জীবন-যাত্রা সুরু হলেই, এই ইচ্ছা ও দ্বেষের দ্বন্দ্ব তাকে মোহিত করে। প্রিয় বা অপ্রিয়ের ধারণা অবশ্য প্রত্যেকের বিভিন্ন।

আজ যাকে মানুষ প্রিয় ভাবে, তাকে পেলেই কি সে তুষ্ট হয়? সে এক আকাঙ্ক্ষার সীমানায় পৌঁছে, আবার পরিখার বাহিরে মনোরম ভূমির সঙ্কেতে চঞ্চল হয়। ভাবে যে আরো আছে তার প্রিয়তর। তখন আবার তার যাত্রা হয় সুরু। ভাবে বাতাস উঠুক তুফান ছুটুক ফিরবে নাকো আর। কিন্তু অজানা দেশে যাত্রার শেষে যথা পূর্বং তথা পরম্।

মানুষের এক প্রকৃতি তাকে ক্ষুদ্র আমিত্বের মধ্যে ঘিরে রাখে, আর এক প্রকৃতি সে আমিত্বকে অতিক্রম করে। সে প্রকৃতি শান্তি চায়, অথচ অশান্ত। কারণ মানবের সুখ অল্পে নয়, ভূমায়। তাই সে অহরহ—প্রসার চায়, বাড়তে চায়, নিজের মধ্যে পূর্ণতা চায়।

মানুষ চিরদিনের যাত্রী, অনাগরিক। সে পথের মাঝে বাসা বাঁধে। ক্ষুদ্র প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লে আবার আয়োজন করে পথ-চলার। মানবের প্রবৃত্তিগুলা ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্য হারায়। ভ্রাম্যমান পরিশ্রান্ত ক্ষণিক বিশ্রাম করে। কিন্তু ক্লান্তিকে ফিরিয়ে পাবার জন্যই যেন সে আবার ছোটে নতুন কূলের সন্ধানে। অদূরে জেগে ওঠে কূল—শান্তির ছায়া-শীতল। বিপুল পরিশ্রমের প্রেরণা আসে—হৃদয়ে আশা, মনে শেষের স্বপ্ন, প্রাণে আশ্রয়ের লোভ। পথে নানা তরঙ্গ এসে নাচায়, কোনোটি অনুকূল, কেহবা প্রতিকূল। ঝঞ্ঝা ওঠে, আবার সুষ্টু বায়ু বয়। আকাশ প্লাবিত হয় বিভিন্ন সঙ্গীতের সুরে। কেহ বলে—ফেরো ফেরো। কেহ গায়—এগিয়ে যাও, শীঘ্র পাবে চির-শান্তি, চির-জ্যোৎস্না-প্লাবিত দেশ যাত্রার শেষে বিরাজিত। কিন্তু কূলে পৌঁছে বোঝে—পথের কষ্ট পণ্ডশ্রম। কোথায় শান্তি? কোথায় তৃপ্তির অমৃত-রস? ধূ ধূ করছে বালু-বেলা। অট্টহাস্য করছে প্রতি বালু-কণা। শ্রান্ত পথিক আবার অদূরে দেখে মরীচিকা। আবার সেই পথে ছোটে।

আমরা মনের গোপনে শান্তির আহ্বান শুনি, কিন্তু চারিদিকে দেখি চিরন্তন সংগ্রাম। আমাদের এক ধর্ম চায় শান্তি, অন্য স্বভাব চায় বৈরিতা—বিশ্ব-বিজয়ের প্রেরণায়। জীবনের যে পথে চলি, যেদিকে তাকাই, সচল জগতের যে প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করি, তারই মাঝে দেখি প্রতিযোগিতা—একের উচ্ছেদে, অন্যের সৃষ্টি, পুষ্টি ও তুষ্টি। সংহারের ভেরী বাঁধন ছেঁড়ে, আবার নতুন বাঁধনের হয় রচনা।

কিন্তু অবিরত আয়াসের মাঝে একটা সত্যের উপলব্ধি হয়—বিশ্বের কোনো অংশ, অন্য বিভাগ হতে বিচ্ছিন্ন নয়। চাঁদ ওঠে, সাগরে জোয়ার আসে। বাতাস বয়—শুকনো পাতা ঝরে নতুন পল্লবকে স্থান দেবার জন্য। পাখী গাছের ডাল ভাঙে নিজের গৃহ রচনার তাগিদে। তার পরিণামে তরু হয় শুষ্ক-শাখার আবর্জনামুক্ত। বৃক্ষ প্রসারের সুবিধা পায়। বিশ্ব একটা প্রকাণ্ড পরিবার। পাখীর সুখ ভোজনে এবং পিয়া-মিলন-আশার সঙ্গীতে। ক্ষুদ্র মানুষও নিজের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু তার মাঝে এক বৃহৎ মানুষ আছে, যার অতৃপ্তি সনাতন, বিশ্ব-বিজয়ের দুরাকাঙ্ক্ষা দুর্বিসহ। এক অদম্য শক্তির সে অধিকারী। একে গীতা বলেছেন—পৌরুষং নৃষু। সেই মনুষ্যত্ব এক অজানাকে জানবার সাধনায় ব্যস্ত। অথচ, সে কথা সে স্পষ্ট বোঝেনা।

এই পৌরুষ বিশ্বের মূল-সূত্রের সন্ধানী। তার জন্য জ্ঞানে ও অজ্ঞানে, অন্তরের এক শক্তির তাড়নায়, মানুষ সদাই পরিশ্রম করছে। যে দুর্বল সে পদে পদে পথ-চলার শ্রান্তিতে, নিরাশার কুহেলিকায় আবৃত হ'য়ে—পথ হারায়—বিশ্রাম চায়—সংগ্রামের পরিশ্রম এড়াতে চায়। কিন্তু উদ্যমহান কর্মহীন থাকতে পারে না। বোঝে—আলস্যে শান্তি নাই। নিরাহার ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-তৃষার নিবৃত্তি হ'লেও তার রসের প্রতি অনুরাগ লোপ পায় না। গীতার শিক্ষা, সে রসের নিবৃত্তি হ'তে পারে পরমের সাক্ষাতে। অলসও মনের মধ্যে গান শোনে—আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে, সেই গভীরে লওগো মোরে অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান।

একই লোক কভু হয় কুয়াশা-পরিবৃত, কভু হয় কর্মরত, কভু বোঝে দিব্যজ্ঞানের রশ্মি উদ্ভাসিত করছে তার অন্তস্তল। আলোর সন্ধান, কর্মের প্রেরণা এবং মোহের আবরণ—এই ত্রিধারায় সংসারের স্রোতস্বতী পুষ্ট।

তাই আমাদের পথচারিতার বিশেষত্ব এই যে আমরা জোয়ার ভাঁটার বিপরীত স্রোতে অব্যবস্থ-চিত্ত কর্ণধারের

স্রোতের নৌকার মত। রাত্রে পথ-হারা পান্থের মত প্রান্তরের একই স্থলে ঘুরে ফিরে পৌছাই। অর্থ-সংগ্রহ ক'রে দেখি, অর্থে শান্তি নাই। যশে শান্তি। পরে দেখি যশ আহরণের চরম পরিণাম নিরাশা। তবু চাই নূতন ধন, নিত্য নবীন যশ। বন্ধুত্বের মাঝে দেখি কুটিলতা, দারুণ স্বার্থের সংঘর্ষণ। এক বন্ধু শত্রু হয়, আবার অন্যের মিত্রতা করি। এ রীতি চলে সর্বদিন সর্ব বিষয়ে।

কিন্তু শিশুকাল হতে চিরকাল মানুষ একটা তত্ত্ব ফুটিয়ে তোলে জীবনে। এ প্রকাণ্ড বিশ্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেলা থাকবার তার তিলার্দ্ধ স্থান নাই। দলের মধ্যে নিজেকে প্রসার না করার অনিবার্য্য পরিণাম উচ্ছেদ। ইচ্ছা ও দ্বেষ উভয়েরই মূলে আছে জানবার বাসনা, প্রসারের ইচ্ছা। শত্রুর পূর্ণতাকে দ্বেষ করি। কিন্তু তাকে জানবার বাসনা অদম্য। সেই বাসনার ফলে হয়, শত্রু শক্তির অংশের প্রতি প্রেম, বাকীটুকুর প্রতি দ্বেষ ও হিংসা। বাঘকে সহজে মানুষ ঘৃণা করেছে নৃশংসতার জন্য, কিন্তু তার বিক্রমের প্রেমে চিত্তকে প্রফুল্ল করেছে। আদর্শ নরকে বলেছে শার্দূল-বিক্রম, নর-শার্দূল।

জড়বাদী বলবে এই প্রেমের প্রসার মানুষের পক্ষে ছিল অত্যাবশ্যক নিজের আত্মরক্ষার তাগিদে। শাস্ত্র বলে, তার এ প্রসারণ-প্রবৃত্তি এলো যে মূল থেকে, তারই শক্তির প্রকাশ এই প্রেম। নিশিদিন মানুষকে টানছে পূর্ণতার প্রেরণা। তারই ফলে সে বুঝেছে যে তার সত্তার অস্তিত্ব থাকবে না বিশ্বের অন্য অংশের সঙ্গে মিতালী না করলে। পরের শক্তি তার শক্তির পূরক, যদিও এ সত্য ভুললে নিজের শক্তির বিলোপ অবধি সম্ভব। পাথর কঠিন কঠোর। কিন্তু সে গুহরূপে মাতৃ-স্নেহে আশ্রয় দিয়েছে আদিম বনচারী নরনারীকে, বাঘ, ভল্লুক, সর্প ও গৃধ্রের অভিযান হতে। মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিতালী করতে হয়েছে, আততায়ীর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মানসে। ব্যক্তি অভিরুচি, ক্ষুদ্র আমিত্বের ক্ষণিক তৃপ্তির বেড়াজাল আদিম যুগ হতে নর-জাতির নির্মূলের হেতু হ'ত। আদি কালের দীর্ঘ-দন্ত শার্দূল, প্রকাণ্ড গণ্ডার বা অতিকায় সরীসৃপের সাথে যোঝবার উপযোগী কোনো অস্ত্রে ভূষিত করেননি বিধাতা আদিম মানবকে। সঙ্ঘের আশীর্বাদে মানব-জাতি আত্মরক্ষার রণে বিজয়লাভ করেছে। দল বাঁধার বাসনা তার সংস্কার। বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রসার করবার ইচ্ছা তার গহন চিত্তের সম্পদ।

একদিকে পূর্ণতা লাভের প্রেরণা, অন্যদিকে যা ক্ষণ-ভঙ্গুর, যা নয় সনাতন, যা গতকাল ছিল না আগামী দিনেও থাকবে না তার পিছনে দৌড়ানো—এই দ্বৈধ-ভাব, এই বিরোধ-ধর্ম জীবের সহজ সংস্কার। আজ মানুষ উন্নত হ'য়েছে। সে প্রকৃতির মাঝে নিজের স্থান পেয়েছে এবং প্রকৃতির বহু রহস্য নিজস্ব করেছে, তবু আরো জানবার, আরো পাবার, আরো প্রসারের আহ্বান তার হৃদয়ের উৎস মুখ হতে সদাই উদ্গত। সে আহ্বান যেমন শিশু ও বনচারী শোনে, তেমনি মহাযোগী মহাজ্ঞানী শোনে।

সে আহ্বান নির্দেশ করে এক প্রচণ্ড অনাদি অনন্ত শক্তিকে। কী সে শক্তি—আমার সাথে যার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান? আর কী সে সম্পর্ক? আদিম বনচারী প্রকৃতির রুদ্র মূর্ত্তিতে ভয় পায়, শান্ত মূর্ত্তিতে শান্তি পায়। অথচ বোঝে তারা একই বিরাট শক্তির বিভিন্ন বিকাশ। অতি বুদ্ধিমানও বিশ্বে বিরাট শক্তির সন্ধান পায়, কিন্তু তাকে বলে অন্ধশক্তি। তার স্বরূপ জানবার ঔৎসুক্য সাধারণ। সবারই মনে প্রশ্ন ওঠে—"কে সে? জানিনা কে। চিনি নাই তারে, শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে, ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি।"

অন্তর প্রদীপ সবারই জ্বলে ওঠে। কে জ্বালায়, কেন জ্বলে—এই সমস্যার সমাধানে দেশে দেশে, যুগে যুগে, কালে কালে প্রচার করেছেন বাণী—সাধু সন্ত দ্রষ্টা ও অবতার।

এ দেশের কৃষ্টি বীরের মত এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে বহুকাল। ঋষিরা বিভিন্ন উপনিষদে, এই বিরুদ্ধ স্বভাবের যথেষ্ট কারণ নির্দেশ করেছেন। জগতের এই দ্বন্দ্ব ও মিলন, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, বিষয়-বিষের প্রকৃতি জেনেও সদা সেই হলাহল পানের তৃষা এবং যা ক্ষণিক তার চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে পরক্ষণে নিরাশার কষাঘাত সহ্য করবার প্রবৃত্তিকে আর্য্যশাস্ত্র নাম দিয়েছেন—মায়া। এ মায়া প্রকৃতির উপাধি, কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা সকল উপনিষদের সার। উপনিষদ গাভী, দোগ্ধা গোপাল-নন্দন, পার্থ বৎস, সুধী মহান গীতামৃত দুগ্ধের ভোক্তা।

গীতায় মানুষের প্রকৃত স্বভাব, তার আচরণ, সংস্কার, স্পৃহা এবং অন্তর বাহিরের নিত্য সংগ্রাম উপেক্ষিত বা লাঞ্ছিত হয়নি। এ শাস্ত্রে জীবনের সাধারণ গতি ও সহজ সমস্যার বর্ণনা আমাদের অন্তরের তারে ঝঙ্কার দেয়। তাই গীতা পাঠে তৃপ্তি। সাধারণ পথ-প্রদর্শকের মতো শ্রীকৃষ্ণ মাত্র বীজমন্ত্র বা তপস্যার উপায় নির্দ্ধারণ ক'রে ক্ষান্ত হননি। বৈরাগ্য-সাধন তাঁর শিক্ষা নয়। বিফলতা মানুষকে বিকল করে, বিদ্রোহী করে। গীতা তেমন সমস্যার কারণ নির্ণয় করেছেন। আত্ম-জ্ঞানই অব্যয় তত্ত্ব-জ্ঞান। আশাবাদ জীবের রহস্য। দুরন্ত নিরাশা ও ব্যর্থতার ঝঞ্ঝার অভিযান হ'তে কি প্রকারে আশা প্রদীপকে সদা প্রজ্জলিত রাখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে তার রহস্য অতি স্পষ্ট ভাষায় বিশদ-ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কর্মই জীবের জীবন। কর্ম অনিবার্য্য। কর্মের পটভূমিতে যে উদ্দেশ্য নিহিত, সৃষ্টি-রহস্যে তার সন্ধান। সৃষ্টি-তত্ত্বের আলোচনায় স্রষ্টার পরিচয়। সে পরিচয় বোধগম্য হ'লে বুঝতে পারা যায়—কেন আস্তিক্য বুদ্ধি সকল মানুষের সহজ সংস্কার। সকল স্তরের, সকল শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ে স্বভাবতঃ আস্তিক্য-বুদ্ধি বিদ্যমান। তার অনিবার্য্য পরিণতি ভক্তি।

মানুষকে নাস্তিক হতে হয় এই সহজাত মনোবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে, তার ভক্তির উৎস-মুখ বন্ধ করতে হয়—তর্ক এবং তথাকথিত বিচার সিদ্ধান্তের বোঝা চাপিয়ে।

এই সহজ আস্তিক্য-বুদ্ধির সংক্ষেপে হেতু নির্দেশ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন—অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্দেশে বাস করেন। সর্বভূত মায়ার বশে যন্ত্রারূঢ়ের মত পরিভ্রমণ করে।

তিনি অন্যত্র বলেছেন—

"আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। স্মৃতি বিস্মৃতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান সবই আমা হ'তে। চারি বেদের অনুশীলনের ফলে আমিই জ্ঞাতব্য, আমিই বেদ-কর্ত্তা এবং বেদ-বেত্তা।"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলেছেন—

পরব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়
পরিপূর্ণ হই বৈসে সবার হৃদয়।

সুতরাং প্রাণের দ্বৈধ-ভাবের দুটি হেতুই জীবের সৃষ্টি-রহস্যে বিদ্যমান। আমরা অনিত্যের পিছনে ছুটি মায়ার বশে। অথচ অন্তরে স্বর শুনি নিজের মাঝে তাঁকে খুঁজে বার করবার। আমাদের সম্প্রসারণের অদম্য স্পৃহার হেতু—হৃদ্দেশে ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

সম্প্রসারণের বাহন প্রেম। সে প্রেম নানারূপে প্রকটিত হয়। সে প্রেম সহজেই শিশুনরের প্রাণে বিদ্যমান। স্নেহের প্রতিমা দেখে সে জননীকে। তার সহ মাতৃ-ভক্তি পরা-ভক্তির ছায়া। বহির্জগতের মাধুরী, মহত্ত্ব এবং কঠোরতা অজ্ঞ বনচারীর মাথা নত করে অজানা লুক্কায়িত শক্তির পাদপীঠে। এ ভক্তি সহজ—সহজাত আস্তিক্য-বুদ্ধির পরিণতি।

দৈবী মায়া দুরতিক্রম্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যাঁরা আমাকে পান, তাঁরা মায়া অতিক্রম করেন। এই মায়া অতিক্রম করলে পুনর্জন্ম দুঃখ হতে পরিত্রাণ।

আমাদের অন্তরে যে আস্তিক্য-বুদ্ধি বিদ্যমান, অথচ মোহে ঢাকা সেই আবরণ উন্মোচন করলে স্রষ্টার বিরাট সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন হয়। প্রাণে গুঞ্জরিয়া উঠে—

তোমার অসীমে প্রাণ-মন লয়ে যতদূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।

বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী শাস্ত্রী

নির্বাসনের পূর্ব্বে ট্রট্স্কীর পত্র

পত্র পরিচয় :—

লেনিন, ট্রট্স্কী, স্টালিন রাশিয়ার ত্রয়ী; জারতন্ত্র বিজয়ী। ট্রট্স্কী তাঁর রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে লিখেছেন—"বিপ্লব আমার জনক জননী. আমি বিপ্লবের সন্তান।"

১৯১৬ সাল—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এসেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া জার্ম্মান সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য সমবেত। স্বদেশ, স্বজাতি, সাম্রাজ্যের নামে বিভিন্ন স্বার্থ ও ঐতিহ্য সত্ত্বেও শত্রু জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে রাশিয়ার লেনিন, জার্ম্মানীর কার্লমর্ক্সের মতানুবর্তন করে বিশ্বব্যাপী এক সমাজতন্ত্র গঠনের দাবী জানিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। তাঁর শিষ্য ট্রট্স্কী ও ষ্টালিন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন রিচালিত করে চলেছেন। তাঁদের আঘাতের প্রথম লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার রেতন্ত্র। বর্তমান পৃথিবীর প্রত্যেক সাম্রাজ্যের ভিত্তিই ধনিকের ধনতন্ত্র। তারাই সাম্রাজ্যের নামে জাতীয়তার নামে শ্রমিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করছিল। কারণ সমাজতন্ত্রীদল যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন। অনেক দেশেই বহু সমাজতান্ত্রিক নেতা দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, কারণ, দেশ বিপন্ন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফরাসী সমাজতন্ত্রী জুলে গুয়েদা। তিনি পূর্ব্বে লেনিনদলের ফরাসী শাখার বিখ্যাত লেখক ও নেতা ট্রট্স্কীর সহকর্ম্মী ছিলেন। যুদ্ধের সময় জুলে গুয়েদা ফরাসী রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যুদ্ধের প্রয়োজনে তাঁর প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী বন্ধু ট্রট্স্কীকে ফরাসীদেশ থেকে বিতাড়িত করেছেন। ট্রট্স্কী সম্পাদিত "নাশে স্লোভা"—"আমাদের পৃথিবী" সংবাদপত্র ফরাসী দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করলেন। নির্ব্বাসনের পূর্ব্বমুহূর্তে ট্রট্স্কী লিখলেন এই অপরূপ পত্র।

পত্রানুবাদ :—

রাষ্ট্রমন্ত্রী জুলে গুয়েদা,

আমি ফরাসীদেশ ত্যাগ করে যাচ্ছি, অবশ্য আমার সঙ্গে আপনার নিয়োজিত পুলিশবাহিনী রয়েছে। তারা আপনার অধীনে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করছে, সেই স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব আপনার হস্তে ন্যস্ত আছে। আমার ফরাসী দেশ ত্যাগের পূর্ব্বে আপনাকে আমার মনোভাব জানিয়ে যাব। অবশ্য আমার কথাগুলি আপনার কোন প্রয়োজনে আসবে না, হয়ত বা ভবিষ্যতে আপনার বিরুদ্ধে প্রয়োজিত হতে পারে। আমাকে ফরাসী দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছে; আপনার সহকর্ম্মী যুদ্ধমন্ত্রী আমাকে নির্ব্বাসিত করেছেন। আমি রাশিয়ান সংবাদপত্র "নাশে স্লোভার" (আমাদের পৃথিবী) সম্পাদক ছিলাম; তিনি সেই পত্রিকার প্রচার ফরাসী দেশে বন্ধ করেছেন। অবশ্য তার জন্য কোন কারণ প্রদর্শন করা প্রয়োজন মনে করেন নি। এই পত্রিকাখানি বিগত দুই বৎসর যাবত যুদ্ধমন্ত্রীর হস্তে কত অত্যাচার সহ্য করেছে, তা' আপনার অজ্ঞাত নয়।

অবশ্য আমার নির্ব্বাসনের কারণ সম্বন্ধে কোন তথ্যই আমার অজ্ঞাত নাই, সে কথা আমি গোপন করব না। একজন আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীর বিরুদ্ধে দমনাত্মক ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আপনার ছিল, কারণ আমি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পক্ষ সমর্থন করিনি, অথবা আমি সে যুদ্ধে স্বেচ্ছায় কোন সহায়তা করিনি।

কিন্তু মজার ব্যাপারটী হচ্ছে এই যে, নির্ব্বাসন হয়েছে আমার, এবং আমাকে নিয়ে হয়েছে আলোচনা, অথচ নির্ব্বাসনের কারণ আমাকে না জানিয়ে মসিয়েঁ ব্রিয়াঁ রাষ্ট্রসভার সভ্য এবং সাংবাদিকদের নিকট তথ্যটী প্রকাশ করেছেন।

গত আগষ্ট মাসে মার্সাই-এর অদূরে একদল বিদ্রোহী রুশ সৈন্য তাদের কর্ণেলকে হত্যা করেছিল। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সৈন্যদের কাছে আমার সম্পাদিত "নাশে স্লোভা" সংবাদপত্রটী আবিষ্কৃত হয়েছে। মসিয়েঁ ব্রিয়াঁ এই আবিষ্কারের সংবাদ কয়েকজন রাষ্ট্রসভার সভ্যের নিকট বলেছেন এবং তাঁরা এই সুসংবাদটী রাশিয়ার ধনতান্ত্রিক সংবাদপত্রের নিকট সালংকারে প্রেরণ করেছেন।

একথা সত্য যে, মসিয়েঁ ব্রিয়াঁ "নাশে স্লোভা"কে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করতে সাহস করেন নি, কারণ "নাশে স্লোভা" পত্রিকার প্রত্যেকটী সংবাদ তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে মসিঁয়ে ব্রিয়াঁর মনোভাব অনেকটা এইরূপ :—রাশিয়ার সৈন্যদল ফরাসী দেশে অবস্থান কালে "নাশে স্লোভা"র মতন সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুলবে; সুতরাং ঐ পত্রের সম্পাদক-মণ্ডলীকে গণতান্ত্রিক ফরাসী দেশ থেকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন। যে সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে কাল্পনিক এবং মিথ্যা সংবাদ প্রচার করতে অস্বীকার করে, সে হয়ত রাশিয়ান সৈন্যদের মনকে স্বাধীন চিন্তা করতে শেখাতে পারে। সৈন্যদের পক্ষে স্বাধীন চিন্তা করা রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মসিয়েঁ ব্রিয়াঁর ব্যাখ্যার মধ্যে বিপরীতার্থক কথা রয়েছে; একবৎসর পূর্ব্বেই ফরাসীমন্ত্রী হার্ভে রাশিয়ান আশ্রয়-প্রার্থীদের বিষয়ে প্রচার করেছিলেন যে, যদি তাদের নির্ব্বাসিত করা হয় তবে ফরাসী জনসাধারণ সেই সিদ্ধান্ত বিনাপ্রতিবাদে স্বীকার করে

কোন মূল্য নাই। ট্রট্স্কী আবার কারারুদ্ধ হলেন। আবার পলায়ন করলেন—এবার ভিয়েনায়। সেই সময় থেকে তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে নিজকে নিয়োজিত করলেন—তিনি আদর্শ প্রচার করেছেন, পত্রিকা সম্পাদন করেছেন, ১৯১৭ সালের বিদ্রোহ পরিচালনা করেছেন, লেনিনের সহযোগিতা করেছেন, আবার নির্ব্বাসিত হয়েছেন, তাঁর জীবনের সঙ্গে রাশিয়ান বিদ্রোহ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে "রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস" রচনা করলেন। যে ঘটনা তিনি সৃষ্টি করেছেন—সেই ঘটনার ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন। সুতরাং ব্যক্তিগত স্পর্শে সেই ইতিহাস হয়ে উঠেছে জীবন্ত, এই ইতিহাসের মধ্যে পাই—"অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের তীব্র সংঘাতের গভীর গর্জ্জন।"

১৯২৩ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর ১৯২৭ সালে ট্রট্স্কীকে ষ্ট্যালিন দল থেকে বহিষ্কৃত করলেন। তার পর তাঁকে তুর্কীস্থানে নির্ব্বাসিত করা হল।

অদৃষ্টের পরিহাসে ১৯১৬ সালের ফরাসী নিষেধাজ্ঞা ১৯২৯ সালে পরিবর্ত্তিত হয়ে ট্রট্স্কী পুনরায় ফরাসীদেশে বাস করবার অধিকার পেলেন। তিনি প্যারিসের উপকণ্ঠে বাস করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ষ্ট্যালিন ফরাসী সরকারের নিকট অভিযোগ করলেন—ট্রট্স্কী কিরভের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। ট্রট্স্কী ষ্ট্যালিনের শত্রু, ট্রট্স্কী অভিযোগ করলেন, "ষ্ট্যালিন রাশিয়ায় বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছেন, ষ্ট্যালিন বিশ্বাসঘাতক।" এই আঘাত প্রতিঘাতের পর ট্রট্স্কী পুনরায় চললেন যাযাবরের মতন। পৃথিবীর কোথাও তাঁর আশ্রয় নেই, পরে ১৯৩৬ সালে তিনি সাময়িকভাবে আশ্রয় পেলেন নরওয়ে দেশে। এক বৎসর পরে ১৯৩৭ সালে মেক্সিকোতে বিশ্রাম-আবাস স্থাপন করলেন। তিন বৎসর পরে জেকস্ মারসড্ তাঁকে হত্যা করল। ট্রট্স্কীর বিশ্বাস, এই হত্যার মূলে রয়েছে ষ্ট্যালিনের প্রচ্ছন্ন হস্ত। ট্রট্স্কীর সর্ব্বশেষ বাণী ছিল—"আমাদের বন্ধুদের বলুন, আমি চতুর্থ আন্তর্জাতিক জয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এগিয়ে চলুন।"

রহস্যময়ী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বল দেখি দেখা হোল কত দিন পরে?
কত দিন? মনে হয় যেন যুগান্তরে
ছিলে তুমি একান্ত নিকট মোর।
কখন না জানি কেন কাটিয়া বন্ধন-ডোর
চলে গেলে কোথায় না জানি;
দুঃসহ দিনের তিক্ত জীবনের গ্লানি
বহিয়া এলাম একা।
অনেকের সাথে মোর পথে হোল দেখা,
দেখিনু নিকটে মোর; অশান্ত চিত্তের অন্তরালে
তুমি যেন পা বাড়ালে
অতি সন্তর্পণে;
তাই বুঝি মনের দর্পণে
পড়েছে তোমার ছায়া বারবার সচকিয়া মোরে।
তাই কি স্বপ্ন ঘোরে
ডেকেছি তোমারে বারেবার
খুলিয়া রেখেছি দ্বার—

আশা ছিল যদি কোনও দিন
শোভাশূন্য আরাম বিহীন
আমার এ শূন্য ঘরে ফিরে আস নিতান্ত খেয়ালে,
দীপ-নির্ব্বাণের আগে ছায়া তব পড়িবে দেয়ালে।
সেদিকে চাহিয়া মোর পরিশ্রান্ত আঁখি
তোমা পানে উন্মীলিত থাকি
আশা ভ'রে হবে কম্পমান,
পল্লবে পলক হ'বে যেন শতবর্ষের সমান।
ছায়া যদি কায়া হ'য়ে ফিরিয়া দাঁড়ায়
সে মুহূর্ত্তে মন যদি আপনা হারায়
তবুও ত আমার সম্মুখে
পরিচিত সে সুন্দর মুখে
দীপ শিখা দিবে তার আলো
ভাল ক'রে দেখে লব কী মাধুর্য্য আমারে ভুলালো,
ভুলালো সংসার মোর ভুলাইল আমার ভুবন
নয়নে প্রচ্ছন্ন তব কী সে রহস্য-প্রস্রবণ!

কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নবম পরিচ্ছেদ

রাজপুরীতে

রাজপুরীর প্রাকার-বেষ্টনীর মধ্যে অনেকগুলি প্রাসাদ আছে; কোনটি সভাগৃহ, কোনটি কোষাগার, কোনটি মন্ত্রণাভবন; একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। রাজকন্যা যে প্রাসাদে বাস করেন তাহা অবরোধ; তাহার পাশে রাজার জন্য পৃথক ভবন। উভয় প্রাসাদের মধ্যে অলিন্দের সংযোগ; উভয় প্রাসাদ ত্রিভূজক।

রাজপ্রাসাদের নিম্নতলে এক পাশের কয়েকটি কক্ষ লইয়া সন্নিধাতা হর্ষের বাসস্থান। রাজ বৈভবের তুলনায় ইহা অপকৃষ্ট হইলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐশ্বর্যের চূড়ান্ত। কঞ্চুকী লক্ষ্মণ চিত্রককে এইখানে আনিয়া অধিষ্ঠিত করিল।

চিত্রক আস্তে আস্তে আসন পরিগ্রহ করিতে না করিতে কঞ্চুকীর ইঙ্গিতে কয়েকটা অসুরাকৃতি সম্বাহক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া সর্বাঙ্গে সবেগে তৈল মর্দন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

অতঃপর চিত্রক শীতল জলে স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিল; অঙ্গে চন্দন প্রলেপ দিয়া আহারে বসিল। প্রচুর পিষ্টক পৌলিক মোদক পরমান্নের আয়োজন, তদুপরি কঞ্চুকীর সবিনয় নির্বন্ধ। চিত্রক আকণ্ঠ ভরিয়া ভোজন করিল।

তারপর শরতের মেঘশুভ্র শয্যায় শয়ন। দুইজন নহাপিত আসিয়া অতি আরামদায়ক ভাবে হস্তপদ টিপিয়া দিতে লাগিল। এই আলস্যসুখ মুদিতচক্ষে উপভোগ করিতে করিতে, পুরুষ ভাগ্যের বিচিত্র ভুজঙ্গ-গতির কথা চিন্তা করিতে করিতে চিত্রক ঘুমাইয়া পড়িল।

ওদিকে সচিব চতুরানন ভট্ট মগধের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা মিথ্যা হয় নাই, রাষ্ট্রনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন না করিয়া যতখানি রূঢ়তা প্রকাশ করা যাইতে পারে ততখানি রূঢ়তার সহিত লিপিতে বিটকরাজ্যের উপর নির্দেশ প্রেরিত হইয়াছে—বিটকরাজ অচিরাৎ মগধের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া বক্রী রাজস্ব অর্পণ করুন; নচেৎ হূণহরিণকেশরী সম্রাট স্কন্দগুপ্ত স্বয়ং সসৈন্যে গান্ধার অভিমুখে যাইতেছেন, ইত্যাদি।

পত্র পাঠ করিয়া চতুর ভট্ট দীর্ঘকাল গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিলেন; তারপর অন্য সচিবদের ডাকিয়া মন্ত্রণায় বসিলেন। শ্যেনপক্ষীর সহিত চটকের প্রতিস্পর্ধিতা সম্ভব নয়; চটকের পক্ষে হিতকরও নয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে বাহুবলই সর্বস্ব নয়, কূটনীতিও আছে। স্কন্দগুপ্ত নূতন হূণ অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য গান্ধারে আসিতেছেন; ঘোর যুদ্ধ বাধিবে; দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিবে; শেষ পর্য্যন্ত ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইবে কিছুই বলা যায় না। সুতরাং অবিলম্বে মগধের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া ছলছুতা দ্বারা যদি কালহরণ করা যায়, হয়তো অন্তে সুফল ফলিতে পারে। একদিকে হূণ, অন্য দিকে স্কন্দগুপ্ত; এ অবস্থায় যথাসাধ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনই যুক্তি।

সচিবগণ একমত হইয়া মনস্থ করিলেন, পত্রের উত্তর দানে যথাসম্ভব বিলম্ব করা হোক; দূতটাকে বলা যাক, মহারাজ কপোতকূটে যতদিন না ফিরেন ততদিন পত্রের উত্তর দান সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে মহারাজ রোট্টকে সব কথা জানাইয়া বার্তা প্রেরণ করা আবশ্যক। তিনি এখন চন্দনদুর্গেই থাকুন, রাজধানীতে ফিরিবার কোনও তাড়া নাই। কিন্তু এত বড় গুরুতর সংবাদ তাঁহার গোচর করা সর্বাগ্রে কর্তব্য।

এইরূপ মনোনীত হইলে পর ত্বরিতগতি তুরঙ্গপৃষ্ঠে চন্দন দুর্গে বার্তাবহ প্রেরিত হইল।

মন্ত্রগৃহে যখন এই সকল রাজকার্য চলিতেছিল, কুমারী রট্টা তখন নিজ ভবনে ছিলেন। আজ নানা কারণে তাঁহার মন কিছু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। প্রথমেই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগরণ; তারপর চৌর ঘটিত ব্যাপারের অদ্ভুত পরিসমাপ্তি। মগধের দূত···মগধ······বিশ্ববিশ্রুত পাটলিপুত্র নগর······দিগ্বিজয়ী বীর স্কন্দগুপ্ত······দূত নিজের কী নাম বলিয়াছিল? চিত্রকবর্মা! চিত্রক······ চিত্র ব্যাঘ্র······ব্যাঘ্রের সহিত কোথাও যেন সাদৃশ্য আছে ···চোখের দৃষ্টি বড় নির্ভীক···

সর্বশেষে সুগোপার মাতার উদ্ধার। সুগোপার মাতা প্রাক্তন রাজপুত্রের ধাত্রী ছিল, কুমারী রট্টা তাহা জানিতেন। অভাগিনীর এই দুর্দশা হইয়াছিল? সকলের অজ্ঞাতে পঁচিশ বৎসর বন্দিনী ছিল! কেমন করিয়া বাঁচিয়া ছিল; কে তাহাকে আহার দিত? পৃথার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া রট্টার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িল। উঃ, পঁচিশ বৎসর পূর্বে হূণেরা কি বর্বরতাই না করিয়াছিল। রট্টা হূণ-দুহিতা, তবু—

সুগোপা মাতাকে উদ্ধার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে লইয়া গিয়াছিল। সুগোপা বড় কান্না কাঁদিয়াছিল, স্মরণ করিয়া রট্টার চোখেও জল আসিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল সুগোপার গৃহে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসেন। সুগোপার গৃহে তিনি বহুবার গিয়াছেন, যখন ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু আজ যাইতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইল। প্রিয়সখি সুগোপা মৃতকল্পা মাতাকে পাইয়া তুমুল হৃদয়াবেগের আবর্তে নিমজ্জিত হইয়াছে, এখন রট্টা তাহার কাছে যাইলে সে বিভ্রান্ত হইবে, বিব্রত হইবে—

মধ্যাহ্ন অতীত হইবার পর রট্টা গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গ্রহাচার্য আসিলেন; স্বপ্ন-কথা শুনিয়া তিনি গ্রহগণনার আঁক কষিলেন, দিক্‌নির্ণয় করিলেন, লগ্ন নির্ধারণ করিলেন। তারপর ফলাদেশ করিলেন,—'কল্যাণি, তোমার জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু শঙ্কিত হইও না; অন্তে ফল শুভ হইবে। এক দিঙ্‌নাগ-সদৃশ মহা-তেজস্বী পুরুষের সহিত তোমার পরিচয় ঘটিবে; এই পুরুষসিংহ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তোমার বিবাহের কালও আসন্ন। শুভমস্তু।' গ্রহবিপ্রের ভাব গতিক দেখিয়া মনে হইল তিনি সব কথা খুলিয়া বলিলেন না, কিছু চাপিয়া গেলেন।

তিনি বিদায় হইলে রট্টা দীর্ঘকাল করলগ্ন কপোলে বসিয়া রহিলেন; শেষে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন— নিয়তির বিধান যখন অখণ্ডনীয় তখন চিন্তা করিয়া লাভ কি?

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল।

ওদিকে চিত্রক দীর্ঘ দিবানিদ্রার পর জাগিয়া উঠিয়াছে। শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ; গত কয়েকদিনের নানা ক্লেশজনিত গ্লানি আর নাই। তাহার মনেরও শরীরের অনুপাতে প্রফুল্ল হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু চিত্রক অনুভব করিল, তাহার মন প্রফুল্ল না হইয়া বরং ক্রমশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে।

রাজপুরীর আদর আপ্যায়নে সে অভ্যস্ত নয়; উপরন্তু কঞ্চুকী লক্ষ্মণ যেন একটু অধিক পরিচর্যা করিতেছে। সে দণ্ডে দণ্ডে আসিয়া চিত্রকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সন্দেশ লইতেছে; তদুপরি তাহার কয়েকটা অনুচর সর্বদাই চিত্রককে বেষ্টন করিয়া আছে। কেহ ব্যজন করিতেছে, কেহ শীতল তক্র বা ফলাম্লরস আনিয়া সম্মুখে ধরিতেছে, কেহ বা তাম্বুল দিতেছে! মুহূর্তের জন্যও সে একাকী থাকিতে পাইতেছে না। তাহার সন্দেহ হইল, এই সাড়ম্বর আপ্যায়নের অন্তরালে অদৃশ্য জাল তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সে মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। হঠাৎবশে রাজকুমারী রট্টার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে চিত্রক মনে মনে একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়া গাত্রোত্থান করিল। উত্তরীয় স্কন্ধে লইতেই এক কিঙ্কর যোড়হস্তে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল—'কি প্রয়োজন আদেশ করুণ আর্য-আণবেদু।'

চিত্রক বলিল—'বহির্ভাগে পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। বায়ু সেবনের প্রয়োজন।'

কিঙ্কর পশ্চাৎপদ হইয়া অন্তর্হিত হইল।

চিত্রক রাজভবনের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছে, কোথা হইতে কঞ্চুকী আসিয়া হাসিমুখে তাহার সহিত যোগ দিল। 'সায়ংকালে বায়ু সেবনের ইচ্ছা হইয়াছে? ভাল ভাল, চলুন আপনাকে রাজপুরী দেখাই।' বলিয়া লক্ষ্মণ কঞ্চুকী লক্ষ্মণ ভ্রাতার মতই তাহার সহগামী হইল।

দুইজনে পুরভূমির যত্রতত্র বিচরণ করিতে লাগিল। চিত্রক বুঝিল পুরীর বাহিরে যাইবার চেষ্টা বৃথা, সে পুর-প্রাকারের বাহিরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কঞ্চুকী হয়তো বাধা দিবে না, কিন্তু নিজে সঙ্গে থাকিবে। সুতরাং বাহিরে যাইবার আগ্রহ প্রকাশ না করাই ভাল।

বিস্তৃর্ত পুরভূমির স্থানে স্থানে বৃক্ষ-বাটিকা, লতা-মণ্ডপ। মানুষ বেশী নাই ; যাহারা আছে তাহারা অধিকাংশই সশস্ত্র প্রতীহার কিম্বা রক্ষী, দুই চারিজন উদ্যানপালও আছে। তাহারা সকলে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত।

ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্রক অনুভব করিল, কঞ্চুকী ছাড়াও অন্য কেহ তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে, নিজে অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। চিত্রক চকিতে কয়েকবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কিন্তু সন্ধ্যার মন্দালোকে বিশেষ কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

তারপর এক বৃক্ষ-বাটিকার নিকটে চিত্রক তাহার অদৃশ্য অনুসরণকারীকে মুখোমুখি দেখিতে পাইল। এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একযোড়া ভয়ঙ্কর চক্ষু তাহার দিকে চাহিয়া আছে, হিংসাবিকৃত মুখে জ্বলন্ত দুটা চক্ষু। চিত্রক চমকিয়া বলিয়া উঠিল—'ও কে ?' সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া গেল।

কঞ্চুকী বলিল—'ও গুহ। আপনাকে নূতন মানুষ দেখিয়া বোধ হয় কৌতূহলী হইয়াছে।

চিত্রকের গত রাত্রের কথা মনে পড়িল : হাঁ, সেই বটে। কিন্তু গত রাত্রে গুহর চোখে এমন তীব্র দৃষ্টি ছিল না। চিত্রক কঞ্চুকীকে প্রশ্ন করিলে কঞ্চুকী সংক্ষেপে পাগল গুহর বৃত্তান্ত বলিল। তখন চিত্রক, অন্ধকূপে পৃথার নিকট যে কাহিনী শুনিয়াছিল তাহার সহিত মিলাইয়া প্রকৃত ঘটনা অনেকটা অনুমান করিয়া লইল। গুহই পৃথাকে হরণ করিয়া কূটরন্ধ্রে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ইচ্ছা ছিল যুদ্ধ শেষ হইলে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দখল করিবে, কিন্তু মস্তকে আঘাত পাইয়া তাহার স্মৃতি ভ্রংশ হয়। তবু সে সব কথা ভোলে নাই ; কোন অর্ধ-বিভ্রান্ত বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া গোপনে পৃথাকে খাদ্য দিয়া যাইত। শতাব্দীর একপাদ ধরিয়া সে এই কাজ করিয়াছে ! আশ্চর্য মস্তিষ্কের ক্রিয়া, আশ্চর্য জীবের সহজাত সংস্কার !

ক্রমে দিবালোক মুছিয়া গিয়া চাঁদের আলো ফুটিয়া উঠিল। রাজপুরীর ভবনে ভবনে দীপমালা জ্বলিল।

প্রদোষের এই সন্ধিক্ষণে চারিদিকে চাহিয়া চিত্রকের মনে হইল সে এই নির্বান্ধব পুরীতে একান্ত একাকী, নিতান্ত অসহায়। কাল বন্দী হইবার পর অন্ধকার কারাকূপের মধ্যে তাহার যে অবস্থা হইয়াছিল, আজ রাজপুরীর দীপোদ্ভাসিত প্রাঙ্গণে সে অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই।

সহসা তাহার অন্তর অসহ্য অধীরতায় ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল ; সে যেন জল হইতে তীরে নিক্ষিপ্ত মীন। কিন্তু সে তাহার মনের অবস্থা সযত্নে গোপন করিয়া কঞ্চুকী সমভিব্যাহারে নিজ বাসভবনের দিকে ফিরিয়া চলিল।

*　　*　　*

রাত্রির মধ্য যামে রাজপুরীর আলোকমালা নির্বাপিত হইয়াছিল ; শুক্লা চতুর্দশীর চন্দ্র পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে লঘু মেঘখণ্ড আসিয়া স্বচ্ছ আবরণে চন্দ্রকে ঢাকিয়া দিতেছিল।

রাজভবন সুপ্ত ; কোথাও শব্দ নাই। চিত্রক আপন শয়নকক্ষে শয্যায় লম্বমান ছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সে ঘুমায় নাই, কেবল চক্ষু মুদিত করিয়া শয্যায় পড়িয়াছিল।

ঘরের এক কোণে স্তিমিত বর্তিকা [illegible] বিকীর্ণ করিতেছিল ; মুক্ত বাতায়ন পথে মৃদু বায়ুর সহিত জ্যোৎস্নার প্রতিভাস কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। চিত্রক নিঃশব্দে পালঙ্ক হইতে নামিয়া বাতায়নের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কোথাও জনমানব নাই ; চন্দ্রিকালিপ্ত পুরী নিথর দাঁড়াইয়া আছে।

চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ মেঘে ঢাকা পড়িল ; বহির্দৃশ্য আবছায়া হইয়া গেল। চিত্রক তখন বাতায়ন হইতে সরিয়া আসিয়া দ্বার পথে উঁকি মারিল। দ্বারের বাহিরে একটা কিঙ্কর বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে ; অন্য কেহ নাই। চিত্রক নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল। প্রাচীর গাত্রে তাহার সর্কোষ অসি ঝুলিতেছিল, সে তাহা কোমরে বাঁধিল।

তারপর লঘু পদে বাতায়ন লঙ্ঘন করিয়া সে পুর-ভূমিতে উত্তীর্ণ হইল। দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া ভাবিল, একটা

বাধা উত্তীর্ণ হইয়াছি, আর একটা বাকি—পুরপ্রাকার। ইহা পার হইলেই মুক্তি।

অদূরে একটি লতা মণ্ডপের অন্তরাল হইতে দুইটি তীক্ষ্ণ চক্ষু যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা সে জানিতে পারিল না।

চন্দ্রের মুখে আবার মেঘের আচ্ছাদন পড়িল। এই সুযোগে চিত্রক ত্বরিত পদে প্রাকারের দিকে চলিল। প্রাকারের ভিতর দিকে স্থানে স্থানে প্রাকারশীর্ষে উঠিবার সঙ্কীর্ণ সোপান আছে, তাহা সে সায়ংকালে লক্ষ্য করিয়াছিল।

প্রাকারশীর্ষে উঠিয়া চিত্রক বাহিরের দিকে উঁকি মারিল। প্রাকার বহির্ভূমি হইতে প্রায় পঞ্চদশ হস্ত উচ্চ; তাহার মসৃণ পাষাণ-গাত্র বাহিয়া নামিবার বা উঠিবার কোনও উপায় নাই। এক উপায়, বজ্রাঙ্গ-বলী পবনপুত্রকে স্মরণ করিয়া নিম্নে লাফাইয়া পড়া; কিন্তু তাহাতে যদি বা প্রাণ বাঁচে, হস্ত পদ রক্ষা পাইবে না; অস্থি ভাঙিবে। তখন পলায়নের চেষ্টা হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হইবে।

তবে এখন কী কর্তব্য? আবার চুপি চুপি গিয়া শয্যায় শুইয়া থাকা? না, আরও চেষ্টা করিতে হইবে। বাহির হইবার একমাত্র পথ তোরণ দ্বার। তোরণ দ্বারে প্রতীহার আছে—তাহার চোখে ধুলা দিয়া বাহির হওয়া কি সম্ভব? কে বলিতে পারে, প্রতীহার হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।—

চিত্রক প্রাকারের উপর দিয়া তোরণ দ্বারের অভিমুখে চলিল। সাবধানে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে। সে চকিতে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

তোরণ স্তম্ভের কাছে পৌঁছিয়া চিত্রক সন্তর্পণে নিম্নে দৃষ্টি প্রেরণ করিল; দেখিল প্রতীহার দ্বারের লৌহ কবাটে পৃষ্ঠ রাখিয়া পদদ্বয় প্রসারণ পূর্বক ভূমিতে বসিয়া আছে, তাহার চিবুক বক্ষের উপর নত হইয়া পড়িয়াছে, ভল্লটি জানুর উপর স্থাপিত। প্রতীহার যে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহাকে দেখিতে দেখিতে চিত্রকের নাসাপুট স্ফুরিত হইতে লাগিল, ললাটের টীকা ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। দেহের স্নায়ুপেশী কঠিন করিয়া সে ক্ষণকাল চিন্তা করিল তারপর নিঃশব্দে কোষ হইতে তরবারি বাহির করিল। ইহাই এখন একমাত্র উপায়। তোরণ দ্বারের গাত্রে যে ক্ষুদ্র কবাট আছে তাহা খুলিয়া সে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে। প্রতীহারকে না জাগাইয়া যদি বাহির হইতে পারে ভাল, আর যদি প্রতীহার জাগিয়া ওঠে, তখন—

নিকটেই শীর্ণ সোপানশ্রেণী; চিত্রক নীচে নামিল। তোরণস্তম্ভের গা ঘেঁষিয়া অতি সতর্ক পদসঞ্চারে নিদ্রিত প্রতীহারের দিকে অগ্রসর হইল। এতক্ষণে সে প্রতীহারের মুখ দেখিতে পাইল; দেখিল গত রাত্রির সেই প্রতীহার।

ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া চিত্রক আর এক পদ অগ্রসর হইল। কিন্তু আর তাহাকে অগ্রসর হইতে হইল না। এই সময় পশ্চাতে একটা গভীর গর্জনধ্বনি হইল; সঙ্গে সঙ্গে ভল্লুকের মতো একটা জীব তাহার স্কন্ধে লাফাইয়া পড়িয়া দুই বজ্রবাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

অতর্কিত আক্রমণে চিত্রক সম্মুখ দিকে পড়িয়া গেল। আক্রামকও সঙ্গে সঙ্গে পড়িল, কিন্তু তাহার বাহুবন্ধন শ্লথ হইল না। চিত্রকের শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। শত্রু পৃষ্ঠের উপর—চিত্রক তাহাকে দেখিতে পাইল না। অন্ধভাবে মাটিতে পড়িয়া সে অদৃশ্য আততায়ীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; তাহার মুষ্টি হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। দুই হাতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিন্তু সে আততায়ীর নাগপাশ হইতে নিজ কণ্ঠ মুক্ত করিতে পারিল না।

এদিকে প্রতীহার আচম্বিতে ঘুম ভাঙিয়া দেখিল তাহার সম্মুখে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। কিছু না বুঝিয়াই সে লাফাইয়া উঠিল এবং কটি হইতে একটা তূরী বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার দিতে লাগিল। তূর্যের তারধ্বনিতে চারিদিক সচকিত হইয়া উঠিল।

চিত্রকের অবস্থা ততক্ষণে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কণ্ঠ মুক্ত করিবার চেষ্টা বৃথা। অন্ধভাবে চিত্রক মাটিতে হাত রাখিল; তরবারিটা তাহার হাতে ঠেকিল। মোহগ্রস্তভাবে তরবারি মুষ্টিতে লইয়া চিত্রক কোনও ক্রমে জানুর উপর

উঠিল, তারপর তরবারি পিছন দিকে ফিরাইল; আততায়ী যেখানে তাহার পৃষ্ঠের উপর জড়াইয়া ধরিয়াছে সেইখানে তরবারির অগ্রভাগ রাখিয়া দুই হাতে আকর্ষণ করিল। তরবারি ধীরে ধীরে আততায়ীর পঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ আততায়ী তদবস্থ রহিল; তারপর তাহার বাহুবন্ধন সহসা শিথিল হইল। সে চিত্রকের পৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ফুস্‌ফুস্ ভরিয়া শ্বাসগ্রহণপূর্বক চিত্রক টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে তূরীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন পুরবাসী ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং দণ্ডাদির দ্বারা চিত্রককে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহার মুখ দেখিয়া তাহারা নিরস্ত হইল।

তোরণ প্রতীহার ভল্ল অগ্রবর্তী করিয়া কাছে আসিয়া মহা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—'আরে এ কি! এ যে কাল রাত্রির চোর—না না—মগধের দূত মহাশয়! এত রাত্রে এখানে কি করিতেছেন? ওটা কে?'

চিত্রক ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল—'জানি না। আমাকে পিছন হইতে আচম্বিতে আক্রমণ করিয়াছিল—'

আততায়ীর অসিবিদ্ধ দেহটা অধোমুখ হইয়া পড়িয়া ছিল, একজন গিয়া তাহাকে উল্টাইয়া দিল। তখন চন্দ্রালোকে তাহার মুখ দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল—গুহ।

গুহ মরিয়াছে; তাহার দেহটা শিথিল জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

প্রতীহার বিস্ময়-সংহত কণ্ঠে বলিল—'কি আশ্চর্য—গুহ! গুহ আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল! কিন্তু সে বড় নিরীহ—কখনও কাহাকেও আক্রমণ করে নাই। আজ সহসা আপনাকে আক্রমণ করিল কেন?'

চিত্রক উত্তর দিল না, একদৃষ্টে গুহর মৃত-মুখের পানে চাহিয়া রহিল। গুহর মুখ শান্ত; যেন দীর্ঘ জাগরণের পর সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই মানুষটাই ক্ষণেক পূর্বে হিংস্র ঋক্ষের ন্যায় তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এই খর্ব ক্ষুদ্র দেহে এমন পাশবিক শক্তি ছিল তাহাও অনুমান করা যায় না।

প্রতীহার ওদিকে প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছে—'কিন্তু গুহ আপনার প্রতি এমন মারাত্মক আক্রমণ করিল কেন? সে অবশ্য পাগল ছিল, কিন্তু কাহাকেও অকারণে আক্রমণ করা—'

চিত্রক বলিল—'অকারণ নয়। আমার প্রতি তাহার বিদ্বেষের কারণ বুঝিয়াছি। পৃথার মুক্তি। গুহ ভাবিয়াছিল, আমিই তাহার গুপ্তধন চুরি করিয়াছি।'

গুহর পাশে নতজানু হইয়া চিত্রক ধীরে ধীরে তাহার পঞ্জর হইতে তরবারি বাহির করিয়া লইল। মৃত্যুর পরপারে গুহ আবার তাহার লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছে কিনা কে জানে!

(ক্রমশঃ)

রাশিফল

জ্যোতি বাচস্পতি

মেষরাশি
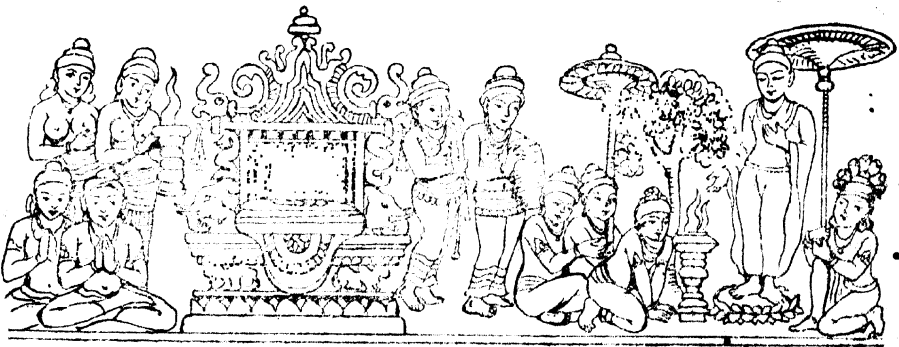
আপনার জন্মরাশি যদি মেষ হয়, অর্থাৎ যে সময়ে চন্দ্র আকাশে মেষ-নক্ষত্রপুঞ্জ ছিলেন, সেই সময়ে যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহলে এই রকম ফল হবে—

প্রকৃতি

আপনি ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক, কিন্তু আপনার ভাবের মধ্যে সজীবতা ও তীব্রতা যতটা আছে, প্রসার বা গভীরতা ততটা নেই। আপনি সকল ব্যাপারেই চান তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও উত্তেজনা, কাজেই আপনার মধ্যে অধীরতা ও চাঞ্চল্য কম-বেশী প্রকাশ পায়। আপনার মধ্যে আত্মসচেতনতা খুব বেশী এবং আপনি কম-বেশী স্পর্শকাতর। আপনার ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিগুলিও সাধারণতঃ বেশ তীক্ষ্ণ। কাজেই অতি সামান্য কারণেই আপনি যেমন উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন, তেমনি সামান্য কারণেই মুহ্যমানও হ'য়ে পড়েন। কোন ভাবই আপনার মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না।

নিজের দিকে আপনার বেশ খর দৃষ্টি আছে, সেইজন্য কোন কিছু আপনার বিরুদ্ধে গেলে, আপনি অধীর ও খিটখিটে হয়ে ওঠেন। অনেক সময় সহজেই রেগে যান, কিন্তু আপনাকে শান্ত করাও শক্ত নয়, অল্প চেষ্টাতেই আপনি প্রসন্ন হ'য়ে ওঠেন।

আপনি স্বাধীনতা-প্রিয় ও উচ্চাভিলাষী এবং আপনার সংগঠন শক্তি খুব বেশী না থাকলেও, নিজের পরিবেশের মধ্যে কর্তৃত্ব করতে চান। কিন্তু কর্তৃত্ব পেলেও অধীরতা ও চাঞ্চল্যের জন্য তা প্রায়ই স্থায়ী হয় না। আপনি নিজের মতে কাজ করতে ভালবাসেন, অপরের সঙ্গে পরামর্শ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে পরামর্শ উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করেন। এমন কি সে পরামর্শের বিপরীত আচরণও করতে পারেন।

আপনার উপর আপনার আবেষ্টনের অথবা বংশ ও পরিবারের প্রভাব খুব বেশী অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব। পারিবারিক আবেষ্টন খুব ভাল না হ'লে নৈতিক অবনতির আশঙ্কা আছে। সঙ্গ নির্বাচনেও আপনার সতর্ক থাকা উচিত। অসৎ সঙ্গে পড়লে সঙ্গীদের প্রশংসা পাবার জন্য, অথবা তাদের উপর নেতৃত্বের লোভে দুর্নীত আচরণ করা আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়।

অর্থভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনার কম বেশী চিন্তা থাকিবে। অনেক সময় আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখা কঠিন হবে। এক সময় আপনি হয়তো ন্যায্য ব্যয়েও বিমুখ হবেন, আবার আর এক সময় অযথা ব্যয়ে মুক্তহস্ত হ'য়ে উঠবেন। অর্থ উপার্জনের ব্যাপারেও অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে বাধ্য হ'য়ে কৌশল বা গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হবে। কোন আত্মীয়ার জন্য আপনার অযথা অর্থ ব্যয় হ'তে পারে, কিন্তু স্নেহশীলা আত্মীয়ার কাছ থেকে আপনি সাহায্যও পেতে পারেন। টাকা খাটানোর ব্যাপারে আপনার বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অনেক সময় অপাত্রে ঋণদান ক'রে অথবা বেয়াড়া ব্যাপারে টাকা লগ্নী করে বিশেষ ঝঞ্ঝাটের আশঙ্কা আছে। আর্থিক অবস্থা শেষ পর্যন্ত মোটের উপর সচ্ছল হ'লেও, আর্থিক ব্যাপারে কম-বেশী ওঠাপড়া আপনার বরাবরই চলবে।

কর্মজীবন

আপনার সেই সকল কাজ ভাল লাগবে—যাতে কর্মের ধারা বা পরিবেশের ঘন ঘন পরিবর্তন আছে। একেবারে ধরাবাঁধা কাজ আপনার প্রিয় নয়। আপনি সেই সব কাজের দিকে আকৃষ্ট হবেন যার মধ্যে খানিকটা অনিশ্চয়তা আছে অথবা যাতে সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়। সুতরাং সৈনিকের কাজ, চিকিৎসকের বৃত্তি, রসায়ন শিল্প, পূর্তকার্য, ধাতুর ব্যবসা, রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রভৃতির যে কোনটাতে হোক আপনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। আপনার জন্ম নক্ষত্র যদি অশ্বিনী হয়, তা'হলে রাজনৈতিক কাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈজ্ঞানিকের কাজ ইত্যাদি আপনার ভাল লাগবে। যদি ভরণী নক্ষত্র হয় তা'হলে যে সব কাজে বিপদের আশঙ্কা আছে সেই সব কাজের দিকে আপনার ঝোঁক থাকবে। আপনি মাঝে মাঝে পরিবর্তন চান, কাজেই একই ভাবে, একই স্থানে, একই কাজে লেগে থাকা আপনার রুচিকর হবে না। কর্মক্ষেত্রে আপনি প্রাধান্য লাভ করতে পারেন কিন্তু কর্মের ব্যাপারে বহু শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠেলে আপনাকে অগ্রসর হ'তে হবে। উন্নতি হ'লেও সে উন্নতি বজায় রাখার জন্য আপনাকে দস্তুরমত লড়াই করতে হবে, না হলে ফিরে অবনতিও হ'তে পারে। বাইরের শত্রুর দ্বারা মিথ্যা অপবাদ বা নিন্দাপ্রচার ত হবেই, অনেক সময় আপনার পারিবারিক আবেষ্টনও আপনার উন্নতির বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। শত্রুর সঙ্গে বিবাদে অনেক সময় এত শক্তি ও সময়ের অপব্যয় হবে যে আপনার অনেক কর্তব্য কাজও সেজন্য অবহেলিত হ'তে পারে। সুতরাং শত্রুতা আপনি যত এড়াতে পারবেন ততই আপনার পক্ষে মঙ্গল। আপনার যদি কৃত্তিকা জন্মনক্ষত্র হয় তা'হলে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক, নতুবা কর্মে পূর্ণ উন্নতি কখনই সম্ভব হবে না।

পারিবারিক

আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে আপনার মোটের উপর সৌহার্দ্য থাকাই সম্ভব। আপনার মধ্যে আভিজাত্যের একটা গর্ব থাকতে পারে

অন্ততঃ পারিবারিক প্রতিষ্ঠা ও বংশমর্যাদার দিকে আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকলে এবং সর্বত্র আপনার ধারণা অনুসারে পরিবারস্থ সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে আপনি অস্বস্তিবোধ করবেন। স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে আপনার আবেগ খুব প্রবল হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা সহজ জ্ঞানের সীমা অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। সন্তানের উপরই হোক বা অপর কোন্ প্রীতির পাত্রের উপরই হোক আপনার এই প্রীতি অনেক সময় তাঁদের পক্ষে পীড়াদায়ক বা ক্ষতিকর হ'তে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে আপনার সংযত হওয়া আবশ্যক। আমোদ-প্রমোদের জন্য ও সন্তানাদির জন্য আপনার অনেক সময় অপব্যয় হ'তে পারে; যার জন্য পরে অনুশোচনা করতে হবে। সন্তানাদির বিবাহের জন্য আপনার কোন রকম চিন্তা হ'তে পারে এবং কোন সন্তানের দূরদেশে অথবা দুর্গম প্রদেশে বিবাহ হওয়াও অসম্ভব নয়।

বিবাহ

বিবাহের ব্যাপারে কিছু বাধা বিঘ্ন হ'লেও আপনার দাম্পত্য জীবন মোটের উপর মন্দ নয়। স্ত্রী (অথবা স্বামী) নম্র ও নিরীহ প্রকৃতির হওয়াই সম্ভব এবং তিনি আপনার অনুগত হবেন। আপনার ভাব-প্রবণতার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে অকৌশল হ'লেও গুরুতর কোন মনোমালিন্য না হওয়াই সম্ভব। আপনার স্ত্রী (অথবা স্বামীর) দেহ একটু দুর্বল হ'তে পারে। যদি এরকম কারো সঙ্গে আপনার বিবাহ হয় যাঁর জন্মমাস বৈশাখ, ভাদ্র, কার্তিক অথবা পৌষ কিংবা যাঁর জন্মতিথি কৃষ্ণ পক্ষের তৃতীয়া বা শুক্লপক্ষের দশমী, তাহ'লে আপনার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সদ্ভাব হবে।

বন্ধুত্ব

আপনার বন্ধুর সংখ্যা বেশী হওয়াই সম্ভব। কিন্তু বন্ধুত্বের ব্যাপারে আপনাকে কম বেশী অশান্তিভোগ করতে হবে। অনেক সময় বন্ধুর জন্য আপনার নিজের কোনরকম বিপদ বা বিভ্রাট উপস্থিত হ'তে পারে; অথবা বন্ধুর কোনরকম বিপদ বা ঝঞ্ঝাটে আপনার মানসিক শান্তি ব্যাহত হ'তে পারে। বন্ধুর জন্য কোনরকম পারিবারিক ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হওয়াও বিচিত্র নয়। আপনি সাধারণতঃ আকৃষ্ট হবেন সেই সব ব্যক্তির দিকে যাঁদের জন্মমাস বৈশাখ, ভাদ্র, অথবা পৌষ এবং যাঁদের জন্মতিথি কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া অথবা শুক্লপক্ষের দশমী।

স্বাস্থ্য

আপনার মধ্যে বংশগত ব্যাধির প্রবণতা থাকতে পারে এবং কোন রকম আশাভঙ্গ অথবা মনোকষ্ট আপনার স্বাস্থ্যহানির কারণ হ'তে পারে। আপনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সাধারণতঃ তীব্র ও রুক্ষ জিনিষ পছন্দ করেন, সেইজন্য মাদকের দিকেও আপনার একটা আকর্ষণ আসতে পারে। কিন্তু তা সযত্নে পরিহার করা উচিত। কেন না আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কোন মাদক বিশেষ অনিষ্টকারী; এমন কি চা, তামাক, কফি, প্রভৃতিরও অপরিমিত ব্যবহার আপনার স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি করতে পারে। একেবারে গুরুভোজনও আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। বারে বারে অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা আপনার পক্ষে ভাল। তরল খাদ্যের চেয়ে শুষ্ক ও ভর্জিত খাদ্যই আপনার উপযোগী বেশী। আহার বিহারে সংযম এবং শান্ত পরিবেশ স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য আপনার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

অন্যান্য ব্যাপার

আপনার মধ্যে ভ্রমণ ও স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা থাকবে বটে, কিন্তু অনেক সময় যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি ভ্রমণ বা স্থান পরিবর্তন করবেন কার্যক্ষেত্রে তা সফল হবে না। প্রবাসে বা ভ্রমণের সময় কোনরকম বিপদ আপদ সম্বন্ধেও সতর্ক থাকা উচিত। বিদেশে শত্রুর দ্বারা বিপন্ন হওয়ারও আশঙ্কা আছে।

কোন গুহ্যবিদ্যা অথবা আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে আপনার ঝোঁক আসতে পারে কিন্তু তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। বিশেষ ক'রে আপনার যদি জন্ম নক্ষত্র ভরণী অথবা কৃত্তিকা হয় তা'হলে গুহ্যসাধনা একেবারে বর্জনীয় এবং ভক্তিমার্গে কিছু আনন্দ পেতে পারেন।

যাতে নিজের দেশের, সমাজের বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ জড়িত আছে ব'লে আপনি মনে করেন, তার উপর আপনার একটা বিশেষ মমতা থাকা সম্ভব এবং তারজন্য অনেক সময় আপনি আত্মত্যাগ এবং অর্থব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আপনার কর্তৃত্ব পাওয়া চাই, নতুবা নিরুৎসাহ হ'য়ে আপনি সে সম্বন্ধে উদাসীন হ'য়ে উঠতে পারেন।

স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ৪, ১৬, ২৮, ৪০, ৫২ এই সকল বর্ষে নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অথবা পরিবার মধ্যে কারো কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ১০, ১২, ২২, ৩৪, ৪৬, ৫৮ এই সকল বর্ষগুলিতে কোনরকম অভিজ্ঞতা হ'তে পারে।

বর্ণ

হালকা লাল রং বা হলদে আভাযুক্ত লাল রং আপনার বিশেষ উপযোগী। বিশেষ ক'রে গেরুয়া রং, চাঁপাফুলের রং অথবা সোনালী রং আপনার বিশেষ সৌভাগ্য বর্দ্ধক হওয়া উচিত। ঘোর লাল রং ব্যবহার না করাই ভাল, কেন-না তাতে উত্তেজনা বৃদ্ধি হ'তে পারে। অসুস্থ অবস্থায় সাধারণতঃ বেশী চকচকে বা জল জলে রং বর্জন করা উচিত। কেন না তা অনেক সময় অস্বস্তিকর হ'তে পারে এবং উপসর্গ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন সোনাপাথর (Gold Stone এ্যাম্বার (Amber) হলদে পোখরাজ প্রভৃতি।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম—ছত্রপতি শিবাজী, টিপুসুলতান, জেনারেল গর্ডন, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন, জাস্টিস্ সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি।

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নালন্দা থেকে ফিরে এসে আর আমাদের রাজগীরে থাকতে ভাল লাগছিল না। অতীত ভারতের ইতিহাস যেন ইঙ্গিতে আহ্বান করছিল —বেরিয়ে পড়ো- যদি দেখতে চাও বৌদ্ধযুগের অগণিত বিলুপ্ত ঐশ্বর্য, যদি ভগবান তথাগতের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ফিরতে চাও পরিব্রাজকের মতো—তবে চলো—লুম্বিনী—পাটলিপুত্র—বৌদ্ধগয়া—সারনাথ—সাঁচী, শ্রাবস্তী—কুশীনগর—কপিলাবস্তু—কৌশাম্বী—

কিন্তু মুস্কিল হয়ে পড়লো আমাদের রাজগীর পোষ্ট অফিস থেকে যথাসময়ে টাকা না পাওয়ায়। কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক রেজেষ্টারী ও ইনসিয়োর ক'রে আমাদের প্রয়োজনমত টাকা পাঠিয়েছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন, কিন্তু রাজগীর পোষ্ট অফিসে কেউ না থাকায় ইনসিয়োর বিলি হয় নি। ডাকঘরে গিয়ে খবর নিয়ে জানা গেল রেজেষ্টারী ও ইনসিয়োর করা চিঠি একখানি আমার নামে এসেছে ঠিক, কিন্তু, সে খানি বিলি করবার মালিক যিনি সেই পোষ্টমাষ্টার মশাই গত একসপ্তাহকাল ডাকঘরে অনুপস্থিত। শোনা গেল তিনি দিন দুই তিনের ছুটী নিয়ে কি একটা বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে পাটনা গেছেন। কাজেই পোষ্ট অফিসে কেবল চিঠি বিলি ছাড়া আর সব কাজ বন্ধ আছে। মণিঅর্ডার করা বা নেওয়া দুইই চলছে না, টেলিগ্রামও বন্ধ, রেজিষ্ট্রেশান এবং ইনসিয়োর কিছুই হবার উপায় নেই, পাবারও উপায় নেই! বিদেশে প্রবাসে যারা গিয়ে পড়েছে তাদের পক্ষে এ একটা গুরুতর অবস্থার অভিজ্ঞতা!

পয়লা ডিসেম্বর আমরা "সপ্তপর্ণী" ছেড়ে চলে আসবো—বাড়ীর মালিক অর্থাৎ আমাদের বেয়ান ঠাকরুণের সঙ্গে এই রকমই কথা ছিল। কিন্তু, কথা রাখা গেল না। শ্রদ্ধেয় নিরুপমা দেবীর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ আমাদের ভাগিনেয়ী কল্যাণীয়া শ্রীমতী কমলকে পত্র লিখে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সপ্তপর্ণীতে থাকার মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া গেল।

রোজই একাধিকবার ডাকঘরে যাই—পোষ্টমাষ্টার ফিরেছেন কিনা খবর নিতে। দেখি রীতিমত ভীড় জমে গেছে সেখানে। কত লোক যে মণিঅর্ডার ইনসিয়োর রেজিষ্ট্রেশান আর টেলিগ্রামের জন্য ধর্ণা দিচ্ছে তার সংখ্যা হয় না। আপাততঃ পোষ্টকার্ড এবং ডাকটিকিটও নিঃশেষ হয়ে গেছে। চিঠিপত্রের আদান প্রদানও বন্ধ হবার উপক্রম। বর্তমান যুগে পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশের সরকারী ডাকঘরের যে এরকম অবস্থা দিনের পর দিন চলতে পারে এ আমাদের ধারণাই ছিল না। ভারতবর্ষ আজব দেশ, এখানে সবই সম্ভব। স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার এখন বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা। এঁদের শাসন পরিচালনার গুণে একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থানের ডাকঘর যে এমনভাবে ভেঙে পড়তে পারে একথা ভাবলেও লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়। প্রায় একসপ্তাহকাল ধরে এই পোষ্টমাষ্টার-হীন-ডাকঘর কংগ্রেস সরকারের শাসন পরিচালনার অযোগ্যতা জনসাধারণের কাছে সপ্রমাণিত করে দিতে লাগলো।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে লোক মারফৎ আমাদের হাতে কিছু টাকা এসে গেল। আমরা তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের স্বামী কৃপানন্দজীকে এবং তাঁর অবর্তমানে সরকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ডি, এন, দাসকে, পৃথকভাবে এক একখানি 'অধিকার পত্র' দিয়ে পাটলিপুত্র সন্দর্শনে রওনা হয়ে গেলুম। এই 'অধিকার পত্র' স্বামীজীকে এবং তাঁর অবর্তমানে ডাক্তারবাবুকে আমাদের যাবতীয় চিঠিপত্র, প্যাকেট, পার্শেল, ইনসিয়োর ও রেজেষ্টারী করা কভার, বুকপোষ্ট, মণিঅর্ডার এবং টেলিগ্রাম পর্যন্ত বিলি করবার জন্য ডাকঘরকে নির্দেশ দিয়ে এলুম।

আমাদের প্রবাসের বন্ধু মার্টিন রেলের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিনয় নন্দী মহাশয় আমাদের পাটনা যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন এবং নিজে আমাদের সঙ্গী হয়ে পাটনা পর্যন্ত এলেন। তিনি সঙ্গে না এলে আমরা কখনই সেদিন বক্তিয়ারপুর ষ্টেশান থেকে 'বেনারস-এক্সপ্রেস' ধরে পাটনা যেতে পারতুম না। কারণ মার্টিনের রেল সময় রক্ষা সম্বন্ধে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। অধিকাংশ দিনই তিনি করেসপণ্ডিং ট্রেনখানি ছেড়ে যাবার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বক্তিয়ারপুরে গিয়ে হাজির হন। যাত্রীদের প্রায়ই পরবর্তী গাড়ী ধরবার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়।

আমরা ৩ই ডিসেম্বর রাজগীরের বাড়ী চাবীবন্ধ ক'রে চাবীগুলি রিজিষ্টার্ড ও ইনসিয়োর পার্সেলে নিরুপমা দেবীর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে পাটনা রওনা হয়েছিলুম। বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে নেমে দেখি করেসপণ্ডিং ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে গেছে। সমস্ত মালপত্র মুটের মাথায় তুলে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি ষ্টেশনে ঢোকবার গেট বন্ধ। লোকে লোকারণ্য সেখানে! প্যাসেঞ্জার ও ষ্টেশন ষ্টাফের সঙ্গে তখন ভীষণ মারামারি চলছে। রেল পুলিশ বে-পরোয়া লাঠি চালনা ক'রেও ক্ষীপ্ত জনতাকে শান্ত করতে পারছে না।

একটি 'ওভারব্রীজ' পার হয়ে ষ্টেশনে যেতে হয়। বিনয়বাবু সঙ্গে থাকায় এবং 'ওভারব্রীজ' পার হবার সময় না থাকায় আমরা তাড়াতাড়ি হবে বলে লাইন অতিক্রম ক'রে ষ্টেশনে এসেছিলুম, কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছে বলে প্রবেশ করতে পারলুম না। বিনয়বাবু কুলিদের

সঙ্গে নিয়ে আমাদের ষ্টেশন ফেনসিংয়ের ধার দিয়ে দিয়ে অগ্রসর হ'তে ব'লে সেই ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল তিনি রেলওয়ে ষ্টাফের একজন লোক সঙ্গে নিয়ে ছুটে আসছেন। প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি ফেনসিংয়ের গায়ে একটি বিশেষ 'প্রবেশ-দ্বার' ছিল। তার সন্ধান রেলওয়ে কর্মচারীরাই জানতেন। বিনয়বাবুর সঙ্গের রেলকর্মচারীটি সেই দরজার চাবীটি নিয়ে এসেছিলেন। আমরা এঁদের সাহায্যে কোনও রকমে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ট্রেণে উঠলুম। "যে যে গাড়ীতে যায়গা পাও কিছু কিছু মাল নিয়ে উঠে পোড়ো" এই ছিল বিনয়বাবুর আদেশ, কারণ বেনারস এক্সপ্রেস প্রায়ই ভর্তি হয়ে আসে, তাছাড়া ট্রেণের সময়ও উত্তীর্ণপ্রায়! কম ভীড়ের গাড়ী খুঁজে দেখে সকলের একগাড়ীতে যাবার অবকাশ নেই তখন। কুলিরা ঝপাঝপ যে যে গাড়ীতে পারল মাল ফেলে দিলে। আমরাও বিনয়বাবুর উপদেশ মতে যে যে গাড়ীটা সামনে পেলুম উঠে পড়লুম। আমাদের সঙ্গের ভৃত্য ও পরিচারিকা রামচন্দ্র ও বিনোদিনীর তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল। কিন্তু সে কাম্‌রাগুলিতে প্রবেশ ক'রে কার সাধ্য! বিনয়বাবু তাদের যে ক্লাশে খুশী তুলে দিলেন। আমি ও খুকী সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট থাকা সত্ত্বেও ইণ্টার ক্লাশে উঠে পড়লুম। বিনি আমাদের কামরায় এল। মেয়েদের বিনয়বাবু ফার্ষ্ট ক্লাশে তুলে দিলেন। রামচন্দ্র কোথায় গেল তার কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না। জিনিসগুলো সব উঠলো কিনা বিনয়বাবু তার তদারক ক'রে—কুলি মিটিয়ে যখন আমাদের গাড়ীতে এসে উঠলেন গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করেছে। সমস্ত ব্যাপারটা লিখতে যতটা সময় গেল তার শতাংশের একাংশ সময়ের মধ্যে আমরা ছুটোছুটি করে ট্রেণ ধরেছিলুম। এ ট্রেণ ধরতে না পারলে আমাদের বড় কষ্ট পেতে হ'ত। শুধু আমাদের কেন, পাটনায় আমাদের নবপরিচিত বন্ধু শশাঙ্কমোহনকে খবর দেওয়া হয়েছিল স্টেশনে আসবার জন্য, কারণ, তারই সনির্বন্ধ আগ্রহে ও অনুরোধে এবং সাদর আহ্বানে আমরা পাটনায় দু'একদিনের জন্য তারই আতিথ্য গ্রহণ করতে যাচ্ছিলাম। সুতরাং এ ট্রেণে না যেতে পারলে আমরা সেদিন আর পাটনা পৌঁছতে পারতাম না। ব্যাঙ্কের বড়সাহেব শশাঙ্কমোহনেরও স্টেশনে ছুটে আসা-যাওয়ায় সময় নষ্ট হ'ত এবং শ্রীমতী মনোজ্যোৎস্না বেচারার অতিথি পরিচর্যার আয়োজনও পণ্ড হ'য়ে যেত।

যাইহোক, বক্তিয়ারপুর থেকে পাটনা যাবার পথে মাঝের একটা স্টেশনে—কি নাম মনে নেই—হ্যাঁ, 'ছাপ্‌রা' বোধহয়; অনেক লোক নেমে গেল। শুনলুম ছট্‌ পরবের জন্য ভারী ধুম হয় 'নাকি এখানে। বিনয়বাবু এই সুযোগে আমাদের ছড়িয়ে-পড়া মালপত্র ও লোকজনদের একত্র করে ফেললেন। রামচন্দ্রকে আবিষ্কার করা গেল একখানি দেড়া-মাশুলের গাড়ীতে। জলের কুঁজো ও গেলাস ছিল তারই হেপাজতে। তৃষ্ণার্ত নবনীতা জলপানের জন্য উত্যক্ত করে তুলছিল আমাদের। রামচন্দ্রকে কুঁজো গেলাস সমেত পাওয়া যেতে আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম! শ্রীমতী তাঁর ভাঁড়ার থেকে নেবু সন্দেশ বার করে দিলেন। ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়েছিলাম সকলেই। খাদ্য ও পানীয় পেয়ে অনেকটা ধাতস্থ হওয়া গেল।

বক্তিয়ারপুর থেকে পাটনা মাত্র ৫০ মাইল পথ, মনে হচ্ছিল যেন এ পথের আর শেষ নেই! চলেছি ত চলেইছি। দু'পাশে বিহারের বিচিত্র পরিবেশ। গ্রাম, শহর, শস্যক্ষেত্র, গোচারণভূমি, কত কি পার হ'য়ে চলেছি কিন্তু দৃষ্টি নেই সেদিকে। কারণ মন হ'য়ে উঠেছে তখন পাটলিপুত্রের জন্য ব্যাকুল। চখের সঙ্গে যদি মনের যোগ না থাকে তবে আমাদের দৃষ্টি হয়ে যায় শূন্য। (vacant) চোখ চেয়েও আমরা তখন কিছু দেখতে পাইনি, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান বস্তু নিচয় তখন আমাদের মনের উপর কোনও ছাপ ফেলতে পারে না তাই তাদের রূপও আমাদের কাছে ধরা পড়ে না।

নবনীতার কুকুর—'দুষ্টু'

বেলা পাঁচটায় বেনারস এক্সপ্রেস আমাদের পাটনায় নামিয়ে দিলে। 'পাটনা সিটি' নয়—নতুন শহর-পাটনায়। স্তূপাকার মালপত্র-সহ আমরা ঠাকুর চাকর ও কুকুর নিয়ে পাটনা স্টেশনে নেমে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত খুঁজে শশাঙ্ক ভায়ার কোন পাত্তাই পেলুম না। অগত্যা, বিনয়বাবু বললেন—চলুন পাটনায় অডিট্‌ এসে আমি যে হোটেলে থাকি সেখানে নিয়ে যাই—খুব ভাল হোটেল, বাঙালীর হোটেল—বিহার অঞ্চলে এ হোটেল "পিণ্টুবাবুর হোটেল" নামে বিখ্যাত।

আমরা সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে দু'খানি ফিটন ও একখানি বন্ধ গাড়ীতে মালপত্র বা চাকর ও নিজেরা উঠে পাটনার রাজপথে পা বাড়ালুম।

"সবুর! সবুর!" কে একজন হেঁকে উঠলেন পথ থেকে। উঁকি মেরে দেখি শশাঙ্ক ভায়া স্বয়ং সাইকেল চালিয়ে গাড়ীর পিছু পিছু ছুটে আসছেন। গাড়ী থামানো হল। শশাঙ্ক এসে বললেন—'আপনারা যে কোন পথ দিয়ে স্টেশন থেকে এলেন—আমি কোথাও খুঁজে

পেলুম না আপনাদের। ভাবলুম—হয়ত নির্দিষ্ট দিনে রাজগীর থেকে বেরুতে পারেননি, অথবা করেসপণ্ডিং ট্রেণটি মিস করেছেন।' যাই হোক পাল্টাপাল্টি অভিযোগান্তে জানা গেল যে আমাদের সঙ্গে নবনীতার যে 'গোল্ডেন ককার স্প্যানিয়েল' কুকুরটি ছিল—যার নাম "বুদ্ধু"—সেই 'বুদ্ধু'র নিশানা থেকে একজন টিকিট চেকার মারফৎ তিনি আমাদের আগমন সংবাদ পেয়ে—পিছু পিছু ছুটে এসে ধরেছেন।

এইভাবে পথ থেকে পাকড়াও ক'রে শশাঙ্ক আমাদের নিয়ে এসে তুললেন ইউনাইটেড্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের প্রশস্ত বাড়ীর দ্বিতলের উপর—তাঁর নিজের কোয়ার্টারে। (ক্রমশঃ)

বিচার

শ্রীনগেন্দ্রবিহারী বসু

গ্রামের মধ্যে কালীনাথ একজন সঙ্গতিপন্ন লোক। গ্রামে দুইখানা দোকান, মোটা রকমের চাষ, তা ছাড়া তেজারতি কারবারও ছিল। একদিন সকালবেলায় অনেক টাকা সঙ্গে লইয়া কালীনাথ সওদা কিনিতে বাহিরে যাইতেছিল। গরুর গাড়ী প্রস্তুত, এমন সময় স্ত্রী আসিয়া বলিল—আজ তোমার যাওয়া হবে না। ভোর রাতে আমি একটা কুস্বপ্ন দেখেছি।

কালীনাথ জিজ্ঞাসা করিল—কি স্বপ্ন দেখেছ?

স্ত্রী বলিল—বলতে নেই, বল্লে কুস্বপ্ন ফলে যায়।

কালীনাথ হাসিল—তবে আর কি। বল নি তো, স্বপ্ন আর ফলবে না।

স্ত্রী প্রায় কাঁদিয়া বলিল—আমার মাথা খাও, এবার যাওয়া বন্ধ কর।

কালীনাথ স্ত্রীর মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—স্বপ্নের কি কোন মানে আছে, ও চিরদিনই মিথ্যে। ও সব বাজে জিনিষে মন দিলে আমাদের ব্যবসা চলে না। তা ছাড়া ভগবানের নাম নিয়ে বেরিয়েছি। তোমাকে আমি বলছি কোন বিপদ হবে না—নিরাপদে বাড়ী ফিরে আসবো।

স্ত্রীকে নানারূপ বুঝাইয়া, ছেলে দুটিকে কোলে করিয়া তাদের গালে মুখে চুমু খাইয়া সে রওনা হইয়া গেল। যাইবার সময় গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিল—ভয় নেই, ফিরে আসবো, নারায়ণকে ডেকো, সাবধানে থেকো।

পথে এক বণিকের সঙ্গে দেখা হইল। সেও সওদা কিনিতে বাহির হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে দুইজনে খাজিতাজার এক হোটেলে আশ্রয় লইল।

গ্রীষ্মকাল। প্রখর রৌদ্রে সেদিন কালীনাথ খুব কষ্ট পাইয়াছিল। তাই ভোরের ঠাণ্ডায় পথ চলিবে ঠিক করিয়া অতি প্রত্যুষে হোটেল হইতে বাহির হইল। ঘরের দুয়ার খুলিতেই নজরে পড়িল কপাট ভেজান, খিল খোলা রহিয়াছে। প্রথমে চমকিয়া উঠিল—এ কি? শুইবার সময় সে নিজেই তো খিল বন্ধ করিয়া শুইয়াছিল। জিনিসপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিল কাপড়-চোপড়, টাকার থোলে সব ঠিক আছে। মনে করিল, সঙ্গী বণিক হয়তো বাহিরে গিয়াছিলেন, খিল বন্ধ করিতে হয়তো ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। বণিক তখনও মশারীর ভিতর ঘুমাইতেছিলেন, তাঁহাকে জাগান বৃথা মনে করিয়া "দুর্গা দুর্গা" বলিতে বলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিনও মধ্যাহ্নে আকাশ হইতে যেন অগ্নি বৃষ্টি হইতেছিল। কালীনাথ ও তাহার গাড়োয়ান তৃষ্ণাতুর হইয়া পড়িয়াছিল। গরু দুটি চলিতে পারিতেছিল না। নাক মুখ দিয়া ফেনা গড়াইয়া পড়িতেছিল। তৃতীয় প্রহরে পথের ধারে এক বৃক্ষ ছায়ায় তাহারা আশ্রয় লইল।

গাছের তলায় ঘাসের উপর গামছা বিছাইয়া কালীনাথ শুইয়া পড়িয়াছিল, গরু দুটি ভিজা ছানি খাইতেছিল, গাড়োয়ান রাঁধিবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় সদলবলে পুলিসের দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীনাথের নাম, নিবাস প্রভৃতি জানিয়া লইয়া দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—বাড়ী হ'তে কবে বের হয়েছ?

কালীনাথ—গতকাল, সকাল বেলায়।

দারোগা—কোথায় যাবে।

কালীনাথ—শহরে, সওদা কিনতে।

দারোগা—রাতে শান্তিডাঙায় ছিলে ?

কালীনাথ—আজ্ঞা হাঁ।

দারোগা—আর কেউ ছিল তোমার ঘরে ?

কালীনাথ—ছিল, আর এক বণিক। তাঁর সঙ্গে কালই পথে আমার দেখা হয়। কিন্তু এত কথা আমায় জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?

দারোগা- সে মারা গেছে। রাতে কেউ তার গলায় ছুরি বসিয়ে তাকে খুন করেছে।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কালীনাথ বলিয়া উঠিল—খুন ? খুন করেছে ?

দারোগা—সঙ্গের কাগজপত্র দেখে জানা গেছে তার কাছে অনেক টাকা ছিল। খুন করে চোর সব নিয়ে গেছে। তুমি ছাড়া সেই ঘরে আর কেউ ছিল না।

কালীনাথ—না, আর কেউ ছিল না, আমরা দুজনাই শুধু শুয়েছিলাম।

দারোগা কালীনাথের থানাতল্লাসি করিলেন। একটা থলিয়ায় অনেক টাকা পাওয়া গেল, বিছানার স্থানে স্থানে রক্তের দাগ দেখা গেল, বালিশের তলা হইতে রক্তমাথা ছোরা বাহির হইল। কালীনাথ কাঁপিতে লাগিল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—স্বীকার করছ ?

কালীনাথ জানাইল, টাকাটা তাহার নিজের, আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

দারোগা বলিতে লাগিল—দুজনাই বণিক, দুজনাই সওদা কিনিতে বাহির হইয়াছিল, দুজনার কাছেই টাকা ছিল। শোবার সময় নিশ্চয়ই দুয়ার বন্ধ করে শুয়েছিলে। কেমন, ঠিক কিনা ?

কালীনাথ—ঠিক। আমি নিজেই দুয়ার বন্ধ করেছিলাম।

দারোগা—চারিদিকের অবস্থা দেখিয়ে দিচ্ছে তুমিই খুন করেছ।

কালীনাথ—না বাবু, এর কিছুই আমি জানি না।

দারোগা রক্তমাথা ছোরাখানা কালীনাথের চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিতে লাগিল—এই দেখ সেই ছোরা, এখনও রক্ত লেগে আছে। তোমার বিছানাতেই পাওয়া গেছে। এর পরও তুমি এর কিছুই জান না! তুমি ছাড়া ঘরে যে আর কেউই ছিল না!

কালীনাথ—নারায়ণ জানেন, এর কিছুই আমি জানিনে।

দারোগা—ও-কথা সবাই বলে কালীনাথ। বেশ তাহলে আদালতেই প্রমাণ দাখিল হবে।

কালীনাথকে সিপাহিরা বাঁধিয়া লইয়া গেল। কালীনাথ সম্বন্ধে তাহার নিজ গ্রামেও অনুসন্ধান করা হইল। সেখানে তাহাকে সকলেই ভাল বলিয়া জানিত। তাহার বিছানায় রক্তমাথা ছোরা পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া প্রতিবেশীরা বিস্মিত হইল, ভাবিল—অসম্ভব কি—মানুষের তো মন ?

কালীনাথের স্ত্রী কাঁদিয়া চোখ মুখ ফুলাইল, মেজেতে মাথা কুটিয়া রক্ত বাহির করিল। ছোট ছোট দুইটি ছেলে, একটি এখনও মাতৃদুগ্ধ খায়, তাহাদের লইয়া লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া সদরে আসিল এবং বহু চেষ্টা করিয়া, অনেক টাকা খরচ করিয়া কালীনাথের সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি পাইল।

কালীনাথ হাজতে, খুনে আসামী, হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি, একটি কুঠুরিতে একখানি কম্বলের উপর পড়িয়াছিল। চোখ দুটি কোটরে বসিয়া গিয়াছে, মাথার কালো চুল অনেক শাদা হইয়াছে, নিটোল কপালে দাগ বসিয়াছে, গালের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এই কয় দিনেই সে যেন জীবনের দশ বছরের পথ আগাইয়া গিয়াছে। দেখিয়া অভাগিনী স্ত্রী সহিতে পারিল না, আছাড় খাইয়া স্বামীর পায়ে মাথা গুঁজিয়া কতক্ষণ কাঁদিয়া লইল। তার পর উঠিয়া নিজের চক্ষু মুছিয়া আঁচল দিয়া স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিল। বলিল—বেশীক্ষণ থাকতে পাব না। যতক্ষণ আছি দুটো কথা কও। কেঁদো না।

জড়িতস্বরে কালীনাথ বলিল—তোমার স্বপ্নই ফলে গেল দেখছি

স্ত্রী বলিল—না, না, ফলবে না, কখনো ফলবে না। তুমিই তো বলেছ স্বপ্ন মিথ্যে, তোমার কথা তো কখনো মিছে হয় না। এ বিপদ নারায়ণের পরীক্ষা, তিনিই সব কাটিয়ে দেবেন।

কালীনাথ চোখের জল হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিল। স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল—মণিকা, শোন। আমি আর সে এক ঘরেই শুয়েছিলাম। শোবার সময় ভিতর

হতে আমিই দুয়োর বন্ধ করেছিলাম, ঘরে আর কেউ ছিল না। সেই রাতে সে খুন হ'লো, রক্তমাখা ছোরা আমার বিছানায় পাওয়া গেল। কে বিশ্বাস করবে আমি মারি নি?

স্ত্রী বলিল—বিশ্বাস? আমি জানি তুমি করো নি, তোমাকে দিয়ে এ কাজ হয় নি, হ'তে পারে না। যে মানুষ খেতে বসে ভাতের থালা ভিখিরিকে তুলে দেয়, ডাক্তারখানায় গিয়ে নিজের গা কেটে রক্ত দিয়ে অচেনা পরকে বাঁচায়, আর নিজে রক্তশূন্য হয়ে ছ মাস বিছানায় পড়ে থাকে, তাকে দিয়ে এ কাজ হয় না। নারায়ণ সব দেখ্‌ছেন তোমাকে তিনি নষ্ট করবেন না। যদি নারায়ণে আমার ভক্তি থাকে, তোমার পায়ে মতি থাকে, তবে আজ জোর গলায় তোমায় বলছি, তোমার মুক্তি হুকুম হবেই হবে। আজ যাঁরা তোমায় জেলে রেখেছেন তাঁরাই একদিন নির্দ্দোষ জেনে তোমায় মুক্তি দেবেন। ভেবে ভেবে শরীর তো একেবারে মাটি করে ফেলছ, এমন করে আর দেহপাত করো না, আমি যে আর সইতে পারি না। হে ভগবান, হে নারায়ণ—ওগো শুধু তাঁকে ডাকো, তিনিই তোমায় মুক্তি দেবেন।

কালীনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হাঁ মণিকা, এখন বাঁচাতে পারেন তিনিই। সত্যিই তিনি অসহায়ের সহায়, কিন্তু তাঁকে ডাকৃতে পারছি কই! যখনই ডাকতে চাই, তিনি কেমন যেন বুক হতে খশে পড়ে যান। তাঁর জায়গায় তুমি, তোমার ঐ ছেলে দুটি বুক আমার জুড়ে বশে। কেবল মনে হয় তোমাদের নিয়ে বিভোর হ'য়ে বশে থাকি। তোমাদের কি হবে, তুমি অসহায় স্ত্রীলোক, ছেলে দুটিকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে। কেবল এই সব কথাই-ভাবি, মন এত দুর্ব্বল, এত অস্থির—নারায়ণ! নারায়ণ!—

সিপাহি আসিয়া বলিল—মাইজি ঘড়ি হো চুকা, আব্‌ যানে হোগা।

মণিকা স্বামীর পায়ে হাত রাখিয়া বলিল—চলুম। আমাদের জন্য ভেবো না। যখন আমাদের সময় ছিল, তখন আমাদের নারায়ণের পায়ে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলে। এখনও তাই করো। আমাকে, তোমার ছেলে দুটিকে, তোমাকে তাঁরই পায়ে ছেড়ে দাও। তিনিই সব দেখ্‌বেন। হে নারায়ণ, হে ভগবান!

যতক্ষণ দেখা গেল কালীনাথ জানালা দিয়া স্ত্রী পুত্রকে দেখিল। তাহারা অদৃশ্য হইলে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—হে হরি, ওদের তুমি দেখো।

স্ত্রী গৃহে আসিয়া বুকের রক্ত দিয়া গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা দিল। তিন দিন উপবাসী থাকিয়া গৃহ-দেবতা নারায়ণের পায়ে তুলসি দিল। নিজের অলঙ্কার, জমি, ধান, পুকুর, বাগান প্রভৃতির প্রায় সমস্ত বেচিয়া স্বামীকে রক্ষা করিতে অর্থ ব্যয় করিল। থলিয়ার টাকা তাহার যে নিজের সে কথা প্রমাণ হইল, কিন্তু কালীনাথ খালাস হইল না। তাহার প্রাণদণ্ড হইল না বটে, চৌদ্দ বছরের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

২

ইহার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কালীনাথের চুল দাঁড়ি আর একটিও কাল নাই। তাহার দেহ সম্মুখ দিকে নুইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে হাঁটে, অল্প কথা কয়, কখনও হাসে না, জেলের কাজ করিয়া অবসর পাইলেই ভগবানের নাম করে। রাত্রি প্রভাতে গলা ছাড়িয়া ভগবানের নাম গায়। যুবা বয়সে সে সুগায়ক ছিল, দীর্ঘ কারাবাসে তাহার সব গেলেও গলার মিষ্টত্বটুকু তিলমাত্র নষ্ট হয় নাই। জেলখানার লোক সুন্দর শান্ত উষায় তাহার অশ্রুমাখা গান শুনিয়া ভক্তিভরে মাটিতে মাথা নোয়াইত, কত পাপ-তাপ দগ্ধ হৃদয় গলিয়া চক্ষু পথে উৎস বহিত। জেলের কর্ম্মচারিরা তাহার ব্যবহারে তাহাকে ভালবাসিত, কয়েদিরা শ্রদ্ধা করিত, কেহ ডাকিত "দাদা ভাই", কেহ বলিত "সন্ন্যাসী"। জেলের মধ্যে সে সন্ন্যাসী কয়েদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

একদিন একদল নূতন কয়েদি সেই জেলে বদলি হইয়া আসিল। রাত্রিতে নূতন পুরাতন কয়েদিদের মধ্যে গল্প গুজব চলিতেছিল। কোথায় বাড়ী, কাহার কি অপরাধ, আরও কত কিছু। একজন বলিল—তাহার তেজারতি কারবার ছিল, গ্রামের একজন থালা বাসন বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার নিয়াছিল। কয়েকদিন পরে দারোগা আসিয়া সেই বাসন ধরিল। সেই বাসন নাকি চোরা বাসন। যে বন্ধক রাখিয়াছিল সে একেবারে অস্বীকার করিল; তার টাকাও গেল; বাসনও গেল, উপরন্তু বিনা দোষে তাকে জেলে দিল। আর একজন বলিল—ও রকম হয়

ভাই। এই সেবার শান্তি-ডাঙ্গার হোটেলে একজনকে খুন ক'রে নিয়ে গেল পুরোপুরি একটি হাজার টাকা। যে খুন কর্‌লে তার পাত্তাটি পেলে না, আমাদের গাঁয়ের এক গোবেচারা, বিন্দু বিসর্গ কিছু জানে না—তাকে ধরে নিয়ে জেল দিয়ে দিলে চোদ্দ বছর। একেই বলে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।"

পাশের ঘরে বসিয়া কালীনাথ সব শুনিতেছিল। শান্তি-ডাঙ্গার কথা শুনিয়া তাহার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল। দুই ঘরের মধ্যে কাঠের দুয়ার, তালা বন্ধ। কপাট ঠেলিয়া ধরিলে সামান্য একটু ফাঁক হয়। কালীনাথ সেই ফাঁক দিয়া দেখিল তাহারই গ্রামের রজনী পাল। না ভুল হয় নাই, বাহিরের বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—রজনী পালই বটে। কি করিয়া জানিল যে, খুনের দায়ে যাহার জেল হইয়াছে সে "নির্দ্দোষী, গোবেচারা, বিন্দু বিসর্গ কিছু জানে না।" কি করিয়া জানিল—পুরোপুরি এক হাজার টাকা! তবে কি রজনী? কালীনাথের বুকের ভিতরে সমুদ্রের ঢেউ যেন বুকের হাড়-গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল।

পুরাণ কত কথা তাহার মনে পড়িল। এক পাঠশালায় দুজনে পড়িয়াছে, এক সঙ্গে খেলা করিয়াছে, দুজনের কত বন্ধুত্ব, কত ভালবাসা! রজনীর বিবাহে সে কত আনন্দ করিয়াছে, তাহার নিজের বিবাহে রজনী নাচিয়া কুঁদিয়া হাসিয়া হাসাইয়া সকলকে পাগল করিয়া দিয়াছে। তারপর যৌবনে রজনী কুসংসর্গে পড়িল। যখন তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রি হইয়া যায়, তখন সে নিজে টাকা দিয়া তাহার বসতবাড়ী রক্ষা করিয়াছিল। রোগে পড়িয়া রজনীর স্ত্রীর বাঁচিবার আশা ছিল না, টাকার অভাবে চিকিৎসা হয় না জানিয়া সে অকাতরে টাকা খরচ করিয়া বন্ধু-পত্নীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। তাহার প্রথম খোকার অন্নপ্রাসনে রজনী খোকাকে রূপার বালা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল; তাহার স্ত্রী জেলে যখন তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তখনও খোকার হাতে সেই বালা ছিল; সেই রজনী! তাহার সুখ দুঃখের সাথী, বাল্যবন্ধু রজনী!

পরদিন রজনীর সঙ্গে কালীনাথের দেখা হইল। রজনী চিনিতে পারিল না, কালীনাথের দিকে চাহিয়া রহিল।

কালীনাথ বলিল—চিন্‌তে পারছো না? আমি কালীনাথ। শান্তিডাঙ্গার খুনের দায়ে জেল খাটছি।

রজনী বলিল—কালীনাথ? কি বদলেই গেছ ভাই, সত্যিই আমি চিন্‌তে পারি নি?

কালীনাথ—কিন্তু তোমার এ দশা কেন?

রজনী—আর বল কেন ভাই। ঘোড়া চুরিতে জেল হয়েছে এক বছর। কিন্তু সত্যিই চুরি আমি করি নি। হাট হ'তে বাড়ী যাচ্ছিলাম। ঘোড়াটা মাঠে চর্‌ছিল। কাল বৈশাখী—পশ্চিমে মেঘ উঠেছিল। তাই ঘোড়াটায় চড়ে বসেছিলাম তাড়াতাড়ি বাড়ী যাবার জন্যে। বাড়ী গিয়েই ঘোড়া আমি ছেড়ে দিতাম। যার ঘোড়া পথেই সে ধরে ফেলেছিল। আমার কথা হাকিম বিশ্বাস করলেন না, এক বছরের জেল দিয়ে দিলেন।

কালীনাথ—কতদিন বাড়ী ছাড়া তুমি?

রজনী—তা প্রায় চার মাস। দুই বাড়ীরই সব ভাল দেখে এসেছি। বৌদি ভাল আছেন। ছেলে দুটি স্কুলে যায়—ভালই আছে।

কালীনাথের বুক ফাটিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। মনে হইল কে যেন বর্শা দিয়া তাহার বুকে খোঁচাইতেছে। তাহার স্ত্রী, ছেলে দুটি!—কত দিন দেখে নাই! কি দোষে সে সব হারাইল। ভগবান তাহাকে সব দিয়া-ছিলেন, কেন আবার কাড়িয়া লইলেন। অমন স্ত্রী—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী! ছেলে দুটি নধরকান্তি, হাসিতে জ্যোৎস্না ফুটিত, কান্নায় মুক্তা ঝরিত। তাহারা এখন স্কুলে যায়! কত বড় হইয়াছে। তাহাদের সে কতটুকু দেখিয়া আসিয়াছিল? তাহাদের বুকে ধরিয়া, মুখে চুমু খাইয়া সে কি সুখ! আর কি তাহাদের দেখিতে পাইবে, আর কি সেখানে ফিরিয়া যাইবে!

কালীনাথের দিন আর কাটে না। বহুদিন কারাবাসে তাহার অতি কষ্টের দিনগুলি কালের নিয়মে অনেকটা সহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রজনীর সহিত দেখা হইবার পর হইতে মনে একটুকুও স্বস্তি ছিল না। তাহার ঘর সংসার, তাহার স্ত্রী পুত্র, তাহার পুকুর-ভরা মাছ, গোলা-ভরা ধান, তাহার গরু বাছুর চাষ, আরও কত কিছু দিবারাত্রি তাহার বুকে তোলপাড় করিয়া বুকটাকে যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিত, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে শান্তি পাইত না। [illegible]

ছুরি করিতে করিতে কাজ ফেলিয়া একদিকে চাহিয়া থাকিত, পাহারাদার আসিয়া বলিত—'কেয়া হুয়া সন্ন্যাসী ভাই, বোখার হুয়া?' খাইতে বসিয়া খাইতে খাইতে তাতে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, সঙ্গী কয়েদিরা বলিত—"সন্ন্যাসী দাদা, খাচ্ছনা যে?" দিনের পর দিন, সে এমনি অস্থির হইয়াই কাটায়'। দিনের বেলা ঐ সব চিন্তা, রাত্রিতে ঐ সবের স্বপ্ন দেখা!

এক রাত্রে, বোধ হয় কোন স্বপ্ন দেখিয়াই সে ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল। সমস্ত শরীর ঘামে একবারে ভিজিয়া গিয়াছে, মাথা চিন্ চিন্ করিতেছে। মাথা টিপিয়া ধরিয়া সে ঘরের একটা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ধীর নৈশ বাতাসে দেহ মন যেন জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। গভীর রাত্রি, বিশ্বব্যাপী অন্ধকার, উপরে নক্ষত্ররাজির ক্ষীণ দীপ্তিতে যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, মাধুর্য্যময়, বারবার দেখিতে ইচ্ছা করে। দেখিতে দেখিতে কালীনাথের শান্তিভাঙার কথা মনে হইল। সে দিন হোটেলের বিছানায় পড়িয়া বাহিরের দিকে খোলা জানলা দিয়া সে এমনি করিয়া চাহিয়াছিল। সে রাত্রি এমনি ঢলঢল লাবণ্যে ভরা, এমনি তারকাখচিত আকাশ, এমনি করিয়া জোনাকি জ্বলিতেছিল, এমনি শ্রান্তিহারী বাতাস বহিতেছিল। আর সেই রাতে সেই বণিকও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিল। আহা নিরপরাধ সেই বণিক—উঃ কি নিষ্ঠুর! ঘুমন্ত মানুষকে খুন! পুরাপুরি একটি হাজার টাকায় কি লাভ হইল, রজনী! কই সেই টাকা তোমায় জেল হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই তো। আহা সেই বণিক, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—কোথায় হয় তো ভাসিয়া গিয়াছে! তাহাদের কান্নায় আকাশ বিদীর্ণ হইয়াছে—মানুষ কাঁদিয়াছে, পশুপক্ষী কাঁদিয়াছে, বাতাস পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইয়াছে!—ও কি? পাশের যে ঘরে রজনী থাকিত সেই ঘর হইতে কেমন একটা শব্দ আসিতেছিল। কে যেন সন্তর্পণে ঘা মারিয়া কিছু ভাঙিতেছিল। দুই ঘরের মধ্যে যে তালাবদ্ধ দুয়ার তাহা ঠেলিতেই একটু ফাঁক হইল। ঘরের আলোতে কালীনাথ দেখিল একজন লোক অস্ত্র দিয়া ঘরের দেয়াল ভাঙিতেছে। দুয়ার ঠেলার শব্দ হইবামাত্র লোকটা অস্ত্র ফেলিয়া কালীনাথের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সে রজনী। কালীনাথ বলিয়া উঠিল—তুমি?

রজনী বলিল—হাঁ ভাই, আমি।

কালীনাথের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

রজনী বলিতে লাগিল—জেল আর আমি সইতে পারছি না কালীনাথ, তাই পালাবার চেষ্টা করছিলাম।

কালীনাথ—পালাবার? জেল হ'তে? ধরা পড়বে যে।

রজনী—না ভাই, সে ভয় আমার নেই। আমাদের পাহারার একজন সিপাহীকে বশ করেছি। এই জেলে যখন আসি সঙ্গে লুকিয়ে কিছু টাকা এনেছিলাম—এক শো টাকার একখানা নোট। সেই টাকা দিয়ে সিপাহীকে বশ করেছিলাম। প্রথম ঠিক হয়েছিল সে আমাদের ঘরের দুয়োরের তালা খুলে আমাকে বের করে দেবে। কিন্তু চাবি থাকে জমাদারের কাছে। সিপাহি কিছুতেই সেই চাবি চুরি করতে পারে নি। অগত্যা দেয়াল ভাঙা ছাড়া আর উপায় রইল না।

কালীনাথ নির্ব্বাক। রজনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রজনী বলিতে লাগিল—সিপাহি দেয়াল ভাঙিবার যন্ত্রপাতি আমাকে দিয়েছিল; সেই সঙ্গে একটা ওষুধ দিয়েছিল। সেই ওষুধ নাকে দিয়ে আমার ঘরের সঙ্গিদের অজ্ঞান করে রেখেছি। ভোরের আগে তাদের ঘুম ভাঙবে না। যদি দেয়াল ভাঙতে পারতাম তবে সিপাহি গুপ্ত দুয়োর দিয়ে আমাকে জেলের বাইরে বের করে দিত। কিন্তু কিছুই হলো না। দেয়াল ভারি শক্ত, যেন ইটের নয়, লোহা দিয়ে তৈরি। পুরো দু ঘণ্টা পরিশ্রম করেও তিনখানি ইটের বেশী খসাতে পারি নি। তার উপর ভীষণ গরম, ঘেমে নেয়ে উঠেছি। হাত একেবারে অবশ হয়ে পড়েছিল; একটু জিরিয়ে নিয়ে যেই কাজ আরম্ভ করেছি অমনি তুমি জেগে উঠে দেখে ফেলেছ। যাক, তুমি দেখেছ তাতে আমার বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু দেয়াল ভাঙা বুঝি আর হয় না, বাইরে যেন ফরসা হয়ে আসছে।

কালীনাথ বলিল—তাই মনে হয়। প্রভাতী তারা যেন আমি দেখেছি। কিন্তু ভোর হ'লেই তো সব দেখে ফেলবে।

রজনী—দেখুক, আমার ভয় কি। আমাদের এই ঘরে পাঁচ জন কয়েদি, কে করেছে ঠিক কি? চার জন সেপাই, এক এক জন পর পর পাহারা দেয়, কার পাহারার সময় ঘটনা ঠিক হবে না। দেখ্‌বার মধ্যে একমাত্র তুমি। তোমাকে দিয়ে আমার কোন অনিষ্ট হবে না। তুমি নিশ্চয়ই কিছু বলবে না?

কালীনাথ—কিন্তু ওরা যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে?

রজনী—বলবে কিছু জানি নে। তুমি ভিন্ন ঘরে থাক, তোমার কি?

কালী—ছি ছি, ও যে মিছে কথা হবে ভাই।

রজনী কালীনাথকে চিনিত। সে কিছুক্ষণ কালীনাথের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—কালীনাথ, তুমি দুয়োরের ওপারে, আমি এপারে, নইলে তোমার পায়ে ধরতাম। জীবনে তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, অনেক বিপদে বাঁচিয়েছ। এবারও আমায় বাঁচাও। তুমি সাক্ষী দিলে ওরা আমায় আস্ত রাখবে না, কোড়া মেরে গায়ের ছাল তুলে নেবে। জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করার যে শাস্তি, তা আমি আর এক জেলে দেখেছি। সে আমি সইতে পারবো না। আমি মরে যাব। ছেলে, মেয়ে, বউ—তাদের আর দেখ্‌তে পাব না। তোমার পায়ে পড়ি আমায় বাঁচাও, ছেলে-মেয়েদের আমায় দেখ্‌তে দাও। তাদের না দেখে আমি আর থাকতে পারছিলাম না, তাই পালাতে চেয়েছিলাম। আমার বুকে আগুন জলছিল। তারা যে কি করছে, তাদের যে কি হচ্ছে কিছুই জানি না—তাদের কিছুই দিয়ে আসতে পারি নি। আমার এমন কিছুই নেই কালীনাথ যে তারা খায়।

অন্য কেহ হইলে রজনীর কথার উত্তর দিতে পারিত। বলিতে পারিত কালীনাথের নিজের কথা, তার আপন স্ত্রী পুত্রের কথা, কিন্তু কালীনাথের মুখ দিয়া বাহির হওয়া তো দূরের কথা, এসব তাহার মনেও আসিল না। রজনীর চোখে জল দেখিয়া তাহার চোখেও জল দেখা দিল।

(৩)

সকাল বেলাতেই তদন্ত আরম্ভ হইল। কয়েদী কিংবা সিপাহিদের নিকট হইতে কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। রজনীর ঘর হইতে দেয়াল ভাঙিবার অস্ত্র ও ক্লোরোফরমের একটি শিশি পাওয়া গেল। ইহাতে সন্দেহ হইল ঘরের সমস্ত কয়েদি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নাও থাকিতে পারে—কেহ কেহ হয় তো ঔষধ প্রয়োগে অজ্ঞান হইয়াছিল। সকলেই যখন কিছু জানে না বলিয়া প্রকাশ করিল তখন ডাক পড়িল পাশের ঘরের কালীনাথকে। জেলের সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার পাশের ঘরের কয়েদিরা গত রাত্রে দেয়াল ভেঙে পালাবার চেষ্টা করেছিল, সে সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?

কালীনাথ—জানি হুজুর। আমি দুয়োরের ফাঁক দিয়ে দেখেছিলাম, মাত্র একজন দেয়াল কাটছিল, অন্য সব নির্দোষ, তারা ঘুমুচ্ছিল।

রজনীর মুখ সাদা হইয়া গেল।

সাহেব—এক জন? কি নাম তার?

কালী—হুজুর, নাম বলতে পারবো না।

সাহেব—নাম জান না, বেশ, সনাক্ত কর।

কালী—না হুজুর, নাম জানি, বলবো না।

সাহেব—কি? বলবে না?

কালীনাথ চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব বলিলেন—না বল্‌লে তোমায় ভীষণ শাস্তি দেব। কোড়ার ঘায়ে দেহের চামড়া থাকবে না।

কালীনাথ তবুও চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব বলিতে লাগিলেন—সন্ন্যাসী, বহুদিন তুমি এই জেলে আছ। তোমার ব্যবহারে কোনদিন কোন খুঁত ধরা যায় নি। তোমার সৎ চরিত্রের জন্য তোমার দীর্ঘ মেয়াদ কালের মধ্যে দেড় বছর রেহাই দেওয়া হয়েছে—তুমি এখন যদি সব জেনেও অপরাধীর নাম না কর, তবে তোমার চৌদ্দ বছরের একটি দিনও রেহাই পাবে না। তার উপর তোমাকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে।

কালীনাথ বলিল—হুজুরের মরজী।

সাহেব দাঁত দিয়া নিজের ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন—কপাল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—খুন তুমি ঠিকই করেছিলে। ফাঁসি হওয়াই উচিত ছিল। তোমার বাইরেটা দেখে সন্দেহ হ'তো হয়তো তুমি দোষী নও, বিচারে ভুল হয়ে থাকবে। এখন দেখছি তা নয়, আমাদেরই ভুল, তুমি ঠিকই দোষী। এতদিন তোমার চরিত্রের যে বাইরেটা

দেখেছি সেটা বাইরেরই জিনিস, ভিতরে তুমি যা ছিলে রয়ে গেছ। আমি তোমায় শেষ কথা বলছি কালীনাথ—পাঁচ মিনিট তোমায় সময় দিলাম। এখনও যদি বল কোন শাস্তি পাবে না। তোমার রেহাইয়ের দেড় বছরের একটি দিনও কাটা যাবে না, কোনও শাস্তি হবে না"—বলিয়া সাহেব ঘড়ি দেখিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিট গত হইলে বলিলেন—বাস্। সময় পার হ'য়ে গেছে। গত রাত্তে যে ঘটনা হ'য়ে গেছে সেটা জেলখানার খুব বড় অপরাধ। তুমি সব বল্লে অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারতেম। নাম প্রকাশ না করায় তার শাস্তি হ'লো না। প্রকারান্তরে অপরাধীকে তুমি সাহায্যই করলে। এই অপরাধে আমি তোমাকে দশ কোড়ার হুকুম দিলাম।

কোড়া এক প্রকার বেতের চাবুক। পাঁচ গাছা লকলকে পাকা বেত ঝাঁটার মত এক সঙ্গে বাঁধা থাকে। একটি আঘাতে পাঁচটি আঘাত হয়।

সেদিন সকল কয়েদির সম্মুখে কালীনাথের নগ্ন দেহে কোড়া মারিয়া সাহেবের আদেশ প্রতিপালিত হইল। বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কালীনাথ অচেতনের মত অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

কালীনাথ জেলের হাসপাতালে। পরদিন বিকালের দিকে রজনী নিঃশব্দে কালীনাথের বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

কালীনাথ জিজ্ঞাসা করিল—কেন এসেছ রজনী?

রজনী ধীরে ধীরে রোগীর শয্যা পাশে বসিল—বলিল—আজ তোমাকে একটা খবর দিতে এসেছি। শান্তিডাঙ্গায় কে খুন করেছিল জান?

কালীনাথ—জানি। তুমি।

রজনী চমকিয়া উঠিল—আমি? এ তো কেউ জানে না—তোমায় কে বল্লে?

কালীনাথ—তুমি। একদিন রাত্তে তুমি আর কয়জন কয়েদীর সঙ্গে গল্প গুজব করছিলে। শান্তিডাঙ্গা খুনের কথাও উঠেছিল। আমি আমার ঘর হ'তে সব শুন্‌ছিলাম। তোমার কথাতেই বুঝেছিলাম, তুমিই খুন করে তার টাকা নিয়ে পালিয়েছিলে।

রজনী—এও তুমি জেনেছ। এ সব জেনেও আমার শাস্তি নিজের ঘাড়ে নিলে? কালীনাথ—

কালীনাথ—কি ভাই।

রজনী একটু চুপ করিয়া বসিয়া বলিল—সে রাত্তে এক অজানাকে খুন করেছিলাম, তোমাকে করি নি। বন্ধু বলে যে করি নি তা মনে করো না।

কালীনাথ কোন কথা কহিল না।

রজনী বলিতে লাগিল—যে মানুষ মানুষকে খুন করে তার আবার বন্ধু অবন্ধু কি! সেই বণিককে খুন করে তোমার গলায় বসাবো বলে ছুরি উঁচিয়েছিলাম। সেই সময় বাইরে কার পায়ের শব্দ হ'লো, তুমিও একটু নড়ে উঠলে, ভয়ে আমার প্রাণ কেঁপে উঠলো, তোমাকে আর খুন করা হলো না। ছোরাখানা তোমার বিছানায় রেখে পালিয়ে এলাম। কেন রেখে এলাম জান? তোমাকে জড়াবার জন্ম। তোমার বিছানায় রক্তের দাগ থাকবে, রক্তমাখা ছোরা তোমার বালিশের নীচে পাওয়া যাবে, তোমাকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে, অন্য কোন দিকে কারুর নজর থাকবে না। আমি নিশ্চিন্ত—জানি আমার উপর সন্দেহ আস্‌তে পারে না। শুন্‌লে কালীনাথ কেমন তোমার বন্ধু, কেমন বন্ধুর জন্যে আজ তুমি হাসপাতালে মর্‌তে বসেছ। রজনী কাঁদিয়া ফেলিল।

কালীনাথ ধীরে ধীরে রজনীর গায়ে হাত দিল, বলিল—এ সব কথা আর কেন ভাই।

চক্ষু মুছিয়া রজনী বলিল—তাই বলছি। শোন। আমি সব ঠিক করেছি। কাল ওরা যখন তোমায় বেত মারছিল, বেতের ঘায়ে গা চিরে যখন মাংস উঠে যাচ্ছিল, গা বয়ে রক্ত পড়্‌ছিল—তখন আমি দেখেছি, তোমার মুখ একটুও বিকৃত হয় নি, কি একটা সুন্দর অস্পষ্ট হাসি তোমার মুখে ফুটে উঠেছিল। এমন আর কখনও দেখি নি। কি সে শাস্তি! কি ভীষণ! কি নিষ্ঠুর!—এমন শাস্তির মাঝে মুখের এমন ভাব আর কখনো দেখি নি। সেই থেকে মাথায় আমার আগুন জ্বলছে। আমি সব ঠিক করেছি। বণিক তো শেষ হয়েই গেছে, কোথায় বাড়ী, কোথায় ঘর, কে তার আছে, জানি না। তবু তুমি আছ। তোমার সুন্দর জীবনটা আমিই নষ্ট করে দিয়েছি। তুমি নির্দ্দোষ, তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা; তবুও তুমি জেল খাটছ। জেলে আর তোমায় আমি রাখ্‌তে দেবো না, আমি সব স্বীকার করবো, স্বীকার করলেই ওরা তোমায় ছেড়ে

দেবে।" বলিয়া কালীনাথের দুই পায়ে মাথা রাখিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। কালীনাথ ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল—রজনী!—

রজনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আর নয়। আমার কথা শেষ হয়েছে, আমি ক্ষমার অযোগ্য, তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাই নি। শাস্তিই আমাকে নিতে হবে, তাই আমি নেবো। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তুমি বাড়ী যেও কালীনাথ। বলিয়া চলিয়া গেল।

রজনী তাহার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল। কয়েকদিন পর কালীনাথের মুক্তির আদেশও আসিয়াছিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই কালীনাথ এপারের সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ওপারে চলিয়া গিয়াছে।

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে

১৯৪৯-৫০ সালের কলিকাতা চিত্রপ্রদর্শনী

শ্রীস্বপনকুমার সেন

নিখিল ভারত চারুকলা প্রদর্শনীর চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনের পৌরোহিত্য করেছেন বাংলার প্রদেশপাল মাননীয় কৈলাসনাথ কাটজু। পূর্ব্ব আভিজাত্য অনুযায়ী উদ্বোধন আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে নিঃসন্দেহ; কিন্তু শিল্পী সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনা বা উভয় পক্ষের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করলেও সত্যিকারের তৃপ্তি দিতে পারেনি এই প্রদর্শনী।

এবারে সংগ্রহ পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়, কিন্তু নিখিল ভারত নামের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে অক্ষম; প্রদর্শন পদ্ধতি পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। তবে এ গতানুগতিক বিশেষ পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে না। এর পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকা ৩৪৬ নং প্রদর্শন "মিলন" আর একখানি জলরঙা ছবি বিভাগীয় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছেন, মহারাজা বাহাদুর স্যার কামেশ্বর সিংহ-স্বর্ণপদক পেয়ে। ২৮২ নং প্রদর্শন এই বিভাগে দ্বিতীয় সম্মান লাভ করেছেন—শিল্পী ইন্দ্র দুগের, শ্রীযুক্ত এন, সি, ঘোষ-রৌপ্য পদক পেয়ে। এই বিভাগে আরও কয়েকজন শিল্পীর কাজ উল্লেখযোগ্য, তাদের মধ্যে শিল্প-কালোয়ান বুধের দৃশ্যাঙ্কন রমণীয়। শিল্পীকে ২৫০৲ টাকার একটি বিশেষ পুরস্কার দিয়ে সম্মান দেওয়া হয়েছে—২০৪ নং প্রদর্শন ব্যবসাপথ

প্রতিলিপি—১

প্রতিলিপি—২

ধরণের প্রদর্শনী চিত্র-প্রদর্শনীর অনুকূল নয়। "ছবির বাজার" এই আখ্যাই শ্রেয়। বাহির প্রাঙ্গণের সজ্জা পরিকল্পনা দেখে "কার্ণিভাল" অনুমান করা অপরাধ নয় এবং তা চিত্র-প্রদর্শনীর পক্ষে নিশ্চয়ই সুনাম অর্জন করে না।

চিত্র প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনের সম্মান প্রদেশপাল-স্বর্ণ-পদক লাভ করেছেন শিল্পী বীরেন দে। বীরেনবাবুর আঁকা দৃশ্যাদির (landscape) কিসসব আছে, হাল্কা ধরণের নজর-ধরা ছবি। পদ্ধতি

চিত্রে। অল্প স্বচ্ছ রঙ ব্যবহার করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শিল্পী। তরুণ শিল্পী রণেন দত্তের কাজও সমপর্য্যায়। শিল্পী চঞ্চল করের গুমকারে-ঘরের দৃশ্যাঙ্কন (landscape) খানি (প্রতিলিপি ১ নং) অতুলনীয়। ছবিখানিতে শিল্পীর তুলির বলিষ্ঠতা প্রকাশমান।

শিল্পী মাখন দত্তগুপ্ত তৈলচিত্র বিভাগে স্যার আবদুল হালিম গজনভী স্বর্ণপদক পেয়ে বিভাগীয় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেছেন তাঁর ৮৮ নং

প্রদর্শন "হাট" চিত্রে (প্রতিলিপী নং ২)। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন, জে, পি, গাঙ্গুলী-রৌপ্য পদক পেয়ে শিল্পী শানু মজুমদার—১৯৬ নং প্রদর্শন "ঘোড়-দৌড়" চিত্রে। এই বিভাগের প্রদর্শন সংখ্যা সর্বাধিক। কয়েকজন প্রথ্যাতনামা শিল্পীও এ বিভাগে যোগদান করে প্রদর্শনীর মর্য্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন, তন্মধ্যে মাননীয় শিল্পী জে, পি, গাঙ্গুলী মহাশয়, শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শিল্পী এল, এম, সেন। এঁর কাজের বৈশিষ্ট্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়, অসমান জমিতে তৈলচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি এঁরই সাধনাপ্রসূত; অপরাপর চিত্র থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। শিল্পী রমেন চক্রবর্ত্তীর তৈল চিত্র হৃদয়গ্রাহী হয়নি। ৩০২ নং প্রদর্শন, শিল্পী বসন্তকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের "তিনটি

প্রতিলিপি—৩

ফুল" ছবিখানি তিন ভগ্নীর প্রতিকৃতি। তৈল চিত্রের বর্ণবিন্যাসের অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট, এঁর সম পর্য্যায় আসে এমন চিত্র একখানিও প্রদর্শিত হয়নি এ বৎসর। স্থানাভাবে বিশেষ আলোচনা সম্ভব হলোনা। শিল্পী সতীশ সিংহ মহাশয়ের তৈলচিত্রে রামায়ণের দু'একখানি চিত্র ও কুরুক্ষেত্রের চিত্রখানি মনোরম। শিল্পী পাণিকরের "তরুণী মাতা" ৩৬৮ নং প্রদর্শন তৈলচিত্রখানি অপূর্ব্ব। শিল্পী এ, এ, আলমিল করের "চার বোন" ২৮৫ নং প্রদর্শন ছবিখানির বিষয়-বস্তু ও বর্ণ বিন্যাস প্রশংসনীয়। ক্যালকাটা গ্রুপস্‌এর কাজগুলির মধ্যে শিল্পী রথীন মৈত্রের "প্রাতভোজন" ২৮৩ নং প্রদর্শন, ছবিখানিও প্রশংসনীয়। শিল্পী ষ্টেলা ক্রামরিশের কাজগুলি খুব আকর্ষণীয় হয়নি। বিষয়বস্তু নির্ভুল হয়নি।

২৩১ নং চিত্রের শিল্পী গোপাল ঘোষের আঁকা চিত্রগুলির মধ্যে তাঁর নিজস্ব ধারা পরিস্ফুট। চিত্রের মধ্যে তুলির স্বাবলীলগতি ও বর্ণবিন্যাসে বলিষ্ঠ ইঙ্গিত অনস্বীকার্য্য। এঁর আঁকা ২১৩ নং প্রদর্শন "কালিম্পঙএর ভুটিয়া রমণী" (প্রতিলিপি নং ৩) চিত্রখানি সত্যই দর্শককে আনন্দদান

প্রতিলিপি—৪

করার ক্ষমতা রাখে। শিল্পী দময়ন্তী চোলার আঁকা ৩৯৭ নং প্রদর্শন "প্রসাধন" (প্রতিলিপি নং ৪) চিত্রখানির আলোছায়ার সমন্বয় অতি সহজে আমাদের চোখে ধরা দেয়। শিল্পী ডরেথা মেরীর আঁকা ৪৫নং প্রদর্শন "গ্রামের মেয়ে" (প্রতিলিপি নং ৫) চিত্রখানি মহিলা বিভাগে

প্রতিলিপি—৫

বিশেষ সম্মান পেয়েছে ও শ্রীতেজেশ বড়াল রৌপ্যপদক প্রাপ্ত করেছেন। শিল্পী কিশোরী রায়ের ১৪৩ নং প্রদর্শন শিল্পাচার্য্য দেবী প্রসাদের প্রতিমূর্ত্তি তৈল চিত্রখানি আকারে ছোট হলেও কৃতিত্বের দিকে নগণ্য নয়।

প্রাচ্য বিভাগে প্রদর্শন সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং বিশেষত্বও প্রকাশ

পায়নি কোনও খানাতেই। চিত্রগুলি প্রায়ই মামুলী ধরণের। শিল্পী এস, বি, পালিসকরকে তাঁর ৩৬৯ নং প্রদর্শন "আমার প্রতিবেশী" চিত্রে কুমার প্রদ্যোৎনারায়ণ ঠাকুর স্বর্ণপদক দিয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সম্মান শ্রীবরদা উকিল রৌপ্যপদক পেয়েছেন শিল্পী অজিতকুমার
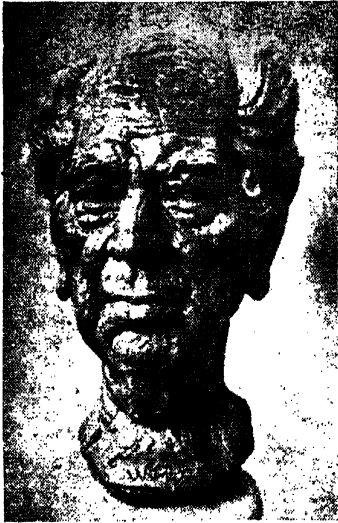
প্রতিলিপি—৬

গুপ্ত তাঁর ১৫৪ নং প্রদর্শনে। শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর খান কয়েক চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে কিন্তু সজীবতা প্রকাশ পায়নি একটিতেও। শিল্পী কমলারঞ্জন ঠাকুরের প্রদর্শনগুলি মনোরম। এই বিভাগে এঁর ৪৪৯নং

প্রতিলিপি—৯

প্রদর্শন "ভগবান বুদ্ধ ও সুজাতা" চিত্রখানি ২৫০৲ টাকার লোটাস ট্রাষ্ট বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। এ ছাড়া এই বিভাগে আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন চোখে পড়ে না।

ভাস্কর্য্য বিভাগ আরও নিকৃষ্ট সংগ্রহ—ভারতীয় শিল্পীদের পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হতে হয় এই বিভাগের প্রদর্শন দেখে। আর দু-একজন শিল্পী এই বিভাগের সম্মান রক্ষা করেছেন। গত কয়েক বৎসর ধরে দেখা যাচ্ছে, এই বিভাগ ক্রমশই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। গত বৎসর লক্ষ্ণৌ থেকে একটি প্রদর্শন পাঠিয়ে প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কয়েকজন শিল্পী, এ বৎসর তাঁরা যে কোনও কারণেই হোক সহযোগিতা করেনি। প্রদর্শনীর বিশেষ ভরসা কলকাতার আর্ট স্কুলের উপর; কিন্তু দুঃখের বিষয় কলকাতা আর্ট স্কুলের এই বিভাগটি বহুদিন যাবৎ দুর্ব্বল হয়ে আছে, সেখান থেকে আর বিশেষ কিছু কল্পনা আমাদের পক্ষে বাতুলতা। শিল্পী সুনীল পালের প্রদর্শিত ৫নং প্রদর্শন

প্রতিলিপি—৭

"শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্ত্তি" (প্রতিলিপি ৬) একমাত্র প্রদর্শন—যার মধ্যে নূতনত্ব আছে, যে কাজখানিকে কেন্দ্র করে অনেক কিছুই বলা যায়। কাজখানি রসিকদের যথেষ্ট আনন্দদান করবে-সন্দেহ নাই। এটিকে শ্রীকানাইলাল জেঠিয়া স্বর্ণপদক দিয়ে এই বিভাগের শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হয়েছে। এই বিভাগের আর একখানি প্রাণবন্ত প্রদর্শন ২নং "চুম্বন" (প্রতিলিপি নং ৭) একখানি কাষ্ঠফলক থেকে শিল্পী এটিকে খুঁজে বার করেছেন। শিল্পী ধনরাজ ভগবৎ এঁরই ১নং প্রদর্শনখানিকে রায়বাহাদুর, আর, এন, মুখার্জ্জী রৌপ্যপদক দিয়ে সম্মানিত করা,

হয়েছে। এই বিভাগের দ্বিতীয় পুরস্কার রাজা বিশ্বেশ্বর সিংহ সাহেব বাহাদুর রৌপ্যপদক পেয়েছেন শিল্পী বিপ্রচরণ মহান্তি তাঁর "প্রেম" ৮নং প্রদর্শনে। ভাস্কর্য্য বিভাগের বিফলতা সত্যই লজ্জাজনক। প্রদর্শন নং ৩০০, "দুই বোন" (প্রতিলিপি নং ৮) রঙিণ কাষ্ঠ খোদাই চিত্রে বিশেষ পুরস্কার নরেশনাথ মুখার্জ্জী স্বর্ণপদক পেয়েছেন শিল্পী হরেন দাস। কাঠ খোদাই চিত্র হিসাবে ছবিটি অপূর্ব্ব, এর মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য্য। শিল্পী অনিমা মুখার্জ্জীর ৫৭ নং প্রদর্শন "নৃত্যরতা কুমারী দল" (প্রতিলিপি নং ৯) রঙিণ কাঠ খোদাই ছাপা, এটিও কুমার জগদীশ সিংহ স্বর্ণপদক পেয়ে সম্মানিত হয়েছে।

প্রতিলিপি—৮

শিল্পী অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তাঁর ১৭২ নং প্রদর্শন "আঁলোর তলে" প্যাষ্টাল চিত্রে ২৫০৲ টাকার ইউনিয়ান বৃত্তি পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন।

শিল্পী গিরীশ মণ্ডলকে তাঁর ২৬৩ নং প্রদর্শনে "দুর্গা পূজা" চিত্রে ১২৫৲ টাকা লোটাস ট্রাষ্ট পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

পরিশেষে মন্তব্য হিসাবে শিল্পী ও শিল্প-রসপিপাসুদের তরফ থেকে দু' একটি বক্তব্য হয়ত প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষের অপ্রিয় লাগবে তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান যে চিত্রখানিকে দেওয়া হয়েছে, কর্ত্তৃপক্ষের বিচারক গোষ্ঠী কি তার চেয়ে ভাল প্রদর্শন এবারের চিত্র প্রদর্শনীতে খুঁজে পাননি? না দেখেও চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন, বিশেষ শিল্পীর প্রতি দরদ দেখানর অনুপ্রেরণায়? শিল্পী চঞ্চল কর, শিল্পী কালোয়ালকৃষ্ণ, তরুণ শিল্পী রণেনআয়ান দত্ত, শিল্পী গোপাল ঘোষ, এঁদের চিত্রগুলি কি তখনও টাঙান হয়নি। তৈল চিত্রের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষের তরফে লজ্জাই প্রকাশ পায়। এখন জনসাধারণের বিচার চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, ছবি দেখতে তারা শিখেছে। সর্ব্বশেষ বক্তব্য প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে আসার পর আর একখানি প্রদর্শনও মনে রেখাপাত করে থাকে না।

অভিনন্দন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নাই পেলে তাহাদের সুখ্যাতি, সম্মান,
বীরত্বের আস্ফালন কথা মাত্রে শেষ,
চক্ষে আজো লেগে আছে স্বপ্নের আবেশ,
স্বাধীনতা মনে ভাবে ঔদার্য্যের দান।

অধিকার-প্রমত্তের নাহি হেথা স্থান,
উচ্চে বসি দেয় তারা সবারে নির্দ্দেশ,
আমরা দরিদ্র, রিক্ত, আমরাই দেশ,
দুর্দ্দিনে নেতৃত্বে করি তোমারে আহ্বান।

যে পারে করিতে ত্যাগ সে-ই শুধু পায়।
জীবনে আচ্ছন্ন করে দারুণ বিষাদ,
বঙ্গের আকাশ কালো অন্ধ তমসায়,
কে জাগাবে? কে ঘুচাবে এই অবসাদ?
নির্ভীক, তোমার পানে সারা দেশ চায়,
শ্যামা জননীর তুমি লভিলে প্রসাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তমলুক মহকুমা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক গুপ্ত বৈঠকে সমবেত হইলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে থানা, আদালত-গৃহ প্রভৃতি সরকারী ভবনসমূহ দখল করিয়া তাহার উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক লইয়া গঠিত বিদ্যুৎবাহিনী ইহার পরদিনই কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিল। বড় বড় গাছ কাটিয়া রাস্তার উপর ফেলিয়া, সেতু ধ্বংস করিয়া এবং টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার কাটিয়া দিয়া পোষ্টগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া তমলুকের সহিত বহির্জ্জগতের যোগাযোগ রহিত করা হইল। লাঠি চার্জ ও গুলিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া দিন দু'য়েকের মধ্যেই তিন-চারিটি থানা অধিকার করিয়া সেগুলির উপর উত্তোলিত করা হইল জাতীয় পতাকা। পাঁচটি বড় বড় শোভাযাত্রা ২৯শে তারিখে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দিক হইতে মহকুমাসহর তমলুকের দিকে অগ্রসর হইল। জনতা থানার নিকটবর্ত্তী হইলে পুলিশ তাহাদের উপর নির্দ্দয়ভাবে লাঠি চালাইতে থাকিলেও সঙ্কল্পবদ্ধ জনতা তাহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন শোভাযাত্রীদিগের উপর পুলিশ ও মিলিটারি সুরু করিল গুলিবর্ষণ। ইহাতে কিছু লোক চলিয়া গেল বটে, কিন্তু যাঁহারা শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতেছিলেন, তাঁহারা পিছু না হটিয়া অগ্রসর হইতেই লাগিলেন। গুলিতে বহুলোক হতাহত হইল। রামচন্দ্র বেরাকে সাংঘাতিকভাবে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হইল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি থানায় পড়িয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে যখন তাঁহার সামান্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি টলিতে টলিতে রক্তাক্ত কলেবরে কোনও মতে থানার বাহিরের দিকের দরজার নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেলেন। সেখান হইতেই তিনি তাঁহার অপর সঙ্গীদিগকে ডাকিবার ভঙ্গীতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"এই যে আমি থানায় এসেছি—থানা দখল হয়েছে।" কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পড়িয়া যান এবং অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সকল শোভাযাত্রার একটিতে ছিলেন ৭৩ বৎসর বয়স্কা মাতঙ্গিনী হাজরা। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁহার অভিনব আত্মবিসর্জ্জন এক অপূর্ব্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল। তমলুক মহকুমাসহরের থানার দিকে উত্তর দিক হইতে যে শোভাযাত্রাটি অগ্রসর হইতেছিল—তিনি ছিলেন তাহারই মধ্যে। সৈন্যগণের প্রবল গুলিবর্ষণের মুখে শোভাযাত্রিগণ সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। সেই সময় লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামক জনৈক বালক অগ্রসর হইয়া একজন সৈন্যের নিকট হইতে তাহার রাইফেল কাড়িয়া লইলে নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে প্রহার করা হয়। মাতঙ্গিনী হাজরা তখন ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা হস্তে লইয়া সৈন্যদলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পান। তাঁহার অটুট দৃঢ়তা ও সাহস দর্শনে সৈন্যগণ কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং পিছু হটিয়া যায়, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার প্রতি তাহারা গুলিবর্ষণ করে। যে হস্তে মাতঙ্গিনী জাতীয় পতাকাটি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা গুলির দ্বারা সাংঘাতিক-ভাবে আহত হয়। মাতঙ্গিনী তথাপি পতাকাটি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিয়া সৈন্যগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যাহাতে ভারতীয় হইয়া তাহারা ভারতীয়গণের উপর গুলিবর্ষণ না করে এবং চাকুরী ত্যাগ করিয়া তাহারাও স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান করে। ইতিমধ্যে নিক্ষিপ্ত আর একটি গুলি আসিয়া তাঁহার ললাট ভেদ করিয়া যায় এবং ভূপতিত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরও দেখা যায় যে পতাকাটি তিনি দৃঢ় হস্তে পূর্ব্বেরই মত ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার রক্তে চারিদিক প্লাবিত হইতে লাগিল। একজন সৈন্য ছুটিয়া গিয়া লাথি মারিয়া পতাকাটি ফেলিয়া দিল। দেখা গেল যে মাতঙ্গিনীর আশে-পাশে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস প্রভৃতি আরও কয়েকজনের মৃতদেহও পড়িয়া আছে। ইহার পর সৈন্যগণ সমগ্র স্থানটি পাহারা দিয়া রাখে এবং আহতগণের মধ্যে যাহারা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছিল, তাহাদেরও শুশ্রূষা করিতে কাহাকেও নিকটে যাইতে দেয় না।

দুর্দ্ধর্ষ জনসাধারণ কিন্তু কিছুতেই শায়েস্তা হইল না। সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহারা কার্য্য চালাইতে লাগিল। মেদিনীপুরে আন্দোলনটা প্রবল হইল কাঁথি এবং তমলুক মহকুমাতেই। থানা, পুলিশ-ফাঁড়ি, ডাকঘর, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, মদের দোকান প্রভৃতি জনসাধারণ আগুন দিয়া পুড়াইয়া দিল, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল, কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে লোকে গ্রেপ্তারও করিল। এই সময় ১৬ই অক্টোবর মেদিনীপুরের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইয়া যায় এবং তাহার সহিত যে বন্যার প্লাবন ঘটে, তাহাতেও—প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এবং সরকারী অত্যাচারের মধ্যেও মেদিনীপুরবাসীদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অবস্থা শেষ পর্য্যন্ত এমন স্তরে গিয়া পৌঁছাইল যে কোন কোন অঞ্চলে বৃটিশ-শাসন-কর্ত্তৃত্ব একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হইল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। উক্ত সরকারের জন্য একজন সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন মন্ত্রীও নিযুক্ত হইলেন। এই সরকারের অধীনে বিভিন্ন থানা-এলাকায় আরও কতকগুলি অধীন শাসন-কেন্দ্র গঠিত হয়। পূর্ব্বে গঠিত বিদ্যুৎবাহিনী এই সরকারের নিয়মিত সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়। বিচারকার্য্য, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ই সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতে থাকে। আর্ত্ত ও দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে,

খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধপত্র বিতরণ করিয়া জাতীয় সরকার জনগণের প্রভূত সেবা করেন।

এই আন্দোলন দমনকল্পে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও ব্যাপকভাবে দমননীতি চালাইতে থাকেন। নানা স্থানে সৈন্যগণের ছাউনি পড়ে। পুলিশ ও মিলিটারির রাজত্ব সুরু হইয়া যায়। গুলি চালনা যেন সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় এবং বিভিন্ন স্থানে যে কত লোক হতাহত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। গুণ্ডাগণকে উৎসাহ দিয়া সৈন্যগণ তাহাদের সহিত এক-যোগে লুটপাট চালায়, লোকের ঘর-বাড়ীতে আগুন দিয়া পুড়াইয়া দেয়। এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয় বহু স্থানে। প্রয়োজন হইলে বিমান হইতেও পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালান হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই এই পীড়ন হইতে রেহাই পায় নাই। সৈন্যগণ বহু স্থানে বহু নারীকে ধর্ষণ করে। মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত নারকীয় অত্যাচার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মুখে চুণকালি লেপিয়া দিল।

আগষ্ট-বিপ্লব ভারতের সকল প্রদেশেই সুরু হয় এবং উহার ঢেউ গিয়া আসামেও পৌঁছায়। আসামের সকল কংগ্রেস নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হয়। শোভাযাত্রা প্রভৃতির উপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালাইতে থাকে। দারং জেলার অন্তর্গত গোপুর থানা-ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করিবার উদ্দেশ্যে ২০শে সেপ্টেম্বর একদল লোক অগ্রসর হইলে পুলিশ তাহাদের উপর গুলি চালায়। ইহার ফলে বহু লোক আহত এবং কনকলতা নাম্নী জনৈকা মহিলা নিহত হন। কনকলতার হস্ত হইতে জাতীয় পতাকাটি লইয়া অপর একজন থানার দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশ তাঁহাকেও গুলি করে। প্রবল গুলি বর্ষণকে অগ্রাহ্য করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কয়েকজন গিয়া থানার উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হন।

উক্ত দিবসেই ঢেকাইজুলি থানা অভিমুখেও একদল শোভাযাত্রী অগ্রসর হন। ফুলেশ্বরী নাম্নী একটি অল্প বয়স্কা বালিকা ও আরও জন কুড়ি লোক সেখানে গুলিতে প্রাণ হারায়। একজন যুবক সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া থানার উপর জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দেন—কিন্তু পুলিসের গুলিতে তিনিও সেখানেই প্রাণ হারান।

আসাম প্রদেশের চতুর্দ্দিকেই পুলিসের ও মিলিটারির অত্যাচার চলিতে থাকে—বহু নর-নারী গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হয়। এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য তেজপুর সহরের ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। পুলিস ও সৈন্যগণ উক্ত সভা আক্রমণ করিয়া যথেচ্ছভাবে লাঠি ও গুলি চালায়। ইহার ফলে বহু লোক আহত হয়। শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও আসাম প্রদেশের অধিবাসীগণ আগষ্ট-বিপ্লবে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। আসামেও রেলের লাইন তুলিয়া ফেলা হয়, সরকারী ভবনসমূহ আক্রমণ ও ধ্বংস করা হয় এবং সৈন্য-নিবাস ও বিমান ঘাঁটি প্রভৃতি নষ্ট করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলায় আন্দোলন বেশ ব্যাপক আকার গ্রহণ করে। উক্ত অঞ্চলে গ্রাম্য এলাকাগুলিতে কাছারি হইতে শাসন-কর্ত্তৃত্ব পরিচালিত হয়। তথাকার জনসাধারণ অহিংস থাকিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাছারিগুলিতে সত্যাগ্রহ পরিচালিত করিতে সঙ্কল্প করেন। তদনুযায়ী ২৪শে আগষ্ট তারিখে বহু লোক করাদগ্রামের কাছারিতে গিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলে উহা বন্ধ হইয়া যায় এবং সত্যাগ্রহীরা তথায় জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে। সরকারী কর্ম্মচারিগণকে অনুরোধ করা হয় যে তাঁহারা যেন আপনাদিগকে জনগণের সেবক বলিয়া মনে করেন। নেতৃস্থানীয় একজন সত্যাগ্রহীকে সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়। যাহা হউক, এইভাবে আরও কয়েকটি কাছারিতেও সত্যাগ্রহের কাজ নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়।

কিন্তু ভাদুজ নামক গ্রামের কাছারিতে একদল লোক সত্যাগ্রহ করিতে যাইলে কর্ত্তৃপক্ষ চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। সহস্রাধিক লোক লইয়া গঠিত শোভাযাত্রা যখন কাছারির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন পুলিশ তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলির আঘাত পাইয়া সত্যাগ্রহীদলের নেতা পতাকা হস্তে শেষ শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং আরও কয়েকজন হতাহত হইল। নিহতদের মধ্যে দুইটি বালকও ছিল। পুলিশ মৃতদেহগুলিতে পদাঘাত করে।

ইহার পর পুলিশ ব্যাপকভাবে উক্ত অঞ্চলে তল্লাসী চালায়, বহু লোককে গ্রেপ্তার করে এবং লোকের উপর অত্যাচার চালাইতে থাকে; কিন্তু তথাপি ইসলামপুর গ্রামের কাছারিতে পুনরায় সত্যাগ্রহ করিবার পরিকল্পনা করা হয়। সেখানে সত্যাগ্রহ করিতে গেলেও পুলিশ গুলি চালায় এবং বহু লোক হতাহত হয়। দলের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কয়েকজন নেতা আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া সাতারার আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন। ১৯৪২ সালের শেষ দিক হইতে সাতারার আন্দোলন অন্য পথ ধরিল। গ্রাম্য কাছারি, রেল ষ্টেশন, ডাক-বাংলো ইত্যাদিতে আগুন ধরাইয়া সেগুলি পোড়ান হইতে লাগিল এবং সমগ্র সাতারা জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করা হইল। কয়েক স্থানে মালগাড়ীকে লাইনচ্যুত করা হইল। এইরূপ কার্য্যকলাপ সাতারা জেলায় ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত চলে।

পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আন্দোলন পরিচালিত করিবার জন্য শত শত কর্ম্মীকে তখন আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। এই সকল আত্মগোপনকারী কর্ম্মীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট গুণ্ডা এবং দুষ্টপ্রকৃতির বহু লোককে চর নিযুক্ত করেন। বাবুরাও দেশমুখ নামক কুখ্যাত একজন গুণ্ডা এই সকল চরের অন্যতম ছিল। একদিন একজন কংগ্রেস কর্ম্মীর অন্বেষণে একদল পুলিশসহ সে তাঁহার বাটীতে যায় এবং উক্ত কংগ্রেস কর্ম্মীর পত্নীকে কয়েকটি অশ্লীল কথা

বলিয়া অপমানিত করে। এইভাবে গুণ্ডা গুপ্তচরদের উৎপাতে সেখানকার ভদ্র অধিবাসীদের বসবাস দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কর্ম্মিগণ তখন এই গুণ্ডা-উৎপাত দমনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। উপরোক্ত ঘটনার দিনকয়েক পরেই একদিন বাবুরাও দেশমুখ-এর মৃতদেহ পথের ধারে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার হাত ও পা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

সাতারা জেলার নানা স্থানে বহু টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হয় এবং তাহা আদায় করা হইতে থাকে পাশবিক পীড়নের দ্বারা। স্ত্রীলোকগণকে বেত্রাঘাত, জনগণকে গুলি করিয়া যদৃচ্ছ হত্যা সাতারা জেলায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এই অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যেও সাতারার অধিবাসিগণ অটুট সঙ্কল্প লইয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। এই সরকার পরম যোগ্যতার সহিত কিছুদিন সাতারার শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত করেন।

বিহারেও আগষ্ট-আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় চলিতে থাকে। ১১ই আগষ্ট সরকারী ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করিবার জন্য পাটনার ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া রাস্তায় সমবেত হয় এবং পাটনা হাইকোর্টের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা হাইকোর্টের উপর হইতে বৃটিশ পতাকা নামাইয়া জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিবার দাবী জানায়। প্রধান বিচারপতি অপ্রীতিকর অবস্থা এড়াইবার জন্য তাঁহার এক কর্ম্মচারীকে দিয়া ছাত্রদের অনুরোধ রক্ষা করেন। অতঃপর ছাত্রগণ বিহার প্রদেশের আইন-পরিষদ ভবনে পতাকা উড়াইবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। একদল ছাত্র যখন জাতীয় পতাকা লইয়া পরিষদ-ভবনের উপর উঠিতে আরম্ভ করে, তখন পুলিশ গুলি চালায় এবং তাহার ফলে সাত জন নিহত হয়।

ইহার পর জনগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং নানাস্থানে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। ১২ই আগষ্ট হাজার হাজার লোকের এক বিরাট বিক্ষুব্ধ জনতা পাটনার বিভিন্ন স্থানের টেলিগ্রাফ-টেলিফোন সংযোগ ধ্বংস করিয়া ফেলে। বাঁকিপুর জেলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই জনতা বৃটিশ-বিরোধী নানাপ্রকার ধ্বনি দিতে থাকে এবং পুলিশের সহিত তাহাদের কয়েকঘণ্টাব্যাপী এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। নানাস্থানে ডাকঘর প্রভৃতি সরকারী ভবন আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ ও মিলিটারির গুলিবর্ষণে বিহার প্রদেশে বহুলোকের মৃত্যু ঘটে। আন্দোলন তথাপি চলিতেই থাকে। বহুস্থানে বৃটিশ-শাসন ভাঙ্গিয়া পড়ায় জনগণই আপনাদের গণরাজ প্রতিষ্ঠিত করে।

পাটনা সহরের কর্ত্তৃত্ব সৈন্যগণের হস্তেই তুলিয়া দেওয়া হয়। পরিচয়-পত্র ব্যতিরেকে সান্ধ্য-আইন বলবৎ থাকার প্রাক্কালে লোক চলাচল নিষিদ্ধ হয়। সহরের বহু সম্মানার্হ ব্যক্তিকেও বন্দীশিবিরে আটক করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়, অথবা প্রয়োজনমত তাঁহাদিগকে বাধ্য করা হয় রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে। ঘটনার কোনও প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ না করিয়া মাত্র সরকারী বিবৃতি মুদ্রিত করিবার নির্দ্দেশ দেওয়ার ফলে সংবাদ-পত্রগুলি সরকারী বিবরণ ছাপিতেও অস্বীকার করে।

বিহার প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও উৎপীড়নের দ্বারা বহু টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়। বহুলোককে অত্যাচারের ভয়ে স্থানে স্থানে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেও হয়। নারীগণও সৈন্যদের হস্তে নিগৃহীতা ও লাঞ্ছিতা হন। আগষ্ট-আন্দোলন উপলক্ষে বিহার প্রদেশে ছয় শতাধিক লোক গুলিতে প্রাণ হারায়। জনসাধারণ তৎসত্ত্বেও সরকারের নিকট নতি স্বীকার করে নাই।

যুক্তপ্রদেশে এই আন্দোলন দমনকল্পে ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া লুটপাট চালান হয়, মহিলাদিগকে পথে ছাড়িয়া দেওয়া হয় বিবস্ত্র করিয়া। বালিয়া ও বাইরিয়ায় গুলি চালাইয়া পুলিশ যথাক্রমে ৪০ ও ৩০ জনকে নিহত করে।

আগষ্ট-বিপ্লব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও তীব্র আকার ধারণ করে এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা তাহা দমন করিতে চেষ্টা করেন। বিয়াল্লিশের বিপ্লবের সম্যক জন-ক্ষতির ইতিহাস আজিও রচিত হয় নাই। সংবাদ প্রকাশের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ইহার বিস্তৃতি ও প্রচণ্ডতা রোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন অপূর্ব্ব গণ-অভ্যুত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বৃটেনের যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহাসভাকে আশ্বাস দিয়া সদম্ভে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ উপলক্ষে বহুসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য ভারতে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার এবং আগষ্ট-আন্দোলনের জন্য ইংরাজজাতির চিন্তিত হইবার কোনও কারণ নাই, অর্থাৎ কিনা প্রয়োজন হইলে ঐ বহুসংখ্যক সৈন্য অশান্ত ভারতবাসীদিগকে শায়েস্তা করিতে পারিবে। যাহা হউক, বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিতেই লাগিল—আর ভারতে চলিতে লাগিল শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা। এদিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা সুভাষচন্দ্র গোপনে ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সর্ব্বাধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ-ফৌজ ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে আঘাত হানিতে থাকে। যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার সাহায্যে মিত্রপক্ষই জয়লাভ করিলেন এবং অক্ষ-শক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি একে একে পরাজয় বরণ করিতে লাগিলেন। ১৯৪৫ সালে মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিল।

ইংলণ্ডের জয় হইল—কিন্তু শক্তি, আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়া তাহার অবস্থা পরাজিত দেশগুলি অপেক্ষা বিশেষ উৎকৃষ্ট হইল না। মহাযুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে তাহার পূর্ব্বক্ষমতা বজায় রাখা আর সম্ভব হইল না। চতুর্দ্দিকে অশান্তি সৃষ্টি হইতে লাগিল—পৃথিবীর সুদূরপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলিতে পর্য্যন্ত দেখা দিল গণজাগরণ। মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

উপক্রম করিতে লাগিল। যুদ্ধকালে মিঃ চার্চিল বৃটিশজাতিকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, বৃটিশ-সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া করিয়া দিবার জন্ত তিনি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই। যুদ্ধশেষে কিন্তু তাঁহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৃটিশ-সাম্রাজ্য দেউলিয়া হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে কারাগারে থাকা অবস্থাতেই যে মাসে মহাত্মা গান্ধী অনশন সুরু করেন এবং তখন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি মুশলিম লীগের সভাপতি জনাব মহম্মদ আলি জিন্নার সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান উদ্দেশ্যে কয়েকদিনব্যাপী আলোচনা চালাইলেন, কিন্তু তাহা সফল হইল না।

১৯৪৫ সালের নির্বাচনে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে শ্রমিকদল বিপুল সংখ্যায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং ভারতীয় সমস্তার সমাধানকল্পে তাঁহাদের মধ্যে খানিকটা আন্তরিকতা দেখা দেয়। ঐ বৎসরের ১৫ই জুন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে ভারতীয় সমস্তার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত ঐ সময় সিমলায় এক নেতৃ-সম্মেলন আহ্বান করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সম্মেলনে যোগদান করিতে সিদ্ধান্ত করেন।

কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ এবং অন্তান্ত আরও কয়েকজন নেতা লইয়া বড়লাটের সভাপতিত্বে ২৫শে জুন হইতে সিমলায় বৈঠক সুরু হইল; কিন্তু বৈঠক শেষ পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ হইল না—কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে লীগ ও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মতানৈক্যের ফলে ১৪ই জুলাই বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল। এক কথায় বলিতে গেলে, সিমলা-সম্মেলনে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা রহিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান মুশলিম লীগের হাতে।

কিন্তু বৈঠক ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই সমস্তার সমাধান হইল না। সমগ্র ভারতে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছিল, যাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কোটি কোটি লোকের অসহযোগিতা ও বিরুদ্ধ মনোভাব লাভ করিয়া একটা বিরাট দেশকে কেবলমাত্র সৈন্ত সাহায্যে শাসন করিতে গেলে যে বিপুল ব্যয় বহন করিতে হয়, তাহা সঙ্কুলান করিবার শক্তি মহাযুদ্ধবিধ্বস্ত বৃটেনের ছিল না। সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই চিরদিনের মত সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু-সময় নির্দ্দেশ করিতেছিল। অধীন ভারত অপেক্ষা স্বয়ং-শাসিত বন্ধুভাবাপন্ন স্বাধীন ভারত যে পরোক্ষে বৃটেনের শক্তি যোগাইতে পারে, তাহা ইংলণ্ডের বিচক্ষণ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ক্রমশঃ উপলব্ধি করিলেন। স্বেচ্ছায় চুক্তির দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর করিলে ভারতে বৃটেনের বাণিজ্য ও ব্যবসায় স্বার্থও বজায় থাকার সম্ভাবনা, সুতরাং ভারতীয় সমস্তা লইয়া তাঁহারা যথেষ্ট মাথা ঘামাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদ তাহার মরণ কামড় দিতে কসুর করিল না। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের যে সকল সৈন্ত ও সেনাধ্যক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিলেন অথবা ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনকে কয়েক দফায় দিল্লীর লাল কেল্লায় সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করিয়া ১৯৪৫ সালের শেষ দিক হইতে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তাঁহাদের বিচার সুরু হইল। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের গৌরবজনক কার্য্যকলাপের বিষয় ভারতবাসিগণ যুদ্ধের সমাপ্তির পর বিশেষভাবে জানিতে পারেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা এই সময় যথেষ্ট অনুপ্রাণিতও হন। নেতাজীর প্রিয় সহকর্মিগণের এই ভাবে বিচার-ব্যবস্থা হওয়ায় ভারতের জনমত অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং চতুর্দ্দিক হইতে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ত্তারা কিন্তু তাঁহাদের জিদ ত্যাগ করিলেন না—নীতির দোহাই দিয়া বিচার-কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অভিযুক্ত সেনাধ্যক্ষগণের পক্ষ সমর্থনের জন্ত একটি কমিটি গঠিত হয় এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ভুলাভাই দেশাই, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, জনাব আসফ আলি ও ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন।

দিল্লীর লাল কেল্লায় সামরিক আদালতে বিচার-প্রহসন চলিতে লাগিল। কাহারও কাহারও গুরুতর দণ্ডবিধান করিয়া পরে আবার সেই দণ্ড মকুব করা হইল—কাহারও কাহারও দণ্ড বজায় রাখা হইল। সমগ্র ভারতে নানা স্থানে এই ভাবে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সেনানীবৃন্দের বিচার এবং তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই উপলক্ষে কোথাও কোথাও গুলিও চলিল এবং কেহ কেহ আহত ও নিহত হইলেন। সমগ্র ভারত আবার যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কিন্তু আঘাত দিতে গিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও এক প্রচণ্ড আঘাত পাইলেন। সেই আঘাত হইল ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত নৌ-বিদ্রোহ।

(আগামীবারে সমাপ্য)

বার্জ-হত্যা প্রসঙ্গে গত চৈত্র সংখ্যা ভারতবর্ষ-এ অনবধানতা বশতঃ একটু ভুল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে যামিনীজীবন ঘোষ মহাশয়ের কোনও পুত্রই পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি প্রদান করেন নাই বা রাজসাক্ষীও হন নাই। রাজসাক্ষী হইয়াছিলেন অপর এক ব্যক্তি। উক্ত বিবরণ অনবধানতাবশতঃ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা দুঃখিত।—লেখক

সুইজারল্যাণ্ড

শ্রীচিত্রিতা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ছুটীর দিন ফুরিয়ে এল। এখন চলেছি ইণ্টারলেকেনে। সেখান থেকে 'যংফ্রাউ'র বিশাল তুষারবক্ষে আরোহণ করব—আর তারপর? —ফিরে যেতে হবে—মহাদেশ থেকে লণ্ডনে, আর লণ্ডন থেকে কলকাতায়। রাস্তা উঠেছে খোঁপার কাঁটার মত বেঁকে। পাশ দিয়ে হুহু করে ছুটে যায় গাড়ী, আর যেসব গাড়ীতে G. B. মার্কা তাদের ভিতর থেকে একটা উল্লাসধ্বনির সঙ্গে রুমাল উড়তে দেখা যায়। সমপথযাত্রীদের পরস্পরের প্রতি এই সোল্লাস-স্বীকৃতি বেশ লাগে। 'জুলিয়ান,' 'ওবরল্প' আর সাস্' তিনটী পাস পার হতে হবে। আহা কেন যে এগুলোকে পাস্ বলা হয়। চমৎকার চওড়া রাস্তার পাশে ফলকের পরে নাম আছে লেখা। হয়ত কোনকালে দুই দুরধিগম্য শিখরচূড়ার মাঝে ছোট্ট একটু সরুপথের চিহ্ন ছিল। আজও সেই পথ সেই দূরকালের নামের স্মৃতি বহন করে আসছে। আল্পসের এই শ্রেণী সাত হাজার ফুটের বেশী উঁচু নয়—তবু বরফ-ঝরা ঘাসের রঙে কেমন একটা মৃত পাণ্ডুরতা। গাছগুলিতে কিন্তু বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। এর উপরের স্তরের আল্পস বৃক্ষহীন চিরতুহিনাবৃত। অদ্ভুত এই ছোট্ট দেশটী—যেন পুরোপুরি একটা ছোট ইয়োরোপ। ইয়োরোপের প্রধান তিনটী ভাষাই এখানে চলে—ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালীয়ান। ইয়োরোপে যতরকম আবহাওয়া সম্ভব, সব এখানে আছে। এদেশের 'লাগো' প্রভৃতি জায়গায় মধ্যসাগরতীরসম্মত চিরবসন্তকাল। সেখানে ভুট্টা আর গমের ক্ষেত, পাম গাছের সারি আর চেষ্টনাটের ছায়া, আর আঙুরলতার কুঞ্জ। আবার ন' দশ হাজার ফুট উপরে, জলহীন, বৃক্ষহীন, অনন্ত তুষার মরু। আর এই তিন হাজার থেকে ৬।৭ হাজার ফুটের মধ্যে, যত পাইনগাছের মেলা, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে সবুজ ঘাসের সমারোহ। এইখানেই বেশীরভাগ গ্রাম ও সহর,—যত চাষীদের বাস। আস্তাবল ও গোয়ালের উপরতলায় তাদের মোটা মোটা কাঠের কুটীর লতাকুঞ্জ দিয়ে ঢাকা। কাঠের খুঁটিগুলোতে ঝুলছে অর্কিড্ কিম্বা জিরেনিয়ামের গুচ্ছ। এখানকার মেয়েরা ছোট ছোট তাঁতে কত পশমের কম্বল, রেশমের নক্সাকাটা চাদর, খদ্দরের মত মোটাসূতোর বেডকভার তৈরী করে। আর তার ওপরে করে অসংখ্যরকম ছুঁচের কাজ। সে কাজগুলির সঙ্গে আমাদের শিল্পী হাতের কাজের আশ্চর্য্য মিল, যেমন কল্কা অথবা পদ্মলতার মত লতা। সুসার্ণে একটা দোকানের কাঁচের জানলায়, ঝুলছিল একটা চাদর। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম সে দোকানে, কী আশ্চর্য্য ভারতের কুটীর শিল্প এতদূরে রপ্তানি হয়?—উত্তর এল—না'না' সুইসদেরের হাতের তৈরী এই চাদর।

ইণ্টারলেকেন হচ্ছে আমেরিকাও ইংলণ্ডের পোষা জায়গা। কোন হোটেলে তিলধারণের স্থান নেই—ভাগ্যে আমাদের আগে থেকেই জায়গা ঠিক করা ছিল। হোটেলে ঢুকে দাম শুনে যদিও মুখ শুকিয়ে আসে, তবু এ একেবারে বুর্জোয়া ব্যাপার, যাকে বলে। টুরিষ্টদের আড্ডা তাই, জায়গাটা অসংখ্য ছোট ছোট দোকানে ভর্ত্তি। আর কি সুন্দর সব খেলনা, কাঠের কত ছোট খাট জিনিষ, কাশ্মীরের মত নক্সাকাটা, আর তার সঙ্গে বিলিতী মিস্ত্রীর যান্ত্রিক বুদ্ধি মিলেছে। ছোট্ট একটা চাষবাড়ী, আল্পনা আঁকা, কাগজের রঙীণ ফুল ঝুলছে।

সুইজারল্যাণ্ডের ছেলে-মেয়ে
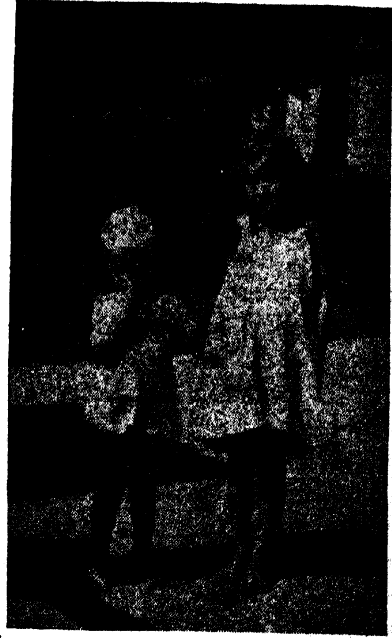
পাশেই একটা বোতাম টিপলে বাড়ীর ছাদটা খুলে গেল, ওমা! একটা বাক্স—তাতে চকোলেট ভর্ত্তি—আর ভেতর থেকে মিষ্টি একটা সুর জলতরঙ্গের মত বাজছে। প্রায় সব বাড়ীতেই একটা করে 'কুকু' ঘড়ি আছে—খুকুকে সবাই ডেকে নিয়ে যায় তাদের ঘরে, দেখ আমাদের ঘড়ি তোমার নাম ধরে ডাকে। কত অজস্ররকম ঘড়ি, আর তাতে কত বিচিত্র কলকৌশল। কোন ঘড়িতে কোকিল এসে কুহুধ্বনি করে ঘণ্টা বাজিয়ে যায়, কোনটায় টুপিমাথায় হাঁস এসে ড্রাম বাজিয়ে যায়। খুকু তো ঘড়ির কেরামতি দেখে একেবারে 'থ'। খুকুর

বাব্যারও সেই দশা এদের বৈদ্যুতিক কেরামতি দেখে। সমস্ত দেশ থেকে কয়লার ট্রেণ তুলে দিয়েছে,—সর্ব্বত্র ইলেকট্রিক। পাহাড়ের গা বেয়ে একেবারে সোজা এরা ট্রেণটাকে তুলে দেয় অনেক সময়। পাশাপাশি দুটো লাইন পাতা থাকে—লিফটের নিয়মে দুটো ট্রেণ পরস্পরের ভারে ওঠানামা করে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে এরা ইয়োরোপের কোন জাতের চেয়ে কম নয়। হাসপাতালগুলির ব্যবস্থা আধুনিকতম। অর্থাৎ লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর মিলনসাধনের তপস্যায় এরা রত। জ্ঞানসকারের দ্বারা ধনসঞ্চয় করে। সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বপ্ন এরা কখনো দেখেনি, তাই এতকাল ধরে শান্তিতে আছে। শোনা গেল সপ্তদশ শতাব্দীতে এদের শেষ গৃহযুদ্ধ হয়।—ওই যে যুদ্ধের ঝড় ইয়োরোপের বুকের উপর দুবার প্রলয়তাণ্ডবে বয়ে গেল, এদেশের গায়ে আঁচড়টী

সুড়ঙ্গ পথে

লাগল না। এরা ছিল রেডক্রসের ভার নিয়ে। দুপক্ষের আহতদেরই সেবা করেছে। লীগ অবনেশনের সম্মিলন বসত এখানেই জেনিভায়। যুদ্ধে শক্তিক্ষয় না করে সবটা শক্তি প্রয়োগ করেছে দেশটাকে গড়ে তুলতে। সেইজন্তে দেশের প্রকৃত অংশ ফসলধারণের অনুপযুক্ত হলেও এরা নানাদিকে নিজেদের বিকশিত করে', দেশের ঐশ্বর্য্য আহরণ করে। বিদ্যুৎ এদের বাঁধা চাকর। আবার তা সত্ত্বেও ছোটগ্রামের নিভৃত কুটীরে, মেয়ের হাতে চলছে তাঁত, কাঠের টুকরোয় ফুলপাতা এঁকে শিল্পী গড়ছে খেলনা। এখানের দোকানে বাজারে সর্ব্বত্র ইংলণ্ডের মত সস্তা রঙের প্লাষ্টিকের সমারোহ দেখলাম না। সাবেক কালের কাঠের খেলনায় ভদ্ররুচির পরিচয় আছে। বিদ্যুৎকে খাটাচ্ছে অসংখ্য কাজে। এ জন্তে যে শক্তির প্রয়োজন, মহাদেব তাঁর জটা থেকে অজস্র ঝরণা-ধারায় অবিশ্রাম সে শক্তি এদের প্রতি বর্ষণ করছেন। প্রকৃতির জলরাশিকে বাঁধ বেঁধে এরা সঞ্চয় করে রেখেছে শক্তির ভাণ্ডার। বেশীর ভাগ কারখানাই জলের ধারে তৈরী। কিন্তু এমন পরিষ্কার পরিপাটী ধোঁয়া বর্জ্জিত সুঠাম ছাঁচের তৈরী যে, প্রকৃতির পরে মানুষের হাতের ছাপ পড়েছে বোঝা গেলেও সৌন্দর্য্যের হানি হয় না। লম্বা বারান্দার এককোণে বেতের কৌচে হেলান দিয়ে ভাবছি এই অদ্ভুত সুন্দর দেশটার কথা, ইয়োরোপের ভূস্বর্গ যাকে বলে, হঠাৎ চমকে উঠি গলার স্বরে—"ক্ষমা কর মাদাম, প্রসারিত হাতে মাথা নত করে বাউ করেন, হোটেল কর্ত্তৃপক্ষের কেউ একজন,—"কাল ভোর সাতটার ট্রেণ তোমাদের যংফ্রাউ নিয়ে যাবে। ৬টার সময়ে তোমাদের ব্রেকফাষ্ট, আর প্যাকেটে করে কিছু লাঞ্চ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে এখন ঘুমতে যাওয়াই সঙ্গত—কাল উঠতে হবে ভোরে।

দু তিনবার ক্ষুদ্রতর ট্রেণ বদল করে করে তুষার চূড়ার পাদমূলে যখন পৌঁছলাম, বেলা দশটা বেজে গেছে। বরফের উপর দিয়ে লাইন নিতে পারেনা, তাই নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে। সাড়ে চার মাইল দীর্ঘ এই সুড়ঙ্গ পথে ট্রেণ চলেছে বিদ্যুতে। মাঝে মাঝে মোটা কাঁচের কেবিন হোলের মতন গোল জানলা। কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে একটু আধটু।" একটা যায়গার ট্রেণ থামালে আমাদের দেখবার জন্তে। অবাক কাণ্ড। অন্ধকারের ফুটোর মধ্যে দিয়ে আলাদীনের ঐশ্বর্য্য ঝিকমিক্ করে উঠল। রোদ পড়ে জ্বলছে রূপোর পাহাড়। বাইরে জ্বলন্ত সাদা, ভিতরে অন্ধকার কালো। টানেল এসে শেষ হয় ছোট একটা পাতাল ষ্টেশনে। পাতালের ওপরে আছে বরফের স্বর্গ, আর তারো উপরে আছে ইয়োরোপের ধ্যানমন্দির ছোট একটী রেস্তোঁরা।

আশ্চর্য্য—রূপ,—এমন যে দেখা যায় ভাবতে পারি নি। হিমালয়ের তুষার চূড়া দেখা হয়ত ভাগ্যে ঘটে উঠবে না—তার অনুজকে তো দেখে নিলাম। যেদিকে তাকাও ধূ ধূ করছে সাদা—ঝরণা নেই, হ্রদ নেই, সবুজের লেশমাত্র নেই—যতদূর তাকাও কোথাও জন বসতির চিহ্নমাত্র নেই।—শুধু তরঙ্গায়িত বরফের মরুভূমি। পাহাড়ের মাথাগুলি ঢেকে ঢেকে গা বেয়ে নেমে নদীর আকারে দূরে মিলিয়েছে। শুভ্র কঠিন মুক্তার মত এই ৫।৬শ ফিট গভীর জমাট নদীকেই বলে গ্লেশিয়ার। বরফের উপরে কাঠের টুল গর্ত্ত করে ঢুকিয়ে বসে পিক্‌নিক চলছে—কুকুরের গাড়ী চড়ে বেড়ানোও চলছে। অদ্ভুত এই ইয়োরোপীয় জাত—কখনো চুপ করে থাকতে জানে না।

মহামৌনের মাঝখানে দাঁড়িয়েও সমানে চলেছে হো হো। হোটেলের আরামকক্ষে যেমন ব্যবহার চলে এখানেও কি তার একটু ব্যতিক্রম হবে না। ওই যে শুভ্র তুষার চূড়ায় বিরাটের নির্ব্বাক ইঙ্গিত—একি একেই অর্থহীন এদের কাছে—এত ব্যর্থ? আমার সমস্ত শরীর এদের কাছে থেকে দূরে যাবার জন্তে উন্মুখ হয়ে উঠল। গাইডকে ইসারা করে এগিয়ে চলি—একটু দূরে নিয়ে চল আর একটু—ওই নিমেষের দাঁড়িয় গতি

পেরিয়ে আর একটু দূরে—যেখান থেকে ওদের কলকোলাহল কানে আসবে না—স্তব্ধতার গভীর ব্যঞ্জনা আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে ধরবে—ঐ ওখানে। "যেওনা যেওনা মা" খুকু চেঁচিয়ে ওঠে—উল্লসিত কলরবে সবাই এল এগিয়ে।—উপদেশ দেবার এমন সুযোগ ছাড়ে কে। সকলের সমবেত পরামর্শ আমার কানের মধ্যে স্লেটের উপর ছুরির আঁচড়ের মত কর্কশ সুরে বাজতে থাকে। এই উল্টো বিপত্তি দেখে থমকে দাঁড়ালাম। আমার অসহায় বিপন্ন মুখ দেখে গাইডের মনে দয়া হোল। সে অনেক লোককে নিয়ে এসেছে—দৈবাৎ তার মধ্যে ভাবপ্রবণ লোকও ছিল—সে বললে,—"তার চেয়ে চল তুমি অবজারভেটরীর উপরে গিয়ে বসবে—সেখান থেকে আরো ভাল দেখতে পাবে। এখানে আর এগোনো, যাকে বলে বিপজ্জনক। কারণ একে তো আগে থেকে পথ ঠিক করা হয়নি, তায় আবার বিকেল হয়ে আসছে। ওখানে যাবার সময় হচ্ছে সকাল ৯টা ১০টার মধ্যে। আর তোমার পোষাকও উপযুক্ত নয়। এখানে মাঝে মাঝে ফাটল ধরে, হঠাৎ তার মধ্যে পড়ে গেলে অনন্ত কবর।" "আচ্ছা এই গ্লেশিয়ার নাকি সরে সরে যায়—এ চলে?"—"হাঁ চলে বই কী। অতি ধীর-অবোধ একটা চলা, দেখে বোঝা যায় না, তবু এ যাত্রার বিরাম নেই। একটু একটু ক্রমে চিরকাল ধরে চলে।—একটা অদ্ভুত গল্প শোন, গাইড বল্লে,—"গত শতাব্দীর প্রথম দিকে একদল লোক আল্পস্ এক্সপীডিশনে আসে।" সবাই ঘনীভূত হয়ে দাঁড়ায় গাইডের চার-পাশে।—চীনে সাদার উপরে ভুষো কালির আঁচড়ের মত, ভূতনাথের পাশে তার প্রেতসঙ্গীদের মত আমরা দাঁড়িয়ে গল্প শুনি। "সেই দলে একই গাঁয়ের পথপ্রদর্শক ছিল জন কয়েক," গাইড বলে, "পাইক পুঁতে পুঁতে, দড়ি দিয়ে নিজেদের বেঁধে বেঁধে তারা এগোচ্ছিল—হঠাৎ ভীষণ গর্জ্জন করে দুফাঁক হয়ে গেল পায়ের নীচের হিমরাশি—ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হোল তার ভিতর থেকে বড় বড় বরফের খণ্ড, নিমেষের মধ্যে তিনটী গাইড তলিয়ে গেল। তাদের অন্য বন্ধুটী গ্লেশিয়ারের এই স্পর্দ্ধিত ঠাট্টার উত্তর দিতে নেমে গেল সেই ফাটল পথে কোমরে দড়ি ও মুখে গ্যাসের থলি বেঁধে, ফাটল এঁকে বেঁকে চিড় খেয়ে খেয়ে নেমে গেছে কোন গম্ভীর পাতালপুরীতে। ৩০০ ফুট গিয়েও যখন কিছু পাওয়া গেল না, সে ফিরে এল পরাজিত হয়ে। বৈজ্ঞানিক তখন বিচার করে বল্লেন, গ্লেসিয়ারের চলা যদি সত্য হয় তবে ৪০ বছর পরে পাহাড়ের নীচে এ ফিরিয়ে দেবে চোরাই মাল। ঠিক একচল্লিশ বছর পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সেখানে পড়ে আছে তিনটী নরকপাল, কয়েকগুচ্ছ কাল ও সোনালী চুল, কয়েক টুকরো জামা কাপড় ও একটী নিটোল শুভ্র হাত। বন্ধু এল সনাক্ত করতে, ছোটবেলায় বন্ধু প্রীতি ভরে যে হাতে কতবার করমর্দ্দন করেছে হঠাৎ সেই একটি পরিপুষ্ট বিচ্ছিন্ন হাত দেখে কথা সরল না মুখে। পৃথিবী যাকে ভুলে গেছে, বরফ তার হিমশীতল বুকে তাকে তেমনি নবীন করে রেখেছে। বৃদ্ধ বন্ধু একবার তার লোলচর্ম কুঞ্চিত হাতের দিকে আর একবার মৃত্যুঞ্জয় সেই যৌবন সুঠাম হাতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে এল।" অজ্ঞাত লোকদের গল্পে ভারী হয়ে এল হাওয়া। সবাই চুপ করে এগিয়ে চলেছে। খুকুর চিত্ত ওদের চেয়েও হালকা—সে বলে আইস প্যালেস দেখব আগে—আমি তাদের অবজারভেটরীর উপরে যাই।" আরে বাবা—আইসপ্যালেসটা চট্ করে একবার দেখে নিয়ে, ওখানে গিয়ে যতক্ষণ খুসী বোস," খুকুর বাবা [illegible] সামলান। বরফের পাহাড় কেটে গুহার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রাসাদ তৈরী করেছে। বিশাল নাচঘর, থাম দিয়ে ঘেরা, কোণে কোণে তুষারের বেদীতে তুষারের ফুলদানী। তাতে একগুচ্ছ তাজা ফুল। বরফের আলোদানে ইলেক্‌ট্রিক বাতী। তাতে কোথাও লাল, কোথাও বা নীল আলো স্বপ্নজাল মেলেছে—এ কোন যাদুকরের দেশ।

অবজারভেটরীর ছাতের উপরে বসে আছি—নীচে, উপরে চারিপাশে যতদূর চাও, ধূ ধূ করছে বরফ, জ্বলছে সূর্য্যের আলোয়, একএকদিকে তাকানো যায় না। তীক্ষ্ণ সাদার ধার ছুরির ফলার মত বিঁধছে চোখে।

একটি বাড়ির নক্সা দেওয়াল

বসে থাকতে থাকতে কেমন যেন লাগে। মন কেমন করা অদ্ভুত এক অনু-ভূতির আস্বাদে আচ্ছন্ন হয়েছে সত্বা। আমি যে আমি, সে কথা একেবারে ভুলে গেছি। এই যে আমি এখনি নীচে গিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে কলরব করতে করতে ট্রেণে চড়ব, ফিরে গিয়ে ডিনার খাব, এ আমি কোথায় দূরে সরে গেছে।—আর এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল তুষাররাশির দিকে তাকিয়ে আছে আমার এক অপরিচিত সত্বা। শুধু তাকিয়ে থাকা—কিছু ভাষা নয়, হাসি নয়, শুধু চোখ দিয়ে অনুভব করা। একেই কি বলে তুষারের মায়া। আলসের মোহমন্ত্র সমস্ত চেতনা ঢেকে ছায়া ফেলে। ধীরে ধীরে বদলে আসে সব। ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ সাদা নরম হয়ে আসে নানা রঙের বর্ণিকাভঙ্গে। আরে দেখতে দেখতে একী! এ যে সোনা, একেবারে সোনা। কঠিন স্বর্ণের স্তূপে আগুন লেগেছে যেন। আর তারি খাঁজে খাঁজে চূড়ায় চূড়ায়, রামধনুর বিচিত্র লীলা।—এ কি এ—? একি এই পৃথিবীর?, এই যে পৃথিবীতে আমরা সকাল থেকে রাত অবধি

কাটিয়ে দিই।—সেকি, যেতে হবে? এত শীঘ্র? আর দেরী নেই, ট্রেণের সময় হয়েছে। হ্যাঁ যেতে হবেই। এমনি সর্ব্বদাই যেতে হয়, ভাল জিনিষ বেশীক্ষণ থাকে না। সুখই ক্ষণিক, দুঃখ অনন্ত। বার বার চোখ বুজে মনের মধ্যে গভীরভাবে এঁকে নিতে চাই ছবি, চোখ খুললেই অপরূপের রূপের মধ্যে মিলিয়ে যায়। ধ্যানের দৃষ্টি আমার নেই, যাকে চোখে দেখলাম, তাকে মনের মধ্যে তেমন করে বরণ করে নিতে পারি কই। সুন্দরকে দেখতে হয় শুধু চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে। সেই অনুভবের মন কি আমাদের আছে? কুয়াশা ঢাকা মনের আকাশে তেমন করে ফুটে ওঠে না সেই ছবি—অব্যক্ত বেদনায় মূক হয়ে যায় মন—ধীরে উঠে আসি—ফিরে যেতে হয় প্রত্যহের পৃথিবীতে। ক্ষণিকের স্বপ্ন দূরে যায়। কোন মন্ত্র বলে নেমে এসেছিল পাহাড় চূড়ার স্বর্গ এই মরদৃষ্টির সীমানায় আবার গেল মিলিয়ে।

দুইটী বটগাছের কথা

যমদত্ত লিখিত

ইংরাজী ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধজয়ের পর লর্ড ক্লাইব (তখন অবশ্য তিনি লর্ড উপাধি পায়েন নাই; সর্ব্ব সাধারণে কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব বলিয়া পরিচিত ছিলেন) বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নূতন সুবেদার নবাব বাহাদুর মীরজাফর আলি খাঁয়ের নিকট হইতে যে চব্বিশটী পরগণার জমীদারী সনদ্ লাভ করেন তাহা হইতেই বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জেলার উৎপত্তি। রবার্ট ক্লাইব যে ২৪টী পরগণা পাইয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ অন্য জেলায় চলিয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য জেলারও কতক কতক অংশ বর্ত্তমানের ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারত বিভাগের ফলে যশোহর জেলার দুইটী থানা, যথা :— বনগাঁ ও গাইঘাটা, ২৪ পরগণা জেলার সহিত যুক্ত হইয়াছে।

লর্ড ক্লাইব যে ২৪ পরগণার সনদ পাইয়াছিলেন তাহার ১নং হইতে ৭৯৯নং পর্য্যন্ত তৌজীর জমাদার ছিলেন সাবর্ণি রায় চৌধুরীরা। কাল ক্রমে ইঁহাদের বহু জমীদারী স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় অন্য লোকের হাতে চলিয়া যায়। কলিকাতার সুবিখ্যাত এ্যাটর্ণী নিমাইচন্দ্র বসুর (গত একশত দেড়শত বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় একমাত্র ইনিই রাজপথে "দম্পতী-বরণ" করিতে পারিয়াছিলেন) ও কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্ব শেষ "প্লীডার" রাজেন্দ্রনাথ বসুর (ইঁহাকে একবার হাইকোর্টের জজ করিবার প্রস্তাব তখনকার প্রধান বিচারপতি Sir William Comer Petheram করিয়াছিলেন) পূর্ব্বপুরুষ মদন বসু যখন বর্দ্ধমান হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে পানিহাটী সমাজগ্রাম বলিয়া ঐ গ্রামে ভিটা পত্তন করেন; তখন অপরের জমীদারীতে বসবাস করিবেন না বলিয়া বহুগুণ পোনে ৬নং তৌজী খরিদ করেন।

পানিহাটী পূর্ব্বে কিরূপ সমাজগ্রাম ছিল সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলে আশা করি পাঠকগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজে কর বংশের স্থান উচ্চে—ইঁহাদের দুই সমাজ, পানিহাটীর কর ও বন্দীপুরের কর। শ্রীচৈতন্যদেব যখন পানিহাটীতে আসিয়াছিলেন, তখন মকরন্দ কর তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভিটা "হলদে কালিবাড়ীর" উত্তর পশ্চিম কোণায় ডাঃ রাধিকাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভিটার সামিল জায়গায় ছিল। অবিনাশচন্দ্র দত্তের পূর্ব্ব-পুরুষ শ্রীকণ্ঠ দত্ত বাংলা সন ১২০৭ কি ১২০৮ সালে পানিহাটীর শেষ করের নিকট হইতে তাঁহার ভিটা ক্রয় করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কোবালায় লিখিত থাকে যে ঠাকুর দালান কখনও ভগ্ন করিবে না। তাঁহার বংশধরেরা এই প্রতিশ্রুতি গত সন ১৩৪০ সাল অবধি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণকার অবস্থা বলিতে পারি না। পানিহাটীতে গত একশত বৎসরের মধ্যে কোনও কর বংশীয়ের সন্ধান পাই নাই।

পানিহাটীর কায়স্থ ঘোষবাবুরা কিরূপ কুলীন ও প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন তাহা দুইটী ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে। শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহার একমাত্র কন্যা কৃষ্ণভাবিনীর বিবাহ পানিহাটীর হরকালি ঘোষের সহিত দেন। আর কলিকাতার বিখ্যাত ধনী

রামদুলাল দেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষ দেবের (যিনি ছাতু বাবু নামে বিখ্যাত) বিবাহ পানিহাটী নিবাসী শম্ভুচন্দ্র ঘোষের কন্যা নবীনমণির সহিত দেন। হরকালি ঘোষের বিবাহ হয় আন্দাজ ইংরাজী ১৮০১ সালে; আর নবীনমণির বিবাহ হয় আন্দাজ ইংরাজী ১৮২০ সালে।

পানিহাটীর মিত্রেরা সুবিখ্যাত ও বহু শাখায় বিভক্ত। স্বামী বিবেকানন্দর পিতা পানিহাটীর মিত্র বাটীতে কন্যা সম্প্রদান করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলেন। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী পানিহাটীর হারাণচন্দ্র মিত্রের কন্যা। বিখ্যাত সরদ্ ও সেতার বাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ ৺উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একবার আসামে বেড়াইতে যায়েন। সেখানকার বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ যেই শুনিলেন তিনি পানিহাটীর মিত্র বংশীয় অমনি তাঁহার গলায় মাল্য ও চন্দন দিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিলেন।

এইরূপে আজ মদনবাবু ৬নং তৌজী লইলেন; কাল মণ্ডলরা অন্যান্য তৌজী অর্জ্জন করিলেন; রায় চৌধুরীদের বহু তৌজী অন্যের হস্তে চলিয়া যায়। বাংলার গবর্নর জেনারেল Warren Hastingsএর রাজস্ব ব্যবস্থার ফলেও বহু তৌজী তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। Warren Hastingsএর দেওয়ান শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এইরূপে ১৫৫।১৫৬নং প্রভৃতি বহু তৌজীর মালিক হয়েন ও মহারাজা উপাধি পায়েন। এই উপাধি দিল্লীর বাদসাহ হইতে লাট সাহেব আনাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। ইনি টালিগঞ্জের টিপু সুলতানের বংশধরদের গোঁয়ারার সহিত বুক চাপ্ড়াইতে চাপ্ড়াইতে "হাসান, হোসেন" শব্দ করিতে করিতে পদব্রজে যায়েন। ইহাতে গোঁড়া হিন্দুরা আপত্তি করাতে তিনি চৌদ্দ মাদলের কীর্ত্তনসহ শোভাবাজার রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরে যায়েন ও শ্যামসুন্দরের গলায় নীলার মালা পরাইয়া দেন।

দেওয়ান গৌরীচরণ রায় চৌধুরী পূর্ব্বে নিম্‌কির অর্থাৎ নিমক মহালের দেওয়ান ছিলেন। তিনি নিজেও সাবর্ণি রায় চৌধুরী বংশসম্ভূত। তিনি জ্ঞাতিগণের নিকট হইতে ১৭২নং হইতে ১৭৪নং প্রভৃতি বহু তৌজী খরিদ করেন ও বন্দোবস্ত লয়েন এবং কালক্রমে বিশাল দুর্গাপুর জমীদারীর মালিক হয়েন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের সময় একমাত্র বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ব্যতীত সুবে বাংলার মধ্যে অপর কোনও জমীদার এত বেশী রাজস্ব সরকারকে আদায় দিতেন না। তিনি নিজ জমীদারীভুক্ত পানিহাটী গ্রামে বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের আনাইয়া ব্রহ্মোত্তর ও জমীদারী দান করিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। ইঁহাদের নির্ম্মিত ৭ ফোঁকর বিশিষ্ট ঠাকুর দালান আজও বর্ত্তমান। সম্মুখের নাটমন্দির তিনতলা সমান উঁচু করা হয়—যাহাতে দোতালায় বা তে-তলায় বসিয়া মেয়েরা পর্দ্দার আড়াল হইতে যাত্রা, নাচ, গান, তামাসা প্রভৃতি দেখিতে পায়। বাড়ীর দেওয়াল সব ৩ ফুট করিয়া চওড়া—চোরে বা ডাকাতে সারা রাত্রি ধরিয়া সিঁদ দিলেও ফুটা করিতে পারিবে না।

দেওয়ান গৌরীচরণের দত্তক পুত্র জয়গোপাল রায় চৌধুরী বড় সৌখীন, তেজী ও ক্রিয়াবান পুরুষ ছিলেন। দেওয়ান গৌরীচরণের নিজের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি যেইদিন দুর্গাপুর তালুক অর্জ্জন করেন সেই দিনই জয়গোপালবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার মাতার অষ্টম গর্ভের পুত্র সন্তান। তাঁহার জন্মের অষ্টম দিন 'আট-কৌড়ের' আয়োজন করিতেছেন তাঁহার জেঠাইমা, অর্থাৎ দেওয়ান গৌরীচরণের স্ত্রী। এমত সময়ে হঠাৎ তাঁহার গর্ভধারিণী মা বলিলেন যে "দিদি! আমার এই ছেলেকে ধর, তোমাকে দিলাম, তুমিই ইহাকে মানুষ করিও; আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ বোধ করিতেছি; আমার ডাক আসিয়াছে—আর তোমার দেওরকে খবর দাও, যদি শেষ দেখা করিতে পারি।" বলিতে বলিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন ও অল্পক্ষণ পরেই মারা গেলেন। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল। দেওয়ান গৌরীচরণ বাড়ী ফিরিয়া সবই শুনিলেন; ভাইকে বলিলেন যে বৌ-মা ত ছেলেটীকে আমাদের দিয়াছেন, তুমি যদি মত কর ত শুভ দিন ক্ষণ দেখিয়া ইহাকে দত্তক গ্রহণ করি। ভাই প্রথমে শুক্র-বিক্রয় করিতে রাজি হয়েন নাই; পরে রাজী হয়েন কিন্তু কথা থাকে যে আবশ্যক হইলে জয়গোপাল তাঁহারও শ্রাদ্ধাদি করিবেন। দেওয়ান গৌরীচরণ ইংরাজী ১৮০১ সালে দেহরক্ষা করেন।

জয়গোপাল বাবুর সখের কথা একটা বলি; তিনি যে

ঘরে বসিতেন সেই ঘরের দেওয়ালে পক্ষের কারুকার্য্যের ভিতর কাশী, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হাতির দাঁতের উপর অঙ্কিত নানাবিধ রঙ্গীণ ছবি পাতলা অভ্রের ঢাকনি দিয়া গাঁথা ছিল। সমগ্র রামায়ণ ছবিতে দেখান ছিল। আর কাছারী বাড়ীর দেওয়ালে শথানেক হাতির দাঁতের বাঁট দেওয়া তরবারী, অসি ও সোনালী গুল্ দেওয়া গণ্ডারের চামড়ার ঢাল ঝুলিত। বসিবার আসনের পিছনে কয়েকটী কারুকার্য্য খচিত বন্দুক ও একটী বড় "কড়া-বীন্" (carabine) ছিল। বাড়ীর ছাদের ওপর 'হুড়ুম-গান' ছিল। গঙ্গার এপার হইতে ছুঁড়িলে ওপারে গিয়া গুলি বা ছট্‌রা পড়িত।

একবার সেকালের বিখ্যাত ডাকাত ভজহরি সর্দ্দার ওরফে ভজুয়া সর্দ্দার কোন্নগরের মিত্রবাবুদের বাটীতে চিঠি দিয়া ডাকাতি করিতে আসিলে খুব লাঠালাঠি সোর-গোল হয়। জয়গোপালবাবু তাহা শুনিতে পাইয়া নিজ হাতে তাগ্ করিয়া "কড়া-বীন্" বা "হুড়ুম-গান" ছুঁড়েন। জয়গোপালবাবুর গুলির আঘাতে ভজহরির বাঁ হাত ভাঙ্গিয়া যায়—ভজহরি নিজের দলবল লইয়া পলায়ন করেন। ভজহরি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল যে সালখিয়াতে (হাবড়ার সন্নিকট—কলিকাতা হাটখোলার আড়পার) ডাকাতি করিতে গিয়া হাটখোলার দত্তবাবুদের কড়াবীনের "পেরেক-লাল্" দেখে-ছিলাম; আর আমার ডান হাত (তাহার একমাত্র পুত্র নরহরি—নরহরি তরবারির এক কোপে মহিষের মাথা উড়াইতে পারিত; নিত্য ২॥ সের চাউলের ভাত খাইত) হারাইয়াছিলাম;—আর আজকে বাঁ হাত গেল। ইহা ইংরাজী আন্দাজ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের কথা। মিত্রবাবুরা তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জয়গোপালবাবুকে একটী দক্ষিণাবর্ত্ত পাণি-শঙ্খ উপহার দেন। বহুদিন ইহা তাঁহার বংশে ছিল—পরে কোন জামাই ইহা চুরি করিয়া লইয়া যায়েন।

জয়গোপালবাবু পানিহাটীর বাজার স্থাপন করেন ও মালপত্র আনিবার সুবিধার জন্ত বাঁধাঘাট করিয়া দেন। ঘাট করিয়া দিলে কিরূপ সুবিধা হয় লোকের রায় চৌধুরী বাবুরা তাহা জানিতেন। পূর্ব্বে জমীদাররা নিজ নিজ এলাকায় সহজে অন্ত কাহাকেও বাঁধা ঘাট করিতে দিতেন না; কিন্তু রায় চৌধুরীবাবুদের ব্যবস্থা অন্তরূপ। কোন প্রজা বা অন্ত কেহ বাঁধা ঘাট স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেই তাঁহারা লিখিত অনুমতি দিতেন এবং এই জমীর খাজনা লইতেন না। এই জন্ত পানিহাটী গ্রামে ও রায়চৌধুরী বাবুদের এলাকায় যত বাঁধা ঘাট তত বাঁধা ঘাট—অন্ত কোনও জায়গায় নাই।

তিনি বাজার ঘাটের দুই পার্শ্বে নহবৎ-খানা করিলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সুখচরের জমীদার "রাজারা" (শোভা-বাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর) আপত্তি তুলেন যে পানিহাটীর "বাবুরা" যখন রাজা নহেন বা বাদসাহী পাঞ্জা পান নাই তখন তাঁহাদের নহবৎ-খানা গাঁথা বে-আইনী। সুখচরের "রাজারা" বহু হাব্‌সী গুণ্ডা আনিয়া একদিন নহবৎ-খানা ভাঙ্গিয়া দেন।

"রাজাদের" সুখচরে সুন্দর বাগান বাটী আছে। গঙ্গার জল বারান্দার নীচের ঘরে আপনা আপনি প্রবেশ করে—এইরূপ ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার সুবিধার জন্ত চারিদিক মার্ব্বেল পাথর দিয়া বাঁধান ও গঙ্গা স্নানের সুবিধার জন্ত লাগাও ছোট সিঁড়ি আছে। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেন; একদিন সন্ধ্যায় এক বাছুরের কাতর হাম্বা রব শুনিয়া তাঁহার মনে নির্ব্বেদ্ উপস্থিত হয়; তিনি বৃন্দাবন-বাসী হয়েন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া বাহিরে কোথাও যায়েন নাই। ভারতের তদানন্তীন বড়লাট লর্ড-লরেন্স তাঁহাকে K. C. S. I. উপাধি দেন; দরবারে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধান করেন যে রাজা রাধাকান্ত দেব কেন উপস্থিত নাই। যখন জানিতে পারিলেন যে রাজা বৃন্দাবন-বাসী হইয়াছেন এবং বৃন্দাবনের চক্ষুঃ-সীমার বাহিরে কোথাও যাইবেন না সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন তিনি বৃন্দাবনের অগ্রবনে (আগ্রায়) Special durbar করিয়া তাঁহাকে K. C. S. Iর সনদ দেন। রাজার অনুরোধে ব্রজমণ্ডলে জীব হিংসা ও গো-হত্যা লাট-সাহেব বন্ধ করিয়া দেন। এই হুকুম গোবিন্দবল্লভ পন্থের মন্ত্রীত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহাল ছিল।

যাক্ এই সব কথা। সুখচরের "রাজারা" নহবৎ-খানা ভাঙ্গিয়া দিলে জয়গোপালবাবু রাজাদের সুখচরের বাগান-বাটী লুঠ করেন ও ভাঙ্গিয়া দেন। এই বাগানে গোস্বামী

চক্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এক শালগ্রাম ছিল—তাহাও লুটিয়া লইয়া আইসেন।

বিবাদ ক্রমশঃই পাকিয়া উঠিল। উভয় পক্ষই বলবান—পুনরায় বল পরীক্ষার আয়োজন চলিতে লাগিল। একদিন সুখচর গ্রামের সীমানায় রাজারা প্রায় পাঁচ-শতাধিক লাঠিয়াল, সড়্‌কিওয়ালা, বন্দুক্‌ওয়ালা, হাব্‌সী কিরিচওয়ালা জমায়েত করিলেন। জয়গোপালবাবুও জাহাজী গোরা, শান্তিপুরের গোড়ো গোয়ালা, তুর্কী সওয়ার ও সাঁওতালী "এক কাঁড় বিধাঁই" (অর্থাৎ তীরন্দাজ) প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন। সীমানা পাহারা দিবার জন্য গোড়ো গোয়ালাদের রাখিলেন। শেষ রাত্রি হইতে রাজারা তাহাদের উপর চড়াও হইলেন; লাঠির চোটে গোয়ালারা রাজাদের হটাইতে লাগিল—এমন সময়ে ভোর হইলে বন্দুকওয়ালারা নিসানা করিয়া গোয়ালাদের দলপতিদের মারিতে লাগিল। সামসুদ্দীন বন্দুকওয়ালা এক ত্রিশূলের উপর বন্দুক রাখিয়া অব্যর্থ টীপে গোয়ালাদের মারিতেছে। তাহারা ক্রমে ক্রমে হটিয়া এখন যেখানে হরিশচন্দ্র দত্তের দেবালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বটগাছ আছে ঐ অবধি হটিয়া আসিল। ইতিমধ্যে খবর জয়গোপালবাবুর কাছে গিয়াছে—তিনি ও "নীলা-সবজি" ঘোড়ায় চড়িয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার দল এগাইয়া চলিল। হুকুম দিলেন ৫০০৲ টাকা নগদ দিবেন যে সামসুদ্দীনের মাথা আনিতে পারিবে। সামসুদ্দীন বাদসাহী ফৌজে কাজ করিয়াছিল; পানিপথের যুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল বলিয়া গর্ব্ব করিত। শ্যামা ঢুলী ঢোল ফেলিয়া দিয়া গুল্তিতে টিপ করিয়া সামসুদ্দীনের চোখ উপড়াইয়া ফেলিল। এইরূপে একের পর এক করিয়া বন্দুকওয়ালাদের চক্ষু নষ্ট করিতে লাগিল। রাজাদের দল পলাইতে লাগিল। এই সময় রায়চৌধুরীদের রণপিঞ্জন বাজিয়া উঠিল—তাঁহাদের দল ডান-কানি আক্রমণ করিয়া রাজাদের নদীর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ঢুলীরা ঢোল বাজাইতে লাগিল!—

চড়াক্ ডুম্! চড়াক্ ডুম্—দুষমনের আক্কেল গুড়ুম্।
চড়াক্ ডুম্! চড়াক্ ডুম্—ধুন্ধুমারির বড় ধুম্-বড় ধুম্॥

রাজাদের দল হটিতে লাগিল। সামসুদ্দীনকে লইয়া হটিতে লাগিল—এমন সময়ে ছিদাম ঢালি তলওয়ারের এক কোপে তাহার মাথাটা কাটিয়া ফেলিল। তাঁহারা ঠাকুরদাস বাবাজীর আখড়ার দক্ষিণ অবধি হটিয়া গেলেন। এই আখড়ার জায়গায় এখন মহেন্দ্রবাবুর ঠাকুর-বাড়ী হইয়াছে। "সাহেব-বাগানের" উত্তর-পশ্চিম কোণে যে বটগাছ আছে ঐখানে সামসুদ্দীনকে কবরস্থ করা হল। তাহার মাথাটা ছিদাম ঢালি পুরস্কার পাইবার পর গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়। জয়গোপালবাবু শ্যামা ঢুলি ও ছিদাম ঢালি দুই জনকেই ৫০০৲ টাকা করিয়া হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

এই সময়ে বারাকপুর ছাউনীতে যাইবার জন্য কলিকাতার গড়ের মাঠের কেল্লা হইতে এক রেজিমেণ্ট গোরা সৈন্য বড় রাস্তা (Barrackpore Trunk Road তখন হয় নাই—খুব সম্ভব নীলগঞ্জের রাস্তা) ধরিয়া কুচ্ করিতেছিল। সঙ্গে দুইটা কামান টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। বরাহনগর সিঁত্তির কাছে আসিয়া তাহারা "তনু" দত্তের বোম-ফাটা পুষ্করিণীর স্বাস্থ্যপ্রদ কাক-চক্ষু জল খাইবার জন্য বিশ্রাম করিতেছিল। "তনু" বাবুর বাগানে খবর আসিল যে রাজাদের সঙ্গে পানিহাটির বাবুদের ঘোরতর দাঙ্গা বাঁধিয়াছে—২০।২৫ জন ঘায়েল হইয়াছে। "তনু" বাবুর সঙ্গে কর্ণেল সাহেবের আলাপ পরিচয় ছিল—তিনি তাঁহাকে এই লড়াই থামাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। কর্ণেলও রাজি হয়েন। এক প্রহর বেলার সময় দাঙ্গার স্থলে উপস্থিত হইয়া দুই পক্ষকে থামিতে ইসারা করিলেন এবং বিবদমান দুই দলের মধ্যে দুই সারি গোরা-সৈন্য সাজাইয়া দিলেন।

পরে বিবাদ মিটাইয়া দিলেন এই সর্ত্তে—রাজারা যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন পানিহাটী গ্রামে সেইখানে একটী বটবৃক্ষ পোঁতা হইবে। কস্মিনকালে কেহ এই বটবৃক্ষ কাটিতে পারিবে না। আর রায়-চৌধুরীদের লোক সুখচর গ্রামের ভিতর যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন সেইখানে আর একটী বটবৃক্ষ পোঁতা হইবে—এই গাছও কেহ কখনও কাটিতে পারিবে না। এখনও এই বটবৃক্ষ দুইটী খোষমেজাজে বহাল তবিয়াতে বর্ত্তমান থাকিয়া সুদূর অতীতের ঘটনাবলীর সাক্ষ্য দিতেছে।

আর এই দুই বটবৃক্ষের ঠিক মাঝখানে দড়ি ফেলিয়া

সুখচর ও পানিহাটী গ্রামের সীমা নির্দ্ধারিত হইল। ভবিষ্যৎ গোলযোগ নিবারণের জন্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা একটী খাদ কাটিয়া কাঠ-কয়লা ও কড়ি দিয়া তাহা ভর্ত্তি করা হইল এবং সীমানা রক্ষায় ভার "খটিদার" অভয়চরণ চট্টোপাধ্যায়ের মাতামহ ৺——— গাঙ্গুলির হাতে দেওয়া হইল। সন ১২৭৫ সালেও রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু সীমানা বজায় আছে কিনা দেখিবার জন্য এই স্থান খনন করেন ও কাটা খাদ কাঠ-কয়লা পরিপূর্ণ দেখেন।

রাজারা কখনও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সুখচরের এই বটবৃক্ষের দক্ষিণে আসিবেন না; আর পানিহাটীর বাবুরাও তদ্রূপ পানিহাটীর বটবৃক্ষের উত্তরে আসিবেন না। উভয় পক্ষই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। বিবাদ প্রায় মিটিয়া গেল, এমন সময়ে গোল বাধাইল গোমতীচক্র ও শালগ্রাম শিলা। রাজারা ইহা ফেরৎ চাহিলেন; রায়চৌধুরীরা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বয়ং পূজার দাবি করিলেন ও বলিলেন যে তাঁহারা ঠাকুরকে অন্নভোগ দিতেছেন, ফেরৎ দিলে কায়স্থ বাটীতে তাহা হইবে না—সুতরাং ঠাকুরের কষ্ট হইবে। সুতরাং ঠাকুর তাঁহাদের কাছেই থাকুক। রাজারা ইহাতে রাজি হইলেন না, বলিলেন জয়গোপালবাবু যদি রাজাদের এলাকায় ব্রহ্মোত্তর দান গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা ঠাকুর ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন। জয়গোপালবাবু ইহাতে রাজি হইলেন না।

কর্ণেল সাহেবের খাস মুন্সীজী মিশির এই বিবাদের এক সমাধান করিয়া দিলেন। তাঁহার জানা এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এই গোমতীচক্র ও শালগ্রাম পূজার ভার পাইলেন। জয়গোপালবাবু পাটনা গ্রামে দশ বিঘা দেবোত্তর করিয়া দিলেন; রাজারা পূজার জন্য মুড়াগাছা পরগণার মধ্যে পঞ্চাশ বিঘা দেবোত্তর করিয়া দিলেন। সকল বিবাদ মিটিয়া গেল।

পানিহাটীর শেষ জমিদার জয়গোপাল রায়চৌধুরীর পৌত্র শিবচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কেও (শেষ জমীদার বলিতেছি এই জন্য যে পানিহাটীর বর্ত্তমান জমীদারগণ আর পানিহাটী গ্রামে দেওয়ান গৌরীচরণের ভিটায় বসবাস করেন না) এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে দেখিয়াছি। যখনই তিনি বাড়ীর বাহির হইতেন দুই জন চাপরাসী সঙ্গে তরবারি লইয়া যাইত। কিন্তু এই বটগাছের উত্তরে আসিলে হয় একলা, না হয় নিরস্ত্র চাপরাসী সঙ্গে লইয়া আসিতেন। আমরা একবার তর্ক করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—যে যে কারণে ও যে যে অবস্থায় এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল বর্ত্তমানে সেই সেই কারণ বা অবস্থা নাই, তিনি কেন এই dry formality বজায় রাখিতেছেন। ইহাতে তিনি বলেন যে পূর্ব্বপুরুষের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ত পরম ধর্ম্ম বটেই, আর তাঁহাদের বিষয় ভোগ করিব; কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বা দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর রক্ষা করিব না এইরূপ বে-ইমানী করা কি উচিৎ? আমরা হিন্দু—বিশেষ ব্রাহ্মণ।

চাওয়া

শ্রীহাসিরাশি দেবী

তোমার চরণ-ধ্বনি নিত্য যেন আমার অন্তরে
বাজে ক্ষণে ক্ষণে
ছায়া ঢাকা বনপথে, রৌদ্রভরা বিজন প্রান্তরে—
মৌন আবাহনে।
বসন্তের বেলা শেষে—মুঞ্জরিত পিয়াল শাখায়,
উদাসী চৈতালী হাওয়া যেন এসে ডাক দিয়ে যায়—
তোমার কণ্ঠের গানে; বরষার কেতুবনে যেন এর সুর—
আমারে উন্মনা করে;—হে সুদূর! আমার সুদূর!

তোমার নয়নপাতে নিত্যকার মুহূর্ত্ত আমার
পরিপূর্ণ হোক্—
প্রহর শেষের আলো প্রস্ফুট করুক বারবার
কিংশুক অশোক।
আমার পৃথিবী ভরা আলো আর আকাশের নীল,
তোমারই মাঝারে যেন খুঁজে পায় অনন্ত নিখিল
রূপে, রসে, গন্ধে ভরা;—বেদনায়—মিলনে—উচ্ছ্বাসে,
তোমার ইঙ্গিত যেন কাছে আসে—আরো কাছে আসে

নহে। সেন বংশীয়েরা মূলতঃ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁহারা বাংলাদেশে আগমন করেন। এই সময়ে আরও একটি কর্ণাটীয় রাজবংশ পূর্ব্বভারতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নান্যদেব নামক জনৈক কর্ণাটবাসী বীরপুরুষ মিথিলা অর্থাৎ উত্তর বিহারে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে উত্তর বিহার শাসন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মদনপাল এবং গোবিন্দপালের সময়ে কেবলমাত্র দক্ষিণ বিহারে পাল বংশীয় রাজগণের অধিকার স্বীকৃত হইত। কিন্তু প্রাচীন পাল সাম্রাজ্যের এই অতি ক্ষুদ্র অংশেও পাল অধিকার অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত ছিল না। মদনপালের সিংহাসন লাভের পূর্ব্ব হইতেই দক্ষিণ বিহারের অধিকার লইয়া পাল এবং উত্তর প্রদেশের গাহড়-বালবংশীয় রাজগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। গাহড়-বালবংশীয় পরাক্রান্ত নরপতি গোবিন্দচন্দ্রের ১১১৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ মানের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আধুনিক পাটনা অঞ্চলে ভূমিদান করিয়াছিলেন। আবার ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত তার তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং মুদ্গগিরি অর্থাৎ মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছিলেন। অবশ্য পালবংশীয় মদনপালের কতিপয় লিপি দক্ষিণ বিহারে পাওয়া গিয়াছে। উপরে আমরা যে নবাবিষ্কৃত শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছি, তদনুসারে ১১৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা ও মুঙ্গেরের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে মদনপালের অধিকার স্বীকৃত হইত। ইহা গাহড়বালদিগের সহিত সঙ্ঘর্ষে মদনপালের সাফল্য সূচিত করে। কিন্তু পরিণামে এই গাহড়বালেরাই যে দক্ষিণ বিহার হইতে পালবংশীয়দিগের শাসন উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দের সীহবর তাম্রশাসন অনুসারে গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চ্চন্দ্র (১১৭০-৯৩ খ্রীঃ) পাটনা জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই জয়চ্চন্দ্রের একখানি শিলালিপি বোধগয়াতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ ১২৪০ বিক্রমাব্দ (১১৮৩-৮৪ খ্রীঃ) কিংবা উহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। গয়া অঞ্চলে ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপালের বিগতরাজ্যের উল্লেখ এবং উহার মাত্র কয়েকবৎসর পরবর্ত্তী জয়চ্চন্দ্রের এই লিপিখানির আবিষ্কারে মনে হয়, জয়চ্চন্দ্রই গোবিন্দপালকে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এই ধারণা সত্য হইলে, গোবিন্দপাল অন্ততঃ দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

গোবিন্দপালের গয়া লিপিতে বিক্রমসংবতের উল্লেখের কারণ এই যে, এই সময়ে ঐ অঞ্চলে গাহড়বাল বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই বংশের রাজগণ রাজকীয় দলিলপত্রে ঐ সংবতের ব্যবহার করিতেন। উত্তরপ্রদেশবাসী বৌদ্ধগণও বিহারের বৌদ্ধ তীর্থগুলিতে বিক্রমসংবতের ব্যবহার প্রচলনের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মুঙ্গের জেলার পশ্চিমাঞ্চলে আবিষ্কৃত মদনপালের পূর্ব্বোল্লিখিত লিপিখানিতে শকাব্দ ব্যবহারের কারণ নির্দ্ধারণ করা সত্যই কঠিন। পূর্ব্বভারতের যে সকল লিপি ও গ্রন্থে শকাব্দের ব্যবহার দেখা যায়, তন্মধ্যে এই নবাবিষ্কৃত লিপিটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় দশমশতাব্দীতে গঙ্গবংশীয় নরপতিগণ উড়িষ্যাদেশে শকাব্দের ব্যবহার প্রচলিত করেন। দ্বাদশশতাব্দীর প্রথমভাগে গঙ্গবংশীয় রাজগণের অধিকার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ভাগীরথী নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই রূপে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সহিত শকাব্দের পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশে শকাব্দের ব্যবহার জনপ্রিয় হইবার প্রধান কারণ, ঐ দেশে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত সেনবংশের প্রতিষ্ঠা। সেনগণ স্বদেশ কর্ণাট হইতে বাংলাদেশে এই অব্দের ব্যবহার আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া বোধহয়। সেনবংশীয় নরপতিগণ রাজকীয় দলিলপত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজগণের ন্যায় রাজ্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেন; কিন্তু সেন আমলেই শকাব্দের ব্যবহার বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বল্লালসেনের অদ্ভুতসাগর ও দানসাগর গ্রন্থে শকাব্দের ব্যবহার দেখা যায়। শ্রীধরদাসকৃত সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থেও শকাব্দের তারিখ রহিয়াছে। আবার ডোম্মণপালের সুন্দরবন তাম্রশাসন (১১১৮ শকাব্দ), হরিকালদেব রণবঙ্কমল্লের ত্রিপুরা তাম্রশাসন (১১৪১ শকাব্দ), দামোদরের চট্টগ্রাম তাম্রশাসন (১১৬৫ শকাব্দ) প্রভৃতি লিপিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। এই যুগে বাংলাদেশ হইতে আসামে শকাব্দের ব্যবহার প্রচলিত হয়। ১১০৭ শকাব্দে প্রদত্ত বল্লভদেবের তাম্রশাসন এবং ১১২৭ শকাব্দের কানাই বড়শী শিলালিপি এই সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে। মিথিলায় কর্ণাটবংশের প্রতিষ্ঠা সম্ভবতঃ উত্তর-বিহারে আংশিকভাবে শকাব্দ প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ। কিন্তু বাংলা, আসাম ও উত্তরবিহারে শকাব্দের প্রচলন যে-যে কারণেই ঘটিয়া থাকুন, মুঙ্গের জেলায় আবিষ্কৃত মদনপালের লিপিটিতে উহার ব্যবহার সত্যই কিছু অস্বাভাবিক। এই লিপির বিষয়বস্তু দুইজন পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক একটি নারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা; ইহা মদনপালের কোন রাজকীয় দলিল নহে। সম্ভবতঃ ঐ দুইজন ব্রাহ্মণ মূলতঃ ভিন্ন কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহাদের স্বদেশে শকাব্দের ব্যবহার জনপ্রিয় ছিল।

রুসো

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল মনীষী ফরাসীদেশে নূতন ভাবের প্রচার করিয়া ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রুসো তাঁহাদের অন্যতম। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে ডিডেরো ও ড্যালেম্বার্ট (Diderot and D'Alembert) যে বিশ্বকোষ (Encyclopedia) প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, রুসো প্রথমে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। Diderot ও Voltaire তাঁহার বন্ধু ছিলেন, পরে মতভেদের ফলে বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। Encyclopedistগণ—প্রজ্ঞাবাদী (Rationalist) ছিলেন, যুক্তিকেই তাঁহারা সর্ববিষয়ে বিচারের মানদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রুসো যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তিকে (feeling) প্রাধান্য দিতেন। রুসো প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক ছিলেন না; কিন্তু সাহিত্য, রাজনীতি ও প্রচলিত রুচিও আচার ব্যবহারের সহিত দর্শনের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

রুসো

১৭১২ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে জেনিভা নগরে রুসো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা ফরাসী বংশীয় এবং ক্যালভিন (Calvinist) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে রুসো নিষ্ঠাবান ক্যালভিনীয়ের উপযোগী শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়া ও নৃত্যশিক্ষা দিয়া তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন। শৈশবেই রুসোর মাতার মৃত্যু হওয়ায় এক আত্মীয়া তাঁহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি একটির পরে একটি করিয়া নানা ব্যবসায়ে শিক্ষানবিসী করেন, কিন্তু কোন ব্যবসায়ই তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায়, ষোড়শ বৎসর বয়সে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া কপর্দ্দকহীন অবস্থায় ইটালী দেশের স্যাভয় প্রদেশে উপস্থিত হন। তথায় জীবিকা উপার্জনের কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, তিনি এক Catholic পাত্রীর নিকট গিয়া Catholic ধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, এবং Turin নগরে ক্যাথলিক-ধর্ম্মগ্রহণেচ্ছুদিগের শিক্ষাশ্রমে প্রেরিত হন। সেই আশ্রমে বাসকালে আশ্রমবাসী এক পাষণ্ড কর্তৃক তাঁহার উপর পাশবিক বলপ্রয়োগের এক কাহিনী রুসো তাঁহার জীবন-চরিতে বর্ণনা করিয়াছেন। আশ্রমের কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিলে, তাহারা দুর্বৃত্তের শাস্তিবিধান তো করিলেনই না, পরন্তু ঘটনাটি প্রকাশ না করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। শিক্ষা-শেষে রুসো Catholic ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু যে আশায় পৈতৃক ধর্ম্মত্যাগ, তাহা পূর্ণ হইল না। প্রভূত উপদেশও সামান্য অর্থ (২০ ফ্রাঙ্কের কিছু বেশী) দিয়া আশ্রমের অধ্যক্ষ তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কয়েক দিন ঘোরাঘুরির পরে এক পোষাকের দোকানে রুসো সহকারীর পদে নিযুক্ত হইলেন। দোকানের মালিক বিদেশে ছিলেন। তাঁহার যুবতী স্ত্রী—Madame Basle—রুসোর প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চারও হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাপার অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই দোকানের মালিক দেশে ফিরিয়া আসিলেন। রুসো কর্ম্মচ্যুত হইলেন।

ইহার পরে Madame de Vercele নামে এক মহিলা রুসোকে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করেন। তিন মাস পরে মহিলার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার একগাছি ফিতা রুসোর নিকট পাওয়া যায়। রুসো ফিতা চুরী করিয়াছিলেন, কিন্তু ধরা পড়িয়া Marion নাম্নী এক যুবতী পরিচারিকার নিকট উহা পাইয়াছেন, বলিলেন। ফলে যুবতী কর্ম্মচ্যুত হইল। এই মিথ্যা অভিযোগের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া রুসো লিখিয়াছেন, যুবতীকে তিনি ভালবাসিতেন এবং তাহার কথা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত। আপনার দোষক্ষালনের উপায় যখন চিন্তা করিতেছিলেন, তখন যুবতীর কথা মনে হইল, এবং বিবেচনা না করিয়াই তিনি তাহার নাম করিলেন। অদ্ভুত ব্যাখ্যা !! অভিযোগ শুনিয়া যুবতী কাতর দৃষ্টিতে রুসোর দিকে চাহিয়াছিল, একটি নির্দ্দোষ বালিকার সর্ব্বনাশ না করিতে তাহাকে অনুনয় করিয়া বলিয়াছিল; কিন্তু রুসোর ভালবাসা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। এই হীন কার্য্যের জন্য রুসো চিরকাল অনুতপ্ত ছিলেন।

ইহার পরে Turin ত্যাগ করিয়া রুসো Annecy নগরে গমন করিলেন। সেখানে madame de Warrens তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভবা এই মহিলা স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া Annecy নগরে বাস করিতেছিলেন, পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া Catholic ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং Savoyএর রাজার নিকট হইতে বাৎসরিক ১৫০০ লিভার বৃত্তি পাইতেছিলেন। নয় বৎসর রুসো এই মহিলার সহিত বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তিনি "মা" বলিয়া ডাকিতেন, কিন্তু তাহার সহিত তাহার যে অবৈধ সংসর্গ ছিল, তাহা তিনি লিখিয়াছেন। Grossi নামে মহিলার এক কর্ম্মচারী ছিলেন। মহিলা Grossi ও রুসো উভয়েরই শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন। Grossiর মৃত্যু হইলে তিনি আর একজনকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করেন। মর্ম্মাহত হইয়া রুসো তখন অন্যত্র চলিয়া যান। (১৭৪১)।

রুসোকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, তিনি যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে পারেন তাহার জন্য, Madame de Warrens অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রুসোর ইচ্ছাশক্তির দুর্ব্বলতার জন্য কোনও চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয় নাই। কেহই তাহাকে কোনও কর্ম্মের উপযুক্ত মনে করে নাই। অস্থিরচিত্ত, অলস ও স্বপ্নাতুর প্রকৃতির জন্য কোন কার্য্যেই রুসো সফলতা লাভে সমর্থ হন নাই। ভবিষ্যতের জন্য তাহার কোনও চিন্তাই ছিল না; উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা তিনি কখনও অনুভব করিতেন না; বেশী কিছু তিনি চাহিতেন না, কোনও প্রকারে শান্তিতে থাকিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইতেন। অভাবের তাড়না না থাকিলেও যৌন-লিপ্সা প্রবল ছিল এবং জীবনে একাধিক স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ সংসর্গ তাহার সংঘটিত হইয়াছিল।

Madame de Warrensএর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিন বৎসর রুসো তাহার সহিত চারমের (Charmettes) নামক পল্লীগ্রামে এক মনোরম গৃহে বাস করিয়াছিলেন। এই তিন বৎসর তাঁহার নিরতিশয় সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে নানা বিষয়ে গ্রন্থপাঠ করিয়া তিনি জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যয়নের কোনও সুচিন্তিত প্রণালী না থাকায় ইচ্ছানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। Voltaireএর Letters Philosophique তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। Montaine, La Bruyere, Boyle, Bossuetএর গ্রন্থও যত্নের সহিত পড়িয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে Locke's Essay, Malebranche, Leibnitz, Descartes, Logic of Port Royal প্রভৃতি পড়িয়াছিলেন। দর্শনের পরে শারীর বিদ্যা (anatomy), জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতিষ ও লাটিন ভাষার চর্চ্চাও করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন প্রণালী সম্বন্ধে তিনি তাঁহার জীবনচরিতে লিখিয়াছেন: "এই সময়ে আমার ভ্রান্ত ধারণা ছিল, যে কোনও গ্রন্থ পড়িয়া লাভবান হইতে হইলে, তাহা বুঝিবার জন্য যে যে বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক, সেই সেই বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। তখন জানিতাম না, যে এই প্রকার জ্ঞান অনেক সময় গ্রন্থকারদিগেরও থাকে না। তাঁহারা প্রয়োজনমত অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন। আমার ভ্রান্ত ধারণার ফলে পাঠে অগ্রগতি বিলম্বিত হইত। প্রত্যেক গ্রন্থেই পদে পদে পাঠ স্থগিত করিয়া গ্রন্থান্তর হইতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া স্থগিত পাঠ আরম্ভ করিতে হইত। এমনও ঘটিয়াছে, যে আরব্ধ গ্রন্থের দশ পৃষ্ঠা মাত্র শেষ করিবার পূর্ব্বেই গ্রন্থ বন্ধ করিয়া অন্য বহু গ্রন্থ পড়িয়া লইতে হইয়াছে।" ভুল বুঝিতে পারিয়া রুসো পঠনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করেন। Encyclopedeaর বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"২৫ বৎসর বয়সে যে যুবক কিছুই জানিত না, অথচ যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হইয়াছিল, সময়ের যথোচিত ব্যবহার করা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছিল। মৃত্যু অথবা দুরদৃষ্ট বশতঃ যে কোনও সময়ে আমার চেষ্টা ব্যাহত হইতে পারে জানিয়া, আমার ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রবণতা কোন্ দিকে, এবং কোন্ কোন্ বিদ্যা চর্চ্চা করিবার আমি উপযুক্ত, তাহা জানিবার জন্য সকল বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। * * * অধ্যয়নের জন্য নিশ্চয়ই আমি জন্মগ্রহণ করি নাই। কোনও বিষয়েই আমি অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিককাল মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না। অন্যের চিন্তা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়া অল্পেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। কিন্তু নিজের চিন্তায় অনেক সময় অধিকক্ষণ কাটাইতে সক্ষম হইতাম। * * * এমনো হইয়াছে যে কোনও গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পড়িবার পরেই আমার মন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তখন মনঃসংযোগের চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, মন স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে, কিছুই ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ একটির পর একটি অবিচ্ছেদে পড়িতে গিয়া দেখিয়াছি, মনোযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। এক বিষয়ে অধ্যয়নের ক্লান্তি বিষয়ান্তরে মনোনিয়োগের ফলে বিদূরিত হয়। * * * এই ভাবে পাঠপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া সমস্ত দিনই বিনা ক্লান্তিতে পড়িতে পারিয়াছি।"

দর্শনশাস্ত্র পাঠকালে রুসো বিভিন্ন দার্শনিকদিগের পরস্পর বিরোধী মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হন। অবশেষে সমন্বয়ের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া তিনি প্রত্যেক দার্শনিকের মত বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়া, তাহার বিকাশ ও পরিণতি বুঝিবার চেষ্টা করেন। সেই মতের বিরুদ্ধ কোনও যুক্তি মনে উঠিলেও তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন "আমি ভাবিলাম, প্রথমে আমার মনের ভাণ্ডারে কতকগুলি ভাব (idea) সঞ্চয় করিয়া লইব। সে সকল ভাব যদি বিশদ হয়, তাহা হইলে তাহারা সত্য কি মিথ্যা, তাহা সঞ্চয়কালে দেখিব না; পরে যখন যথেষ্ট পরিমাণে ভাব সঞ্চিত হইবে, তখন তুলনা করিয়া কোন্‌টি গ্রহণ করিব, কোন্‌টি বর্জ্জন করিব, তাহা ভাবা যাইবে। কয়েক বৎসর অন্যের চিন্তার দ্বারা চালিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, যথেষ্ট বিদ্যা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। তখন অপরের চিন্তার সাহায্য বর্জ্জন করিয়াও চিন্তা করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছি, এবং স্বকীয় বুদ্ধি দ্বারা অধীত বিষয়ের বিচার করিবার সামর্থ্যও লাভ করিয়াছি।" যথেষ্ট চেষ্টা সত্তেও রুসোর শিক্ষা কখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। Encyclopedistদিগের সর্ব্বতোমুখী বিদ্যার সহিত তাঁহার অর্জ্জিত বিদ্যার তুলনা হইত না। Plutarch, Tacitus, Seneca, এবং Plato ও Virgil তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু গ্রীক ও লাটিন ভাষার অন্যান্য লেখকদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না।

চারমেতে বাস করিবার সময় রুসো প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন এবং ভ্রমণের সময় প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসনা করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন "আমার উপাসনা কেবল কতকগুলি শব্দের উচ্চারণেই শেষ হইত না। আনন্দ-দায়িনী প্রকৃতির স্রষ্টার দিকে আমার হৃদয় তুলিয়া ধরিয়া রাখিতাম। ঘরের মধ্যে উপাসনা করিতে আমার ভাল লাগিত না, ঘরের দেওয়াল ও

স্থূলের মধ্যের যাবতীয় দ্রব্য ভগবান ও আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিত। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিতে আমার ভাল লাগে। * * * যাঁহার জীবন আমার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল, তাঁহার ও আমার নিজের জন্য পাপ-যন্ত্রণা-ও-অভাবমুক্ত নির্দ্দোষ শান্তিপূর্ণ জীবন, ধার্ম্মিকোচিত মৃত্যু এবং পরলোকে ধার্ম্মিকোচিত গতি ভিন্ন অন্য কিছুই আমার প্রার্থনীয় ছিল না। প্রার্থনার সঙ্গে ভগবানের ধ্যান করিতাম। আমি জানিতাম সর্ব্বমঙ্গলদাতা ভগবানের অনুগ্রহের উপযুক্ত হওয়াই তাঁহার অনুগ্রহ পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়—প্রার্থনা নয়।'

১৭৪১ সালে Madame de Warrensএর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রুসো প্যারিস নগরে গমন করিলেন। তখন তাঁহার সম্বল ছিল ১৫ লুই (রৌপ্য), একখানা নাটকের হস্তলিপি, এবং সঙ্গীতের স্বরলিপির এক নূতন পদ্ধতি, যাহা হইতে তিনি অর্থ ও যশঃ, উভয়ই আশা করিয়াছিলেন।' প্যারিসে কিছুদিন ইতস্ততঃ গমনাগমনে অতিবাহিত হইল। Fontenelle, Marivaux, Condillac ও Diderot ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত এই সময় পরিচয় হইয়াছিল। Diderotর সহিত পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। একজন মহিলার অনুরোধে রুসো ভিনিসস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। (১৭৪৩) কিন্তু রাষ্ট্রদূতের সহিত কলহ করিয়া সে পদ ত্যাগ করিলেন। এই কলহে রুসোর দোষ ছিল না। রাষ্ট্রদূত তাঁহার বেতন না দেওয়ায় তিনি প্যারিসে আসিয়া গবর্মেণ্টের নিকট বিচারপ্রার্থী হন। বহুদিন পরে তিনি প্রাপ্য বেতন পাইয়াছিলেন। প্যারিসে ফিরিয়া আসিবার পরে রুসোর কয়েকখানা নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, কিন্তু তাহা হইতে অর্থাগম হয় নাই। ১৭৪৪ সালে তিনি Therese le Vasseur নাম্নী এক হোটেল পরিচারিকার প্রণয়ে আবদ্ধ হন এবং তাহার সহিত স্বামী স্ত্রীর মত বাস করিতে থাকেন। Theresse অশিক্ষিতা ও দেখিতে কুৎসিত ছিলেন। লিখিতে অথবা পড়িতে জানিতেন না, বৎসরের মাসগুলির নাম কখনও একাদিক্রমে বলিতে পারিতেন না, সংখ্যা গণনা করিতেও শেখেন নাই। Thresse মাতা তাহার সহিত বাস করিত এবং মাতা ও কন্যা উভয়েই রুসো এবং তাঁহার বন্ধুদিগকে অর্থোপার্জনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিত। Theresseএর প্রতি রুসোর যে বিন্দুমাত্রও ভালবাসা ছিল না, তাহা তিনিই লিখিয়াছেন। তবুও ২৫ বৎসর তাহার সহিত বাস করিয়া অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। Theresseএর গর্ভে রুসোর পাঁচটি সন্তান হইয়াছিল। সকলগুলিকেই তিনি মাতৃহীন শিশুদিগের হাসপাতালে দান করেন। (Foundling Hospital) এই জঘন্য কাজের জন্য রুসো তাহার "Confessions গ্রন্থে অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ না করিয়া রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করিয়া তিনি যে গুরুতর অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অনুতপ্ত ধর্ম্মবুদ্ধিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন "স্বীয় সন্তানদিগকে উপযুক্তভাবে লালনপালন করিবার আর্থিক সামর্থ্য আমার ছিল না। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা আমার সাধ্যাতীত ছিল। ভাবিয়াছিলাম উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আমার সন্তানেরা সাধু উপায়ে ভদ্রজীবনযাপন করিতে পারিবে না। Theresseএর মাতা ও তাহার ভ্রাতা ভগিনীদিগের সংসর্গও কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে না। অথচ আমার সন্তানগণ গৃহে প্রতিপালিত হইলে, তাহাদের সংসর্গ অপরিহার্য্য হইবে। এরূপ অবস্থায় সরকারী শিশু-আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়া তাহারা যদি কৃষক অথবা শিল্পীর ব্যবসায়ে সাধুভাবে জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। Platoর কল্পিত Republicএ জন্মের পরেই শিশুদিগকে পিতামাতার নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিয়া রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কোনও শিশুরই সেখানে স্বীয় পিতামাতার সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা নাই। প্লেটোর আদর্শে রাষ্ট্রের নাগরিকের কর্ত্তব্য আমি পালন করিয়াছি।" তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সন্তানদিগের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু তাহাদের প্রস্তাব রুসো স্বীকার করিলে, তাঁহার সন্তানদিগের জীবন অধিকতর সুখী হইত বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। অন্য কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া তাহারা আপনাদের পিতামাতাকে ঘৃণা করিতে শিখিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩৭ বৎসর বয়সেও রুসোর জীবনে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোনও চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। তখনও তিনি তাঁহার জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান পান নাই। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তার পরে হঠাৎ একদিন অচিন্তিত ভাবে তাঁহার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল, তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান পাইলেন। ১৭৪৯ সালে একদিন রুসো তাঁহার বন্ধু Diderotর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিলেন। Diderot তখন প্যারিস হইতে ছয় মাইল দূরে এক কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। পদব্রজে পথ চলিবার সময় রুসো একখানা সাহিত্যিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল সেই পত্রিকায় মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপনের উপর। Academy of Djion "বিজ্ঞান ও কলার উন্নতি দ্বারা মানুষের নৈতিক উন্নতি অথবা অবনতি হইয়াছে" এই সম্বন্ধে প্রবন্ধের জন্য একটা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই ঘোষণা পাঠমাত্র রুসোর মনে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল। শত শত ভাব তাঁহার মনের মধ্যে কলরব করিয়া উঠিল। ভাবের উত্তেজনায় তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া তিনি অর্দ্ধঘণ্টা প্রগাঢ় চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। মনে হইল তিনি অন্য জগতের অধিবাসী, অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছেন। Academyর প্রশ্নের উত্তরই যে কেবল তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, তাহা নহে। অন্য বহু সত্যও তাঁহার মনে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে রুসো আপনার স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন যে সত্যের

সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যতের সমস্ত রচনা তাহার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

ফরাসী সমাজে তখন অশান্তির অগ্নি অল্পে অল্পে ধূমায়িত হইতেছিল। অনিয়ন্ত্রিত রাজশক্তির অধীনে নৈতিক শিথিলতা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছিল। মানব-জীবনের মহত্ত্বে সন্দেহ সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত হইতেছিল। সাইত্রিশ বৎসর যাবত রুসো ভবঘুরের জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সমাজের বিধি ও নিষেধ গ্রাহ্য করেন নাই। রাজশক্তির যথেচ্ছাচার ও সামাজিক দুর্নীতি দেখিয়া তাঁহার মন মাঝে মাঝে বিচলিত হইত, বিরক্তি দমন করিয়া রাখিতেন। কিন্তু দমিত বিরক্তি ও বিদ্রোহী ভাব মনে সঞ্চিত হইতেছিল। আজি তাহা বিস্ফুরিত হইয়া পড়িল। সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্নীতি ও অনাচার তাঁহার লেখনী-মুখে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উদ্ঘাটিত হইল।

রুসো Academy of Dijon-এর প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার এই প্রথম রচনা পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহা তিনি আশা করেন নাই। কিন্তু যাহা অপ্রত্যাশিত ছিল, তাহাই সংঘটিত হইল। তাঁহার প্রবন্ধই পরীক্ষকগণকর্ত্তৃক পুরস্কারের জন্য নির্ব্বাচিত হইল। হঠাৎ তাঁহার যশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। বিপ্লবসৃষ্টির কোনও উদ্দেশ্য তাঁহার না থাকিলেও, পাঠকেরা তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে বিপ্লবের ইঙ্গিত দেখিতে পাইল। প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে সাহিত্য কলাও বিজ্ঞান সুনীতির প্রধান শত্রু। অনাবশ্যক দ্রব্যের অভাব-বোধের সৃষ্টি করিয়া তাহারা মানবের স্বাধীনতা অপহরণ করে এবং তাহাকে দাসে পরিণত করে। সভ্যতা হইতে পরিচ্ছদের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে; আমেরিকায় অসভ্যদিগের মত যাহারা উলঙ্গ থাকে, তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় না। বিজ্ঞান ও সুনীতি পরস্পর-বিরোধী। নীচ ও ঘৃণিত মূল হইতে যাবতীয় বিজ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে। কুসংস্কার-প্রসূত ফলিত জ্যোতিষ হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রের (astronomy) জন্ম; অর্থলোভ হইতে জ্যামিতির উৎপত্তি; বৃথা কৌতূহল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জনক; মানুষের অভিমান হইতে চরিত্র-নীতির উদ্ভব; উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাগ্মিতার প্রসূতি। শিক্ষা ও মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা মানুষের কোনও উপকারই হয় নাই। অসভ্য মানুষ হইতে সভ্য মানুষের ব্যাবর্ত্তক সমস্ত গুণ ও আচারই অমঙ্গলের আকর। শৈশবে পঠিত Plutarch's Lines রুসোর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এথেন্স্ অপেক্ষা স্পার্টার জীবনযাপন প্রণালী তাঁহার অধিকতর মনোমত ছিল। Lycurgus তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ রুসো গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ইয়োরোপীয়দিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত অসভ্যদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। মানবের সুখ-ও-শান্তিবিধানে সভ্যতার কোনও কৃতিত্বই তিনি দেখিতে পান নাই। সভ্যতার উন্নতিতে তিনি মানবজাতির অবনতিই দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাহার সর্ব্বধ্বংসী সংস্পর্শ হইতে যদিও তাঁহার জন্মভূমি জেনিভা ও আপনাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কোনও সুফলের প্রত্যাশা তিনি করেন নাই।

হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া রুসো থামিতে পারিলেন না। প্রথম প্রবন্ধের সফলতায় তাঁহার চিন্তার স্রোত প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং যে সমস্ত চিন্তা মনে উদিত হইতে লাগিল, বিস্তারিত করিয়া তাহা বর্ণনা করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার মূত্রাশয়ের পীড়া প্রবল হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা বলিলেন, ছয় মাসের অধিক তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিয়া শেষ করিবার জন্য তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। যে সমস্ত দার্শনিকের মত তিনি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের শিক্ষায় ভ্রান্তি ও নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কিছুই এখন দেখিতে পাইলেন না। সমাজের সর্ব্বাঙ্গে বর্ত্তমান অত্যাচার ও দুর্গতি তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল নিজের বিশ্বাসের সহিত যদি তাঁহার জীবনের সামঞ্জস্য না থাকে, তাহা হইলে কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। এই বিশ্বাসে তিনি স্বকীয় জীবনযাপন প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। সাদা মোজা ও সূক্ষ্ম বস্ত্র বর্জ্জন করিলেন, ঘড়ি বিক্রয় করিলেন, মোটা কাপড়ের সাধারণ স্যুট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি এক আফিসে ধনরক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে কাজ ছাড়িয়া দিয়া স্বরলিপি নকল করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার অন্তরে যে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, এ সকল তাহার বাহ্যিক প্রকাশ। শতবর্ষ পরে তাঁহারই শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া কাউণ্ট টলষ্টয় সর্ব্ববিধ বিলাস বর্জ্জন করিয়াছিলেন। রুসোর স্বভাবেও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। ভয় ও লজ্জার সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়া গেল। প্রচলিত আচার ও সংস্কারের বশীভূত লোকের শ্লেষ ও ব্যঙ্গ অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অসম সাহসে সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কারের প্রতি কশাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে ও দশ বৎসর পরেও যিনি মনের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেন না, তাঁহার শ্লেষোক্তি সমগ্র পারিসের মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ফলে অনেকের মনে তাঁহার প্রতি দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল।

১৭৫৩ সালে রুসোর "Discourse on the origin of Inequality" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি পূর্ব্বগ্রন্থে প্রকাশিত মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং "ব্যক্তিগত সম্পত্তি" (Property) কে সামাজিক বৈষম্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, রাষ্ট্রকর্ত্তৃক এই অসাম্য—নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ধনী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাষ্ট্র-ক্ষমতা অন্যায়পূর্ব্বক অধিকৃত হইলে যে রাষ্ট্রের অবনতি হয় ও প্রজাসাধারণ দাসে পরিণত হয়, তিনি তাহা ও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকের অনেক পূর্ব্বে এই দার্শনিক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই স্বকীয় মতকে সাধারণ-বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দান করিয়া রুসোর মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন নাই। এই সময়ে কোনো কার্য্যই রুসো অর্দ্ধসমাপ্ত করিয়া ফেলিয়া রাখিতেন

না। চিন্তা তাহার নিকট ক্রীড়া অথবা বিলাসের উপকরণ মাত্র ছিল না। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন; ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, মানুষ স্বভাবতঃ নিষ্পাপ; তাহার সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানই তাহাকে কলুষিত করে। এই মত খৃষ্টধর্ম্মের "আদি পাপ" (Original Sin) ও "চার্চ্চের মাধ্যমে মুক্তি"বাদের (Salvation Through the Church) বিরোধী। তৎকালীন অনেক দার্শনিক "প্রাকৃতিক অবস্থা"র কথা বলিয়াছিলেন। রুসো এই অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই অবস্থা যে কোথাও বর্ত্তমান নাই, কখনও বর্ত্তমান ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও কখনো ইহার উদ্ভব হইবে না, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক্ জ্ঞানের জন্য এইরূপ এক অবস্থার কল্পনা করা আবশ্যক। "প্রাকৃতিক ব্যবহারে"র (Natural Law) ধারণা "প্রাকৃতিক অবস্থার সম্যক ধারণা ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। মানুষের কতটুকু প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত, যতক্ষণ সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না জন্মে, ততক্ষণ তাহার জন্য আদিতে বিহিত, অথবা তাহার সেই অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী নিয়ম কি, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। এই নিয়মের যাহারা অধীন, এই অধীনতা সম্বন্ধে তাহাদের সচেতন হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। এই চেতনা চেষ্টাপ্রসূত না হইয়া স্বাভাবিক হওয়া আবশ্যক। মানুষে মানুষে যে স্বাভাবিক ভেদ আছে, তাহাতে রুসোর আপত্তি নাই। বয়স, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে ভেদ অপরিহার্য্য। কিন্তু সমাজকর্ত্তৃক অনুমোদিত বিশেষ অধিকার সমর্থনযোগ্য নহে।

"ব্যক্তিগত সম্পত্তি"ই সামাজিক বৈষম্যের মূল। প্রথমে যে লোক একখণ্ড জমিতে বেড়া দিয়া বলিয়াছিল "এই জমি আমার," এবং তাহার কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রতিবাসীদিগকে তাহার স্বামিত্ব স্বীকার করিতে দেখিয়াছিল—সেই লোকই সমাজের (Civil Society) প্রতিষ্ঠাতা। তাহার পরে ধাতুর ব্যবহার ও কৃষিকার্য্যের উদ্ভাবন দ্বারা এক অনিষ্টকর বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। শস্য মানুষের দুর্ভাগ্যের প্রতীক, ইয়োরোপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শস্য ও লৌহ উৎপন্ন হয়। এই জন্য ইয়োরোপের দুঃখকষ্ট অধিক। এই অনিষ্টের প্রতীকার করিতে হইলে সভ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে। কেননা সভ্যতাবর্জ্জিত স্বাভাবিক মানুষ দোষহীন; অসভ্য মানুষের যখন উদর পূর্ণ থাকে, তখন সমগ্র প্রকৃতি ও তাহার মধ্যে শান্তি বিরাজ করে; তখন সে স্বজাতীয় সকলেরই বন্ধু।

নূতন গ্রন্থের একখণ্ড রুসো ভলটেয়ারকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, "মানবজাতির বিরুদ্ধে লিখিত আপনার গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদিগের সকলকে মূর্খে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে এরূপ চতুরতা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। আপনার গ্রন্থ পড়িয়া চারি হাত পায়ে হাঁটিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ৬০ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে যে অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছি, দুর্ভাগ্যক্রমে এখন তাহাতে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। Canadaর অসভ্যদিগের অনুসন্ধানে যাত্রা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা যে সমস্ত পীড়ায় আমি ভুগিতেছি, তাহার জন্য একজন ইয়োরোপীয় চিকিৎসক আমার আবশ্যক। দ্বিতীয় কারণ এই যে ক্যানাডায় এখন যুদ্ধ চলিতেছে, এবং আমাদের দৃষ্টান্তে সেখানকার অসভ্যগণও আমাদের মতই দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে।" ইহা হইতেই ভলটেয়ার ও রুসোর কলহের সূত্রপাত।

"Discourse on Inequality" রুসো জেনিভার নগরপিতাদিগের (City Fathers) নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন নাই। সাধারণ নাগরিকদিগের সমান বলিয়া গণিত হওয়া তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় মনে হয় নাই। কিন্তু রুসোর যশঃ বিস্তৃত হইতে দেখিয়া তাঁহারা তাহাকে জেনিভায় নিমন্ত্রণ করিলেন। রুসো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং ক্যালভিনীয় সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন কেহ জেনিভার নাগরিক হইতে পারিত না বলিয়া তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্মে পুনরায় দীক্ষিত হইলেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি আপনাকে জেনিভার নাগরিক বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছিলেন। জেনিভায় বাস করিবার ইচ্ছাও তাঁহার মনে উত্থিত হইয়াছিল। কিন্তু জেনিভার শাসনকর্ত্তাদের তাঁহার গ্রন্থের প্রতি বিরাগ দেখিয়া সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। জেনিভায় বাস না করিবার আরও একটি কারণ ছিল। ভলটেয়ার তখন জেনিভার নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে বাস করিতেছিলেন। জেনিভায় কোনও নাটক অভিনীত হইতে পারিত না। ভলটেয়ার এই বাধা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল জেনিভায় তাঁহার নাটকের অভিনয় হয়। রুসো নাট্যাভিনয়ের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিলেন। অসভ্যেরা নাটকের অভিনয় করে না। প্লেটো নাট্যাভিনয়ের অনুমোদন করেন নাই। যাহারা অভিনয় করে ক্যাথলিক পুরোহিতগণ তাহাদের বিবাহে অথবা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় পৌরহিত্য করেন না। Bossuet নাটককে ইন্দ্রিয়-লালসার পাঠশালা (School of Concupiscence) বলিয়াছেন। ইত্যাদি যুক্তির প্রয়োগ করিয়া রুসো বিলাসবর্জ্জিত কঠোর জীবনের পক্ষে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

১৭৫৫ সালে ভীষণ ভূমিকম্পে লিসবনে বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সংবাদে বিচলিত হইয়া ভলটেয়ার এক কবিতায় করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই কবিতা পাঠ করিয়া রুসো বিরক্ত হইয়া লিখিলেন—"যশঃ, পৌরুষ ও সম্পদের গর্ব্বে অভিভূত ব্যক্তিকে মানবজীবনের দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে সুতিক্ত তীব্র বচন প্রয়োগ করিতে এবং জাগতিক যাবতীয় পদার্থকে অমঙ্গলময় বলিয়া ঘোষণা করিতে দেখিয়া, তাহাকে স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, ও জগতের প্রত্যেক পদার্থই যে উৎকৃষ্ট, তাহা প্রমাণ করিবার অর্থহীন ইচ্ছা আমার মনে উদিত হইল। ভলটেয়ার দৃশ্যতঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও, প্রকৃতপক্ষে সয়তান ভিন্ন কাহারও অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। যে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাসের ভাণ করেন, তিনি এক ঈর্ষ্যান্বিত পুরুষ মাত্র, অনিষ্টকর কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুতেই তাঁহার সুখ হয় না।

তাঁহার এই মত স্পষ্টতঃই যুক্তিহীন। সর্ববিধ সৌভাগ্যের অধিকারী ও সুখের ক্রোড়ে শায়িত ব্যক্তির পক্ষে তিনি নিজে যে দুঃখকষ্টের আঘাত ভোগ করেন নাই, তাহার ভয়াবহ নিষ্করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া অপরকে নিরাশার গহ্বরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা নিতান্তই বিরক্তিকর। মানবজীবনের দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগের অধিকার তাঁহার অপেক্ষা আমার অধিক থাকিলেও, আমি নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলাম যে মানুষের দুঃখ কষ্টের জন্য ঈশ্বর বিন্দুমাত্রও দায়ী নহেন। মানবীয় বৃত্তি নিচয়ের (Faculties) অপব্যবহারই তাহার জন্য দায়ী। পদার্থের স্বরূপের সেজন্য কোনও দায়িত্বই নাই।" রুসো ভলটেয়ারের কবিতায় কঠোর সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন "ভূমিকম্প লইয়া এত হৈ চৈ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। মধ্যে মধ্যে কতকগুলি লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহাতে অমঙ্গলের কিছুই নাই। লিসবনের লোকেরা যদি সপ্ততল গৃহ নির্মাণ না করিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে অরণ্যের মধ্যে বাস করিত, তাহা হইলে তাহাদের বিপদ ঘটিত না। প্রকৃতির বিরোধী আচরণ দ্বারাই তাহারা বিপদ আহ্বান করিয়াছিল।" ভলটেয়ার রুসোর পত্রের উত্তরে কোনও পত্র তাঁহাকে লেখেন নাই। উত্তর দিয়াছিলেন তাঁহার Candide নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তাহার ভীষণতম অস্ত্র—"ভলটেয়ারের শ্লেষ" (The mockery of Voltairs)—রুসোর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

এইরূপে ভলটেয়ার ও রুসোর মধ্যে যে কলহের সূত্রপাত হইল, তৎকালের সমস্ত দার্শনিকই তাহাতে একতর পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভলটেয়ার রুসোকে "অনিষ্টকারী উন্মাদ" বলিতেন। রুসো ভলটেয়ারকে "অধর্ম্মের ভেরী, উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু নীচ আত্মা" প্রভৃতি অভিধানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৭৬০ সালে তিনি ভলটেয়ারকে লিখিয়াছিলেন "আমি বস্তুতঃ আপনাকে ঘৃণা করি, কেননা আমার ঘৃণাই আপনি চাহিয়াছিলেন। যদি আপনি চাহিতেন, আপনাকে ভালবাসিতেও পারিতাম। এক সময়ে আপনার সম্বন্ধে যে সমস্ত ভাবে আমার অন্তর পূর্ণ ছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল আপনার প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আপনার রচনার প্রতি আকর্ষণই অবশিষ্ট আছে। আপনার প্রতিভা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি যদি আমার শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আমার দোষ নাই।"

Discourse on Inequality গ্রন্থে রুসো ক্রমবর্দ্ধমান যথেচ্ছাচারের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে উত্থাপিত বিদ্রোহকে "বিধিসঙ্গত কার্য্য" (Judicial action) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এতাদৃশ মত-প্রচারে বিপদ তো ছিলই। অধিকন্তু রুসো সাধারণের উপর প্রভূত প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ বাক্‌পটুতার অধিকারী ছিলেন। তিনি মুক্ত বাতাসে বক্তৃতার উপযোগী এক রচনা-শৈলী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহা পাঠে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিত। ১৭৫৮ সালে তিনি D' Alembertকে যে ২৮৩ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র লেখেন, তাহাতে এই রচনা-শৈলীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পত্রে উন্মাদিনী বাগ্মিতার স্রোত প্রবাহিত ছিল। পাঠ করিয়া সাধারণে বিশেষ ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত, বহু বিদ্বৎপরিষদের সভ্য, D' Alembert তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই, তিনি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন "আপনার লেখনীর মত লেখনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বিপজ্জনক। যে অবজ্ঞা আপনি সাধারণের প্রতি প্রদর্শন করেন, তাহা দ্বারাই কিরূপে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাহা আপনিই জানেন।" এই পত্রে তিনি লুথারের সঙ্গে রুসোর তুলনা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

বর্ষার উৎসবে

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

কাঁঠাল পাকাবে ব'লে জ্যৈষ্ঠ যবে আনিল গরম,
মনে হ'ল স'য়ে থাকি, কোয়াগুলি মিঠে ও নরম
চেখে চেখে খাওয়া যাবে, গরম হোক্ সে ভালো ক'রে!
'দেখিনি এহেন গ্রীষ্ম' মনে হয় প্রত্যেক বছরে,
এ আর এমন কিবা? তারপরে 'পরিত্রাহি' ডাক্!
থাক্ থাক্, ভগবান্ কাঁঠাল হবে না পরিপাক,
পাগলের নেশা বটে! কাঁঠালের দুটি মুদ্রা দাম!
টাকায় তিনটি আম! দু আনায় কুড়ি কালো জাম!
প্রাণ যায় প্রাণ যায়, ঘেমে ঘেমে নুয়ে পড়ে ঘাড়!
মেঘের পুঁটলী নিয়ে অকস্মাৎ নামিল আষাঢ়।
তবলাপটিতে জল, জল জমে ঠন্‌ঠনে ভ'রে;
বন্ধ ট্রামে ব'সে ব'সে বর্ষার কবিতা লিখি জোরে।
পকেটে ফাউন্টেন্ পেন, আর ছিল লাইব্রেরীর বই
তাতেই কবিতা লিখি, তারা আর দেখে নেয় কই?
ছাতা ছিলনাকো কাছে, ঘরে কবে ফিরিব কে জানে!
ফুটপাত থেকে জল ঢোকে গিয়ে দোকানে দোকানে।
আমি ত কবিতা লিখি—ভালোবাসি প্রবল বর্ষণ,
মাঝ পথে নয় বন্ধু, অধিকার ক'রে গৃহ কোণ।
সমস্ত দুপুর ধ'রে, আর ধ'রে সমস্ত রাত
ঝর ঝর ঝর ধারে আকাশের ঝক্কক্ প্রপাত।
কবে ভালো লেগেছিল, আজো যে তেমনি ভালো লাগে,
মুড়ি তেলেভাজা আর খিচুড়িতে ভালোবাসা জাগে।
বরষারে ভালোবাসি, এঁকে যেতে পারি তার ছবি,
এ পোড়া বাংলা দেশে তাই লোকে বলেছিল 'কবি'।
নগণ্য কবির মাঝে পেয়েছিনু একটু ঠাঁই!
পথের কাদার ভয় কুকুরের ভয় যায় নাই।
আমার এ কাব্যখানি অন্ধ কবি পড়ে দিক্ তবে,
বর্ষণের আশঙ্কায় গেলাম না বর্ষার উৎসবে॥
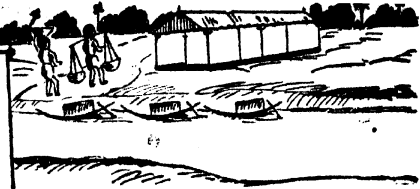
(পূর্বানুবৃত্তি)

দেবু চায়ের কাপ হাতে লইয়া বার দুই চুমুক দিয়াই অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

সে গিরীশদের কথা ভাবিতেছিল।—ইতিহাসের চক্রান্তের চড়কে পিঠে বাণ ফুঁড়িয়া পুরুষানুক্রমে মহানন্দে ঘুরপাক খাইতেছে—আর ভাবিতেছে পাকে পাকে উঠিয়া স্বর্গে চলিয়াছে। হিন্দুর শিবঠাকুরের সিংহাসন গিয়াছে সেই কবে, মুসলমানের পীরের মসনদও গিয়াছে, সিংহাসন বল মসনদ বল—দখল করিয়া বসিয়াছে ইংরাজ, তবুও হিন্দু মুসলমানের আক্রোশ আর মিটিল না। দুই বিড়ালের ঝগড়ায় রুটির গোছা লইয়া বাঁদর গাছে উঠিয়া পরমানন্দে রসাস্বাদন করিতেছে—বিড়াল দুইটার সেদিকে দৃকপাত নাই—তাহারা লেজ এবং রোঁয়া ফুলাইয়া নখ বাহির করিয়া পরস্পরের বুক চিরিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিবার জন্য যুদ্ধে মাতিয়া রহিয়াছে।

সে বুঝিতে পারে না—কেন এই সহজ সত্যটা তাহাদের বোধগম্য হয় না। অবশ্য সে নিজেও একদিন বুঝিতে পারিত না। একদিন বিশুভাইয়ের সঙ্গে এই লইয়া তাহার বিরোধও হইয়াছিল। সে কথা মনে পড়িলে আজও তাহার দুঃখ হয়। লজ্জাও হয়। মনে মনে তাহার জেলবাসটাকে সে ভাগ্য বলিয়া মানে। ভাগ্যে তাহার জেল যাওয়ার সুযোগ হইয়াছিল!

স্বর্ণ স্নান সারিয়া বাহির হইয়া আসিল। তোয়ালে দিয়া মাথার চুল মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল?

দেবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—সনাতন ভৌতিক কাণ্ড। ভূতে সব উল্টে দিলে।

—মানে?

—মানে আবার কি? এ দেশে সর্ষের মধ্যে ভূত বাসা বেঁধে থাকে। হাটের ব্যাপারেও হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাসা বেঁধে রয়েছে।

স্বর্ণ যত বিস্মিত হইল তাহার চেয়ে অনেক বেশী উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। স্থির দৃষ্টিতে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া—দেবুকেই কঠোর স্বরে বলিল—হেঁয়ালী রাখ বাপু। কি হয়েছে বল!

—মুসলমানেরা দাবী করেছে—হাটে জয়তারার আশ্রমের জন্যে যে তোলা ওঠে—তার ভাগ পীরের দরগার জন্যে দিতে হবে।

—তারপর?

—তারপর আর কি? হিন্দুরা বলছে—তার চেয়ে আমাদের জমিদারের সঙ্গে মিটমাট করাই ভাল।

—মিটমাট করাই ভাল! এই কথা বললে? কে?

—গিরীশ।

স্বর্ণ স্তব্ধ হইয়া গেল। ক্ষোভে স্তব্ধ হইয়া গেল। দেবু একটু হাসিল—বলিল—কথা বল না যে!

স্বর্ণ বলিল—ওদের—

—ওদের কি?

কথা বোধ হয় খুঁজিয়া না পাইয়াই স্বর্ণ বলিল—ওদের ম'রে যাওয়া উচিত। ম'রে যাক, সব ম'রে যাক।

তাহার মুখচোখ ক্ষোভে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দেবুর চেয়ে উত্তেজনা তাহার অনেকগুণে বেশী। স্বাভাবিক ভাবেই বেশী। ধর্ম্মই হোক—রাজনীতিই হোক—সংসারই হোক—মেয়েরা যত আবেগের সঙ্গে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে, নিজেদের কঠিন পাকে জড়াইয়া দিতে পারে—পুরুষে ততখানি গাঢ় আবেগের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিতে পারে না। তাহার উপর স্বর্ণ স্বামী পাইয়াছে—সংসার পাইয়াছে; কিন্তু আজও সন্তান কোলে পায় নাই। রাজনীতির পথে পা দিয়া সে দেবুর অপেক্ষাও প্রবল বেগে ছুটিতে চায়। সে দিক দিয়া—পঞ্চগ্রামের মানুষের সঙ্গে অনেকগুণে বেশী পৃথক—বেশী স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। নারীপ্রকৃতির স্বভাবধর্ম্মই বোধ করি এমনি, জীবনে যাহা আঁকড়াইয়া

ধরে—তাহাকে পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে জীবন পরিত্যাগ করা অপেক্ষাও কঠিন, কিন্তু কোনক্রমে পরিত্যাগ করিলে আর সে সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না, যে নূতন খাতে সে প্রবেশ করে—সেই পথেই ছুটিয়া চলে প্রবলতর গতিতে, যে নূতন আশ্রয়কে পায়—তাহাকেই জড়াইয়া ধরে সবলতর আবেগে। দেখুড়িয়ার তিনকড়ি মণ্ডল—জাতিতে সদ্‌গোপ—নিজে হাতে সে চাষ করিত, তাহার কন্যা সে। দশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল, ভোরবেলা হইতে উঠিয়া হিন্দুসমাজের আচার-আচরণ পালন করিয়া চলিত, হিন্দু সমাজের অন্ধবিশ্বাস আঁকড়াইয়া ধরিয়া বাপের সংসারে থান কাপড় পরিয়া, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটিয়া, নানা ব্রতবারে উপবাস করিয়া—ভাইয়ের আমলে ভাজের সঙ্গে কলহ করিয়া হিন্দু বালবিধবার জীবনের বাঁধা ছকে ছকে—ঘুরিয়া একদা গোলকধামের ঘুঁটির মত বৈকুণ্ঠে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনকড়ি মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে সুরু করিল। স্বর্ণ তাহার দাদা গৌরের বই লইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিল। তারপর ঘটিল বিপর্য্যয়। ডাকাতির মামলায় তিনকড়ির জেল হইয়া গেল। ছেলেটি ও মেয়েটি দেবুর উপর নির্ভর করিয়া বসিল। দেবু স্বর্ণের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাহাকে লেখাপড়া শেখানোই সর্ব্বোত্তম পন্থা বলিয়া মনে করিল। তিনকড়ির ছেলে গৌরের লেখাপড়া হইল না, সে দেবুর আশ্রয়ে আসিয়া কংগ্রেসের ভলেণ্টিয়ারী সুরু করিল। তারপর একদা হইল নিরুদ্দেশ। স্বর্ণ প্রাণপণে লেখা-পড়াকেই আঁকড়াইয়া ধরিল। মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল। দেবুর ইচ্ছা ছিল—স্বর্ণকে মাইনর পাস করাইয়া গ্রামেই ছোট ছেলে-মেয়েদের পাঠশালা খুলিয়া বসাইয়া দিবে। হয়তো—তাইই হইত। কিন্তু তিরিশ সালে দেবু গেল জেলে। জেল হইতে ডিটেনশনে। স্বর্ণ তখন নূতন পথে ছুটিতে সুরু করিয়াছে। জংসনের বালিকা বিদ্যালয়ে ছোট দিদিমণির চাকরী লইয়া—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। জংসন তার জীবনে আনিল নূতন ধারা। সে ম্যাট্রিক পাস করিল, দেবু জেল হইতে ফিরিল। তারপর একদিন কি জানি কেমন করিয়া কি হইয়া গেল—দেবু অনুভব করিল—স্বর্ণকে তাহার জীবনে চাই। আশ্চর্য্য—স্বর্ণ শিহরিয়া উঠিল না, জ্বলিয়া উঠিল না, পুলকিত লজ্জায় মাথাটি হেঁট করিয়া বলিল—এত বড় ভাগ্য যে আমি ভাবতেও পারি না দেবুদা। আমাকে তুমি—? দেবু বলিল—আমরা রেজেষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করব স্বর্ণ—যদি চাও তা হ'লে পুরুতও ডাকব।

বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু শিবকালীপুর দেখুড়িয়া; তাই বা কেন—পঞ্চগ্রামের সমাজ অসহ্য হইয়া উঠিল। স্বর্ণের কৃতিত্বে একদা সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল, দেবুর আত্মত্যাগে সেবায় গোটা পঞ্চগ্রাম তাহাকে নেতৃত্বের আসন দিয়াছিল, কিন্তু এই বিবাহের পর গোটা পঞ্চগ্রামের সমাজ তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। পূর্ব্বের কাল হইলে হয়তো অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সেটা সম্ভবপর ছিল না। শুধু সকলে যেন সরিয়া গেল।

স্বর্ণ এবং দেবু একদা আসিয়া জংসনে বাসা করিল। দেবুর রাজনৈতিক জীবন ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইল। স্বর্ণ দেবুর কাছে সেই শিক্ষা গ্রহণ করিল। তারপর আসিল অরুণা। দেবুই যোগাযোগ করিয়া তাহাকে এখানে আনিল। সদ্‌গোপ গৃহস্থের শান্তশিষ্ট বালবিধবা কন্যাটি কোথায় যে হারাইয়া গেল এই নূতন স্বর্ণের মধ্যে, সে কথা বোধ করি স্বর্ণ নিজেও জানে না। জানা দূরের কথা, কোনদিন কোন মুহূর্ত্তের জন্য সে-দিনের কথা তাহার মনেও পড়ে না। পড়িলে বোধ হয় নারী হইয়া এমন ভাবে গিরীশ-কাকাদের বলিতে পারিত না—ওদের ম'রে যাওয়া উচিত। ম'রে যাক সব, ম'রে যাক্।

দেবু চায়ের কাপটি শেষ করিয়া আরও খানিকটা চা ঢালিয়া লইয়া বলিল—তুমি বেশী উত্তেজিত হয়ে কাউকে কিছু ব'লো না যেন।

—বলব না? কেন? তোমার ভয় হচ্ছে না কি?

—তুমি ইস্কুলে চাকরী কর স্বর্ণ। ওরা সব আগে থেকেই চেষ্টা করছে তোমাকে সরাবার।

—চাকরী ছেড়ে দেব।

—না। সে ঠিক হবে না।

—আমার কিন্তু এই ভাবে লুকোচুরি খেলে চাকরী করতে ভাল লাগছে না। চাকরী ছেড়ে আমি পার্টির কাজই করব।

—না। যখন প্রয়োজন হবে, তখন ছিতেই হবে।

সে প্রয়োজন এখনও আসে নি। তার চেয়ে স্কুলের চাকরীতে অনেক বেশী কাজ হচ্ছে।

—কিন্তু এবার অবস্থাটা কি হ'ল ভেবে দেখছ? অরুণাদি চ'লে গেলেন। এবার যে কে আসবেন—কেমন লোক—তার সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারব কি না—সে সব ভেবে আমার একদম ভাল লাগছে না।

হঠাৎ উনানে ফট্-ফট্ শব্দে কয়লা ফাটিয়া তাহাদের চকিত করিয়া তুলিল। স্বর্ণ বলিল—দাঁড়াও।

লোহার শিক দিয়া নিচে খুঁচাইয়া আঁচ খানিকটা নামাইয়া দিল, তারপর ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়া বলিল—এক একবার মনে হয় কি জান? মানে, ইচ্ছে হয়। ইচ্ছের কথা বলছি। ইচ্ছে হয়—চাকরী ছেড়ে শিবকালীপুরে গিয়ে থাকি। আগের আমলের মত ওখানে কাজ করি।

ঘাড় নাড়িয়া দেবু বলিল—সে আর হয় না।

—হবে না কেন? হবে না—মনে ভাবলেই হবে না। হবে, বিশ্বাস রাখলে হতেই হবে। কথাতেই রয়েছে—'নেই বললে সাপের বিষ থাকে না।'

—কথাটা মিথ্যে স্বর্ণ। বিষধর সাপ যদি হয়—তবে পৃথিবীশুদ্ধ লোক 'নেই' ব'লে সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেও—বিষ না-থাকা হবে না, বিষ থাকবেই। আর যদি হেলে বা জল-ঢোঁড়া হয় তবে 'নেই' বলে না-চেঁচালেও বিষ থাকবে না। শিবকালীপুরে ফিরে যাওয়া—বাস করতে যাওয়া—আর হবে না।

সে বারবার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া কথাটার উপর জোর দিতে চেষ্টা করিল।

—পণ্ডিত! পণ্ডিত মশায়!

দরজার কড়াটা নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে কে ডাকিল—পণ্ডিত মশায়! কণ্ঠস্বর যত শান্ত তত কুণ্ঠিত। দেবু মুহূর্তে চিনিল—নলিন ডাকিতেছে। এ কণ্ঠস্বর আর কাহারও হইতে পারে না। বি-এ পাস করার পর জংসনে সে দেবু মাষ্টার—মাষ্টার মশাই নামে পরিচিত, তাহার জীবনের সকল পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়া—পঞ্চগ্রাম সমাজও ওই নামেই তাহাকে ডাকে। শিবকালীপুরের জগন ডাক্তারও তাহাকে মাষ্টার বলে, শুধু নেলো বা নলিন তাহাকে বলে, পণ্ডিত মশায়।

স্বর্ণ দরজা খুলিয়া দিল। নেলো আসিয়া নীরবে দাওয়ায় বসিল। দেবু প্রশ্ন করিল—কি সংবাদ নলিনচন্দ্র, বল।

নেলো খুঁট খুলিয়া টাকায় পয়সায় রেজকিতে প্রায় মুঠাখানেক নামাইয়া দিয়া বলিল—গুনে নেন। মহিলা সমিতির টাকা।

স্বর্ণ বলিল—টাকা তো মাসের শেষে নেওয়া হয়। এখন কেন? ঠিক মিলিয়ে হিসেব ক'রে নিতে সময় লাগবে তো!

দেবু বুঝিয়াছে। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—হয়েছে কি? হঠাৎ টাকা পয়সা মিটিয়ে দিতে এসেছিস?

নলিন স্নায়ুরোগগ্রস্তের মত বারকয়েক কাঁধ ঝাঁকি দিয়া—নড়িয়া চড়িয়া সংকোচ কাটাইয়া বলিল—আপনারা আলাদা লোক দেখুন। ও—আমি—

সে নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে আরম্ভ করিল।

দেবু বলিল—তুই পারবি না?

শান্ত নিরাসক্ত ভাবে নলিন বলিল—না।

—কেন? কি হ'ল?

—হয় নাই কিছু। হবে আর কি? মানে—। ঘাড় হেঁট করিয়া সে নখ দিয়া মাটির উপর ছবি আঁকিতে সুরু করিল।

—মানেটা কি রে? সেই তো জিজ্ঞেস করছি।

—মানে—। ঘাড় তুলিল নেলো, কিন্তু দেবুর দিকে তাকাইল না—অন্য দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—মানে, আমি পারব না। মানে—। আবার ঘাড় হেঁট ক'রে আমি আঁকা ছবির দিকে চাহিয়া বলিল—মানে, মনটা আমার খচ-খচ করছে।

—মন খচখচ করছে? কেন, সেই ছেলেটার হাত থেকে পুতুল কেড়ে নেওয়ার জন্যে?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া—। নলিনের হেঁট-করা মাথাটা নানা অস্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে নড়িতে লাগিল।

—তা ছাড়া আবার কি?

কিছু না। টাকা নিয়ে ওকে যেতে দাও। স্বর্ণ তীব্র-স্বরে বলিয়া উঠিল।—ও যখন পারবে না, তখন জোর ক'রে লাভ কি? জেনেই বা হবে কি?

হাসিয়া দেবু বলিল—না—না—না। জানতে হবে বৈ

কি। নলিনের সঙ্গে আমার তো সাধারণ সম্পর্ক নয়!

স্বর্ণ বলিল—না। সব মিথ্যে। যেখানে স্বার্থ নেই সেখানে সম্পর্কের কোন দাম নেই। যখন নলিনের রঙ-তুলি কেনার পয়সা ছিল না, যখন গাঁয়ের লোকে ওকে ঘেন্না করত, যা-তা বলত, তখন তুমি ভালবেসেছিলে, আপনার জনের মত স্নেহ করেছিলে, সাহায্য করেছিলে—তখন সম্পর্কের দাম ছিল। আজ নলিনের হাতের পুতুল দেখে কলকাতার ব্যারিষ্টারের ছেলে—কঙ্কনার জমিদার-বাড়ীর বংশধর কাঁদে, হাটে নলিনের ডালা-ডালা পুতুল বিক্রী হয়—আজ আর তোমার সঙ্গে সম্পর্কের দাম কি বলতে পার? সাধারণ সম্পর্ক নয়—মানে—অসাধারণ সম্পর্ক! হাসিও পায়—দুঃখও ধরে। ছি! তোমার লজ্জা হয় না, কিন্তু আমি লজ্জা পাই।

টাকা পয়সাগুলি মুঠায় তুলিয়া স্বর্ণ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। বলিল—মহিলা-সমিতির সঙ্গে তোমার সম্পর্কও কিছু নাই, আমি এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, আমি নিলাম টাকা। ঠিক মিলিয়ে হিসেব ক'রে দেখে নেব। নলিন, তোমাকে আমি খালাস দিলাম। আমাদের ব্যবস্থা আমরা যা হয় করব।

নলিন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াই রহিল। কোন উত্তর সে দিল না।

দেবু বলিল—চা খাবি?

নলিন ঘাড় নাড়িল—না। ঘাড় তুলিয়া বলিল—চা খেয়েছি একবার। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তা হ'লে আমি যাই।

—আচ্ছা।

যাইতে গিয়া নলিন কিন্তু ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—ছেলের হাত থেকে পুতুলটা নেওয়া কিন্তু আমার মনে ভারী লেগেছে পণ্ডিত। আমি একদিন বাবুদের বাড়ীতে গিয়ে একটি বুড়ো পুতুল ওদের দাওয়ার ওপর রেখে পালিয়ে এসেছি। শুনলাম বাবু সেটাকে লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে। তা দেক। তার ধর্ম্ম তার ঠাঁই—আমার ধর্ম্ম আমার কাছে।

আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—স্বর্ণদিদি বললে আমাকে কথাগুলান—তা—কথাগুলান সত্যি। একটুকুও বাড়িয়ে বলে নাই। সেই নজরবন্দীবাবু আর তুমি না থাকলে পণ্ডিত আমার ভাগ্যে—। বোধ হয় খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিল—মুটে মজুরের কাজ ক'রেই জীবন কাটত আর কি! আমার জাতজন্ম নিয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে—বাড়ীতে চাকরও কেউ বোধ হয় রাখত না। তা ছাড়া তুমিই আমাকে টেনে নিয়ে এলে জংসনে। আমার খুব ভয় ছিল। জংসনকে দেখে এখনও আমার ভয় লাগে। জংসনে টেনে এনেছ, তাই পুতুল বিক্রী হচ্ছে। লোকে জানতে পেরেছে—তারিফ করছে। তা—। তা যতদিন বাঁচব—আমি বলব সবাইকে, আজও বলি—এর পরও বলব—পণ্ডিত ছিল তাই আমার সব। তা আমি বলব।

দেবু এতক্ষণে রাগ করিল। যাহার কাছে কৃতজ্ঞতা পাওনা থাকে—সে অকৃতজ্ঞ হইলে দুঃখ অবশ্যই হয়, কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার ভান করিয়া ন্যাকামি করিলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। দেবুর মনে হইল, নেলো এইবার ন্যাকামি সুরু করিয়াছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল—সে না বললেও চলবে রে। সে আশা ক'রে তোকে আমি সাহায্য করি নি। বুঝলি!

—সে আমি জানি পণ্ডিত। আমার গুণ আছে দেখে তুমি সাহায্য করেছিলে। আমিও এতদিন তুমি যা বলেছ—না করি নাই। তুমিই বল পণ্ডিত। তখন আমি ছেলেমানুষ, তুমি—সেই নজরবন্দীবাবু কত চিঠি আমাকে দিয়েছ···আমি জংসনে—সদরে দিয়ে এসেছি—ভেবে দেখ! তার পরে—কত ছবি তুমি বরাত করেছ—আমি এঁকেছি, তুমি ভেবে দেখ। সেই একটা শেকল বাঁধা মানুষ—টেনে শেকল ছিঁড়ছে ছবি তুমি আঁকালে—আমি আঁকলাম। তুমি বললে না কিছু, তবু আমি তো বুঝতে পেরেছিলাম ওর মানে কি? 'না' তো আমি করি নি। দারোগা ডেকে নিয়ে বললে—তুই এঁকেছিস। তোমার বিপদ হবে বুঝে আমি বলেছিলাম—না। মার দিয়েছিল—তবু হ্যাঁ বলি নাই। মনে কর তুমি। তারপরে যত ছবি আঁকালে। কিন্তু—ও-সব আমার ভাল লাগে না. পণ্ডিত, তাতেই পণ্ডিত—। ভাবছিলাম অনেক দিন থেকেই। এবারে এই ব্যাপারে মনে আমার ভারী ঘা লেগেছে। তাই সব ব'লে ক'য়েই আমি স'রে যাচ্ছি।

এই ধরণের কথা দেবু নলিনের কাছে প্রত্যাশা করে নাই। সে তাহাকে দিয়া দলের মত-অনুযায়ী কতকগুলা পোষ্টারের ছবি আঁকাইয়াছিল। উদ্দেশ্যটা কেবল যে দলের কার্য্যোদ্ধার একথা ঠিক নয়, চিত্রশিল্পের কল্পনায় অঙ্কন-পদ্ধতিতে তাহার চোখের সামনে একটা নূতন পথের ইঙ্গিত দিতেও চেষ্টা করিয়াছিল। সেই চেষ্টাকে এমন বিকৃতভাবে নেলো গ্রহণ করিবে—তাহা সে ভাবে নাই। দেবুর মাথার মধ্যে রক্ত যেন চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল। নেলো পয়সাকড়ির ব্যাপারে অত্যন্ত হিসাবী এবং কৃপণ সে তাহা জানে। সেই কারণে পোষ্টারের ছবি আঁকাইয়া সে তাহাকে মজুরী দিতেও চাহিয়াছিল। নলিনই লয় নাই। হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল—পণ্ডিত, তোমার কাছে আমি ছবির দাম নিতে পারব না। এখন আমার পয়সা আছে। কিছু টাকা আমি জমিয়েছি। যদি অভাব কখনও হয়—এমনি চেয়ে নোব। তুমি যা করেছ —আমার বাপ-দাদাতে তা করত না পণ্ডিত। তারা আমাকে ছবি আঁকতে রঙ তুলি কিনে দিত না। বোষ্টমের ছেলে—কাঁধে ঝোলা দিয়ে বলত—ছবি আঁকতে হবে না পোটোর মত—ভিক্ষে ক'রে আন্‌ গিয়ে। নয় তো ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকর-খানসামার কাজে ভর্ত্তি ক'রে দিত।

কথাগুলি শুনিয়া দেবুর বড় ভাল লাগিয়াছিল, শুধু তাই নয়—নেলোর উপর তাহার যে স্নেহ সেই স্নেহের সঙ্গে একটা শ্রদ্ধাবোধ যুক্ত হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল—ছেলেটা শুধু জন্মগত শিল্পবোধ লইয়াই সংসারে আসে নাই—শিল্পবোধের সঙ্গে শুদ্ধ মনুষ্যত্ব-তৃষ্ণাও লইয়া আসিয়াছে!

আজ দেবুর সমস্ত ধারণা এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। রাগ তাহার হইয়াছিল—সে-রাগ সংযত করিয়াও দেবুর কণ্ঠস্বর মাত্রাতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। গম্ভীর কণ্ঠে দেবু বলিল—তার জন্যে তো আমি মজুরী দিতে চেয়েছিলাম নলিন। তুমিই নাও নি। ভাল ক'রে স্মরণ ক'রে দেখ তুমি।

নলিন একটু চমকিয়া উঠিল—বলিল—তা কি আমি বলেছি পণ্ডিত?

—তবে? তবে তুমি বলছ কি?

—বলছি—। নলিন মাথা চুলকাইতে লাগিল। মনের কথা সে যেন ঠিক প্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

—কি বলছ—বল?

—মানে—। ও সব আঁকতে আমার ভাল লাগে না। ও-সব—। এবার সে একবার বাঁ কাঁধ—একবার ডান কাঁধ ঝাঁকি দিয়া নিজের মনের অস্বাচ্ছন্দ্য এবং অক্ষমতা অসহায়ভাবে প্রকাশ করিল। তারপর বলিল—আমি যাই পণ্ডিত মশায়। নতুন দোকান করছি—তার উদ্যুগ আছে। আমি যাই।

—যাও।

নলিন আবার যাইতে যাইতে ঘুরিল—বলিল—আমি নিজেও আর হাটে দোকান করব না পণ্ডিত মশায়। তাতেই আরও মিটিয়ে দিলাম আপনাদের সমিতির টাকা। বাবুদের ছেলের হাত থেকে পুতুলটা ছোঁ মেরে তুলে নিলে বড় দিদিমণি, সেটাও আমার যেমন মনে লেগেছে, বাবুদের ছেলের জন্যে পুতুল দিয়ে এলাম—সেই পুতুল বাবু লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে—তাও তেমনি আমার মনে লেগেছে। ওদের হাটে আর আমি দোকান করব না। সে যদি না-খেতে পেয়ে ম'রেও যাই, তবুও না। আমি ইষ্টিশানের ফটকের ধারে বড় অশথ গাছটার নিচে—দোকান পাতব। ওই যে—কংরেজ স্যান মশায় আছেন—উনি নিয়ে গিয়েছিলেন সুরপতিবাবুর কাছে;—উনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান তো, ওঁকে বলে ক'রে দিলেন। রাস্তা বোর্ডের, জায়গাটাও বোর্ডের। গাছতলায় একটি তক্তাপোষ পাতব, তার ওপরে কাঠের খুপরী ঘর ক'রে নোব—পানের দোকানের মত। তা ছাড়া খানিকটা—

একসঙ্গে এতগুলা কথা বলিয়া ফেলিয়া নলিন হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল। যে কথাটা বলিতে গিয়া থামিয়া গিয়াছে—সে কথাটা সংকোচে আটকাইয়া গিয়াছে। ওই গাছতলায় দোকান বন্দোবস্ত লওয়া ছাড়াও সে খানিকটা ভিটা বন্দোবস্ত লইয়াছে। জংসনে দক্ষিণ দিকে একটা দেহব্যবসায়িনীদের পল্লী আছে। সেই পল্লীর মুখেই একটি ভিটে সে কিনিয়াছে। গিরীশ ছুতার মধ্যে থাকিয়া সস্তায় ভিটাটা করিয়া দিয়াছে। ওইখানেই সে ঘর তুলিবে। একখানা

ঘর—একটা বড় চালা, আরও একটা ছোট চালা। ঘরখানায় সে বাস করিবে, ছোট চালাটায় রান্না হইবে, বড় চালাটা হইবে তাহার পুতুল গড়িবার ঠাঁই।

দেহব্যবসায়িনীদের সম্পর্কে তাহার নিজের কোন সংকোচ নাই। কিন্তু দেবু পণ্ডিত, স্বর্ণ—ইহাদের আছে, সে কথা জানে বলিয়াই কথাটা বলিতে গিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

দেবু বেশ একটু বিস্ময় বোধ করিল। সমস্ত শুনিয়া স্বর্ণের মনও অনেকটা প্রসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া জমিদারের হাট পরিত্যাগ করিয়াছে এই সংবাদে তাহাদের দুইজনেই খুশী হইয়াছে।

স্বর্ণ বলিল—এতক্ষণ এ কথা বলিস নি কেন ?

দেবু হাসিল—বলিল—শ্রীমান নলিনচন্দ্রের কথাবার্ত্তার ধরণই এই। ফ্ল্যাস ব্যাকটা খুব পছন্দ ওর।

নলিন বার দুই কাঁধ ঝাঁকি দিয়া বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ যেন পলাইয়া গেল। দেবু একটু ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—নলিন!

দরজার ওপার হইতে উত্তর আসিল—কাল আসব। আজ—

আজ সকালেই সতীশ বাউরীর আসিবার কথা আছে। ঘর ঠিকা লইবে। সতীশ বাউরী পঞ্চগ্রামের মধ্যে পাকা দেওয়াল-বারুই, তাহার হাতের কাঁচা মাটির ঘরের আজও একশ বৎসর পরমায়ু।

সতীশ বলে—চার শতায়ু—পাঁচ শতায়ু ঘর সে আমরা পারি না। তবে—হ্যাঁ, শতায়ু ঘর—মানে যদি ঠিক মতন ছাদন টাদন দিয়ে রক্ষে করেন তবে একশো বছর যাবে। তিন চার বছর অন্তর পোঁতা বেঁধে যাবেন—মেঝেতে ইঁদুর লাগলে—খুঁড়ে জল ঢেলে—নতুন মেঝে করবেন—ব্যস্।

সতীশও আজকাল পঞ্চগ্রামের জীবনগণ্ডী অতিক্রম করিয়া জংসনে আসিয়াছে। অবশ্য পুরাপুরি নয়, আংশিক ভাবে। চাষের সময় পঞ্চগ্রামের মাঠে চাষ করে, ফসল উঠিয়া গেলে—মাস চারেক সে জংসনে আসিয়া কাঁচা মাটির বাড়ী ঠিকা লইয়া কাজ করে। গিরীশ ছুতার চাল কাঠামো তৈরী করে, সে সতীশকে কাজ জুটাইয়া দেয়, সতীশ দেওয়াল তৈয়ারী করিয়া গিরীশকে কাঠামোর কাজ আনিয়া দেয়।

গিরীশ বলে—এটা আমাদের গিরীশ সতীশ এ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। কণ্ট্রাকটার বিল্ডার এ্যাণ্ড কারপেণ্টার।

সতীশ হাসে।

গিরীশ বলে—তুই যদি হোলটাইম হ'তে পারতিস সতীশ, হাফটাইম হলেও হ'ত একরকম। এ যে কোয়াটার টাইম। মোটে তিন চার মাস!

গিরীশ নলিনের তক্তাপোষ দোকানটা ঠিকা লইয়াছে। বলিয়াছে—এস্তা বানিয়ে দোব, দেখবি। পিছনের কাঠের দেওয়ালে—থাক্ লাগিয়ে দোব। দুই পাশে কব্জা দিয়ে দুপাল্লা—তাতেও থাকবে আলমারী। বন্ধ ক'রে তালা দিয়ে দাও, একটি বন্ধ আলমারী। খুলে দাও, থাকে-থাকে পুতুল সাজানো সারি-সারি। সবুজ রঙ লাগিয়ে দোব। সাদা হরফে লিখে দোব—"গিরিন কেবিন—পুতুলের দোকান।" অর্থাৎ গ্রাণ কেবিন—।

* * *

স্বর্ণ বলিল—মিথ্যে ওর ওপর রাগ করছিলাম আমরা। সেকালের মন ওদের, ওরা সব বুঝতে পারে না। তুমি যে সব আইডিয়া দাও, সে সব ওর ঠিক মাথায় ঢোকে না।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

নদীর ধারে মুখার্জ্জীবাবুর মিলে—ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল। সে উঠিল। প্রাইভেট টিউশনির সময় হইয়াছে। ঠিক প্রাইভেট টিউশনি নয়, কোচিং ক্লাস। ষ্টেশন-মাষ্টারদের ছেলেমেয়েদের লইয়া সকাল সন্ধ্যা কোচিং ক্লাস করে সে। দশ বারোটি ছেলে, ছেলে পিছু তিন টাকা মাইনা। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা ওখানেই হয়। এ ছাড়া খবরের কাগজ আছে, গৌর কাগজ বেচে, কমিশনের অর্দ্ধেক সে পায়, অর্দ্ধেক দেবুর, তাহাতেও দশ পনের টাকা পায়। স্বর্ণ মাইনে পায় তিরিশ টাকা। আশী টাকায় বেশ চলিয়া যায় দুজনের। চাষের ধান চালটা ইহার পরে।

—হ্যালো কমরেড ডেবেনোত্তস্কি!

দেবু দেখিল—উকীল সুরপতিবাবু বাইসিক্লে চড়িয়া পিছন হইতে আসিতেছেন। আগে সুরপতি দেবুকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন, বলিতেন—চাষা!

আজকাল দৃষ্টি খানিকটা পাল্টাইয়াছে। এখন ব্যঙ্গ

করিয়া বলেন—কমরেড। কখনও কমরেড গোস্থা, কখনও কমরেড ডেবেনোভস্কি, কখনও বলেন—এই যে ব্রাদার—এলোঁমেলো ক'রে দে-মা লুটেপুটে খাই!

কাজ সুরপতির নাই—সে দেবু জানে; শুধু ওই কমরেড ডেবেনোভস্কি বলিয়া ব্যঙ্গ করিবার জন্যই ডাকিয়াছে। দেবু ফিরিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া হাসিল।

সুরপতি সাইক্ল হইতে নামিয়া বলিল—কি ব্যাপার ভাই দেবনাথ? তোমার সেই কারিগর ছোকরা দেবকী সেনের হাতে গিয়ে পড়ল কেমন ক'রে বল তো? আমার কাছে গিয়েছিল সেনকে নিয়ে—ষ্টেশনের ধারে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের গাছতলায় দোকান করবে। আমি অবিশ্যি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম না কিছু, তবে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। তোমায় বাদ দিয়ে দেবকীকে নিয়ে এসেছে—ব্যাপার কি? হাটে ষ্টল করছিল—তোমাদের মহিলা-সমিতির ষ্টলের সঙ্গে—হঠাৎ ঘুড়ির মত গোঁত্তা খেয়ে লাইনের ওপার থেকে—এপারে এসে পড়ল ছোকরা!

দেবু হাসিয়া বলিল—কি জানি কি হ'ল! শুধু বললে—ছেলের হাত থেকে পুতুল কেড়ে নিলে পণ্ডিত—! সেন্টিমেন্টে লেগেছে আর কি!

সুরপতি বলিলেন—ঠিক করেছিলেন অরুণা ভটচাজ! ওতে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কঙ্কনার জমিদার-নন্দন প্রজার বুকের রক্ত-চোষা টাকায় বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে এসে একেবারে লীডার সেজে বসবার মতলব—ওদের আমিও একেবারে দেখতে পারি নে। আরে বাবা, পাড়াগাঁয়ের মহালে প্রজাদের সঙ্গে যা করিস তা' করিস, জংসন ম্বারমণ্ডলের মত একটা এতবড় জায়গা—এখানে পর্য্যন্ত জমিদারী চাল চালতে যায়! জমিষ্টার—বলে কি জান?—জমিষ্টার বোঝ তো? জমিদার কাম্ ব্যারিষ্টার—জমিষ্টার! জমিষ্টার সাহেব—সেদিন বলে—অরুণা ভটচাজের চাকরী খেতে হবে—স্বর্ণের চাকরীও। শেষ বলে—ন্যায়রত্ন অরুণা দেবীকে নাত-বউ স্বীকার ক'রে ওর বাড়ীতে যখন নিমন্ত্রণ নিলেন—তখন ওঁকে পতিত করা হোক! আমি তো হাসব—না—কাঁদব ভেবে পাই নে!

—শুনবে বই কি। তোমাদের স্পাইয়িং সিষ্টেম—পুলিসের চেয়ে খারাপ নয়। সুরপতি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হঠাৎ হাসি থামাইয়া বলিলেন—অরুণা দেবীর রেজিগ্‌নেশন আমি এ্যাকসেপ্ট করতে চাই নে। ওঁকে আমি লিখেছি—আপনি একবার অন্তত আসুন। চার্জ্জ বুঝিয়ে দিতেও তো আসতে হবে। তখন আসুন—এলে সাক্ষাতে সমস্ত কথাবার্ত্তা হবে। তারপর যা হয় করবেন। আজ চিঠি পেলাম—আসছেন তিনি। শীগ্‌গির আসবেন।

—আসছেন? লিখেছেন? দেবু চকিত হইয়া উঠিল।

—আজই সকালে চিঠি পেয়েছি। আচ্ছা, চলি। হ্যাঁ, কথায় কথায় আসল কথাটা ভুলে গিয়েছি। হাটের তোলা নিয়ে আন্দোলনটা বন্ধ করছ কেন? ধান চালের চল্‌তা ঈশ্বরবৃত্তি—ও দুটো নিয়েও যা আরম্ভ করেছ, ওতে আমার সিম্প্যাথি আছে। ফুল সিম্প্যাথি।

সুরপতি চলিয়া গেল। বড় ভাল সাইক্ল চালান ভদ্রলোক। ধীর গতিতে চলেন—বনিয়াদী চাল সাইক্লের গতির মধ্যেও ফুটিয়া উঠে।

ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনেই রেলওয়ে কম্পাউণ্ড, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তাটা আসিয়া রেলের ফটকের মুখে শেষ হইয়াছে। চারিপাশে অনেকটা খোলা জায়গায় থান দশেক মোটর বাস দাঁড়াইয়া আছে। খোলা জায়গাটার চারিপাশে বড় বড় গাছের শ্রেণী একটি ছায়ামণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। আগে গরুর গাড়ী ষ্টেশনে যাত্রী আনিয়া এই ছায়ায় বিশ্রাম করিত। মোটর-বাসের চলন হওয়ার পর গরুর গাড়ীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এখন এই সব গাছের তলায়—ছোট-খাটো দোকান বসিতেছে। পান-সিগারেট, চানাচুর, তেলে-ভাজা, গোটা কয়েক ছোট চায়ের দোকান—ভাঁড়ে-চা-বিক্রেতা, একটা গাছতলায় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের জলসত্র—এই সব লইয়া বেশ একটি ছোট বাজার বসিয়াছে, এইখানেই সম্ভবত এই অশথ গাছটার তলায় নেলোর দোকান বসিবে।

বাসের ভিড়ের মধ্য হইতে একটা ছোকরা ছুটিয়া আসিল।—মাষ্টারজী!

শিবকালীপুরের সদ্‌গোপদের একটি অনাথ ছেলে। আজ আর সে অনাথ নয়, নিজের ভার সে নিজেই লইয়াছে। ছেলেবেলায় অনাথ ছিল। বছর আষ্টেক বয়সে—মা-বাপ দুইই মারা গিয়াছিল, ছেলেটা পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত—প্রতিবেশীর দাওয়ায় বা চণ্ডীমণ্ডপে—ঘুমাইত, লোকের বাড়ীতে মাগিয়া খাইত। অনিরুদ্ধ কর্ম্মকারের সন্তানহীনা স্ত্রী—ছেলেটাকে কুড়াইয়া লইয়া মানুষ করিয়াছিল। কামার-বউ একদিন চলিয়া গেল—

দেবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

উচ্চিংড়ে আসিয়া জংসনে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। প্রথমে করিত ভিক্ষা। তারপর সে নিজের কাজ বাছিয়া লইয়াছে। বাসে আসিয়া কাজ লইয়াছে।

উচ্চিংড়ে একখানা চিঠি দেবুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

উচ্চিংড়ে দেবুর চেলা। দেবুর একটি চেলার দল আছে। দল নহিলে—পৃথিবীতে বাঁচিবার উপায় নাই। বিশেষ জংসনে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালী যুবকদের পক্ষে জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। ১৮ হইতে ৩০ বৎসরের স্বাস্থ্যবান যুবক মহকুমা-শাসকের নিকট সত্বর আবেদন করুন। আন্দাজ তিন সপ্তাহ শিক্ষা দেওয়া হইবে; যাহারা উত্তীর্ণ হইবে, বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে। বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে সুযোগ পায় না বলিয়া যাঁহারা এতদিন অনুযোগ করিতেন, আশা করি, সত্বর এই জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিবার প্রেরণা দিবেন। দেশের ছেলেদের দেশরক্ষা কার্য্যে শিক্ষালাভের এ মহাসুযোগ কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। —পল্লীবাসী

* * *

বর্ধমান জেলার নবপ্রতিষ্ঠিত বিরাট নগরী চিত্তরঞ্জনে বাঙ্গালীর স্থান নাই। অথচ বাঙ্গালীদের মধ্যে সহস্র সহস্র বেকার পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রাদেশিকতায় চিত্তরঞ্জন বিষাক্ত হইয়া আছে। অবশ্য এখানে প্রাদেশিকতা করিতেছে মাদ্রাজীরা। মাদ্রাজী কেরাণী, মাদ্রাজী টাইপিষ্ট, এমন কি মাদ্রাজী স্কুল শিক্ষকও চিত্তরঞ্জনে সমস্ত দিক দখল করিয়া আছে। উপরের কথা তো বলিতেই নাই। কেমিষ্ট নায়ার, এ, এম, ই, শাস্ত্রী- চার্জ্জমেন সীতারমন, কৃষ্ণস্বামী ও তস্যভ্রাতা নারায়ণ স্বামীর, বীর রাঘবনের দৃষ্টান্ত এবং তাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেই সব বুঝা যাইবে। স্বজনপ্রীতি আত্মীয়পোষণ চিত্তরঞ্জনেরও নৈতিক জীবনকে কলুষিত করিয়াছে। —দামোদর

* * *

সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদকগণের মুখপাত্র হিসাবে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁহার ভাষণে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মিলনের অন্তরায় কোথায় তাহা খোলাখুলিভাবে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন, "পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই যে উহার ভিত্তি ধর্ম্মের উপরে। আমাদের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম্মনিরপেক্ষ এবং শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী যিনিই হউন না কেন, তাঁহার হাত শাসনতন্ত্র দ্বারা বাঁধা, কিন্তু দুঃখের বিষয় পাকিস্তানে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা নাই। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী পাকিস্তানে হিন্দুদের রক্ষা করিবার আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি মৌখিক! কাল হয়ত জনাব লিয়াকত খান পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী বা জনাব নুরুল আমিন পূর্ব্ববঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী না থাকিতে পারেন। তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তগণ শাসনতন্ত্রগত কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় এই প্রতিশ্রুতি নাও মানিতে পারেন।" সম্পাদক সম্মেলনে শ্রীযুত ঘোষ পরিষ্কারভাবে ভারতের দাবী পেশ করিয়াছেন। আমরাও বরাবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিতে দাবী জানাইয়া আসিতেছি। পাকিস্তান গণপরিষদ এখনও শেষ হয় নাই। পাকিস্তান ইচ্ছা করিলে আজই তাহা করিতে পারেন। —দামোদর

* * *

বাঙ্গালী ধনী জমিদার আজ সর্ব্বহারা হইয়া পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করে। এক মুঠা নামজাদা ডাক্তার ও ব্যারিষ্টার, উকিল লইয়া বাঙ্গালী জাতি নহে। যে দেশে শতকরা ৮৮জন নিরক্ষর শ্রমিক ও নারী, সেই দেশকে বাঁচাইতে হইলে, এই মূক মুখে যে ভাষা দিতে

হইবে শুধু তাহা অক্ষর পরিচয় নহে। আমাদের ঘরে ঘরে ঈশ্বর বিশ্বাসের উপাসনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা-ত্যাগের ব্যবস্থা যাহাতে হয়, সেই দিকে মন দিতে হইবে। সমষ্টিচৈতন্যকে জাগাইবার জন্য আমাদের সমাজে সুনীতি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। আমাদের ব্যষ্টিশক্তি সমষ্টিগঠনে চিরদিন অনুদ্বুদ্ধ, তাই আমাদের দেশের ৫০টী ব্যাঙ্ক অকৃতকার্য্য হইয়া মাথা গুঁজিল। যৌথ কারবার গড়িয়া উঠার প্রদীপশিখা জ্বালাইতে গিয়াও বাঙ্গালী জাতি অকৃতার্থ হইল। ধনসম্পদে, সমাজে, রাষ্ট্রে সমষ্টিশক্তি বিনিয়োগ করার জন্যই আমরা জাতির প্রাণশক্তির মূলে ঈশ্বরবিশ্বাসের দীপশিখাই উজ্জ্বল করিতে বলি। ব্যষ্টির ধনদৌলত, বাড়ী-ঘর কিছুই স্থায়ী হইবে না, সমষ্টিশক্তির প্রাণ চাই। সেই সমষ্টির মূলে ঈশ্বরচৈতন্য যদি জাগ্রত না হয়, আমরা যে দল গড়িব—সে দল স্বার্থ-কলুষিত হইয়া ছিন্নমস্তার ন্যায় আপনার কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া আপনারই রক্ত পান করিবে।

—নবসংঘ

* * *

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুরা মজা পাইয়া বসিয়াছে। যাহার যেখানে খুসী খালি বাড়ী দেখিলেই ঢুকিয়া পড়িতেছিল এবং খালি জমি পাইলেই খুঁটি গাড়িতেছিল। সরকারী কর্ম্মচারীরা এতদিন শুধু ইহাদের দৌড় কতদূর তাহাই দেখিতেছিলেন। ইহারা ভাবিয়াছিল এমনি করিয়াই বোধ হয় দিন চলিয়া যাইবে। কিন্তু পরে পিঠে যখন লাঠি পড়িল এবং নাকে চোখে টিয়ার-গ্যাস ঢুকিল তখন নাকের জলে চোখের জলে এক হইয়া আইনের মর্য্যাদা কি উপলব্ধি করিতে পারিল। এই সামান্য কথাটা তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে তাহাদের অদৃষ্টে যদি সুখশান্তি থাকিবে তাহা হইলে সাতপুরুষের ভিটা পরিত্যাগ করিতে হইবে কেন? আবার শুনিলাম ইহারা দল বাঁধিয়া বাংলার মুখ্যমন্ত্রী রায় মহাশয়ের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতে গিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা! অন্যায়ও করিব চোখও রাঙাইব? পুলিশ ইহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া একটা কাজের মত কাজ করিয়াছে। —যুগবাণী

* * *

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক নিযুক্ত করা নিয়ম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়ম পালন করা হইতেছে না। মন্ত্রীদের প্রিয় এবং অনুগৃহীত ব্যক্তিদের সরাসরি নিয়োগ করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে যে সেলস ট্যাক্স কমিশনার এবং আরও কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে না জানাইয়া সেল ট্যাক্স কমিশনারকে স্বীয় পদে পাকা করা হইয়াছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেন হইল পাবলিক সার্ভিস কমিশন গবর্ণমেন্টের নিকট তাহা জানিতে চাহিয়া কোন জবাব পান নাই। ইহা সত্য কি না গবর্ণমেন্ট তাহা জানাইবেন কি?

—যুগবাণী

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা আজকের দিনে ভারতের মনোভাবকেই বিশ্লেষণ করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, রাশিয়া ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশকে বাদ দিয়া জাতি-সংঘকে নূতন করিয়া গঠন করার প্রস্তাব অবিবেচিত ও অনিষ্টকর। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া জাতিসংঘ গঠিত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু একথাও সত্য যে, জাতি সংঘের শুধু অস্তিত্বের দরুণই আমরা বহু বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

জাতিসংঘ দ্বিধা-বিভক্ত হইলে পর বহু রাষ্ট্র এই দ্বিধা-বিভক্ত সংস্থার অঙ্গীভূত হইতে রাজী নাও হইতে পারে। ঘটনাবলীর চাপে অথবা নিজেদের স্বার্থে এই সকল রাষ্ট্র কোন জোটের সহিত মিলিত হইতে সম্মত হইবে না। তাহারা তখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আদর্শের সেবা করিয়া যাইবে। জাতিসংঘের রূপ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা হইলে, তাহা দ্বারা আরও শক্তিশালী সংস্থা গড়িয়া উঠিবে না।

—সৈনিক

* * *

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিতেছি। তাঁহারা সুকৌশলে বিহারের অন্তর্গত বাঙ্গলাভাষাভাষী অঞ্চলসমূহের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির যে বহুদিনের দাবী, তাহা চাপিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই: পূর্ব্ববঙ্গাগত শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসনে সাধ্যমত চেষ্টা করার জন্য কমিটি কংগ্রেস কর্ম্মিগণের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু এক শ্রেণীর দায়িত্বহীন লোক যে এই অবস্থার সুযোগ লইয়া বিহারের অংশবিশেষ বাঙ্গলার অঙ্গীভূত করার দাবী করিতেছে তাহার নিন্দা করিয়া বলা হয় যে, ইহাতে বিহারবাসীদের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হইবে এবং শরণার্থীদের স্বার্থহানি হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের অনুকূলে তাহার প্রাপ্য ভূমি ছাড়িয়া দিতে বিহারের অনিচ্ছার সংবাদ জানি। কিন্তু একটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পশ্চিমবঙ্গের বহুকালের দাবীকে কিরূপে এই বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন যে, এক শ্রেণীর দায়িত্বহীন লোক এই অবস্থার সুযোগ লইতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না। বিহার রাজ্যের কংগ্রেস তথা সরকারের এই কূটকৌশল মনোভাব সম্বন্ধে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ওয়াকিবহাল থাকা কর্ত্তব্য।

—জনসেবক

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদর দপ্তর রাইটাস বিল্ডিংএ সম্প্রতি ট্যাপিওকা হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকারের খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার্থ পরিবেশন করা হইয়াছে। ট্যাপিওকা ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসীদের একটি অন্যতম প্রধান খাদ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিষয়ক গবেষক মিঃ গ্রেগরী

বলেন যে, সেই সময়ে ত্রিবাঙ্কুরেও দুর্ভিক্ষ ঘটে, কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের হাজার হাজার লোক এই ট্যাপিওকা আহার করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। খাদ্য হিসাবে দেখা গিয়াছে ট্যাপিওকা আলুর অপেক্ষাও বেশি খাদ্যপ্রাণসমন্বিত। বাংলাদেশে ইহার প্রচলন আজও না হইলেও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত সেন এই বলিয়া আশা প্রকাশ করেন যে একদিন না একদিন ইহা বাঙালীর প্রিয়খাদ্য হইয়া উঠিবে। খাদ্য সম্বন্ধে বাঙালীর অভ্যাস যেরূপ অদ্ভুত, তাহাতে এই আশা কোনদিন পূর্ণ হইবে কিনা বলিতে পারি না। অবশ্য উপায়ান্তর না দেখিয়া খাদ্যের ব্যাপারে অনেক কিছু অসুবিধাই বাঙালীকে সহ্য করিতে হইতেছে ; কিন্তু তথাপি রন্ধনের প্রণালী পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ অধিবাসীদের এই জন্য অনেক ক্ষতি হইতেছে। বহু রন্ধনীয় উপকরণের মধ্যে ভেজাল আছে জানা সত্ত্বেও মুখরোচক আস্বাদের লোভে আমরা পুরাতন রন্ধনের প্রণালী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। এই রন্ধনের প্রণালী এবং বিশেষ বিশেষ অপ্রয়োজনীয় রন্ধন দ্রব্যের আসক্তি ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে না পারিলে আরো কতো দুর্ভোগ ভাগ্যে আছে তাহা বলা শক্ত। —নির্ণয়

* * *

বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেস প্রেসিডেন্টগণের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক সম্মেলনে একটী স্বল্প-মেয়াদী অর্থ-নৈতিক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করে জনসাধারণের কর্ম্মে উৎসাহ বর্ধনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ...কিন্তু এই প্রচেষ্টা আজও অঙ্কুরিত হয় নাই।...সকলেই স্বীকার করছেন যে স্বাধীন ভারতের সরকার যে মানসিকতা পরিবর্তনের ফলে অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে প্রগতি অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে, সে সম্পর্কে ব্যবস্থা করতে পারেননি।...কারণ জনসাধারণের মধ্যে উদ্যমের সঞ্চার সরকার করতে পারেননি।...সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ যথা চোরাবাজার, অন্যায় মুনাফা, ট্যাক্স ফাঁকী, ভেজাল প্রভৃতি অপরাধ আইনের চক্ষে ধরা পড়ে না। উপরন্তু এই দুষ্কৃতকারীরা সরকারী ঊর্ধতন কর্তাদের প্রভাবিত কোরে শাসন পরিচালনা বিষাক্ত করে তুলেছেন।...সাধারণ লোক মনে করে যে কতকগুলি ধনী ব্যক্তিরাই কায়েমী স্বার্থের প্রয়োজনে শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং প্রকৃত পক্ষে এটাকে জনসাধারণের সরকার বলা যায় না।...এজন্য প্রয়োজন ছিল এই সবের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যাতে সাধারণের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতো। তারই অভাবের জন্যই জনসাধারণের মধ্যে সরকারী প্রচেষ্টায় উদ্যমের সাড়া পাওয়া যায় না।...আমাদের বিশ্বাস এই সমাজ-বিরোধী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে...অবিলম্বে জনসাধারণের উদ্যমের বদ্ধদ্বার খুলে যাবে।

—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড

* * *

বর্দ্ধমান জেলায় পাঁচটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হইয়াছে বটে, কিন্তু একটি এক্সচেঞ্জ হইতে অন্য এক্সচেঞ্জে কথা বলিতে গেলে ট্রাঙ্কল চার্জ্জ করা হয় প্রতি তিন মিনিটে এক টাকা আট আনা। এখান হইতে কলিকাতা ও সহরতলীতে টেলিফোন করিতে গেলেও তিন মিনিটে ঐ দেড় টাকাই চার্জ্জ দিতে হয়। কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে মেমারী টেলিফোন করিতে গেলে প্রতিদিন মিনিটে লোক্যাল চার্জ্জ হিসাবে লাগে ছয় আনা মাত্র। এক জেলায় বাস করিয়া জেলাস্থিত বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে যদি কলিকাতার ন্যায় সম হারে কোন-সেলামী দিতে হয়, তাহা একান্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা বর্দ্ধমান জেলাস্থিত সমস্ত এক্সচেঞ্জগুলিতে পরস্পর কথা আদান প্রদানের সুযোগের জন্য একটা ন্যায্য পরিমাণ লোক্যাল চার্জ্জ ধার্য্য করিয়া ট্রাঙ্কলের দায় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য অনুরোধ করি। —দামোদর

* * *

অনেকেরই ধারণা আছে যে ভারতের আদর্শবাদী কংগ্রেসী প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ব্ল্যাকমার্কেটের উপর নিত্যন্তই খড়্গহস্ত। তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে পণ্ডিতজী বার বার এই প্রশ্নে বিব্রত হইয়া নিজেই ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ধানবাদে তিনি বলিয়াছেন যে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের ফাঁসি দিবেন একথা তিনি কোনদিন বলেন নাই, তবে ১৯৪৩ সালের বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের সময় যাহারা চাউলের ব্ল্যাকমার্কেট করিয়াছিল তাহাদের ফাঁসি হওয়া উচিত ইহাই তিনি বলিয়াছিলেন। বড়লোকের নামে দুষ্টলোকে যা তা রটায়, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু এরূপ ভাবে মিথ্যা কথা রটাইয়া যাহারা কংগ্রেসের বিশিষ্ট মুরুব্বীদের সঙ্গে পণ্ডিতজীর বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারা নিঃসন্দেহে পাষণ্ড এবং দেশদ্রোহী সন্দেহ নাই।

—যুগবাণী

* * *

দামোদর পরিকল্পনার ন্যায়ই ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইলে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং বর্দ্ধমান জেলায় ১৮লক্ষ বিঘা জমিতে জল সেচের সুব্যবস্থা হইবে এবং ৮১ লক্ষ মণ ধান ও ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার মণ রবিশস্য উৎপন্ন হইবে। অনুমান, এতদঞ্চলের কৃষি সম্পদ শতকরা একশত গুণ বৃদ্ধি পাইবে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধ নির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বীরভূমের সিউড়ী শহরের দুই মাইল দূরে ১০১৩ ফুট দীর্ঘ তিলপাড়া বাঁধ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। আশা করা যায়, ১৯৫১ সালে বর্ষা সমাগমের পূর্ব্বেই উহা সমাপ্ত হইবে এবং ৩ লক্ষ বিঘা জমি জল সেচের আওতায় আনা সম্ভব হইবে। এ পর্য্যন্ত আনুমানিক দুই কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। —জনসেবক

* * *

ভারতসরকারের আইন সচিব ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর ও তাঁহার পত্নী মহাদিল্লী বৌদ্ধবিহারে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ আম্বেদকর তপশীল শ্রেণীভুক্ত হিন্দু নেতা। তিনি

দুই বৎসর পূর্বে এক ব্রাহ্মণ মহিলাকে বিবাহ করেন। তপশীলিদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য তাঁহার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টার জন্য তাঁহার খ্যাতি ও শাসনতান্ত্রিক আইনে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ভারতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বিশেষতঃ তিনি ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান রচয়িতারূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বর্তমানে তিনি মনে করেন যে একমাত্র বুদ্ধের শিক্ষাই পৃথিবীর শান্তি আনিতে সমর্থ।

—অজয়

* * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও আরও একটি যে যুদ্ধ পৃথিবীর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছে ইহা আমরা সকলেই জানি। আর জানি, সেই মহাযুদ্ধে জগতের যে-মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে তাহা জোড়া না-লাগা পর্যন্ত সেই ভয়াবহ যুদ্ধ কোনোদিনই সম্ভব হইবে না। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছি, পূর্বের ভাঙা-হাড় জোড়া না লাগিতেই যুদ্ধের জন্য প্রায় সকলেই গোপনে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এই গোপন-প্রস্তুতির অন্তরালে আর যাহাই থাকুক, শান্তি যে কেহই চাহিতেছে না ইহা সুস্পষ্ট। অথবা শান্তির জন্যই আর একটি দারুণ অশান্তিকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে। কিন্তু সেই শ্মশানে শান্তি আনিয়া জগতের কি কল্যাণ সাধিত হইবে আমরা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গ—জার্মানী, ইতালী ও জাপান, ইংরেজ, ফরাসী, রুশ ও মার্কিন শক্তিপুঞ্জের উপর যে আঘাত হানিয়াছিল, তাহাতে এই চতুর্বর্গ এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন ফ্যাসিষ্ট শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য। কিন্তু ধ্বংস-কার্য শেষ হইলে দেখা গেলো, তাহারা আর এক লক্ষ্যে হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এ অবস্থায় পশ্চিমি শক্তিবর্গ নিছক আত্মস্বার্থ রক্ষার তাগিদেই জোট বাঁধিলেন এবং উত্তর অতলান্তিক চুক্তি হইতে সুরু করিয়া কলম্বো ও সিডনীর কমনওয়েলথ সম্মেলন পর্যন্ত যতকিছু উদ্যোগ আয়োজন হইয়াছে, তাহার মাধ্যমে নিজ নিজ অধিকার রক্ষার জন্য কোমর বাঁধিলেন—এইভাবেই যুদ্ধোত্তর পৃথিবী অনিবার্য আদর্শ-বিরোধে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িল। শুধু তাই নয়, দেখা গেলো, আড়ালে আড়ালে দুই তরফই ব্যাপক রণ-প্রস্তুতির উদ্যোগ আয়োজন প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। আরো লক্ষ্য করা যাইতেছে, যে জিন্নার "বিপন্ন ইসলাম" ধুয়ার মতো এই সকল অঞ্চলে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলিও একটা "বিপন্ন ইউরোপীয় উদার নীতি"র ধুয়া তুলিতেছেন। শুধু ধুয়া তুলিয়াই তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন না, দল ভারী করিবার বিবিধ চেষ্টা ঐ সঙ্গে করিতে লাগিলেন।

অনুমান করা যাইতেছে, এই প্রাথমিক উদ্যোগ পর্বের আড়ালে একটী বৃহৎ সম্ভাবনা আসন্ন।

—সৈনিক

* * *

ভারতবর্ষ হইতে বৎসর বৎসর যে কোটি টাকা মূল্যের চা বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার কারবার শ্বেতাঙ্গদের একচেটিয়া। এই অনভিপ্রেত অবস্থার পরিবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য লইয়া ভারত সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপেনসন বোর্ডের স্থলে কেন্দ্রীয় চা বোর্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং মিঃ এম কে সিংহ উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সম্প্রতি মিঃ সিংহ ছুটি লওয়াতে তাঁহার স্থলে জেমস ফিনলে এণ্ড কোম্পানীর মিঃ বেলকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই পদে নিযুক্ত করিবার মত একাধিক যোগ্য ভারতবাসী থাকা সত্ত্বেও একজন শ্বেতাঙ্গকে কেন এই পদে নিযুক্ত করা হইল তাহাতে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। আলোচ্য বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ভারতবাসী যাহাতে চায়ের রপ্তানী ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য ইউরোপীয় চা ব্যবসায়িগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বোর্ডের সভাপতির ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ পদে উক্ত ইউরোপীয় চা ব্যবসায়ীদেরই একজন প্রতিনিধিকে নিয়োগ করার ফলে ভারতীয় চা ব্যবসায়ীদের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। এই কারণে উক্ত নিয়োগ সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য ভারত সরকারকে আমরা অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

—আর্থিক জগৎ

* * *

—এগারো—

রেশমের কুঠির শ্রীহীন কম্পাউণ্ডটার মাঝখানে দার্শনিকের মতো নিরাসক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ক্রু সাহেব।

দৃষ্টিটা আকাশের দিকে। একটা বিশাল কালো কম্বলের কয়েকটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে কালো মেঘের টুকরো। রক্তমাখানো দুটো ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে যেন এক ঝলক তীক্ষ্ণ হাসির আভাস জাগিয়ে ঝলসে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। আজ হোক কাল হোক—লালমাটির রাঙা ধুলোয় তাণ্ডব তুলে ছুটে আসবে ঝড়, ভেঙে পড়বে রূপোর তীরের মতো খরধার বৃষ্টি।

উগ্র সূর্যকিরণের জ্বালায় কঠিন পোড়া মাটি এলিয়ে আছে একখানা বিশাল পাথরের মতো—যেন বলির রক্তের রঙ্ মাখা। বর্ষার জল পড়লে একরাশ ঘন রক্তচন্দনের মতো কোমল হয়ে যাবে—তৃণাঙ্কুর মাথা তুলবে এখানে ওখানে। শুকিয়ে আসা বিলগুলো ভরে যাবে ঘোলা জলে আর গাঢ় সবুজ উজ্জ্বল পদ্মপাতায়।

এখনো যেন পোড়া মাটি থেকে কী একটা উঠছে খানিক তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো। শুকনো কলাপাতার মতো মরা ঘাসের রঙ। জলহীন খানা ডোবার ফাটলে ফাটলে একরাশ শুঁটকি মাছের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে জীওল মাছের ঝাঁক। তিন হাত মাটির নিচে শক্ত খোলার ভেতরে পা-মুখ গুটিয়ে নিয়ে যোগমগ্ন আছে 'ছুয়া'র দল—সাঁওতালেরা এখনো ওদের সন্ধান পাবে না।

কিন্তু ক'বে আসবে বৃষ্টি?

একটা অদ্ভুত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ক্রু সাহেব। দিগ্-দিগন্তব্যাপী মাঠজুড়ে ছুটে আসবে মহানন্দা— পুনর্ভবা আত্রাইয়ের জল, দাম ঘাসের শীষকে বারো হাত লম্বা করে দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ খেলবে সীমাহীন 'চাফালে চাফালে'? আর চাফাল থেকে সেই জল বয়ে আসবে এই শুকনো কাঁদড়ের সংকীর্ণ খাত দিয়ে—বয়ে নিয়ে যাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে মাটির তলায় সন্তর্পণে পুঁতে রাখা বাদামী রঙের সেই হাড়গুলি?

খুন। সে খুন করেছে।

নিজের হাত দুটো চোখের সামনে বাড়িয়ে ধরল ক্রু সাহেব। যেন মণিবন্ধের হাড়দুটো তার ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, তাই আঙুলগুলো অসহায় ভাবে কাঁপছে থর থর করে। তাদের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই তার। দিনের পর দিন—বছরের পর বছরগুলি মনের যে অন্ধকার সংকীর্ণতায় স্তরে স্তরে মাকড়শার জাল বুনেছিল—জটাধর সিংয়ের খুন সেই জালটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

তখনো মার্গা আসেনি জীবনে। তখনো আরম্ভ হয়নি এমন একটা শান্ত-নিরীহ অহিংস অধ্যায়। পার্সিভ্যাল ক্যাক্রুর উদ্দাম রক্ত ধমনীতে ধমনীতে মাতলামি করে ফিরছে। কালো মায়ের তপ্ত কামনার সঙ্গে বাপের মত্ত লালসার প্রেরণায় সেদিন—

একটার পর একটা উল্কা ঝরে পড়া সেপ্টেম্বরের রাত্রে—চামড়ার মতো পুরু নীরেট অন্ধকারে—হাওয়ার শির্‌শিরানি লাগা ঘন বেনাবনের মধ্যে। বায় কয়েক দপ দপ করে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বেজে উঠেই—হঠাৎ একটা ফুটবল-ব্লাডারের মতো চুপ্‌সে নেমে গিয়েছিল হৃৎপিণ্ডটা। হাতের তলায় সেটা স্পষ্ট টের পেয়েছিল স্মাইদ্ ক্যাক্রু। টের পেয়েছিল কেমন করে শরীরের উত্তাপ নিবে গিয়ে তা ক্রমশ শীতল আর আড়ষ্ট হয়ে আসতে থাকে।

—হ্যালো স্মাইক্!

কোথায় যেন বিস্ফোরণ ঘটল ডিনামাইটে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের কোলে বিদ্যুতের রক্তমাখা ঠোঁট থেকে যেন বেরিয়ে এল বজ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন। অতলবাহী কোনো লাভাস্রোতের উৎক্ষেপে যেন দোলা খেয়ে উঠল পায়ের তলায় মাটিটা।

—হ্যালো স্মাইদ্!

ভগবানের ভুল হতে পারে, শয়তানের ভুল হওয়াও সম্ভব, কিন্তু অ্যাল্‌বার্টের নয়। তিব্বতের কোনো পাহাড়ী গুহায় গিয়ে লুকিয়ে থাকলেও সে ঠিক আবিষ্কার করে ফেলত। প্রশান্ত মহাসাগরে ডুব দিয়ে থাকলেও ডুবুরী হয়ে ঠিক ধরে ফেলত অ্যালবার্ট।

ফোড়ার মধ্যে ছুরি বসিয়ে ডাক্তার রুগীকে হাসতে বললে কেমন দেখায়, সেটা অভিব্যক্ত হল ক্রু সাহেবের মুখে। একটা প্রাণান্তিক মোহিনী হাসি হেসে বললে, হ্যালো অ্যালবার্ট।

—অনেক খুঁজে আসতে হল—পিঠের ওপর একজোড়া বন্দুকের ভারে কুঁজো হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অ্যালবার্ট বললে, সে রীতিমতো অ্যাড্‌ভেঞ্চার—একেবারে মঙ্গোপার্কের মতো।

—মঙ্গোপার্কের পরিণামটা তোমারও ঘটলে আমি বেঁচে যেতাম—মনে মনে দাঁত খিঁচিয়ে বললেও বাইরে দেঁতো হাসিটা বজায় রাখতেই হল ক্রুকে : কিন্তু আজকে তো তোমার—

—না, আমার আসবার প্ল্যান ছিল আগামী কাল সকালে। কিন্তু শিকারের লোভে মনটা এমন ছটফট করছিল যে একটা দিনও আর দেরী করতে ইচ্ছে করল না। তা ছাড়া ভাবলাম, তোমাকে একটা সারপ্রাইজ্‌ও দেব, তাই—

—কিন্তু তোমার তো খুব কষ্ট হল। যদি কাল সকালের ট্রেনে আসতে তা হলে এসব ট্রাবল হত না—এতক্ষণে একটা আশ্বস্ত আত্মপ্রত্যয়ের স্বর ফুটল ক্রুর গলায়। সত্যিই তো, কালকের ট্রেনে যদি অ্যালবার্ট আসত, তা হলে কী হত কে বলতে পারে? কে বলতে পারে একখানা গাড়ি নিয়ে সে স্টেশনে যেত না, একটা রাজকীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করে আনত না অ্যালবার্টকে। একটা রাত্রি—একটা সম্পূর্ণ রাত্রি ছিল তার হাতে। সে রাত্রিটিতে কী হতে পারত আর কী যে হতে পারত না—তা তো অ্যাল্‌বার্টের জানার কথা নয়!

—একটা মন্দ অ্যাড্‌ভেঞ্চার তো হল না!—কাঁধের ওপর দুটো বন্দুকের ভার বয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অ্যাল্‌বার্ট তাকালো নিজের ট্রাউজারের দিকে। পা [illegible]

কোমর পর্যন্ত লাল-কালো কাদায় একাকার। চকচকে জুতো জোড়ার আভিজাত্য একরাশ কাদার প্রলেপে চাপা পড়ে গেছে। নিম্নাঙ্গটা করুণ চোখে লক্ষ্য করে অ্যালবার্ট বললে, ট্রাবলও অবশ্য দিয়েছে কিছু কিছু।

—তাই তো, ছিঃ ছিঃ—সখেদে জানালো ক্রু সাহেব। কিন্তু মনের মধ্যে যেন একটা হিংস্র উল্লাস সাড়া দিয়ে বললে, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। যেমন অকারণে ভূতের মতো পরের ঘাড়ে এসে চেপে বসতে চাও, উপযুক্ত একটা শিক্ষা হয়েছে তার। শুধু কাদা কেন, কাঁদড়ের ভেতর তুমি ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকলেই আমি সত্যিকারে খুশি হতাম।

পাকা বারো মাইল পথ ঠেঙিয়ে এখন অ্যালবার্টের প্রাণ নাভিশ্বাস। শুধু কাঁধের ওপর দুটো বন্দুক ঝুলছে তাই নয়—হাতে একটা আধমণী সুট্‌কেস। ক্রুর প্ল্যান্টেশনের স্বপ্ন স্বর্গে আসবার খেসারত ইতিমধ্যেই অনেকখানি দিতে হয়েছে অ্যালবার্টকে। মাঠে গোরু ছেড়ে দিয়ে ঘুমুবার আশায় গল্পের যে লোকটি খাটিয়া সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারপর সারা দুপুর যাকে সেই খাটিয়া পিঠে বেঁধে মাঠঘাট বন-বাদাড় ছুটতে হয়েছিল গোরুর পিছে পিছে—অ্যালবার্টের এখন সেই দশা।

নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল।

—কি হে স্মাইদ্, এখন কি এখানে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে রসালাপ করবে, না তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটু বসতে দেবে?

—ওহো—সো সরি!—চোখ কান বুঁজে হেডিস্ কিংবা লিম্বোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার মতো ক্রু সাহেব বললে, এসো, এসো। ওই আমার কুঠি।

কুঠি নয়—আফ্রিকার জঙ্গল। কালো জানোয়ারের মতো থাবা পেতে বসে আছে মার্থা কারু। ও ক্রাইস্ট—ও হোলি শেফার্ড, এই মহা-সংকটে নিরীহ মেষশাবক ক্রু সাহেবকে রক্ষা করো প্রভু! ইহুদীদের অমন ক্রুসের যন্ত্রণা সইতে পেরেছ, আর মার্থার দাঁতের ধার একটু সহ্য করতে পারবে না? হে মানবপুত্র, ইচ্ছে করলে তুমি সব পারো।

ধরা ইঁদুরকে নিয়ে বেড়াল যেমন কিছুক্ষণ নিরুদ্বিগ্ন [illegible]

আন্তরিকতায় অ্যালবার্টকে আহ্বান এবং স্বাগত জানালো মার্থা।

পাছে অ্যালবার্ট আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মার্থা তার স্বাভাবিক গলা-বাজানো শুরু করে, এই ভয়ে আগে থেকেই হুঁশিয়ার হতে চাইল ক্রু সাহেব। বেশ শক্ত করে, আঁটঘাট বেঁধে!

—খুব বড় ঘরের ছেলে অ্যালবার্ট।

মার্থা সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

—ওর এক পিসেমশাই লর্ড। লর্ড অফ—লর্ড অফ—সাহায্যের আশায় স্মাইদ্ এবার কাতর দৃষ্টিতে তাকালো অ্যালবার্টের দিকে।

অ্যালবার্ট তখন ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কর্দমাক্ত জুতোটার ফিতে খুলছিল। মাথা না তুলেই ক্রু সাহেবের অসমাপ্ত কথাটা শেষ করে দিলে: লর্ড অফ ব্রেটনক্রুকশায়ার, নর্থ এক্মিটার।

ব্রেটনক্রুকশায়ার—নর্থ এক্মিটার! গালভারী শব্দ দুটো বোমার আওয়াজের মতো ক্রু সাহেবের নিজের কানেই শোনালো। এই দুটো প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর নামের কী প্রতিক্রিয়া মার্থার ওপরে ঘটে, সেটা লক্ষ্য করবার জন্য ক্রু সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল স্ত্রীর দিকে।

না, লক্ষ্য একেবারে ব্যর্থ হয়নি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চমক লেগে রইল মার্থার মুখে চোখে। গোল্ডার্স গ্রীনে কোনো এক 'ক্যারুজ'-এর অবাস্তর একটা কল্পমূর্তি নয়; অ্যালবার্টের মধ্যে সার আছে, ভার আছে। গলার টাই-পিন, জামা আর হাতের বোতাম খাঁটি সোনার। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের আংটিটায় সবুজাভ একটুকরো পাথর ঝলমল করছে—হীরে হওয়াই সম্ভব। ধুলো-কাদায় মাথা বেশ-বাসে স্পষ্ট স্বচ্ছলতার ছাপ। আপাতত পুরু একটা কাদার প্রলেপের নিচে ঢাকা পড়লেও জুতোজোড়া যে খাঁটি পেটেণ্ট লেদারের তাতে সন্দেহ নেই।

মেয়েদের জন্মগত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির সাহায্যে মিনিট তিনেকের মধ্যে এতগুলো জিনিস আবিষ্কার করল মার্থা। আরো আবিষ্কার করল—অ্যালবার্টের চুলের রঙ সোনালি, গায়ের বর্ণ তুষার শুভ্র, মার্থার হাতের 'ক্যাট্স্ আই' পাথরটার মতো কপিল চোখের তারা।

আর পাশাপাশি ক্যারু? কালো মায়ের কালো ছেলে; পার্সিভ্যালের এতটুকু চিহ্ন কোনোখানে খুঁজে পাওয়ার জো নেই।

একচোখে বিরাগ আর একচোখে বিমুগ্ধ বিস্ময় ফুটিয়ে মার্থা বললে, হাতমুখ ধুয়ে তাজা হয়ে নিন মিস্টার ফিলিপসন—আমার চা এখনি তৈরী হয়ে যাবে।

জুতোটার তত্ত্বাবধান করতে করতে মাথা না তুলেই অ্যালবার্ট বললে, অনেক ধন্যবাদ।

লর্ড অফ ব্রেটনক্রুকশায়ার, নর্থ এক্মিটার—শব্দ দুটোকে কানের মধ্যে ভরে নিয়ে চায়ের সন্ধানে চলে গেল মার্থা।

শুধু ক্রু সাহেব দাঁড়িয়ে রইল নিস্তব্ধ হয়ে। এখনো সামলে নেয়নি অ্যালবার্ট, এখনো ঠিক ধাতস্থ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু একটু পরে? মিথ্যার বালির বাঁধটা ধ্বসে একাকার হয়ে গেছে। কোন্ অলৌকিক উপায়ে এখন অ্যাল্বার্টকে দেখানো যাবে সারি সারি ফলন্ত আখরোটের বন, টলটলে নীল জলের নদীতে কার্পের ঝাঁক, ছবির মতো পামগাছের সারি! কোন্ ইন্দ্রজাল দিয়ে সৃষ্টি করা যাবে পার্সিভ্যালের সেই জমজমাট রেশমের কুঠি—একখানা নয়, দু-দুখানা মোটর গাড়ি?

ক্রু সাহেবের কপালে ঘামের ফোঁটা জমতে লাগল।

জুতোটাকে ছুঁড়ে ফেলে অ্যালবার্ট ক্লান্তভাবে শরীরটা মেলে দিলে।

—আঃ!

ক্রু সাহেব অপেক্ষা করতে লাগল বলির পশুর মতো।

—কী বিশ্রী কাদা এদিককার। উঠতে চায় না কিছুতেই।

—হাঁ, এঁটেল মাটি।—সভয়ে জবাব দিলে ক্রু সাহেব। যেন মাটিটা তারই হাতে তৈরী—সেই অপরাধে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে একটা।

—পথে খানা-খন্দলও খুব।

—বর্ষায় জল আসে।—ফিস্‌ফিসে গলায় ক্রু সাহেব জানাল।

—বোসো না, দাঁড়িয়ে আছো কেন?—সহজ অন্তরঙ্গতায় অ্যালবার্ট বললে।

বসতে ভয় করে। কেমন শক্তিহান হয়ে পড়বে, ইচ্ছে করলেই উঠে পালাতে পারবে না। তবু বসতেই হল।

শরীরে কোথাও এক বিন্দু জোর নেই। যেন সাতদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে এই মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে।

যে ঘরটায় দুজনে বসেছে—এটাই ক্রু সাহেবের ড্রয়িং রুম। পার্সিভ্যালের আমলে ঝলমল করত শ্রী-সমৃদ্ধিতে; মেজেতে ছিল দু ইঞ্চি পুরু রং-বেরঙের ছবি আঁকা কাশ্মীরী কার্পেট; ছিল সোফা সেটি, গদী মোড়া চওড়া চওড়া বেতের চেয়ার। এখন সে কাশ্মীরী কার্পেট কুঠিবাড়ির কোনো ছাত ফাটা অন্ধকার ঘরে একরাশ ধুলোয় লজ্জায় বিলীন হয়ে গেছে; সোফা সেটি কোন্ মন্ত্রবলে ডানা মেলে উড়ে গেল কাক সাহেবের নিজেরই তা ভালো করে জানা নেই। ভাঙা বেতের চেয়ারগুলিতে ছারপোকার রাশি খেয়েদেয়ে আরসোলার আকার ধারণ করছিল—মার্থা তাই সেগুলোকে বাড়ির পেছনের আস্তাকুঁড়ে বিদায় করেছে।

সিমেণ্টের চটা ওঠা মেজেতে এখন খানকয়েক কাঁটাল কাঠের চেয়ার। শুধু সেদিনের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে ঘরে টিঁকে আছে—বার্মা সেগুনের একখানা বার্ণিশ ওঠ ভারী টেবিল; দেওয়ালে ফাটা কাচের ফ্রেমে বিবর্ণ কয়েকখানা ছবি—ঔপনিবেশিক ইংরেজের রুচিমাফিক খানকতক শিকারের চিত্র, ক্যাভাল্‌রিচার্জের একটা রোমহর্ষক ব্যাপার, রঙ্ জলে যাওয়া সোনালি ফ্রেমে একখানা পঞ্চম জর্জের ছবি, তার তলায় ল্যাটিন হরফে গড্ সেভ দ্য কিং। আর আছে সবুজ ফ্রেমে ওভ্যাল্‌শেপের বড় একখানা ব্রেজিলিয়ান আয়না—পারা উঠে গিয়ে তার ভেতরে ফুটেছে বসন্তের ক্ষতাঙ্কের মতো একরাশ বিন্দুচিহ্ন—কাচের ওপর কুয়াশার মতো একটা ঝাপসা আবরণ।

গৃহসজ্জা থেকে শুরু করে টানা-পাখার শূন্য হুকে মাকড়শার জাল পর্যন্ত কিছুই দৃষ্টি এড়াল না অ্যালবার্টের। মৃদু হেসে পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করল। একটা সিগারেট দিলে ক্রু সাহেবকে। একটা নিজে ধরালো।

স্তব্ধতা। কী বলা যাবে কেউ খুঁজে পেল না খানিকক্ষণ। তবু অ্যাল্‌বার্টই স্তব্ধতা ভাঙল।

—এখানে তোমরা কতদিন আছো?

—প্রায় চল্লিশ বৎসর।—বলতে গিয়ে ক্রু সাহেব সিগারেটের গোড়াটা চিবিয়ে ফেলল।

কিন্তু আর যাই হোক, নিষ্ঠুর নয় অ্যাল্‌বার্ট। বন্দুক দেখেই যে পাখি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তার ওপর অকারণে আরো দুটো একটা টোটা খরচ করবার প্রবৃত্তি নেই তার। আর তা ছাড়া—তা ছাড়া মদের নেশা। সেই নেশার ঝোঁকে নিজের অতৃপ্ত কামনাগুলোর ওপর কল্পনার রঙ ফলিয়ে ছিল স্মাইদ্। তার দোষ নেই।

সুতরাং অ্যালবার্ট সমস্ত জিনিসটাকে যেন পাশ কাটিয়ে গেল।

—তোমাদের বাড়িটা একটু পুরোনো হলেও নেহাৎ খারাপ নয়।

—হুঁ।

—বেশ খোলা মেলা। চারদিকে চমৎকার মুক্ত-প্রকৃতি?

ঠাট্টা করছে নাকি? ক্রু সাহেব বুঝতে পারল না। একবারের জন্মে মাথা তুলেই চোখ নামিয়ে দিলে।

—শহর থেকে এখানে এসে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি। আঃ—কী চমৎকার মাঠের হাওয়া। দূরের গাছপালাগুলোকেও কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

ঠাট্টা? ক্রু সাহেব একটা ঢোঁক গিলল। যদি ঠাট্টাও হয়—তবু কি অদ্ভুত কৃতিত্ব অ্যালবার্টের! ছুরি যদি চালিয়েও থাকে, তার আগে ব্যবহার করেছে মর্ফিয়া—বেদনা বিন্দুমাত্র টের পাবার উপায় নেই!

—হুঁ।

—আমার এই সব কুঠিবাড়ির ওপরে একটা অদ্ভুত মোহ আছে। ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন ক্যাস্‌লগুলোতে গেলে এইরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে আমার। পুরোনো বাড়ি আর বিচিত্র প্রকৃতি মিলে যেন একটা আশ্চর্য অতীতকে জাগিয়ে তোলে। বর্তমানটাকেই কেমন অবাস্তব বলে বোধ হতে থাকে।

কাব্য করছে নাকি অ্যাল্‌বার্ট? না ব্যঙ্গকাব্য?

এবার সাহসে ভর করে ক্রু সাহেব সোজা তাকিয়ে দেখল। না—ব্যঙ্গের চিহ্নও কোথাও নেই। নিজের মধ্যে যেন মগ্ন হয়ে গেছে অ্যালবার্ট, হারিয়ে গেছে নিজের ভাবনার গভীরে। চোখ দুটোতে একটা মুগ্ধ তন্ময়তা। সে কি এই বাড়ির প্রভাবেই? না—ইংল্যাণ্ডের সেই

অতীতের ঘনছায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন অতিকায় ক্যাস্‌লগুলির স্বপ্ন-স্মৃতিতে ?

দিগন্তের সবুজ গাছগুলি ছাড়িয়ে আরো দূরে সঞ্চার করে ফিরল অ্যাল্‌বার্টের দৃষ্টি।

—আচ্ছা, আকাশের কোলে ওই যে নীল মেঘের মতো রেখা—ওটাই কি হিমালয়ান্‌ রেঞ্জ ?

—ওর নাম—তি—তিন পাহাড়।—বাংলাদেশের ভূগোল সম্পর্কে অ্যালবার্টের জ্ঞানটা খুব মারাত্মক নয়, এমনি প্রত্যাশা করে ক্রু সাহেব বললে, তা হিমালয়ান্‌ রেঞ্জই বলতে পারো বই কি !

—ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তো। ঠিক যেন একটা মোষের পিঠের মতো মনে হচ্ছে।

—হুঁ !

—আচ্ছা, মাউন্ট্‌ এভারেস্ট্‌ দেখা যায়না এখান থেকে ? আর কাঞ্চনজঙ্ঘা ?

এতবড় মিথ্যে কথা আর কী করে বলা যায় ? জবাব দিতে হল, না।

—তবু এও মন্দ নয়।—হাতের সিগারেটটার কথা ভুলে গিয়ে অ্যালবার্ট পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইল।

—চা এসেছে।

বীণার ঝঙ্কারের মতো শোনালো মার্থার গলা। চমকে দুজনেই ফিরে তাকালো। মার্থার এ গলা ক্যারু সাহেব সর্বশেষ শুনেছিল জীবনের পূর্বরাগ পর্বে। তারপর এতকাল ধরে ফাটা-কাঁসরের পালাই চলে এসেছে।

শুধু তাই নয়। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যেই আশ্চর্যভাবে নিজের ভোল বদলে ফেলেছে মার্থা। কোন্‌ ফাঁকে একটা ভালো পোষাক তুলে রেখেছিল, সেইটে পরে এসেছে, গালে মুখে পড়েছে প্রসাধনের একটা লঘু প্রলেপ। হঠাৎ যেন দশ বছর আগেকার কিশোরী মার্থা নবজন্ম লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়। পুরোনো কাঠের বাক্সটা থেকে কী করে খুঁজে এনেছে সে আমলের একটা আর্দালীর পোষাক। চাপিয়েছে রাজবংশী চাকরটার গায়ে। দু একটা জায়গায় পোকায় কেটেছে বটে, তবু তো মন্দ দেখাচ্ছে না একেবারে !

চাকরটা সামনের টেবিলের ওপর একটা কাঠের ট্রেতে করে চা আর খাবার রাখল। কোথায় গেল মার্থা চিনির চা—কেমন করে এল শাদা রুটি, একটুখানি মাখন, দুটো ডিম ? বিহ্বল হয়ে ক্যারু সাহেব বসে রইল !

ক্ষুধার্ত অ্যালবার্ট গোগ্রাসে রুটি ডিম গিলতে লাগল, আর মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফেলতে লাগল মার্থার ওপরে।

কিন্তু শুধুই কি কৃতজ্ঞ দৃষ্টি, না আরো কিছু ? আজ ক্যারুর মনে হল, দশবছর আগে কিশোরী মার্থা সত্যিই সুন্দরী ছিল তা হলে! হোক নেটিভ ক্রীশ্চানের মেয়ে, তবু ফর্সার দিকেই তার গায়ের রঙ, চোখের তারা দুটো আশ্চর্য গভীর—মুখে একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা। আরো আশ্চর্য, মার্থার বাঁ গালে একটা ছোট তিল যে আছে—সেটাও কেন এতদিন তার চোখে পড়েনি ?

—তুমি চুপ করে বসে আছ কেন ? চা খাবে না ?

সম্ভাষণটা ক্যারুর প্রতি। এবার আর বীণা বাজল না, ফাটা কাঁসরের রেশটা অস্পষ্ট ভাবে শুনতে পাওয়া গেল।

—হ্যাঁ, এই যে নিই—থতমত খেয়ে একটা চায়ের কাপ কোলের দিকে টেনে নিলে ক্রু সাহেব।

খাবার শেষ করে রুমালে মুখটা মুছে নিলে অ্যালবার্ট। মার্থাকে পরিতৃপ্ত স্বরে জানালো, অশেষ ধন্যবাদ।

মার্থা হাসল। ক্রু সাহেবের আবার মনে হল অদ্ভুত শাদা দাঁতগুলি।

মার্থা বললে, এই পাড়াগাঁয়ে যখন এসে পড়েছেন, তখন এ কষ্টটুকু করতেই হবে। এখানে এ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

বেশ ভালো ইংরেজি বলে তো মার্থা। সহজ, সুন্দর, চমৎকার নির্ভুল উচ্চারণ। হাঁ—হাঁ, মনে পড়েছে। মিশনারী বাপের মেয়ে—দার্জিলিংয়ের কী একটা স্কুল থেকে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেছিল বটে। আর এই মার্থাকে এতকাল ভুলে ছিল স্মাইদ্‌ ক্যারু—ভুলে ছিল দীর্ঘ দশ বছর ধরে। গোল্ডার্স গ্রীণে ক্যারু কোম্পানির জাগ্রত স্বপ্নে এতদিন এই বাস্তব জগৎটা কোন্‌খানে হারিয়ে গিয়েছিল ?

ক্যারুর কালো হাতের পাশে ধব্‌ধবে সাদা একখানা হাত অ্যাল্‌বার্টের। সে হাতের কড়ে আঙুলে ঝকঝক করছে ঈষৎ হরিৎ একখণ্ড পাথর—হীরেই নিশ্চয়। সোনালি রঙের চুলে ঝকঝক করছে বিকেলের সোনালি আলো।

এই-ই পার্সিভ্যালের সত্যিকারের স্বজাতি, তার সগোত্র। আপাদমস্তক এমন একটা অনন্যতা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে এর পাশাপাশি কালো মায়ের কালো ছেলে এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেছে। যেন অবচেতন মনে হঠাৎ উপলব্ধি করতে পেরেছে, অমন করে তাকে পথের ধূলোয় ফেলে দিয়ে কেন চলে গিয়েছিল পার্সিভ্যাল কারু!

—আপনি কখনো যান নি ইয়োরোপে?—মার্থার প্রতি অ্যাল্‌বার্টের একটা উজ্জ্বল প্রসন্ন প্রশ্ন।

—নাঃ—মার্থার দীর্ঘশ্বাস।

—যাবেন একবার। দেখে আসবেন।—মার্থাকে অ্যালবার্ট বলে চলল, যদি আগে থেকেই খবর দেন, আমিও না হয় সহযাত্রী হবো। তারপর আমাদের ওখানে দু চারদিন আতিথ্য নিয়ে আসবেন।

ক্যারু সাহেব চুপ করে বসে রইল। এ আলাপের মধ্যে তার যেন কোথাও স্থান নেই। সে যেন একান্তই অনাহূত, অবাঞ্ছিত আগন্তুক। এখানে অ্যালবার্ট পার্সিভ্যালের সগোত্র—আর মার্থা? মার্থা যেন হঠাৎ দশ বছর আগে তার কুমারী জীবনে ফিরে গেছে,—পরিচ্ছন্ন, কমনীয় একটি বিদুষী মেয়ে। গোল্ডার্স গ্রীণের স্বপ্ন না দেখালে যে মার্থাকে কোনোদিন জয় করা যেত না।

ক্যারু শুনে যেতে লাগল।

—যাবেন এক্সিটারে। দেখে খুশি হবেন।

—কী আছে দেখবার?—মার্থার সাগ্রহ প্রশ্ন।

—সেণ্ট্ পিটারস্ ক্যাথিড্রাল। আটশো বছর আগেকার।

—আর?

—আর জয়স্তম্ভ। উইলিয়াম দি কঙ্কারার তৈরী করিয়েছিলেন।

এক্‌সিটার। চোখ বুজে মার্থা দেখতে লাগল।

—ওখান থেকে কিছু দূরেই গ্রেটনক্রকশায়ার। সেইখানে আমাদের বাড়ি ক্রকশায়ার হল। ছবির মতো একেবারে। বড় বড় পপলার গাছের ছায়া। হনিসাক্‌লে ঢাকা বাড়িগুলি। পপিতে আলো করা বাগান, আর রাশি রাশি পাকা আপেল।

ক্রু সাহেব যেমন করে তার প্ল্যান্টেশনের গল্প বলেছিল, এ কি তাই? ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু এটা বুঝতে পারল এই মুহূর্তে মার্থা আর অ্যালবার্টের মধ্যে সে যেন কোথাও নেই। একটা অনধিকারীর মতো সসম্ভ্রমে অনেকখানি দূরে সরে দাঁড়িয়ে আছে।

মাঠের ওপারে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নেমে আসবার আগেই উঠল ঝিঁঝিঁর ডাক। কুঠিবাড়ির কব্জা-ভাঙা জানলা বাতাসে আর্তনাদ তুলতে লাগল পেত্নীর কান্নার মতো।

মার্থা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আলো জেলে আনি।

আশ্চর্য চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে গেল সে। আটশো বছর আগেকার সেণ্ট্ পিটারস্ ক্যাথিড্রাল তাকে হাতছানি দিচ্ছে, ডাক পাঠিয়েছে উইলিয়াম দি কঙ্কারারের সিটাডেল। হনিসাক্‌লের আবরণে ঢাকা বাড়িগুলির চার-পাশ থেকে তার রক্তে সাড়া দিয়েছে হয়তো দীর্ঘকায় পপলার-বীথির মর্মর স্বর।

অ্যাল্‌বার্ট একটা সিগারেট ধরালো।

আর স্মাইদ্ ক্যারু শুনতে পেলো মাঠের ওপারে ডেকে উঠ্‌ছে শেয়াল। ক্রমশঃ

পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা (৩)

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার সর্ব্বগ্রাসী চাপে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব হাজার সমস্যা যে আজ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, একথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আগেই বলা হইয়াছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বাণিজ্যগত আয় যতই হউক এবং শিল্প বাণিজ্যে যত লোকেরই কর্ম্মসংস্থান হইয়া থাকুক, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সব শিল্পবাণিজ্যের মূলধন বা শ্রমিক সংস্থানের ব্যাপারে অবাঙ্গালী প্রতাপই বেশী, বাঙ্গালার নিজস্ব লাভ এক্ষেত্রে খুবই সীমাবদ্ধ। কাজেই মোটের উপর পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা কোনকালেই স্বচ্ছল নহে। এই প্রদেশে যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষের কিছু বেশী, ইহাদের মধ্যে অবাঙ্গালী শ্রমিকদের কথা বাদ দিলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আড়াই কোটি অধিবাসীর হিসাবে যন্ত্রশিল্পের শ্রমিক সংখ্যা সমগ্র প্রদেশের সার্ব্বজনীন কর্মসংস্থান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট নয় এবং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভারতের স্থায় সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিও কৃষিকেন্দ্রিক। অত্যধিক লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল বলিয়া পশ্চিমবঙ্গে আবাদযোগ্য পতিত কৃষি জমির পরিমাণ প্রচুর হইতে পারে না। অনুমিত হয় এইরূপ জমি পরিমাণে ২০ লক্ষ একরের মত। এই জমি কিন্তু টুকরো টুকরো ভাবে প্রদেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে এবং সাধারণভাবে ইহাদের চাষ লাভজনক বা সহজ হয় নাই বলিয়াই দুঃস্থ কৃষিজীবী পশ্চিমবঙ্গবাসী এগুলি অনাবাদী থাকিতে দিয়াছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী বাংলায় গত ৫০ বৎসরে শতকরা ৪৩·১ ভাগ জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ে নাই বলিয়া এবং ফসল উৎপাদন বাড়িবার পরিবর্ত্তে নিম্নগ নীতি অনুযায়ী কমের দিকে গিয়াছে বলিয়া এই প্রদেশে আর্থিক তথা বেকার সমস্যা ক্রমশঃই তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর পশ্চিমবঙ্গেই যে কৃষিজীবির পক্ষে এই সমস্যার চাপ অধিকতর ভয়াবহ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। স্বাধীনতালাভের পর সরকারী প্রয়াসে পশ্চিম বাঙ্গলার স্থায়ী অধিবাসীরা নিজেদের দীর্ঘকালীন দুঃখমোচনের অনেক আশা করিয়াছিল। কিন্তু দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে বসবাস অসম্ভব হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যেভাবে লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যেভাবে তাহারা সরকারের আর্থিক সঙ্গতি বিপন্ন করিল, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন আজ পশ্চিমবঙ্গের নিছক অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নের অন্তরালে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের উপর গভীর ভরসায় যেসব সর্ব্বহারা সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের উপস্থিতি বাস্তুহারার সমস্যা এত জরুরী যে, এখন আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অন্য কোন সমস্যা আলোচিত হইবারই সুযোগ পাইতেছে না। কিন্তু মানবতার আবেদন যত মহানই হউক, এইভাবে সবকিছু আর দীর্ঘকাল উপেক্ষা করা উচিত নয়। আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা এমনই বিচিত্র এবং প্রসারণশীল যে, পরিমিত সম্পদ লইয়া এ সমস্যার সমাধানের পর অন্য কিছুতে হাত দিবার কল্পনা করাই বাতুলতা মাত্র। এক্ষেত্রে দেখিতে শুনিতে খারাপ হইলেও দীর্ঘ উপেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব সমস্যাগুলি এইবার আপন গুরুত্বে বিবেচিত হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক অবস্থিতি, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি স্মরণ করিয়া সারা ভারত যদি পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যাকে সত্যকার সর্ব্বভারতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করিত, তাহা হইলেও পশ্চিমবঙ্গও অবশ্যই স্বেচ্ছায় যতটা সম্ভব দুঃখবরণে অগ্রসর হইত, কিন্তু কার্য্যতঃ সর্ব্বভারতীয় সক্রিয় সহযোগিতা যথেষ্ট না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের উপরই চাপ পড়িতেছে অসম্ভব রকম বেশী এবং ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। এই শোচনীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই অনেকে সাম্প্রতিক দিল্লী-চুক্তির পর বিষন্নমনে শরণার্থীদের পূর্ব্ববঙ্গে প্রত্যাগমনের প্রয়োজন লইয়া আলোচনা করিতেছেন।

দিল্লীচুক্তি যতটা কার্য্যকরী হয় এবং ভারতসরকার ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কর্তৃপক্ষ সহানুভূতিসূচক মনোভাব লইয়া যতটা আগাইয়া আসেন, ততই মঙ্গল। অবশ্য পরিস্থিতির প্রকৃত উন্নতি লইলেও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীর পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গে প্রত্যাগমন আশা করা যায় না। অবস্থার উন্নতি না হইলে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যাই হয়তো পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বনাশ ঘটাইবে। যাহা হউক, পরিকল্পনাদি রচনায় সময় আশাবাদী মনোভাব লইয়া অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায়ও নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বহু শরণার্থী শেষ পর্য্যন্ত ভারতে থাকিয়া যাইবে, অন্য প্রদেশে যতই স্থান হউক, পশ্চিমবঙ্গে থাকিবে ইহাদের একটি বড় অংশ। এই সব আশ্রয়প্রার্থীর কর্ম্মসংস্থান ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব বেকার সমস্যা বিদূরণেও অনেক কর্ম্মসংস্থানের প্রয়োজন। এইভাবে বহুসংখ্যক নূতন কর্ম্মের সংস্থান ত্বরান্বিত না হইলে অর্থনৈতিক ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার চাপে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত অন্ধকার হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। পশ্চিমবঙ্গের নিজের ক্ষমতা যেরূপ, তাহাতে এই ক্ষুদ্রাকার প্রদেশ এ বিষয়ে লক্ষণীয় সাফল্যলাভ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। আগেই

বলা হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ২০ লক্ষ একরের মত হইতে পারে, তবে এই জমি অত্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে প্রদেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে। এই জমি যতদূর সম্ভব ব্যবহার করিতেই হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় সমগ্রভাবে আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ যথাক্রমে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ একর, ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার একর ও ৩১ লক্ষ ৪৪ হাজার একর, বিশেষভাবে ২০।২৫ লক্ষ শরণার্থী কৃষিজীবীকে এই সব জমিতে পুনর্বাসন করা চলিতে পারে। পশ্চিমবাংলায় কৃষিব্যবস্থা বর্ত্তমানে যুগান্তরের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ৯ লক্ষ একর ও ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য সেচ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে আরও ১৩ লক্ষ একর, একুনে পশ্চিমবঙ্গের এই ২২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের সম্ভাবনা আছে। কাজেই শরণার্থী পুনর্বসতি এবং প্রাদেশিক আর্থিক পুনর্গঠনের প্রশ্নের নিরিখে এই কৃষিসম্পর্কিত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কার্য্যকারিতা দ্রুততর হওয়া দরকার তবে ইহা সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্ববঙ্গের শরণার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ কৃষক শ্রেণীর লোক হওয়ায় ইহাদিগের সামান্য অংশকেই নিজ বৃত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে পুনঃ সংস্থাপন সম্ভব হইবে।

দিল্লীর বিখ্যাত অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক 'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' গত ২১শে এপ্রিলের সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগসমস্যার সমাধানসূচক একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন যে, এই প্রদেশের কৃষিশিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া এখানে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে ৫ লক্ষ নূতন কর্ম্মসংস্থান সম্ভব হইতে পারে। এজন্য তাঁহারা নূতন মূলধনের প্রয়োজন অনুমান করিয়াছেন ১২৫ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান জাতীয় আয়ের পরিমাণে ৭০০ কোটি টাকার মত। উপরোক্ত মূলধন খাটিবার ফলে জাতীয় আয় শতকরা ২০ ভাগ বাড়িলে ৫ লক্ষ বাড়তি কর্ম্মসংস্থানের সম্ভাবনা। তবে শতকরা ২০ ভাগ বা ১৪০ কোটি টাকার মধ্যে তাঁহারা কৃষির উপর বেশী ভরসা না করিয়া কৃষির হিসাবে ৩৫ কোটি টাকা লগ্নী করিয়া বৎসরে ১০ কোটি টাকা আয় বাড়াইবার কথা বলিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন যে সম্প্রসারিত কৃষিতে নূতন এক লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে। পশ্চিমবঙ্গ যদিও শিল্পের হিসাবে কিছুটা সমুন্নত, তবু আপেক্ষিক সুবিধা থাকায় পশ্চিমবঙ্গে আরও শিল্পসম্প্রসারণ সহজ ও সম্ভব বলিয়া ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্টের ধারণা। তাঁহাদের মতে শিল্পবাণিজ্যখাতে ৮৫ কোটি টাকা বিনিযুক্ত হইলে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে বাৎসরিক ১২০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে এবং কর্ম্মসংস্থান হইতে পারে মোট ৪ লক্ষ লোকের। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে শিল্প সংগঠন হইতে এই প্রদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৪ ভাগ বা ২৪০ কোটি টাকা আয় হয় এবং এই সব শিল্পে সাড়ে ছয় লক্ষের কিছু বেশী লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। এই শিল্পগুলিতে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ১০৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।

ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট পত্রিকার উপরোক্ত পরিকল্পনার গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য, কিন্তু সমস্যার ব্যাপকতার তুলনায় ইহা যে যথেষ্ট নয়, তাহা লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে। তবু ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট যাহা বলিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহাও কতখানি সম্ভব হইবে কে জানে? কয়লাখনি এলাকার নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এবং কলিকাতা বন্দর থাকায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সংগঠনের সুবিধা অবশ্যই আছে, কিন্তু সারা ভারতের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই যেভাবে শিল্পসমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে এই প্রদেশে আরও অনেক বেশী শিল্পপ্রসারের চেষ্টায় ঝুঁকি আছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, এসময় মূলধন বিনিয়োগে লোকের ইতস্তত: করাও যেমন স্বাভাবিক, মূলধন বিনিয়োগে লাভের ভরসাও তেমনি কম। সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে বিশৃঙ্খলা যখন তখন আশঙ্কা করা যায়, কাজেই ধীরে সুস্থে পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পসম্প্রসারণ ও সম্প্রসারিত শিল্পে বাড়তি কর্ম্মসংস্থান ইচ্ছা থাকিলেই হয়তো নিশ্চিত হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই বিশালায়তন ভারতের আয়কর ও কর্পোরেশন ট্যাক্সের এক পঞ্চমাংশ জোগাইয়া থাকে। ইহা হইতেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সংস্থান অনুমান করা যায়। ইহার উপর প্রচুর পরিমাণে নূতন শিল্প এই প্রদেশে বাড়াইবার আগে অন্য প্রদেশের শিল্পপ্রসারের প্রয়াসও লক্ষ্য করা দরকার। কলিকাতার বন্দর দিয়া এখনই বৎসরে ৩০০ কোটি টাকার মত পণ্য চলাচল হয়। পশ্চিমবাংলায় উৎপন্ন শিল্পপণ্যের মূল্য ২৪০ কোটি টাকার মত এবং ইহার মধ্যে একমাত্র কলিকাতার কেন্দ্রে ১৬০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপন্ন হয়। আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার চাপে এবং রাজনৈতিক ফাটকাবাজীর পীঠস্থান হওয়ায় কলিকাতার বর্ত্তমানে যে হাল হইতেছে, তাহাতে কলিকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিমবাংলায় আরও প্রভূত শিল্পসম্প্রসারণ সত্যই অনিশ্চিত। হুগলী নদী মজিয়া যাইতেছে বলিয়া বন্দর হিসাবে কলিকাতার ভবিষ্যত সকলেরই মাথাব্যথার কারণ হইয়া উঠিতেছে। শিল্প বাণিজ্যসম্প্রসারণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য নূতন লোকের কর্ম্মসংস্থানের শুভেচ্ছা প্রকাশের সময় হুগলী নদীর ক্রমাবনতির কথাও অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে। সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী অর্থনীতির কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, বেসরকারী অর্থনীতিও যে শোচনীয় স্তরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা টাকা ও শেয়ার বাজারের মন্দা অবস্থা হইতে অনুমান করা যায়। এসময় শিল্পসম্প্রসারণ হইবে কাহার দায়িত্বে? অথচ একথাও ঠিক যে, কৃষির প্রসার-সম্ভাবনা একান্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া কর্ম্মসংস্থানের জন্য শিল্পবাণিজ্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া উপায় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের রাজ্য বলিয়াই হউক, অথবা এই প্রদেশে আগের মত সর্ব্ববিধ সুবিধার আশা না থাকিবার জন্যই হউক, অবাঙ্গালী শিল্পপতিরা ইতিমধ্যেই বাংলা হইতে তাঁহাদের কারবার যতটা সম্ভব গুটাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন। কোন কোন বড় প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই কলিকাতা হইতে তাঁহাদের

প্রধান অফিসের কাজকর্ম্ম ভারতের অন্য কোন বড় সহরে স্থানান্তরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারত সরকারের শিল্পনীতিও বিকেন্দ্রীকরণের দিকে। সরকারী প্রয়াসে ভারতে যে দুইটি লৌহ ও ইস্পাতের বড় কারখানা বসিতেছে, আপেক্ষিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের একটিও পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। সুতরাং এক্ষেত্রে সরকার যদি নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া ইনডাসট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশনের সুবিধা দিতে বা অন্যভাবে অর্থ সাহায্য করিতে রাজী থাকেন, তবেই পশ্চিমবঙ্গে নূতন করিয়া শিল্পসম্প্রসারণ আশা করা যায়। বেসরকারী সূত্র হইতে মূলধন সংগ্রহ এখন কিরূপ কঠিন ও অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, ভারতসরকার ও সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর যুক্ত প্রয়াসে পণ্যবাহী জাহাজ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টাতেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। এই প্রতিষ্ঠান ইষ্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশনে জনসাধারণের নিকট হইতে শতকরা ২৩ ভাগ মূলধন সংগ্রহের কথা ছিল, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত বাজারের অবস্থা দেখিয়া সরকার জনসাধারণের আশা ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের পূর্ব্বসিদ্ধান্তমত শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার ছাড়াও উপরোক্ত ২৩ ভাগ শেয়ারও নিজেরাই গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, কেন্দ্র হইতে আশ্রয়প্রার্থী খাতে যে ৫ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে, সাময়িক সাহায্যদান ব্যবস্থা পরিচালনায়ও তাহা যথেষ্ট মনে হয় না ; এখন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বহু লক্ষ লোকের পুনর্ব্বসতির সমস্যার সমাধান কিরূপে হইবে ? আগেই বলা হইয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যাহারা আসিয়াছে তাহারা অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং তাহাদের অনেকেই নিঃসম্বল। ইহাদের ঘরের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কাজের ঠিক করিয়া দিতে হইবে, যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়ায় ততদিন ইহাদের নিয়মিত অর্থসাহায্য করিতে হইবে। খাস পশ্চিমবঙ্গে এসব হওয়া কেমন করিয়া সম্ভব ? আলোচ্য প্রবন্ধের পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশে দেখানো হইয়াছে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী ২ কোটি ১২ লক্ষ লোকের উপর দেশবিভাগের প্রথম ধাক্কায় আশ্রয়প্রার্থী ও মৃত্যু অপেক্ষা জন্মহারের আধিক্যের দরুণ বাড়তি জনসংখ্যা ধরিয়া যে লোক বাড়িয়াছে, তাহাতে এখানে প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির ঘনত্ব গড়ে ৮৬৮ জন দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ড, জাপান ও জার্ম্মানীকে জনবহুল দেশ বলা হল, এইগুলির মাইল পিছু জনসংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে ৭০৩, ৪৮২ ও ৩৭৩। কাজেই সহানুভূতি আছে বলিয়াই পূর্ব্ববঙ্গের অসংখ্য শরণার্থীকে পশ্চিমবঙ্গ যদি স্থান দিবার দুঃসাহস করে, তাহা তাহার আত্মহত্যারই কারণ হইবে। কোন রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিক সম্পর্কে রাষ্ট্রের যতখানি দায়িত্ব, একজন সর্ব্বহারা শরণার্থীকে আশ্রয় দিবার দায়িত্ব তাহার চেয়ে অনেক বেশী। পশ্চিমবঙ্গ তাহার বহু দুর্ভাগ্য পীড়িত পুরাতন বাসিন্দাদের কিছু করিতে পারে না, শরণার্থীদের সব প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্ব লইবে কোন সাহসে ? দেশ বিভাগের সময় ভারতীয় নেতৃবর্গ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, শরণার্থীদের সেই প্রতিশ্রুতিই সবচেয়ে বড় মূলধন। এই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইবার দায়িত্ব ভারতসরকারের তথা ভারতের সমস্ত রাজ্যের। পশ্চিমবঙ্গে ভিড়ের প্রথম চাপ পড়িবেই, কিন্তু তাই বলিয়া পশ্চিমবঙ্গকে বর্ত্তমানে পুনর্ব্বসতির যে বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে, তাহা পশ্চিমবঙ্গের সাধ্যাতীত। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্যে শরণার্থীদের ঘর বাঁধিয়া দিলেই বা তাহাদের সাময়িক সাহায্য করিলেই সমস্যার শেষ হইবে না, এই জনতার চাপ হইতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ অর্থব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার কি হইবে ?

হৃদয়াবেগের দিক হইতে শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়লাভই বাঞ্ছনীয়, অন্যপ্রদেশে তাহাদের বাঙ্গালীত্ব হয়তো বিপন্ন হইবে, কিন্তু পরিস্থিতি বর্ত্তমানে যেরূপ তাহাতে এই হৃদয়াবেগের কথাই সমস্যা সমাধানের শেষ কথা ধরিয়া লওয়া উচিত নয়। পূর্ব্ববঙ্গে বসবাস যদি শেষপর্য্যন্ত অসম্ভবই হয়, একেবারে নিঃস্বদের যতটা সম্ভব পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্যপ্রদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হওয়াই দরকার। পুনর্ব্বসতির সময় অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে যাহারা একসঙ্গে বসবাস করিবে তাহাদের মধ্যে কৃষ্টি বা সংস্কৃতিগত একটা যোগাযোগ যেন রক্ষিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে যাহারা আসিতেছে, তাহারা সকলেই পশ্চিমবঙ্গে সব কিছু সুবিধা পাইয়া পুনর্ব্বসতির সুযোগ লাভ করিবে, শুভেচ্ছা হিসাবে এই দাবীর যে মূল্যই থাক, বাস্তবক্ষেত্রে ইহা অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ বর্ত্তমানে আশ্রয়প্রার্থীদের সকলকে আশ্রয় দিতে ও বাঁচিবার পূর্ণ সুযোগ দিতে যদি না পারে, ধরিয়া লইতে হইবে তাহা তাহার অনিচ্ছার নহে, অক্ষমতারই পরিচায়ক।

বাস্তহারা পুনর্ব্বসতি—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ বাস্তহারা পশ্চিমবঙ্গে আগমন করায় তাহাদের পুনর্ব্বসতি সমস্যা এখন সকল দেশকর্ম্মীকে বিব্রত করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ পল্লী মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে তাহাদের পুনর্ব্বসতির এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া গত ৩১শে মে এক সাংবাদিক সম্মিলনে উপস্থিত করা হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ হাজার ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত ৩৫ হাজার গ্রাম আছে। প্রত্যেক গ্রামেই এখন রজক, নাপিত, ছুতার, কামার, রাজমিস্ত্রী, তাঁতি কৃষক প্রভৃতির অভাব হইয়াছে। ঐ সকল গ্রামের অধিবাসীরা যদি ২।৪ ঘর করিয়া প্রয়োজন মত বাস্তহারা গ্রহণে অগ্রসর হন ও তাহাদের বাসের জন্য জমি, বাসগৃহের ব্যবস্থা প্রভৃতি করিয়া দেন, তাহা হইলে কয়েক লক্ষ বাস্তহারাকে বাংলার গ্রামগুলিতে স্থান দান করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে সকল ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও গ্রাম-সেবক কর্ম্মীদের অনুরোধ করা হইয়াছে। কলিকাতা শ্যামবাজার ১১৫-এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে পত্র লিখিলে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে। পল্লী মঙ্গল সমিতির এই নূতন পরিকল্পনা সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পশ্চিম বাংলায় পথ সমস্যা—

গত প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ সকল জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পশ্চিম বাংলার সকল পথের অবস্থাই অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির আয়-হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধির ফলে তাহারা রাস্তাগুলির মেরামত করিতে সমর্থ হয় নাই—নূতন পথও নির্ম্মিত হয় নাই। সেই জন্য আজ দেশবাসীর অসুবিধা ও কষ্টের শেষ নাই। সেজন্য জনগণের পক্ষ হইতে একটি পথ ও যানবাহন উন্নতি সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির পক্ষ হইতে দেশের পথ সমূহের প্রয়োজনীয়তা স্থিরীকৃত হইতেছে ও কোথায় অবিলম্বে নূতন পথ নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন, সে বিষয়েও তদন্ত করা হইতেছে। সকল জেলা ও মহকুমা সহরে ও থানার গ্রামে যাইবার উপযুক্ত পথ না থাকায় সকল সময়ে জনগণকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শুধু সরকারী চেষ্টায় এ কাজ শেষ করা সম্ভব হইবে না। পূর্ব্বে বহু ধনী লোক ব্যক্তিগত অর্থে নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেন—এখন আবার জনগণকে সে কার্য্যে অবহিত করা বিশেষ প্রয়োজন। জেলাবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি দ্বারাও নূতনভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া গ্রাম্য পথগুলির সংস্কার বা পুনর্নির্ম্মাণ করা অবিলম্বে প্রয়োজন। পথ ও যানবাহনের ব্যবস্থা না হইলে লোকের পক্ষে গ্রামে যাতায়াত করা বা বাস করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না।

ধান্য উৎপাদকদের জন্য পুরস্কার—

গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গের কৃষকগণকে অধিকতর ধান্য উৎপাদনের জন্য পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সাধারণতঃ প্রতি বিঘা জমীতে সাড়ে ৫ মণ ধান্য জন্মে—যে সকল কৃষক অধিক পরিমাণে ধান্য উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত ২২০জন কৃষকের প্রত্যেককে ১০০ টাকা হিসাবে মোট ২২ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। মোট ২৩৭টি থানার মধ্যে ২২০টি থানার কৃষক পুরস্কার পাইয়াছে। এইভাবে উৎসাহ দানের ফলে এবার পশ্চিমবঙ্গে ৮৭ হাজার বিঘা অধিক জমীতে ধানচাষের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যে সকল কৃষক পুরস্কার পাইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে অন্ততঃ ৯ বিঘা জমী চাষ করিতে হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় একজন তিন বিঘায় ৭৩ মণ ৩০ সের, হুগলী জেলায় ৫৮ মণ ২৭ সের ও নদীয়া জেলায় ৫৮ মণ ১৩ সের ধান্য উৎপাদন করিয়াছেন। এইভাবে সকল প্রকার কৃষির জন্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিলে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, ফলে খাদ্যাভাব দূর হইবে ও বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করার প্রয়োজনও থাকিবে না।

মিউনিসিপাল-শাসন—

হুগলী জেলার আরামবাগ মিউনিসিপালিটীর কমিশনার-গণকে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে অযোগ্য স্থির করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার মিউনিসিপ্যালিটি বাতিল করিয়া দিয়াছেন ও একজন সরকারী কর্মচারীর উপর কার্য্য পরিচালনার ভার দিয়াছেন। এ ব্যবস্থা নূতন নহে, কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার বহু মিউনিসিপালিটীই এইভাবে বাতিল হইয়াছে। প্রকাশ—পৌর সভার পরিচালনায় কয়েকটি কুকার্য্য, অনিয়ম ও দলাদলি ঘটিয়াছিল এবং একজন কমিশনারকে অপর এক ব্যক্তির বেনামিতে মিউনিসিপাল ঠিকাদারী দেওয়া হইয়াছিল। অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেন নাই। এইরূপ অবস্থা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি মিউনিসিপালিটীর মধ্যে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সরকার পক্ষ কঠোরতার সহিত কার্য্য করেন না। যে কারণেই হউক, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় গলদ হইয়াছে। ইহার দূরীকরণে সরকার পক্ষ উদ্যোগী না হইলে মিউনিসিপাল শাসনের নামে দেশে কুশাসন চলিয়া দেশবাসীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। আমরা এ বিষয়ে সরকারী স্বায়ত্তশাসন বিভাগকে উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্যপালনে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

মন্ত্রী ও গভর্ণর—

শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ আসামের গভর্ণর ছিলেন, তাঁহাকে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরামও পূর্বে বিহারে গভর্ণর ছিলেন, তাঁহাকে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল—এখন আবার তাঁহাকে আসামের গভর্ণর করা হইল। উভয় ব্যক্তিই আজীবন কংগ্রেস কর্ম্মী—যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু এই একই লোককে বার বার বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার। বিশেষ করিয়া গভর্ণরের পদ যেরূপ সম্মানজনক—তাহাতে প্রাদেশিক গভর্ণরের পদে নিযুক্ত লোককে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা আদৌ ভাল দেখায় না। ইহাতে শাসন ব্যবস্থার ক্রটিই পরিলক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া, সকলেই মনে করে, ভারতে পণ্ডিত নেহরুর সহকর্মী কয়েকজন লোক ছাড়া উচ্চপদে কাজ করিবার যোগ্যতা আর কাহারও নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীকে পুনরায় মন্ত্রী নিয়োগ করার কথা আসে—গভর্ণর জেনারেলের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর আর তাঁহাকে নিম্নপদে নিযুক্ত না করাই শোভন হইত। তিনি যোগ্য ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বয়সের কাহারও উপর ঐ কার্য্যভার দিলে হয় ত তিনি অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিতেন।

সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ব্রহ্মচারী ভোলানাথ ও সুন্দরবনবাসী শ্রীপ্রফুল্ল মিত্তার সুন্দরবন গ্রামাঞ্চলের চোরাই চালান দমন মানসে ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ, সাগর আনা প্রভৃতি এলাকায় নৌকাযোগে পরিভ্রমণ ফটো—শ্রীঅনুকূল পাত্র

সাহিত্যপরিষদ ষ্ট্রীট—

কলিকাতায় সাহিত্যপরিষদ ষ্ট্রীটে বহুসংখ্যক খাটালে গো-মহিষ রাখার ব্যবস্থা থাকায় ঐ অঞ্চলটি দিয়া জনগণের যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। সম্প্রতি কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ঐ অঞ্চলের খাটালগুলি তুলিয়া দিয়া ৯ বিঘা জমা দখল করিবেন ও ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় পার্ক ও বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। এত দিনে যে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা সত্যই আনন্দের বিষয়। উহার অনতিদূরে হরিনাথ দে রোডেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার খালি জমীতে দরিদ্র জনগণের বাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতার বস্তীগুলি ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দিয়া তথায় কম ভাড়ার বাড়ী নির্ম্মিত হইলে সহরের নোংরাও দূর হইবে, দরিদ্র জনগণও বাসের অধিক সুবিধা লাভ করিয়া ধন্য হইবে। এখন কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার—সকলের এক যোগে এবিষয়ে কার্য্য করা উচিত। প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার রায়ের এ বিষয়ে বহু অভিনব পরিকল্পনা আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছিলাম—সেগুলি সত্বর কার্য্যে পরিণত হইলে সহরবাসী সত্যই উপকৃত হইবে।

রাজ্যেও আদিবাসীর সংখ্যা অধিক। সভ্য জাতির লোকেরা অপেক্ষাকৃত কম সভ্য আদিবাসীদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা করে না। তাহাই শ্রীজয়পাল সিংএর অভিযোগ। আগামী নির্ব্বাচনে যাহাতে আদিবাসী ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের সদস্য ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্যও এখন হইতে প্রচার কার্য্য চলিতেছে। অখণ্ড ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্রমে বহু প্রদেশে বিভক্ত করার চেষ্টা সর্ব্বত্র চলিতেছে। ইহার ফল কি হইবে বলা কঠিন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিভাগের

বিগত ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি—সভাতে শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মঙ্গলাচরণ করেন।

ফটো—শ্রীপান্না সেন

ঝাড়খণ্ড প্রদেশ—

শ্রীযুক্ত জয়পাল সিং ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের নেতা। তিনি ঐ অঞ্চলে ঝাড়খণ্ড প্রদেশ গঠনের জন্য তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। আদিবাসীদের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা—তিনটি প্রদেশের মধ্যে পৃথক ভাবে বাস করিতে না দিয়া—সকল আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল একত্র করিয়া একটি স্বতন্ত্রপ্রদেশ গঠন করাই শ্রীজয়পাল সিংএর উদ্দেশ্য। ছোটনাগপুরের সকল জেলাতেই আদিবাসীর সংখ্যা অধিক। সেরাই-কোলা ও খরসোয়ান রাজ্য এখন বিহারের মধ্যে। ময়ুরভঞ্জ উড়িষ্যার মধ্যে। ঐ সকল রাজ্য ছাড়া ও কিওনঝড়, বোনাই, বামরা, গাংপুর, যশপুর, সারগুজা, উদয়পুর, কোরিয়া ও চাংবেকার

আন্দোলন প্রবলতর হইয়াছে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা পূর্ব্বে একটি প্রদেশ ছিল—এখন তিনটি হইয়াছে—আরও বিভক্ত হইলে শাসন-ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে।

শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস—

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করার পর কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চেন্সেলার শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহকারী মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশে কেহই তাঁহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং এই নিয়োগের জন্য কেহ প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর কার্য্যও সমর্থন করেন নাই। বাংলা হইতে একজন সদস্য

লইয়া কোন্ প্রকারে বাংলার মান বজায় রাখা হইয়াছে। ভারতের মধ্যে আজ পশ্চিম বাংলার সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—সে সকল সমস্যার কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে ঠিক ভাবে জানাইবার জন্য পশ্চিম বাংলা হইতে একজন শক্তিশালী সদস্যকে যদি কেন্দ্রীয় সরকারে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইত, তবে লোক কতকটা সন্তুষ্ট হইতে পারিত। বাংলার অভাব অভিযোগ শুনিবারও লোক নাই—ইহা অপেক্ষা বাংলার দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালী কি সত্যই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে? ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত লোক প্রধান মন্ত্রী থাকিতেও পশ্চিম বাংলার প্রতি এইরূপ অবিচার কি তিনি সহ্য করিয়া যাইবেন?

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ—

কলিকাতা সহরে প্রতিদিন ২০ হাজার মণ দুগ্ধের প্রয়োজন। কিন্তু তাহার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দক্ষিণ কলিকাতায় ৪০টি ডিপো খুলিয়া ১০০ মণ দুধ ১২ আনা সের দরে সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্রমে এই ব্যবস্থা প্রসার করিয়া সমগ্র সহরে দুধ সরবরাহ করা হইবে। খাদ্য মন্ত্রী আশা করেন, এক বৎসরের মধ্যে সহরে দুধ জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। কাঁচরাপাড়ার নিকট হরিণঘাটায় একটি সরকারী গো-শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহাও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা চলিতেছে, আমরা খাদ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করি। সঙ্গে সঙ্গে বলা প্রয়োজন, সরকারী অর্থ যেন এ জন্য অপব্যয়িত না হয়। অনেক সময় দেখা যায়, জনগণের সামান্য উপকার করিতে গিয়া সরকারী কর্ম্মচারীরা অনাবশ্যক অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। হরিণঘাটার সরকারী গোশালা দেখিলে সেই অপব্যয়ের আশঙ্কাই মনে হয়। তথায় যে ভাবে অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, ব্যবসা হিসাবে দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া লাভ করা অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। খাদ্য-মন্ত্রী মহাশয়কে আমরা এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি।

সপ্তদেউলের মন্দির—

বর্দ্ধমান জেলার আঝাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত দেউলিয়া গ্রামে বিখ্যাত প্রাচীন সপ্ত দেউলের মন্দির আছে—উহা মসাগ্রাম রেল ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। মেরামত ও রক্ষার অভাবে মন্দির গাত্রের কারুকার্য্য ধ্বংস হইতেছে। ইটগুলি খুঁড়িয়া বাহির করিয়া লোকে লইয়া যাইতেছে। ঐ স্থান হইতে বহু মূর্ত্তিও স্থানান্তরিত হইয়াছে। গ্রামটির সর্ব্বত্র ও পাশের মাঠগুলিতে প্রচুর ইট পাওয়া যায়। আমরা সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগকে মন্দির রক্ষার জন্য অবহিত হইতে অনুরোধ করি। স্বাধীন দেশে পুরাকীর্ত্তিগুলির রক্ষার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

কবি নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী—

বাংলা দেশের এই সুপ্রসিদ্ধ কবি-দম্পতী ৫ই জুন তারিখে 'পি এণ্ড ও' কোম্পানীর জাহাজ 'এস্, এস্, চিত্রলে' বোম্বাই হইতে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

কন্যা নবনীতা সহ কবি দম্পতী—শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী

তাঁহাদের একমাত্র কন্যা কুমারী নবনীতাও সঙ্গে গিয়াছেন। তাঁহারা ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, আলসেস-লোরেণ, রাইনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালি, রুমানিয়া,

যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, স্পেন, পোর্তুগাল ও মিশর ঘুরিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সাত সাগর পারে তাঁহাদের এই প্রবাসযাত্রা শুভ হউক এবং তাঁহারা নিশ্চিন্ত নিরাপদে ভ্রমণ শেষ করিয়া সুস্থ দেহে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করুন ইহাই আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

পরলোকে স্বামী অমৃতানন্দ—

গত ১৮ই মে বৃহস্পতিবার প্রাতে ৯ ঘটিকায় সিওয়ানে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অমৃতানন্দ মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঠাকুর পরমহংসদেবের ন্যায় তিনিও কণ্ঠনালীতে দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মুক্তিব্রতে দীক্ষাদাতা ও অগ্নিমন্ত্রের উপাসক
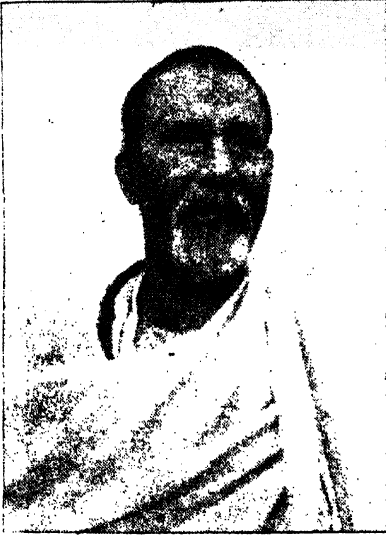
স্বামী অমৃতানন্দ

অনুশীলন সমিতি ও যোগেন্দ্র ঠাকুরের পরিচালিত অস্ত্রবলে স্বাধীনতা লাভে দৃঢ়সংকল্প বিদ্রোহী যুবকগণের সংসর্গ হইতে ঠাকুর পরমহংসদেবের মন্ত্রশিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাকে পরম মোক্ষলাভের পথে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দেন। পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল নলেন্দ্র দেব। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীর সম্মুখস্থ দেববংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পরলোকগত দেশকর্মী রাজেন্দ্র দেব এবং বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্র দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার মুক্তি ও শান্তি কামনা করি।

প্রয়াগে বাঙ্গালী কবি সম্মিলন—

গত ১৬ই বৈশাখ এলাহাবাদ প্রয়াগে বিচিত্রা কৃষ্টি সংঘের উদ্যোগে স্থানীয় বাঙ্গালী কবিদের এক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদস্থ অমৃতবাজার পত্রিকার বার্ত্তা সম্পাদক শ্রীপ্রমোদকুমার সেন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৪ জন কবি মিলিত হইয়া স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন—তাঁহাদের নাম—শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়, শ্রীজহর রায়, শ্রীসুনীল বসু, শ্রীসমরেন্দ্র দে, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসমর ঘোষ, ডাঃ আশামুঞ্জুল দাস, শ্রীমতী জাহ্নবী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়, কুমারী সাধনা চট্টোপাধ্যায় ও কুমারী অর্চনা মুখোপাধ্যায়। স্থানীয় বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

ডাক্তার মাথাই ও শ্রীসাকসেনা—

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব ডাঃ জন মাথাই ও পুনর্বসতি-সচিব শ্রীমোহনলাল সাকসেনা গত ৩১শে মে পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের স্থানে যথাক্রমে শ্রীচিন্তামণি দেশমুখ ও শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। পদত্যাগ কালে ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যাপারে মূলনীতি সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, পণ্ডিত নেহরু যে পথে ভারতকে পরিচালিত করিতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই দেশে অর্থ-নৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হইবে। শ্রীসাকসেনাও পদত্যাগ কালে বলিয়াছেন—মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, নানা কারণে তিনি তাহা পালন করিতে সমর্থ হন নাই। কাজেই তাঁহার পক্ষে পদত্যাগ করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ও ক্ষিতীশবাবুর উক্তির পর ডাক্তার মাথাই ও শ্রীসাকসেনার বিবৃতি কি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবে? দেখা যাইতেছে, ৪জন মন্ত্রীই পণ্ডিতজীর

মতানুসারে কাজ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহার পর কি হয়, তাহাই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব—

উড়িষ্যায় প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব উড়িষ্যা-দেশবাসীর নানা প্রকার সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। উড়িষ্যায় বাঙ্গালী বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থাতেও তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় কয়েক সহস্র বাঙ্গালী উড়িষ্যায় বসবাসের সুবিধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই কতকগুলি বিষয়ে নূতন নীতি প্রবর্তনে অবহিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি বক্তৃতা অপেক্ষা কাজ বেশী করিবেন। শিল্প ও সরবরাহ বিভাগে তিন পক্ষকে একত্র হইয়া কাজ করিতে হয়—তিন পক্ষের কার্য্যই পরস্পর বিরোধী—(১) শিল্পপতি ধনী পক্ষ (২) সরকার পক্ষ ও (৩) দরিদ্র শ্রমিক পক্ষ। তিনি সকল পক্ষকেই বিবেচনার সহিত কাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রমিক মালিক বিরোধ লাগিয়াই আছে—তৃতীয় সরকার পক্ষকে সর্বদা তাহা মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। সরকার পক্ষের সহিত ধনীদেরও বিবাদের অন্ত নাই—শ্রীযুত মহাতাব কি সে বিষয়ে কিছু করিতে পারিবেন? যাহা হউক, কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই গত ২৮শে মে তিনি দিল্লীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্তত সকলের মনে আশার সঞ্চার করিবে।

বাস্তুত্যাগী ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা—

২৪ পরগণা মসনন্দপুরের নিকটস্থ দক্ষিণ চাতরা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এক শত বাস্তুত্যাগী ছাত্রকে তাঁহাদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ঐ সকল বাস্তুত্যাগী ছাত্র যদি ছাত্রাবাসে থাকে, তবে মাসিক মাত্র ১০ টাকায় তাহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। বিদ্যালয়টি ফাঁকা মাঠের উপর, নদীর ধারে, গ্রামের বাহিরে অবস্থিত—সেখানকার স্বাস্থ্য ভাল—কাজেই তথায় এইভাবে একটি বৃহৎ আবাসিক বিদ্যালয় গঠিত হইতে পারে। আমরা এই চেষ্টার জন্য বিদ্যালয়ের সম্পাদক দেশকর্মী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং আশা করি, তাঁহার এই আদর্শ সর্বত্র অনুসৃত হইবে। দক্ষিণ চাতরা বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম।

বোম্বায়ে বাঙ্গালীর সম্মান—

ডাক্তার বীরেন্দ্রকুমার নন্দী সম্প্রতি পার্লে-আনধেরী এলাকা হইতে বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে সংক্রামিক ব্যাধির সময়

ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার নন্দী

সাহায্য কার্য্য পরিচালনা করেন ও সে সময়ে মিউনিসিপ্যাল শাসনের সহিত সংযুক্ত হইবার তাঁহার ইচ্ছা হয়। ইহার পূর্বে কোন বাঙ্গালী বোম্বায়ে মিউনিসিপ্যাল সদস্য নির্বাচিত হন নাই। তাঁহার কেন্দ্র হইতে যে ৩ জন সদস্য নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে ডক্টর নন্দীই সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছেন। তিনি কলিকাতার এম-এস-সি, ম্যাঞ্চেষ্টারের পিএচ-ডি ও লণ্ডনের এ-আই-সি। টেডিংটন কেমিকেল কারখানার তিনি প্রধান কেমিষ্ট, ম্যানেজার ও ডিরেক্টার। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম-মহাধ্যক্ষ (লেবার কমিশনার) শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস সম্প্রতি ভারত

সরকারের প্রতিনিধি-উপদেষ্টারূপে জেনিভায় আন্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে গিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে শ্রম-মহাধ্যক্ষের পদে কাজ করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক—তাঁহার বহু প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

জেলা-জজ ও ট্রাইবিউনালে জজ হিসাবেও তিনি বহুদিন দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার উপস্থিতি ও কার্য্যের দ্বারা জেনিভায় বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি পাইবে ও শ্রমিক সমস্যা সমাধানের নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়া জগৎবাসীর কল্যাণ সাধন করিবে।

নদীয়া জেলায় উদ্বাস্তু সহর—

নদীয়া জেলার শান্তিপুর ও রাণাঘাটের মধ্যবর্তী ফুলিয়া ষ্টেশনের নিকট সরকার সাড়ে ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি নূতন উদ্বাস্তু সহর নির্মাণ করিতেছেন। তথায় প্রায় ৩০ হাজার লোক বাস করিতে পারিবে। অধিবাসীদিগকে কাজ দিবার জন্য তথায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কারিগরী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ঐ কেন্দ্রে কাহাকেও খয়রাতী দান দেওয়া হইবে না। ইহা একটি আশার সংবাদ বটে; কিন্তু ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার ৩ শত বিঘা জমী দখল করিয়া সরকার তথায় যে ৫ শত উদ্বাস্তু গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার সংবাদে আমরা চিন্তিত হইয়াছি। ঐ সকল গৃহ নাকি বর্ষায় টিকিবে না—২।১ পসলা বৃষ্টির পরই পড়িয়া যাইতেছে—অথচ প্রত্যেকটি গৃহ নির্মাণে ৫ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। নদীয়ার নূতন সহর নির্মাণের পূর্বে সে জন্য আমরা কর্তৃপক্ষকে সতর্কতার সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। 'সংগঠনী' পত্রে বসিরহাটের 'জাতীয় অর্থের ছিনিমিনি' শীর্ষক যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সে জন্য উপযুক্ত তদন্ত হওয়া ও অপরাধীদের শাস্তিবিধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী—

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে কলিম্পংয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন। তিনি তথায় যুগান্তরের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন—"আমি নিজে পূর্ববঙ্গের লোক ও পূর্ববঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি নিজে তথায় যাইয়া নির্ভয়ে বসবাস করিতে পারি না। কাজেই মন্ত্রী হিসাবে আমি অন্য লোককে কিরূপে তাহা করিতে বলিব? কাজেই মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করা ছাড়া চুক্তির পর আমার অন্য উপায় ছিল না।" ক্ষিতীশবাবুর এই স্পষ্ট উক্তির পর আর কিছু বলিবার নাই। পণ্ডিত নেহরু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ও ক্ষিতীশবাবুর মত সহকর্ম্মীদের এই মনোভাব জানার পরও কেন যে চুক্তি করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মত ক্ষিতীশবাবুরও তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বর্ত্তমান সমস্যায় দেশবাসী সকলকে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা উচিত। তাঁহার পদত্যাগে দেশবাসী যেমন আনন্দিত, তাঁহার মত অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করিলে তেমনই তাহারা উপকৃত হইবে।

হরিণঘাটায় নদী-বিজ্ঞান মন্দির—

গত ২১শে মে রবিবার সকালে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা হইতে ৩২ মাইল দূরে হরিণঘাটায় পশ্চিম বাংলার নদীর গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য নদী-বিজ্ঞান মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৪৩ সাল হইতে নদী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। এতদিন গলসিতে একটি রিভার মডেল ষ্টেশন ও বেলঘরিয়ায় একটি টাইডেল মডেল ষ্টেশন ছিল। পরে (১) পরিসংখ্যান বিভাগ (২) পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ (৩) রসায়ন বিজ্ঞান ও (৪) হাইড্রলজিকাল বিভাগ খোলা হইয়াছিল। মৃত্তিকা গবেষণাগারও পরে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। বর্ত্তমানে সকল বিভাগ নূতন মন্দিরে স্থানান্তরিত হইবে। বাংলা দেশের সকল বাণিজ্য ও ঐশ্বর্য্য নদীর গতিপ্রকৃতির সহিত জড়িত। কাজেই নদী-বিজ্ঞানের আলোচনা এদেশে বিশেষ প্রয়োজন। এই মন্দির সত্বর দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে পারিলেই—ইহার প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর লাঞ্ছনা—

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি লিপিবদ্ধ হওয়ার পর লোকে মনে করিয়াছিল যে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার বন্ধ হইবে। চুক্তির পর হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে বা আসামে গমনে ও অস্থাবর সম্পত্তি আনয়নের কিছু সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুর লাঞ্ছনা প্রায় সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেগুলি অবশ্যই তিনি উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ মুখে যাহাই বলুন না কেন, তাঁহারাও সকল সংবাদ জানেন। ২৮শে মে দিল্লী হইতে জানা গিয়াছে যে এই সকল অত্যাচারের কাহিনী দিল্লী কর্ত্তৃপক্ষ পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষকেও জানাইয়াছেন। কিন্তু তাহার কোন ফল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে ঐ সকল অনাচার সরকারী লোক করে না, বেসরকারী গুণ্ডা বা আনসার দল তাহা করিয়া থাকে—কিন্তু সে কথা সত্য নহে। সত্য হইলেও সরকারী কর্ম্মচারীরা সে সকল অত্যাচার বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা করেন না। এ অবস্থায় চুক্তির সর্ত্ত ভারতরাষ্ট্র কতদিন আর মানিয়া চলিবেন? যাহাদের জন্য চুক্তি তাহারা যদি কোন সুবিধা না পায়, তবে ত এই চুক্তি বিফলই হইয়াছে। তাহার পর দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি?

অধ্যাপক ভাণ্ডারকর—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক, ভারতীয় সংস্কৃতিতে সুপণ্ডিত ডাক্তার দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ৭৫ বৎসর বয়সে গত ৩০শে মে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পুনার খ্যাতনামা পণ্ডিত, ভাণ্ডারকর ইনিষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের পুত্র। তিনি ১৯১৭ সাল হইতে দীর্ঘ ২০ বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধেও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন শিক্ষাব্রতী পণ্ডিতের অভাব হইল।

শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু। সমবেত সভ্যবৃন্দ ও প্রদেশপালের সমক্ষে মঠের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল রত মঠ-সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বামে মঠের অন্যতম কর্মী শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায়

ফটো—দিলীপ সেন

কাশ্মীর সমস্যা ও তাহার সমাধান—

ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান উভয় দেশই কাশ্মীর দাবী করায় যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ হইতে সার ওয়েন ডিক্সন ভারতে আসিয়া সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ও উভয় পক্ষের সহিত কথা বলিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি কয়েকদিন সকলের কথা শুনার পর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমস্যা এরূপ জটিল যে উহার সমাধান সহজসাধ্য হইবে না। অথচ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উপর শুধু ভারত-পাকিস্তানের শান্তি নহে, সমগ্র জগতের শান্তি নির্ভর করিতেছে। উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি সমাধানের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি তাহা সম্ভব হইবে? প্রথমেই ঐ দেশ দখল না করিয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যে ভুল করিয়াছেন, তাহার জন্য ভারতকে হয় ত শেষ পর্য্যন্ত দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। সে সময়ে জাতি সংঘের দ্বারস্থ না হইলেই পণ্ডিতজী ভাল কাজ করিতেন। এখন

বোধ হয় কাশ্মীর ভাগ অথবা যুদ্ধ—এ ছাড়া সমস্যা সমাধানের অন্য উপায় নাই। পণ্ডিতজী যুদ্ধ-বিরোধী, কাজেই কাশ্মীর ভাগ করা ছাড়া অন্য উপায় দেখা যাইতেছে না।

নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

নদীয়া জেলার রাণাঘাট নিবাসী খ্যাতনামা উকীল, নদীয়া জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২১শে মে ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার রাণাঘাটের বাসগৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তিনি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ পরিশ্রম ও কর্ম্মদক্ষতায় উন্নতিলাভ করেন। তিনি এক সঙ্গে ২০ বৎসর নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের কাজ করেন—সে সময়ে নদীয়া জেলায় মুসলমান প্রাধান্য ছিল। তিনি সমবায় আন্দোলনের প্রথম হইতে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে ১৯২৮ সালে রায় বাহাদুর ও ১৯৩৭ সালে ও-বি-ই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। রাণাঘাটের সকল সদনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও সর্ব্বদা রাণাঘাটের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। তিনি ১২ বৎসর কাল রাণাঘাট লোকাল বোর্ডের সভাপতি ও ১২ বৎসর রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সপ্তম দিনে তাঁহার পত্নীও পরলোকগমন করিয়াছেন।

কম্যুনিষ্ট চীন বহিষ্কার—

ফ্লোরেন্সে রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষাবিজ্ঞান-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে ৩০শে মে ভারতীয় প্রতিনিধি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রস্তাবে জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধিকে অপসারিত করিয়া কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিকে গ্রহণ করার প্রস্তাবের বিপক্ষে ৩০ জন ও পক্ষে মাত্র ৪ জন ভোট দেওয়ায় ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। ১৪ জন প্রতিনিধি নিরপেক্ষ ছিলেন। এই ঘটনা হইতে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা স্পষ্ট বুঝা যায়। পৃথিবী গণতন্ত্রের যতই জয় ঘোষণা করুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠা এখনও পৃথিবীতে পূর্ণভাবেই রহিয়া গিয়াছে। সে জন্য কম্যুনিষ্ট চীন চৈনিক সংস্কৃতির প্রকৃত প্রতিনিধি হইয়াও রাষ্ট্রসংঘে স্থান লাভ করিতে পারিল না।

কম্যুনিষ্ট দলের গলদ—

ভারতে এক সময় কম্যুনিষ্ট ভীতি সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়াছিল এবং নানা প্রদেশে কম্যুনিষ্ট অনাচার সৃষ্ট হওয়ায় দেশবাসী শঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ দলের যুদ্ধকালীন নেতা শ্রীপূরাণচাঁদ যোশী দল হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে ও দল ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছে। শ্রীযোশী ৬৪ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া দলের গলদ প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহার ফলে দল হইতে বহু ভাল নেতা সরিয়া পড়িয়াছেন। শুধু দেশের সকল কাজ পণ্ড করিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কম্যুনিষ্ট দল এ দেশে গঠিত হইয়াছিল, তাহা যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না, তাহা প্রথম হইতেই বুঝা গিয়াছিল। একদল অসন্তুষ্ট রাজনীতিক কর্ম্মী ভুল করিয়া ঐ দলে প্রবেশ করে ও পরে যখন নিজেদের ভুল বুঝিতে পারে, তখন দল ছাড়িয়া চলিয়া আসে। শুধু স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে কোন রাজনীতিক দল দেশে টিকিয়া থাকিতে পারে না। যত অধিক কম্যুনিষ্ট এই সত্য বুঝিতে পারিবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

তারকেশ্বরে গণ্ডগোল—

তারকেশ্বরে ভোগ বিলি লইয়া গণ্ডগোলের ফলে তীর্থগুরু মোহান্ত মহারাজের উপর যে আক্রমণ হইয়াছিল, সে সংবাদে দেশবাসী সকলেই ব্যথিত হইয়াছেন। যাহারা ঐ আক্রমণের জন্য দায়ী, তাহারা মোহান্ত মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করায় তথায় এক অচল অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ পল্লী মঙ্গল সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, সুন্দরবন

প্রজামঙ্গল সমিতির ব্রহ্মচারী ভোলানাথ প্রভৃতি তথায় যাইয়া ঐ সম্বন্ধে তদন্তের পর যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সত্য ঘটনা জানা যায়। ভোগ-বিতরণ ব্যাপারে যেমন ক্রটি দেখা যায়, তেমনই আক্রমণ-কারীদের কার্য্যও কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বহু দিন হইতে তারকেশ্বর পরিচালনা-কমিটীর সহিতও মোহান্ত মহারাজের বনিবনাও হইতেছিল না। বর্ত্তমানে এ সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আমরা পল্লীমঙ্গল সমিতিকে অগ্রণী হইয়া অব্যবস্থা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি। তারকেশ্বরের বর্ত্তমান মোহান্ত বাঙ্গালী ও অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি—সাধক। তাঁহার সময়ে তারকেশ্বরে গণ্ডগোল থাকাও আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। স্বাধীন দেশে ধর্ম্মস্থান সংস্কারেও শাসক-মণ্ডলীর চেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

দিল্লীতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর আহ্বান পাইয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দিল্লী গিয়াছিলেন এবং গত ২৭শে ও ২৮শে মে দিল্লীতে ছিলেন। লিয়াকৎ-নেহরু চুক্তি সম্পর্কে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ও ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যে সকল বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহাতে বিচলিত হইয়া ও সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য পণ্ডিতজী ডাঃ রায়কে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের সদিচ্ছা সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলায় কেহই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না—সে কথা বার বার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ও ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে দেশবাসীর সে মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধন কি সম্ভব? পণ্ডিত নেহরু ইন্দোনেশিয়া হইতে ফিরিবার পথে ২৪শে জুন কলিকাতায় আসিবেন ও ২ দিন থাকিয়া পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দেখিয়া যাইবেন। তিনি কি সে সময়ে মত পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন? পূর্ব্ববঙ্গে উৎপীড়ন ও অত্যাচার বন্ধ হইবার কোন আশাই দেখা যায় না—কাজেই চুক্তি হয় ত শেষ পর্য্যন্ত ছেঁড়া কাগজে পরিণত হইবে।

মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার—

'বিহার হেরল্ড' সম্পাদক ও 'প্রভাতী' মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার গত ২৩শে মে মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে পাটনায় পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি পাটনার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের কনিষ্ঠ পুত্র। 'বিহার হেরাল্ড' নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক ১৮৭৪ সালে স্বর্গত গুরুপ্রসাদ সেন প্রতিষ্ঠা করেন—১৯৩৮ সালে মণীন্দ্র ঐ পত্রের সম্পাদক হন। কৃতিত্বের সহিত এম-এ পাশ

মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার

করিয়া তিনি সরকারী চাকরী বা অধ্যাপনার জীবন গ্রহণ না করিয়া সাংবাদিক হন ও গত ১৩ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনভাবে দক্ষতা ও সাহসের সহিত সে কাজ করিয়া গিয়াছেন। ১৯৪০ সালে তিনি পাটনার বাঙ্গালী সমাজের মুখপত্ররূপ 'প্রভাতী' প্রকাশ করেন। এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রভাতীর সম্পাদনভার শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। মণীন্দ্রের এই অকাল মৃত্যুতে পাটনার সাংবাদিক সমাজের ও বাঙ্গালী অধিবাসীদের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

বাস্তুত্যাগী ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ—

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীর কাজ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। তিনি পূর্ববঙ্গ হইতে আগত লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ও সে বিষয়ে কর্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। তিনি পর পর কয়দিন কাঁচরাপাড়া, রাণাঘাট, বেনাপোল, বনগাঁ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কয়দিন ধরিয়া নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তস্থিত গ্রামগুলির অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। সাহায্য ও পুনর্বসতি কার্য্যে যে সকল গলদ দেখা যাইতেছে, তিনি সেগুলি সম্বন্ধেও কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতেছেন। সে জন্য কয়বার তিনি পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার রায়ের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মোটের উপর কি ভাবে দুর্গত বাস্তুহারাদের পুনরায় উপযুক্তভাবে বাসস্থান ও কার্য্য দেওয়া যায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের সে বিষয়ে যত্ন ও ও চেষ্টার অভাব নাই। মোটা বেতনের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া তিনি যে দেশসেবার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন; তাঁহার এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক, সকলেই উহা প্রার্থনা করিতেছে। বর্ত্তমান দুর্গত বাংলায় তাঁহার এই সেবাকার্য্য তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে।

কাঁচরাপাড়া চাঁদমারী আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে জনসভায় বক্তৃতা-রত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণে শ্রীমাখনলাল সেন, বামে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেজর প্রভাত বর্দ্ধন, ডাঃ ডি-এন, ভাদুড়ী প্রভৃতি। ছবির নিম্নে উপবিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ পল্লী-মঙ্গল সমিতির সদস্যগণ—(বাম দিক হইতে) শ্রীরজনীকান্ত পাল, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র (সম্পাদক), শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, শ্রীহেমচন্দ্র রায় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ধর, শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফটো—পান্না সেন

সুন্দরবন অঞ্চলে দুরবস্থা—

পশ্চিম বাংলার দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীরা নানারূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। এ বৎসর যোগেশগঞ্জ ইউনিয়নে ও পার্শ্ববর্ত্তী ইউনিয়নে পানীয় জলের অভাবে বহু লোক কলেরায় মারা গিয়াছে। ঐ অঞ্চলে জেলাবোর্ডের যে সকল হেল্থ এসিষ্টাণ্ট আছে তাহারা মাত্র ২০ টাকা মাসিক বেতন পান ও সঙ্গে ২০ টাকা ভাতা, ঘোরার জন্য ৫ টাকা ও বাড়ীভাড়া ২ টাকা মোট ৪৭ টাকা পান। অথচ ঐ অঞ্চলে সরকারী হেল্থ এসিষ্টাণ্টগণ বেতন ৪৫ টাকা লইয়া মোট ১০৫ টাকা পাইয়া থাকেন। কাজেই তাহাদের দ্বারা কতটুকু কাজ হয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। অথচ ঐ অঞ্চল হইতে ব্যবস্থা পরিষদে ৪ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে—তন্মধ্যে শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ও শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর মন্ত্রী, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী। অন্যতম মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরীও ঐ অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁহারা যদি সুন্দরবনের দরিদ্র অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটু অবহিত হন, তবে তাহারা বহু প্রকারে উপকৃত হইতে পারে। ঐ অঞ্চলে পথ নাই, যানবাহনের ব্যবস্থা নাই—শিক্ষার

ব্যবস্থা ও অতি সামান্য। ২৪ পরগণা জেলা বোর্ড কর্তৃপক্ষও এ সম্পর্কে কিছু করেন বলিয়া মনে হয় না।

দেশরক্ষা ব্যবস্থা—

স্বাধীনতা লাভের পর দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে নূতন শাসক মণ্ডলীকে অবহিত হইতে হইয়াছে। কেন্দ্রে যে সামরিক বিভাগ ছিল, তাহা সম্প্রসারিত হইয়াছে। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ছাড়া এখন নৌ-সেনা ও বিমান-সেনার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। প্রদেশ গুলিতেও দেশরক্ষা বিভাগ স্থাপন করিয়া বিশেষ প্রয়োজনের জন্য সৈন্য সংগ্রহ বা স্বেচ্ছা-সৈনিক সংগ্রহ করা হইতেছে। পশ্চিম-বঙ্গ আজ বিশেষ বিপন্ন। পাকিস্তান হইতে অত্যাচারী আন্সার বাহিনী প্রায়ই ২ হাজার মাইল সীমান্তের যে কোন স্থান দিয়া পশ্চিম বঙ্গ আক্রমণ করিতেছে—লিয়াকৎ-নেহরু চুক্তির পরও সে আক্রমণ বা অত্যাচার বন্ধ হয় নাই। আক্রমণে বাধা দিবার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা পশ্চিম বঙ্গের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত পরিভ্রমণের সময় যে অব্যবস্থা দেখিয়াছি, তাহাতে চিন্তিত না হইয়া থাকা যায় না। ৪ মাইল অন্তর একটি করিয়া সীমান্ত পুলিস ষ্টেশন—তথায় মাত্র ৫।৬ জন প্রহরী বাস করে—তাহার পর ৪ মাইলের মধ্যে কোন পাহারা নাই। সীমান্তে প্রাচীর, নদী বা কোন বাধা দিবার কিছুই নাই। তাহার সুযোগ লইয়া পাকিস্তানী আন্সারগণ আমাদের রাজ্যে আসিয়া প্রয়োজন মত সকল জিনিষ লুঠ করিয়া বা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। সে ব্যবস্থা এখনও বন্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্তান হইতে আগত হিন্দুরা ঐ সকল সীমান্তে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। তাহাদের উপর আনসারদের ক্রোধ অধিক—কাজেই ঐ সকল হিন্দু প্রায়ই অত্যাচারিত ও লুণ্ঠিত হয়। পাকিস্তানী আনসার বাহিনী ওদেশে সীমান্ত রক্ষার কাজ করে। আমাদের রাজ্যে ঐরূপ কোন রক্ষীদলের ব্যবস্থা নাই। একদল লোককে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া সামরিক শিক্ষা দান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহাদের সীমান্ত রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় নাই। ২৪ পরগণার সীমান্তগুলিও এখন পর্য্যন্ত অরক্ষিত অবস্থায় আছে। যে সকল স্থান দিয়া চোরাই মাল আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে—পাহারার ব্যবস্থা না থাকায় চোরাই কারবারের ব্যবসায়ীরা তথায় কালোবাজার তৈয়ারীর সুবিধা পাইয়া থাকে। ঐ ভাবে কত মাল যে ভারত রাষ্ট্র হইতে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। আমাদের শাসকবর্গ কেন যে এখনও দেশরক্ষা ব্যাপারে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই, তাহা জানি না। এ জন্য যে পরিমাণে রক্ষী বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন ছিল তাহাও করা হয় নাই। সে জন্য পাকিস্তানী আক্রমণ চলিলেও এ পক্ষ হইতে তাহাতে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় না। কতদিন এই ভাবে আমরা আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হইব, তাহা কে জানে?

বৃক্ষ-রোপণ উৎসব—

গত কয় বৎসর ধরিয়া পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে বর্ষাকালে বৃক্ষ রোপণ উৎসবের আয়োজন করা হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক দিকে জনগণের উৎসাহের অভাব, অন্য দিকে সরকার পক্ষের মামুলী বিজ্ঞাপন—উভয়ের জন্য অধিকসংখ্যক বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা দেখা যায় না। বাংলা দেশে গাছের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় উপযুক্ত বর্ষারও অভাব দেখা দিয়াছে, সে জন্য বন বিভাগ হইতে পশ্চিম বাংলার কোন কোন জেলায় নূতন করিয়া বন সৃষ্টিরও আয়োজন চলিতেছে। এ দেশে সাধারণ গৃহস্থগণ গ্রামে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জামরুল, লিচু প্রভৃতি ফলের বাগান নিজ নিজ গৃহের চতুর্দিকে তৈয়ার করিত। মানুষ গ্রামের বাস ছাড়িয়াছে, সকলে সহরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, কাজেই কেহ আর ফলের বাগান তৈয়ার করে না। পিতামহ বা প্রপিতামহ যে ফলের বাগান তৈয়ার করিয়া গিয়াছিলেন, গত মহাযুদ্ধের সময় একটা গাছের দাম এক শত টাকা হওয়ায় (কয়লার অভাবে কাঠের চাহিদা বাড়ায়) লোক সে সকল গাছ অর্থের লোভে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, সে সকল ফলের গাছের স্থানে নূতন বাগান তৈয়ারী হয় নাই। সে জন্য আজ বাংলায় ফলের দামও অত্যধিক হইয়াছে। এ অবস্থায় সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে বৃক্ষ রোপণ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন হইয়াছে। যাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ জমীতে ফলের গাছ রোপণ করেন, সে জন্য

সকলকে অবহিত করা প্রয়োজন। সরকারী বাগানে ফলের গাছের চারা তৈয়ার করিয়া তাহা সকলের মধ্যে সুলভে সরবরাহ করা কর্ত্তব্য। এবার বাংলায় প্রচুর আম হইলেও আমের দর কমে নাই—কারণ মানুষের সংখ্যার তুলনায় আম গাছের সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছে। ধনীরা যাহাতে ফলের বাগান করিতে উৎসাহিত হয়, কৃষি-বিভাগ সে জন্য কোন চেষ্টা করেন না। বৃক্ষ রোপণের নানা দিক আছে। নিম্ন বঙ্গে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হয়—অথচ নারিকেলের চাষ বৃদ্ধিতেও সরকার কোন প্রকার উৎসাহ দান করেন না। যে ভাবে ধান্য-চাষীদের অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদনের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে, সেই ভাবে ফলের বাগান তৈয়ারীর জন্য, অধিক পরিমাণ তরি-তরকারী উৎপাদনের জন্যও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। অনেক বড় বড় প্রশস্ত নূতন পথ তৈয়ার হইতেছে—সেই সকল পথের ধারে ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিলে পথের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, পথচারীরা রৌদ্রের তাপ হইতে রক্ষা পায় ও সঙ্গে সঙ্গে ফল উৎপন্ন হইয়া দেশে ফলের অভাব দূর করে। সে বিষয়ে কাহারও কোন চেষ্টা দেখা যায় না। পুরাতন পথগুলির ধারে যে বৃক্ষরাজি ছিল, সেগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার স্থানে নূতন বৃক্ষ লাগাইবারও কোন চেষ্টা দেখা যায় না। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে কেহ একটি নূতন গাছ তৈয়ার করিয়া দিলে তাহাকে ৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইত। এখন কি আবার সে প্রথা প্রবর্তন করা যায় না? অবশ্য এখন পুরস্কারের পরিমাণ ৪।৫ গুণ করা প্রয়োজন হইবে। তাহা করিলে শুধু ঐ একটি পথের ধারেই কয়েক সহস্র গাছ তৈয়ার হইতে পারে। আমাদের এক বন্ধু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় রাস্তার ধারে নারিকেল গাছ রোপণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রচুর পরিমাণ নারিকেল উৎপন্ন হইলে তদ্বারা দেশের খাদ্যাভাব কতক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে দেশে জ্বালানি কাঠের খুবই অভাব। অথচ এক শ্রেণীর জ্বালানী কাঠের গাছ পথের ধারে রোপণ করিলেই বড় বড় গাছে পরিণত হয়—সে গাছগুলি অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সে দিকেও কৃষি বিভাগের কর্তৃপক্ষদের যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। মিউনিসিপালিটী, ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড প্রভৃতি যাহাতে এ কার্য্যে অগ্রসর হয়, সরকারী স্বায়ত্তশাসন বিভাগ ও কৃষি-বিভাগ সে বিষয়েও কেন অবহিত হন না জানি না। স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে অতি সহজে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়। তাহারা যৌবনে এ কার্য্যে উৎসাহ পাইলে সারা জীবন সে অভ্যাস রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে। বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে রথের উৎসব হয়, রথের বাজারে পূর্ব্বে বহু গাছের চারা বিক্রীত হইত—এখনও কোন কোন স্থানে সে ব্যবস্থা দেখা যায়। বর্ষার প্রথমেই রথ হয়—কাজেই লোক রথের বাজারে চারা কিনিয়া বর্ষার প্রথমে তাহা বাগানে রোপণ করিলে বর্ষার জলে সে সকল গাছ বাঁচিয়া যাইত। সে ব্যবস্থায় উপযুক্ত ব্যক্তিদেরও অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা প্রয়োজন। কৃষি-বিভাগের কর্মচারীরা যাহাতে এ সকল কাজে মন দেন, তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। খাদ্য-বিভাগ হইতেও এ বিষয়ে কাজ করা উচিত। ফলের গাছই হউক, জ্বালানী কাঠের গাছই হউক—আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সেগুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। পূর্বে পথের ধারের তেঁতুল গাছগুলি হইতে এত অধিক তেঁতুল পাওয়া যাইত যে তেঁতুলের সের ছিল ১ পয়সা। আর এখন তাহা ৮ আনা। পথের ধারে কাহাকেও আর নূতন তেঁতুল গাছ বসাইতেও দেখা যায় না। শ্রাবণে হয় ত সরকার পক্ষ হইতে বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হইবে, সে জন্য আমরা এখন হইতে সকলকে উৎসাহের সহিত সে বিষয়ে কার্য্য করিতে অনুরোধ করি। দেশের প্রত্যেক নরনারী যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হন, তাহা হইলে সমস্যার সমাধান করা আদৌ কষ্টকর হইবে না।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
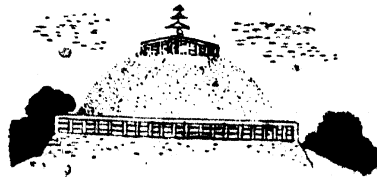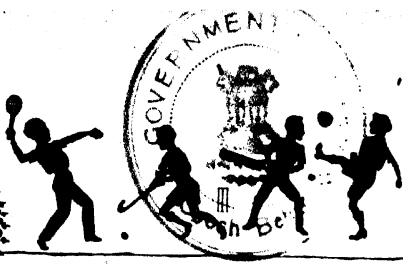
ফুটবল লীগ ঃ

ক'লকাতার গড়ের মাঠে ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেছে। গত বছরের থেকে খেলার মাঠের দর্শক সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে যে কোন দুর্ব্বল দলের খেলায় মাঠে বেশ দর্শক সমাগম হচ্ছে। এর কারণ, খেলার ভাল স্ট্যাণ্ডার্ড নয়, প্রধান কারণ হ'ল ক'লকাতায় লোক সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এ পর্য্যন্ত প্রথম বিভাগের লীগে যতগুলি খেলা হয়েছে তার ফলাফলের উপর লীগের উপরের দিকে আছে গত বছরের লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, মোহনবাগান এবং রাজস্থান। ইস্টবেঙ্গল ৯টা খেলায় ১৭ পয়েন্ট করেছে। জর্জ্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে তাদের খেলার ফলাফল এর সঙ্গে ধরা হয়নি। সেদিন খেলা শেষ হবার নির্দ্ধারিত সময়ের তিন মিনিট আগে পর্য্যন্ত খেলাটা ড্র যাচ্ছিল এমন সময় ইস্টবেঙ্গল এক গোল দেয়। এই গোল হবার আগেই রেফারী অফ্ সাইডের হুইসেল দেন। কিন্তু মাঠে একদল উচ্ছৃঙ্খল দর্শক ঢুকে পড়ায় খেলাটা শেষ পর্য্যন্ত আর হয়নি, অসমাপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। এ খেলার পয়েন্ট সম্পর্কে আই এফ এ-র কাছ থেকে এখনও কোন সুস্পষ্ট মত পাওয়া যায়নি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১০টা খেলার মধ্যে ৩টে খেলায় দলের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। তাদের খারাপ খেলা হয়েছে কালীঘাট, জর্জ্জ টেলিগ্রাফ এবং ক্যাল: গ্যারিসন দলের সঙ্গে। কালীঘাট ক্লাবের সঙ্গে খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব শেষ পর্য্যন্ত ১-০ গোলে জয়ী হয়ে কোন রকমে মান রক্ষা করেছে। খেলার আগে কেউ ভাবতে পারেনি অখ্যাতনামা একেবারে তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে কালীঘাট ক্লাব গত বছরের লীগ-শীল্ড-রোভার্স বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে একেবারে নাজেহাল করবে। নিরপেক্ষভাবে সেদিনের খেলা বিচার করলে ঐ দিনের খেলায় কালীঘাট ক্লাবের জয়লাভই সঙ্গত হ'ত। কালীঘাট ক্লাব দুর্ভাগ্যক্রমে হেরে গেলেও দর্শকদের একথা বুঝিয়ে দিয়েছে বাঙ্গলার যুব শক্তি উপেক্ষিত হলেও এখনও মরেনি; অভিজ্ঞতা এবং খ্যাতির দিক থেকে কালীঘাট ক্লাব ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়দের সামনে দাঁড়াতে পারে না কিন্তু এ সমস্তই সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়তাবোধের কাছে কি ভাবে চুরমার হতে পারে সেদিনের খেলায় তারা দেখিয়ে দিয়েছে। আমরা কালীঘাট ক্লাবের বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলি 'সাবাস! সাবাস! এই সঙ্গে যে সব ক্লাব উৎকট দলীয় স্বার্থে বাইরের খেলোয়াড় আমদানী ক'রে লীগ-শীল্ড পাওয়াটাই একমাত্র কাম্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদের সেদিনের খেলায় অবস্থা অনুধাবন করতে অনুরোধ করি। জর্জ্জটেলিগ্রাফের সঙ্গে খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা দর্শকদের হতাশ করেছে। খেলোয়াড়দের বহু ত্রুটির জন্য সমর্থকেরা শেষ পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ক্যালকাটা গ্যারিসনের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গলের তিনজন নিয়মিত খেলোয়াড় নামেনি। ভিজে মাঠের সুবিধা পেয়ে সৈনিকদল ইস্টবেঙ্গল দলের থেকে অধিক অব্যর্থ গোলের সুযোগ পায় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার একটীরও সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড় আবিদ এবছর মহমেডান স্পোর্টিং দলে যোগদান করায় দলের বিশেষ ক্ষতি হয় নি। তাদের 'ফরওয়ার্ড লাইন' এখনও অন্য দলের থেকে

সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী এবং শ্রেষ্ঠ। সেই তুলনায় হাফ্‌ লাইন সুবিধার নয়। রক্ষণভাগে একমাত্র ব্যোমকেশ বোসই নির্ভরশীল। তাজ মহম্মদের মত একজন শক্তিশালী ব্যাকের অভাব বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। আক্রমণভাগে শক্তিশালী খেলোয়াড় থাকার জন্য রক্ষণভাগে এখনও তেমন চাপ পড়েনি। দলের কৃতিত্ব এ পর্য্যন্ত একটা খেলাতেও হারেনি এবং মাত্র একটা গোল খেয়েছে। গোল দিয়েছে ই-আই রেলদলের মেওয়ালাল। খেলা ড্র গেছে একটা, ডালহৌসির সঙ্গে। ১০টা খেলায় ২১টা গোল দিয়েছে। ১০টা খেলায় ১৬ পয়েণ্ট করে দ্বিতীয় স্থানে আছে গত বছরের আই এফ এ শীল্ডের রানার্স-আপ মোহনবাগান ক্লাব। মোহনবাগান এখনও পর্য্যন্ত হারেনি। ২০টা গোল দিয়ে ৩টে গোল খেয়েছে। দলের নতুন খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফরওয়ার্ডে সত্তার (মহঃস্পোর্টিং), এস গড়গড়ি, অনিল মুখার্জি (রাজস্থান); হাফব্যাকে ডি পাইন (এরিয়ান্স) এবং রতন সেন (রাজস্থান)। মূল্যবান এক পয়েণ্ট নষ্ট করেছে স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে। রাজস্থান ক্লাব ১০টা খেলে ১৫টা পয়েণ্ট পেয়েছে। রাজস্থান লীগের খেলায় প্রথম হেরেছে ১-০ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে। রাজস্থানে একাধিক নামকরা খেলোয়াড় এ বছর যোগ দিয়েছে। ভারতীয় অলিম্পিক গোলরক্ষক সঞ্জীব, হাফব্যাকে অরোকিয়া স্বামী ও মহাবীর, ফরওয়ার্ডে বজ্র ভেলু, শ্যাম্পাঙ্গী, রমন, এণ্টনি এবং ডি ক্রুজ। দলের রক্ষণ এবং আক্রমণভাগ সমান শক্তিশালী। খেলোয়াড় সংগ্রহের দিক থেকে রাজস্থান ক্লাব ফুটবল ক্রীড়ামহলে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি ক'রেছিল খেলায় তেমন কিছু দেখাতে পাচ্ছে না। এ পর্য্যন্ত বেশী গোল দেওয়ার কৃতিত্ব লাভ করেছে আর দাশগুপ্ত (কালীঘাট) ৭; মেওয়ালাল (ই-আই-আর) ৭; এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ভেঙ্কটেস ও ধনরাজ (ইস্টবেঙ্গল) ৬; কে সিংহ, (কালীঘাট) ৬; এ ব্যানার্জি (জর্জটেলিঃ)—৫; ইউরোপীয় সমাজের ধ্বজাধারী বিখ্যাত ক্যালকাটা ক্লাব লীগের শেষ ধাপে আছে। ১২টা খেলায় ২ পয়েণ্ট করেছে। পর পর দশটা খেলায় হেরে ক্যালকাটা ক্লাব ভবানীপুর দলের সঙ্গে ২-২ গোলে খেলা ড্র ক'রে এক পয়েণ্ট পায়। এবছর কোন্ দল লীগ পাবে এবং কোন্ দল দ্বিতীয় বিভাগে নামবে এ জানবার আগ্রহ দর্শকমহলের সমান। শেষ পর্য্যন্ত যদি ক্যালকাটা ক্লাবই লীগের সর্ব্বশেষ স্থান অধিকার করে তাহলে এই দলের সম্মান কি উপায়ে বজায় রাখা যায় এই নিয়ে নিশ্চয় ক্রীড়ামহলে নানা জল্পনা কল্পনা চলবে। এটা কম উপভোগ্য বিষয় হবে না।

মহমেডান স্পোর্টিং লীগের তালিকায় বর্ত্তমান অবস্থায় ১০টা খেলায় ১৩ পয়েণ্ট ক'রে চতুর্থ স্থানে আছে। হার হয়েছে ১টায়, রাজস্থান দলের কাছে ১-০ গোলে। জর্জ্জ-টেলিগ্রাফ আছে পঞ্চম স্থানে এদের হার ২টো।

ভবানীপুর ১০টা খেলায় ৮টা ম্যাচ ড্র করেছে, হেরেছে ১টায়, ইস্টবেঙ্গলদলের কাছে এবং জিতেছে ক্যালকাটা গ্যারিসনের সঙ্গে ৮ গোলে। কালীঘাট ৮-১ গোলে বি এন আরকে হারিয়েছে। এ বছর এ পর্য্যন্ত এত বেশী গোলে এই দু'দল ছাড়া কোন দল জিত্‌তে পারেনি।

ইংলিশ ফুটবল মরশুম ঃ

১৯৫০ সালের ইলিংস ফুটবল মরসুমের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নীচে ফলাফল দেওয়া হল।

এফ এ কাপ ঃ

বিজয়ী	রানার্স-আপ
আর্সেনাল—২	লিভারপুল—০

প্রথম বিভাগ লীগ

চ্যাম্পিয়ানস	রানার্স-আপ
পোর্টসমাউথ—(৫৩)	উলভার হামটন ওয়াণ্ডারার্স (৫৩)

দ্বিতীয় বিভাগ লীগ ঃ

টোটেনহাম হটসপার (৬১)	শেফিল্ড ওয়েডনেসডে (৫২)

তৃতীয় বিভাগ (সাউথ)

নটস কাউন্টি (৫৮)	নর্থহামটন টাউন (৫১)

তৃতীয় বিভাগ (নর্থ)

ডনকাষ্টার্স রোভার্স (৫৫)	গেটসহেড (৫৩)

৪২টা খেলায় কোন দল কত পয়েণ্ট করেছে তা দলের নামের পর বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হ'য়েছে।

স্কটিস লীগ 'এ'	রেঞ্জার্স (৫০)	হিবারনিয়ান (৪৯)
,, ডিভিসন 'বি'	মর্টোন (৪৭)	এয়ারড্রিওনিয়ান্স (৪৪)

জাতীয় জীবনে ফুটবল খেলা ঃ

বাঙ্গলা দেশের সব থেকে জনপ্রিয় খেলাধুলো ফুটবল খেলার মরসুম ক'লকাতার গড়ের মাঠে গত মে মাসের

প্রথম থেকে সুরু হয়ে গেছে। ক'লকাতার গড়ের মাঠকে সারা ভারতের ফুটবল এবং হকি খেলার মহা-তীর্থক্ষেত্র বলা অসঙ্গত হবে না। ফুটবল খেলার সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির কৃষ্টি-সভ্যতার যেন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, যেমন জীবনধারণের ক্ষেত্রে ভাত ও মাছের। ক'লকাতা সহর ছাড়িয়ে বাংলার মফঃস্বল সহর, সহরতলী এবং পল্লী গ্রামাঞ্চলগুলিতে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তার তুলনা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে মিলবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতি ইংরেজ রাজত্বের সময় থেকেই নিঃস্ব হয়ে করুণার পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈদেশিক শাসক-কুলের স্বার্থের প্রয়োজনে বাঙ্গালী জাতিকে আত্মত্যাগ এবং নানা প্রলোভনের বিনিময়ে চাকুরীবৃত্তির পথ বেছে নিতে বাধ্য করা হয়েছিলো। এর কুফল সমগ্র জাতির স্বাধীন সত্তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে যথেষ্ট বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ালেও বাঙ্গালী জাতির মধ্যে একাধিক প্রতিভাবান মনীষি জন্মগ্রহণ ক'রে সারা ভারতের দাসত্ব শৃঙ্খলমোচনের সংগ্রামে নেতৃত্বের সম্মান লাভ এবং সেই সঙ্গে চরম দুঃখ দুর্দ্দশা এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করেছিলেন। বাঙ্গালী জাতির জীবনসত্তার মধ্যে রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ বৈদেশিক শাসকমণ্ডলীর চোখে কিন্তু অপরাধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ শাসক সম্প্রদায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন-প্রাণ, মান-সম্মানকে কি ভাবে লুণ্ঠিত এবং লাঞ্ছিত করেছে তার ইতিহাস দীর্ঘদিনের এবং আজকের ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী জাতিই বৈদেশিক কূটনীতি এবং নিপীড়নের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিয়ে আজ নিজ দেশে পরবাসী হয়েছে। অর্থনৈতিক চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুখ থেকে অনেক দিন আগেই হাসি মিলিয়ে গেছে। বাঙ্গালী হাসতে জানে না, এ রকম মন্তব্য বাঙ্গালা জাতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল চালু আছে। একথাটা যেমন খাঁটি সত্য, তেমনি এর ব্যতিক্রম আছে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে। একদিকে, দেশপ্রেমের গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে গিয়ে বাঙ্গালী যুবকদের মুখে হাসি ঝরেছে অপরদিকে বাঙ্গালীর মুখে হাসি দেখা গেছে ফুটবল খেলার মাঠে। চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত কেরাণী, স্কুল কলেজের ছাত্র, বেশীর ভাগ এদের নিয়েই ফুটবল খেলোয়াড় আর এরাই হ'ল ফুটবল খেলার দর্শক এবং বড় সমর্থক। বছরের মধ্যে যে মাস থেকে সুরু ক'রে তিনচার মাস ক'লকাতার বাঙ্গালী জাতির মধ্যে একটা আনন্দ-উদ্দীপনার সাড়া পাওয়া যায়। বাঙ্গালী জাতি যে হাসতে পারে, তাদের প্রাণে যে আনন্দের প্রাচুর্য্য আছে সেই সঙ্গে ধৈর্য্য এবং কষ্ট-সহিষ্ণু গুণও যে আছে, বোশেখ এবং জষ্ঠি মাসের কাঠফাটা রোদে আবার আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের অবিরাম বারিপাতের মধ্যে খেলার মাঠে আট দশ ঘণ্টা অপেক্ষামান বাঙ্গালী দর্শকদের দেখলে তা স্বীকার না ক'রে পারা যায় না।

বৃটিশ আমলে পুলিশের গুতো এবং ঘোড়ার লাথির বেড়াজাল পার হয়ে মাঠের মধ্যে ঢুকে সে কি আরামের নিশ্বাস আর একমুখ হাসি। আর যেদিন খেলায় গোরা কিম্বা ইউরোপীয় দলকে বাঙ্গালী দল হারিয়ে দিত সেদিন মনের আনন্দে বাঙ্গালী দর্শকদের মুখে হাসি উপ্‌ছে পড়তো। আগের দিনে বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়দের খেলায় নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার বিশেষ প্রশংসা শোনা যায়। এর পিছনে নিছক খেলাটাই বড় ছিল না, ছিল বহুদিনের উৎপীড়নের ফলে প্রতিশোধের আক্রোশ, জাতীয়তাবোধ এবং রাজনৈতিক চেতনা। ভারতীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব নিয়ে বৈদেশিক সরকারের সঙ্গে আমাদের যে বিরোধ ছিল খেলার মাঠে তাদেরই জাতীয় ফুটবল খেলায় হারিয়ে আমরা জাতীয় জয়লাভের সমান আনন্দ এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করতুম। শিক্ষা, সভ্যতা এবং কৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন পাশ্চাত্য পদ্ধতি এবং ভাবধারাকে আমরা অন্ধের মত অনুকরণ করেছি তেমনি ফুটবল বিদেশী খেলা হওয়া সত্ত্বেও আমরা জাতীয় খেলার সমান পদমর্য্যাদা দিয়েছি। ভারতীয় ফুটবল খেলার যে একটা নিজস্ব পদ্ধতি এবং স্বাতন্ত্র্য ধারা রয়েছে তার পথ প্রদর্শক হ'ল বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়রা। আজ যেমন ঘটনাচক্রে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা পিছু হটেছি, তেমনি পিছনে পড়ে আছি খেলাধুলায় এমন কি ফুটবল খেলাতেও। ক'লকাতার অর্থবান ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলির উগ্র দলীয় মনোভাব এবং তাদের অবলম্বিত নীতিই ফুটবল খেলায় বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের জীবনে চরম ব্যর্থতা ডেকে এনেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে

যেমন সট-কাট নোট মুখস্থ ক'রে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় সাফল্য লাভের সোজা পথ বেছে নিয়েছে, আমাদের দেশের নামকরা একাধিক ফুটবল টীমের কর্তৃপক্ষ মহলকে লীগ-শীল্ড জয়লাভের অন্ধমোহে জাতীয় সম্মান এবং খেলাধূলার মূলনীতি বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল দলগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার বাইরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমন কি বর্ম্মা মুল্লুকেও খেলোয়াড় সংগ্রহের আড়কাঠি পাততে দেখা গেছে। এসব কাজে তাঁদের কি উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং আইনের ছিদ্র পথ আবিষ্কারের কুটবুদ্ধি! আজ তাঁদের কাছে বড় কথা, লীগ-শীল্ড নিয়ে দলের নাম প্রতিষ্ঠা ক'রে বেশী সংখ্যক সমর্থক যোগাড় করা। এর মধ্যে নীতি বা কোন আদর্শের বালাই নেই, একমাত্র দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া। মনের মধ্যে এবং আচার ব্যবহারে প্রাদেশিকতা এবং সঙ্কীর্ণতা পোষণ করা মহত্বের যেমন পরিচয় নয় তেমনি এর দোহাই দিয়ে এমন উদারতার পথ নিশ্চয় অবলম্বন করা উচিত হবে না যার ফলে সমগ্র জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে। আজ ক'লকাতায় যে অবাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়দের উপর দলের সম্মান রক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং যে সব কৌশলে তাদের দলভুক্ত করা হয় তা আত্মপ্রবঞ্চনার সমান এবং তাতে সখের খেলোয়াড়দের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। ১১. ৬. ৫০.

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

নরেন্দ্র দেব প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "রাজপুতের দেশে"—৩॥০

মন্মথ রায় প্রণীত নাট্যোপন্যাস "কৃষাণ"—২৲

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত স্বরলিপি "সুরবিহার"—৪৲, গানের বই "ভাগবতী গীতি"—৪৲

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার প্রণীত উপন্যাস "মানস-প্রতিমা"—২।০

যজ্ঞেশ্বর রায়-সম্পাদিত গল্প-গ্রন্থ "ধূসর পদচিহ্ন"—২৲

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "উপনিষদ" (৩য় খণ্ড)—২৲

শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত ডিটেকটিভ উপন্যাস "দুর্দ্দান্ত স্বপন"—২৲, "হীরক-দ্বীপে স্বপন"—২৲, "অপরাজেয় মোহন"—২৲

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ-অনূদিত "আইভ্যানহো"—১৲

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী "কানাইলাল"—৷০, "সত্যেন বসু"—৷০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "গ্রীণ হাউস"—১॥০

শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা"—২৲

শ্রীমতী বিজনলতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "ধূলার ধরণীতে"—২॥০

প্রবোধ সরকার প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "লক্ষ বর্ষ পরে"—১॥০

শ্রীঅনাথ রায় প্রণীত "অদৃশ্য কালো গোয়েন্দা"—১৲

শ্রীশ্রীসদ্গুরু সাধন সঙ্ঘ প্রকাশিত "পারের কড়ি" (ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজীর পত্রাবলী)—২৲

শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "বনলতা"—॥০

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "ভারতীয় সঙ্গীত পরিচিতি" (১ম খণ্ড)—৩৲

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" ২য় খণ্ড—৬৲

মিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "পাটলিপুত্র"—২৲

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের পাকিস্তানস্থ গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা আমাদের কার্য্যালয়ে "ভারতবর্ষ"-এর চাঁদা পাঠাইতে বা জমা দিতে অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতঃপর ইচ্ছা করিলে গ্রাহকনম্বর উল্লেখপূর্ব্বক The Asutosh Library, 78/6, Lyall Street, Dacca, East Pakistan—নিকট চাঁদা পাঠাইতে বা জমা দিতে পারেন। নূতন গ্রাহকগণ টাকা জমা দিবার সময় "নূতন গ্রাহক" কথাটি উল্লেখ করিবেন। ইতি—

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

নববধূর পতিগৃহযাত্রা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা

শিল্পী :—(প্রত্যাখ্যাত ছবিগুলি সংগ্রহ করিয়া) ত্রুটি জানতে পারলে সংশোধন করতে পারতাম।

সম্পাদক :—অসম্ভব। ঐ চেহারা আর কত্তো শোধরাবেন! তা ছাড়া আপনার গুপ্তি-চাহনিটাও সুবিধার নয়।
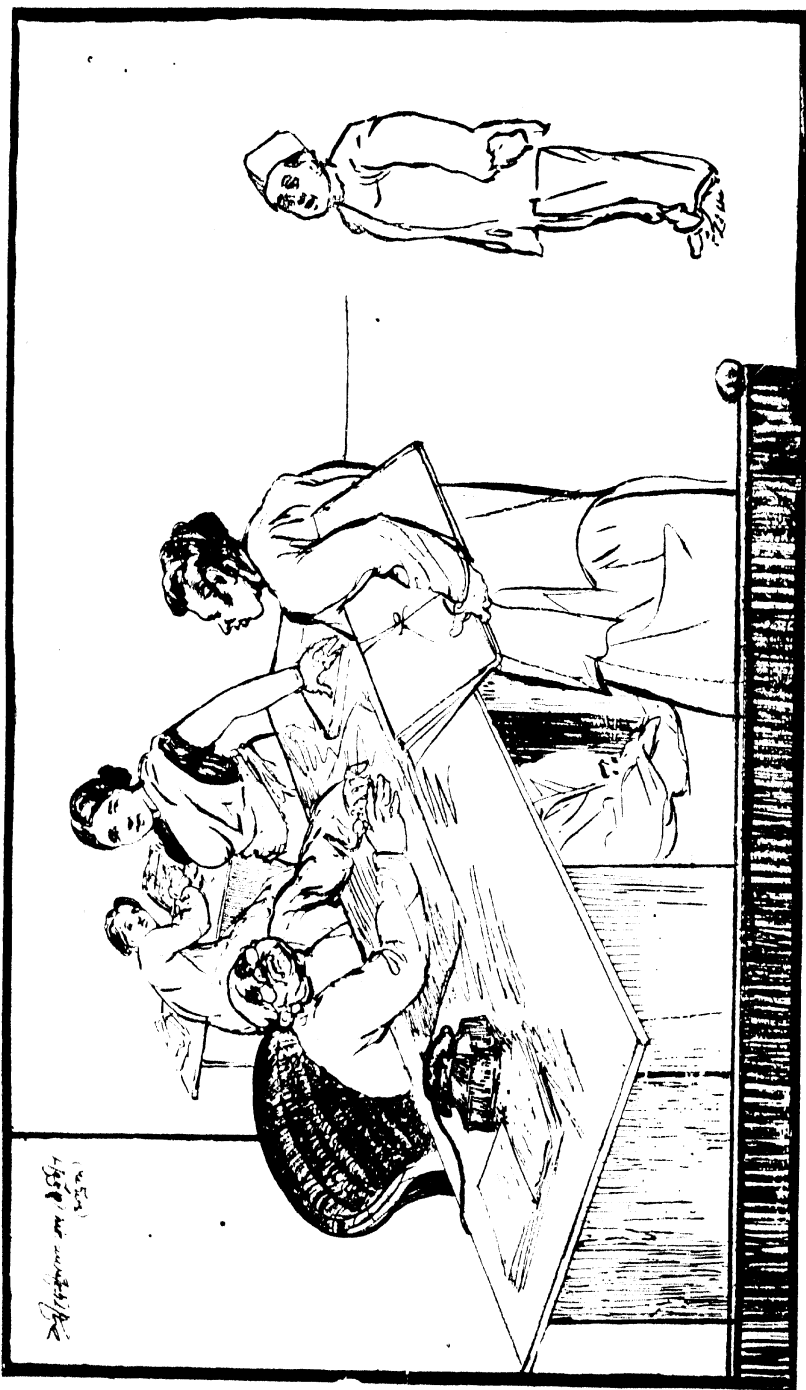
শ্রাবণ—১৩৫৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

গীতায় সন্ন্যাসের আদর্শ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। শর-বর্ষণের জন্য ধনুর্বাণ তুলিয়া অর্জুন সহসা থামিয়া গেলেন, সারথিকে বলিলেন—রথ ফিরাও, যুদ্ধ আমি করিব না, বিজয় রাজ্য সুখ আমি চাহি না, 'রুধির-প্রদিগ্ধান' ভোগে আর কাজ নাই। কর্মত্যাগ সংসারত্যাগ করিয়া আমি সন্ন্যাসী হইব, ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিব। কিন্তু ফিরিবার পথ নাই—'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' রথ স্থাপিত। পাণ্ডবপক্ষের সর্বময় অধিনায়ক রথীন্দ্র অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বিমুখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কঠোর ভাষায় বলিলেন—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। অর্জুন, ক্লীব হইও না, অধর্মের গ্লানিতে ক্লিষ্ট বিশাল ভারতকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন মহাভারত সৃষ্টি কর। বুর্জোয়া মনোবৃত্তি, আভিজাত্যের চিন্তাপ্রণালী ছাড়িয়া দাও। একতরফা ভীষ্ম-দ্রোণের জন্য 'কৃপয়াবিষ্ট-মশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্' হইলে জনসাধারণ—যেঽপি স্যুঃ পাপ-যোনয়ঃ—স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র পতিত চণ্ডাল বাদ পড়িয়া যায়। গণশক্তিই রাষ্ট্র-শক্তি।

যাঁহারা বলেন—রূপক ছলে অন্তর্জগতের রহস্যসমূহ সমাধান করাই গীতার উদ্দেশ্য, গীতার কুরুক্ষেত্র ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্র নহে, উহা মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র, মানুষের সহিত মানুষের যুদ্ধ গীতায় বর্ণিত হয় নাই, উহা সাধন-সমর, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। মানুষের অন্তর্জগতে যেমন পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, বহির্জগতে মানুষের বাস্তব কর্মজীবনেও সেইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত নিরন্তর চলিতেছে। ভারতের নবযুগে আজ এই কথাটি সর্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে যে, এক ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধই গীতার পটভূমি, রক্ত-প্লাবিত ইতিহাসের ক্ষেত্রেই গীতার বাণী উচ্চারিত। ধর্মক্ষেত্র আজ আর নৈমিষারণ্যের শান্ত পরিবেশের মধ্যে নহে,

ভারতের শেষ বেদান্ত সকল শেষ প্রশ্নের চরম মীমাংসা দিতে রণভূমির কেন্দ্রস্থলেই আবির্ভূত, কলকোলাহলময় যুদ্ধক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদরূপে প্রকট হইয়াছে। দুর্যোগময় কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণ 'ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে'র উপদেশ দিয়াছেন, ধূলিমলিন ধরার কর্মের মধ্যেই নৈষ্কর্ম্যের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। গীতা ঝড়ের শাস্ত্র—ঝড়কে বুকে লইয়া কেমন করিয়া পরম শান্তি নামিয়া আসে সেই সংবাদ গীতা দিয়াছেন। শ্মশানের শান্তি গীতা প্রচার করেন নাই।

সংসার যুদ্ধক্ষেত্র—ইহাই সংসারের স্বরূপ, এখানে সকলে যুযুৎসু হইয়াই সমবেত। বিশ্বপ্রকৃতি এখানে চ্যালেঞ্জ দিয়া বসিয়া আছেন—যো মাং জয়তি সংগ্রামে * * * স মে ভর্তা ভবিষ্যতি। এই যুদ্ধ-আহ্বান গ্রহণ করিয়া তাহাকে জয় করিতে হইবে। এই জয় করার সাধনা গীতাতে বর্ণিত। অন্তর্জগতে বহির্জগতে যত প্রকার শত্রু আছে সব জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে হইবে। ভিতরের কামক্রোধাদিই কেবল শত্রু নয় বাহিরের আততায়ী দুর্যোধনাদিও পরম শত্রু। এ বিশ্বে পরাজিতের স্থান নাই।

জটিল সমস্যাপূর্ণ সংসারকে পায়ে ঠেলিয়া জগতের ওপারে মুক্তির সন্ধান দিবার জন্য সকল উপনিষদের সার লইয়া গীতার সৃষ্টি হয় নাই। গীতার মুক্তি এই জগতের মাটির বুকে—ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ—মৃত্যুর পূর্বে এই মানব দেহে—প্রাক্ শরীর-বিমোক্ষণাৎ। সংসার ত্যাগ করিলেই শান্তি আসে না, রস-লালসা অতৃপ্ত-বাসনা অবচেতনায় বাসা বাঁধিয়া সুযোগের অপেক্ষায় স্তব্ধ থাকে। অস্বীকার করিলেই বিশ্বপ্রকৃতি অস্বীকৃত হয় না। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণকার দিয়াছেন—রাজা সুরথ, বৈশ্য সমাধি, সৌভরি পরাশর ঋষ্যশৃঙ্গ বিশ্বামিত্র রাজা ভরত। নিগৃহীত হইলেই কামনা মরে না, স্নায়ুমণ্ডলকে শুকাইলে বাসনা শুকায় না—ইহা রোগীকে শেষ করিয়া রোগ উপশমের নিষ্ফল প্রয়াস। গীতার আদর্শ জনকাদয়ঃ। রাজর্ষি জনক প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হইয়া সংসারে থাকিয়াই সন্ন্যাসী। কর্ম-ক্ষেত্রের মত্ততার মধ্যে তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ সমতা নৈষ্কর্ম্যের অবিচল শান্তি আনিয়াছিলেন। ভোগ ও ত্যাগ, সংসার ও সন্ন্যাস—উভয়ের সত্য সম্বন্ধ স্থাপন, তাহাদের সমন্বয় গীতার মহাদান।

কিছুদিন পূর্বে ভারতের তদানীন্তন মহামান্য রাষ্ট্রপাল শ্রীরাজাগোপালচারী এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—ভারতের বৈদান্তিক সভ্যতা, তাহার অজড়বাদী সংস্কৃতি ভারতকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আর্য সভ্যতার মূল প্রকৃতি, তাহার অধ্যাত্মবাদ একভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা আজও অম্লান। সত্য বটে অতি প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করিয়া ভারত আজও বাঁচিয়া আছে, কিন্তু কিভাবে সে জীবিত তাহা আজ বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে। কোনমতে টিকিয়া থাকাই পরম পুরুষার্থ নহে। একটা জাতি জীবন্মৃত অবস্থায় বহুকাল টিকিয়া থাকিতে পারে, ক্ষয়রোগীও দীর্ঘজীবী হয়। বহুকাল বাঁচিয়া আছি অতএব ভবিষ্যতেও থাকিব, এযুক্তি বালকেই করে। অজড়বাদের যদি এতই মহিমা, তবে সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? মুসলিম আক্রমণ, বৃটিশ-বণিকের রাজ্য প্রতিষ্ঠা সে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই কেন? পশ্চিম পঞ্জাবে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের একটা কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ববঙ্গ হিন্দুর দেশ, আফগানিস্থান বেলুচিস্থান হইতে তাহা অনেক দূরে, সেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হইল কেন? চোখের উপর অখণ্ড ভারতবর্ষ ছিন্নভিন্ন হইল, তাহার দুইটি অঙ্গ খসিয়া গেল। অজড়বাদী সংস্কৃতি, তাহার নেতিবাদ সকল বিপদ হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে পারে নাই—একথা আজ অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিতে হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতির যে ত্রুটির জন্য এই সুদূরপ্রসারী পরাধীনতার জ্বালা, তাহার কোলের কোটী কোটী সন্তান ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ খ্রীশ্চান হইয়াছে, সেই গলদ দূর করিতে হইবে, যাহাতে আর ইহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। হিন্দুকে বাঁচিতে হইলে, নবলব্ধ স্বাধীনতা স্থায়ী করিতে হইলে, স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে, সনাতন ধর্মকে অচলায়তন সমাজকে আবর্জনামুক্ত করিয়া প্রকৃত হিন্দুত্বের আদর্শে নবরূপে রূপায়িত করিতে হইবে।

প্রশ্ন উঠে, ভারতীয় সংস্কৃতির ত্রুটি কোথায় এবং তাহা কেমন করিয়া আসিল? কেমন করিয়া এই মহাদেশ ধীরে

ধীরে নৈষ্কর্মের প্রেরণায় অভিভূত হইল, গীতার প্রাণবান সমন্বয়মূলক শিক্ষা কেমন করিয়া চাপা পড়িল? মানুষের জীবনে যেমন কৌমার যৌবন জরা—জাতির জীবনেও সেইরূপ উত্থান সমৃদ্ধি ও পতন আসে। বহু কাল ধরিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপূর্ব সৃষ্টি-শক্তি, কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়া কালধর্মে ভারতের জীবনীশক্তি কর্মপটুতা চিন্তা-শক্তি অবসন্ন হইল। ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন। একজন রাজার ছেলে বিশ্বমানবের দুঃখনিবৃত্তির সন্ধানে যৌবনেই সকল পার্থিব ঐশ্বর্য তুচ্ছ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। পণ্ডিত-গণ বলেন, গৌতম বুদ্ধই ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী। বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিল—শূন্যবাদ, পরলোকে নির্বাণ ও ইহলোকে নৈষ্কর্মের মাহাত্ম্য, অহিংসার মহিমা। সংসার অনিত্য দুঃখময়। দুঃখ জয় করিতে হইলে কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে, তবেই নির্বাণলাভ সম্ভব। দলে দলে লোক সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুর জীবন গ্রহণ করিতে লাগিল। একটা প্রদেশ ভিক্ষু ভিক্ষুণীর বিহারে পরিণত হইল। মহারাজ অশোক অসাধারণ কর্মশক্তির পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু তিনিও শেষে রাজকার্যে উদাসীন হইয়া সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিতেছেন—But the policy of blood and iron was not suitable to Asoke who embraced Budhism and spent his energy in an organised missionary propaganda. * * * The political disintegration and foreign domination were perhaps the price India had to pay for the religious propaganda of Asoke. বুদ্ধের জীবনাদর্শ, অশোকের দৃষ্টান্ত জাতির মনে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। গৌতম বুদ্ধ সনাতন ধর্মের ভিত্তি বেদকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। আচার্য শঙ্কর আবির্ভূত হইলেন। বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিলেও আচার্য বুদ্ধের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তিনিও বৌদ্ধসন্ন্যাসবাদ স্বীকার করিলেন। আচার্যের মায়াবাদ, নিগুর্ণব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও নির্বাণে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। এই জন্যই বলে শঙ্কর 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ'।

আচার্যের মতে সন্ন্যাস, পূর্ণভাবে কর্মত্যাগ করাই চরম লক্ষ্য, গীতা যে বাসনা ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে বলিয়াছেন, তাহা কেবল প্রথম অবস্থায় চিৎশুদ্ধির জন্যই উপযোগী। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, কেবল অজ্ঞানের জন্য জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, এই অজ্ঞান দূর হইলেই সে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারে এবং তাহাই মোক্ষ বা মুক্তি। জ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয়। নিষ্কাম কর্ম চিত্তশুদ্ধি করিয়া জ্ঞানলাভে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে মাত্র। অর্জুন অজ্ঞান অবিদ্বান, তাই শ্রীভগবান পাণ্ডবকে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। গীতার শঙ্কর-ব্যাখ্যা সন্ন্যাসমূলক এবং গীতার সকল প্রাচীন ব্যাখ্যা মূলতঃ শঙ্কর ভাষ্যের অনুসরণে রচিত। পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ মায়ার ছলনা, জীবের কর্তৃত্ব অংশত মিথ্যা, এই মিথ্যার অবসান করিয়া সদ্ব্রহ্মে লীন হওয়াই জীবের পরমা গতি—এই বাণী অগণিত শাস্ত্রব্যাখ্যার মাধ্যমে, যত্রতত্র বিচরণশীল সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীর মুখে, শত শত মঠ-মন্দির-আশ্রম হইতে ব্যাপক-ভাবে প্রচারিত হইল। গীতার সমন্বয়মূলক শিক্ষা এইভাবে চাপা পড়িয়া গেল।

যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া মহাযোগী শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছিলেন সে উচ্চভূমিতে উঠিবার যোগ্যতা অতি অল্প মানবের ঘটিয়া থাকে। কালধর্মে জাতির জীবনে বার্দ্ধক্য আসিয়াছিল, তাহার চিন্তাশক্তি নিস্তেজ হইয়াছিল। কর্মের নিজস্ব পারমার্থিক মূল্য অস্বীকার, জগৎ মিথ্যা সঙ্গীত অবসন্ন জাতির কর্ণে মধুবর্ষণ করিল। মায়াবাদী সন্ন্যাসীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত কেহ দেখিল না। অল্পপরিসর জীবনে যানবাহনহীন সেই প্রাচীন যুগের অদ্বৈতবেদান্তের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা আচার্যের বিরাট কর্মের পরিচয় কেহ লইল না। পণ্ডিত নেহরু লিখিয়াছেন—And yet Shankar was a man of amazing energy and vast activity. He was no escapist retiring into his shell or into a corner of the forest, seeking his own individual perfection and oblivious of what happens to others.

ব্যাপকভাবে মায়াবাদ প্রচারের ফলে জনসাধারণ নির্বিচারে জগৎ মিথ্যা বলিয়া মানিয়া লইল। শঙ্কর-দর্শনে

'মিথ্যা' শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া সহস্র সহস্র অযোগ্য লোক সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইল। এতগুলি লোকের কর্মশক্তি হইতে জাতি বঞ্চিত হইল। যাহারা সংসার ত্যাগ করিতে পারিল না তাহারা চোখ কান বুজিয়া কোন রকমে সংসার করিতে লাগিল। সংসারে তাহাদের ঘোর অবিশ্বাস, সন্দেহ। মায়া পিশাচী এখানকার প্রতি ধূলিকণায় লুকাইয়া চক্রান্তের জাল বুনিয়া জীবকে বিভ্রান্ত করিতেছে। সমুদ্র-সৈকতের তপ্ত বালুচরে বৃষ্টিবিন্দু যেমন ক্ষণিকে মিলাইয়া যায়, এ সংসার, 'সুতমিত-রমণীসমাজ' তেমনি অনিত্য ক্ষণবিধ্বংসী। যে সংসার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, লজ্জানিবারণের আবরণ যোগায় তাহাকে অবহেলা করিয়া ইহলোকের পরপারে নিত্য বস্তুর সন্ধানে এদেশের ছোট বড় সকলেই ব্যাকুল—কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে। যে জাতির অস্থিমজ্জায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে চিন্তার প্রতি স্পন্দনে এই শিক্ষা বদ্ধমূল, তাহারা পার্থিব জীবনে কতটুকু উন্নতি করিবে? সংসার পান্থ-শালা, সংঘবদ্ধ হইয়া দুঘণ্টার পান্থশালার উন্নতি কে করিতে চায়? দেশশুদ্ধ লোক যে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে তাহা নয়, সংসারে থাকিয়া তাহারা জীবনে উৎসাহ হারাইয়াছে; এইরূপে একটা জাতি নির্জীব কর্মবিমুখ লৌকিক ব্যাপারে উদাসীন। এ সংসার যদি প্রবাসভূমি তবে প্রবাসের উন্নতির জন্য কে চেষ্টা করে? চল মন নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে?

শূন্যবাদ, মায়াবাদের মধ্যে যাহা কিছু উচ্চ আদর্শ জনসাধারণ তাহা বুঝিতে পারিল না, তাহারা বুঝিল যে সংসার অনিত্য দুঃখময়, অতএব তুচ্ছ ব্যাপারে মন না দিয়া পরলোকে মুক্তির জন্য প্রস্তুত হওয়াই মানুষের কর্তব্য। এই মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে কর্মবিমুখতা এবং ইহজীবনের প্রতি একটা বৈরাগ্যময় অবসাদ আনিয়া দিল। সর্ববিশেষের ক্ষেত্র এই সংসার হইতে মুখ ফিরাইয়া একান্ত নির্বিশেষের ভাবনাই ভারতীয় সংস্কৃতির ত্রুটি। ইহাই পলায়নপরতা-রূপ ক্লৈব্য, যাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ' বলিয়া স্নেহ-মধুর তিরস্কার করিলেন।

গীতার স্পষ্টবাণী—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্। যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ অজ্ঞজনকে বড় বড় কথা বলিয়া কর্মভ্রষ্ট করিয়া বিপথে চালিত করিও না, তাহাদের বুদ্ধি ভেদ জন্মাইও না। যাঁহারা বিদ্বান বুদ্ধিমান তাঁহারা সকল কর্ম করিয়া সাধারণকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন, কারণ নির্বিচারে জনসাধারণের মধ্যে ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শ প্রচার করিলে তাহাদের বুদ্ধির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কর্মের দ্বারা সিদ্ধি হয় না, জ্ঞানের দ্বারাই হয়—এই মত খণ্ডন করিবার জন্য গীতা বলিতেছেন—কর্ম করিয়াই জনকাদি পূর্বতম মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন সাধারণে না বুঝিয়াও তাহাই করে। তিনি যে আদর্শের সৃষ্টি করেন সাধারণ লোক তাহাই করে। ৩।২০-২১। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করেন অবতাররূপী ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইতেছেন। দেখ অর্জুন, কর্মের দ্বারা লাভ করিবার আমার কিছুই নাই, ত্রিভুবনে কোন কিছুর জন্য কাহারও নিকট আমি কিছু প্রত্যাশা করি না, তথাপি আমি কর্ম করি। আমি যদি আলস্যবশে কর্ম না করি, তবে লোকে আমারই পথে চলিবে ও উৎসন্নে যাইবে। ৩।২২-২৪। সাধারণ লোকে সংসারে যে সব কর্ম করে জ্ঞানীরাও সেই সকল কর্ম করিবেন, তবে জ্ঞানী কর্ম করিবেন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, আসক্তিশূন্য হইয়া সর্বভূতহিতের জন্য, লোক-সকলকে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবার জন্য।৩।২৫। সন্ন্যাসীরা মনে করেন তাঁহারা কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য, কিন্তু ভগবান কর্মত্যাগ করেন না—বর্ত এব চ কর্মণি।

গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসের এক অভিনব আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। সন্ন্যাসী বলিলে সাধারণত বুঝায় যিনি সংসারের সকল কর্তব্য পরিহার করিয়া পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন। শরীর ধারণের জন্য যেটুকু কর্ম করিলে নয় তিনি কেবল তাহাই করেন। কর্ম সাক্ষাদ্‌ভাবে মুক্তি দিতে পারে না, জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হয়—এই ধারণার বশেই সাধক সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করেন। তৎকালপ্রচলিত জ্ঞান-কর্মের এই বিরোধের কথা অর্জুন জানিতেন। অর্জুন প্রশ্ন তুলিলেন—তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে তুমি

কর্মত্যাগ ও কর্মানুষ্ঠান দুই-ই করিতে বলিতেছ ; এই দুয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয় ঠিক করিয়া আমাকে বল।৫।১। আমি সংসারে থাকিয়া কর্তব্যকর্মাদি করিব, না সর্বকর্ম বর্জন করিয়া সকল লৌকিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসী হইব ? ভাল মন্দ সকল কর্মই যখন বন্ধন, তখন কর্মের হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হই না কেন ? উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ (উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ) কিন্তু দুইয়ের মধ্যে কর্মযোগের একটু বৈশিষ্ট্য আছে—কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে। সংসার ত্যাগ কখনই আচরণীয় নহে এমন কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। প্রবৃত্তিভেদে দুর্বার প্রেরণা আসিলে সর্বস্বও ত্যাগ করিতে হয়। হৃদিস্থিত ভগবানের আহ্বানে সিদ্ধার্থ সর্বত্যাগী, শঙ্কর আজন্ম সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী নিমাই পথে পথে কলিযুগের নবগায়ত্রী হরিনাম প্রচারে পাগল। সংসারে থাকিলেই বন্ধন হইবে একথাও ঠিক নহে। নিয়ত কর্মে রত গৃহীও সন্ন্যাসী হইতে পারে। কর্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, সন্ন্যাসী হইলেই কর্মত্যাগ হয় না। দেহধারী মানুষের পক্ষে কর্মত্যাগে বহু বাধা অনেক ক্লেশ। কর্ম না করিয়া কেহ কখনও ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। জোর করিয়া কর্ম বন্ধ করিলে মন বিষয় চিন্তা করে—শরীরে মনে নানা ব্যাপার চলিতে থাকে—সে সবই কর্ম। কর্তার অন্তর্গত ভাবই বাহ্যজগতে কর্মরূপে প্রকাশিত হয়। বাহ্য প্রকাশ না থাকিলেই যে অন্তর্গত ভাব থাকিবে না, তাহা নহে। এ অবস্থায় কর্ম বন্ধ করা মিথ্যাচার। কর্ম না করিলেই যে সিদ্ধি হয় তাহাও নহে—ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি। কর্মত্যাগ যখন অসম্ভব তখন কর্মমার্গে থাকিয়াও কি করিয়া নৈষ্কর্ম্যের পরম শান্তি লাভ করা যায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিতেছেন। কর্ম করিয়াও সন্ন্যাসীর লভ্যস্থানে পৌছান যায় এবং কর্মযোগের যাহা বৈশিষ্ট্য, সাংসারিক অভ্যুদয়, তাহাও ক্ষুণ্ন হয় না। কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাসও কষ্টকর—সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। কিন্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদির জন্য সন্ন্যাস কষ্টকর, তাহাতে কর্মেরও বিঘ্ন নিহিত—ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। প্রতি ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ ভোগ্য বিষয়ে রাগ-দ্বেষ রহিয়াছে। অনুকূল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষের ফলেই মানুষের কর্ম দোষযুক্ত হয়। গীতার মতে তিনিই চিরসন্ন্যাসী যাঁহার কোন বস্তু বা বিষয়ে রাগও নাই দ্বেষও নাই।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

রাগদ্বেষ-দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত গৃহীও সন্ন্যাসীপদবাচ্য ; তিনি অনায়াসে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করেন।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥

কর্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া সংসারের সমাজের সকল কর্তব্য যিনি করিয়া যান তিনিই একাধারে সন্ন্যাসী ও যোগী। সংসারত্যাগ (নিরগ্নি), কর্মত্যাগ (অক্রিয়) সন্ন্যাসীর প্রকৃত লক্ষণ নয়, সন্ন্যাসের লক্ষণ ফলকামনাত্যাগ। কর্মযোগের পরিণতিও সন্ন্যাস, কিন্তু তাহা বাহ্য সন্ন্যাস নয় আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাস। সন্ন্যাস অন্তরের বস্তু, ভিতরের ত্যাগ—রাগদ্বেষের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্কাম সমতা লাভ। আত্ম-কেন্দ্রিক ভোগ-লালসার প্রেরণায় কর্ম না করিয়া সর্বভূত-সেবা হিসাবে যিনি কর্ম করেন, তিনি সন্ন্যাসী। বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-সেবায় কাম্যকর্মের অর্পণকেই (ন্যাস) গীতা সন্ন্যাস বলিয়াছেন—কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। শ্রীকৃষ্ণে কর্মার্পণই গীতার নৈষ্কর্ম্য—যৎ করোষি * * * তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্। এই অর্পণ, শরণাগতি সাধনা গীতার পরম ও চরম রহস্য।

শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ আজ বন্ধন-মুক্ত। বাহির হইতে ঘটনাস্রোত আসিয়া মায়াবাদের দৃঢ়মূল শিথিল করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে, তাহার জ্ঞান বিজ্ঞানের তীব্র আলোকে ভারত আর এক বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন। পাশ্চাত্যের ভোগবাদ ও জড়বাদের আদর্শে ভারতবাসী আকৃষ্ট হইয়াছে। দেশজোড়া অভাবের তাড়নায়, সমস্যার উপর সমস্যায় দিশেহারা মানুষ বলিতেছে —জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা। অন্নই সত্য, ব্রহ্ম নাই। পঞ্চভূতের চক্রান্তে পড়িয়া ব্রহ্ম আজ কাঁদিতে বসিয়াছেন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাস। এই দুই বিপরীত প্রান্তের (সংসার-সন্ন্যাস, ভোগ-ত্যাগ) মধ্যবর্তী পথের সন্ধান—গীতা নির্দেশ করিয়াছেন, তাই আজ সমন্বয়মূলক গীতাধর্ম প্রচারের এত প্রয়োজন। ভোগের ক্ষেত্রে ত্যাগের অবতরণই গীতার প্রাণ। গীতা যুগপৎ যুদ্ধশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র। কুটিল সংসারে চলিবার প্রকৃত কৌশল গীতা শিখাইয়াছেন—যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।

একটি কাহিনী

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

ভালো খাইয়ে ব'লে নাম ছিলো শৈলেশের। বন্ধু সিতি-কণ্ঠের বৌভাতের নেমন্তন্নে কাল ওরা সদলে উপস্থিত থেকে শৈলেশকে খাইয়েছে। যদিও কেউই বাদ যায়নি, তবু প্রচুর আয়োজনের সদ্ব্যবহার শুধু বুঝি শৈলেশের দ্বারাই সম্ভব হ'য়েছিলো। সকলের সমবেত অনুরোধকে এমন-ভাবে এক সঙ্গে রক্ষা করা আর কারও পক্ষে সহজ হ'তো না।

সে রাত্রে শৈলেশের থাকার কথা ছিলো। কারণ সেই একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিতিকণ্ঠের। আর থাকেও অনেক দূরে—হাওড়া ময়দানের সামনে। খাওয়া-দাওয়ার পরে একটা ফাঁকা ঘরে ফরাসের ওপরে তাকিয়ায় ভর দিয়ে শৈলেশ বিশ্রামের চেষ্টা করছিলো। গোলমালের বাড়ীতে শোয়ার জন্যে এর চেয়ে ভালো জায়গা হয়ত আর পাওয়া যাবে না। আর একটু পরে ঘুমোনোর চেষ্টা করা চলবে। আপাততঃ শৈলেশ একটি সিগারেট ধরিয়ে আরাম ক'রে বসলো।

অঘ্রাণের মাঝামাঝি চলছে। কাজেই রাত্রের দিকে একটু শীতের আমেজ পাওয়া যায়। খোলা জান্‌লা দিয়ে বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো শৈলেশকে। এতক্ষণে শৈলেশের মনে হ'লো খাওয়াটা একটু বেশীই হ'য়ে গেছে। সিগারেটে দু' একটা টান দিয়ে সে শরীরটাকে গরম ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করলো।

সিতিকণ্ঠ এসে ঢুকলো ঘরে—কিরে, ব'সে ব'সেই ঘুমোচ্ছিস নাকি? এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে শৈলেশ বললো—আয়, বোস। খাওয়াটা বেশ ভালোই হ'য়েছে। একে তোর বিয়ে, তায় প্রত্যেকটা জিনিসই ভালো হয়েছে। নেমন্তন্ন খাওয়ার মত সুখ আর কিছুতে আছে কিনা ভাবছি।

সিতিকণ্ঠ তৃপ্তির হাসি হাসলো। কিন্তু শৈলেশ পরক্ষণেই বলে উঠলো—তবু খেতে বসে খাওয়াটাকেও যে কত বিশ্রী লাগতে পারে, শুধু অবস্থার ভেদ বিশেষ ঘট্‌লে—তাই মনে হচ্ছে আমার।

—কেন, কেউ নিমপাতা খাইয়েছিলো বুঝি?

শৈলেশ গম্ভীর মুখে উত্তর দিলো—না।

—তবে? কেউ অপমান—

সিগারেটের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরের বর্ণ বদলাতে সুরু করেছে। জ্বলন্ত টুকরোটুকু ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শৈলেশ যেন অনেক দূর থেকে উত্তর দিলো—এমন ঘটনা কি ঘট্‌তে পারে না? মনে কর, প্রত্যেকটি জিনিসই সুস্বাদু, আদর আপ্যায়নে কোন ত্রুটি নেই, সমস্ত পৃথিবীর খিদে জমেছে পেটে—অথচ এক মুহূর্ত্তে মনে হ'লো, খাওয়াটাই বুঝি সবচেয়ে কুৎসিত ও জঘন্য রকম দুঃসহ···

শৈলেশ বলে চলেছে—মনে কর, এমনি এক প্রথম শীতের দিন। অপরাহ্নের ম্লান ছায়ায় তখনও আকাশ উদ্ভাসিত। সূর্য্যের প্রখর ও চোখ-ঝলসানো অগ্নি-গোলকে লালচে আভা ধরতে সুরু ক'রেছে। আর তুই চলেছিস মোটরবাসে এক অরণ্য-ভরা বিজন গ্রাম্য পথ ধরে। মনে কর সে জায়গাটা মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। আর বাসে যে পথ ধ'রে তুই এগিয়ে চলেছিস সে পথটা আটাশ মাইল দীর্ঘ। এই আটাশ মাইল বনপথ অতিক্রম ক'রে বাস যেখানে এ যাত্রার মত থামবে তুই সেইখানটায় নেমে পড়লি। কলকাতাবাসী শহুরে যুবকের পক্ষে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন একান্ত বিজন একটি গ্রামের রাস্তা আতঙ্কজনক বইকি, কিন্তু তোর যথেষ্ট সাহস রয়েছে। তাই ভয় না পেয়ে সেখানে নেমেই প্রথমে খোঁজ করবি সেখানে চায়ের কোন দোকান আছে কি না। নেই শুনে আবার প্রশ্ন করবি—'শ্যামলগাছি এখান থেকে আরও কত দূর ভাই?' বাসের আর একটি যাত্রী তোকে বলবে—'এই ত' মাইল চারেক মাত্র রাস্তা। কাদের বাড়ী যাবেন আপনি? ও চৌধুরীদের বাড়ী? নরেন চৌধুরী আপনার বন্ধু? তা তেনাদের ত' বাড়ীর গাড়ী আছে। আপনি বুঝি খবর না দিয়েই আসছেন? তা' এই পথ ধরে সোজা চলে যান; সেই

যেখানে কাতলামারীর বিলের পাশ দিয়ে রাস্তাটা বাঁক খেয়ে পূবে ঘুরে গেছে সেইখানে জিজ্ঞাসা করবেন, সবাই দেখিয়ে দেবে। গাঁয়ে পৌছুলে আপনিও চিনে নিতে পারবেন। এ তল্লাটে অত বড় বাড়ী ত' আর নেই। অত বড় লোকও—'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তুই চলতে সুরু করেছিস? সেই নিঃশব্দ গ্রাম্য পথে তখন জ্যোৎস্না লুটোপুটি খেতে আরম্ভ করেছে। হাঁটু অবধি ভরে উঠেছে সাদা ধুলোয়, পথের দুধারে ছোট ছোট ঝোপ জঙ্গল। মাঝে মাঝে আতাফুলের একটু মিষ্টি গন্ধ। কোনখানে আবার দু-পাশে মাঠ দূর পর্যান্ত বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে। তার মাঝে মাঝে চালা ঘর। কিন্তু কোথাও মানুষের সাড়া নেই। অজস্র চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত আকাশ আর নতুন এ্যাড্‌ভেঞ্চারের রসে ভরা সেই অরণ্যপথ… কিন্তু তোর মনে তখন কবিত্ব নেই। তুই ভাবছিস অন্য কথা।

—হ্যাঁ বেণুর কথাই। বেণু নরেনের ছোট বোন। বিয়ে হয়নি তখনও। তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছে কলকাতায়। এম-এ পড়ার সময় নরেন ছিলো সহপাঠী। অনেক দিন সে টেনে নিয়ে গেছে তোকে তাদের বাড়ীতে। হাজরা রোড যেখানে ল্যান্সডাউনকে খণ্ডিত ক'রে বালীগঞ্জী আভিজাত্যের ছোঁওয়ায় প্রবেশ করেছে, সেই-খানেই ওদের বাড়ী। তুই অনেক দিন গিয়েছিস ওদের বাড়ী—কিন্তু নরেন ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই আলাপ হয়নি। আর হবেইবা কি করে? তুই ত মেয়েদেরকে চিরকাল অবজ্ঞা করিস। তাদের সঙ্গে মেশার মত চেষ্টাও তাই কখনও ছিলো না।

তবু একদিন আচমকা আলাপ হ'য়ে গেলো। নরেনকে খুঁজতে তাদের বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে তার একতলার স্টাডিতে সোজা ঢুকে পড়েছিস। কিন্তু ঘরে ঢুকেই অপ্রস্তুত হয়ে গেলি। নরেন নেই—তার চেয়ারে একটি তরুণী ব'সে ব'সে বোধ হয় কিছু নকল করছিলো। তোকে দেখেই সে উঠে দাঁড়ালো—"আসুন, দাদা নেই, একটু বাইরে গেছেন। আপনাকে বসতে বলে গেছেন দাদা।"

একটি অপরিচিতা তরুণীর সামনে দাঁড়িয়ে তুই বিব্রত বোধ করছিস বইকি। সঙ্কোচের সঙ্গে হয়ত বলছিস—"আচ্ছা, আমি না হয় পরে ঘুরে আসছি।"

খিলখিল করে হেসে উঠলো তরুণীটি। অত্যন্ত সপ্রতিভ-কণ্ঠে সে বললো—"কেন, দাদা না থাকলে বসতে পারেন না? আমাদের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা করে নাকি?"

জোর করে লজ্জা ঝেড়ে তুই বলে উঠলি—"না লজ্জা নয়, ইচ্ছে হয় না।"

—"ইচ্ছে হয় না!" একটু ঝাঁঝালো কণ্ঠে তরুণী প্রশ্ন করলো—"কারণ?"

"কারণ?"…তুই হঠাৎ বলে ফেললি—"আধুনিক মেয়েরা কথা বলতে জানে না বলে।"

তুই যদি সঙ্কোচ ঝেড়ে মেয়েটির চোখে চোখে চাইতে পারতিস, তাহ'লে দেখা যেতো, প্রথমে রাগে লাল হ'য়ে উঠলো তার মুখ, তারপর তার কপালে জাগলো ভ্রূকুঞ্চন। চোখের কোণে নামলো তীক্ষ্ণতা। সেই মেয়েটি বলে উঠলো—"সত্যি কথা, আপনাদের মত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে জানার দরকার হয় না। পুরুষ যদি পুরুষ না হয়ে মেয়েমুখো হয়, তবে আমাদেরও ঘৃণা আসে।"

অপমানে তুই তৎক্ষণে বিবর্ণ হ'য়ে গেছিস। খুব শক্ত মত একটা প্রত্যুত্তর তৈরী ক'রে বলতে গিয়ে দেখবি, মেয়েটি সেখানে নেই। তোর কথার উত্তর দিয়েই সে ভেতরে পালিয়েছে।

অনেকক্ষণ শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলি তুই। তারপর অনিচ্ছার সঙ্গেই এগিয়ে যাবি চেয়ারটার দিকে। লক্ষ্য পড়লে দেখবি, টেবিলের ওপর একটি ছোট্ট খাতা খোলা পড়ে আছে। তাতে মেয়েলি অক্ষরের ছোট ছোট সুন্দর হরফ যেন যত্ন ক'রে সাজানো। একটু কৌতুহলি হ'য়ে তুই ঝুঁকে পড়বি খাতাটির ওপর। একি? অবাক হ'য়ে তুই দেখবি সেই খাতাটির বুকে লেখা ছোট ছোট অনেকগুলি গান। আর সে গানগুলোর সবই তোর লেখা। এবারে চোখে পড়বে ওপরে আর একটি খাতা খোলা পড়ে আছে। তোর লেখা গানগুলো পড়বার জন্যে নরেন যে খাতাটি নিয়ে এসেছিলো সেই খাতাটি। এতক্ষণে কেমন যেন একটু আনন্দ আসবে তোর মনে। অপরিচিতা এক তরুণীর হাতে নিজের কবিতাকে সমাদৃত হ'তে দেখলে কার না আনন্দ হয়। মনে হ'লো এত গান লেখা সেই

একমুহূর্তেই বুঝি সার্থক হ'য়ে উঠেছে। মেয়েটির ওপর এতক্ষণ ধরে যে রাগ সঞ্চিত হ'য়েছিলো তোর, তার সবটুকু ঝরে পড়বে। একটু অনুতপ্ত বোধ করবি। আর একবার দেখা পেতে ইচ্ছে হ'বে তার। খাতার পাতাগুলি ওলটাতে ওলটাতে একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়াবি। সুন্দর অক্ষরে লেখা একটি নাম—শ্রীমতী বেণু চৌধুরী।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী বেণু ফিরে এসেছে। খাতাটিকে তোর হাতে বিপর্য্যস্ত হ'তে দেখে প্রায় চিৎকারের সুরে সে প্রশ্ন করলো—"আমার খাতা আমায় না ব'লে আপনি খুলে দেখছেন ?"

তার ক্রোধরক্ত চোখের দিকে তুই যেন চেয়ে রইলি। সর্ব্বাঙ্গ তার তখনও কাঁপছে রাগে। সেই অবস্থায় তার মধ্যে এক অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেলো তোর চোখ। মিনিটখানেক চোখে চোখে চেয়ে থেকে হঠাৎ এক শুভ মুহূর্ত্তে দুজনেই একসাথে হেসে উঠ্‌লি ; আর সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসির মধ্যে দিয়ে তোদের সন্ধি হ'য়ে গেলো।

এরপর বেণুর একটু বর্ণনা দেওয়া যাক। বড়লোকের মেয়ে ; বাড়ী মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত এক অতি অখ্যাত পল্লীগ্রামে। বেণু ও নরেন কলকাতায় থেকে পড়াশোনো করে। তারা মামারবাড়ী থেকে পড়ে এবং তাদের মামা কলেজের প্রোফেসর ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন।

আপাততঃ ধ'রে নেওয়া যাক্ বেণুর বয়স প্রায় কুড়ি। শরীরের গঠনে পাঞ্জাবী মেয়ের দৃঢ়তা। তার দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহে কমনীয়তার অভাব ছিলোনা কিন্তু তবুও সে রূপসী নয়। বর্ণ শ্যাম। চোখের দৃষ্টি গভীর কিন্তু চঞ্চল। সে চোখে স্বপ্ন দেখা চলে এবং অভিজাত ঘরের দুলালদের কেউ কেউ সে চোখের মায়াঅঞ্জনে মুগ্ধ হয়েছে বলে শোনা যেত।

অতঃপর নরেনের সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব আরও গভীর হ'য়ে উঠলো ও সে বাড়ীতে তোর যাতায়াত নিয়মিত হ'লো। অবশ্য এর মধ্যে মনোজগতের কোন দেবতার হাতের স্পর্শ আছে কিনা সে খবর তুই রাখতিস না। কারণ প্রেমে পড়ার স্বভাব তোর মোটেই ছিলোনা। তুই ভালো-বাসতিস শুধু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চা ও বিস্কুট ধ্বংস করতে, আর সে বাড়ীতে ইদানীং প্রবেশ করলেই চা ও বিস্কুট প্রচুর পরিমাণেই এসে হাজির হ'তো। চা-সরবরাহের ভার গ্রহণ করেছিলো আশুতোষের আই-এ ক্লাসের ছাত্রী শ্রীমতী বেণু চৌধুরী।

দিনের পর দিন তুই ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে লাগলি। তোর মেলামেশায় কোন উদ্দেশ্য ছিলোনা। শুধু নরেনের অনুরোধেই তুই ওখানে যেতিস। আর ওখানে গেলেই বেণুর সাহচর্য্য অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠ্‌তো। অবশ্য বেণুর সাহচর্য্য পরিহার করবার চেষ্টাও তুই কোন দিনই করিস নি। কারণ তোর মধ্যে কোন অসদুদ্দেশ্য ছিলোনা। আর মেয়েদের চোখে চোখে তুই চাইতে পারতিসনা। কাজেই বেণুর চোখে অনুরাগের আগুন সঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে কিনা লক্ষ্য করবার মত সুযোগও তোর আসেনি।

তবু হঠাৎ একদিন সে ধরা পড়লো তোর কাছে। কিন্তু ধরা পড়লিনা তুই। তাই অনেক অমূল্য মুহূর্ত বৃথাই অতিবাহিত হলো। অনেক সূর্য্য আকাশে জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে গেলো। তবুও চেতনা এলোনা তোর। আচ্ছা, ধরে নে একটি সন্ধ্যা—যে সন্ধ্যায় তুই নিয়মমত হাজির হলি নরেনের খোঁজে। বাড়ী গিয়ে যখন শুনলি নরেন বায়োস্কোপে গেছে, তখন তোর মনে পড়ে গেলো যে তোরও যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তখন প্রায় সাতটা। কাজেই আর যাওয়া চলেনা। অগত্যা বসে পড়ে তুই বললি—আমি চলি তাহ'লে ?

দুই কালোচোখে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠ্‌লো। মেঘের গরজনে শোনা গেলো—ইস্ আমি চা খাবোনা বুঝি ? তুই বোকার মত বলে ফেললি—তা খাও না ? কিন্তু আমি থেকে কি করবো ?

সেই কালোচপল চোখ তখন বলে উঠ্‌লো—"বসুন চুপ করে। একা চা খেতে আমার ভালো লাগেনা।"

কিন্তু তুই যে চিরকালের হাঁদা। এততেও তুই উঠ্‌বার চেষ্টা করলি। বললি—"একা কেন, তোমার মামা ও মামীমাও ত' চা খান ?

তবু সমান উৎসাহে বললো বেণু—"ওঃ তাহ'লেই হয়েছে। তাঁরা গেছেন শ্যামবাজারে নেমন্তন্ন রাখতে। ফিরবেন রাত দশটায়।"

কাজেই তোকে বসতে হলো। বোধহয় তিন মিনিটের

মধ্যেই বিদ্যুতের মত চকিতে চা নিয়ে ফিরে এলো বেণু। বললো—"একা একা চা খেতে হ'বে ভেবে এতক্ষণ যা বিশ্রী লাগছিলো।"

কথায় কথায় তোরা অনেক কথার অবতারণা করলি। অনেক আলোচনা হলো। রাতের ঘোর নামলো ঘরের মধ্যে। বেণু তোর একান্ত পাশে বসেই গানের খাতাটা খুলে রাখলো। বললো—"এ কথাগুলোর মানে বুঝতে পারিনা যে ?......"

এক সময়ে তুই হঠাৎ উঠে পড়লি। বললি—"রাত হ'য়ে যাচ্ছে, আমি চলি।"

নিমেষে সোজা হ'য়ে বসলো সে, বললো—"না।"

—"বা:, রাত হচ্ছে না ?"

কেমন যেন গভীর অস্বচ্ছ কণ্ঠে বেণু বললো—"না।"

হঠাৎ সে তোর মণিবন্ধটা তার কোমল একটি হাতের স্পর্শে চেপে ধরে বললো—"যান্ দেখি, কেমন জোর গায়ে!"

কব্জিটা ঘুরিয়ে নিমেষের মধ্যে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলি তুই। কিন্তু পেছন থেকে ডাকলো বেণু—"শৈলেশবাবু..."

হঠাৎ চমকে উঠ্‌লো শৈলেশ। আচমকা নিজের নাম উচ্চারণ করে ফেলছে সে। অপ্রস্তুতভাবে সিতিকণ্ঠের দিকে চাইতে গিয়ে খেয়াল হলো সিতিকণ্ঠ নেই। তার তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে সে কখন উঠে গেছে। আপন মনে হাসলো শৈলেশ। বললো—ভাগ্যিস সিতি উঠে গেছে, নইলে ধরা প'ড়ে যেতুম যে!

কিছুক্ষণ শুব্ধ হ'য়ে থেকে এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে সে আপন মনেই বলতে সুরু করলো...

—"শৈলেশবাবু..."

তুই ফিরে তাকালি। সোফার ওপর ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে প্রতীক্ষা করছে বেণু। তার উদগ্রকণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি জেগে উঠ্‌লো—"দাদা এলে যাবেন; এখন না।"

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলি তুই, কিন্তু তোর খেয়াল বড় অদ্ভুত। তুই বললি—"না, কাজ আছে। আমি এখনই যাবো।"

পা বাড়াবার আগেই বিদ্যুৎগতিতে বেণু এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো।—"না, আপনি যাবেন না।"

সেই রাত্রির রহস্যে-আচ্ছন্ন বেণুকে যে-কোন লোকেরই বিস্ময়কর ব'লে বোধ হ'তে পারতো। কিন্তু কবিতা লিখেও তুই কোনদিন মনে প্রাণে কবি হ'তে পারিস নি। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বললি—"তারপর ?"

বেণু তোর বিরক্তিকুঞ্চিত চোখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে একটু হাসবার চেষ্টা করলো—"আমায় খুব বিরক্তিকর মনে হচ্ছে ?"

তার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা গলার করুণ সুরে যেন বেজে উঠলো। কিন্তু তুই অবিচল। তোর মুখের দিকে চেয়ে অবশেষে হতাশ ভাবে সে বললো—"না, আপনাকে জোর ক'রে ধ'রে রাখবো না। আপনি যান..."

তুই আর বিলম্ব না করে একতলায় নামবার সিঁড়িতে পা দিলি। কয়েকটা সিঁড়ি মাত্র নেমেছিস—হঠাৎ বেণু ঝড়ের মত লাফিয়ে এসে দাঁড়ালো তোর গা ঘেঁষে। হাত চেপে ধরে বললো—"না, যাবেন না।"

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তোর চোখে জান্‌লার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছিলো। সেই চোখের দিকে চেয়ে ওর মুষ্টি শিথিল হ'য়ে এলো। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তুই নেমে এলি রাস্তায়। তারপর সোজা তোর মেসে ফিরে গেলি।

মনে কর, মেসে গিয়ে দেখলি একটা টেলিগ্রাম এসে পড়ে আছে। টেলিগ্রাম প'ড়ে তুই জানলি—বাড়ীতে মার টাইফয়েড। আর দেরী না ক'রে সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরে এলি। মাকে নিয়ে মাসখানেক ব্যস্ত থাকা গেলো; তোর পরীক্ষা ত' আগেই চুকে গেছে। কাজেই বাড়ী ব'সে চাকরীর দরখাস্ত ছাড়তে লাগলি। ইতিমধ্যে আরও কিছুদিন কেটে গেলো।

এমনি একদিন রাত্রে হঠাৎ একটা দরকারে কলকাতায় এলি। তারপর ভবানীপুরের দিকে কাজ সারতে গিয়ে ইচ্ছে হ'লো হাজরা রোড অবধি এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু বেণুরা কেউ ছিলো না; কাজেই তোকে ফিরতে হ'লো। খবর পাওয়া গেলো, ওরা দেশের বাড়ীতে ফিরে গেছে।

এই প্রথম একটা অনুতাপ এলো তোর মনে। আত্মগ্লানিকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত লোক তুই নোস্, তবু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগলো কলকাতা। একদিনের বেশী

থাকতে ইচ্ছে হ'লোনা। পোঁট্‌লা বেঁধে রওনা দিলি বাড়ীর দিকে।

বাড়ীতে এসেই দেখা গেলো একখানা ছোট্ট চিঠি এসে পড়ে আছে। লিখছে শ্যামলাগাছি থেকে বেণু চৌধুরী। ধরে নেওয়া যাক্ চিঠিটা এই রকম—

শৈলেশবাবু, নববর্ষের প্রীতি ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। নতুন বছরের সুরুতে আপনার শুভেচ্ছা কামনা করছি। মনে আমার জন্যে যদি কোন ঘৃণা সঞ্চিত থাকে তবে তা ভুলে যাবেন আশা করি।—বেণু—

সেদিন রাত্রে তুই স্বপ্ন দেখবি। দেখবি দিগন্তের একটা রক্তরাঙা মেঘ আস্তে আস্তে মানুষের মূর্ত্তিতে রূপ নিলো। দেখবি, সেই মানুষের মূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছে বেণুর সুস্পষ্ট মুখখানি। স্বপ্নের ঘোরে মনে হ'বে এই মেয়েকে চেয়েই তুই জন্ম জন্ম সাধনা ক'রে আসছিস। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই স্বপ্নের মায়াও মিলিয়ে যাবে। তখন নিজের ওপরেই হয়ত অকারণ রাগ হবে।

তবু সারাদিন ধ'রে একটা ইচ্ছে হবে মনে—একবার শ্যামলাগাছি যেতে। পল্লীগ্রামের অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের ছবি ভেসে উঠবে চোখে। কিন্তু যাওয়া হবে না। পরের দিন সকালেই একটা চাকরীর উমেদারীতে তোকে বর্দ্ধমান ছুটতে হবে।

চাকরী নিয়ে বসেছিস আসানসোলে। কাজের চাপে অন্য কোন কথা হয়ত মনে নেই। কিন্তু আষাঢ়ের প্রথম দিনে একটুকরো একটা চিঠি এসেছে। লেখকের নাম নেই, তবু লেখককে চিনতে দেরী হবে না। চিঠিটা হয়ত এমনিও হ'তে পারে—"এই সজল আষাঢ়ের প্রথম দিনটিতে তোমার জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি। তোমার পথযাত্রা নির্বিঘ্ন হোক। আমায় কি একেবারেই ভুলে গেলে?" —সে—

হঠাৎ মনে হবে—না, ভুলিনি। ভুল সেদিন হ'য়েছিলো। কিন্তু সে ভুলের সংশোধন করবো। নিজের সঙ্গে প্রতারণা করবোনা আর। বেণু, তোমায় আমি খুঁজে পেয়েছি আজকে।

অপেক্ষায় দিনগুলি দীর্ঘ হ'য়ে উঠলো। অবশেষে আশ্বিনের ছুটিতে বাড়ী আসার সুযোগ ঘট্‌লো। পূজোটা কাটিয়েই রওনা দিলি মুর্শিদাবাদের দিকে।

তারপর……

আমার সেই প্রথম বর্ণনার স্থানে এসে দাঁড়িয়েছিস তুই। সেই জ্যোৎস্না-জড়ানো কাঁচা রাস্তা ব'য়ে একটা একটা ক'রে গ্রামগুলোকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলি। বাঁদিকে বিলের মুখে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক বটগাছকে ছেড়ে এগিয়ে গেলি। সেই নিঃশব্দ পথে চলতে চলতে বারবার দাঁড়িয়ে পড়েছিস। পেছন দিকে চেয়ে আবার এগিয়ে গেছিস। তারপর একটা গ্রামে এসে থমকে দাঁড়ালি। পথের ওপরেই একটা প্রাসাদের মত বাড়ী। সেই অরণ্যের দেশে একটা অদ্ভুত অভিনবত্ব।

উৎসব শেষের বাতিটির মত একটি ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছিলো তার বৈঠকখানায়। গোটানো সতরঞ্চিটির এপাশে ওপাশে জড়ো করা আসন আর পাতা। ব্যস্ত ভাবে এদিক ওদিক ছুট্‌ছিলো দু'একটি চাকর। তাদেরই একজন এসে হয়ত প্রশ্ন করে বসবে—"কাকে চান?"

"নরেন নেই?"

চাকরের ডাকে নরেন বেরিয়ে এলো। অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ক্লান্ত মনে হলো তাকে। হয়ত সারাদিনের পরিশ্রমে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে সে। তোকে দেখেই চমকে উঠবে যেন। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে কটি কথা—"শৈলেশ?" এমনভাবে বিস্মিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সে যে, তুই কিছুটা লজ্জিত হ'য়ে পড়বি। মনে হবে এ' উৎসব বাড়ীতে হয়ত তার আসাটা উচিত হয়নি। কিন্তু নরেন বলবে—"আয় ভেতরে।"

ভেতরের ঘরে তোকে বসিয়েই নরেন অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। তুই বসে বসে দেখছিস বাড়ীতে একটু ব্যস্ততার ভাব। চাকর এসে তোকে মুখ হাত ধোয়ার জল এনে দেবে। চাকরেই এনে দেবে চা। চা খেতে গিয়ে তোর একটা অভিমান আসবে মনে। কলকাতার বাড়ীতে বেণু বরাবর নিজের হাতেই তাকে চা এনে দিতো। এখানে তার দেখাও পাওয়া গেলো না এখন পর্য্যন্ত। অর্দ্ধেকটা খেয়ে জুড়োনো চাটা সরিয়ে রেখে দিবি।

অবশেষে নরেন ফিরে আসবে। বলবে—"একটু দেরী হ'য়ে গেছে। কিন্তু সত্যি বলছি, তুমি যে আসবে এ' আমি কল্পনাও করিনি।"

অভিমানে শুব্ধ হ'য়ে তুই দাঁড়িয়ে রইলি। হঠাৎ এক সময়ে মাথা তুলতেই চোখে পড়লো নরেনের

সৌবর্ণং কমলাক্ষস্য তারকাক্ষস্য রাজতং।

তৃতীয়স্তু পুরস্তেষাং বিদ্যুন্মালিন আয়সং। ৬৫

দ্যুলোকে বীর্য্যবান্ অসুরদিগের তিনটি পুর ছিল। একটি লৌহময় অপরটি রজতময় এবং অন্যটি সুবর্ণময়। সুবর্ণময় পুরের অধীশ্বর কমলাক্ষ, রাজতপুরের স্বামী তারকাক্ষ এবং আয়সপুরের স্বামী বিদ্যুন্মালী। প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য যে উক্ত ত্রিপুরনিবাসী অসুরগণই ত্রিপুরাসুর নামে অভিহিত এবং শিব কর্ত্তৃক নিহত। ত্রিপুরাসুর একটি নহে। বনপর্ব্বের ৩৩ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে,

"নির্জ্জিতেষুচ দৈত্যেষু তারকস্য সুতাস্ত্রয়ঃ।

তারাক্ষঃ কমলাক্ষশ্চ বিদ্যুন্মালীচ পার্থিব।

তপ উগ্রং সমাস্থায় পরমে নিয়মে স্থিতাঃ॥ ৪।৫।

হে রাজন্! দেবগণ কর্ত্তৃক অসুরেরা পরাজিত হইলে তারকাসুরের পুত্রত্রয় তারাক্ষ কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী বিশেষ নিয়ম পূর্ব্বক উগ্রতপস্যা করিয়াছিল, তাহাদের তপস্যার ফলে ময় তিনটি পুর নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

"ততোময়ঃ স্বতপসা চক্রেধীমান্ পুরাণিচ।

ত্রীণি কাঞ্চনমেকংবৈ রৌপ্যং কার্ষ্ণায়সংতথা। ১৫।

কাঞ্চনং দিবিতত্রাসীদন্তরীক্ষেচ রাজতং।

আয়সঞ্চাভবদ্ ভৌমং চক্রস্থং পৃথিবীপতে॥ ১৬।

একটি পুর কাঞ্চনময় অপরটি রৌপ্যময় অন্যটি কৃষ্ণলৌহময়। কাঞ্চনময় পুর দ্যুলোকে, রাজত অন্তরীক্ষে এবং লৌহময় ভূলোকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুর চক্রের উপর রচিত হইয়াছিল।

বিষ্ণুপর্ব্বের ৮৩ অধ্যায়ের বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয়েরাও অবস্থা-বিশেষে অসুরের পক্ষভুক্ত হইয়া দেবতাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত। ইহাও বুঝা যায় যে, অসুর নিবাসে ব্রাহ্মণাদিরও অবস্থান হইত। যথা—

"বৈশম্পায়ন উবাচ—

এতস্মিন্নেব কালে তু চতুর্ব্বেদ ষড়াঙ্গবিৎ।

ব্রাহ্মণো যাজ্ঞবল্ক্যস্য শিষ্যো ধর্ম্মগুণান্বিতঃ॥১

ব্রহ্মদত্তেতিবিখ্যাতো বিপ্রোবাজসনেয়িবান্।

অশ্বমেধঃ কৃতস্তেন বসুদেবস্য ধীমতঃ॥২।

স সংবৎসরদীক্ষায়াং দীক্ষিতঃ ষট্পুরালয়ে।

আবর্ত্তায়াঃ শুভে তীরে সুনদ্যা মুনিজুষ্টয়া॥ ৩।

সখা চ বসুদেবস্য সহাধ্যায়ী দ্বিজোত্তমঃ।

উপাধ্যায়শ্চ কৌবব্য ক্ষীরহোতা মহাত্মনঃ॥ ৪।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিতেছেন—ঐ সময়ে ষড়ঙ্গের সহিত চতুর্ব্বেদবিৎ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য ধার্ম্মিক বিবিধগুণসম্পন্ন বাজসনেয়ী শাখাধ্যায়ী ব্রহ্মদত্ত নামক এক বিপ্র ছিলেন। ইনি বুদ্ধিমান্ বসুদেবের অশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ষট্পুরস্থ মুনিগণ—সেবিত আবর্ত্তা নামক নদীর শোভন তীরে সেই ব্রাহ্মণ সংবৎসর ব্যাপক যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ইনি বসুদেবের সখা, সহাধ্যায়ী এবং ক্ষীরহোতা অর্থাৎ অধ্বর্য্যু ছিলেন। (২) ইনি একজন উপাধ্যায় ছিলেন। অথবা সহাধ্যায়ের পর বসুদেবেরই উপাধ্যায় হইয়াছিলেন। এস্থলে উপাধ্যায় শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। অমর সিংহ বলিয়াছেন, "উপাধ্যায়োঽধ্যাপকঃ," উপাধ্যায় শব্দের অর্থ অধ্যাপক। ইহা হইতে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পাইল না। "উপেত্য অধীয়তে অস্মাৎ" ছাত্র আসিয়া ইহার নিকট হইতে অধ্যয়ন করে এই অর্থে (ইঙশ্চ। পাং। ৩।৩।২১) এই পাণিনি সূত্রানুসারে ইঙ্ ধাতুর পর অপাদানে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে উপাধ্যায় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের স্কুল কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক নহেন। কারণ ইঁহারা ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ান। মনু বলিয়াছেন। ২। ১৪১

"একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।

যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থং উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥"

বেদের একদেশ অথবা বেদের অঙ্গ যিনি বৃত্তির জন্য অধ্যাপনা করেন, তিনি অধ্যাপক। বৃত্তি শব্দের অর্থ গুরুদক্ষিণা অথবা রাজ-প্রদত্ত সাহায্য। বেতন নহে।

"বসুদেবস্তত্র যাতো দেবক্যা সহিতঃ প্রভো।

যজমানং ষট্পুরস্থং যথাশক্রো বৃহস্পতিম্॥৫

তৎ সত্রং ব্রহ্মদত্তস্য বহ্বন্নং বহুদক্ষিণম্।

উপাসন্তি মুনিশ্রেষ্ঠা মহাত্মানো মহাব্রতাঃ॥ ৬।

ব্যাসোঽহং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ সুমন্তুর্জৈমিনিস্তথা।

ধৃতিমান্ জাজলিশ্চৈব দেবলাদ্যাশ্চ ভারত॥ ৭

শ্রদ্ধানুরূপয়াযুক্তং বসুদেবস্য ধীমতঃ।

যজ্ঞেপ্সিতান্ দদৌ কামান্ দেবকী ধর্ম্মচারিণী॥ ৮

বাসুদেব প্রভাবেণ জগৎ স্রষ্টুর্মহীতলে।

তস্মিন্ সত্রে বর্ত্তমানে দৈত্যাঃ ষট্পুরবাসিনঃ॥ ৯

নিকুম্ভাদ্যাঃ সমাগম্য তমূচুর্ব্বরদর্পিতাঃ।

কার্য্যতাং যজ্ঞভাগো নঃ সোমং যাস্যামহেবয়ং॥

কন্যাশ্চ ব্রহ্মদত্তো নো যজমানঃ প্রযচ্ছতু॥ ১০॥

হে প্রভো! দেবকীর সহিত বসুদেব ষট্পুরে অনুষ্ঠিত সেই যজ্ঞে যজমান ব্রহ্মদত্তের সমীপে বৃহস্পতি যজ্ঞে ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিয়াছিলেন। বহু অন্নযুক্ত এবং প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত ব্রহ্মদত্তের সেই সত্রে মহাব্রত মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠগণ গমন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ব্যাস আমি (বৈশম্পায়ন) যাজ্ঞবল্ক্য সুমন্তু জৈমিনি ধৃতিমান্ জাজলি এবং দেবল প্রভৃতি। সেই সত্রটি বুদ্ধিমান্ বসুদেবের সম্পত্তির অনুরূপ হইয়াছিল। ইহাতে ধর্ম্মচারিণী দেবকী প্রার্থীর অভিলাষিত বস্তু দান করিয়াছিলেন। জগৎস্রষ্টা বাসুদেবের প্রভাবানুসারে ভূতলে সেই "সত্র" আরব্ধ হইলে ষট্পুরবাসী নিকুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণ উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, আমাদের জন্য যজ্ঞের ভাগ নির্দ্দিষ্ট হউক, আমরা

(২) অধ্বর্য্যুদ্গাতৃ হোতারো যজুঃ সামগ্‌বিদঃ ক্রমাৎ। যজ্ঞব্যাপৃত যজুর্ব্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ অধ্বর্য্যু। অমর ব্রহ্মবর্গ।

যজ্ঞীয় সোমলতার নিকট যাইব। যজ্ঞানুষ্ঠাতা ব্রহ্মদত্ত আমাদিগকে কন্যা দান করুক, অন্যান্য বর্ষেও প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছিল যে,—

"অন্যথা তুষ্ণং দ্রষ্টব্যং বরমাজ্ঞাপয়ামহে"।১২

"আমরা আদেশ করিতেছি যে, আমাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে যাগ করিতে দিব না।" এদিকে ব্রহ্মদত্তের নিমন্ত্রণে জরাসন্ধ প্রভৃতি ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ সমাগত হইয়াছিলেন। অসুরের সহিত বিবাদ করিবার জন্য বসুদেবের অভিপ্রায়ানুসারে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন প্রকৃতির সহিত ষট্‌পুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের উপক্রমে নারদ মুনি চিন্তা করিয়া অসুর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—

"কথং বিরোধং যদুভিঃকৃত্বা স্বস্থে রিহাস্যতে।

যো ব্রহ্মদত্তঃ স হরিঃ সহি তস্য পিতুঃ সখা।"

তুমি যাদবদিগের সহিত বিরোধ বাঁধাইয়া এখানে নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া আছ কেন? যে ব্রহ্মদত্ত সেই হরি। কারণ সে তাহার পিতা বসুদেবের সখা। কৃষ্ণের জন্য ব্রহ্মদত্ত বহু ভাল ভাল কন্যা রাখিয়াছে। তুমি যে একশত কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছ তাহা উপযুক্ত রূপে ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সহায় কর। নারদের পরামর্শে নিকুম্ভ তাহাই করিল।

"নিকুম্ভোঽথাব্রবীদ্ধৃষ্টঃ ক্ষত্রং সুররিপুস্তদা।

অনুবর্ণয়িত্বা ক্ষত্রস্য মাহাত্ম্যং সত্যমেব চ ॥৪৯

তখন দেবশত্রু নিকুম্ভ হৃষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিল—

"যুদ্ধং নো রিপুভি সার্দ্ধং ভবিষ্যতি নৃপোত্তমাঃ।

সাহায্যং দাতুমিচ্ছামো ভবদ্ভিস্তত্র সর্ব্বথা ॥৫০

এবমস্ত্বিতিতানূচুঃ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষীণ কিল্বিষাঃ।

পাণ্ডবেয়ানৃতে বীরান্ ক্রতার্থাম্নারদাত্বিভো ॥৫১

শত্রুর সহিত আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত। হে নৃপতিশ্রেষ্ঠগণ! ইহাতে আপনাদের সর্ব্বথা সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করি। ইহাতে কেবল পাণ্ডবগণ ব্যতীত সকল ক্ষত্রিয়ই সম্মত হইলেন।

অতঃপর যুদ্ধ এবং তাহার ফলাফল। আমরা এইমাত্র প্রতিপাদন করার অভিপ্রায়ে এই বৃত্তান্তটি উদ্ধৃত করিলাম যে,—সেকালে ক্ষত্রিয়গণ ন্যায় এবং ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেবদ্বিজের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণে বিরত হইতেন না।

কিরাত-প্রসঙ্গ

বিষ্ণুপুরাণের ২ অংশ। ২৮ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, "পূর্ব্বে কিরাতাযস্যান্তঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।" যে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকে কিরাত নিবাস এবং পশ্চিমে যবন স্থান। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কিরাত একশ্রেণীর ম্লেচ্ছ। ইহাদের নিবাস যে কেবল ভারতের বাহিরে পূর্ব্বদিকেই নিয়ত ছিল, তেমন বুঝা যায় না। মহাদেব আরাধনার্থ অর্জ্জুন হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন। উহা উত্তর দিকে অবস্থিত।

"দিশং হ্যদীচীং কৌরব্য হিমবচ্ছিখরং প্রতি।" (বনপর্ব্ব ৩৮ অ—৩।১) উত্তর দিকে হিমালয় পর্ব্বতের শিখরের উদ্দেশে অর্জ্জুন গমন করিয়াছিলেন। এখানেই অর্জ্জুনের ছলনার জন্য মহাদেব কিরাতবেশে গমন করিয়াছিলেন। উমা দেবীও কিরাতবেশধারিণী হইয়াছিলেন।

"কৈরাতং বেশমাস্থায় কাঞ্চনদ্রুম-সন্নিভম্।

বিভ্রাজমানো বিপুলো গিরির্ম্মেরুরিবাচলঃ॥ (বনপর্ব্ব ৩৯ অ ২)

সেই মহাদেব কাঞ্চনবৃক্ষের ন্যায় কৈরাতবেশ ধারণ করিয়াছিলেন ইহাতে বিপুলকায় মহাদেব সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন।

"দেব্যা সহোময়া শ্রীমান্ সমানব্রতবেশয়া।

নানা বেশধরে হৃষ্টে র্ভূতৈমনুগত স্তদা ॥৪॥

কিরাত বেশ-সংছন্ন স্ত্রীভিশ্চাপি সহস্রশঃ।

অশোভত তদা রাজন্ স—দেশোঽতীব ভারত ॥৫॥

মহাদেব কিরাতবেশ ধারণ করাতে উমা দেবীও ঐ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাদেবের অনুচর ভূতবর্গও নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিয়াছিল। কিরাতবেশধারী স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন সেই দেশ অতীব শোভা পাইয়াছিল।

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, হিমালয়ের অন্তর্গত ও কিরাত—নিবাস ছিল। কিরাতদিগের বেশভূষা কিরূপ ছিল, তাহা ত্বরিতা দেবীর ধ্যানগম্য রূপের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়।

যথা,—"শ্যামাং বর্হিকলাপশেখর-যুতা সাবদ্ধপর্ণাং শুকাং

গুঞ্জাহার-লসৎ পয়োধরভরা মষ্টাহিকাল্ বিভ্রতীম্।

তাড়ঙ্কাঙ্গত মেখলা-গুণরণন্মঞ্জীরতাং বিভ্রতীং

কৈরাতীং বরদাভয়োদ্ধতকরাং দেবীং ত্রিনেত্রাং ভজে॥"

শ্যামবর্ণা, ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত-মস্তকভূষণালঙ্কৃতা পত্রময়-বসন-পরিধানা, গুঞ্জাময়হারের দ্বারা যাঁহার স্তনদ্বয় শোভমান, যিনি অষ্ট সর্প ধারণ করিতেছেন, তাড়ঙ্ক বলয়-কটিসূত্র ভূষিতা এবং শব্দায়মান নূপুরধারিণী কিরাত বেশধারিণী বরদ মুদ্রা ও অভয় মুদ্রার দ্বারা যাঁহার হস্ত উদ্ধত ত্রিনয়না দেবীকে ভজন করি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কিরাতেরা মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিত, লতাপাতায় আবরণ বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত, এবং বুকে গুঞ্জার মালা পরিত।

কিরাতদিগের কিরূপ ধর্ম্ম ছিল, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিথিতত্ত্ব ধৃত স্কন্দ-পুরাণীয় এবং ভবিষ্য-পুরাণীয় বচনে কথিত হইয়াছে যে,—

"সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।

বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানান্তু সম্মতা॥"

তপ যজ্ঞ মন্ত্র রহিত যে পূজা যাহাতে সুরা ও মাংস প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয় সেই পূজা তামসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ভবিষ্যোত্তরে বলা হইয়াছে যে,—

"ব্রহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈ বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।

এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ॥"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অন্যান্য সেবকগণ দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া থাকে। দস্যুতা ব্যবসায়ী নানাপ্রকার ম্লেচ্ছগণও পূজা করিয়া থাকে। এতাবতা বুঝা যায় যে, দস্যুতাই কিরাতদিগের ব্যবসায় ছিল।

দশকুমার চরিত কাব্যের অন্তর্গত উপহার বর্মচরিত পাঠে জানা যায় যে বিদেহ দেশ ও মগধের মধ্যস্থানে অরণ্য মধ্যে কিরাত নিবাস ছিল। চণ্ডীকার সমীপে কিরাতেরা নরহত্যা করিত।

ভারতবর্ষ

বিষ্ণু পুরাণ ২য় অংশ ২য় অধ্যায়ে মৈত্রেয় কর্ত্তৃক ভূমণ্ডল বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে পরাশর বলিয়াছেন;

"জম্বু প্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তম ॥ ৫
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্ ॥ ৬

পৃথিবী মধ্যে সাতটি দ্বীপ অবস্থিত। তাহাদের নাম জম্বুদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ, শাল্মলিদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ ও পুষ্করদ্বীপ। এই সাতটি দ্বীপ, লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত পদার্থময় সাতটি সমুদ্রের দ্বারা সমভাবে আবৃত অর্থাৎ বেষ্টিত। এই সকল দ্বীপের মধ্যস্থলে জম্বুদ্বীপ অবস্থিত। এই জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থানে সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিত।

হিমবান হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্য দক্ষিণে।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষ পর্ব্বতাঃ ॥ ১০

হিমালয় প্রভৃতি ছয়টি পর্ব্বত বর্ষসংজ্ঞক অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অবস্থান করিয়াছে, অতএব ইহাদের নাম বর্ষ পর্ব্বত। বর্ষ পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, হেমকূট ও নিষধ এই তিনটি মেরুর দক্ষিণে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই তিনটি পর্ব্বত সুমেরুর উত্তরে।

"ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্।
হরিবর্ষং তথৈবান্যন্ মেরোর্দ্দক্ষিণতো দ্বিজ ॥ ১২
রম্যকঞ্চোত্তরে বর্ষং তস্যৈবানুহিরন্ময়ম্।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈভারতস্তথা ॥ ১৪

হে দ্বিজ মৈত্রেয়! মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমতঃ ভারতবর্ষ, তৎপর কিম্পুরুষবর্ষ, তৎপর হরিবর্ষ। মেরুর উত্তরদিকে রম্যকবর্ষ তৎসমীপে হিরণ্ময়বর্ষ তৎপর উত্তর কুরুবর্ষ। এই বর্ষ ভারতের মত অর্থাৎ ধনুরাকার।

"নবসংস্রমেকৈকমেতেষাং দ্বিজ সপ্তম।
ইলাবৃতঞ্চ তন্মধ্যে সৌবর্ণোমেরুরুচ্ছিতঃ ॥ ১৪

এই সকল বর্ষের পরিমাণ নবসহস্র যোজন। ইলাবৃত বর্ষেরও প্রমাণ নবসহস্র যোজন তাহার মধ্যভাগে সুবর্ণ মেরু উন্নতভাবে অবস্থিত।

"মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্র নবসাহস্রবিস্তৃতং।
ইলাবৃতং মহাভাগ চত্বারশ্চাত্র পর্ব্বতাঃ ॥ ১৫

নবসহস্র যোজন বিস্তৃত ইলাবৃত বর্ষে মেরুর চারিদিকে বিধস্ত স্বরূপ অযুত যোজন সমুন্নত চারিটি পর্ব্বত আছে।

"পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ ॥ ১৭

পূর্ব্বদিকে মন্দর পর্ব্বত, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল, উত্তরে সুপার্শ্ব।

"ভদ্রাশ্বং পূর্ব্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।
বর্ষে দ্বে তু মুনিশ্রেষ্ঠ তয়োর্মধ্যে ইলাবৃতম ॥ ২৩

মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং পশ্চিমদিকে কেতুমালবর্ষ, এই দুইটির মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ।

ভারতের সীমা—বিষ্ণু পুরাণ ২য় অংশ ৩ অধ্যায় পরাশর উবাচ

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণং।
বর্ষং তৎ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥
নবযোজন সাহস্রোবিস্তারস্য মহামুনে। ২

হে মুনি প্রবর! সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে নয় হাজার যোজন বিস্তৃত যে স্থান তাহার নাম ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষে মহেন্দ্র মলয় সহ্য শুক্তিমান ঋক্ষ বিন্ধ্য ও পরিপাত্র এই সাতটি কুল পর্ব্বত আছে।

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষ পর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুল পর্ব্বতাঃ ॥ ৩

এই ভারতবর্ষ নবভাগে বিভক্ত।

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্ ॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্ত্বথবারুণঃ ॥ ৬
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥
পূর্ব্বেকিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়াবৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চভাগশঃ ॥ ৮
ইজ্যা যুদ্ধবণিজ্যাদ্যৈর্ব্বর্ত্তয়ন্তোব্যবস্থিতাঃ।

ইহাতে ইন্দ্রদ্বীপ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণ গভস্তিমান্—নাগদ্বীপ, সৌম্যদ্বীপ, গান্ধর্ব্বদ্বীপ; বারুণদ্বীপ নবম। এই দ্বীপ দক্ষিণোত্তরে সহস্র যোজন বিস্তৃত—উহা সাগর দ্বারা সংবৃত। ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাত নিবাস এবং পশ্চিমে যবন নিবাস। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্ব স্ব ভাগক্রমে বাস করে। ইহারা যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা জীবনধারণ করে। এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতের পূর্ব্বদিকে কিরাত নিবাস এবং পশ্চিমে যবন অবস্থিত। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে কিরাত এক শ্রেণীর ম্লেচ্ছ। মহাদেবের আরাধনার্থ অর্জ্জুন হিমালয়ে তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন। উহা উত্তরদিকে অবস্থিত। "দিশং হ্যুদীচীং কৌরব্যো হিমবচ্ছিখরং প্রতি।" (বনপর্ব্ব ৩৮ অ ১৩) উত্তরদিকে হিমালয়ের শিখরের উদ্দেশে অর্জ্জুন গমন করিয়াছিলেন। এখানেই অর্জ্জুনের ছলনার জন্য মহাদেব কিরাত বেশে গমন করিয়াছিলেন, এবং উমা দেবীও কিরাত বেশধারিণী হইয়াছিলেন,

কৈরাতং বেশমাস্থায় কাঞ্চন দ্রুমসন্নিভম্।
বিভ্রাজমানো বিপুলো গিরির্ম্মেরুরিবাচলঃ ॥"

সেই মহাদেব কাঞ্চন বৃক্ষের ন্যায় কৈরাত রূপ (কিরাত বেশ) ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বিপুলকায় মহাদেব সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন।

"দেব্যা সহো মায়া শ্রীমান্ সমানব্রত বেশয়া।
নানা বেশ ধরৈ র্হৃষ্টৈর্ভূতৈরনুগতস্তদা ॥ ৪।
কিরাত বেশ সংচ্ছন্নঃ স্ত্রীভিশ্চাপি সহস্রশঃ ॥
অশোভত তদারাজন্ স-দেশোঽতীব ভারত ॥ ৫।

মহাদেব কিরাত বেশ ধারণ করাতে উমা দেবীও ঐ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, মহাদেবের অনুচর ভূতবর্গও নানা প্রকার বেশ ধারণ করিয়াছিল। কিরাত বেশধারী স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন সেই দেশ অতীব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দশম পরিচ্ছেদ

তিলক বর্মা

পরদিন প্রাতঃকালে সচিব চতুর ভট্ট রাজভবনে চিত্রকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বস্তিবাচন করিয়া বলিলেন—'কাল রাত্রে আপনি পুরভূমিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনার দেখিতেছি মন্দ দশা চলিয়াছে; পদে পদে বিপন্ন হইতেছেন। গভীর রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় বাহির হওয়া নিরাপদ নয়; রাজপুরীর মধ্যেও বিপদ ঘটিতে পারে।'

কঞ্চুকী উপস্থিত ছিল; সে বলিল,—সেই কথাই তো আমিও বলিতেছি। কিন্তু দূত প্রবরের বয়স অল্প, মন চঞ্চল—' বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

চতুর ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাত্রে কি নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল?' প্রশ্নের অন্তর্নিহিত প্রকৃত প্রশ্নটি চিত্রক বুঝিতে পারিল; সচিব জানিতে চান কী জন্য রাত্রির মধ্যযামে সে একাকী বাহিরে গিয়াছিল। এই প্রশ্নের জন্য চিত্রক প্রস্তুত ছিল, সে মনে মনে একটি কাহিনী রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহাই সচিবকে শুনাইল।

—গভীর রাত্রে চিত্রকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ঘুম ভাঙ্গিয়া সে দেখে, একটা লোক বাতায়ন পথে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন চিত্রক তরবারি লইয়া দুরভীষ্ট ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হয়। চোর তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া পলায়ন করে; চিত্রকও বাতায়ন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। কিছুদূর পশ্চাদ্ধাবন করিবার পর সে আর চোরকে দেখিতে পায়না। তখন ইতস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে তোরণ সন্নিকটে উপস্থিত হইলে গুহ তাহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে—ইত্যাদি।

কাহিনী অবিশ্বাস্য নয়। চতুর ভট্ট মন দিয়া শুনিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, ইহা যদি মিথ্যা গল্প হয় তবে দূত মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তি আছে বটে। মুখে বলিলেন—'যা হোক, আপনি যে উন্মাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই ভাগ্য। আপনি মগধের মহামান্য দূত; আপনার কোনও অনিষ্ট হইলে আমাদের আর সান্ত্বনা থাকিত না। কঞ্চুকীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'লক্ষ্মণ, দিবারাত্র দূত মহাশয়ের রক্ষার ব্যবস্থা কর। তিনি এখন কিছুদিন রাজ-অতিথিরূপে থাকিবেন; তাঁহার অনিষ্ট হইলে দায়িত্ব তোমার, স্মরণ রাখিও।'

চিত্রক উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল,—'কিন্তু আমি শীঘ্রই চলিয়া যাইতে চাই। আতিথ্য রক্ষা তো হইয়াছে, এবার আমাকে বিদায় দিন।'

সচিব দৃঢ়ভাবে বলিলেন,—'এত শীঘ্র যাওয়া অসম্ভব। চষ্টন দুর্গে মহারাজের নিকট মগধের লিপি প্রেরিত হইয়াছে, মহারাজ সম্ভবত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়া আপনি চলিয়া যাইতে পারেন না।'—গাত্রোত্থান করিয়া চতুর ভট্ট নরম সুরে বলিলেন—'আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? রাজকার্য একদিনে হয়না। কিছুদিন বিশ্রাম করুন, আরাম উপভোগ করুন; তারপর বিটঙ্ক রাজ্যের দূত যখন পত্রের উত্তর লইয়া পাটলিপুত্রে যাইবে তখন আপনিও সঙ্গে ফিরিতে পারিবেন। সকল দিক দিয়া সুবিধা হইবে।'

সচিব প্রস্থান করিলেন। চিত্রক হতাশা-পূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া রহিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবলই শশিশেখরের সগুম্ফ মুখ ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

দিনটা প্রায় নিষ্ক্রিয় ভাবেই কাটিল। কঞ্চুকী লক্ষ্মণ যদি বা এ পর্যন্ত চিত্রককে কদাচিৎ চক্ষের অন্তরাল করিতেছিল, এখন একেবারে জলৌকার ন্যায় তাহার

অঙ্গে জুড়িয়া গেল; স্নানে আহারে নিদ্রায় পলকের তরে তাহার সঙ্গ ছাড়িল না।

অপরাহ্ণের দিকে উভয়ে অক্ষক্রীড়ায় কাল হরণ করিতেছিল। বিনা পণের খেলা, তাই চিত্রকের বিশেষ মন লাগিতেছিল না; এমন সময় অবরোধ হইতে রাজকুমারীর স্বকীয়া এক দাসী আসিল। দাসী কৃতাঞ্জলী-পুটে দাঁড়াইতেই কঞ্চুকী ঈষৎ বিস্ময়ে বলিল—'বিপাশা, তুমি এখানে কি চাও?'

বিপাশা বলিল—'আর্য, দেবদুহিতার আদেশে আসিয়াছি।'

কঞ্চুকী ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'দেবদুহিতার কী আদেশ?'

বিপাশা বলিল—'দেবদুহিতা উশীর-গৃহে অবস্থান করিতেছেন, সঙ্গে সখী সুগোপা আছেন। দেবদুহিতা ইচ্ছা করিয়াছেন মগধের দূত মহোদয়ের সহিত কিছু বাক্যালাপ করিবেন। অনুমতি হইলে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারি।'

কঞ্চুকী বিপদে পড়িল। কোনও রাজদূতের সহিত অবরোধের মধ্যে সাক্ষাৎ করা রাজকন্যার পক্ষে শোভন নয়, নিয়মানুগও নয়। কিন্তু রাজকুমারী একে স্ত্রীজাতি, তায় হূণকন্যা; অবরোধের শাসন তিনি কোন কালেই মানেন না। উপরন্তু, গণ্ডের উপর পিণ্ড, ঐ সুগোপা সখীটা আছে। সুগোপাকে কঞ্চুকী স্নেহের চক্ষে দেখে না। সুগোপার সহিত মিশিয়াই রাজকন্যার মর্যাদাজ্ঞান শিথিল হইয়াছে। কিন্তু উপায় কি? এদিকে অবরোধের শালীনতা রক্ষা করিতে হইবে; নহিলে কঞ্চুকীর কর্তব্যে ত্রুটি হয়। আবার দূত-প্রবরকেও একাকী ছাড়িয়া দেওয়া যায় না—

লক্ষ্মণ কঞ্চুকী চট্ করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল; বিপাশাকে বলিল—'তুমি অগ্রবর্তিনী হও, আমি দূত মহাশয়কে লইয়া স্বয়ং যাইতেছি।'

কঞ্চুকী সঙ্গে থাকিলে অবরোধে পুরুষ প্রবেশের দোষ অনেকটা ক্ষালন হইবে, অধিকন্তু দূত মহাশয়ও চোখে চোখে থাকিবেন।

অবরোধের পশ্চিম প্রান্তে উশীর গৃহ। সারি সারি কয়েকটি কক্ষ; দ্বারে গবাক্ষে সিক্ত উশীরের জাল। গ্রীষ্মের তাপ বর্ধিত হইলে পুরস্ত্রীরা এই সকল শীতল কক্ষে আশ্রয় লইয়া থাকেন।

একটি কক্ষে শুভ্র মর্মর পট্টের উপর কুমারী রট্টা উপবিষ্টা ছিলেন; সুগোপা তাঁহার কাছে কুট্টিমের উপর তালবৃন্ত হাতে লইয়া বসিয়াছিল। কঞ্চুকী ও চিত্রক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে সুগোপা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটি গৌড়দেশীয় মসৃণ পট্টিকা পাতিয়া দিল।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে রট্টা মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। কঞ্চুকীকে চিত্রকের সঙ্গে দেখিয়া তিনি ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন, কৌতুক-তরল কণ্ঠে বলিলেন—'এই অবরোধের প্রতি আর্য লক্ষ্মণের যেমন সতর্ক স্নেহ-মমতা, শিশু সন্তানের প্রতি মাতারও এমন দেখা যায় না।'

লক্ষ্মণ অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। চিত্রক রাজকুমারীর বাক্যে ফোটন দিয়া বলিল—'কঞ্চুকী মহাশয় আমার প্রতিও বড় স্নেহশীল, তিলার্ধের জন্যও চোখের আড়াল করেন না।'

বিড়ম্বিত কঞ্চুকী নতমুখে হেঁ হেঁ করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার উভয় সঙ্কট; কর্তব্য করিলে বাক্য যন্ত্রণা, না করিলে মুণ্ড লইয়া টানাটানি।

যাহোক, অতঃপর কুমারী রট্টা চিত্রককে বলিলেন—'দূত মহাশয়, আমার সখী আপনাকে কিছু কথা বলিতে চায়, তাই আপনাকে কষ্ট দিয়াছি। সুগোপা, এবার তোর কথা তুই বল্।'

সুগোপা কোলের উপর দুই মুক্ত হস্ত রাখিয়া নতচক্ষে বসিয়া ছিল, এখন ধীরে ধীরে বলিল—'আর্য, আমি আপনার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, প্রতিদানে আপনি আমার ইষ্ট করিয়াছেন। আপনার প্রসাদে আমার মাতাকে ফিরিয়া পাইয়াছি।'

চিত্রক অবহেলা ভরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া এমন ভাব প্রকাশ করিল যে মনে হয় এই সব ইষ্টানিষ্ট চেষ্টা তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর। সুগোপা তখন বলিল—'আপনি উদার চরিত্র। তাই সাহস করিয়া আপনার নিকট একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি। আমার অভাগিনী জননী—' সুগোপার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল—'উদ্ধার পাইবার পর শয্যা লইয়াছেন। তাঁহার শরীর অতি দুর্বল, যে-কোনও মুহূর্তে প্রাণবায়ু বাহির হইতে পারে। কিন্তু

তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। তাঁহার বড় সাধ আপনাকে একবার দেখিবেন, নিজমুখে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন—'

চিত্রক বলিল—'কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যদি আমাকে দেখিলে সুখী হন আমি নিশ্চয় দেখা করিব। কোথায় আছেন তিনি?'

সুগোপা বলিল—'আমার গৃহে। আমার কুটীর রাজপুরীর বাহিরে কিছু দূরে। যদি অনুগ্রহ করেন, এখনি লইয়া যাইতে পারি।'

চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইল—'চলুন। আমি প্রস্তুত।'

কঞ্চুকী ত্রস্তভাবে লাফাইয়া উঠিল—'অ্যাঁ—রাজপুরীর বাহিরে! তা—তা—আমি সঙ্গে দুইজন রক্ষী দিতেছি—'

চিত্রক বলিল—'নিষ্প্রয়োজন। আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ।'

বিব্রত কঞ্চুকী বলিল—'কিন্তু তাহা কি করিয়া হইতে পারে! আর্য চতুর ভট্ট—অর্থাৎ—আপনার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর—'

চিত্রক রট্টার দিকে চাহিয়া করুণ হাসিল—'আমার উপর কঞ্চুকী মহাশয়ের বিশ্বাস নাই। তিনি বোধহয় এখনও আমাকে চোর বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার সন্দেহ, ছাড়া পাইলেই আমি আবার ঘোড়া চুরি করিব।'

রট্টা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন করিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, রক্ষীর প্রয়োজন নাই। সুগোপা দূত মহাশয়কে লইয়া যাইবে, পৌঁছাইয়া দিবে।'

পিণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া কঞ্চুকী বলিল—'তা—তা—দেবদুহিতার যদি তাহাই অভিরুচি—'

চিত্রক মনে মনে ভাবিল—এই সুযোগ! সে আর রাজকুমারীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল না; রট্টার চোখে কি জানি কী সম্মোহন আছে, চোখোচোখি হইলে আবার হয়তো তাহার মনের গতি পরিবর্তিত হইবে। সে সুগোপার অনুসরণ করিয়া উষ্ণীর-গৃহ হইতে বাহির হইল।

রাজপুরীর তোরণ দ্বারের সম্মুখ দিয়া যে পথ গিয়াছে তাহা দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গিয়া নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিয়াছে, তারপর আরও খানিকদূর গিয়া একটি বাঁকের মুখে আসিয়া আবার নীচে নামিয়াছে। এই বাঁকের উপর সুগোপার কুটীর; ইহার পর হইতে রাজপুরুষ ও নাগরিক সাধারণের গৃহাদি আরম্ভ হইয়াছে।

সুগোপার কুটীর ক্ষুদ্র হইলেও সুদৃশ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; চারিদিকে ফুলের বাগান। সুগোপার মালাকর স্বামী গৃহেই ছিল; সুগোপাকে আসিতে দেখিয়া সে ফুল-মাল্যাদি লইয়া বাহির হইল। বাজারে ফুল-মাল্য বিক্রয় করিয়া যাহা পাইবে তাহা লইয়া সে মদিরালয়ে প্রবেশ করিবে। লোকটি অতিশয় নীরব প্রকৃতির; আপন মনে উদ্যানের পরিচর্যা করে, মালা গাঁথে বিক্রয় করে, আর মদিরা সেবা করে। কাহারও সাতে পাঁচে নাই।

সুগোপা চিত্রককে মাতার নিকট লইয়া গেল। একটি ঈষদন্ধকার কক্ষে খট্বার উপর সযত্নবিন্যস্ত শয্যায় পৃথা শুইয়া আছে। তাহার দেহ যথাসম্ভব পরিস্কৃত হইয়াছে; নখ কাটিয়া মাথায় তৈল সেক করা হইয়াছে। কিন্তু কেশের গ্রন্থিযুক্ত তাম্রাভ বর্ণ দূর হয় নাই। মুখের ও দেহের ত্বক দীর্ঘকাল আলোকের স্পর্শাভাবে হরিদাভ বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

পৃথা শয্যার সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছিল; কোটরগত চক্ষু ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ ছিল; চিত্রক নিঃশব্দে তাহার শয্যা-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলে সে ধীরে ধীরে চক্ষু নামাইল। অনেকক্ষণ চিত্রকের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—'তুমিই সেই?'

সুগোপা শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া মাতার কপালে হস্ত রাখিল, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—'হাঁ মা, ইনিই সেই।'

আরও কিছুক্ষণ চিত্রককে দেখিয়া পৃথা বলিল—'তুমি হূণ নও—আর্য।'

চিত্রক হাসিয়া বলিল—'হাঁ আমি আর্য। যে হূণ তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল সে মরিয়াছে।' বলিয়া সংক্ষেপে গুহের মৃত্যু বিবরণ বলিল।

শুনিয়া পৃথা বলিল—'এখন আর কী আসে যায়। আমার জীবন শেষ হইয়াছে।'

চিত্রক শয্যাপাশে বসিয়া সান্ত্বনার কণ্ঠে বলিল,—'এরূপ কেন মনে করিতেছ? তোমার শরীর আবার সুস্থ হইবে। তোমার কন্যা আছে; তাহাকে লইয়া আবার তুমি সুখী হইবে। যাহা অতীত তাহা ভুলিয়া যাও।'

পৃথার মুখে আশা বা আনন্দের রেখাপাত হইল না। সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'আমার কথা থাক। তোমার কথা বল। তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, তোমার কথা শুনিতে চাই।—তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি অপরিচিত নও—পূর্বে যেন দেখিয়াছি।'

চিত্রক লঘু হাস্যে বলিল—'তুমি তো অন্ধকারে দেখিতে পাও। সে-রাত্রে কূট-কক্ষে দেখিয়াছিলে—হয়তো সেই স্মৃতি মনে জাগিতেছে।'

'তাহাই হইবে। তোমার নাম কি?'

'চিত্রক বর্মা।'

পৃথা নীরবে তাহার ক্ষতরেখা চিহ্নিত অঙ্গে চক্ষু বুলাইল।

'মাতা পিতা জীবিত আছেন?'

মাতা পিতা! চিত্রক মনে মনে হাসিল; তাহার মাতা পিতা থাকিতে পারে ইহাই যেন অসম্ভব মনে হয়। বলিল—'না, জীবিত নাই।'

'তোমার বয়স অল্প মনে হয়—'

'নিতান্ত অল্প নয়, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর।'

পৃথা কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল; শেষে ধীরে ধীরে বলিল—'আমার তিলক বাঁচিয়া থাকিলে তোমার সমবয়স্ক হইত।'

'তিলক কে?'

'কুমার তিলক বর্মা। আমি তাহার ধাত্রী ছিলাম। সে আর সুগোপা এক দিনে জন্মিয়াছিল; আমায় দুগ্ধ দু'জনকে ভাগ করিয়া দিতাম।'

সুগোপা নিম্নস্বরে বলিল—'মা, ও কথা আর মনে আনিও না।'

পৃথা চক্ষু নিমীলিত করিয়া বলিল—'তাহার কথা ভুলিতে পারি না। নবনীতের ন্যায় সুকুমার শিশু—সেই শিশুকে হূণেরা আমার বুক হইতে ছিঁড়িয়া লইল—তারপর—তারপর—'

অকালবৃদ্ধা পৃথার পাণ্ডুর গণ্ড বহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ক্ষরিত হইতে লাগিল। সুগোপা চিত্রকের সহিত বিষণ্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিল।

চিত্রক বলিল—'ক্ষত্রিয় শিশু যদি তরবারির আঘাতে মরিয়া থাকে তাহাতে আক্ষেপ করিবার কী আছে? ক্রীতদাস হইয়া বাঁচিয়া থাকার অপেক্ষা সে ভাল।'

পৃথা নিস্তেজ স্বরে বলিল—'রাজার পুত্র ক্রীতদাস হয় নাই সে ভাল। কিন্তু রাজজ্যোতিষী বলিয়াছিলেন, এ শিশু রাজটীকা লইয়া জন্মিয়াছে, রাজচক্রবর্তী হইবে। কই, তাহা তো হইল না! রাজজ্যোতিষীর কথা মিথ্যা হইল—'

চিত্রক মৃদুহাস্যে বলিল,—'রাজজ্যোতিষীর কথা অমন মিথ্যা হয়। কিন্তু রাজটীকা লইয়া জন্মিয়াছে ইহার অর্থ কি?'

পৃথা ধীরে ধীরে বলিল—'আমি যেন চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি। তাহার ভ্রূর মধ্যস্থলে জটুল ছিল; অন্য সময় দেখা যাইত না, কিন্তু সে কাঁদিলে বা ক্রুদ্ধ হইলে ঐ জটুল রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিত। মনে হইত যেন রক্ত-চন্দনের তিলক। তাই তাহার নামকরণ হইয়াছিল—তিলকবর্মা।'

বাতাসের ফুৎকারে ভস্মাবৃত অঙ্গার যেমন স্ফুরিত হইয়া উঠে, চিত্রকের ভ্রূমধ্যে তেমনি রক্তটীকা জ্বলিয়া উঠিল। সে ব্যায়ত চক্ষে চাহিয়া অর্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'কী বলিলে?'

পৃথা চক্ষু মেলিল। সম্মুখেই চিত্রকের মুখ তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া আছে; সেই মুখে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রবালের ন্যায় তিলক জ্বলিতেছে। পৃথার চক্ষু ক্রমে বিস্ফারিত হইতে লাগিল; তারপর সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'তিলক! আমার তিলক বর্মা! পুত্র! পুত্র!'

পৃথা দুই কঙ্কালসার হস্তে চিত্রককে টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিতে চাহিল; কিন্তু এই প্রবল উত্তেজনায় তাহার দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল; সহসা তাহার হস্ত শিথিল হইয়া চিত্রকের স্কন্ধ হইতে খসিয়া পড়িল। সে চক্ষু মুদিত করিয়া মৃতবৎ স্থির হইয়া রহিল।

সুগোপা কাঁদিয়া উঠিল। চিত্রক পৃথার বক্ষের উপর করতল রাখিয়া দেখিল অতি ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। সে সুগোপাকে বলিল—'এখনও বাঁচিয়া আছেন। যদি সম্ভব হয় শীঘ্র চিকিৎসক ডাকো।'

সুগোপা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাজবৈদ্য রট্টার আদেশে পৃথার চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন। রাজ-

বৈদ্যের বাসভবন নিকটেই; অল্পক্ষণের মধ্যে সুগোপা বৈদ্যকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বৈদ্যরাজ ঈষৎ মুখ বিকৃত করিলেন, তারপর সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিলেন।

সে রাত্রে চিত্রক রাজপুরীতে ফিরিয়া গেল না।

সন্দিগ্ধ কঞ্চুকী অলক্ষিতে দুইটি গুপ্ত-রক্ষী পাঠাইয়াছিল, তাহারা সারা রাত্রি সুগোপার কুটীরের বাহিরে পাহারা দিল।

গভীর রাত্রে পৃথা মোহাচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া ছিল। চিত্রক তাহার শয্যাপাশে দাঁড়াইয়া সুগোপার স্কন্ধের উপর হাত রাখিল—'সুগোপা, তুমি আমার ভগিনী; আমরা একই স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছি।'

সুগোপা শুধু সজল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

চিত্রক বলিল—'যে কথা আজ শুনিয়াছ তাহা কাহাকেও বলিও না। বলিলে আমার জীবন সংশয় হইতে পারে।'

সুগোপা ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'এখন তুমি কী করিবে?'

চিত্রকের অধরে ম্রিয়মান হাসি দেখা দিল—'ভাবিয়াছিলাম পলায়ন করিব। কিন্তু এখন—কি করিব জানি না। তুমি একথা কাহাকেও বলিও না। হয়তো তোমার মাতা ভুল করিয়াছেন; রুগ্ন দেহে এরূপ ভ্রান্তি অসম্ভব নয়—।'

সুগোপা বলিল—'ভ্রান্তি নয়। আমার অন্তর্যামী বলিতেছেন, তুমি তিলক বর্মা।'

'তিলক বর্মা। শুনিতে বড় অদ্ভুত লাগে। কিন্তু সত্য হোক মিথ্যা হোক, তুমি শপথ কর এ কথা গোপন রাখিবে।'

'ভাল, গোপন রাখিব।'

'কাহাকেও বলিবে না?'

'না।'

পৃথার আর জ্ঞান হইল না। রাত্রি শেষে তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। (ক্রমশঃ)

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

পাচ

২০-এ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ মঙ্গলবার দুপুরে এস্ এস্ মহারাজা জাহাজ পোর্ট-ব্লেয়ারে পৌছিল। মঙ্গলবার সকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, পোর্টব্লেয়ার জেটীতে জাহাজ ভিড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবলভাবে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

এবার জাহাজে যাত্রীসংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশতের কিছু বেশী। জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তবে জাহাজে তাঁহার সহিত আলাপ হয় নাই, পোর্টব্লেয়ারে পৌছাইয়া তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। তিনি পুনর্ব্বাসন বোর্ডের সভ্য, অতএব সরকারী খরচে আন্দামানে পুনর্বসতির তত্ত্বাবধান করিতে যাইতেছিলেন। আন্দামানে এক সপ্তাহ থাকার পর তিনি আমাদের সহিত ঐ জাহাজেই মাদ্রাজে আসেন। আন্দামানে তিনি ছিলেন ডেপুটী কমিশনারের বাংলোতে, মাদ্রাজে আসিয়া তিনি Woodlands Hotel-এ উঠিয়াছিলেন। আমরা সামান্ত লোক তাঁহার সহিত একত্রে থাকিতে পারি নাই। উপরন্তু মাদ্রাজ হইতে তিনি বিমানযোগে কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার সহিত আমাদের শেষ দেখা মাদ্রাজেই হইয়াছিল। সরকারী অর্থে প্রথম শ্রেণীর সেলুন ও বিমানে করিয়া যে সমস্ত দেশ-সেবক ঘোরাফেরা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা সামান্ত শিক্ষক—পকেটের পয়সা খরচ করিয়া একত্র ঘোরাঘুরি করার সামর্থ্য কিরূপে লাভ করিতে পারি! জীবানন্দবাবু ছাড়া আরও কয়েকজন জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মিঃ চিন্নাপ্পা নামক আন্দামানের বনপাল (Conservator of Forests) ছিলেন। তিনি ফার্ষ্ট ক্লাসের ডেকের উপর সবেগে পায়চারী করিতেন এবং সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই সকলকে শুনাইয়া দিতেন যে, তিনি ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ (Commander-in-Chief) মিঃ ক্যারিয়াপ্পার নিকট আত্মীয়। এ ছাড়া কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ও অন্য কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ যাত্রী ও জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন, তাহাদের পরিচয় পাই নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কতকগুলি ছাত্র পূজাবকাশে কলিকাতা হইতে পোর্টব্লেয়ারে নিজেদের আত্মীয়ের নিকট ফিরিতেছিল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি local born, অর্থাৎ পূর্ব্বে তাহাদের দেশ ছিল ভারতের কোন না কোন প্রদেশে, তবে পিতা বা পিতামহ কয়েদীরূপে আন্দামানে গিয়া সেইখানেই বসবাস করিয়া তাহারা এখন আন্দামানেরই

লোক হইয়া গিয়াছেন। শিক্ষা, আচার ও ব্যবহারে তাহারা এখন যে কোন উচ্চস্তরের নাগরিকের সহিত সমান পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে এবং নৈতিকতার মান কোন অংশেই কম নাই। অপর কতকগুলি ছাত্রের পিতা বা আত্মীয় চাকুরী সূত্রে আন্দামানে আছেন, ঐ সমস্ত ছাত্রেরা ছুটীতে বেড়াইবার উদ্দেশে যাইতেছিল। এ ছাড়া কতকগুলি আন্দামানের কর্ম্মচারী কোন না কোন কাজে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, পুনরায় কর্ম্মস্থলে ফিরিতেছিলেন। ইহারা নিজেদের চাকুরী অনুযায়ী কেহ দ্বিতীয় শ্রেণী, কেহ বা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট পাইয়াছিলেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের টিকিট বা T.A. দেওয়ার ব্যাপারে একটি অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে শুনিলাম। আন্দামানের সরকারী কর্ম্মচারীগণ নিজেদের পদমর্য্যাদা অনুযায়ী দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ডেক শ্রেণীর ভাতা কিম্বা পাস্ পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের পত্নীরা সর্ব্বদাই ডেকের ভাড়া বা পাস্ পাইয়া থাকেন। এই নিয়মের মূলে কি আছে জানি না। অথচ যে সমস্ত কর্ম্মচারী প্রথম শ্রেণীর ভ্রমণ-ভাতা পাইয়া থাকেন তাঁহাদের পত্নীরাও প্রথম শ্রেণীর ভাড়া পাইয়া থাকেন। সাহেবী যুগের কোন এক অব্যক্ত কারণে এই নিয়ম বোধ হয় চালু হইয়াছিল। অদ্যাবধি সেই নিয়মই চলিতেছে। অন্যপক্ষে এখানকার চাকুরীতে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের ছুটীর নিয়মও একটু বিশেষ ধরণের। ভারতের অন্যত্র সকল স্থানেই যে কয়দিন অফিসে না যাওয়া যায় সেই কয়দিনই ছুটী বলিয়া ধরা হইয়া থাকে, কিন্তু আন্দামানের কর্ম্মচারীগণ আন্দামান হইতে কলিকাতা বা মাদ্রাজে আসিয়া যে কয়দিন ভারতে অবস্থান করেন, মাত্র সেই কয়দিনই ছুটী লইয়াছেন বলিয়া পরিগণিত হয়, অর্থাৎ জাহাজে আসা-যাওয়ার আট দিন সময় ছুটি বলিয়া গণ্য হয় না।

জাহাজে চারিদিন একত্র অবস্থানের ফলে সহযাত্রী অনেকেরই সহিত আলাপ হইয়াছিল। আন্দামানে গিয়া কোথায় উঠিব সেই বিষয় ইঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করিয়াছিলাম, যা হোক, একটা ব্যবস্থা হইয়াই যাইবে। আমরা যে তিনজন একসঙ্গে ছিলাম, সেই তিন বন্ধুর মধ্যে একজন নাকি কমিউনিষ্ট, একজন ছিলেন মহাসভাপন্থী, অপরজন কংগ্রেসভক্ত। কমিউনিষ্ট বন্ধুটি জাহাজের মুসলমান যাত্রীদের সহিত রীতিমত আলাপ জমাইয়া তুলিলেন, কঙ্গরসী বন্ধুটি খদ্দরধারীদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন, আর মহাসভাপন্থীটি কোন্ মুসলমান হিন্দু নারী-হরণ করিয়া পলাইতেছে সেই গবেষণায় প্রাণ উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে রফা করা গেল যে, তিন মূর্ত্তি তিন দিক হইতে চেষ্টা করিব এবং যে কোনো দিক দিয়াই ব্যবস্থা হউক না কেন, কমিউনিষ্টরীতি অনুযায়ী তিনজনেই সমানভাবে উহা ভাগ করিয়া লইব।

২০-এ সেপ্টেম্বর দুপুরে জাহাজ পোর্টব্লেয়ারে অর্থাৎ 'চাথামের' জেটিতে লাগিল বটে, কিন্তু ঝমঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। নিজেদের মালপত্র বাঁধিয়া লইয়া বহু কষ্টে এক কুলির ব্যবস্থা করিয়া ওয়াটারপ্রুফ গায়ে ছাতা হাতে জাহাজ হইতে নামিতে যাইব, শুনিলাম পোর্টব্লেয়ারের ডাক্তার সাহেব জাহাজে আসিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার নিকট কলেরা ও বসন্তের প্রতিষেধক টীকা যে দেওয়া হইয়াছে, সেই সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে। ভাবি যাত্রীদের অবগতির জন্য চলিয়া রাখি যে ইহা বিশেষ প্রয়োজন। যাহা হউক, ডাক্তার বি চক্রবর্ত্তীর নিকট সার্টিফিকেট দেখাইয়া উহাতে সহি করাইয়া আমরা ঘাটে নামিয়া পড়িলাম। এই ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর নিকট আমার একখানি পরিচয়পত্র ছিল, কিন্তু তখন ত আর উঁহাকে চিনিতাম না, কাজেই তখন কোন পরিচয় হয় নাই। অফিসী কায়দায় তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া জেটীর উপর অবতরণ করিলাম।

পরবর্ত্তী বিপদ, পোর্টব্লেয়ারে সচরাচর কোনরূপ ভাড়াটে গাড়ী পাওয়া যায় না। পূর্ব্বাহ্নে টেলিফোন করিলে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। কিন্তু এ সমস্ত সংবাদ সে সময়ে জানতাম না। এ ছাড়া আমাদের জানা ছিল যে, থাকিবার মত কোন হোটেলও নাই, আছে এক সরকারী Guest house। এই সরকারী অতিথিশালাটি পোর্টব্লেয়ারের জাহাজঘাট 'চাথাম' হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটি অতিসুন্দর কাঠের বৃহৎ বাংলো বাটীতে অবস্থিত। এখানে সাতদিন পর্য্যন্ত থাকা যায়, তবে আন্দামানের চিফ্ কমিশনার বা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অনুমতি লইয়া সাতদিনের বেশীও থাকা যায়। এই সরকারী অতিথিশালায় সর্ব্বসময়ের জন্য একজন care-taker এবং অনেকগুলি বেয়ারা-চাপরাশী থাকে। এখানকার দক্ষিণাও বড় কম নয়। এই অতিথিশালায় পাঁচখানি ঘর আছে। ১নং ও ২নং কামরায় থাকিতে হইলে জনপ্রতি দৈনিক ৫৲ টাকা ভাড়া লাগে, ৩নং ও ৪নং এ-টাইপ কামরার জন্য দৈনিক মাথা পিছু ৪৲ টাকা এবং ৪নং বি টাইপ ও ৫নং কামরার জন্য দৈনিক প্রতিজনের ২৲ টাকা ভাড়া লাগে। এ ছাড়া আহারের জন্য দৈনিক ১০৲ হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত তিন শ্রেণীর তিন রূপ খানা আছে; প্রাতরাশ ও অপরাহ্নের চা পান স্বতন্ত্র। অতএব ঠিক করিয়াছিলাম, এখানে না উঠিয়া সম্ভাব্য অন্য কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুনিয়াছিলাম, পোর্ট-ব্লেয়ার সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং জেটী হইতে তিনমাইল দূরে Bachelor's Mess নামক একটি প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে পোর্ট ব্লেয়ারের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীগণ বাস করেন। ইচ্ছা ছিল সেইখানেই যাইয়া থাকার ব্যবস্থা করিব। কিন্তু যাই কি করিয়া। এদিকে বৃষ্টি আরও জোরে পড়িতে লাগিল। কুলিরা রাগারাগি করিয়া রাস্তার মাঝখানে মাল নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। সুনীলবাবু কোনরূপ অসুবিধা হইলেই বলিয়া উঠিতেন 'মহা বিপদ'; তিনি আর একবার তাঁহার সেই প্রিয় কথাটি উচ্চারণ করিলেন।

বৃষ্টির মধ্যেই খোঁজ করিয়া দেখা গেল, অনেকগুলি মালবাহী লরী দাঁড়াইয়া আছে এবং সেগুলিতে মাল ও মানুষ উভয়ই উঠিতেছে। এইরূপ কোন লরী পাওয়া যায় কি না তাহার সন্ধান করিতে গিয়া দেখি আমাদেরই সহযাত্রী এক মুসলমান ছাত্রের দাদা তাঁহার ভাইকে লইবার জন্য একখানি লরী আনিয়াছিলেন। তিনি সেই লরীতে আমাদের তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, যে Bachelor's Mess-ই বাঙ্গালী আগন্তুকের প্রথম যাওয়ার পক্ষে শ্রেষ্ঠ-স্থান এবং লরীতে

কিছুক্ষণ ঝাঁকুনি খাওয়ার পর বেলা প্রায় তিনটা নাগাদ আমরা ব্যাচিলার মেসে উপস্থিত হইলাম।

ব্যাচিলার মেসটি সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত একখানি সুন্দর কাঠের দোতলা বাড়ী। উহার একতোলায় গভর্ণমেন্টের ছাপাখানা। দোতলায় উঠিয়া যে ঘরে প্রথম বসিলাম উহা বাঙ্গালীদের ক্লাবঘর। ঐ ঘরে সরস্বতী পূজা হইতে বাঙ্গালীদের নাট্যাভিনয়ের রিহার্সাল ও গল্পগুজব ইত্যাদি হয়, এবং ঐখানেই তিনটি আলমারিতে বাংলা বই আছে, অর্থাৎ উহাই স্থানীয় বাঙ্গালীদের লাইব্রেরী। মেসের দরোয়ান বলিল যে, এখানে থাকিবার মত কোন খালি জায়গা নাই, অতএব—

মালপত্র ফেলিয়া, ওয়াটারপ্রুফ খুলিয়া বেঞ্চির উপর স্থির হইয়া বসিতে না বসিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। শুনিলাম এইরূপ বৃষ্টি এখানে নয়মাস যাবৎ হইয়া থাকে, বাকী তিনমাস অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে। সহযাত্রী বন্ধু নির্ম্মলবাবু তাহার ছাত্রের দাদা শ্রীঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একখানি চিঠি লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি মেসের বেয়ারাকে সেই চিঠি দিয়া ঠাকুরদাসবাবুর সন্ধান লইতে বলিলেন। বেয়ারা চলিয়া গেল। আধঘণ্টার মধ্যেই ঠাকুরদাসবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুরদাসবাবু CPWD র ওভারসিয়ার, স্বাস্থ্যবান প্রিয়দর্শন রসিক যুবক, এককথায় মাই-ডিয়ার-জাতীয় লোক। কোনরূপ দ্বিধাবোধ না করিয়াই এক বেয়ারার সাহায্যে আমাদের মালপত্র উঠাইয়া নিজের বাটীতে আনিয়া হাজির করিলেন। তাঁহার বাটী বিবী লাইন নামক এক রাস্তার উপর, মেস্ হইতে খুব নিকটেই বটে। স্ত্রী, শিশুকন্যা ও একটি ভৃত্য লইয়া তিনি প্রবাসে সুখী জীবন যাপন করেন। এই ঠাকুরদাসবাবুর সহায়তায় আমরা আন্দামানের বহু বাঙ্গালীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। অবশ্য তিনি মুখে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদের লইয়া বেশী বেড়াইতে বা দেখাইতে পারিবেন না, কারণ জাহাজ যে কয়দিন বন্দরে থাকে, সে কয়দিন তাঁহাদের বড়ই ব্যস্ত থাকিতে হয়, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তিনি আমাদের লইয়া যেভাবে ঘুরাইলেন, তাহার অধিক কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে আন্দামানের ঘাটে জাহাজ যাওয়া এবং থাকা একটা উৎসব বিশেষ। দেশের যাবতীয় চিঠি, খবরের কাগজ, দোকানের প্রয়োজনীয় মাল সমস্তই এই জাহাজ যোগে যায়। জাহাজের যাওয়া এদেশের 'জীবনকাঠি', চলিয়া আসা 'মরণকাঠি'। সারা বছরে ১৮ বার মাত্র জাহাজ যাইয়া থাকে, ১২ বার কলিকাতা হইতে এবং ৬বার মাদ্রাজ হইতে। ঐ একখানি জাহাজ 'এস্‌এস্ মহারাজাই' এইভাবে যাতায়াত করে। এ ছাড়া দুই একখানি চার্টার-করা জাহাজও মধ্যে মধ্যে যায় এবং বর্ম্মা হইতে পেট্রলবাহী জাহাজও আসে। কিন্তু এদেশের আসল প্রাণশক্তি-সঞ্চারকারী জাহাজ ঐ 'এস্‌এস্ মহারাজ।'

বিকাল আন্দাজ ৪টার সময় বিবী লাইনে ঠাকুরদাসবাবুর বাটীতে আসিয়া হাত পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া চা এবং পাঁপর ভাজা খাইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বৃষ্টি সমানেই পড়িতেছিল। তিনি বলিলেন, বৃষ্টি এইরূপেই পড়ে এবং পড়িতেই থাকিবে, অতএব বৃষ্টির জন্য চিন্তা করিলে চলিবে না। চাপানের পর তিনি আমাদের 'তিনজন'কে লইয়া চিফ্ কমিশনারের সেক্রেটারী শ্রী কে সি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলোয় লইয়া চলিলেন।

প্রৌঢ়বয়স্ক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাকা সাহেবী কায়দার প্রবাসী বাঙ্গালী। বাড়ী ঘরের বন্দোবস্ত নিখুঁত সাহেবী ধরণে, নিজের পরিচ্ছদ এবং ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র এবং মার্জ্জিত ইংরাজের মত। চুলচেরা হিসাব এবং ওজন করিয়া কথা বলেন। নবাগন্তুকের সহিত ভদ্রতা রক্ষার জন্য যতটুকু আবহাওয়ার সংবাদ এবং রাষ্ট্রনীতি চর্চ্চার প্রয়োজন মাত্র ততটুকুই করিলেন এবং আন্দামানের বাস্তহারা উপনিবেশগুলি ঘুরিবার জন্য আমাদের পরিপূর্ণভাবে সাহায্য করিলেন। তাঁহার সহায়তা না পাইলে আমরা হয়ত সমস্ত দক্ষিণ আন্দামান ঘুরিতে পারিতাম না। তাঁহার সাহায্যেই আমরা 'রস' দ্বীপে যাইবার জন্য মোটর লঞ্চ পাইয়াছিলাম। তিনি নানাভাবে আমাদের নিকট প্রশ্ন করিয়া শেষে এই বলিয়া স্বীকার করিলেন যে, বিনা প্রয়োজনে, কোনরূপ আত্মীয় বন্ধু না থাকা সত্বেও কেবলমাত্র বেড়াইবার উদ্দেশ্যে এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও পোর্ট ব্লেয়ারে আসেন নাই এবং বলিলেন যে যদি কখনও কেহ আন্দামানের উদ্দেশ্যহীন দর্শকের তালিকা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে আমরাই সেই তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিব। প্রায় ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার পর আমরা সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকাল হইতেই আমাদের আন্দামান ভ্রমণ সুরু হইল। জীপে, লঞ্চে এবং পদব্রজে সাতদিন ধরিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছি, কতকগুলি পুরাতন বন্ধু এবং সহপাঠীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি, কতকগুলি নূতন বন্ধু লাভ করিয়াছি, অনেকের বাটীতেই সাদরে অভ্যর্থিত বা নিমন্ত্রিত হইয়াছি এবং সাতদিন পরে যখন জাহাজে চড়িয়াছি তখন বহু প্রবাসী বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষে জেটীতে আসিয়া আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়াছেন। জাহাজ যখন জেটী ছাড়িয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তখনও তাহাদের মূর্ত্তিগুলি ছবির ন্যায় জেটীর উপর স্থির নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াছিল, অবসর সময়ে এখনও সেই এক সপ্তাহের বন্ধু ও বান্ধবীদের চাথাম জেটীর উপর দণ্ডায়মান নিশ্চল মূর্ত্তিগুলি চিত্রার্পিতবৎ মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠে। (ক্রমশঃ)

রুসো

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

কিন্তু এ সকলের কিছুতেই রুসোর তৃপ্তি হইতেছিল না। সংসার হইতে বিদায় লইয়া পারিস হইতে দূরবর্ত্তী কোনও স্থানে নির্জনে বাস করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার এই ইচ্ছার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার বান্ধবী Madame d'epincy মন্ট্ মরেন্সির অরণ্যের মধ্যে তাঁহার নিজের গৃহের সন্নিকটে তাঁহার জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। গৃহের নাম হইল Hermitage (নিভৃত কুটীর)। ১৭৫৬ সালে রুসো পারিস ত্যাগ করিয়া এই কুটিরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার এই নির্জন-প্রিয়তার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। কেহ তাঁহাকে মানব-বিদ্বেষী (misanthrope) বলিলেন; কেহ বলিলেন, প্রশংসা-লোভী। ১৭৬২ সালে Maleshberbesকে লিখিত এক পত্রে রুসো তাঁহার নির্জনবাসের কারণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন "লোকালয়-ত্যাগের প্রকৃত কারণ আমার অদম্য স্বাধীন প্রকৃতি। এই প্রকৃতির নিকট সম্মান, ধনসম্পদ, যশঃ কিছুরই কোনও মূল্য নাই। এই প্রকৃতি আমার অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত নহে; মজ্জাগত আলস্য হইতে ইহার উদ্ভব। আমার এই আলস্যের পরিমাণ এত বেশী, যে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। ইহার জন্য সকল ব্যাপারেই আমার ভয় পায়। নাগরিক জীবনের সামান্যতম কর্ত্তব্যও অসহনীয় হইয়া পড়ে। যখন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন একটা কথা বলা, একখানা পত্র লেখা, অথবা কোথায়ও গিয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করা, আমার ভীষণ পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।" রুসোর যৌবনের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল এক আকাঙ্ক্ষা—অবসর ও শান্তি। অবসর ও শান্তির সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। Therese ও তাহার মাতাও রুসোর সহিত Hermitageএ বাস করিতে লাগিলেন।

রুসো চিরকাল ভালবাসার কাঙাল ছিলেন। নিজের স্নেহের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে দান করিতেন; স্বার্থ-চিন্তার লেশ তাঁহার ছিল না। কিন্তু সে ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদান কখনও প্রাপ্ত হন নাই। অন্তরের সমস্ত স্নেহ তিনি Thereseকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিকট যে স্নেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার অন্তর তৃপ্ত হয় নাই। Montmorencyর অরণ্যের বিজনতার মধ্যে তাঁহার স্মৃতির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইত এবং অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিত। তিনি লিখিয়াছেন—"বাঁচা ও ভালবাসা আমার কাছে অভিন্ন তবুও কেন আমাতে সম্পূর্ণ অনুরক্ত একজন বন্ধুও পাইলাম না? * * * কেন আমার অন্তর স্নেহে পূর্ণ ও সহজেই আবেগে বিচলিত হইলেও কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আমি ভালবাসিতে পারিলাম না? ভালবাসিবার ইচ্ছার আগুনে দগ্ধ হইতে হইতে বার্দ্ধক্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াও আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রকৃতপক্ষে বাঁচা আমার ঘটিয়া উঠিল না। * * * যদি আমার সুকোমল বৃত্তিনিচয়ের ব্যবহারই করিতে পারিব না, তবে কেন তাহা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? নিয়তি আমার ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে নাই; তাহার নিকট এখনও আমার কিছু প্রাপ্য আছে।"

জুন মাসে একদিন বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া রুসো চিন্তা করিতেছিলেন। নাইটিংগেল তখন মধুরস্বরে গান করিতেছিল; অদূরে স্রোতস্বতী কুলকুলনাদে বহিয়া যাইতেছিল। রুসোর দেহ আলস্যে অবশ ও মন স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া আসিল। অকস্মাৎ স্মৃতির দ্বার খুলিয়া গেল। তাঁহার প্রেমাতুর মনের সম্মুখে পূর্ব্ব-পরিচিতা সুন্দরীগণের জীবন্ত চিত্র ভাসিয়া আসিল। সুন্দরীগণ-পরিবেষ্টিত রুসোর প্রেমতৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিল, চিত্ত অস্থির হইল। অস্থিরতার মধ্যে মনে হইল তাঁহার প্রেমলীলার বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাস্তব জগতে প্রেম-পিপাসার পরিতৃপ্তি অসম্ভব জানিয়া কল্পনার জগতে মন ধাবিত হইল, স্বকীয় সৃষ্টির মধ্যে পরিতৃপ্তির সন্ধানে ছুটিল। তাঁহার অমর উপন্যাস La Nouvelle Helloiseএর নায়িকা জুলি ও ক্লেয়ার তখন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মানস চক্ষুর সমীপে আবির্ভূত হইল। রুসো গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেন। ১৭৬০ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ ঈর্ষাবশে গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। ভলটেয়ার অতি নীচ ও জঘন্য ভাষায় রুসোকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ ঐ সমস্ত সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া বিপুল সমাদরে গ্রন্থের অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

Hermitageএ রুসো বহুদিন বাস করিতে পারেন নাই, Madame d'epincyর সহিত কলহ করিয়া তিনি ১৭৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে Montmorencyতে উঠিয়া যান, এবং সেখানে Duke of Luxemburghএর আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। চারি পাঁচ বৎসর তিনি এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার La Nonvelle Helloise সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়। Letter to D' Alembert on the theatre, Emile ও Social Contractও এই সময়ে রচিত ও প্রকাশিত হয়।

Emile শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়, গ্রন্থে তাহারই আলোচনা আছে; এই শিক্ষা-প্রণালীতে আপত্তিজনক কিছু না থাকিলেও "The confession of a Savoyard Vieor" নামক অধ্যায়ে "প্রাকৃতিক ধর্ম্মের (natura

religion) যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা পাঠ করিয়া রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট উভয় সম্প্রদায়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

সভ্যতা তাঁহার মতে যাবতীয় অনর্থের মূল। সভ্যতার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুক্ত পরিবেশের মধ্যে শিশুর শিক্ষা হওয়া উচিত। সভ্য মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরাধীন। জন্মমাত্র তাহাকে কাপড় পরাইয়া দেওয়া হয়, মৃত্যু হইলে কফিনে বন্দী করা হয়। প্রকৃতি তাহার সন্তানদের শিক্ষার জন্য যে পথ অনুসরণ করে, তাহাই শিশুদিগের শিক্ষায় অবলম্বিত হওয়া উচিত। নানাবিধ অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলিয়া প্রকৃতি শিশুদিগের শরীর কষ্টসহ করিয়া তোলে—দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিতে শিক্ষা দেয়। শিশুদিগকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কষ্ট সহ্য করাই তাহাদিগের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত।

অভাব অপেক্ষা তাহা পূরণ করিবার শক্তি যাহার কম, তাহাকেই দুর্ব্বল বলে। এই দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইলে, অভাবপূরণের শক্তি অর্জন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

যে ব্যক্তি যাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম, তাহাই ইচ্ছা করে এবং যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করে, সেই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন। পরনির্ভরতা দ্বিবিধ—দ্রব্যের উপর নির্ভর ও মানুষের উপর নির্ভর। প্রথমটির কোনও নৈতিক ফল নাই, কিন্তু দ্বিতীয়টি যাবতীয় দোষের আকর। শিশুদিগকে মানুষের উপর নির্ভর হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। শিশু যাহা চায় তাহাই তাহাকে দিওনা; যাহা তাহার প্রয়োজন, কেবল তাহাই দেওয়া উচিত। প্রকৃতির প্রথম তাড়নায় কোনও দোষ নাই। "আদিম পাপ" (original sin) বলিয়া মানুষের অন্তরে কোনও পাপ-প্রবৃত্তি নাই। কিরূপে কেন পাপ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, তাহা লক্ষ্য করা যায়। শিশুদিগকে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি, তাহা শিক্ষা না দিয়া, তাহাদের অন্তরকে পাপের স্পর্শ হইতে রক্ষা করাই উচিত। শিশুর উপযুক্ত একমাত্র নৈতিক শিক্ষা এই—"কাহাকেও আঘাত করিও না।"

জ্ঞানের অভাব হইতে কাহারও কোনও অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ভুলের ফল মারাত্মক। শিশুদের শিক্ষার জন্য পুস্তকের প্রয়োজন নাই। তাহাদের ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিয়া তাহারা শিখুক। সমগ্র পৃথিবীই তাহাদের পুস্তক, যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই তাহাদের শিক্ষার বিষয়। প্রাকৃতিক ব্যাপার সকল তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে দাও; তাহাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে দাও, শীঘ্র শীঘ্র সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। আপনার চেষ্টাতেই তাহাকে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে দিও। অনেক বিষয় তাহাকে শিখাইও না। কিন্তু কোনও বিষয়েই ভুল শিখিতে দিও না। স্মৃতি ও বিচারশক্তি ধীরে ধীরে আসে, কিন্তু মিথ্যা সংস্কার আসে দলে দলে। তাহা হইতে শিশুদিগকে রক্ষা করা চাই। যদি কোনও পুস্তক শিশুদিগকে দিতেই হয়, তবে সে পুস্তক Robinson Crusoe.

সামাজিক যে সকল সম্বন্ধ শিশু বুঝিতে অক্ষম, সে সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করিও না। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষ যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তাহা বুঝাইবার জন্য শিল্পের দিকে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট কর। কৃষিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সম্মানজনক শিল্প; তাহার পরেই ধাতু-শিল্প, তাহার পরে সূত্রধরের কর্ম্ম। এইরূপে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের জ্ঞান হইবে।

যদি এমন অবস্থা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, যে কাহারও পক্ষে অন্যায় কর্ম্ম না করিয়া জীবনধারণ অসম্ভব হয়, এবং লোকে অন্যায় কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে অন্যায়কারীর ফাঁসী না দিয়া যাহারা তাহাকে অন্যায় করিতে বাধ্য করেছে তাহাদেরই ফাঁসী দেওয়া উচিত। বর্ত্তমান সামাজিক শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিয়া থাকিও না। এ শৃঙ্খলা চিরস্থায়ী নহে। ভবিষ্যতে সমাজে কি বিপ্লব আসিতে পারে, তাহা বলা যায় না। সে বিপ্লবে ধনী দরিদ্র হইয়া যাইতে পারে, দরিদ্র ধনী হইতে পারে; রাজা সাধারণ লোকের একজন হইতে পারেন। অদৃষ্টের আঘাত কি এতই বিরল, যে তাহার আঘাত তোমার সন্তানদিগের উপর পড়িবে না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? সে সঙ্কটকাল অদূরবর্ত্তী। বিপ্লবের ধারে আমরা দাঁড়াইয়া আছি। সমাজের বাহিরে নির্জ্জনে যে বাস করে, সে যেরূপ ইচ্ছা সেই ভাবেই বাস করিতে পারে। কাহারও নিকট তাহার কোনও ঋণ নাই। কিন্তু সমাজে যে বাস করে, হয় তাহাকে অন্যের ব্যয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, অথবা তাহার জীবিকার জন্য যাহা ব্যয় হয়, তাহা নিজের পরিশ্রম দ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে। ধনী, নির্ধন, সবল অথবা দুর্ব্বল—সমাজের প্রত্যেককেই খাটিতে হইবে। যে পরিশ্রম করে না, সে তস্কর। বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেও, সকল মানুষই সমান। যে শ্রেণীতে অধিকসংখ্যক লোক, সেই শ্রেণীই অধিক সম্মান পাইবার উপযুক্ত।

শিশুদিগের সঙ্গীনির্ব্বাচন এমন ভাবে করিতে হইবে, যে তাহারা সঙ্গীদিগকে ভাল বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু সংসারের সহিত তাহার পরিচয় এমন ভাবে করিয়া দিতে হইবে যে, সংসারে যাহা ঘটে, তাহার সকলই সে মন্দ মনে করে। মানুষ যে স্বভাবতঃ ভাল, তাহা শিশুকে বুঝিতে দিতে হইবে, কিন্তু সমাজ কিরূপে মানুষকে দূষিত করে তাহাও দেখাইতে হইবে। সাবধানে চলিতে, বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সম্মান করিতে, মিতভাষী হইতে, সত্য বলিতে সাহসী হইতে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবে।

শিশুদিগকে বিবাদ-বিসম্বাদ ঘৃণা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। পরের উপর প্রভুত্ব করিয়া অথবা অন্যের কষ্ট দেখিয়া যেন তাহারা আনন্দ না পায়। কষ্ট দেখিয়া স্বভাবতঃ যেন তাহাদের কষ্ট হয়।

মানুষকে অসভ্যে পরিণত করা, অথবা পুনরায় জঙ্গলে পাঠাইয়া দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। সংস্কার অথবা অদম্য প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত না হইয়া তাহারা যুক্তিসম্মত জীবনযাপন করে ইহাই আমার লক্ষ্য। চক্ষু দ্বারা যেমন দেখা যায়, তেমনি হৃদয় দ্বারা অনুভব করা চাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষার প্রয়োজন রুসো স্বীকার করেন নাই। অল্প

বয়সে ভুল শিক্ষা পাইবার বিপদ আছে। "মুক্তির জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রয়োজন"...ইহা ঠিক ভাবে বুঝিতে না পারার জন্যই পরমঅসহিষ্ণুতার উদ্ভব হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলেও মুক্তি ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভবপর। শিশু ও উন্মাদদিগের ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। কেহ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক অবিশ্বাস পোষণ না করে, তাহা হইলে বৃদ্ধ অবস্থায় অবিশ্বাসী হইলেও পরলোকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য হইতে তাহার বঞ্চিত হইবার কারণ নাই। যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহাদিগের নিকট সত্য-প্রচারের ফলে ভুল প্রচার হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকা অপেক্ষা কোন ধারণা না থাকাই ভাল। ঈশ্বরকে অপমান করা অপেক্ষা তাহাকে দেখিতে না পাওয়াই ভাল।

Emile ও Social Contract—উভয় গ্রন্থই ১৭৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থ হইতে ৮০০০ ফ্রাঙ্ক লাভ হইবে বলিয়া রুসো আশা করিয়াছিলেন। এই অর্থ হস্তগত হইলে তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজের একখানা সত্য জীবনচরিত লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিকে বিপদের মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল। বহুসংখ্যক শত্রু তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছিল। তাঁহার "Julie" গ্রন্থের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন "রাজপুত্রের উপপত্নী (Mistress of a Prince) অপেক্ষা কয়লা-খনির শ্রমিকও অধিক সম্মানের উপযুক্ত।" ইহা পড়িয়া রাজার উপপত্নী Madame de Pomapadour তাঁহার উপর ভীষণ রুষ্ট হন। প্রধান মন্ত্রী Choiseulও তাহার উপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। Encyclopedist গণ তাঁহাকে দলত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহার দেশব্যাপী খ্যাতি ভলটেয়ারের অসহ্য হইয়াছিল। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ তাঁহার প্রচারিত মত দেশের অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণই তাঁহার "প্রাকৃতিক ধর্ম্মের" প্রচারে স্ব স্ব ধর্ম্মের বিপদ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সময়ে Encyclopedist ও খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসীদিগের মধ্যে ভীষণ কলহ চলিতেছিল। রুসো লিখিয়াছেন "উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মত তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। উপযুক্ত নেতা কোনও দলের ছিল না তাই রক্ষা, নতুবা দেশে অন্তর্বিদ্রোহ সংঘটিত হইত। নিষ্করুণ পরমঅসহিষ্ণুতাজাত ধর্ম্মসংক্রান্ত যুদ্ধের ফল কি হইত, তাহা ঈশ্বরই জানেন।" এই বিরোধ শান্তির জন্যই রুসো Nouvelle Heioice এবং Emile গ্রন্থে পরমত সহ্য করিবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছিল বিপরীত। উভয় দল মিলিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশে উদ্যত হইল। রুসোর চতুর্দ্দিকে যে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, রুসো তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। নির্জ্জন পল্লী-নিবাসে নিজের গ্রন্থের সফলতার আনন্দে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতেছিল। মেঘ-গর্জ্জন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। যখন বিপদের কথা জানিতে পারিলেন—অপরিসীম ভয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং যেখানে বিপদ ছিল না, সেখানেও বিপদ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি আরম্ভ হইল। সকলেই তাঁহার শত্রু, সকলেই তাহাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, এই বিশ্বাসে তাহার মনের সমতা হারাইয়া ফেলিলেন—উৎপীড়নের ভীতি তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। তাহার মূত্রাশয়ের পীড়া এই উত্তেজনায় অসম্ভব রূপে বাড়িয়া উঠিল। যন্ত্রণায় অনেক সময় আত্মহত্যার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। Emile গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল হল্যাণ্ডে। হল্যাণ্ডে গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইবার পরে কুড়িদিন গত না হইতেই প্যারিসের পার্লিয়ামেণ্ট রুসোর নিকট হইতে কোনও কৈফিয়ত না লইয়াই উক্ত গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলিবার এবং রুসোকে বন্দী করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। ৯ই জুন আদেশ প্রদত্ত হয়, ১০ই তারিখে Palais de Justiceএর সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থ প্রথমে ছিড়িয়া ফেলা হইল, তারপরে আগুনে পোড়ানো হইল। অনেকে প্রকাশ্য ভাবেই বলিতে লাগিল, গ্রন্থের সঙ্গে গ্রন্থকারকে পোড়াইয়া মারা উচিত। রুসোর সম্ভ্রান্ত বন্ধুগণ তাহাকে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। ১১ই জুনই রুসো পলায়ন করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি নিরাপদ হইতে পারিলেন না। তাঁহার শত্রুগণ সেখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করিল। ৯ দিন পরে জেনিভাতেও তাহার গ্রন্থ আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হয়। বার্ণ ও নিউস্যাটল ও জেনিভার অনুসরণ করিল। সমস্ত ইউরোপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিসম্পাত উচ্চারিত হইতে লাগিল। এরূপ প্রচণ্ড রোষ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। সর্ব্বত্রই রুসোকে অবিশ্বাসী নাস্তিক, উন্মাদ, হিংস্রপশু, ব্যাঘ্র প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করিতে লাগিল। রুসোর মনে হইল, সমগ্র পৃথিবী তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। রুসোর অন্তর ছিল অতি দুর্ব্বল ও কোমল। ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে তিনি ভুগিতেছিলেন। এরকম অবস্থায় যে ভীষণ বিদ্বেষের বন্যা তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল, তাহার চাপে তিনি যে বুদ্ধিবিবেচনা হারাইয়া ফেলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উৎপীড়ন-ভীতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত।

সুইজারল্যাণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া রুসো প্রাসিয়ার রাজা Frederick the great এর রাজ্যে Motiers গ্রামে আশ্রয় লইলেন। আড়াই বৎসর তিনি তথায় বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে অবস্থান কালে জেনিভার রাষ্ট্র ও চার্চ্চকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লেখার জন্য পুরোহিতেরা ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। Motier এর গীর্জ্জায় তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল এবং গীর্জ্জার পুলপিট হইতে ধর্ম্মোপদেষ্টা তাঁহাকে anti-Christ (খৃষ্টশত্রু) বলিয়া অভিহিত করিলেন। সাধারণ লোক উত্তেজিত হইয়া পথে ঘাটে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। একদিন রাত্রিকালে বহুসংখ্যক লোক মিলিত হইয়া তাহার গৃহ আক্রমণ করিলে তিনি পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। Bienne হ্রদের তীরে একমাস বাস করিবার পরে Berne নগরের শাসনকর্ত্তাগণের আদেশে তাঁহাকে সে স্থানও ত্যাগ করিতে হইল। রুসো ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দার্শনিক পণ্ডিত ডেভিড হিউম রুসোকে ইংলণ্ডে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই বিপদের সময় তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। ইংলণ্ডে সকলেই রুসোকে সাদরে গ্রহণ করিল। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জ তাঁহাকে বৃত্তি দান করিলেন। প্রসিদ্ধ বক্তা বার্কের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল, কিন্তু সে বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নাই। বার্ক লিখিয়াছেন "একমাত্র আত্মাভিমান ভিন্ন, তাঁহার হৃদয়কে প্রভাবিত অথবা বুদ্ধিকে চালিত করিবার উপযোগী কোনও নীতি (Principle) তাঁহার ছিল না।" হিউম বহুদিন পর্য্যন্ত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে ভালবাসিতেন, এবং শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু রুসোর উৎপীড়নভীতি তাঁহাকে সকলকেই অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস হইল, হিউমও তাঁহার শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। মাঝে মাঝে এই অমূলক ধারণায় লজ্জিত হইয়া তিনি হিউমকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেন "না না। হিউম বিশ্বাসঘাতক নয়।" কিন্তু অবশেষে অবিশ্বাসেরই জয় হইল, রুসো পলায়ন করিলেন। হিউম তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "তাঁহার সমস্ত জীবনই বেদনার (feeling) জীবন। তাঁহার বেদনাবোধ এত তীব্র হইতে দেখিয়াছি, যে অন্য কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। কিন্তু এই বেদনাবোধ তাঁহাকে সুখ অপেক্ষা দুঃখের তীব্রতর অনুভূতিই দিয়াছে। যদি কোনও লোকের পরিচ্ছদের সহিত তাহার শরীর হইতে ত্বকও খুলিয়া লওয়া হয় এবং সেই অবস্থায় সে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সম্মুখীন হয় তাহা হইলে তাহার যে অবস্থা হয়, রুসোর অবস্থাও তদ্রূপ।"

ইংলণ্ড হইতে পলায়নের পরে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রুসো স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তাহাকে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি প্রদত্ত হইল। প্যারিসে একটি সামান্য গৃহে স্বরলিপি নকল করিয়া তিনি দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি তাহার জীবনচরিত লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। এই জীবনচরিতের নাম দিয়াছিলেন Confessions (স্বীকারোক্তি)। এই গ্রন্থ তিনি কয়েকজন বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু Madame d'Epincy ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহাদের গুপ্তকথা প্রকাশিত হইবার ভয়ে পুলিশের সাহায্যে ইহার পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার চিঠিপত্রও গবর্ণমেণ্টের আদেশে খুলিয়া পড়া হইতে লাগিল। ফলে রুসোর মানসিকব্যাধি বাড়িয়া চলিল। তিনি "নির্জ্জন দ্বীপে রবিনসনক্রুসো" অপেক্ষা প্যারিসে আপনাকে অধিকতর নিঃসঙ্গ মনে করিতে লাগিলেন। সমস্ত পৃথিবী তাঁহাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করে, এই বিশ্বাসে রুসো "Dialogues de Rousseau Jean Jacks" লিখিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের তিনি যে ভীষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উন্মাদের প্রলাপ মাত্র। তাহার হতাশার আর্ত্তনাদ কোনও মানুষের কর্ণে প্রবেশ করিবে না, এই বিশ্বাসে তিনি প্যারিসের Notre Dame গীর্জ্জায় বেদীর উপর তাহার গ্রন্থ ঈশ্বরকে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বেদীর পথ রুদ্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই আঘাতে তাহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হইল ঈশ্বরও তাঁহার প্রতি বিরূপ। গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসের ফলে তখন তাঁহার মনে হইল, ঈশ্বর যখন তাহার উপর উৎপীড়ন হইতে দিতেছেন, তখন ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার "সনাতন আদেশের" (eternal decrees) অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং সেই আদেশের নিকট দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত নত হওয়া ভিন্ন তাহার করণীয় কিছু নাই। এই বিশ্বাসে তিনি কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। এই সময়ে Les Reveries du promeneur solitare গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। (১৭৭৬ সালে এই গ্রন্থ আরব্ধ হয়, কিন্তু শেষ হয় নাই) এই গ্রন্থে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন "পৃথিবীতে আমি একা। ভাই নাই, প্রতিবাসী নাই, বন্ধু নাই, সখা নাই, আমি ভিন্ন আমার কেহই নাই। মানবের মধ্যে যে ছিল সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহশীল ও মিশুক, সকলেই তাহাকে বর্জন করিয়াছে।......কিন্তু গহ্বরের তলদেশে হতভাগ্য মরণশীল মানুষ আমি শান্তই আছি—শান্ত কিন্তু ঈশ্বরের মতই সুখ দুঃখের অতীত।" তাঁহার Reveri'es সম্বন্ধে Roman Rolland লিখিয়াছেন "এই গ্রন্থে তাহার কলা-কৌশলের কোনও অপকর্ষের পরিচয় নাই। বরং তাহার বিশুদ্ধিই দৃষ্ট হয়। অরণ্যের নিস্তব্ধতার মধ্যে বিষাদমগ্ন বৃদ্ধ নাইটিংগালের মধুর সঙ্গীতের মতই রুসোর এই শেষ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার জীবনের অল্পসংখ্যক সুখের দিনগুলি আলোচনা করিয়াছেন—যখন তিনি প্রকৃতির অঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সঙ্গে একীভূত হইয়াছিলেন। অন্য সমস্ত অনুভূতিবর্জিত হইয়া, সত্তার গভীরে (depths of Being) মনঃ নিমজ্জিত করিয়া আপনার স্বরূপের আলিঙ্গনে বদ্ধ (Entwined with himself) হইয়া তিনি যে বিপুল উল্লাস অনুভব করিয়াছিলেন, সেই প্রাচ্য উল্লাস (ecstasy) পাশ্চাত্যদেশের কেহই তাহার মত অনুভব করে নাই। জীবনের শেষের দিকে তিনি উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনা করিতেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অপেক্ষা পৃথিবীর প্রাণের সংস্পর্শ এবং মাঠ, জলাশয়, বন, নির্জনতা, সর্ব্বোপরি শান্তি ও বিশ্রামের যে স্মৃতি এই আলোচনা হইতে উদ্বুদ্ধ হইত, তাহাই তাহার কাম্য ছিল।" সঙ্গীতেও তিনি আনন্দ পাইতেন।

১৭৭৮ সালের ২০মে তারিখে M.de Gerardin নামে একজন ধনী ভদ্রলোক রুসোকে তাহার দরিদ্র আবাস হইতে লইয়া গিয়া প্যারিস হইতে নয় মাইল দূরে Ermenville নামক গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্বর্গতুল্য উদ্যান গৃহে রুসো পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার স্বাস্থ্যের ও কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ২রা জুন তারিখে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বে রুসো যখন তাঁহার কেহই নাই বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনি জয় করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহার গ্রন্থাবলীর ছয় সংস্করণ এবং La nouvelle Heloiseএর দশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এবং তাহার বাণী বহুলপ্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৮২ সালে তাঁহার Confessionsএর প্রথম ভাগ এবং Reveries প্রকাশিত হয়, এবং তাহার দ্বারা পাঠকের মন বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়। ১৭৮০ সালে ফ্রান্সের রাণী ও রাজপুত্রগণ সহ অর্দ্ধ ফ্রান্স Peupliers দ্বীপে যেখানে তাঁহার দেহ সমাহিত হইয়াছিল, তথায় গিয়া আপনাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করিয়াছিল এবং তদবধি এই উন্মাদ পণ্ডিতের সমাধিক্ষেত্র ফ্রান্সের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। "দার্শনিক"গণের বিষবিদগ্ধ সমালোচনায় তাঁহার যশঃ বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ফ্রান্সের যুবকগণ দেখিয়াছিল ভার্ণির অধিবাসী ভলটেয়ার রুসোর মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু দুঃখকষ্টের মধ্যেও স্বীয় মত হইতে বিচ্যুত না হইয়া রুসো মৃত্যু পর্য্যন্ত সাধারণের একজন থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। ভাবী ফরাসী বিপ্লবের নায়কগণ —যাঁহারা পরে পরস্পরের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন—বার্নেস্, ড্যান্টন, কার্ণট, বিলড্, ভ্যারেন্, কুজন, ম্যানন রোলাণ্ড—সকলেই মিলিত হইয়া রুসোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রুসোর Discourse on Inequalityর ব্যাখ্যা করিয়া Brissot কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। Robespierre রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রুসোর মত অনুসরণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং ১৭৯৪ সালে যখন তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতালাভ করিয়াছিলেন, তখন ৭ই মে তারিখের প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় তিনি রুসোর প্রতি Encyclopedistগণের শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের পক্ষ হইতে তিনি রুসোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহাকে বিপ্লবের অগ্রদূত এবং মানব জাতির শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ বৈপ্লবিকগণ বিপুল সম্মানের সহিত তাঁহার দেহ নির্জন Peupliers দ্বীপ হইতে আনিয়া প্যারিসের Pantheonএ সমাহিত করিয়াছিল। Constituent Assembly গৃহে তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি ফ্রাঙ্কলিন ও ওয়াসিংটনের মূর্ত্তির সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

রাশি ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

মিথুন রাশি

আপনার জন্মরাশি যদি মিথুন হয়, অর্থাৎ চন্দ্র যে সময় আকাশে মিথুন নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন, সেই সময় যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহলে এই রকম ফল হবে।

প্রকৃতি

আপনি ইঙ্গিতজ্ঞ ও মেধাবী। যে কোন বিষয় চট্ করে বোঝবার ও শেখবার শক্তি আপনার মধ্যে আছে। কিন্তু আপনার মধ্যে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা যতটা আছে, গভীরতা ঠিক ততটা নেই। কাজেই বহুতর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেও সে জ্ঞান কতকটা ভাসা ভাসা ধরণের হবে।

শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের দিকে আপনার একটা সহজ আকর্ষণ থাকবে এবং বহুবিষয় জানবার ও শেখবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আপনার মধ্যে লক্ষিত হবে। আপনার প্রকৃতির বিকাশ হবে হৃদয়ের মধ্য দিয়ে ততটা নয়, যতটা বুদ্ধির মধ্য দিয়ে।

অনেক কিছু জানার ইচ্ছা আছে ব'লে, আপনার মধ্যে কম বেশী অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য লক্ষিত হবে এবং ঠিক একই বিষয় নিয়ে লেগে থাকা আপনার পোষাবে না। কাজেই লোকে আপনাকে একটু অব্যবস্থিত-চিত্ত ভাবতে পারে।

প্রত্যেক ব্যাপারে বাইরের খুঁটিনাটি আপনি যতটা লক্ষ্য করবেন, তার ভিতরকার তত্ত্বের দিকে আপনার ততটা লক্ষ্য থাকবে না। আপনি যদি শিল্পী বা সাহিত্যিক হন, তাহলে আপনার রচনা বা শিল্প মনোজ্ঞ হলেও, তার মধ্যে খুব বেশী গভীরতা পাওয়া যাবে না।

আপনি পরিবর্ত্তনপ্রিয়। একই জায়গায় একই ভাবে বেশীদিন থাকা, অথবা দীর্ঘদিন ধরে একই কাজে আত্মনিয়োগ করা আপনার প্রকৃতির বিরোধী; কি লেখাপড়ার ব্যাপারে, কি বিষয়কর্ম্মে, কি পারিবারিক বা সামাজিক ব্যাপারে সর্ব্বত্রই আপনি চাইবেন পরিবর্ত্তন। একই সঙ্গে একাধিক ব্যাপার নিয়ে থাকতে না পারলে, আপনার মন যেন স্বস্তি পায় না এবং আপনার এ শক্তিও আছে যাতে আপনি মনকে চট্ করে এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চালনা করতে পারেন।

আপনার এই প্রকৃতির জন্য আপনার মধ্যে বহুমুখীনতা দেখা যেতে পারে, কিন্তু এই জন্যই অনেক সময় আপনার মধ্যে অধ্যবসায়ের অভাব ও অধীরতা দেখা যাবে, যাতে ক'রে কোন ব্যাপার সম্বন্ধে সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান লাভ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

আপনি সাধারণতঃ ঘোরাফেরা করতে ভালবাসেন এবং আপনার একাধিক স্বতন্ত্র বাসস্থান একাধিক স্বতন্ত্র পারিবারিক বন্ধন থাকা খুবই সম্ভব এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবের একাধিক কাজে আত্মনিয়োগ করাও আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়।

আপনি সাধারণতঃ আনন্দপ্রিয় হবেন, সেইজন্য আপনার সামাজিক ব্যবহার প্রায়ই মধুর হবে এবং বিবাদ বা বিতণ্ডা উপস্থিত হ'লে হয় সে স্থান ত্যাগ করবেন, না হয় বুদ্ধি কৌশলের দ্বারা বিসম্বাদের কারণ দূর
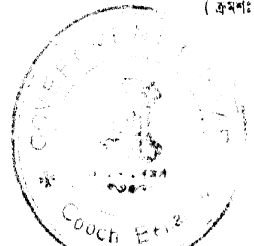
করার চেষ্টা করবেন। প্রত্যক্ষভাবে বিরোধ করা আপনার প্রকৃতির বিরোধী।

আপনার মধ্যে সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করার শক্তি যথেষ্ট আছে এবং তর্ক বিতর্কেও আপনার কম বেশী পটুত্ব দেখা যাবে। আপনি অধিকাংশ ব্যাপারেই যুক্তিতর্কের সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করবেন এবং যা যুক্তিতর্কের বিষয় নয়; যা প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর নির্ভর করে তাকেও যুক্তিতর্কের গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে আসতে চাইবেন।

পরের প্রশংসার উপর আপনার একটা লোভ আছে এবং অনুচর-সহচরের প্রীতির চেয়ে তাদের প্রশংসা অর্জন করাই আপনার কাম্য হবে বেশী। অনেকক্ষেত্রে অনুচর সহচরের মনোভাব হিসেবে আপনার নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করবেন। সেই জন্য সঙ্গ নির্বাচনে আপনার যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিত। সৎসঙ্গে পড়লে অনেক সময় যেমন আপনি আপনার বাসনা সংযত করতে পারবেন; অসৎ সংসর্গে পড়লে তেমনি আপনার নীতি জ্ঞানের বিরুদ্ধে কাজ করতেও আটকাবে না।

আপনার মধ্যে যৌন আকর্ষণ প্রবল হওয়াই সম্ভব। তবে তাকে যদি ঊর্দ্ধপথে চালনা করতে পারেন, তাহ'লে আপনার বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হ'তে পারে। সাধারণতঃ কিন্তু তা আপনাকে যৌন ব্যাপারে প্রায়ই একনিষ্ঠ থাকতে দেবে না।

অর্থ-ভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনার অনেক উত্থান পতন ঘটবে। কোষ্ঠীতে যদি বিশেষ ভাল যোগ না থাকে তাহ'লে আর্থিক ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব প্রায়ই লক্ষিত হবে। ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্য দুইই আপনাকে ভোগ করতে হবে এবং অনেক সময় আপনার নিজের ইচ্ছাতেই ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য বরণ করতে পারেন। নিজের বুদ্ধি-কৌশলে আপনি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন, কিন্তু অর্থ আপনি যতই উপার্জন করুন, অর্থ সম্বন্ধে কখনই ঠিক নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন না। আপনার পারিবারিক ব্যাপারে এবং স্ত্রী-পুত্র বা মাতার জন্য অর্থনাশ বা সম্পত্তিহানি হ'তে পারে। অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে অনেক সময় আপনাকে কৌশল বা কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিতে হবে।

কর্ম-জীবন

কর্ম-জীবনে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। কর্মের ব্যাপারে অনেক সময় ওঠাপড়া বা পরিবর্তন চলতে পারে। আপনার উচ্চাভিলাষ নেই তা নয়, কিন্তু সে উচ্চাভিলাষ অনেক সময় ঠিক নির্দিষ্ট পথে চলতে পারবে না। আপনার নিজের মানসিক অবস্থার জন্যই হোক্, অথবা দৈহিক অস্বাস্থ্যের জন্যই হোক্, আপনার কর্ম-বিপর্যয় ঘটতে পারে। তা ছাড়া কর্মস্থানে আপনার অনেক শত্রুও থাকবে। আপনার সহকর্মী এবং অধীনস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা অনেক সময় প্রকাশ্যে শত্রুতা হবে এবং আপনার শত্রুরা আপনার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন নিয়ে মিথ্যা কুৎসা বা অপবাদ রটনা করতে পারে, যাতে করে আপনার কর্মস্থলে কর্ম-বিপর্যয় এবং সমাজে সম্ভ্রমহানি হ'তে পারে। আপনার মধ্যে নানা রকম কর্মের যোগ্যতা আছে। আইনজ্ঞ চিকিৎসক, লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বক্তা সাংবাদিক প্রভৃতির কাজ আপনি যেমন যোগ্যতার সঙ্গে করতে পারেন, তেমনি দালালী দৌত্য কার্য, কেরাণীর কাজ, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কাজের যোগ্যতাও আপনার মধ্যে আছে। মোট কথা যে সকল কাজে হাতের কৌশল ও নৈপুণ্য অথবা মস্তিষ্ক চালনা দরকার সে সব কাজে আপনার বিশেষ যোগ্যতা প্রকাশ পাবে। আপনার প্রধান সমস্যা হবে আপনার মন স্থির করা নিয়ে। আপনি মন স্থির ক'রে যদি এর যে কোনটাতে আত্মনিয়োগ করতে পারেন তাহ'লে শিক্ষা ও আবেষ্টনের অনুপাতে আপনার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী।

পারিবারিক

যদিও আপনার অনেক আত্মীয় কুটুম্ব থাকতে পারে, তাহ'লেও তাঁদের সঙ্গে ঠিক প্রীতির বন্ধন থাকা সম্ভব হবে না। অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ মৌখিক শিষ্টাচারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে।

পারিবারিক ব্যাপারে আপনি বিশেষ ভাগ্যশালী হবেন না। অনেক সময় ইচ্ছা করেই হোক্ বা বাধ্য হ'য়েই হোক্, আপনাকে পরিবার হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে হবে। আপনার পরিবার মধ্যে কোন গুপ্ত রহস্য থাকতে পারে। পরিবারে অথবা গৃহস্থালির ব্যাপারে কোন রকম বৈচিত্র্য বা অসাধারণত্ব থাকাও অসম্ভব নয়। পারিবারিক আবেষ্টন আপনার উন্নতি বা সাফল্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু আপনি আপনার সন্তানদের উপর খুব স্নেহশীল হবেন এবং তাদের উন্নতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেও পরাঙ্মুখ হবেন না। সন্তানের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ উন্নতিশীল হবেন।

স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে আপনার মধ্যে দৃঢ় নিষ্ঠা থাকা কঠিন হবে। আপনি সে সম্বন্ধে হয় একেবারে উদাসীন হ'য়ে উঠবেন, না হয় ঘন ঘন পরিবর্তন কামনা করবেন। মোটকথা স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে আপনাকে কম-বেশী দুঃখ ভোগ করতে হবে।

বিবাহ

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'বে বিবাহে বাধাবিঘ্ন বা বিলম্ব হ'তে পারে। বিবাহের পর স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ একেবারে উদাসীন হ'য়ে উঠতে পারে। মোট কথা আপনার এই রাশি স্থিরতর দাম্পত্য জীবনের অনুকূল নয়। আপনার স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) মতামতের সঙ্গে অনেক সময় আপনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবেন না এবং তা নিয়ে কম বেশি খিটিমিটি বা অশান্তিও চলতে পারে। যদি আপনার স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে পারেন, তাহ'লেই দাম্পত্য জীবনে কিছু শান্তি পাবেন, নতুবা অশান্তি কম-বেশী হবেই। যাঁর জন্ম-মাস আষাঢ়, কার্তিক, পৌষ অথবা ফাল্গুন, কিম্বা যাঁর জন্মতিথি

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ বা শুক্লপক্ষের অষ্টমী এরকম কারো সঙ্গে বিবাহ হ'লে আপনার দাম্পত্য জীবনের অশান্তি অনেক কমতে পারে।

বন্ধুত্ব

আপনার অনুচর-পরিচরের সংখ্যা বহু হবে এবং কোন বন্ধুর সঙ্গে আপনার গভীর স্নেহের বন্ধন থাকবে। সহকর্মীদের মধ্যেও আপনার দু'চারজন বিশ্বস্ত বন্ধু থাকবে কিন্তু বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎ আপনার ঘোরতর শত্রু হ'য়ে দাঁড়াবে এবং নানারকমে আপনাকে বিব্রত ও অপদস্থ করবার চেষ্টা করবে। এই জন্য বন্ধুত্বের ব্যাপারে আপনি যেমন আনন্দও পাবেন তেমনি দুঃখ ও মনস্তাপও ভোগ করবেন। আপনার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব তাঁদের সঙ্গে যাঁদের জন্ম মাস আষাঢ়, কার্তিক, অথবা ফাল্গুন এবং যাদের জন্মতিথি কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ কিম্বা শুক্লপক্ষের অষ্টমী।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনার একটা উদাসীনতা থাকা সম্ভব। অনেক সময় পীড়ার সূত্রপাতে আপনি তা অগ্রাহ্য করে চলার দরুণ পীড়া গুরুতর হ'তে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। আপনার চর্মরোগ, রক্ত-সংক্রান্ত পীড়া ও স্নায়বিক ব্যাধির প্রবণতা আছে। অতিরিক্ত উত্তেজনা অথবা মানসিক পরিশ্রমের জন্য স্নায়ুবৈকল্য বা মস্তিষ্কের পীড়া হ'তে পারে। সে সম্বন্ধেও সতর্কতা আবশ্যক। নিজের অবিবেচনা; অবহেলা ও কুচিকিৎসা আপনার স্বাস্থ্যহানির কারণ হ'তে পারে।

অন্যান্য ব্যাপার

আপনার ভ্রমণের অনেক সুযোগ উপস্থিত হবে এবং অনেক সময় ধর্মোপলক্ষে তীর্থভ্রমণও হ'তে পারে। তা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ বা স্থান পরিবর্তন প্রায়ই হবে। আপনার দূরদেশে যাত্রাও হ'তে পারে, এমন কি দূর প্রবাসে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকাল বাসও করতে পারেন। বিদেশে বা ভ্রমণের সময় অনেক অসাধারণ বা বিচিত্র ঘটনা ঘটতে পারে, যার কোনটা প্রীতিকর কোনটা বা অপ্রীতিকর।

স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ১২, ২৪, ৩৬, ৪৮ এই সকল বর্ষে আপনার নিজের অথবা পরিবার মধ্যে কারো কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ৩, ৬, ১৫, ১৮, ২৭, ৩০, ৩৯, ৪২ এই সকল বর্ষগুলিতে আনন্দজনক কোন অভিজ্ঞতা হ'তে পারে।

বর্ণ

আপনার প্রীতিপ্রদ ও সৌভাগ্যবর্দ্ধক বর্ণ হচ্ছে গাঢ় সবুজ এবং সবুজ রঙের সব রকম প্রকারভেদ। ছাই রঙ্ অথবা শ্লেট রঙও আপনার উপযোগী।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন পান্না, সবুজ Asct হরিৎক্ষেত্র বৈদুর্য্যেগ (Cat's eye)।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জন কয়েকের নাম—শ্রীশঙ্করাচার্য, এনি বেসান্ত, কবি বায়রণ, কবি অক্ষয় বড়াল, প্রসিদ্ধ গায়ক লালচাঁদ বড়াল, মসিঁয়ে লাফায়েত, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, ডাক্তার বামনদাস মুখার্জি, জাস্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র, মহারাজা জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্বামী শিবানন্দ, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ প্রভৃতি।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের সর্ব্ববৃহৎ ধার্মিক মেলা—কুম্ভমেলা এইবার হরিদ্বারে বিশেষ জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। স্বাধীন ভারতে এইটিই ইহার প্রথম অধিবেশন। কুম্ভমেলা ভারতের জাতীয় মহামেলা। লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণের আবেগে সমবেত হয়—এই মহামেলা উপলক্ষে ভারতের চারিটি প্রান্তে প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী এবং নাসিকে। কে জানে কোন সুদূর অতীতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এই মহান্ প্রেরণা ও উদ্দীপনাময়ী শুভ তিথির আবির্ভাবে আসমুদ্র-হিমাচলবাসী হিন্দু নরনারীর প্রাণে এই প্রবল ধর্ম্মোন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিহাসও তাহার পরিচয় দিতে অপারগ।

কুম্ভমেলার উৎপত্তি সম্পর্কে পুরাণোক্ত ঘটনায় পাই—ক্ষীর সমুদ্র মন্থনে অমৃতকুম্ভ হস্তে ধন্বন্তরি আবির্ভূত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট অমৃতকুম্ভ সমর্পণ করায় দেবাসুরে সংগ্রাম বাধে। দেবরাজ ইন্দ্র তদীয় পুত্র জয়ন্তকে সেই অমৃত কুম্ভ প্রদান করিলে—জয়ন্ত তাহা মর্ত্তের চারিটি স্থানে একদিন করিয়া লুকাইয়া রাখেন। দেবতাগণের একদিনে মানুষের দ্বাদশ বৎসর, তাই প্রতি বার বৎসরে উক্ত চারিটি স্থানে অমৃত কুম্ভযোগ উপলক্ষে মহামেলার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে।

এই কুম্ভমেলা উপলক্ষে বিশেষ করিয়া হরিদ্বার এবং প্রয়াগে সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। এইবারও গিরি-বন-কান্তার অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি উল্লঙ্ঘন করিয়া দূর দূরান্তর হইতে সন্ন্যাসীগণ আসিয়াছিলেন দলে দলে—এই মহামেলায় সম্মিলিত হইতে। কী গভীর উৎকণ্ঠা আবেগ প্রাণে লইয়া—এই সাধু সমাজ মেলায় সমাগত হয়—তাহা যিনি না দেখিয়াছেন—তাঁহার কল্পনাতীত।

উত্তরাখণ্ডের পথের দুর্গমতা, শৈত্যের প্রচণ্ডতা উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণাপথ হইতে সন্ন্যাসীর দল আসেন এই মহাপুণ্য তিথিতে তুষার-শীতল গঙ্গাধারার অবগাহন করিতে। স্নানের যে কী উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। স্নানাভিযানের দৃশ্যও বড় মধুর ও ভাবাবেগপূর্ণ। জটাজুটশোভিত, ভস্মবিমণ্ডিত সন্ন্যাসীগণ যখন সমবেতকণ্ঠে "হর হর মহাদেব" ধ্বনি করিতে করিতে হস্তী-অশ্ব-পৃষ্ঠে সমাসীন হইয়া অথবা শিবিকারোহণে ভাব গদগদকণ্ঠে বেদমন্ত্র ধ্বনিত করিতে করিতে স্নানার্থে যুগযুগান্তরের আধ্যাত্মিক বিভূতি-মণ্ডিত ব্রহ্মকুণ্ড অভিমুখে যাইতেছিলেন—যিনি সে দৃশ্য দর্শন না করিয়াছেন—তাঁহাকে কি ভাবে বুঝাইব—যে সেই দৃশ্য কত মাধুর্য্য-ময় বা ভাবপ্রদ। সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম অবলেপিত হইয়াছে,—শিরোপরি কেশদাম অযত্নে জটার আকার ধারণ করিয়াছে। সামান্য পরিধেয়-টুকুও বিলাস-সৌখীনতার আশঙ্কায় যাঁহাদের অঙ্গে স্থানপায় নাই, এমনতর সহস্র সহস্র সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী চলিয়াছেন সামমন্ত্রে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া স্নানাভিলাষে—এ দৃশ্য তো বিস্মৃত হইবার নহে। হে পাশ্চাত্য শিক্ষাগর্ব্বী ভারতের নব্যসমাজ, একবার শ্রদ্ধালুচিত্তে দর্শন করতো কুম্ভমেলার ভাবোদ্বেলিত সন্ন্যাসীসমাজের স্নানাভিযান,—বুঝিতে পারিবে ভোগোন্মুখ পাশ্চাত্য এবং তপস্যৈক-সম্বল প্রাচ্যের পার্থক্য কোথায়!

একদল স্নানার্থী সন্ন্যাসীর ব্রহ্মকুণ্ডে গমন

ভারত সেবাশ্রমসংঘে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীজগজীবনরাম ফটো—ব্রহ্মচারী মৃত্যুঞ্জয়

সাধুদর্শন, সৎপ্রসঙ্গ এবং মহা-পুণ্যিত এই শুভ লগ্নে স্নানাভিলাষে লক্ষ লক্ষ গৃহী নরনারীরও সমাগম হয় এই কুম্ভমেলা উপলক্ষে। সহস্র সহস্র মাইল দূর দুরান্তর, এমন কি সুদূর আফ্রিকা ব্রহ্মদেশ হইতে হিন্দুগণ আসিয়াছিলেন—এই সাধু-দর্শন তথা সপ্তপাতক সংহর্ত্রী জাহ্নবীর পূত পবিত্র বারিরাশিতে সাংসারিক জ্বালামালা ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ করিয়া দিতে। আগামী মেলার আগমনের পূর্ব্বেই স্বীয় জীবন-দীপ নির্ব্বাপনের আশঙ্কা করিয়া যেন সকলেই সমবেত হয়—এই মহাপুণ্যিত উৎসবের মাধুর্য্যের আস্বাদ করিতে। তাই অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আসেন—সারা জনমের পাপ-তাপ ক্লান্তি-কালিমা বিসর্জ্জন দিয়া নির্ম্মল নিষ্পাপ নিকলুষ হইতে; জীবনতরণীর স্থায়িত্বের পরিমাপে অক্ষম—মধ্যম বয়সের নরনারী আসেন, অসমাপ্ত চলতি পথের পাথেয় সঞ্চয়

করিতে। আবার কেহ বা আসেন যুগযুগান্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি-পূত এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে।

গৃহীর সহিত সন্ন্যাসীর মহামিলনের মহাতিথি এই কুম্ভমেলা। প্রাচীন ভারতে সর্ব্বত্রই সাধুসমাজের সহিত গৃহীকুলের সম্বন্ধ ছিল এক অচ্ছেদ্যসূত্রে গাঁথা। কিন্তু কালক্রমে সে আদর্শ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাই আধুনিক ভারতে গৃহী তথা সাধুসমাজের এই দুরবস্থা। আচার্য শংকর এই কুম্ভমেলার সংস্কার সাধন করিয়া সন্ন্যাসী-সমাজের সহিত গৃহস্থ-সমাজের এক সংযোগ স্থাপন করিয়া ভারতের সন্ন্যাসী-সমাজকে আবার সমাজ সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। আচার্য্যশংকর গিরি, সাগর, পর্ব্বত, বন, অরণ্য, পুরী প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া এক একটি সম্প্রদায়ের উপর জাতিগঠন, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতির দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশে একদল সন্ন্যাসী থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবে—তাহাদের নাম—গিরি অথবা পর্ব্বত সম্প্রদায়। সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী জনপদে অবস্থান করিয়া একদল সন্ন্যাসী জাতি সংগঠন, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ করিবে—তাহারা হইবেন সাগর সম্প্রদায়ভুক্ত। এইরূপে নগরে থাকিবেন—পুরী সম্প্রদায়, অরণ্য-বনে থাকিবেন বন এবং অরণ্য সম্প্রদায়। পরাধীন ভারতে বিদেশী তথা বিধর্ম্মীর শাসনকালে ভারতের সন্ন্যাসী সমাজ আচার্য্য শংকরের অর্পিত সেই দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়াছে। আজ ভারতের সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী স্বীয় দায়িত্ব ছাড়িয়া সমাজের গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হরিদ্বার সাংস্কৃতিক সম্মেলনে শ্রীজগজীবন রাম। দক্ষিণে এবং বামে উত্তর প্রদেশের আবগারী বিভাগের মন্ত্রী চৌধুরী গিরিধারী লাল ও শ্রীসি-এম-নিগম—হরিদ্বার কুম্ভমেলায় নিয়োজিত অফিসর

সাধুসমাজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তথা কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ১৯২৭ সালে ভারত সেবাশ্রম সংঘের অধিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ কুম্ভমেলায় সেবাকার্য্য তথা ধর্ম্ম-প্রচারের ব্যাপক আয়োজন করেন। সেই সময় হইতে প্রতি কুম্ভমেলায় সঙ্ঘ হইতে সেবাকার্য্য এবং ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এইবার হরিদ্বারেও সন্ন্যাসীগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য তথা যাত্রীদের সর্ব্বপ্রকারে সহায়তাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই মহামেলায় সঙ্ঘ হইতে একটি সর্ব্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন এই সম্মেলনে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত শংকররাও দেও, ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠকের জন্য উপস্থিত থাকিতে না পারায় ভারতের শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুত জগজীবন রাম এবং অখিল ভারত আর্য্যধর্ম্ম সেবাসঙ্ঘের সভাপতি গোস্বামী গণেশদত্তজী উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত জগজীবন রাম বলেন—"বর্ত্তমানে ধর্ম্ম ও লোকাচারের নামে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে বহু কুসংস্কার আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার স্থান প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে ছিল না। সেই কুসংস্কার রাজি অপসারিত করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে কলঙ্ক মুক্ত করিতে পারিলে তাহা পুনরায় সমস্যাসঙ্কুল ভারত তথা সমগ্র জগতের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হইবে।" অস্পৃশ্যতা ও অনাচরনীয়তার উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন—"হিন্দুধর্ম্ম যদি বিশ্বের সকলের মধ্যে একই আত্মার অস্তিত্বের দাবী করে তবে তাহার সমাজ-জীবনে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের উন্নত অনুন্নতের প্রশ্ন আসে কেমন করিয়া। যে হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডাল গুহককে কোল দিয়াছিলেন—সেই ধর্ম্মের মধ্যে ঘোর অস্পৃশ্যতা কিরূপে আসিল?

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মতদ্বৈধতার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত জগজীবন রাম বলেন—"ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে বিরোধ তাহা একান্ত কাল্পনিক। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু বিজ্ঞান আমাকে নাস্তিক করে নাই। বিজ্ঞান কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রথমে মানিয়া লয়—পরে প্রমাণ বা প্রয়োগের দ্বারা উহার সত্যতা নির্ণয় করে। ধর্ম্মও সেইরূপ কতকগুলি

সত্যকে মানিয়া লইয়া প্রমাণ বা প্রয়োগের দ্বারা তাহার সত্যতা নির্দ্ধারিত করে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিজ্ঞানবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকে বাদ দিয়া বিজ্ঞান টিকিতে পারে না। ইহাই আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস।"

'সিকিউলার ষ্টেট"—কথাটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া মন্ত্রীমহোদয় বলেন—আমাদের সরকার ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বটে, কিন্তু সে রাষ্ট্র যদি ধর্ম্মহীন হইত তবে আমার ন্যায় আস্তিকের স্থান সেখানে হইত না। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিতে ইহাই বুঝায় সে রাষ্ট্র কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রশ্রয় দিবে না।

সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক মিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজী বলেন—জাতি গঠনের সমস্যাই আজ জগতের সমক্ষে প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই ভারতের স্বাধীনতা। ভারতীয় সংস্কৃতিই একদিন বিশ্বকে শান্তির বাণী শুনাইয়া জগতের প্রকৃত কল্যাণ করিয়াছিল। সে দায়িত্ব আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি প্রদর্শন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের উপযুক্ত শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দাবী জানাইয়া সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া যাঁহারা তাহাদের শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন তন্মধ্যে—ভারতীয় গণতন্ত্রের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, উপপ্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পার্লামেণ্টের স্পীকার শ্রী জি-ভি মবলংকার, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী শ্রী কে-শান্তনম, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি প্রদেশের গভর্ণর এবং প্রধানমন্ত্রীগণ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও, বোম্বাইয়ের মেয়র শ্রী এস্-কে-পাতিল অন্যতম।

সন্ন্যাসী সমাজকে সমাজ সেবায় উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে একটি অখিল ভারতীয় সন্ন্যাসী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন—শ্রবণনাথ মঠের মঠাধ্যক্ষ মণ্ডলেশ্বর স্বামী মোহনানন্দী। সভাপতির অভিভাষণে স্বামীজি বলেন—"হিন্দু শাস্ত্র 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—অর্থাৎ নিজের মুক্তি এবং জগৎ কল্যাণের আদর্শ সিদ্ধির জন্য নিরন্তর কর্ম্ম করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় সাধু-সমাজ আজ জগৎ কল্যাণের আদর্শ বিস্মৃত হইয়া মায়াবাদের নামে এক ভ্রান্ত আত্মকেন্দ্রিক অধ্যাত্ম সাধনায় ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে ব্যাস, বশিষ্ঠাদি আচার্য্যগণ, শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ আদি অবতার পুরুষগণ লোক সংগ্রহের জন্য প্রাণ-পাতী পরিশ্রম করিয়া তিলে তিলে আত্মদান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, মহর্ষি দয়ানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সমাজ সেবার আদর্শ বরণ করিয়াই নিজেদের জীবনের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।"

হরিদ্বারে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর বক্তৃতা

ফটো—ব্রহ্মচারী মৃত্যুঞ্জয়

বর্ত্তমান ভারতের ভয়াবহ অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া স্বামীজী বলেন—"ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে আজ যখন লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা-ভগিনী স্বজন তথা সহায়সম্বলহীন হইয়া নিদারুণ দুঃখ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে,—যখন সমাজের নৈতিক অধোগতি চরমসীমায় উপনীত হইয়া ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করিতে বসিয়াছে,—যখন সাধুসমাজের চিরন্তন সেবক গৃহস্থকুল নানা সমস্যাজালে বিজড়িত, সেই দুর্য্যোগ মুহূর্ত্তে ভারতের সাধুসমাজ কিরূপে নীরব নীশ্বর হইয়া গেল কে জানে? এই মহা দুর্দ্দিনেও কী সন্ন্যাসী সমাজের মোহনিদ্রার অবসান ঘটিবে না? পরিশেষে সভাপতি মহাশয় সন্ন্যাসী সমাজকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজ-সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে আবেদন জানান।

মেলার প্রথম দিকে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হরিদ্বারে আসেন। তিনি

গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা, মন্দির প্রদক্ষিণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিলে জনসাধারণের মধ্যে বেশ একটা ভাবের সৃষ্টি হয়।

অখিল ভারত সাধুসম্মেলনের প্রস্তাবাবলী

১। সাধুসন্ন্যাসী, ত্যাগী-তপস্বী মহাত্মাগণই ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও সাধনার প্রকৃত ধারক ও বাহক। সমগ্র জীবনব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য্যার দ্বারা তাঁহারাই ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে জাগ্রত জীবন্ত রাখিয়া মানুষকে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ দান করিয়াছেন। আজ ধর্ম্মের গ্লানি, নৈতিক অধঃপতন এবং দুর্নীতি ও অনাচারের প্রসারের ফলে সমগ্র দেশে যে দুঃখদৈন্য অশান্তি দেখা দিয়াছে; সাধুসমাজের অকুণ্ঠ সেবা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারাই কেবল তাহা দূরীভূত হইতে পারে। এতৎ সম্পর্কে তাঁহাদের এক মহান কর্ত্তব্য দায়িত্ব আছে। সুতরাং অখিল ভারতীয় সাধু সম্মেলনের এই অধিবেশন মত, পথ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সাধু, সন্ত, মোহান্ত, আখড়া ও মঠাধীশকে এই কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনে অগ্রসর হইতে আবেদন জানাইতেছে।

২। সাধুসমাজের অমনোযোগ ও অনবহিত থাকার সুযোগে বিজাতীয় রাষ্ট্রকর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র সাধুসমাজকে 'অনুৎপাদক' (unproductive) আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া সমাজবহির্ভূত গণিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। সাধুসমাজকে সংঘবদ্ধভাবে ইহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে এই অখিল ভারতীয় সাধু সম্মেলন অনুরোধ জানাইতেছে এবং আগামী আদম সুমারীতে সাধুসমাজকে উৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে এই সম্মেলন সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

ইহা ছাড়া সাধুসমাজকে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করিয়া সমাজ-সেবায় উদ্বুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া আর একটি প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া সারদাপীঠাধীশ জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য বাণী প্রেরণ করেন।

এইবার মেলায় প্রায় ১২ লক্ষ নরনারীর সমাগম

মেলা সুষ্ঠুরূপে এবং সাফল্য সহকারে উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে সরকার হইতে এইবার বিশেষ পরিপাটির সহিত সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হয়। কলেরা প্রতিষেধক ব্যবস্থায় সরকার এই বৎসর বিশেষ কৃতিত্ব প্রদান করিয়াছেন।

সেবা বিভাগের কার্য্যাদি হিন্দুস্থান স্কাউট, ভারতীয় গার্ল গাইড, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং মহাবীর দলের স্বেচ্ছাসেবক তথা কর্ত্তৃপক্ষগণের দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমের ফলে বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে।

মেলার প্রধান স্নানের দিনের একটি মাত্র ঘটনায় সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক তথা যাত্রীগণের অন্তরে এক গভীর শোকের ছায়াপাত করিয়াছিল। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের দূরদর্শিতার অভাবই যে উক্ত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল—প্রত্যক্ষদর্শীর ইহাই অভিমত।

৩০শে চৈত্র, মহাবিষুব সংক্রান্তি প্রকৃত কুম্ভযোগের তিথি। ২৯শে চৈত্র রাত্রি ১২টার পর হইতেই স্নান আরম্ভ হইয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী "হর হর মহাদেব"—"গঙ্গা মায়িকী জয়" ধ্বনি করিতে করিতে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট অভিমুখে চলিয়াছে। কী প্রাণের আবেগ, কী গভীর উৎকণ্ঠা হৃদয়ের। হাজার মাইল দূর হইতে যাত্রী আসিয়াছে—এই রাত্রি নিশীথে পুণ্যধারায় একটি ডুব দিতে। পথের শ্রান্তি-ক্লান্তি, সাংসারিক দুঃখকষ্ট, গ্লানিগ্লানি সব ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে—ঐ একটিমাত্র ডুব—একবার মাত্র মস্তক নিমজ্জনের পরমুহূর্তে—। এই শ্রদ্ধা বিশ্বাস লইয়া অগণিত যাত্রীর দল চলিয়াছে ব্রহ্মকুণ্ডে। অবাক হইতে হয়—স্নানের পরে তাহাদের প্রফুল্লতা দেখিয়া। নির্ম্মল নিষ্পাপ চরিত্রের প্রসন্নতা ফুটিয়া ওঠে—সিক্তবসন ভক্তের মুখমণ্ডলে।

বেলা তখন প্রায় ৭টা। ঘাটে ভিড়ের চাপ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল, যাত্রীদের নানা প্রকারে সহায়তা দানে আমরা এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ সকলে ব্যস্ত। ব্রহ্মকুণ্ডে আগমনের রাস্তায় একটি দরজায় পুলিশ যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করিতেছিল। অকস্মাৎ জানিনা কী কারণে সেই দরজার কিছু অংশ বন্ধ করা হইল। মাত্র ৫মিনিটের মধ্যে দরজার উভয় পার্শ্বে যাতায়াতের উপযুক্ত রাস্তা না পাওয়ায় ভীষণ ভিড় জমিয়া গেল। এই সময়েই জনতার পায়ের নীচে যাওয়া ৩২জন প্রাণ হারাইল এবং বহু যাত্রী আহত হইল।

কুম্ভমেলা দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনি বুঝিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রাদেশিকতার লেশ নাই, মতদ্বৈধতার স্থান নেই এতটুকু। একই উদ্দেশ্যে মহামিলনের পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে হিন্দুর তীর্থস্থানে। তাই হিন্দুর তীর্থস্থানগুলিই হিন্দু সংস্কৃতির তথা জাতির মহাপীঠস্থান এবং এই তীর্থস্থানগুলিকেই কেন্দ্র করিয়াই হিন্দুধর্ম্ম আবার জাগ্রত হইবে।

নির্জ্জান মনের পরিচয়

শ্রীশান্তশীল বিশ্বাস

মানুষের মন বল্‌তে সাধারণের কাছে শুধু সজ্ঞান (চেতন) মনের কথাই মনে হয়, কিন্তু এই সজ্ঞান মনই ত আর মানুষের সমস্ত মন নয় ; মনের বিভিন্ন স্তর আছে ;—সজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নির্জ্জান মন—এই সব কয়টা মিলিয়ে সত্যিকারের মানুষের মন। এখন মনের শেষোক্ত দুই স্তরের পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক্।

'আসংজ্ঞান মন' ঠিক সজ্ঞান মনের পরেই থাকে, যেখানে চিন্তারাশি এত তৎপর হয়ে থাকে যে একটু সুযোগ পেলেই তা সজ্ঞান মনে চলে আসতে পারে। যেমন ধরুন, ঘরে বসে পড়াশুনা করছেন আর আপনার পাশের টেবিলে রয়েছে ঘড়ি, টিক্‌টিক্ শব্দে চলেছে, আপনার সজ্ঞান মনে সে শব্দবোধ আস্‌ছে না কিন্তু আসবার জন্য সর্ব্বদাই তৎপর ; হঠাৎ ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল—অম্‌নি আপনার খেয়ালে এলো যে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। আর নির্জ্জান মন বল্‌তে বোঝায় যেখানকার চিন্তারাশি সোজাসুজি আপনার চেতনাতে আসবার চেষ্টা করেও সহজে আস্‌তে পারে না, অথবা এলে আপনি তাকে চিন্তে পারেন না যে এ আপনার মনেরই কথা।

সাধারণ মানুষ মনের এই সজ্ঞান ও নির্জ্জান স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান চেতন বা অচেতন ভাবে করেই চলে। এই দুই স্তরের মধ্যে যেদিন আর সামঞ্জস্য রাখ্‌তে পারে না তখনি হয় সে অস্বাভাবিক। তাই অনেক অস্বাভাবিকতা যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বা পাগলের মধ্যে দেখা যায় তার কার্য্যকারণের সন্ধান মেলে ঐ নির্জ্জান মনেই। এই ভাবে মনকে স্তরে স্তরে ভাগ করে নিয়ে কোনও মানসিক ঘটনার কারণ উদ্‌ঘাটন করার নামই মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis)—যার প্রথম স্রষ্টিকর্ত্তা ডাঃ সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড।

এই নির্জ্জান মনের গঠন সজ্ঞান মনকে সর্ব্বদাই প্রভাবান্বিত করে বা করবার চেষ্টা করে। আমরা কখনও তা বুঝতে পারি, কখনও তা পারি না। যেমন একজনের হয়ত দেশ-দেশান্তর বেড়াতে খুব ভাল লাগে। তিনি সুযোগ পেলেই তাঁর ভ্রমণের কথা বল্‌তে চান্। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় 'ভ্রমণ' আপনার এত ভাল লাগে কেন ; তিনি পরিষ্কার বলবেন যে তাঁর ওটাই খুব ভাল লাগে অর্থাৎ তিনি সচেতন যে তাঁর এই অনুপ্রেরণার উৎস তাঁর নিজের ভেতরেই আছে—আছে তাঁর নির্জ্জান মনে এই ধরণের প্রেরণাপূর্ণ বিশেষ মানসিক গঠনকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় 'গূঢ়ৈষা' (complex) বলে। আবার আর এক ধরণের 'গূঢ়ৈষা' নির্জ্জান মনে গড়ে ওঠে বা থেকে যায়, সজ্ঞান মনে যার কোনও সহজ পরিচয় থাকে না। এই সকল মানসিক জটিলতা গড়ে ওঠে মানসিক দ্বন্দ্বের (conflict) ফলে। যেমন ধরুন আপনার কোনও ব্যক্তিবিশেষের উপরে অত্যন্ত ঘৃণা আছে। সেই ব্যক্তিটি এমন এক কাজ পেলেন যাকে আপনিও খুব ভাল বাসেন, অথচ হয়ত কিছুদিন বাদে দেখা গেল যে আপনার ঐ কাজটার ওপরে আর শ্রদ্ধা নেই। আপনি সুরু করেছেন ঐ কাজটাকে ঘৃণা করতে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে আপনি বলবেন "আমার কাছে ও কাজটা ভাল লাগে না তার কারণ এই সব দিক্ থেকে কাজটা খুব খারাপ ইত্যাদি"। এই রকমভাবে ভুয়ো যুক্তি দিয়ে ঐ কাজটার প্রতি আপনার ঘৃণার কারণ দেখাবার চেষ্টা করবেন। অথচ ঘৃণার আসল কারণ রইল আপনার নিজের কাছেও অজানা— "আপনার ঐ ঘৃণিত লোকটি যে ঐ কাজ করে।"

এই রকম মানসিক 'জটিলতা' আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে আমরা জানা মানুষের অজানা মনের গঠন জান্‌তে পারি। এই মানসিক গঠন আবিষ্কারের কতকগুলি প্রণালী ফলিত-মনস্তত্ত্ব আজ আমাদের বলে দিয়েছে, যেমন Word Association Test, Free Association Test, Thematic apperception Test, Rorschach Test. এর মধ্যে এক "Free Association Test" ছাড়া সব কয়টাই সাধারণতঃ মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাগারে বসে সহজে করা সম্ভব। Word Association Test-এর স্রষ্টিকর্ত্তা ডাঃ ইয়ুঙ্গ (Jung) একবার নাকি এক হাসপাতালে এক চুরির ব্যাপারে আসল চোরকে বার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অনেক প্রকার মানসিক ব্যাধির কারণ এই নির্জ্জান মনেই থাকে। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। এক রকম মানসিক ব্যাধি আছে যাকে বলে ফিউগ (Fugue)। এ রকম মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখা যায় হয়ত হঠাৎ বাড়ী থেকে উধাও হয়ে দূর ভিন্ দেশে গিয়ে অন্য-এক উপায়ে কিছুদিন কাটিয়ে বাড়ী ফিরে এসে আর সেই অবস্থার কথা মনে করতে পারে না। দুটো অবস্থার—সুস্থ ও অসুস্থ চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা আর সম্ভব হয় না। একে বলে বিসঙ্গ (Dissociation)। আবার এমনও অনেক সময় দেখা যায় যাকে বলে 'দ্বৈত অস্মিতা' (Double Personality)। একই মানুষ কিছুদিন একরকম অস্মিতা থেকে আর একরকম অস্মিতা অবলম্বন করলেন, অথচ একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য নেই—তারা সম্পূর্ণ পৃথক।

এ সবের নির্জ্জান মনের অবদমিত বাসনার খেলাই একমাত্র কারণ। একটা বাস্তবিক ঘটনা দেখ্‌লে এটা পরিষ্কার হবে। রেভাঃ এনসেল বোর্ণ নামে একজন পাদ্রি সাহেব হঠাৎ বাড়ী থেকে উধাও হয়ে গিয়ে পেনসিলভীনেয়ার অন্তর্গত নরিস টাউনে এ. জে. ব্রাউন নাম নিয়ে এক দোকান খুলে বসেন ; অথচ এই অবস্থায় থাকবার সময়ে তাঁর পূর্ব্বের পাদ্রি জীবনের কিছু মনে ছিল না, শুধু মনে ছিল যে তিনি অন্য কোথাও থেকে চলে এসেছেন। তারপরে এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে হঠাৎ আবার পূর্ব্ব জীবনের কথা মনে আসে, তিনি তারপরে বাড়ী ফিরে আসেন। কিন্তু

তখন পলাতক জীবনের দিনগুলি কি করে কাটিয়ে ছিলেন তাও আর মনে পড়ে না তাঁর। (Psychology of Insanity—Burnard Hurt)।

রেভাঃ বোর্ণ পাদ্রি হলেও তাঁর নির্জ্ঞান মনে ব্যবসা করে বড়লোক হবার এক উগ্রবাসনা অবদমিত হয়ে ছিল, যা এত অদ্ভুতভাবেই পরিতৃপ্ত হয়েছিল। এ ধরণের মানসিক ব্যাধি খুব কমই দেখা যায়। সাধারণতঃ যে সব মানসিক বিকার যেমন প্যারানোইয়া, হিষ্টিরিয়া, মেনিকডিপ্রেসিভ সাইকোসিস, অবসেশন, কম্‌পালসান নিউরোসিস, এঙ্কজাইটাল নিউরোসিস ইত্যাদি খুব বেশী সংখ্যাতে দেখা যায়। তাদেরও সমস্ত মানসিক বৈলক্ষণ্যের কারণ পাওয়া যায় ঐ নির্জ্ঞান মনেই। এই সব রকম মানসিক ব্যাধি নিয়ে আলোচনা এখানে স্থানাভাবে সম্ভব নয়। তাও দু' একটা মানসিক ব্যাধির লক্ষণ নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। অনেক মানসিক রোগী আছে যাদের ধারণা তারা মস্ত বড়লোক, কেউ হয়ত বলবে যে সে নিজে গান্ধিজী, কি সুভাষ বোস, কি আরও কত কি। একে মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলে 'মেগালোম্যানিয়া'। এর কারণ দেখা যায় নির্জ্ঞান মনে রয়েছে 'আত্মপ্রেম' ও বড় হবার উগ্রবাসনা—যা সফল হয়নি তাই এইভাবে বাস্তব বিফলতা করতে চায় পূরণ।

আবার এক রকম রোগী আছে যাদেরকে বল্‌তে শোনা যায় যে তারা মাতৃগর্ভে চলে যেতে চায়, অথবা এমন ভাবে সর্ব্বদা বসে থাক্‌তে চায় যেমন ভাবে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগে মাতৃগর্ভে থাকে। এর কারণ মানুষ যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন তার থাকে না আত্ম অনাত্ম বোধ। যার ফলে সে থাকে চরম সুখে। তাই ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে পায় এক মানসিক আঘাত যাকে বলা যায় জন্মাঘাত (Birth Trauma)। তখনই তার পুনরায় প্রাক্‌জন্ম অবস্থায় ফিরে যাবার বাসনা জন্মায় সেটা থাকে অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান মনের অন্তরালে। সেই অবদমিত বাসনা পরিতৃপ্ত করতে চায় মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যে অবস্থায় থাকে সেই ধরণে বসে থেকে। এই ধরণের অবদমিত বাসনার পরিতৃপ্তির চেষ্টার অভিব্যক্তি সুস্থ সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় তার কুকুর কুণ্ডলি হয়ে শোবার চেষ্টাতে—তা ছাড়া কুকুর কুণ্ডলি হয়ে শুয়ে কি আর মানুষ সব চাইতে আরাম পায়?

এবার সাধারণ ভুলের কথা ধরা যাক্, যার কারণ থাকে ঐ নির্জ্ঞান মনেই। যেমন একজন তাঁর সহকর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করছেন "কাল অফিস্ ছুটি না বন্ধ?" তার কারণ তাঁর নির্জ্ঞান মনে রয়েছে কাল যেন অফিস বন্ধই থাকে। একজন ফ্রয়েডের ওপরে অত্যন্ত চটা ছিলেন তাই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে লিখ্‌তে গিয়ে 'Freud'এর বানান 'Fraud' লিখেছিলেন ভুলে। এই কারণেই অনেক সময়ে অনেককে প্রশ্ন করতে দেখা যায় Leading questionএ "চা আপনি খাবেন না ত?"

এই নির্জ্ঞান মনের প্রভাব যে কত বেশী আমাদের জীবনে তা মনোবিজ্ঞানীর চোখে দেখ্‌লে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। যেমন ধরা যাক্—হিন্দুর ছেলে মস্ত বড় সাহেব হয়েও অনেক কুখাদ্য খেয়েছেন এমন লোক্‌কেও শোনা গেছে নিষিদ্ধ গোমাংস খুব বড়াই করে খেতে গিয়ে খেতে পারেননি অথবা খেতে পেরেও অসুস্থ হয়েছেন—অবশ্য শুধু মানসিক কারণে। তারপর তাঁর মুখে শোনা গেছে "এই মাংসটা অন্য কিছুর জন্য খেতে আপত্তি নেই; আপত্তি শুধু অস্বাস্থ্যকর বলেই," অথচ যে কারণে সত্যিকারের গোমাংস অস্বাস্থ্যকর সে কারণ আরও অনেক প্রকার মাংসেই ত বর্ত্তমান; সে সব ত অনেকেই খেতে পারেন অম্লান বদনে। এই রকম নিজের মনের আসল দুর্ব্বলতাকে ঢাক্‌বার জন্য ভুয়োযুক্তি খাড়া করার নাম 'যুক্ত্যাভাস' (Rationalisation)। এই 'যুক্ত্যাভাস' দিয়ে আমরা আমাদের মনের অনেক সংস্কার ও দুর্ব্বলতার ঢিলা যুক্তির বাধনকে করি শক্ত এতে কোনও সন্দেহ মাত্র নেই। এমনি করে নিজেকে দিই ফাঁকি। এই যুক্ত্যাভাসের জোরে আজও বেঁচে আছে অনেক সামাজিক কুসংস্কার যাদেরকে জানি আমরা অন্যায় কিন্তু আসল কাজের সময় পারি না করতে কিছুই। মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে বলেই নিয়ে আসি ভুয়োযুক্তির বোঝা। একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে আমরা অনেক সময়েই যুক্তির চেয়ে মানসিক অবস্থা ও গঠন দ্বারাই বেশী চালিত হই।

আবার এই নির্জ্ঞান মনের অন্তর্নিহিতে বর্ত্তমান সংস্কারই করেছে সমাজ জীবনকে সম্ভব, আমাদের মনে সর্ব্বমুহূর্ত্তেই আসছে নানা বাসনা যাদেরকে দমন না করলে আমাদের সমাজ, সভ্যতা বলে থাকে না কিছুই। এই সভ্যতার ভাঙ্গন থেকে আমাদেরকে সর্ব্বদা নিবৃত্ত করে আমাদের নির্জ্ঞান মনেরই নিষেধবাণী যাকে ডাঃ ফ্রয়েড বলেছেন 'অধিশাস্তা' (Super Ego), যা গড়ে ওঠে আমাদের মধ্যে শৈশব থেকে পিতা মাতার অনুশাসনে, অনুকরণে, একীকরণে ও পরিবারের ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ও সেই প্রভাবের বিস্তৃতিকরণে।

কিন্তু এই অধিশাস্তার শাসনও নিরঙ্কুশ নয়? তাকে বিপর্য্যস্ত করে দিতে চায় প্রতি মুহূর্ত্তে নানা ধরণের আদিম বাসনা (Primitive Instincts)—যারা এসেছে আমাদের মধ্যে আদিম পিতৃপুরুষের কাছ থেকে। তাই মানুষের নির্জ্ঞান মনের অন্তরালে চলে দ্বন্দ্ব (Conflict)। এই দ্বন্দ্বে কোন কোন সময়ে অধিশাস্তা হয় পরাজিত, আমাদের বাসনা হয় পরিতৃপ্ত, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে অধিশাস্তা মানে না হার, তাকে বজায় রাখ্‌তে হয় নিজের প্রতিপত্তি—সকল দ্বন্দ্বকারী বাসনাকে মনের আরও নিভৃতকোণে নির্ব্বাসন দিয়ে। এই বাসনা নির্ব্বাসনের নামই মনস্তত্ত্বের ভাষায় অবদমন, (Repression)। কিন্তু এই নির্ব্বাসিত বাসনা বন্দীদশাতেও হয়ে থাকে চিরবিদ্রোহী—প্রতিক্ষণেই করে চলে দ্বন্দ্ব, তাই যখনই আর পারি না আমরা দুই শক্তির ভারসাম্য রাখ্‌তে তখনই আমরা হই—অস্বাভাবিক—এমন কি পাগল।

সাধারণতঃ এই সব অবদমিত বাসনা পরিতৃপ্ত হয় দিবা স্বপ্নে ও স্বপ্নে। স্বপ্নেই মানুষের নির্জ্ঞান বাসনার পরিচয় থাকে সব চাইতে স্পষ্ট। ডাঃ ফ্রয়েড তাই স্বপ্নকে বলেছেন "মনের অচেতনে যাবার প্রশস্ত রাজপথ"। অবশ্য এই স্বপ্নই অনেক সময় আমাদের দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ মনের নিদ্রাকে রাখে অটুট, কিন্তু স্বপ্নেও এই বাসনার পরিতৃপ্তি একেবারে সোজাসুজি সম্ভব হয় না, কারণ সজ্ঞান মন নিদ্রিত হলেও নির্জ্ঞান

মনের রাজত্বের শাসক প্রহরীরা (Censor) হয় না সম্পূর্ণ অলস, তারা বাধা দেয় বাসনাকে নগ্নরূপে এসে হানা দিতে। তাই এই বাধাকে অতিক্রম করে আসতে হয় বাসনাকে নানা প্রক্রিয়া করে—যেমন ক্ষুদ্রীকরণ, সাঙ্কেতিকতা, অবস্থান্তর, নাটন, অভিক্ষেপ ইত্যাদি। আমরা স্বপ্নের প্রকাশিতরূপকে প্রায়ই সব সময় পাই "রূপক রূপে"। তাই কোনও স্বপ্নের বিভিন্ন বিষয় বস্তুকে ভাগ করে তাদের অনুষঙ্গ নিয়ে যখন এসে পড়ি স্বপ্নের অন্তর্নিহিতরূপে, তখন দেখ্‌তে পাই এ শুধু বাসনারই খেলা। স্বপ্নের এই সব রকম প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা স্থানাভাবে এখানে সম্ভব নয়, শুধু একটা উদাহরণ নিয়ে এটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

ধরুন একজন স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁকে বাঘে তাড়া করেছে। এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বাস্তবে তাঁর পিতা বা অন্য কোনও শাসকের ভীতিই হচ্ছে এর কারণ। শাসক (authority) নিয়েছে স্বপ্নে বাঘের প্রতীক। শিশুদের স্বপ্ন অনেকটা সোজাসুজি প্রকাশিত হয়, কিন্তু বয়স্কদের স্বপ্ন প্রায় সময়েই আসে জটিলাকারে।

এই নির্জ্ঞান মনের খেলা আরো নানা দিক থেকে বিন্যাস করা যেতে পারে। যেমন দেখি জনের স্বভাব জনতাতে (crowd) মিশে হয়ে যায় অনেক সময়ে আর এক। সাধারণ জনতার স্বভাব লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার অনেক বৈশিষ্ট্য—যেমন এক বিশেষ কারণ বা লক্ষ্যবস্তুকে নিয়ে গড়ে ওঠা জনতার থাকে প্রবল ভাবাবেগ, আর সাথে সাথে হয়ে যায় অনেক পরিমাণে বুদ্ধিহীন। তাই জনতার মনে মন মিলিয়ে অনেক বিচক্ষণ লোকও করে ফেলে দেয় অনেক দায়িত্বহীন কাণ্ড। এরকম কেন হয়? তার কারণ বিশ্লেষণ জিন্সবার্গ, মাকডুগাল প্রমুখ অনেকে অনেক দিয়েছেন, তার বিশদ বর্ণনা এখানে দরকার নেই। শুধু দেখা যাক্ নির্জ্ঞান মনও এখানে কতখানি দায়ী। পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে আমাদের মনের অচেতনে রয়েছে 'আদিম স্বভাব' যা জনতার মাঝে অন্যকে অনুকরণে, একীকরণে ও অন্যের ভাবাবেগের প্রভাবে (Sympathetic Induction) জনতার মাঝে নিজের দায়িত্ব এড়াবার সুযোগ নিয়ে হয়ে পড়ে অভিব্যক্ত।

আজকে 'মনস্তত্ত্ব' নানা ক্ষেত্রেই এগিয়ে গিয়েছে। 'শিল্প' ক্ষেত্রেও এগিয়ে আসতে পিছপাও হয় নি। যদিও এই 'শিল্প' ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ মাত্র বিশ কি পঁচিশ বছর, তবুও এ দিয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। আজকের দিনে শিল্পক্ষেত্রে সব চাইতে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে 'শ্রমিক সমস্যার' নানাদিক্।—শ্রমিক বিক্ষোভ, ধর্ম্মঘট, অনুপস্থিতি, শ্রমিক পরিবর্ত্তন ইত্যাদি, এ সব কারণে 'শিল্প-বাণিজ্য' জগতে যে কি বিরাট ক্ষতিসাধন হচ্ছে তার একটা উদাহরণ উল্লেখ করছি তাতে পরিষ্কার বোঝা যাবে। আমেরিকাতে ফিবশার ও হান্না এ দু'জনে ১৯৩৪ সালে একটা হিসাব নিয়ে দেখেছেন একমাত্র শ্রমিক পরিবর্ত্তনের ফলে এক বছরে ৯০০০০,০০০০ ডলার পরিমাণ অর্থের ক্ষতি হয়েছে। আরো কত ক্ষতিসাধন যে হতে পারে এই 'শ্রমিক বিক্ষোভে'র ফলে তা বুঝতে আর বেশী চিন্তার প্রয়োজন হয় না। আজকের 'ফলিত মনস্তত্ত্ব' মনোভাব-পরিমাপক প্রশ্নমালার প্রয়োগ ও আরও অন্যান্য পদ্ধতিতে গবেষণা করে দেখেছেন এবং এখানে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ফলিত মনস্তত্ত্ব' শাখাও এখানে গবেষণা করে যা পেয়েছেন তাতে দেখা যায় এই শ্রমিকবিক্ষোভের সব চাইতে বড় কারণের সূত্র মেলে ঐ নির্জ্ঞান মনেই, শ্রমিক সাধারণের মনের নির্জ্ঞানে যে হীনতাভাব (Inferiority Complex) জমে ওঠে নানা ভাবে তারা অবহেলিত ও অপমানিত হয়ে তারই ফলে দেখা দেয় সংঘাত। "মাহিনা বাড়াও" এই জেহাদ প্রায় সব ধর্ম্মঘটের কারণ বলে প্রতীয়মান হলেও মনস্তাত্ত্বিক কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ওটা নয়।

আবার রাজনীতি ক্ষেত্রেও এই নির্জ্ঞান মনের প্রভাবকে আবিষ্কার করা কঠিন নয়। সাধারণ যুক্তিবাদের ওপরে অনেক সময়েই স্থান পায় মানুষের মনের অন্তর্নিহিতে বর্ত্তমান পুঞ্জীভূত সংস্কার (Prejudice)। এই কৌশলকে অবলম্বন করে রাজনীতি ক্ষেত্রেও অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে আজও, তাই রাজনীতির সব চাইতে বড় অস্ত্র হল "প্রচার"। এই প্রচার সব চাইতে সাফল্য লাভ করে যখন সামান্য যুক্তির আবরণে গা ঢাকা দিয়ে চলে যেতে পারে মানুষের নির্জ্ঞান মনের ভিত্তিতে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে নাৎসী জার্ম্মানীতে ৯৫% জন শিক্ষিত হয়েও হিটলারকে তারা নিজেদের ত্রাণকর্ত্তা বলে মনে করত, নাৎসীদলের প্রচারকার্য্যের ফলে। এই ভাবে আমরা সর্ব্বদিক থেকেই দেখতে পাই নির্জ্ঞান মনের গুরুত্ব ও প্রভাব।

পদার্থবিদ্যায় যেমন 'ইথারের' অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়াই তা না হলে অনেক সমস্যার হয় না সমাধান, তেমনি নির্জ্ঞান মনকে স্বীকার ছাড়া বহু প্রশ্ন থাকে অমীমাংসিত।

শ্রীগীতগোবিন্দে পাঠভেদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

শ্রীগীতগোবিন্দের মত একখানি বহুল-প্রচারিত গ্রন্থে পাঠভেদ থাকা স্বাভাবিক। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দে পাঠভেদ অত্যন্ত অল্প। অথচ আটশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত এই গ্রন্থখানি সারা ভারতবর্ষে আজিও সমান সমাদৃত।

শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীতগুলির রূপান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাঠান্তর পাওয়া যায়—শ্লোকের মধ্যে, শ্লোকের সংখ্যারও ন্যূনাধিক্য ঘটিয়াছে। বঙ্গীয় সংস্করণ অপেক্ষা বোম্বাই নির্ণয়সাগরযন্ত্রে মুদ্রিত সংস্করণে কয়েকটি শ্লোক অধিক আছে। আবার বাঙ্গালায় প্রচলিত গ্রন্থের বাঙ্গালী টীকাকারগণও কেহ কেহ কোন কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করেন নাই। উদাহরণস্বরূপ সর্গান্ত শ্লোকগুলির উল্লেখ করিতে পারি।

বাঙ্গালী টীকাকারগণের মধ্যে বোধ হয় ধৃতিদাস বৈদ্য বয়োজ্যেষ্ঠ। নিত্যধামগত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎসম্পাদিত শ্রীগীতগোবিন্দের ভূমিকায় নারায়ণ দাসের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। "বসুবাণ ভুবন গণিতে শাকে" ৮৫১৪=১৪৫৮ শকাব্দায় রমানাথ শর্ম্মা "মনোরমা" নামে 'কাতন্ত্র ধাতুবৃত্তি' রচনা করেন। রমানাথ 'ৎসর' ধাতু ব্যুৎপন্ন পদ প্রয়োগ বিচারে শ্রীগীতগোবিন্দের 'ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন' পদ উদ্ধার ও তৎপ্রসঙ্গে নারায়ণ দাসের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। রমানাথ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম-সাময়িক। নারায়ণ দাস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। নারায়ণ দাস শকাব্দার চতুর্দ্দশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। নারায়ণ দাস স্বপ্রণীত 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী' টীকায় পদ্মাবতী শব্দের ব্যাখ্যায় ধৃতিদাসের টীকা হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"শৃঙ্গারিস্বধেত্যাহ ধৃতিদাসস্তদ সমীক্ষিতা বিধানম্"। সুতরাং শকাব্দার ত্রয়োদশ শতকে ধৃতিদাসের জীবৎকাল অনুমান করা চলে। ধৃতিদাসের টীকার নাম 'সন্দর্ভ-দীপিকা'। প্রতি সর্গের শেষে—"ইত্যাস্থান চতুরানন বিশ্বাস বৈদ্য শ্রীধৃতিদাস বিরচিতায়াং সন্দর্ভদীপিকায়াং শ্রীগীতগোবিন্দ টীকায়াং" এইরূপ লেখা আছে। বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ইত্যাস্থান চতুরানন"—কথা কয়েকটি হইতে অনুমান করেন ধৃতিদাস কোন রাজসভাসদ ছিলেন।

ধৃতিদাস এবং নারায়ণদাসের টীকায় সর্গান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা নাই। এসিয়াটিক সোসাইটীর (নারায়ণ দাসের টীকাযুক্ত) পুঁথিতে সর্গান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা আছে, কবির পরিচয়-শ্লোকের ব্যাখ্যা নাই। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সংগৃহীত টীকায় এবং বাঁকুড়া জেলার ভাদুল গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের সংগৃহীত ১৫৬৫ শকাব্দায় অনুলিখিত পুঁথিতে নারায়ণদাসের টীকায় সর্গান্ত শ্লোক ও কবির পরিচয়-শ্লোক ব্যাখ্যাত হয় নাই। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় বলেন, সর্গান্ত শ্লোকগুলি সন্দেহজনক। কারণ মৈথিল পণ্ডিত শঙ্কর মিশ্রও স্বপ্রণীত রসমঞ্জরী টীকায় শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করেন নাই এবং রাণা কুম্ভ রসিকপ্রিয়া টীকায় চতুর্থ সর্গের অন্ত-শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"প্রবন্ধ পৃথিবী ভত্রা প্রবন্ধ প্রীতয়ে হরেঃ"।

আমার মনে হয় রাণা কুম্ভ বোধ হয় একটি প্রবাদের ভিত্তিতে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। প্রবাদটি এই (সংস্কৃত ভক্তমাল)—পুরীর রাজা একখানি গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করেন। কোন গ্রন্থ জগন্নাথ দেবের প্রিয়, পরীক্ষার জন্য জয়দেব রচিত ও স্বরচিত গ্রন্থ দুইখানি জগন্নাথ মন্দিরে রাখিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দেন। দুয়ার খুলিলে দেখা যায়—জয়দেবের গ্রন্থ উপরে ও রাজার গ্রন্থ নীচে রহিয়াছে। ইহাতে রাজা দুঃখিত হইলে দৈববাণী হয়—

> জয়দেবকৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
> তবকৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥

উড়িষ্যার অধীশ্বর গজপতিরাজ পুরুষোত্তমদেবের রচিত একখানি গীতগোবিন্দের পরিচয় পাওয়া যায়—"অভিনব

গীতগোবিন্দ"। হয়তো এই গ্রন্থ লইয়াই প্রবাদের উৎপত্তি এবং রাণা কুম্ভের টীকায় এই প্রবাদের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

বঙ্গেশ্বর দনুজমর্দ্দনদেব ও তৎপুত্র যদু বা জলালউদ্দীনের সভাপণ্ডিত রাঢ়ের রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি গীতগোবিন্দের টীকায় সর্গান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কবির পরিচয়-শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীমহাপ্রভুর অনতিপরবর্ত্তী বিখ্যাত টীকাকার পূজারী গোস্বামী সর্গান্ত শ্লোক তথা কবির পরিচয় শ্লোকেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃহস্পতি মিশ্র পাঁচশত বৎসরেরও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। পূজারী গোস্বামীর বয়স চারিশত বৎসরের বেশী নহে।

আমাদের মতে শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীত ও অপরাপর শ্লোকগুলির মত সর্গান্ত শ্লোকগুলিও কবি জয়দেবের রচিত। জয়দেবের প্রায় সম-সময়েই ১১২৭ শকাব্দায় সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের "সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে" জয়দেব রচিত একত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে শ্রীগীতগোবিন্দের পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তন্মধ্যে—

"জয়শ্রী বিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ॥

(সদুক্তিকর্ণামৃত ॥ ১।৫৯।৪ ॥ কৃষ্ণভুজঃ ॥)

শ্লোকটি শ্রীগীতগোবিন্দের একাদশ সর্গের অন্তিমশ্লোক। আমাদের নিশ্চয়তার আরো একটি কারণ, সর্গান্ত শ্লোক-গুলি গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জক। প্রতি সর্গের বিষয়বস্তুর সঙ্গে—এমন কি সর্গের নামের সঙ্গেও এই সমস্ত শ্লোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত শ্লোকটিই গ্রহণ করিতেছি। একাদশ সর্গের নাম "সানন্দ গোবিন্দ"। সর্গের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীরাধার অভিসার। শ্রীরাধাকে কুঞ্জে অভিসার করিতে দেখিয়া গোবিন্দ আনন্দিত হইয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকে কৃষ্ণভুজের বর্ণনা আছে। যে বাহুযুগল শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনের জন্য লালায়িত, সেই ভুজদ্বয় সাক্ষাৎ অন্তকসদৃশ কুবলয়াপীড় হস্তীর মৃত্যু-পূর্ব্ব-বমিত রক্তবিন্দুতে মণ্ডিত হইয়াছে। অর্থাৎ এ হেন চঞ্চলভুজযুগশালী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনের জন্য সানন্দে প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রত্যেক সর্গান্ত শ্লোকেরই এইরূপ ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেও এই জাতীয় শ্লোক পাওয়া যাইতেছে। দশম স্কন্ধের ষড়বিংশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি এইরূপ—

দেবে বর্ষতি যজ্ঞ বিপ্লবরুষা বজ্রাশ্ম পরুষানিলৈঃ
সীদৎ পালপশু স্ত্রিয়াত্ম শরণং দৃষ্ট্বানু কম্প্যুৎ স্ময়ন্।
উৎপাট্যৈক করেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রৎ গোষ্ঠমপাং মহেন্দ্রমদভিদ্ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাং॥

সর্গের নাম সকল পুঁথিতে একরূপ নহে। বঙ্গীয় সংস্করণের প্রথম সর্গের নাম 'সামোদ দামোদর'। বোম্বাই নির্ণয়সাগর সংস্করণেও এই নাম গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বৃহস্পতি মিশ্রের টীকাসংযুক্ত পুঁথিতে এই সর্গের নাম 'মুগ্ধমনোহর'। নারায়ণ দাসের ও বৃহস্পতি মিশ্রের টীকা সংযুক্ত পুঁথি দুইখানিতে চতুর্থ সর্গের নাম 'স্নিগ্ধ-মাধব', অন্যান্য পুঁথিতে নাম 'স্নিগ্ধ-মধুসূদন'। বোম্বাই নির্ণয়সাগর সংস্করণে, বৃহস্পতি মিশ্র ও নারায়ণদাসের টীকা সংযুক্ত পুঁথিতে দশম সর্গের নাম চতুর 'চতুর্ভুজ।' অন্যান্য পুঁথিতে নাম 'মুগ্ধ মাধব'।

প্রচলিত বঙ্গীয় সংস্করণের সঙ্গে অনেক প্রাচীন পুঁথির শ্লোক বিন্যাসের ঐক্য নাই। প্রচলিত সংস্করণে প্রথম সর্গে "দরবিদলিত মল্লী" শ্লোকের পর "আশ্লোৎসঙ্গ" শ্লোক, তাহার পরে "উন্মীলন মধু গন্ধ" শ্লোক আছে। বৃহস্পতি মিশ্রের টীকাসংযুক্ত পুঁথিতে "দরবিদলিত মল্লী"র পর "উন্মীলনমধুগন্ধ" শ্লোক এবং তাহার পর "আশ্লোৎসঙ্গ" শ্লোক আছে। এইরূপ অপর দুই একটি সর্গেও দেখিয়াছি। চতুর্থ সর্গে "গণয়তি বিহিত" শ্লোকে বৃহস্পতি মিশ্র পাঠ ধরিয়াছেন—"কলয়তি বিহিত" "কন্দর্প জ্বর সংজ্বরাতুর" স্থলে পাঠ "সংজ্বরাকুল" দ্বাদশ সর্গে "প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ" স্থলে সদুক্তিকর্ণামৃতে পাঠ "উন্মীলৎ পুলকাঙ্কুরেণ" "তস্যাঃ পাট স্থলে সদুক্তি কর্ণা-মৃতের পাঠ অস্যাঃ"।

দ্বাদশ সর্গের প্রচলিত

ইতি মনসা নিগদন্তং সুরতান্তে সা নিতান্তখিন্নাঙ্গী।
রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্॥

এই শ্লোকের পরিবর্ত্তে বৃহস্পতি মিশ্র নীচের শ্লোকটি গ্রহণ করিয়াছেন—

অথ কান্তং রতিক্লান্তমপি মণ্ডন বাঞ্ছয়ন্।
নিজগাদ নিরাবাধা রাধা স্বাধীনভর্তৃকা॥

বৃহস্পতি মিশ্র ও নারায়ণ দাস দ্বাদশ সর্গের "নীলদৃষ্টি

মিলৎ" এবং "ব্যালোলঃ কেশপাশ" শ্লোক ব্যাখ্যা করেন নাই।.

বঙ্গীয় সংস্করণের একাদশ সর্গের "ভজন্ত্যাস্তল্লান্তং" শ্লোকের পর নির্ণয়সাগর প্রকাশিত পুস্তকে এই শ্লোকটী আছে—

সানন্দং নন্দসূনুর্দিশতুমিতিপরং সংমদং মন্দমন্দং
রাধামাধায় রাহেবোর্ব্বিবরমনুদৃঢ়ং পীড়য়ন্ প্রীতিযোগাৎ।
তুঙ্গৌ তস্যা উরোজাবতনু বরতনোর্নিগতৌ মাস্মভূতাং
পৃষ্ঠং নির্ভিদ্য তস্মাদ্বহিরিতি বলিত গ্রীবমালোকয়ন্ বঃ॥

বঙ্গীয় সংস্করণের একাদশ সর্গোক্ত "জয়শ্রীবিন্যস্তৈঃ" এই শ্লোকের পর নির্ণয় সাগর পুস্তকে এই শ্লোকটি আছে—

সৌন্দর্যৈকনিধেরনঙ্গ ললনা লাবণ্য লীলা পুষো
রাধায়া হৃদিপল্বলে মনসিজ ক্রীড়ৈক রঙ্গস্থলে।
রম্যোরোজ সরোজ খেলন রসিত্বাদাত্মানঃ খ্যাপয়ন্
ধ্যাতুর্ম্মানসরাজহংস নিভতাং দেয়ান্মুকুন্দো মুদং॥

বঙ্গীয় সংস্করণের দ্বাদশ সর্গে কবির পরিচয়েই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। নির্ণয়সাগর পুস্তকে তাহার পর এই শ্লোকটি আছে—

ইত্থং কেলিততীর্বিহৃত্য যমুনা কুলে সমং রাধয়া
তদ্রোমাবলি মৌক্তিকাবলি যুগে বেণীভ্রমং বিভ্রতি।
তত্রাহ্লাদি কুচপ্রয়াস ফলয়ো লিপ্সাবতো র্হস্তয়ো
র্ব্যাপারাঃ পুরুষোত্তমস্য দদতু স্ফীতাঃ মুদাং সম্পদম্॥

বঙ্গীয় সকল সংস্করণে নীচের শ্লোকটি পাওয়া যায় না। কোন কোন টীকাকারও শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন নাই।

স্বামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ম্বরপরাং ক্ষীরোদ তীরোদরে
শঙ্কে সুন্দরি কালকুটমপিবন্মূঢ়ো মৃড়ানী পতিঃ।
ইত্থং পূর্ব্বকথাভিরন্য মনসো নিক্ষিপ্য বক্ষেঽঞ্চলং
রাধায়া স্তন কোরকোপরি মিল নেত্রো হরিঃ পাতুবঃ॥

বৃহস্পতি মিশ্রের টীকা সংযুক্ত পুঁথিতে কয়েকটি নূতন শ্লোক আছে। দুইটি শ্লোক একেবারে অস্পষ্ট। অপর শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিলাম। "যদ্ গান্ধর্ব্ব কলাসু" শ্লোকের পরই নিম্নের শ্লোকটি রহিয়াছে।

জয়শ্রী কাহ্নস্য প্রসরতর সারস্বত বত
স্ফুরদ্‌বৃন্দে গোবর্দ্ধনচরণরেণু প্রণয়িনঃ।
ইয়ং মে বৈদগ্ধী স্মরতরল বালাধর সুধা
রসস্যন্দ স্বাদু র্জয়তি জয়দেবস্য কবিতা॥

ভারত-আমেরিকার কাব্য-বন্ধন

শ্রী[illegible]কুমার চট্টোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকায় সর্ব্বাগ্রগণ্য কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকের উপর প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি, সাহিত্য ও দর্শনের যে প্রভাব পড়েছিল সে কথা আজ মনে করতে কেবল যে আনন্দই হয় তা' নয়, বেশ একটা গৌরবও সেই সঙ্গে মনকে ভরিয়ে তোলে। আজ ভারত স্বাধীন, কিন্তু সেকালে এদেশে ইংরেজের আধিপত্য বেশ কায়েমি হয়ে গিয়েছে। এক পরাধীন জাতির সাহিত্য-দর্শন, কলা-কৃষ্টি যে এক পশ্চিমী দেশের বাস্তবপন্থী মনের উপর কোন আঁচড় কাটতে পারে তা' আমরাই সেকালে, বুঝতে পারা দূরে থাকুক, ভাবতেও পারিনি। দার্শনিক এমার্সন উপনিষদের অতীন্দ্রিয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। চিন্তাসেবী থোরো ভারতীয় ভাবধারায় এক অন্তঃস্পর্শী সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করেছিলেন। কবি হুইটম্যান ভারতীয় সাহিত্য-দর্শনের আদর্শ সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। জগতের সভ্যতায় ঐ আদর্শ যে এক অমূল্য সম্পত্তি তা' হুইটম্যানই প্রচার করেন সদর্পে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে একটা ছোট কবিতার বই প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে থাকে মাত্র একটা কবিতা, তার নাম "প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" (ভারত-যাত্রা)। যে ঘটনা সমাবেশকে অবলম্বন করে কবিতাটি লেখা হয় তা' হচ্ছে এক কথায় পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বের যোগাযোগ। ইয়ুরোপে সুয়েজ খাল কাটা, আর আমেরিকায় "প্রশান্ত মহাসাগর" রেলপথ স্থাপনা ঐ দুই ব্যবস্থাই পূর্ব্ব আর পশ্চিমের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তোলার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। পূর্ব্ব-পশ্চিমের মেলামেশায় পৃথিবীতে যে এক বিরাট একক সভ্যতায় জন্ম হ'তে পারে সে-স্বপ্ন দেখেন হুইটম্যান। ঐ নবজাত সভ্যতায় প্রতীচ্যের বাস্তবতা আর প্রাচ্যের আত্মজ্ঞান এই দুয়ের হ'বে সম্মেলন। প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের ঐ সম্মেলন পরমপিতার ইচ্ছানুসারেই হ'বে, আর সেই উদ্দেশ্যেই প্রতীচ্যের বিজ্ঞানী সুয়েজ খাল কেটেছেন, আর যুক্তরাষ্ট্রে "প্রশান্ত-মহাসাগর" রেলপথ উন্মোচন করেছেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংযোগ, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ভগবানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় ঘটতে চলেছে। সে-অবস্থায় প্রতীচ্যের উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন যে প্রাচ্যে এবং বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে, কি এক

বিশেষ কৃষ্টি, কি এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানী সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। ঐ কৃষ্টি-সভ্যতা ভবিষ্যৎ জগতের কৃষ্টি-সভ্যতাকে এক বিশেষ রূপে, এক বিশেষ আদর্শে গড়ে তুলতে সমর্থ। হুইট্‌ম্যান তাঁর "ভারত-যাত্রা" কবিতায় ঐ কথাই বলেছেন এক চরম উপলব্ধির পর। ভারতে আসার পথ আবিষ্কার হওয়ার মূল সার্থকতা হলো এমন এক পুরাতনী আদর্শকে আবিষ্কার করা, যা'র মাঝে এক নূতন যুগের বীজ আছে সুপ্ত হ'য়ে। ভারতযাত্রার উদ্দেশ্যই হ'লো বিস্মৃত জ্ঞানের উদ্ধার। এ যাত্রায় প্রতীচ্য প্রাচ্যের কোলে, যেমন ছোট ভাই বড় ভাইয়ের সস্নেহ আশ্রয় লাভ করবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতীচ্য প্রাচ্যের সন্ধানে নূতন নূতন সহজ পথ আবিষ্কার করে। সেই পথে প্রাচ্যে গিয়ে ভারতীয় দর্শন-সাহিত্য, শিল্পকৃষ্টির নানা অভিব্যক্তি সংগ্রহ করে এক নূতন আন্তর্জাতিক সভ্যতা-কৃষ্টির সৃষ্টি করার জন্য এক উদাত্ত আহ্বান প্রতীচ্যের দেশে দেশে ছড়িয়ে দেন আমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান। সে আহ্বানে সক্রিয় সাড়া পাওয়া যায়নি সত্য, কিন্তু প্রতীচ্যের বুদ্ধিজীবীরা ভারত সম্বন্ধে অনুসন্ধানী ও শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে পড়েন। তাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত যে "গীতাঞ্জলী" উপহার প্রতীচ্যকে প্রদান করেন, তা' প্রতীচ্য সাদরেই গ্রহণ করে। লণ্ডনের "ইণ্ডিয়া সোসাইটি" ১৯১২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের পহেলা তারিখে "গীতাঞ্জলী" নামে ৭৫০ খানা বইয়ের এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে কবির "নৈবেদ্য," "খেয়া" আর "গীতাঞ্জলী" থেকে গৃহীত ১০৮টি বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ সন্নিবেশিত হয়। বইয়ের পরিচিতি লেখেন আয়র্লণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি ইয়েটস্। আর বইয়ের গোড়াতেই কবির যে প্রতিকৃতি দেওয়া হয় তা' আঁকেন লণ্ডন রয়েল কলেজ অফ্ আর্টসের অধ্যক্ষ রথেনষ্টিন্। লণ্ডনে "গীতাঞ্জলী" প্রকাশিত হওয়ার চারদিন আগে কবি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে পৌঁচেছেন। নিউ ইয়র্ক থেকে কবি সোজা চলে যান ইলিনইস্ রাষ্ট্রের উরবানা সহরে। ঐ রাষ্ট্রে কবি নভেম্বর—ডিসেম্বর মাস এবং জানুয়ারীর কয়েকদিন নানা গীর্জ্জায় অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। চিকাগো সহর থেকে প্রকাশিত "পোয়েট্রি" (কবিতা) নামক এক মাসিক পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় ইংরেজীতে অনূদিত ছ'টি "গীতাঞ্জলী" কবিতা প্রকাশিত হয়। "পোয়েট্রি" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এজ্রা পাউণ্ড। পাশ্চাত্য দেশে কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় "পোয়েট্রি"তে। ইলিনইস রাষ্ট্রে ভ্রমণ পর্ব্ব শেষ করে কবি যান চিকাগো সহরে; সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে "প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, তারপর সহরের ইউনিটারিয়ান হলে "অন্যায়ের সমস্যা"র উপর আলোচনা পাঠ করেন। এরপর কবি যান রচেস্টার সহরে, সেখানে আন্তর্জ্জাতিক মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়। এখানে জার্ম্মাণ দার্শনিক রুডলফ য়ুকেনের সহিত কবির পরিচয় ঘটে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় কবি "আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ"এর উপর এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। এরপর কবি যান বোষ্টন সহরে, সেখানে বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে কবি আলাপ-আলোচনা করেন। এরপর কবির আমেরিকা ভ্রমণের এক বিশেষ অধ্যায় রচিত হলো হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পর পর গোটা কয়েক বক্তৃতা দেওয়ায়। পরে এসব বক্তৃতা প্রকাশিত হয় "সাধনা" নামক পুস্তকে।

কবির আমেরিকা ভ্রমণের প্রথম পর্য্যায় শেষ হয় হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পর। এরপর রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বারের জন্য আমেরিকায় যান ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। এবারে "পণ্ড লাইসিয়াম" নামক বিশিষ্ট বক্তৃতা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কবি আমেরিকার নানা স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন সহরে প্রথম পদার্পণ করলেন। প্রথম বক্তৃতা দেন আমেরিকার নারীদের এক সম্মেলনে; তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "জাতীয়তাবাদ।" ঐ বক্তৃতায় তিনি ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করেন, পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাম্রাজ্যলিপ্সার প্রতি কটাক্ষপাত করেন।

তারপর কবি পোর্টল্যাণ্ড, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, লস্ এঞ্জেলিস্ ও নিউইয়র্ক সহরে পর পর বক্তৃতা দেন। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে কবির বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "আন্তর্জ্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ।" নিউইয়র্ক সহরের কলম্বিয়া থিয়েটার হলে তাঁর এক ছোট গল্পের অনুবাদ পাঠ করেন। এরপর ভ্রমণ তালিকা তৈরী হয় পাসাডেনা, সল্ট লেক সিটি, চিকাগো, আইওয়া, মিলওয়াকি, লুসেভিল এবং ডেট্রয়েট সহর নিয়ে। ডেট্রয়েট সহরে "জাতীয়তাবাদ" সম্বন্ধে কবি যে আলোচনা করেন আমেরিকার পত্রিকা মহল সে আলোচনার তীব্র সমালোচনা করেন। সে সমালোচনার প্রধান বক্তব্য ছিল যে কবি "মিষ্টি কথায় অবসাদগ্রস্ত মনের বিষ" উদ্গার করেছেন মাত্র। কবি কিন্তু ঐ সমালোচনার বিশেষ বিব্রত হলেন না। তাই ক্লিভ্‌ল্যাণ্ডে যে বক্তৃতা দেন তা'তে আমেরিকার "স্বর্ণলোভের" প্রতি কটাক্ষপাত করেন। নিউইয়র্ক সহরের কার্ণাগি হলে কবি এসিয়াবাসীর প্রতি আমেরিকার বিদ্বেষ ও বিদ্রূপকে শ্রোতাদের সামনে ধরে দিতে চেষ্টা করেন। ফিলাডেলফিয়ায় "ব্যক্তিত্ববাদের" উপর বক্তৃতা করেন। এ ভাবে বক্তৃতা দেওয়ার তালিকায় শেষ সহরের নাম এসে পড়লো, নিউইয়র্ক। তারপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। কবি দেশে ফিরে এলেন।

প্রায় চার বছর পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কবি পিয়ারসনকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকায় যান। ইয়োরোপেই গিয়েছিলেন বেড়াবার জন্যে; পরে লণ্ডন থেকে কবি যান নিউইয়র্ক সহরে। কবির ঐ তৃতীয়বারের আমেরিকা ভ্রমণ! ব্রুক্‌লিন সঙ্গীত শিক্ষায়তনে কবি "প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন" সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করেন। ফিলাডেলফিয়ার নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে "বাংলার দার্শনিক (মিস্‌টিক) কবি" ও নিউইয়র্ক সহরে "কবির ধর্ম্ম" সম্বন্ধে কবি বক্তৃতা দেন। কবি চেষ্টা করেন বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তুলতে, কিন্তু চরম বিফলতা এসে দাঁড়ায় তাঁর সামনে। এর পর কবি যান চিকাগো সহরে; পরে টেক্‌সাস্ রাষ্ট্রে বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছুকাল ভ্রমণ করে বেড়ান। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইয়োরোপে ফিরে আসেন!

কবি চতুর্থবার আমেরিকা যাত্রা করেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে। সঙ্গে নেন এলমহার্ষ্ট সাহেবকে। এবার কবি যান দক্ষিণ আমেরিকায়। পেরু রাষ্ট্রের শতবার্ষিকী উৎসব এ'বৎসর হয়। কবি পূর্ব্বাহ্লেই নিমন্ত্রণ পান, সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য যান কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্যে তিনি কোন বক্তৃতাই করতে পারেন না।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষাশেষি সময়ে কবি কানাডা যাত্রা করেন কলকাতা থেকে। কানাডার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কবিকে আমন্ত্রণ পাঠান তৃতীয় বার্ষিক আলোচনা সভায় বক্তৃতা দেবার জন্যে। কবি দু'দিন দু'টি বক্তৃতা দেন। প্রথমটি "অবসরের সার্থকতা"; আর দ্বিতীয়টি "সাহিত্যের ধর্ম্ম"। কবি "অবসর"-এর এক অপূর্ব্ব দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন।

"সাহিত্য-ধর্ম্মের" উপর বক্তৃতাও খুবই মনোজ্ঞ হয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সময় কবি কানাডায় অবস্থান করেন। আরও কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা দেন। পরে আমেরিকার হারভার্ড, কলম্বিয়া, ক্যালিফর্নিয়া ও ডেট্রয়েট বিশ্ববিত্তালয়গুলোর নিমন্ত্রণ পেয়ে লস্ এঞ্জেলিস্ সহরে যান। ইতিমধ্যে কবির পাস্‌পোর্ট হারিয়ে যাওয়ায় এমন এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কবি এবারের আমেরিকা ভ্রমণ বন্ধ করে দিয়ে দেশে ফিরে আসেন। আমেরিকার সরকার কবিকে যে নূতন পাসপোর্ট দেন তা'তে লেখা থাকে—যে এই অনুমতি-পত্র এশিয়াবাসী অশ্বেতকায় (কালা আদমি) জনসাধারণের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধিকে বিশেষ ব্যবস্থায় দান করা গেল। কবি ঐ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না, কারণ ঐ ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাচ্যের প্রতি আমেরিকার চরম বিদ্রূপ প্রকট হয়েছিলো। কবি ফিরে এলেন জাপানে। এরপর কবির আর আমেরিকা যাওয়া ঘটেনি।

আজ ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে এদেশের যোগাযোগ খুবই দৃঢ়। আজ কবিকে পাসপোর্ট নিয়ে কোন অপমান সহ্য করতে হতো না। কিন্তু যে-দেশের দার্শনিক এমার্সন, কবি হুইট্‌ম্যান ভারতবর্ষের দর্শন, ইতিহাস, সভ্যতা সম্বন্ধে এককালে শ্রদ্ধাবান সেই দেশই কিনা ভারতের আন্তর্জ্জাতিক কবি রবীন্দ্রনাথকেও 'কালা আদমি' ছাড়া আর কোন ভাবে দেখতে চায়নি। এ' পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নেই। যাই হোক, এ' অদ্ভুত ব্যবস্থার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই এশিয়াবাসীদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাককে আমেরিকার নাগরিক অধিকার দেওয়া হবে প্রতি বছরে—আমেরিকার আইনসভা এ' সিদ্ধান্ত করেছেন। ভারত-আমেরিকার কাব্য-দর্শনের বন্ধন এমার্সন-হুইট্‌ম্যান, বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ করে গেলেও ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র না হওয়ার দরুণ ওদেশের কাছে উচিত সম্মান পায়নি। বাস্তব-পন্থী আমেরিকার মন কেবলমাত্র বাস্তব বিচারই গ্রহণ করতে পারে সহজ ভাবে, অন্য বিচার নয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকার কাব্য-সাহিত্য, দর্শন-কৃষ্টি, কলা-শিল্প সব কিছুরই বিশেষ বিচার, সব কিছুরই প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা, আগেও ছিল আজও আছে।

বসন্ত-শেষ

আশা দেবী

হঠাৎ কখন অন্যমনে কাজের ফাঁকে
জানলাটুকু খুলে,
একটি ঝলক হাসির মতো
এলো দখিন হাওয়া।
নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ বয়ে
হাজার হাজার মৌমাছিরা
গুনগুনিয়ে গেল
পাগল-করা ফাগুন দিনের গান;
মৌ-ঝরা ফুল একটি দুটি পড়লো এসে
শিথিল কবরীতে
হারিয়ে গেল মন।

হারিয়ে যাওয়া মন
হঠাৎ যেন উঠলো কেঁদে
অঝোর ঝরে
অকারণে পড়লো মনে যেন:
ফাগুন যে আজ বন্ধ আমার ঘরে
আমার মনের গোপন কোণার
রিক্ত কোঠাগুলো
দেয় নি তো কেউ ভরে
এমনিতরো ফাগুন দিনের মতো;
মনের কক্ষ উজাড় করে নেয় নি কেউ লুটে
ভাঁড়ার ঘরের আনন্দময় ধন।

আরশিখানা তুলে
পড়েছি তো মহাকালের লেখা
ফাগুন যে যায় আবার আসে দ্বারে;
আসে না তো ফিরে
মনের ফাগুন দেহের আগল খুলি
সেই যে গেছে সোনার রঙিণ রথে॥

গত কিছুকাল হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে একশ্রেণীর নারীপুরুষের নানাপ্রকার অনাচার ক্রিয়া-কর্ম্মের সংবাদ প্রকাশ পাইতেছে। সুখের বিষয়, কলিকাতা পুলিশ উদ্বাস্তু নারী এবং বালিকাদের বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গত কয়েকদিনে পুলিস ৫০ জন নারী এবং ৪০ জন পুরুষকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরার দায়ে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছেন। ইহারা নাকি প্রলোভন দেখাইয়া উদ্বাস্তু নারী এবং বালিকাদের সরাইয়া ফেলিবার ফিকিরে ছিল। শিয়ালদহ ষ্টেশনে উদ্বাস্তু নারীদের 'বিশেষ প্রকার' সামাজিক বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইলে পুলিসের একক চেষ্টায় খুব বেশী ফল হইবে না। এ-বিষয়ে, সাধারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তির কর্ত্তব্য সুনির্দ্ধারিত। নারীকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার প্রথা নূতন নহে। সমাজ-বুকে এই পাপ বহুকাল হইতেই ক্ষতের মতো বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এই পাপের প্রকাশ এমন ব্যাপকভাবে কলিকাতা সহরে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো দেখা যায় নাই। মানুষের চরম বিপদে এবং অসহায় অবস্থার সুযোগে যাহারা মানুষকে গভীরতম পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে চায় সামান্য অর্থলাভের আশায়, তাহাদের ক্ষমা নাই। প্রয়োজন হইলে, প্রমাণিত অপরাধীর প্রতি চরম দণ্ডের ব্যবস্থাও বিশেষ আইনবলে করা দরকার। গভীর পরিতাপের বিষয়, একদল বাঙ্গালী-নারীই আজ দুর্গতা নারীর ভীষণতম অকল্যাণের সহায়করূপে কার্য্য করিতেছে। এই সকল নারীর পশ্চাতে গোপনে যে বিত্তশালী সঙ্ঘ আছে, তাহাদের আবিষ্কার করা পুলিসের এবং জনসাধারণের প্রধানতম কর্ত্তব্য। মনে রাখা প্রয়োজন, সামান্য সূত্র হইতেই বৃহত্তম ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাওয়া সম্ভব। —দৈনিক বসুমতী

*   *   *   *

ময়মনসিংহে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"বর্ত্তমানে সংখ্যালঘুরা কতকগুলি অস্বাচ্ছন্দ্যের সম্মুখীন রহিয়াছেন। গুরুতর সাংসারিক প্রয়োজনেও সংখ্যালঘুরা তাঁহাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ইচ্ছামত বিক্রয় করিতে পারিতেছেন না। সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ী নানা অজুহাতে দখল করা হইতেছে। সংখ্যালঘুদের বাড়ীর ফল, গাছ, বাঁশ, পুকুরের মাছ যে কেহ ইচ্ছামত ব্যবহার করিতেছে দেখিয়াও আপত্তি করিবার মত বল তাঁহারা পান না।" পাক-ভারত চুক্তির ফলে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সমস্যা একেবারে জলবৎ তরল হইয়া গিয়াছে বলিয়া যাঁহারা ভারতীয় ইউনিয়নে বসিয়া দিবারাত্রি প্রচার চালাইতেছেন, তাঁহারা একথা শুনিয়া কি বলিবেন? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যাঁহারা এখনো পূর্ব্ববঙ্গে রহিয়াছেন, পাকিস্তানী শাসনের মহিমা হাড়ে হাড়ে মালুম পাইতেছেন—লোকে তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিবে, না বিশ্বাস করিবে দিল্লীর প্রাসাদকূটে বসিয়া, অপরের মুখে ঝাল খাইয়া যাঁহারা বিবৃতি ছাড়িতেছেন তাঁহাদের কথা? সংখ্যালঘু সম্মেলনে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাও বলিয়াছেন, "গত হাঙ্গামার সময় হইতে অসংখ্য লোক পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজও পূর্ব্ব বাঙ্গালা হইতে উদ্বাস্তুদের স্থানান্তর গমন বন্ধ হয় নাই। অল্পসংখ্যক উদ্বাস্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করার জন্যই পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছেন।" অধিকাংশ উদ্বাস্তুই সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিতেছেন—একথা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য কিছুদিন আগে পণ্ডিত জওহরলাল এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছিলেন। এবার তিনি ও তাঁহার দলবল কি বলিবেন!

— দৈনিক বসুমতী

*   *   *   *

করিমগঞ্জ হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, গত ২৮শে মার্চ পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ মোটর লঞ্চযোগে কুশিয়ারা নদীর অপর পারে জকিগঞ্জে উপস্থিত হইয়া তথাকার ফৌজদারী আদালতের প্রাঙ্গণে আহূত এক সভায় ভাষণ দেন। মৌলানা সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার প্রস্তাব করেন এবং তজ্জন্য আপাততঃ বিনা বেতনে পাঁচ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের আবেদন জানান। সংবাদটি এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই আমরা কল্পনার চক্ষে সভার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া দেখিলাম, সভাটা হয়তো বা এতক্ষণ সামরিক আবহাওয়ায় সরগরম হইয়া উঠিয়াছে এবং উপস্থিত 'জনগণের' মধ্যে জেহাদী সৈন্য তালিকায় নাম লিখাইবার জন্য একটা তাড়া-হুড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সংবাদের পরবর্তী অংশটি আমাদিগকে অত্যন্ত হতাশ করিয়াছে: সভাস্থলে কে বা কাহারা যেই-না বলিল যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, অমনি সভাস্থ 'জনগণ' জানের ভয়ে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় হিন্দু বাড়ীর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব এই ডামা-ডোলের মধ্যে পড়িয়া কি করিলেন ও কোথায় গেলেন ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি: ছুটাছুটি করিতে গিয়া যদি হাত-পা ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বুড়ো-হাড় কি আর জোড়া লাগিবে! —আনন্দবাজার পত্রিকা

*   *   *   *

এদেশে শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া দিল্লীর হাটে কয়েক দিন আগে কংগ্রেসী হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দস্তর মত 'চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি' সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আর বার্লিনে 'রয়টারের' হাঁড়ি ফাঁসাইয়া মস্ত সোরগোল তুলিয়াছেন মিঃ জন পিট। ভদ্রলোক ছিলেন বার্লিনে রয়টারের প্রধান সংবাদদাতা। অকস্মাৎ একদিন পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীতে গিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করিয়া বসিলেন—আর তিনি পশ্চিম জার্ম্মাণীতে

ফিরিয়া গিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সমরলিপ্সুদের হাতের পুতুল হিসাবে কাজ করিবেন না। শুধু এই সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াই মিঃ পিট ক্ষান্ত হন নাই। ভদ্রসমাজে 'রয়টারের' নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার মুখোস খুলিয়া দিয়া বলিয়াছেন, "পূর্ব্ব ইউরোপ এবং পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর জনসাধারণের উন্নতির চেষ্টা সম্বন্ধে যে সব খবর আমি দিতাম, ইচ্ছা করিয়াই তাহা চাপিয়া রাখা হইত। এতদিনে আমি বুঝিয়াছি, পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু সে শুধু যুদ্ধাতঙ্ক প্রচার করিবার স্বাধীনতা। আমরা সাংবাদিকরা এই প্রচারের কাজে সাহায্য করার জন্যই পয়সা পাইয়া থাকি।" থলির ভিতর হইতে এই-ভাবে বিড়াল বাহির হইয়া পড়িতে দেখিয়া স্বভাবতঃই বার্লিনের রয়টারের কর্ত্তারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা অস্ফুট স্বরে যেন বলিতেছেন—"হেড অফিসের বড়বাবু লোকটি বড় শান্ত, তাঁর যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানতো?" কিন্তু মাথার 'ব্যামো' প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াও এই কেলেঙ্কারী চাপা দেওয়া যে সহজ হইবে, ব্যাপার দেখিয়া তাহা মনে হয় না।

—দৈনিক বসুমতী

*　*　*　*

বর্ত্তমানে কলিকাতার বাজারে অনেকেই এরূপ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, দোকান হইতে ১০ গজ মাপের কাপড় ক্রয় করিয়া তাহা ধোয়াইবার পর দেখা যায় যে, উহার দৈর্ঘ্য ৯ গজের বেশী নহে। এই ভাবে ছোট মাপের কাপড়ের উপর বড় মাপ ছাপ দিয়া জনসাধারণকে প্রতারণা করিবার ব্যাপার সম্প্রতি আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরস্থ ভারতীয় বণিক সভার সভাপতি সর্দ্দার হরদয়াল সিং এরূপ অভিযোগ করিয়াছেন যে, ঐ স্থানের বাজারেও অনুরূপ ধরণের কাপড় রপ্তানী করা হইতেছে। কেবল তাহাই নহে। রপ্তানীকৃত কাপড়ের বুনন সকল স্থানে সমান নহে এবং ভারতীয় রপ্তানীকারকগণ অর্ডার মাফিক মাল সরবরাহ করেন না বলিয়াও সিঙ্গাপুরের বাজারে অভিযোগ রহিয়াছে। মোটের উপর কাপড়ের কলওয়ালা ও কাপড় রপ্তানীকারকদের দুর্নীতিমূলক কাজের জন্য বিদেশের বাজারেও ভারতীয় কাপড়ের দুর্নাম রটিয়াছে। উহার শেষ পরিণতিতে বিদেশের বাজারে ভারতের কাপড়ের কাটতি যে বন্ধ হইবে এবং ভারতের বাজারে উহার কাটতি যে সঙ্কুচিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ বর্ত্তমানে বিদেশে কাপড় রপ্তানীর দ্বারা ভারত সরকার ১০০ কোটি টাকার সমমূল্যের বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস করিতেছেন। মুষ্টিমেয় কাপড়ের কলওয়ালার দুর্নীতিমূলক স্বার্থপরতার জন্য সমষ্টিগতভাবে ভারতের এই ভাবে স্বার্থহানি ভারত সরকার আর কতদিন নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে প্রত্যক্ষ করিবে?

—আর্থিক জগৎ

*　*　*

আজ মানুষের চিন্তার মধ্যে যে আবিলতা প্রবেশ করিয়াছে তাহা দূর করাই হইবে আজকের দিনের প্রথম কাজ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও আমরা অন্যভাবে চিন্তা করিতে পারিলাম না—এই পরাজয়, আজ আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইল। দেশকে সত্যই আমরা ভালবাসি কিনা—দেশের জন্য এতকাল দুঃখ বরণ করিয়াও আজো আমরা প্রমাণ করিতে পারিলাম না। ফাঁকি ক্রমশই আমাদের ধরা পড়িতেছে। ফাঁক ছিলো ঐ ভালবাসার মধ্যেই। ভালো দেশকে বাসি নাই—ভাল বাসিয়াছিলাম নেতৃত্বের লোভকে, আমার "অহং" কে। তাই সকল দিকের অনাচার আজ এমন কুৎসিৎরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। দেশ-প্রেমিকতার এমন নাটকীয় অভিনয় আর কোন দেশের ইতিহাসে দেখা যায় নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ নিয়োগী মহাশয় পদত্যাগকালে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছি। বাণিজ্য-সচিব নিয়োগী মহাশয়ের অজ্ঞাতসারেই পাকিস্তানের সহিত এই যে গোপন চুক্তি এতকাল ধরিয়া চলিতেছিল—ইহার কোনো সদুত্তর গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলিয়া ঘোষণা করার পরেও সরকারের এই মনোভাব অপরিবর্তিতই রহিয়া গেলো—ঠিক এই কারণেই জনসাধারণ তাহার রাষ্ট্রকে আপন-রাষ্ট্র বলিয়া আজো মনে করিতে পারিল না।

—সৈনিক

*　*　*

সিমলন অঞ্চলে চাষীরা সরকারী বীজাগার হইতে আলুর বীজ কিনিয়াছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে এই আলুর-বীজ জল পাইয়া পচিয়া গিয়াছিল। ফলে গাছ ঠিকমত বাহির হয় নাই বা তাহাতে চাষীদের ক্ষতি হইয়াছিল। এই ক্ষতি পূরণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। সরকার এই আবেদনে যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া চাষীদের নিকট হইতে বাজারের আলুর দর যখন ৫।০—৫॥০ মণ, সেই সময় সরকার ১১।০ দরে আলু কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারের এই প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

—বর্দ্ধমানের কথা

*　*　*

পাকিস্তানী গুপ্তচর বা পঞ্চমবাহিনীকে সমূলে উৎপাটন না করিতে পারিলে আমরা ধ্বংস হইব। একথা কোন সময়েই বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত কোন সরকার বা পুলিশ বিভাগই এই বিষবৃক্ষের মুলোৎপাটন করিতে সমর্থ হইবে না। মুর্শিদাবাদ জেলার রাষ্ট্রানুগত প্রত্যেকটি হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে এবিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। আজ যাহারা আমাদের রাষ্ট্রকে নিজের রাষ্ট্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুন্ঠিত,—আমাদের নদ, নদী, আমাদের ডাকঘর, আমাদের কলকারখানা, আমাদের অফিস, আমাদের আদালত, আমাদের ক্ষেতের ফসল, আমাদের যান-বাহন নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে আজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহারা হিন্দুই হউন, মুসলমানই হউন, খৃষ্টানই হউন, অথবা বৌদ্ধই হউন কোন মতেই যেন তাহাদের ক্ষমা করা না হয়। প্রতিদিন যাহারা আমাদের মুখের আহার, আমাদের পরণের কাপড়, আমাদের রোগের ঔষধ ও রোগীর পথ্য সুরঙ্গ পথে চালান দিতেছে,

প্রতিদিন যাহারা আমাদের আলো নিভাইয়া দিতেছে, আমাদের বাতাস বিষাক্ত করিতেছে, তাহাকে ক্ষমা করিও না। একজন লায়েক আলী পলাইয়াছে পলাইতে দাও, ঘরের কোণে প্রতিবেশী লায়েক আলির সৃষ্টি যেন আর ভবিষ্যতে না হয়। —গণরাজ

* * *

যাঁরা জগতে শান্তির পূজারী, যাঁরা মানবের কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় আত্ম-সমাহিত, যাঁরা নিজের জীবনের উপলব্ধ সাধনা দ্বারা সর্বসাধারণের মনে প্রেরণা সঞ্চার করছেন তাঁরা নমস্য, পূজ্য। সেই মহাপুরুষের মধ্যে যাঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা উঠেছে তাদের মধ্যে ভারতীয় আছেন শ্রীঅরবিন্দ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আর পণ্ডিত জওহরলাল। তাঁদেরই সঙ্গে একই পর্যায়ে পাশ্চাত্য দেশের যাঁদের নাম চোখে পড়ছে তাঁদের মধ্যে আছেন বৃটেনের ভূতপূর্ব যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী চার্চিল আর আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। শেষোক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের যুদ্ধের আশা আজও মেটেনি; অপরজন নাগাসাকি ও হিরোসীমার নরমেধ যজ্ঞে শান্তির বীজ বপন করে খ্যাতি অর্জন করেছেন ও অহমিকার তুঙ্গ শিখরে বসে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। পুরস্কারের ফসলের ক্ষেত্র পশ্চিমে। সেখানে শান্তির ধারণা কতখানি স্পষ্ট তা এই শান্তি-পূজারীদের নাম-মালায় প্রকাশ পেয়েছে। —পদাতিক

* * *

এবার দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির ফলে বর্দ্ধমানের মধ্যস্থিত বাঁকা নদীটী একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিল ১৩০৭ সালের অনাবৃষ্টির পর বাঁকার এমন দুরবস্থা আর দেখা যায় নাই। স্থানে স্থানে যেটুকু জল থাকিত, এবৎসর তাহাও নাই। যেখানে একটু জল আছে, সেখানকার জলে এমন দুর্গন্ধ যে, পার্শ্ববর্তী অধিবাসীরা তিষ্টিতে পারে না। বাধ্য হইয়াই অনেকে ঐ জলই পানীয় ও ব্যবহার্য্যরূপে ব্যবহার করিতেছে। ফলে বসন্ত ও কলেরা রোগ সংক্রমিত হইতেছে। উল্লেখযোগ্য যে, বাঁকার জল বর্দ্ধমানের কয়েকটী অঞ্চলের লোকদের পক্ষে অপরিহার্য্য। নদী নালা সংস্কারের জন্য যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হইয়াছিল, বাঁকা সংস্কারে সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে সহরের জলাভাব প্রভূতরূপে লাঘব হইবে এবং চাষ আবাদেরও উন্নতি হইবে। —আর্য্য

* * *

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তক "কিশলয়ের" একখণ্ড সম্প্রতি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সরকারী দপ্তরখানা ভিন্ন অন্যত্র ইহার দুষ্প্রাপ্যতাই অবশ্য আমাদের বিলম্বে প্রাপ্তির প্রধান হেতু।

প্রাথমিক স্তরে পুস্তকহীন-শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করিয়া তাহারই সহিত সঙ্গতি রক্ষাকল্পে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য একটি পুস্তক শিক্ষা-অধিকার নিজে প্রকাশ করিবেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্য কোন গ্রন্থকারকে প্রবেশ করিতে দিবেন না—এই বিজ্ঞপ্তি যে সময় সংবাদ পত্রাদিতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল—তখন দেশের বহু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমরাও তখন ইহার অনুমোদন করিতে পারি নাই।......

কিন্তু সরকার অস্বাভাবিক জেদের সহিত সে সকল প্রতিবাদ তখন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে আমরা সে সময় স্বভাবতঃই এ কথা মনে করিয়াছিলাম যে প্রস্তাবিত গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই অভিনব সম্পদসমৃদ্ধ একটা অপূর্ব্ব পুস্তকই হইবে। ভাবিয়াছিলাম, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থই হয়ত বা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার এবার আমদানী করিতে যাইতেছেন নতুবা এতটা দৃঢ়তা তাঁহারা দেখাইতেন না; কিন্তু পুস্তকখানি হাতে পাইয়া আমরা একেবারেই নিরাশ হইয়াছি। —বাঙলার শিক্ষক

* * *

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি অনেকাংশে স্কুল সব ইনস্পেক্টার বা অবর পরিদর্শকগণের কার্য্যের উপর নির্ভর করে। প্রাথমিক শিক্ষকগণের এক হিসাবে তাঁহারাই বন্ধু, উপদেষ্টা এবং পথ প্রদর্শক। অথচ এই অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারীবৃন্দের দুর্দ্দশার প্রতি প্রাথমিক শিক্ষকগণেরই মত সরকার এবং জন সাধারণ তুল্যরূপে উদাসীন। আমরা বহু বৎসর ধরিয়া সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতা মঞ্চ হইতে সরকার ও জন সাধারণের নিকট ইঁহাদের এই দুরবস্থার কথা জানাইয়া আসিতেছি। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ইহার কোন প্রতিকার হইল না। ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। ইঁহারা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত। দুরদৃষ্টবশতঃই শিক্ষা বিভাগের নিম্ন বিভাগে চাকুরী লইতে বাধ্য হইয়াছেন। হাড়ভাঙ্গা খাটুনী ইঁহাদের খাটিতে হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই সেই খাটুনীর কিছু মাত্র পুরস্কার লাভ ইঁহাদের ভাগ্যে জুটে না। আমরা শিক্ষা সচিবকে আবার বলিতেছি ইহাদের সক্রিয় সাহায্য এবং পরিপূর্ণ সহযোগিতা ভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষোন্নতির কোনও পরিকল্পনাই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। —শিক্ষক

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ যে দিল্লীর এক উদ্বাস্তু কেন্দ্রে উদ্বাস্তুদের কুটীরশিল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প শিক্ষাদানের জন্য এক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থানুযায়ী জাপান হইতে কিছু জাপানী যন্ত্রপাতি এবং কারিগর আনা হইয়াছে। তাহাদের শিক্ষাধীনে দুই শতাধিক উদ্বাস্তু কারিগরী শিক্ষালাভ করিতেছে। দেশের বিভিন্ন উদ্বাস্তু কেন্দ্রেও অনুরূপভাবে উদ্বাস্তুদের কারিগরী শিক্ষাদানের জন্য ভারত সরকার নাকি আরো কারিগর এবং জাপানী যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়াছেন। পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে সকলে সমর্থন করিবেন। সাধারণ-ভাবে বাঙালী উদ্বাস্তুদের কর্ম্ম বিমুখতা এবং দুরবস্থা সম্বন্ধে নানা কথা শোনা যায়। এই ব্যবস্থা যাহাতে শীঘ্র পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের মধ্যে অবলম্বন করা যায় সেদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই দৃষ্টান্ত হইতে শরণার্থীদেরও কি শিক্ষণীয় কিছু নাই? —নির্ণয়

—ভারত মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্ব্বে পাকিস্থানে যে পাট ক্রয় করে তাহা এবং আসাম হইতে পাকিস্থানের মধ্য দিয়া আমদানীর পথে অনেক পাট পাকিস্থান আটক করে। এজন্য ভারত পাকিস্থানকে কয়লা দেওয়া বন্ধ করে। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে যে, উক্ত পাটের মধ্যে ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার ২০১ মণ পাকিস্থানী পাট এবং ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩১৭ মণ আসামী পাট পাকিস্থান এই পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে এবং উহার মধ্যে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬২১ মণ আসামী পাট ও ৫ লক্ষ ১ হাজার ৮২৩ মণ পাকিস্থানী পাট ভারতে পৌঁছিয়াছে। একমাত্র পাকিস্থানেই ২৫ লক্ষ মণের উপর ভারতীয় পাট আটক পড়িয়াছিল। কাজেই মোট পাটের এখনও কিছুই আসে নাই। —আর্থিক জগৎ

* * *

দিল্লীর অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর তথাকার সংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেন যে, রাজধানীতে চোরাবাজারে ১ মণ ময়দার মূল্য ১০০৲ টাকা। উহার নিয়ন্ত্রিত মূল্য প্রতি মণ ১১৲ টাকা। পক্ষকাল পূর্ব্বে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করিয়া তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, চোরাবাজারে প্রতি মণ চিনি ৭০৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়। চোরাবাজারের সংবাদ ডিরেক্টর মহাশয় পাইয়াছেন—সাংবাদিকদের সেই সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন—দিল্লীর সংবাদে কেবল ইহাই জানিলাম। কিন্তু জনসাধারণের জানিবার বিষয় চোরাবাজার দমনকল্পে দিল্লী কর্তৃপক্ষ অক্ষম হইতেছেন কেন? ১১৲ টাকা যাহার নিয়ন্ত্রিত মূল্য তাহা ১০০৲ টাকায় ক্রয় করে কাহারা, কেন এবং কোন্ উদ্দেশ্যে। দেশে চোরাবাজার আছে—রাজধানীতে (রাজধানী মাত্রেই ধনপতিদের সমাগম ও সমারোহ ঘটে) হয়তো বেশী আছে ইহা জনসাধারণ জানে ও বিশ্বাস করে। কিন্তু "চোরাবাজার" নির্মূল করিবার জন্য রাজধানীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে কিনা—তাহাই আমরা জানিতে চাই। চোরাবাজার দমনের জন্য সরকার ও সরকারী কর্মচারিগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস আনিয়া দেওয়া কিন্তু খুব শক্ত নহে; কেবল বড় বড় কতকগুলি চোরাকারবারীকে আদর্শ সাজা দান করিয়াই তাহা করা যায়। —আনন্দবাজার পত্রিকা

* * *

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থার জন্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে বোর্ড গঠিত হইয়াছে, তাহার একটি পরিকল্পনা সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করিয়াছেন ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। এই পরিকল্পনার তেরো দফা কর্ম্মসূচী পাঠ করিয়া আমাদের ইহাই মনে হইতেছে যে, যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে উপায়ের অভাব হয় না। কিন্তু পুনর্ব্বসতি দপ্তরের শোভা হিসাবে যাহারা উচ্চপদে বিরাজ করিতেছেন, এই ধরণের পরিকল্পনা বহু পূর্ব্বেই তাঁহাদের নিকট হইতে আশা উচিত ছিল। একটা ডামাডোল, হৈচৈ-এর মধ্যে অর্থের কখনও সদ্ব্যয় হইতে পারে না। যাহারা প্রকৃত সাহায্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র, তাহারা পিছনের অন্ধকারে পড়িয়া থাকে, আর স্বার্থ ও সুযোগসন্ধানী দল সম্মুখে আগাইয়া সাহায্য লাভ করে। এই দৃশ্যই আমরা গত তিন বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি। ভারত গভর্ণমেণ্ট উদ্বাস্তু আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য এযাবৎ কম অর্থ ব্যয় করেন নাই, কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা কোথায় কাহার নিকট গিয়াছে, কিরূপে উহা ব্যয় হইয়াছে তাহার সন্ধান বা হিসাব লইলে তাহা খুব প্রীতিকর হইবে না। সে যাহাই হউক, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরালোচনা করিয়া লাভ নাই। বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর কিভাবে পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাদের আশ্রয় ও কর্ম্ম সমস্যার কিরূপে সমাধান করা সম্ভব তাহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তথা ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দিয়াছেন এবং আমরা বিশ্বাস করি, গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের সহযোগিতায় পুনর্ব্বসতির কাজ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে না হইলেও অনতিবিলম্বে উহার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান সম্ভব হইবে। —যুগান্তর

* * *

জন মাথাইয়ের পদত্যাগ, আচার্য্য কৃপালনীর বক্তৃতা এবং শেঠ ডালমিয়ার পত্র দেশের বর্ত্তমান আর এক উদ্বেগজনক ঘোষণা। জন মাথাই যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে গণতন্ত্রের পঙ্গুতা প্রকটিত, আর শেঠ রামকৃষ্ণ নরনারী ও পাপশক্তি সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতেও দুর্নীতির কদর্য্য নারকীয় রূপ দেখা গিয়াছে। আর শ্রীকৃপালনীর পার্লিয়ামেণ্টের বক্তৃতা সকলের ত্রাসের কারণ হইয়াছে। তিনি মন্ত্রীপদে সমাসীন ব্যক্তির উৎকোচ গ্রহণের কথাও বলিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে গুড় কেলেঙ্কারী, জমিদারী কেলেঙ্কারীর কথা তো প্রচারিতই হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রীর ঘুষ লওয়া উল্লেখ করিবার পর কৃপালনী আর যাহা বলিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত আতঙ্কজনক। তিনি বলিয়াছেন:—"জনসাধারণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, পুরাতন শাসনেই তাহারা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল।" সে কি,—স্বাধীনতা অপেক্ষা পরাধীনতা সুখের? কেন দেশবাসীর মনে এ ভাব জাগিল? কাহার দোষ? কাহাদের ত্রুটী বিচ্যুতিতে? এদিকে নয়া দিল্লীতে ১লা জুনের পার্লিয়ামেণ্টের বিতর্কে প্রকাশ, শ্রীগিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের লোক হওয়ায় পণ্ডিত নেহরু তাঁহাকে সমর্থন করেন এবং বাজপেয়ীর জন্যই কাশ্মীর ব্যাপার নাকি ভারতের প্রতিকূল হইতেছে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন একদিন গান্ধীজী-কথিত সয়তানী শাসনের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তিনি বিদেশী। পণ্ডিত জওহরলালের উপর এমন অনতিক্রম্য প্রভাব কিসের জন্য? —আর্য্য

* * *

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বহুল পরিমাণ আলু উদ্বৃত্ত হইয়া পড়াতে— উক্ত দেশ ২২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৫৫ ব্যাগ আলু স্পেন, পর্ত্তুগাল, ইসরায়েল, সিংহল, বেলজিয়াম, ইটালী প্রভৃতি দেশে সস্তা দরে বিক্রয় করিবার জন্য দিয়াছে। প্রতি ব্যাগে ১০০ পাউণ্ড আলু ছিল এবং প্রত্যেক ব্যাগের মূল্য পড়ে ১ সেণ্ট—আমাদের দেশের হিসাবে তিন পয়সার সামান্য কিছু বেশী। —আর্থিক জগৎ

* * *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজগণ ইহা বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালীরা বিশেষভাবে দেশপ্রেমিক ও চিন্তাশীল এবং সেনাবাহিনীতে তাহাদিগকে রাখা মোটেই নিরাপদ নহে। ইহার ফলে "বেঙ্গল আর্ম্মি" ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং হীনবল করিবার জন্য বাঙ্গালীদিগকে অসামরিক জাতিতে পরিণত করা হয়। বিদ্রোহের পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অতঃপর মূলতঃ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অঞ্চলবিশেষ হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন সম্পন্ন করেন এবং তাহাদের মধ্যে যাহাতে ঐক্যবোধ জাগ্রত না হয় ও একদল আর এক দলকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকেন। ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত সৈন্যবলের সাহায্যেই প্রকৃতপক্ষে ইংরাজগণ ভারতবর্ষ শাসন করিতেন—সামান্য গোরা সৈন্য যাহা থাকিত, তাহা দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ মাত্র সামরিক শক্তির জোরে শাসন করা যাইত না। ইংরাজের এই দুর্ব্বলতার বিষয় যাহাতে ভারতবাসীদের নিকট যতদূর সম্ভব গোপন থাকে, সে সম্বন্ধেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন।

সৈন্যগণ ষ্টেনগান লইয়া বোম্বাই নগরীর রাজপথে পাহারা দিতেছে

অতএব দেখা যায়, যে, ভারতীয় সৈন্যগণের পূর্ণ আনুগত্যের উপরই ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব ছিল প্রধানতঃ নির্ভরশীল এবং ইহাকেই মূলধন করিয়া ইংরাজগণ নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষ শাসন করিতেন ; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রয়োজনের তাড়নায় ব্যাপকভাবে সৈন্যবাহিনীতে লোক-সংগ্রহ করার ফলে সৈন্যবাহিনীতে বহুদিনের সযত্ন-রক্ষিত শৃঙ্খলা অনেকখানি বিপর্য্যস্ত হয় এবং যুদ্ধের প্রথম দিকটায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটিশের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে এই শৃঙ্খলা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রণক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণের সময় ইংরাজ সৈন্যগণের অপসরণই অগ্রাধিকার লাভ করে এবং ভারতীয় সৈন্যগণের একটা বৃহৎ অংশকে পশ্চাতে ঘাঁটি আগ্‌লাইবার জন্য রাখিয়া অধিকাংশ ইংরাজ সৈন্যই নিরাপদে স্থানত্যাগ করে। ভারতীয় বাহিনী বিপদ ও অনাহারের মধ্যে পরিত্যক্ত হয়। পরবর্ত্তীকালে মূলতঃ এই সকল ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারদের লইয়াই আজাদ-হিন্দ-ফৌজ সংগঠিত হয় এবং এতদিনের সামান্য বেতনভুক্ পেশাদার সৈন্যগণ আপনাদের জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া যোগ্য নায়কের নেতৃত্বাধীনে জাতীয় বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়।

হাজার হাজার সৈন্যের এইভাবে পরিত্যক্ত হওয়া এবং তাহাদের দ্বারা আজাদ-হিন্দ ফৌজ সংগঠিত হওয়ার ফলে যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে এক গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সৈন্যগণ ইহা উপলব্ধি করিতে সুরু করে, যে, রণক্ষেত্রে কামানের গোলার খোরাক হিসাবেই কেবলমাত্র তাহাদের প্রয়োজন—তাহাদিগকে দরকার কেবল ইংরাজ সৈন্যগণের স্থানত্যাগ নিরাপদ করিবার জন্য পশ্চাতের ঘাঁটি আগ্‌লাইতে। তাহাদের সুখ-সুবিধা এবং মঙ্গলের জন্য ইংরাজ- সরকারের কোনও দায়িত্ব নাই। এতদ্ব্যতীত সৈন্য ও অফিসার হিসাবে ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বেতনের তারতম্য ছিল গভীর। ইংরাজগণের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য ভারতীয়গণকে দেওয়া হইত। ইংরাজ অফিসারদের নিকট হইতে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অসম্মানজনক আচরণ লাভ করা ছাড়া ভারতীয় সৈন্যদের আর কিছুই লাভ হইত না। এইরূপ অভিযোগও শুনা যায় যে কমাণ্ডার কিং "তলোয়ার" নামক জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীদের নাকি "কুলীর বাচ্ছা" ইত্যাদি সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন। যুদ্ধ শেষে প্রয়োজন না থাকায় সেনা-বিভাগে ব্যাপকভাবে ছাঁটাইয়ের উদ্যোগ চলিতেছিল। তাহার ফলেও অনেকের সহসা বেকার হইবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনানীবৃন্দের বিচারকার্য্য সুরু করার ফলেও সেনা-বিভাগের ভারতীয়গণের মধ্যে প্রবল অসন্তোষের সঞ্চার হয়।

নৌ-শিক্ষার্থীরা তাহাদের বিবিধ অভাব-অভিযোগের বিষয় প্রথমে কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করে, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় না। কোনও ব্যবস্থাবলম্বনের চেষ্টামাত্র না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ উহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ভারতীয় নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি ভাইস-এ্যাড্‌মিরাল গডফ্রে যখন বোম্বাই পোতাশ্রয়ে "তলোয়ার" নামক জাহাজটি পরিদর্শন করিতে যান, তখন পি, সি, দত্ত নামক জনৈক টেলিগ্রাফিষ্ট জাহাজের দেওয়ালে "ভারত ছাড়" "জয় হিন্দ" প্রভৃতি লিখিয়া দেন। এই অপরাধের জন্য পি, সি, দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিলে পি, সি, দত্তের আচরণের মধ্যেই নৌ-শিক্ষার্থিগণের মনোভাবের পরিবর্ত্তন অনুধাবন করিতে পারিতেন। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের পাকা বনিয়াদে যে ঘুণ ধরিয়াছে—ভারতবাসীদের "ভারত ছাড়" দাবী যে সমর-বিভাগের ভারতীয়গণেরও দাবীতে দাঁড়াইয়াছে—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারা চেষ্টা করিলেন না। চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদীসুলভ মনোভাব লইয়াই তাঁহারা ঘটনাকে আয়ত্ব করিবার চেষ্টা করিলেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হইল—রুদ্ধ রোষ প্রথমে ধর্ম্মঘটের আকারে, পরে প্রচণ্ড বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করিল। "তলোয়ার" জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্ম্মঘট প্রথম সুরু হইল ১৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে। প্রায় ১১০০ নৌ-শিক্ষার্থী এই ধর্ম্মঘটে অংশ গ্রহণ করিল।

অসন্তোষ দ্রুত বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। "কলাবতী," "আউধ," "ন্যাসিক" ও "নিলাম" জাহাজও পরের দিনই যোগদান করিল এই ধর্ম্মঘটে। ইহাতে ধর্ম্মঘটী নৌ-সৈন্য ও নৌ-শিক্ষার্থিগণের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় ২০,০০০। ইহার পর ক্রমশঃ "আকবর," "মার্চলিমার," "ফিরোজ" প্রভৃতি জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীরা এবং বিভিন্ন ডকের শ্রমিকরাও ধর্ম্মঘটে যোগদান করার ফলে ধর্ম্মঘটীদের শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। বোম্বাই শহরের রাজপথে ধর্ম্মঘটীদের এক বিরাট্ শোভাযাত্রা বাহির হইল। যে সকল লরী তাহাদের দখলে ছিল, সেগুলির উপরে কংগ্রেস ও লীগের পতাকা এবং লালঝাণ্ডা উড়াইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হইল। বিক্ষুব্ধ ধর্ম্মঘটীরা যে সর্ব্বসময়ই শান্তিপূর্ণ রহিল, তাহা নহে। কোথাও কোথাও তাহারা ইংরাজ-সৈনিক অথবা পুলিশ অফিসারদিগকে প্রহার করিতেও দ্বিধা করিল না। কতকগুলি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানও তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইল। ধর্ম্মঘটীদের মধ্যে কোনও শৃঙ্খলাই বজায় রহিল না। ২১শে তারিখের মধ্যে বোম্বাই পোতাশ্রয়ের প্রায় কুড়িখানি জাহাজ বিদ্রোহীদের দখলে চলিয়া গেল—এমন কি, প্রধান সেনাপতি স্বয়ং যে জাহাজখানিতে থাকেন, সেই ফ্লাগসিপ "নর্ম্মদা" পর্য্যন্ত বাদ পড়িল না। সবগুলি জাহাজের উপরই বৃটিশ পতাকার পরিবর্ত্তে কংগ্রেস ও লীগের পতাকা শোভা পাইতে লাগিল।

নৌ-বিদ্রোহ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাই শহরের অধিবাসীরাও চঞ্চল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নাগরিকগণ ক্ষিপ্ত হইয়া বোম্বাইয়ের গিরগাঁও ও কলবাদেবী অঞ্চলে ট্রাম-বাস ভাঙ্গিয়া আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল, সরকারী অফিস প্রভৃতি আক্রমণ ও লুঠ করিতে লাগিল, বৃটিশ সৈন্য ও পুলিশের সহিত লড়াই করিবার জন্য স্থানে স্থানে ব্যারিকেড রচনা করিল। সমগ্র বোম্বাই শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ায় পূর্ণমাত্রায় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতে লাগিল। পুলিশ ও সৈন্যগণ বিভিন্ন স্থানে বহুবার গুলি চালাইল।

নৌ-ধর্ম্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য বোম্বাইয়ের মেরিন-ড্রাইভ ও আন্ধেরী এলাকার ভারতীয় বৈমানিকগণও ধর্ম্মঘট সুরু করিল। বাংলায় কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত রেহালার নৌ-শিক্ষার্থীরা, মাঝেরহাটের নৌসৈন্যগণ এবং "হুগলী" জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীরাও ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিল। মাদ্রাজে "আদিয়ার" রণপোতের নৌসৈন্যেরাও কাজ বন্ধ করিয়া দিল। বিদ্রোহ কিন্তু প্রবল আকারে দেখা দিল করাচীর বন্দরে। সেখানকার "হিমালয়", "বাহাদুর", "চমক" এবং "হিন্দুস্থান" প্রভৃতি বিদ্রোহে যোগদান করিল এবং তাহাদের নেতৃত্ব করিতে লাগিল "হিন্দুস্থান"। "হিন্দুস্থান" জাহাজের নৌসৈন্যেরা একেবারে চরমপত্র দিয়া বসিল। তাহারা সোজাসুজি জানাইয়া দিল, যে, সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার মধ্যে তাহাদের দাবী স্বীকার করিয়া না লইলে তাহারা সৈন্যদের উপর গুলি চালাইবে। ইহার পর সামরিক পুলিশ "হিন্দুস্থান"-এর উপর গুলিবর্ষণ করিল—"হিন্দুস্থান" তাহার প্রত্যুত্তর দিল দুইটি কামান হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া। সিগন্যালের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া "হিন্দুস্থান" করাচীর অন্যান্য বিদ্রোহী জাহাজগুলিকে আবশ্যক নির্দ্দেশাদি দান করিতে লাগিল।
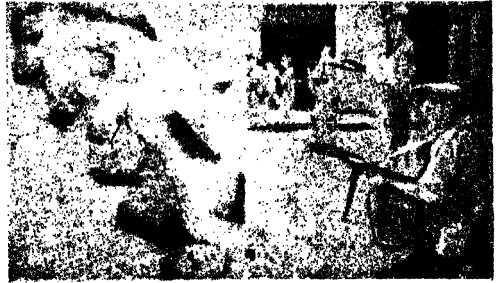
নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাই-এ গণ-বিক্ষোভ। মিলিটারির গুলিতে নিহত কয়েকজন

আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় সৈন্য বিভাগে যে ভাঙ্গন ধরাইয়াছিল, নৌ-বিদ্রোহে তাহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিল। সামরিক সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগে ভারতীয়গণের যে ঐকান্তিক আনুগত্যের উপর বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ছিল, ইংরাজ কূটনীতি ও সমরনীতিবিদ্‌গণ বুঝিতে পারিলেন যে তাহা আর বিন্দুমাত্র নির্ভরযোগ্য নহে। যে বিদ্রোহ নৌ-বিভাগে সুরু হইয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে অন্যান্য বিভাগেও তাহার সংক্রমণ সংঘটিত হইতে পারে। অসন্তুষ্ট জনসমষ্টি, বিরুদ্ধ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিদ্রোহী সৈন্যদল লইয়া তাঁহারা বারুদের স্তূপে বসিয়া আছেন—যে কোনও মুহূর্ত্তে বিস্ফোরণ ভয়াবহরূপে আরও প্রচণ্ড হইতে পারে। অতএব সত্য সত্যই ভারত হইতে বৃটিশ সিংহের সসম্মানে প্রস্থানের সময় সমাগত হইয়াছে। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে তখনও কর্তৃপক্ষের মনে যেটুকু ইতস্ততঃ ভাব ছিল, নৌ-বিদ্রোহ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা দূরীভূত করিয়া বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইল।

নৌ-বিদ্রোহ সুরু হওয়ার একদিন পরেই ১৯৪৬ সালের ১৯শে

ফেব্রুয়ারি বিলাতের শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ভারত সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। তাহাতে বলা হইল যে, ভারতে শীঘ্রই ঐক মন্ত্রি-মিশন প্রেরিত হইবে এবং ভারত যাহাতে দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা ভারতের নূতন শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন।

কয়েকদিন যাবৎ নৌ-সৈন্যগণ ক্যাস্‌ল ব্যারাকের মধ্যে ঘাঁটি করিয়া বৃটিশ সৈন্যগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে রত রহিল। ব্যারাকের অভ্যন্তরস্থ অস্ত্রাগারটি রহিল তাহাদেরই দখলে। ২১শে তারিখে রাত্রে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলি কমন্স সভায় এক বিবৃতি দিয়া জানাইলেন, যে, ঘটনাকে আয়ত্তে আনিবার জন্য বৃটিশ নৌ-বহরের একটা বড় দল বোম্বাই বন্দর অভিমুখে ইতিমধ্যেই যাত্রা করিয়াছে। নয়াদিল্লীর প্রধান কেন্দ্র হইতেও ঘোষণা করা হইল, শক্তিশালী নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী বোম্বাই, পুণা ও করাচীতে প্রেরিত হইয়াছে। ভারতীয় নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি ভাইস্ এ্যাডমিরাল গডফ্রে ঐ ২১শে তারিখেই বোম্বাই বেতার-কেন্দ্র হইতে নৌ-বিদ্রোহীদের উদ্দেশে এক ভাষণে জানাইলেন, বিদ্রোহীদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে এবং ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি পূরণ করারও চেষ্টা করা হইবে—কিন্তু বিদ্রোহীদিগকে করিতে হইবে বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ। তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন, গভর্ণমেণ্টের শক্তি অল্প নহে এবং প্রয়োজন হইলে সমগ্র শক্তি বিদ্রোহ-দমনে নিয়োজিত হইবে; এমন কি, সেজন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের গৌরবের নৌ-বহরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেও তাঁহারা দ্বিধা করিবেন না।

২১শে ফেব্রুয়ারি রাত্রেই ভারতীয় নৌ-বহরের একটা দল গিয়া বোম্বাই বন্দরে প্রহরায় নিযুক্ত হইল এবং কয়েকখানি জঙ্গী ও বোমারু বিমান উপর হইতে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালাইতে লাগিল। উভয় পক্ষ হইতেই সারা রাত্রি গুলি ও গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল।

বোম্বাই শহরের অবস্থা আরও চরমে উঠিল। ২২শে তারিখে জনসাধারণ কতকগুলি অঞ্চলে এতই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল যে, পুলিশ ও মিলিটারি নানা স্থানে বহুবার গুলি চালনা করিল। সেদিনের গুলি বর্ষণে নিহত হইল প্রায় ৬০জন এবং আহত হইল প্রায় ৬০০ ব্যক্তি। জনসাধারণ সেদিন আন্দাজ ৪০খানি সামরিক লরি আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিল, ১২টি ডাকঘর ও ৩০টি র‍্যাশন দোকান লুঠ করিল এবং ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের ৩টি শাখা আক্রমণ করিয়া জিনিষ-পত্র ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা এতই প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল যে, কয়েক স্থলে মিলিটারি ও পুলিশের সহিত জনতার রীতিমত লড়াই হইয়া গেল। সরকারী পক্ষে নিহত হইল একজন কনষ্টেবল এবং আহত হইল ৯০জন কনষ্টেবল এবং ৩৭জন অফিসার।

বেতার মারফত নৌ-সেনাপতির ভীতি প্রদর্শনে কোনও ফল ফলিল না। ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় ধর্ম্মঘট কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদাস ত্রিকমদাস, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জনাব মহম্মদ আলি জিন্না প্রভৃতি নেতাগণ বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া শান্তির জন্য আবেদন জানাইলেন। সর্দ্দার প্যাটেল আরও জানাইলেন যে, নৌ-সৈন্যগণের অভাব-অভিযোগ পূরণের ব্যাপারে এবং তাহারা যাহাতে শাস্তি না পায় সে বিষয়ে কংগ্রেস যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

ইহার পর ২২শে ফেব্রুয়ারি রাত্রে "তলোয়ার" জাহাজে কেন্দ্রীয় ধর্ম্মঘট কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহাতে জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপদেশ ও আবেদন অনুযায়ী বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করারই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। পরদিন ভোর ৬টা ১৩ মিনিটের সময় আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশমূলক সাঙ্কেতিক বার্ত্তা বিদ্রোহী ঘাঁটিগুলিতে প্রেরণ করা হইল। বিভিন্ন ঘাঁটির বিদ্রোহী নৌ-সৈন্যগণ এবং জাহাজগুলি ইহার পর একে একে আত্মসমর্পণ করিল। করাচীতে ইহার একদিন পূর্ব্বেই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে। ২২শে তারিখে উভয়পক্ষে প্রবলভাবে গোলাগুলি বিনিময়ের পর বৃটিশ ছত্রীবাহিনীর আক্রমণে নিরুপায় হইয়া সকাল ১১টা ১৫মিনিট সময়ে "হিন্দুস্থান" এবং অন্যান্য জাহাজ আত্মসমর্পণ করে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর নৌ বিদ্রোহের মত এতবড় বিদ্রোহ সমরবিভাগে আর ঘটে নাই। পতনশীল বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি ইহার দ্বারা যেন কম্পিত হইয়া উঠিল।

১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ্চ ইংলণ্ডের শ্রমিকদলীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলি আর একটি ঘোষণায় জানাইলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহকে আর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়গুলির অগ্রগতি ব্যাহত করিতে দেওয়া হইবে না। মন্ত্রি-মিশন প্রেরণ সম্পর্কে তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষ যাহাতে দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্যই তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ভারতে গমন করিতেছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, ভারতবাসীদের দ্বারাই তাহা স্থিরীকৃত হইবে। তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, ভারতের জনগণ সত্বর এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিবার অধিকার তিনি স্বীকার করিলেন এবং যথাসম্ভব দ্রুত ও সহজভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

ইহার পর মন্ত্রি-মিশনের তিনজন সদস্য—ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য-সচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স এবং নৌ-সচিব মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডার—২৩শে মার্চ্চ করাচীতে আসিয়া পৌঁছাইলেন। মিশনের নেতা ছিলেন লর্ড পেথিক লরেন্স। ভারতে আসিয়াই মিশনকে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সম্পর্কীয় মিঃ এ্যাটলির ঘোষণার ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইল। উহা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহারা বলিলেন যে, উক্ত ঘোষণায় মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা হয় নাই; অর্থাৎ তাহার নির্গলিতার্থ এইরূপ দাঁড়াইল যে ভারতকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিচার করিলে যে সব এলাকায় মুসলমানগণ

সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সকল স্থানে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবেই পরিগণিত হইবেন। এইভাবে ভারতকে অখণ্ডভাবে বিচার না করিয়া মুসলমানগণকে সমগ্র ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত হওয়ার আশঙ্কা হইতে মুক্ত করা হইল। ইহার পূর্ব্বে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভৌগোলিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারত অখণ্ড—ইহার উপর পাকিস্তানী-অস্ত্রোপচার চলিবে না। মন্ত্রি-মিশনের ব্যাখ্যায় কিন্তু পাকিস্তানের আভাষই যেন উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

ভারতে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দলকে তাঁহাদের বক্তব্য এবং প্রস্তাবসমূহ মন্ত্রি-মিশনের নিকট উপস্থাপিত করিবার জন্য মিশন আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। আলোচনার প্রথম পর্য্যায় শেষ করিয়া মন্ত্রীত্রয় বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে কয়েক দিনের জন্য ১৯শে এপ্রিল তারিখে কাশ্মীরে গমন করিলেন। তাঁহাদের কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ৫ই মে হইতে মন্ত্রি-মিশনের সদস্যগণ, বড়লাট এবং কংগ্রেস ও লীগনেতৃবৃন্দের ত্রিদলীয় বৈঠক সিমলায় সুরু হইল; কিন্তু মুশলিম লীগের পাকিস্তান দাবী এবং কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত দাবীর টানা-হেঁচড়ায় ১২ই মে সন্ধ্যায় বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল।

মন্ত্রি-মিশনের সহিত আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোনও মীমাংসা সম্ভব না হইলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ক্রমিক গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে; সুতরাং বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেলেও মন্ত্রি-মিশনের কার্য্য শেষ হইল না। উভয় দলের মধ্যে কোনও মীমাংসা সম্ভব না হওয়ায় এক বিবৃতি মারফত বড়লাট এবং মন্ত্রীত্রয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় সকল উদ্যোগ শেষ হইল না; পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শীঘ্রই এক ঘোষণা করা হইবে।

সেই ঘোষণা প্রকাশিত হইল ১৬ই মে। উহাতে গণ-পরিষদ গঠন এবং ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় রূপ সম্বন্ধে সুপারিশের আকারে এক পরিকল্পনা প্রচারিত হইল। পরিকল্পনার দুইটি অংশ—একটি দীর্ঘমেয়াদী ও অপরটি স্বল্পমেয়াদী। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা এবং যানবাহন ব্যতীত অপর সমুদয় ক্ষমতা প্রাদেশিক ও দেশীয়রাজ্য গভর্ণমেণ্টসমূহের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের সমবায়ে এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হইল। পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যানবাহনের পুরাপুরি কর্ত্তৃত্ব কেবল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তে থাকিবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক সাম্প্রদায়িক অনুপাতে একক হস্তান্তর-যোগ্য ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে প্রতি দশ লক্ষে একজন হিসাবে মোট ৩৮৫ জন সদস্য লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক শাসনতন্ত্র-রচনাকারী গণ-পরিষদ গঠিত হইবে। ৩৮৫ জন সদস্যের মধ্যে বৃটিশ ভারত হইতে থাকিবেন ২৯২ জন এবং দেশীয় রাজ্য হইতে ৯৩ জন। মুশলিম লীগের পাকিস্তান দাবী আংশিকভাবে পূরণের জন্য বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলিকে এভাবে তিনটি মণ্ডলীতে ভাগ করার ব্যবস্থা হইল, যাহাতে মুসলমানগণ যে যে অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান গঠন করিতে চাহেন, সেই সেই অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসন-তন্ত্র প্রণয়নে তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে, গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই ক, খ ও গ প্রদেশ-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিনিধিবর্গ পরিকল্পনায় উল্লিখিতমত তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব মণ্ডলীর অন্তর্গত প্রদেশসমূহের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন এবং ঐ সমুদয় প্রদেশ লইয়া মণ্ডলী গঠিত হইবে কি না এবং হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের ভার ঐ মণ্ডলী গ্রহণ করিবে, তাহা স্থির করিবেন। নূতন শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পর কোনও প্রদেশ ইচ্ছা করিলে উহা যে মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত আছে, তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে। আলোচনা কমিটির মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে এবং যোগদানের জন্য সর্ত্ত স্থির কিরিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় বলা হইল, যে সকল প্রধান প্রধান দল উপরোক্ত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মানিয়া লইবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া অন্তর্বর্ত্তী কালের জন্য ভারতগভর্ণমেণ্ট পুনর্গঠিত হইবে।

২৯শে জুন তারিখে মন্ত্রি-মিশনের সদস্যগণ ভারত ত্যাগ করিলেন।

মন্ত্রি-মিশনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কংগ্রেস সর্ত্তসাপেক্ষভাবে দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন—কিন্তু স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাব স্বীকার করিয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠনে রাজি হইলেন না। মুশলিম লীগ প্রথমে উভয় প্রস্তাবই গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট একমাত্র তাঁহাদের লইয়া অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠনে উদ্যোগী না হওয়ায় এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় মণ্ডলী-গঠন প্রভৃতির ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তরের ফলে তাঁহারা পরে আবার বাঁকিয়া বসিলেন। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে প্রদেশসমূহ হইতে গণ-পরিষদের সদস্য-নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইলে দেখা গেল যে, উহাতে কংগ্রেস দলের ২১১ জন এবং লীগের মাত্র ৭৩ জন সদস্য স্থান পাইয়াছেন; সুতরাং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা (মিঃ জিন্নার ভাষায় Brute Majority) থাকার ফলে গণ-পরিষদে কংগ্রেসের প্রভাব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তখন ২৯শে জুলাই তারিখের এক অধিবেশনে লীগ কাউন্সিল মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন, সার্ব্বভৌম পাকিস্তানের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম-দিবস হিসাবে পালন করা স্থির হইল।

পণ্ডিত নেহেরু ইতিমধ্যে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। লীগও যাহাতে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করেন, পণ্ডিত নেহেরু তজ্জন্য জনাব মহম্মদ আলি জিন্নার সহিত বোম্বাই নগরীতে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ-আলোচনা চালাইলেন—কিন্তু লীগের মনোভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হইল না। এদিকে ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম-দিবসে নানা স্থানে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু

হইল—তন্মধ্যে কলিকাতার দাঙ্গাই হইল ভয়াবহ। উহার পর হইতেই অদ্যাপি নানাস্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিয়া আসিতেছে।

পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে ২রা সেপ্টেম্বর অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠিত হইল। ইহার পর বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সহিত লীগ-সভাপতি মিঃ জিন্নার গোপন আলোচনার ফলে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা মানিয়া না লইলেও লীগের পাঁচ জন সদস্যকে ২৬শে অক্টোবর অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে গ্রহণ করা হইল; কিন্তু ইহার ফল শুভ হইল না। দুইটি প্রতিদ্বন্দী দলের আদর্শগত পার্থক্যের জন্য সদস্যগণের মধ্যে মত-বিরোধ এবং অসহযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করিল।

৯ই ডিসেম্বর হইতে গণ-পরিষদের অধিবেশন সুরু হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল; কিন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে থাকিয়াও লীগের উক্ত গণ-পরিষদ বর্জ্জন করার সিদ্ধান্তে উদ্ভব হইল এক জটিল পরিস্থিতির। তখন লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দকে লইয়া মিঃ এ্যাটলির আমন্ত্রণে আলোচনার জন্য লণ্ডনে গমন করিলেন। কংগ্রেসের তরফে গেলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং লীগের তরফে মিঃ জিন্না। আলোচনায় কিছুই মীমাংসা হইল না। দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা সম্পর্কে লীগের ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়া মিঃ এ্যাটলি ৬ই ডিসেম্বর এক বিবৃতি দিলেও এবং কংগ্রেস সেই ব্যাখ্যাই মানিয়া লইতে সম্মত হইলেও লীগ গণ-পরিষদে যোগদান করিতে রাজি হইল না। লীগ সদস্যগণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ৯ই ডিসেম্বর কিন্তু গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসিল।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি মিঃ এ্যাটলি ভারত সম্পর্কে কমন্স সভায় এক চূড়ান্ত ঘোষণা দিলেন। উহাতে বড়লাট হিসাবে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ ঘোষণা করা হইল এবং বলা হইল যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত শাসনের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ অবিলম্বেই আরম্ভ করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ যাহাতে ঐ সময়ের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হইতে থাকিবে। সমগ্র বৃটিশ ভারত উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐক্যমত হইয়া ক্ষমতা গ্রহণে ইচ্ছুক না হইলে, কাহার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে, সে বিষয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করিয়া দেখিবেন। তখন বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার বা অঞ্চল বিশেষে প্রাদেশিক সরকার অথবা ভারতের স্বার্থ ও ন্যায়পরায়ণতার দিক হইতে অপর কাহার হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। বস্তুতঃ এই ঘোষণার দ্বারা মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনা কার্য্যতঃ পরিত্যাগ করা হইল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব লইয়া মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে বড়লাট হইয়া আসিলেন লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন। কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার পর তাঁহাদের সম্মতিতে তিনি ৩রা জুন তারিখে ভারত-বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ইহার ফলে বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হইল—আসামের শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট গ্রহণের পর উহা পূর্ব্ববঙ্গের সহিত যুক্ত হইল। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশেও গণ-ভোট লইয়া উহার পাকিস্তানে যোগদান সাব্যস্ত হইল।

১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহাসভায় হাউস অফ কমন্স-এ ভারতীয় স্বাধীনতা-আইন উত্থাপন করা হয় এবং আলোচনান্তে অতি দ্রুত ১৪ই জুলাই তাহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়। বিলটি লর্ড সভায় অনুমোদিত হয় ১৬ই জুলাই তারিখে। রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ ১৮ই জুলাই বিলে সম্মতি দান করিলে উহা আইনে পরিণত হয়।

উক্ত আইন অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান নামে দুইটি নূতন ডোমিনিয়ন গঠিত হয় এবং উক্ত দুইটি ডোমিনিয়নের উপর বৃটিশ মন্ত্রি-সভার সর্ব্ববিধ কর্ত্তৃত্ব লোপ পায়। দেশীয় রাজ্যগুলির উপরও ইংলণ্ডেশ্বরের সার্ব্বভৌমত্বের অবসান ঘটে এবং অভিপ্রায়, সংস্কৃতি ও নৈকট্য অনুযায়ী ঐগুলিকে দুইটি ডোমিনিয়নের যে কোন একটিতে যোগদানের অধিকার ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

ভারতীয় গণ-পরিষদ শাসন-তন্ত্র প্রণয়নের কার্য্য চালাইয়া যাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে ভারত-রাষ্ট্রের সংলগ্ন দেশীয় রাজ্যগুলিও একে একে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর গণ-পরিষদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কার্য্য সমাপ্ত হইয়া ঐদিন উহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়। তাহার ফলে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি মহান্ ভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ভারত স্বেচ্ছায় উপনিবেশ-গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিলেও ইংলণ্ডের রাজার প্রতি তাহার আনুগত্যের সমাপ্তি ঘটিয়াছে।

আমাদের স্বাধীনতা-লাভের ইহাই ইতিহাস। যাঁহাদের বিপুল স্বার্থত্যাগ এবং আত্মবিসর্জ্জনের উপর এই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা—তাঁহারা চিরদিন পূজিত হউন।

সমাপ্ত

বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী

ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

ভিক্টর হুগোর প্রথম যৌবনের পত্র

পত্র পরিচয়—

করাসী ভিক্টর হুগো বাঙ্গালী পাঠকের নিকট অপরিচিত নন, তাঁর রচনা "লে মিজারেবলস," "হঞ্চ্ বেক অব্ নতার দামের" ইংরেজী অনুবাদ শিক্ষিত বাঙ্গালী সাগ্রহে পাঠ করে।

ফরাসী বিদ্রোহের সমকালে ১৮০২ সালে বিখ্যাত হুগো পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল ; ১৯ বৎসর বয়সে তাঁর শৈশব খেলার সাথী এডিলির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তিন বৎসর অসংখ্য কবিতা, উচ্ছ্বাস, পত্র বিনিময়, মান অভিমান। ২২ বৎসর বয়সে এডিলিকে বিবাহ করেন ; তারপর ভিক্টর হুগোর দুরন্ত চিত্ত শান্ত হয়। Le Dermier Jour d'em Condemne, নামক রচনায় মানব-হৃদয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষার অপূর্ব বিশ্লেষণ করেন। প্রেমের আবেদনই ভিক্টর হুগোর শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতার উৎস। এই কবিতাগুলি ক্রমশঃ ভিক্টর হুগোকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি কবির আসন দান করেছে।

পরবর্ত্তী জীবনে ভিক্টর হুগো নানা বিষয়ে রচনা আরম্ভ করেন এবং রাজনীতির আবর্ত্তে জড়িয়ে পড়েন। তৃতীয় নেপোলিয়নকে তিনি প্রথম নেপোলিয়ানের 'শীর্ণ সংস্করণ' বলে আখ্যায়িত করেন। Napoleanic Legend, Napolean le Petit এই দুইটী কথা ইউরোপের ইতিহাসে অবিনশ্বর। ফলে ভিক্টর হুগোকে প্রায় ২০ বৎসর নির্বাসন ভোগ করতে হয়েছিল।

এই আলোচ্য পত্রখানি বিবাহের পূর্বে ২১ বৎসর বয়সে লেখা।

সন্ধ্যা—শুক্রবার, মার্চ ১৫
১৮২২ খৃঃ

এডিলি !

আজ রাত্রিতে আর আমি বাইরে যাব না, কাল এবং পরশু দুইটী সন্ধ্যা আমার বেশ কেটেছে, আজ সন্ধ্যায় আমি আমার ঘরে বসে থাকব এবং তোমার নিকট পত্র লিখব। এডিলি, আমার কল্পনার এডিলি, তোমাকে বলবার মতন আমার কত কথা আছে জান ? গত দুই দিন আমি কেবল আমাকেই প্রশ্ন করেছি প্রতি মুহূর্ত্তে—এই আনন্দ কি স্বপ্নের বিলাস মাত্র ! আমার মনে হচ্ছে আমি যাহা অনুভব করি, তার সঙ্গে পৃথিবীর কোন সম্বন্ধ নেই। আজও আমি মেঘমুক্ত আকাশ পরিকল্পনা করে উঠতে পারি নি।

এডিলি, তুমি ধারণা করতে পারবে না, আমি কত নিঃস্ব করে আমাকে নিবেদন করে দিয়েছি। ছাই, আমি কি তাই জানি ! আমি দুর্ব্বল ; তাই আমি ভেবেছিলাম, আমি শান্ত। আমি এক উদ্‌ভ্রান্ত নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম, তাই আমি ভেবেছিলাম, আমি নির্ভীক, আমি প্রশান্ত। আজকে আমাকে তোমার চরণ প্রান্তে নিবেদন করবার অধিকার দাও—তুমি কত বিরাট, কোমল, শক্তিময়ী ! আমার কেবল মনে হচ্ছে তোমার নিকট আমার আত্মনিবেদনের চরম পরিণতি হবে—তোমার জন্য আমার আত্ম-বিসর্জ্জন। কিন্তু এডিলি, তোমার প্রেমের আতিশয্যে আমার জন্য তোমার সমস্ত শান্তি উৎসর্গ করার আয়োজন করেছ !

এডিলি, গত আট দিন তোমার ভিক্টর কি অদ্ভুত চিন্তা করেছে জান ? কল্পনায় তোমার অপূর্ব প্রেমের অর্ঘ্য গ্রহণ করেছি, যদি আমার পিতা আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে অর্থ প্রদানে অসম্মত হন, তবে হয়ত যে কোন উপায়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তোমাকে নিয়ে যাব। কারণ, তুমি আমার সঙ্গিনী, বাক্‌দত্তা, আমার ভবিষ্যৎ পরিণীতা। তোমার আমার মিলনে যারা বিঘ্ন—তাদের স্পর্শ থেকে বহু দূরে তোমাকে নিয়ে যাব। আমরা ফরাসী দেশ অতিক্রম করে যাব। আমরা এমন দূরদেশে যাব যেথানে আমাদের অধিকার নিঃসন্দেহ। দিনের বেলায় আমরা একই যানবাহনে পথ চলব, রাত্রিতে আমরা একই গৃহতলে সুপ্তি লাভ করব।

মহিমময়ী এডিলি ! তুমি ভেবো না, আমি তোমার বিশ্বাসের অন্যায় সুযোগ নেবো, তুমি নিশ্চয় একথা ভেবে আমার উপর অবিচার করবে না আশা করি। তোমার ভিক্টর হুগোর নিকট তুমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী। আমাদের যাত্রাপথে তুমি নির্ভয়ে নিদ্রা যাবে আমার সঙ্গে একই গৃহতলে ; কিন্তু তোমার ভিক্টরের স্পর্শে তুমি আতঙ্কিত হয়ে উঠবে না, তোমার ভিক্টর তোমার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করবে না। আমি তোমার পার্শ্বে একটী আসনে বসে থাকবো, অথবা তোমার শয্যার নিম্নে গৃহতলে বসে তোমার বিশ্রামের প্রহরী হয়ে থাকব। তোমার এই ক্রীতদাস প্রত্যাশা করে যে, সে স্বামীর অধিকারেই তোমার রক্ষাকর্ত্তার আসন গ্রহণ করবে। তার পর যেদিন ধর্ম্মযাজক তাকে সে অধিকার দেবে......

এডিলি ! তুমি আমাকে ঘৃণা করো না, আমার দুর্বলতাকে ক্ষমা করো ; তোমার শক্তির প্রাচুর্য্যে তুমি মহীয়সী। আমার নিঃসঙ্গতা, আমার আত্মীয় বিচ্যুতি, আমার পিতার অস্বীকৃতির কথা একবার বিবেচনা করে দেখো। একটী সপ্তাহ কেটেছে যখন তোমাকে প্রায় হারিয়েছিলাম, আমার নিরাশার তীব্রতায় তুমি আশ্চর্য্য হয়ো না।

আমার ছোট্ট আদরের বস্তুটী, তুমি যে কত শ্লাঘার বস্তু! তোমাকে স্বর্গের অপ্সরার সঙ্গে তুলনা করলে অপ্সরাকে গৌরবান্বিত করা হবে। বিধাতা তোমাকে তাঁর সমস্ত সম্পদ অকুণ্ঠ দান করেছেন—তুমি পেয়েছ ধৈর্য্য, তুমি পেয়েছ অফুরন্ত আশ্রয়।

এডিলি! তুমি ভুল করো না—আমি অন্ধ উচ্ছ্বাসের আবেগে এই কথাগুলি বলে যাচ্ছি—তোমার জন্য আমার উচ্ছ্বাস আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিঃশেষ হবে না—প্রতিদিন আমার উচ্ছ্বাস বেড়ে চলেছে। আমার সমস্ত সত্ত্বা তোমাতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমার সমস্ত জীবন যদি তোমাতে বিলীন না হত, তবে আমার জীবনের সুর স্তব্ধ হয়ে যেত; আমার মৃত্যু হত, নিরুপায় হয়ে আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হত।

এডিলি, এইগুলি অবশ্য আমার কল্পনা। তোমার লিপি আমার নিকট কখনো আশা, কখনো বা হতাশা বহন করে আনত। তুমি যদি বলতে— আমাকে ভালবাস, তুমি জান আমার কি আনন্দ হত? তুমি যে কি অপূর্ব অনুভূতি উপভোগ করেছ তা' আর কল্পনা করব না।

এই অনুভূতির প্রতীক 'আনন্দ' ভিন্ন আর কোন শব্দ রচিত হয় নি কেন বলত? মানুষের ভাষায় শক্তি নেই যে তার ভাষার মধ্য দিয়ে সে এই অনুভূতিকে কোন রূপ দেয়। শোকাবহ আত্মবিস্মৃতি থেকে অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব আনন্দানুভূতি আজ আমাকে বিহ্বল করেছে। এই মুহূর্ত্তে আমি আমারই পার্শ্বে বসে আছি; তবু আমি মাঝে মাঝে আতঙ্কিত হয়ে উঠি এই বুঝি আমার দিব্য স্বপ্নানুভূতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ব।

আজ তুমি আমার এডিলি! এতদিন পরে তোমাকে আপনার ভাবতে পারছি। কয়েক মাসের মধ্যেই, আশা করি, আমার অপ্সরা আমার বাহুপাশে ঘুমিয়ে পড়বে, আমার বাহুপাশে জেগে উঠবে, আমার বাহুর আবরণে জড়িয়ে থাকবে, সর্বক্ষণ তোমার সকল চিন্তা সর্ব্বক্ষণে তোমার সকল দৃষ্টি আমাকে কেন্দ্র করে নিবিড় হয়ে থাকবে, আমার দৃষ্টি আমার চিন্তা তোমারই হবে, আমার এডিলি!

এবার তুমি আমার হবে, একান্ত আমার, একমাত্র আমার। আজকে আমার মর্ত্তলোকে স্বর্গের আনন্দ উপভোগের দিন। আজকে তুমি আমার নবপরিণীতা স্ত্রী, তারপর তুমি মা হবে—আমার সন্তানের জননী। কিন্তু তুমি আমার চিরন্তনী প্রথম দিনের মতনই কমনীয়। বিবাহিত জীবনের পরিণতিতেও তুমি কুমারী জীবনের মত সুকুমারী থাকবে। প্রেম কার্যে, বল, বল তুমি, তুমি কি চিরন্তন বিবাহ বন্ধনের মধ্যে অবিনশ্বর প্রেমের আনন্দের পরিকল্পনা করতে পার? অবশ্য সেদিন আমাদের আসবে···এসেছে।

এডিলি, কোন বাধাই আজ আমাকে নিরুৎসাহ করতে পারছে না। তুমি মনে করো না যে, আমি তোমাকে মিনতি জানাচ্ছি। আমি কেবল লিখছি, লিখেই চলেছি, আমার গৌরবে তুমি গরবিনী হবে। এই বিশ্রামহীন পরিশ্রম কত আনন্দ বহন করে আনে জান ত। আমি সহস্রবার ভগবানকে মিনতি জানিয়েছি—আমার সমস্ত জীবনের বিনিময়েও যদি তোমাকে একটু আনন্দ দিতে পারি! আজ আমি কত সুখী, আমি কত সুখী হতে চলেছি!

এডিলি, আমার স্বর্গের দেবী, আমার প্রিয়তমা এডিলি! বিদায়। তোমার সুকোমল কেশদাম চুম্বন করে আমি আমার শয্যায় ফিরে যাব। আমি তোমার কাছ থেকে বহুদূরে, কিন্তু তোমার স্বপ্ন যে আমার কত কাছে। এই ত কয়েকদিন পরেই তুমি আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়াবে। বিদায়। তোমার স্বামীর এই বিহ্বলতাকে ক্ষমা করো। তার আলিঙ্গন গ্রহণ করো, আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করো। ইহলোকে আর পরলোকে। তোমার আলেখ্য?

পত্র পরিণাম :—

ভিক্টর হুগো অভিজাত পরিবারের সন্তান। তার পিতা নেপোলিয়ানের যুগের সৈন্যাধ্যক্ষ। এই বিবাহে ভীষণ আপত্তি। কিন্তু ভিক্টর গোপনে এডিলির সঙ্গে বিবাহ স্থির করলেন। শেষে বাধ্য হয়ে দুই পরিবারই বিবাহে মত দিয়েছিলেন। এই বিবাহের পরে ভিক্টর হুগোর ভ্রাতা ইয়ুজেন হুগো হঠাৎ বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে পড়ল। তাকে বাতুল আশ্রমে প্রেরণ করা হল। এই উন্মত্ততার কারণ এডিলির প্রতি নিষ্ফল আকর্ষণ।

এডিলি বহু সন্তানের জননী; বহু সন্তান মৃত। স্বামীর গর্বে এডিলি গর্বিতা। কিন্তু ভিক্টর হুগো সেই প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নি। তরল ফরাসী সমাজ জীবনের আবর্ত্ত থেকে ভিক্টর হুগো মুক্তি পান নি, সমাজের পঙ্কিল স্পর্শ তাঁকে নানাভাবে কলুষিত করেছিল।

দ্বারমণ্ডল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চিঠিখানা আসিয়াছে জেলার সদর হইতে। এ জেলায় দেবুদের যে দলটি আছে সেই দলের সেক্রেটারী লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন—"কোন রকমে সরকারী গোপন খবর পেলাম যে, আগামী হাটবারে আই-বি ডিপার্টমেন্টের একটা দল ওখানে যাবে। এস-পি যাবে আগের দিন। দরবারী শেখ আজ রওনা হবে। বিশেষ কিছু একটা ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই। পত্র পাওয়া মাত্র যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করবেন। সম্ভবত পুলিশ কারও কাছ থেকে খবর পাচ্ছে।"

দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, ঠিক করিয়া লইল কি কি করিতে হইবে।

কংগ্রেসের মধ্যে দেবুদের যে উপদলটি এখানে আছে তাহারা নিজেদের মত ও পথ অনুযায়ী হাটের দিন অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া ওঠে। হাটের দিন এখানকার চারিদিক হইতে যে বিপুল জনসমাগম হয় তাহার সুবিধা তাহারা গ্রহণ করে। পল্লীতে পল্লীতে যে সব গ্রাম্যকর্ম্মীরা আছে তাহারা নিজেদের কাজেই হাটে আসে, তাহাদের সঙ্গে দেখা হয়, তাহাদের হাত দিয়া প্যাম্ফলেট পাঠায় গ্রামে-গ্রামে। এই সব লোকেদের মধ্যে যাহারা বিশেষভাবে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের লইয়া বৈঠক বসে। তাহাদের নিকট হইতে গ্রাম্যসংবাদ সংগ্রহ করে। বিশেষ করিয়া গ্রাম্য-বিরোধের সংবাদ। জমিদার-প্রজা, মহাজন-খাতক, জোতদার-কৃষাণ, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিরোধ বাধিলে সেই সব বিরোধের ক্ষেত্রে তাহারা প্রজা-খাতক-কৃষাণ-দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি জানায়—গ্রাম্যকর্ম্মীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে নির্দ্দেশ দেয়। আরও নানা আলোচনা গল্প হয়। দেবুদের দলের মতবাদগত দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সংগ্রাম আসিতেছে সে সংগ্রাম সামগ্রিকভাবে বিপ্লবাত্মক না হইলে কোন ক্রমেই সার্থক হইবে না। এক সঙ্গে তাহারা রাষ্ট্র এবং সমাজ দুই ব্যবস্থাকেই প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া ভাঙিয়া দুই ব্যবস্থাকেই নূতন করিয়া গড়িবে। বিশ্বনাথের কাছে একদিন এই সব কথা শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে দলগত মতবাদ সংক্রান্ত বই পড়িয়া, অর্থনীতিশাস্ত্রে বি-এ পাশ করিয়া এবং দলের বিভিন্ন নেতার কাছে শিক্ষালাভ করিয়া আজ এমনই দাঁড়াইয়াছে যে এই ছাড়া আর কোন পথ তাহার দৃষ্টির সম্মুখে নাই। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত এই দুর্গম পথের শেষ প্রান্তে তাহার কল্পজগত সে স্পষ্ট দেখিতে পায়। সেখানে সে দেখিতে পায় অপরূপ এক রাজ্য—অপূর্ব্ব এক মানুষের সমাজ। মানুষে মানুষে ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ নাই—শূদ্র নাই—চণ্ডাল নাই, হিন্দু নাই—মুসলমান নাই—খৃষ্টান নাই; ধনী নাই—দরিদ্র নাই, রাজা নাই—প্রজা নাই, শোষক নাই—শোষিত নাই, আছে শুধু মানুষ, ভেদ নাই তাই বিরোধ নাই, বিরোধ নাই তাই মিথ্যা নাই; আছে শুধু মানুষ আর পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্ম। মানুষ আপন আপন সাধ্য অনুযায়ী কাজ করিয়া যায়, প্রত্যেকে কাজ করে সকলের জন্য, সকলে কাজ করে প্রত্যেকের জন্য। শুধু তাহারা ভারতবর্ষকেই দেখে না, তাহারা দেখে সমগ্র পৃথিবীকে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি শাখা, দেবু এই শাখার সেক্রেটারী। ইহারা চরমতম উগ্রপন্থী বলিয়া ইংরাজ সরকার কঠিন দৃষ্টি রাখিয়াছেন। আরও কয়েকটি বামপন্থী দল কংগ্রেসের মধ্যেই আছে—কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রী দল। কিন্তু কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রী দলের কোন শাখা এখানে নাই। দেবুদের দলের একটা বিশেষ সুবিধা আছে, বিগত যুগের বিশিষ্ট বৈপ্লবিক কর্ম্মীদের অনেকে এই মত—সেই সঙ্গে এই দলকে গ্রহণ করিয়াছেন; আরও

সুবিধা আছে—সেইটাই খুব বড় সুবিধা—এই দলের ভাণ্ডারে অর্থ আছে।

দেবু মনে মনে স্থির করিয়া লইল কি কি করিতে হইবে। হাটবার আগামী শুক্রবার, আজ সোমবার। দরবারী শেখ নামক পুলিশ কর্ম্মচারীটি কাল সকালে আসিয়া পৌঁছিবে। লোকটি আকৃতিতে প্রকৃতিতে একেবারে সয়তান। উপরের ঠোঁটটা জন্মকাল হইতেই কাটা—এদেশে বলে—গন্না কাটা—ইংরাজীতে যাহাকে বলে হেয়ার-লিপস। কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়া উপরের মাড়ির দুইটা দাঁত বাহির হইয়া থাকে। এ জেলার পুলিশ সাহেব সমশের সাহেবের ডান হাত—উপযুক্ত অনুচর। সমশের থান অল্পবয়সী—আই-পি। কিন্তু ইহারই মধ্যে ইংরাজ পুলিশ-কর্ম্মচারীদের নেক নজরে পড়িয়াছে। উনিশ শো তিরিশ সালে মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহীদের উপর চরমতম অত্যাচার করিয়াছিল এই থান সাহেব। এ জেলায় আসিয়া বিরাট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া এক ষড়যন্ত্র মামলা করিয়া উপরে নাম কিনিয়াছে। ষড়যন্ত্র মামলার কথা স্মরণ করিলে দেবুর হাসি পায়। দেবু তখন অন্তরীণ অবস্থায় জেলের মধ্যে ছিল বলিয়াই রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। আসামীদের মধ্যে একজনের স্বীকৃতি অনুযায়ী একটা বড় দীঘি হইতে একটা ট্রাঙ্ক উদ্ধার করা হয়। সে নাকি বলিয়াছিল যে, ডাকাতি করিয়া ছয় মাস আগে এই দীঘিতে ট্রাঙ্কটা ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে, ট্রাঙ্কের ভিতর নগদ টাকা—একটা রিভলভার কিছু গহনা লুকানো ছিল। গহনার মধ্যে ছিল একছড়া সোনার চেন ও সোনার ঘড়ি। মহা সমারোহ করিয়া মাসখানেক ধরিয়া দিবারাত্রি চৌকীদার-পাহারার মধ্যে প্রচুর খরচ করিয়া দিঘীর জল মারিয়া সেই ট্রাঙ্ক বাহির করা হইয়াছিল। এখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তরুণ বাঙালী আই-সি-এস আগাগোড়াই এই মামলাটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়া থান সাহেব ওই ট্রাঙ্ক উদ্ধারের সময় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কৌতূহলবশত গিয়াছিলেনও। সত্যই ট্রাঙ্ক উঠিয়াছিল, ট্রাঙ্কের মধ্যে স্বীকারোক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি জিনিষও মিলিয়াছিল। কিন্তু একটা অঘটন ঘটিয়াছিল—ছয় মাস পূর্ব্বে জলে ডুবানো ট্রাঙ্কটার মধ্যে রাখা ঘড়িটার সেকেণ্ডের কাঁটাটাকে টিক্ টিক্ শব্দে চলিতে দেখা গিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘড়িটা হাতে লইয়া থান সাহেবকে বলিয়াছিলেন—কি মেকারের ঘড়ি খানসাহেব? এক দমে ছ মাস চলছে? অদ্ভুত!

সামসের সাহেব দেখি—দেখি বলিয়া ঘড়িটা হাতে লইয়াছিলেন—সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন—কই? চলছে কই? না তো! বলিতে বলিতেই ঘড়িটা তাঁহার হাত হইতে বাঁধানো ঘাটের উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

তাহার পরই সামসের সাহেব গেলেন কলিকাতায়। দিন দুয়েক পরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তার আসিয়াছে—অবিলম্বে জেলার সদরে গিয়া জেলার ভার গ্রহণ কর। তোমাকে বদলী করা হইল।

কিছুদিন আগে—বৎসর দুয়েক আগে—আরও একটা বিচিত্র রাজনৈতিক মামলা হইয়া গিয়াছে। জেলার সদরে শহর হইতে ষ্টেশনে যাইবার পথে একটা নির্জ্জন বসতিহীন স্থানে ডাক-লুট হইয়াছিল। ইনসিওর এবং পোষ্টাপিসের টাকা লইয়া প্রায় হাজার কয়েক টাকা ছিল। ওই অপরাধে জেলার কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের এক ছেলের এবং আরও দুইটি ছেলেকে দীর্ঘকাল জেলে রাখিয়া অবশেষে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ডাকলুটের কোন কিনারা হয় নাই। প্রকাশ্য কিনারা হয় নাই। কিন্তু এই দরবারী শেখ যে থানায় এস-আই ছিলেন সেই থানার এক কনেষ্টবল স্থানীয় পোষ্টাপিসে মণিঅর্ডার করিতে গিয়া পোষ্টমাষ্টারের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। তাহার নোটের নম্বরে এবং আরও কতকগুলি চিহ্নের সঙ্গে পোষ্টাপিসের সেই লুট-হওয়া নোটের নম্বর ও চিহ্নের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। কনেষ্টবল বলিয়াছিল—সে নোট পাইয়াছে দারোগাবাবুর কাছে! অর্থাৎ দরবারী শেখ সাহেবের কাছে। বিচিত্র ব্যবস্থা। দরবারী শেখের উন্নতি হইয়া গিয়াছে এই ঘটনার পর। তিনি সদর সহরে একেবারে খোদ সমরেশ থান সাহেবের রীডার হইয়া গিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, দরবারী শেখ সাহেব অতঃপর আই-বি বিভাগে বিশেষ পদে উন্নীত হইবেন।

দরবারী শেখ আসিতেছে আগামী কাল। আজই

সাবধান হইতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে সাবধান করিতে হইবে গৌরকে। সে দিনরাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অজুহাত অবশ্য আছে, সে খবরের কাগজ বিক্রী করে। এখানে বাড়ী বাড়ী কাগজ বিলি করে অপরাহ্নে। পরদিন সকালেই সাইকেল ঠেঙাইয়া বাহির হইয়া যায় গ্রামের দিকে।

ভয় স্বর্ণ সম্পর্কেও আছে। সে যে রকম উগ্রমতবাদী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে ভয় অহেতুক নয়। পড়াশুনার মধ্যে ইস্কুলের মেয়েদের যে কি বলিয়াছে তাহা সেই জানে। তবে বলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে অপ্রকাশ থাকিবে না। কিছু-দিন হইতেই এই লইয়া অরুণা বারবার তাহাকে বলিয়াছে —ঠিক এ রকম ক'রে কথা-বার্ত্তা মেয়েদের বলো না স্বর্ণ।

স্বর্ণ শ্লেষ মিশাইয়া হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল—কেন? ভয় করে আপনার? তারপর বলিয়াছিল—কি করবে? চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেবে? দিক না! কিম্বা পুলিশে ধরবে? ধরুক। জুজুর ভয়ে ঘরের কোনে লুকিয়ে তা ব'লে আর থাকতে পারব না।

উচ্চিংড়ে ছেলেটা আবার আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। —মাষ্টারজী!

দেবু বলিল—বল্।

—চিঠ্যি উঠ্যি—কুছ দিজীয়ে গা?

দেবু ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল—ফের তুই যদি হিন্দী বলবি, তোর মাথায় ডাণ্ডা লাগাব আমি।

উচ্চিংড়ে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দেবু বলিল—হাসিস না। হিন্দী কেন বলিস তুই?

উচ্চিংড়ে বলিল—যো সাদী কো যো মন্তর মাষ্টারজী!

তারপর বলিল—মোটর চালায়েঙ্গেজী। চলেঙ্গে—ইধর—উধর—কেতনা দেশ—দিল্লী লাহোর—বিনা হিন্দীসে ক্যায়সে চলে গা, বলিয়ে তো?

—ওদিকে মটরের হর্ণ বাজিতেছে ঘন-ঘন। ড্রাইভারটা হাঁকিতেছে—আরে—এ! এ উচ্চিংড়োয়া!

—আভি আয়া জী! বলুন, বলুন, চিঠি দেবেন?

—না। তুই শুধু বলিস—যে—ঠিক আছে সব। আর—

—আর প্রত্যেক বাসের দিকে নজর রাখবি। দরবারী শেখ দারোগার এখানে আসবার কথা আছে। সে যদি—

—কে? সেই গল্লা-কাটা?

—হাঁা। সে যদি বাসে আসে তবে আমি যেন সঙ্গে সঙ্গে খবর পাই।

—ঠিক হ্যায়। ঠিক মিলেগা। গোবরা আপনাকে ঠিক জানিয়ে আসবে। আমি শহরে গেলেই ও ছুটি পাবে। পরের বাসেই ও ফিরবে। ওকে আমি বলে দোব। ও এখানে থাকবে। নামলেই খবর পাবেন আপনি। ও রেলে এলেও খবর পাবেন। ষ্টেশনেই থাকবে আজ গোবরা। চায়ের দামটা দেবেন।

বলিয়াই ছুটিয়া গিয়া লাফ দিয়া বাসে উঠিয়া পড়িল উচ্চিংড়ে। হাঁকিতে লাগিল—আব চলে গা—তুফান মেল! চল্‌লো—চল্‌লো—চল্‌লো। এই ছেড়ে চল-লো!

বাসের গায়ে দুই তিনটা চাপড় মারিয়া শব্দ তুলিয়া বলিল—অ-ব ঠিক হ্যায়!

দেবু একটু হাসিল। সেই উচ্চিংড়ে—ও গোবরা। শিবকালীপুরে লোকের ঘরে ভিক্ষা মাগিয়া খাইয়া ফিরিত। নিঃসন্তান কর্ম্মকার-বধূ পদ্ম অন্তরের ক্ষুধায় উচ্চিংড়েকে কাছে টানিয়া আপন করিতে চাহিয়াছিল। কর্ম্মকার-বধূ একদা নিরুদ্দেশ হইল—ছেলে দুইটা আসিয়া আশ্রয় লইল জংসনে। দেবু ভাবিয়াছিল—দুইটা ভিক্ষুক বাড়িল, দুইটা জুয়াচোর কি চোর বাড়িল। কিন্তু বিচিত্র এই বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রসভ্যতা-প্রধান নগরসৃষ্টি। কর্ম্ম-প্রবাহ যেমন বিপুল গতি, তেমনি বিশাল পরিধি, শুধু তাই নয়—তেমনি তাহার বহু বিচিত্র স্রোতধারা। এখানকার মোটর যন্ত্র ছেলে দুইটাকে আকর্ষণ করিল। প্রথম প্রথম মোটর বাসের পাশে বসিয়া থাকিত, বিস্মিত দৃষ্টিতে এই যন্ত্রযানগুলিকে দেখিত। যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা চাহিত। ক্রমে বাস-ড্রাইভারদের সঙ্গে ভাব জমাইয়া মোটর বাসের কাছে আসিল। তারপর বিনা বেতনে বেগার খাটিতে সুরু করিল। তারপর জংসন শহরের বিপুল বিশাল কর্ম্মপ্রবাহের এই বিচিত্র স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। সংসারে যে কোন কাজ হইলেই তো মানুষের চলে না,

কাজ করিয়ে তৃপ্তি হয় না, প্রয়োজন হয় কাজের সঙ্গে অন্তরের রুচির যোগাযোগের।

দেবু জানে—এই ভাঙা ভগ্ন সমাজের নিঃস্ব রিক্ত দেশটার মানুষের পঙ্গু জীবন এই জংসনের মত নূতন ক্ষেত্রে সার্থক সচল হইয়া উঠিবে। কংগ্রেসের চরকা-খদ্দরে তাহাদের বিশ্বাস নাই; যন্ত্রশিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের কথায় একটু বাঁকা হাসি তাহাদের ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া ওঠে।

তাহার প্রমাণ চাই ?

দেবু তাহাকে বলিবে—একবার সকালে কি সন্ধ্যায় ষ্টেশনের ওভারব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া দেখিয়ো। সার্থকতা কোথায় একথা মানুষকে বলিয়া দিতে হয় না, জীব-জীবনের ঘ্রাণ ও স্পর্শ শক্তির মত একটা শক্তি আছে তাহার, সেই শক্তিবলে তৃষ্ণার্ত্ত জীবের বাতাসের সজল স্পর্শ হইতে জল কোন দিকে আছে বুঝিতে পারার মত সে বুঝিতে পারে—কোথায় আছে জীবনের সার্থকতা। গ্রামে গ্রামে গ্রামোপযোগী করিয়া এই জীবনধারা ও সভ্যতাকে লইয়া যাও—দেখিবে সেখানেও মানুষের জীবন সার্থক হইয়া উঠিবে। ঠিক এই কারণেই এই জংসনকে সে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র হিসাবে বাছিয়া লইয়াছে। পৌছাইয়া দিবে সে নবজীবনের ধারা।

—মাষ্টার মশায় !

দেবু ফিরিয়া দেখিল—ষ্টেশন কম্পাউণ্ডে কোয়াটার্স এলাকায় ছোটবাবুর বাসার বারান্দায় তাহার ছাত্রদের একজন দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। মাষ্টারদের ছেলেপিলেরা একটু বিচিত্র ধরণের। একটা যেন স্বতন্ত্র জাতি বা সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। জীবন স্বপ্ন—রেলের চাকরী। পড়াশুনা—পাশ করিবার জন্য। সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে উহাদের স্বভাব বদলাইবার জন্য—কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যেন উহাদের রক্তগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফুটবল খেলা—থিয়েটার এই দুইটী হইল—সংস্কৃতির সর্ব্বোত্তম শিখর। যাক—সে তাহার কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে। পাশ করাইয়া দিতে হইবে। সে অগ্রসর হইল। তাহার আগে চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। খবরটা না আসিলে বিপদ হইত। কয়েকদিন আগেই প্রচুর প্যাম্ফলেট আসিয়াছে। সেগুলাকে নষ্ট করিলে চলিবে না। লুকাইয়া রাখিবার খুব ভাল জায়গা তাহার আছে। রামবিলাস তাহার ব্যবস্থা করিবে। প্রয়োজন হইলে—রেলের কোন গুদামের মালের মধ্যে মিশাইয়া রাখিয়া দিবে। ওদিকেও একটা সুবিধা হইয়াছে। এ জেলায় পুলিশের মধ্যেও দেখা দিয়াছে একটা বিরোধ। সামসের খাঁ আসিয়া অবধি এটার সৃষ্টি। লীগ-শাসনের জন্য—সমসের খাঁর মধ্যে ইংরেজ-ভক্তির সঙ্গে মুসলীমপ্রীতিও অত্যন্ত উগ্রভাবে দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া দরবারী শেখকে অত্যধিক অনুগ্রহ করার জন্য হিন্দু কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছে। তার উপর জংসনের এই হিন্দু-মুসলীম বিরোধের ফলে সে বিরোধ ভিতরে ভিতরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু পুলীশ-কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু। অখাদ্য কুখাদ্য বিচার না-করিলেও—তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—চোর-ডাকাত-খুনে-সন্ত্রাসবাদীর হাত হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—দেব-দেবীরা। বিশেষ করিয়া—মা কালী! দেবু আবার একটু হাসিল।

* * * *

দেবু গোপনে সংবাদটা কয়েকজনকেই জানাইয়া দিল। কংগ্রেস আপিসে জানাইল; গ্রামের কর্ম্মীদের মধ্যে যাহারা দলের সভ্য তাহাদেরও জানাইল—যাহারা সভ্য নয় তাহাদের জানাইল যে, এখন দুই তিন হাটবার দেবু বা অন্য প্রধানেরা জংসনে থাকিবে না, সুতরাং তাহারা যেন দেবুর বাসায় বা কংগ্রেস আপিসে, কি রেলওয়ে ইয়ার্ডের মধ্যে মহাবীর-তলায় না যায়। রাজনৈতিক দলের মধ্যে জানাইল না শুধু হিন্দুমহাসভাকে। ওই দলটিকে দেবু দলের মধ্যেই গণ্য করে না। বলে—এ যুগে ওটা হ'ল নিতান্তই সখের যাত্রা থিয়েটারের দল—এবং নাটকে কেবল একটি পার্টই আছে—ভীমের পার্ট। পালার নাম—হিড়িম্বার স্বয়ম্বর; হিড়িম্বার মালা পাবার জন্য যত বর—সবাই ভাম সেজে—তুলোর গদা হাতে নিয়ে—সিংহাসন জুড়ে বসে—স্পিরিটগাম দিয়ে আঁটা—হেম্পি চুলের গোঁফে তা' দিচ্ছে। কথাটা অল্প বিস্তর সত্য, কারণ কঙ্কনার জমিদার বাড়ীর ছেলে—যাকে সুরপতি বলে—'জমিষ্টার'—সে, কি শ্রীহরি ঘোষ, কি শেঠ সুরযমল রাজরোষে ইঁহাদের কোন ভয় থাকিতেই পারে না।

কিন্তু দেবকী সেনকেও সে সংবাদ দিল না। দলের প্রধানদেরও সরাইয়া দিল।

স্বর্ণ বলিল—তুমিও কয়েক দিন সরে যাও।

—না। এখান থেকে সরব না। তবে বাড়ী থেকে সরে থাকব।

—কেন? এখানে থাকবারই বা এমন প্রয়োজন কি?

—আছে। তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে? মানে?

—তুমি জল একটু বেশী ঘোলা করেছ স্বর্ণ। যদি বাড়ী সার্চ করে, কি—তোমাকে ডাকে—। দেবু শিহরিয়া উঠিল। দরবারী না-পারে এমন কাজ নাই। দরবারী একটা পশু।

স্বর্ণ তীক্ষ্ণ হাসিয়া বলিল—ধরেই যদি নিয়ে যায় করবে কি?

—করব আর কি? তবু উৎকণ্ঠা থেকে বাঁচব।

—কোথায় থাকবে?

—থাকব রামবিলাসের আড্ডায়।

—রামবিলাস—এখানকার রেলকর্মীদের একজন মাতব্বর। জংসনের ইয়ার্ডের একজন পয়েন্টসম্যান। ট্রেড ইউনিয়নের একজন সভ্যও বটে। লিলুয়া অঞ্চল হইতে বৎসরখানেক আগে এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছে।

বেলা আড়াইটার সময় কলিকাতা হইতে কাট্ প্যাসেঞ্জারে খবরের কাগজ আসে। গৌর ষ্টেশনে গিয়া কাগজ ডেলিভারি লইয়া থাকে।

হালদার দারোগা—ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল। গৌর ষ্টেশনে আসিতেই তাহাকে বলিল—কি খবর? ওখানে কি?

গৌর হাসিয়া বলিল—কাগজ ডেলিভারী নেব।

—খবরের কাগজ?

—হ্যাঁ।

—বোনাই কোথায়? দেবু ঘোষ?

—কাল রাত্রে কলকাতা গিয়েছে।

—হ্যাঁ! কলকাতা গিয়েছে?

—তারপর—আর সব খবর কি? কি রকম চালাচ্ছ আজকাল?

—কি?

—দলের কাজকর্ম?

—দলবল আর নাই। খেতে পাই না—দল করব!

—হুঁ। তাই বলছিল বটে সব। তা গাঁয়ে গিয়ে চাষবাস কর না কেন? খবরের কাগজ বিক্রী ক'রে আর কি হবে? না—লাঙল ধরতে লজ্জা করে?

গৌর একটু হাসিয়া বলিল—তা করে একটু আধটু। ওই ট্রেন আসছে আমি যাই।

সে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

ব্রেক-ভ্যানের দরজায় গিয়া কাগজের বাণ্ডিল বগলে করিয়া সে আর ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মের গেট দিয়া ফিরিল না, প্লাটফর্ম্মের প্রান্তভাগ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু গেটের কাছে ফিরিতে হইল তাহাকে। তাহার সাইকেল খানা গেটের কাছে পানওয়ালার দোকানে রাখিয়া আসিয়াছে।

গেটের কাছে আসিয়া সে আশঙ্কায় হতবাক হইয়া গেল।

—ও কে? সাদা থান কাপড় পরিয়া বিধবার বেশে ও কে—অরুণা-দিদি? হ্যাঁ অরুণা-দিদি তো! একেবারে চেনা যায় না। চিনিবার উপায় নাই। এ অরুণা-দিদি যেন সে অরুণা-দিদিই না।

সে অরুণা-দিদিকে দেখিয়া মনে হইত—কুমারী মেয়ে। অরুণা-দিদি বিধবা, সেকথা সে জানিত। কিন্তু অরুণা-দিদি পেড়ে কাপড়-ব্লাউজ পরিত। হাতে দুইগাছি চুড়ি ছিল। তাহার সঙ্গে বাঁহাতে থাকিত রিষ্টওয়াচ, মাথার চুল বাঁধিবার ধরণেও কুমারী বা বিধবা চিনিবার উপায় ছিল না।

এ অরুণা-দিদির পরণে সাদা থান কাপড়, সাদা ব্লাউজ, খালি হাত, বেশ-প্রসাধনের ধরণের মধ্যেও বৈধব্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

সে ছুটিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।—অরুণা-দি!

মুখ ফিরাইয়া অরুণা গৌরকে দেখিয়া বলিল—গৌর!

—হ্যাঁ। কিন্তু—।

মধ্যপথেই তাহার কথার উপরে—কথা বলিল অরুণা। বলিল—তোদের কাউকেই খুঁজছিলাম।—ভালই হয়েছে। তারপর মুখ ফিরাইয়া অন্য কাহাকেও বলিল—আমার ব্যাগ বিছানা থানায় নিয়ে যাবার কি দরকার আছে? ষ্টেশনে

তো দেখেছেন সব? এ দুটো বাসায় পাঠিয়ে দিতে আপত্তি আছে আপনার?

দরবারী শেখ পানের দোকানটার ওপাশে ছিল, গৌর দেখিতে পায় নাই। দরবারী শেখ বলিল—না। ও দুটো আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন।

অরুণা বলিল—এ দুটো তুই বাসায় পাঠাবার ব্যবস্থা কর গৌর। আমায় একটু থানায় যেতে হবে।

—থানায় কেন?

রুক্ষ ভাষায় শেখ বলিল—দরকার আছে!

গৌর ছুটিল বাসার দিকে, স্বর্ণকে খবরটা দিয়া সে ছুটিল ইয়ার্ডের কোয়াটার্সের দিকে—দেবুদাকে সংবাদ দিতে হইবে। গৌরের সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন রওনা হইল। আপনার নূতন গিরীশ, কেবিন পুতুলের দোকান বন্ধ করিয়া সেও ছুটিল। সম্পূর্ণ শেষ না হইলেও, গিরীশ তাহার দোকানটা গাছের গায়ে বসাইয়া দিয়াছে। নেলো ছুটিল—স্থান মহাশয়—অর্থাৎ দেবকী সেনের কবিরাজখানার দিকে। সেন ছিল না। সে গিয়াছে জয়তারা আশ্রমে ন্যায়রত্নের কাছে। নেলো আবার ছুটিল। ঘণ্টাখানেক পরে—বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন দেবকী সেনকে সঙ্গে করিয়া থানায় আসিয়া উঠিলেন। তখন স্বর্ণ সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুরপতিবাবুও আসিয়াছেন, তিনি বসিয়া আছেন থানার ভিতরে। (ক্রমশঃ)

সাহিত্যিকের কর্ম্মসাধনা

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সাহিত্য সাধনার যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায় তাহা অতিক্রম করিয়া সাহিত্য সম্মেলনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে যোগ দিবার অবসর সাংবাদিকের কর্ম্মজীবনে সহজে ঘটিয়া ওঠে না। সাহিত্যের ধারক ও বাহক হইলেও উহার নিয়মিত সাধক হইবার সুযোগ সাংবাদিকের জীবনে স্ফূরিত হইবার অবকাশ পায় না। সাহিত্য নিত্য, কিন্তু সাংবাদিকের অবদান সাময়িক ও নৈমিত্তিক। যে ফুল প্রভাতে ফুটিয়া সন্ধ্যা না হইতে হইতেই ঝরিয়া যায় সাহিত্যের দিক দিয়া সেই ফুল ফুটাইয়া যাওয়াই আমাদের কর্ম্ম ও সাধনা। তথাপি উহারই মধ্য দিয়া সাহিত্যের যজ্ঞসূত্রে কিছু দান যে ঘটে, রূপ-রস-গন্ধে কিছু প্রকাশ যে দেখা যায়, তাহা উপলব্ধি করি তখনই, যখন মনীষীর সম্মেলন সাহিত্যের অর্ঘ্য রচনার জন্য সাংবাদিককে আহ্বান করেন।

মেদিনীপুর জেলায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যাঁহার নাম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য, বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য গঠনে অগ্রণিগণের পূর্ব্বগুরু সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মেদিনীপুরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা যখন চিন্তা করি—তখন রামায়ণের একটি চিত্র মনশ্চক্ষুতে ভাসিয়া ওঠে। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞসভায় বাল্মীকির সহিত সীতা যখন প্রবেশ করিতেছেন তাহার বর্ণনায় রামায়ণকার বলিয়াছেন:

"তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগামিনী হইয়া বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য যেভাবে বিশ্বসভায় প্রবেশ করিয়াছে রামায়ণের উল্লিখিত বর্ণনাটি তাহার উপযুক্ত উপমা। পরবর্তীকালে যে গদ্য রীতি অবলম্বন করিয়া বাঙলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটিয়াছিল বিদ্যাসাগর হইতেই তাহার সৃষ্টি। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে লক্ষ কোটিবার প্রণাম করিয়াও তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। তাঁহার নামে স্মৃতিমন্দিরের নামকরণ করিয়া এবং তথায় বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা করিয়া মেদিনীপুরের অধিবাসীরা উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন।

সাহিত্যের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হইলেও আর একটি অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য আমাকে করিতে হইবে। মেদিনীপুরে আসিয়া পরলোকগত কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। তাঁহার সামাজিকতা, বদান্যতা প্রভৃতির কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। তাহা সুপরিচিত। যাহা বিশেষভাবে স্মরণীয় তাহা হইল দেশ-হিতার্থে তাঁহার ত্যাগ ও দুঃখবরণ। এই ত্যাগ ও দুঃখবরণের সম্পূর্ণ কাহিনী লোক সমক্ষে কখনও হয়ত প্রকাশিত হইবে না; ইতিহাসে তাহার কতখানি পরিচয় থাকিবে ভবিষ্যতের কথা।

সাহিত্য অবসরের সৃষ্টি। যথেষ্ট অবসর এবং যথেষ্ট বিরাম না মিলিলে উন্নততরের সাহিত্য বা স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। সুখের অবস্থাতেই হোক বা দুঃখের অবস্থাতেই হোক, সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অবসর অত্যাবশ্যক। বাহিরের দিক হইতে ইহা স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ না হইলেও মনের দিক হইতে ইহা অবিসংবাদিত সত্য। বাহিরের লোকেরা ইহা হয়তো বুঝিতে পারে না; কিন্তু সাহিত্য রচনা যে করে সে আপনার মধ্যে ইহার সত্যতা প্রত্যক্ষভাবেই উপলব্ধি করে। সাংবাদিকের

অতিব্যস্ত জীবনে বাহিরের ও অন্তরের দিক হইতে এই অবসরের একান্ত অভাব বলিয়াই উল্লিখিত মন্তব্যের সত্যতা আমরা যেমন উপলব্ধি করিতে পারি এমন বোধ হয় আর কেহ পারে না। একই ক্ষেত্রে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের সংমিশ্রণ বাঙলা সাহিত্যে একাধিকবার ঘটিয়াছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে সাহিত্যেই যাহার মূলপ্রবৃত্তি শেষ পর্য্যন্ত সাহিত্যই তাহার একান্ত উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে।

সাহিত্যের যাহা উপজীব্য, ইতিহাসের যাহা উপাদান তাহা মেদিনীপুরের দিকে দিকে পরিকীর্ণ হইয়া আছে; গম্ভীরনাদী সমুদ্র-সলিলে বিধৌত এই ভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মহত্ব ও বিশালত্বের রূপ যেন আপনা হইতেই মিশিয়া রহিয়াছে। উচ্চতম মহিমা, গভীরতম বেদনা এবং নিবিড়তম অনুভূতি—এইগুলিকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বজন-সমাদৃত স্থায়ী সাহিত্যের উদ্ভব হইয়া থাকে। মেদিনীপুরের পূর্ব্ব-প্রান্তস্থ সমুদ্রসৈকতে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে 'কপালকুণ্ডলার' উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা অকারণ নহে। বহু পুরাতন কথার উত্থাপন করিব না, ১৯২০ সালে 'অসহযোগ আন্দোলনের' প্রারম্ভ হইতে রাজনৈতিক কর্ম্মজীবনে মেদিনীপুরের যে সকল বন্ধুদের সহিত পরিচয় হইয়াছে, যে সকল ঘটনার সহিত অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় লাভের সুযোগ হইয়াছে এবং যে বিপর্য্যয় ও উত্থান-পতনের ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষ্য করিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি তাহা হইতে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, সাহিত্য-সৃষ্টির মূলগত পূর্ব্বোক্ত উপাদানসমূহ এখানে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান।

সাহিত্যের কথা অপেক্ষা বাঙ্গালীর নিজ জীবন-সমস্যার কথাই আজ আমাদের কাছে অত্যন্ত বড় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর জীবনাকাশ আজ নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন আর তাহারই নিকষকৃষ্ণ ছায়া পড়িয়াছে বাঙ্গালীর সমাজ ও সাহিত্যের উপর। ইহা আসন্ন বরষায় নবসম্ভাবনাপূর্ণ মেঘসঞ্চার নহে—যে মেঘের জন্য তৃষিত, আকুল ও আশাপূর্ণ চিত্তে লোকে চাহিয়া থাকে, যাহা নবসৃষ্টির সূচনা করে, ফলভার-পরিমাণ সাফল্যের প্রেরণায় যাহা নূতন জীবনীশক্তি বহন করিয়া আনে। আমাদের জীবনাকাশে এখন যে ঘনঘটা দেখা দিয়াছে ইহা সেই মেঘ যাহার মধ্য দিয়া প্রলয়ের ইঙ্গিত ও সূচনা প্রকট হইয়া ওঠে, কাল-বৈশাখার ক্ষণিক প্রকাশে যাহার ধ্বংসকারী শক্তির পরিচয় মাঝে মাঝে অকস্মাৎ আমরা পাই—যাহার ঘর্ষণে ঘর্ষণে বিদ্যুদগ্নি লোকত্রাস উৎপাদন করে—যাহা ঝড়ঝঞ্ঝা, উৎপাত, মহামারীর বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। জীবনের এই সঙ্কট আমাদিগকে মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষায় আহ্বান করিতেছে। সেই পরীক্ষায় কিভাবে আমরা উত্তীর্ণ হই তাহার উপরেই আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের স্থিতি ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ইতিহাসের যুগ-পরিবর্ত্তনে ও রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বেও যে বাঙ্গালীসমাজকে এমনতর সঙ্কট ও সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার প্রমাণ ও পরিচয় আমাদের সাহিত্যের মধ্যে রহিয়াছে, সাময়িক সাহিত্যের উপর তাহা আপনার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। যে সঙ্কটের প্রকাশ ও ক্রিয়া আমরা সম্মুখে দেখিতেছি, ইহার ঘাত-প্রতিঘাত সাহিত্যের উপর কি আকারে দেখা দিবে তাহা সুধীজনের চিন্তনীয় বিষয়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমার উপরে এক বিশেষ ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কি কর্ম্মসাধনা অবলম্বনীয় তৎসম্বন্ধে স্বীয় অভিমত দিতে হইবে। সাধারণ লৌকিক ক্ষেত্রে ইহার যে উত্তর দেওয়া যায়—সাহিত্যের ও সাহিত্যসাধনার মাধ্যম অবলম্বন করিয়াই সেই উত্তর উপস্থাপিত করিতেছি। সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম তাহাতেই ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহা যন্ত্রচালিত রচনার ধারা বা সমষ্টি নহে। ইহা শক্তির সমন্বয় ও প্রকাশের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহা শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে এবং ব্যক্তির মধ্যে ও সমষ্টির মধ্যে নবশক্তি উদ্বোধনের প্রেরণা দেয়—নবশক্তি জাগাইয়া তোলে। ভাবের রাজ্যে, চিন্তার রাজ্যে, অনুভূতির রাজ্যে প্রেরণা ও আলোড়ন জাগাইয়া তাহাকেই কর্ম্মজগতের মধ্যে নূতন রূপ দেয়। আমরা সেই প্রত্যক্ষরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হই, অভিভূত হই। কিন্তু সন্ধান ও বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, মূল শক্তির ক্রিয়া হইতে উহার উদ্ভব, সাহিত্যের শক্তির আধারেই তাহা প্রথমে সঞ্চিত ও সঞ্চারিত হইয়াছে। সবিশেষ পরিচয় দিবার সময় ও অবসর এখানে নাই। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য ও বিশ্ব-ইতিহাস একত্রে পাশাপাশি রাখিয়া অনুধাবন করিলে আমার বক্তব্যে উহার অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইবে। দুইটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ফরাসী বিপ্লবের মূল শক্তির সন্ধান রহিয়াছে রুশোর রচনায়। বাঙলার ও ভারতের নব জাতীয়তার মূল প্রেরণা রহিয়াছে বঙ্কিমের আনন্দমঠে।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম দিকে বাঙ্গালী সমাজ ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—ইংরাজ রাজত্বের অবসানে পুনরায় ছড়াইয়া পড়িতেছে বা ছড়াইয়া পড়িতে হইতেছে। কিন্তু উভয় অবস্থার মধ্যে কি মর্ম্মভেদী পার্থক্য! তখন বাঙ্গালী ভারতবর্ষে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল সুষুপ্ত ভারতকে জাগাইবার জন্য জ্ঞানের বর্তিকা হাতে লইয়া, মুক্তিমন্ত্রের প্রেরণা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিয়া; তাহাতে ভারত জাগিয়াছিল, বাঙ্গালীর নিকট হইতে জ্ঞান-সাধনায় ও মুক্তি-সাধনায় দীক্ষা লইয়াছিল; বাঙ্গালীকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; বাঙ্গলার প্রতিভা ও দেশাত্মবোধ সেদিন অজস্র ধারায় আপনার দানে ভারতবর্ষকে পরিপুষ্ট করিয়াছে; উহাকে নূতন রূপ দিয়াছে; আপনাদের ধ্যানের ভারতকে অধ্যাত্মলোক হইতে আনিয়া চক্ষের সম্মুখে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেদিন, আর এদিন! আজ আমরা ছড়াইয়া পড়িতেছি, সংসার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন বাস্তুহারা হইয়া, আশ্রয়হারা হইয়া, সর্ব্বহারা হইয়া; হয়তো বা অনুগ্রহের প্রার্থী এবং কৃপার প্রার্থী হইয়া। বিশ্বসমাজের নিকট ভারতীয় সংস্কৃতির যাঁহারা বার্ত্তাবহ এবং অগ্রদূত,—রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত,—এই বাঙলা দেশ হইতেই তাঁহারা উদ্ভূত হইয়াছেন। আজ ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া দাঁড়াইতে হইবে ইহাই কি আমাদের বিধিলিপি? বুঝিতে পারি না, ভবিষ্যৎ দেখিতে পাই বা উপলব্ধি করিতে পারি এমন অভিমানও পোষণ করি না; তথাপি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বর্ত্তমানকে পরীক্ষা করি এবং ভবিষ্যতের

দিকে চাহিয়া থাকি—পরিণাম কি এবং পরিণতি কোথায়? ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রায়াবসানকালে আসন্ন দুর্গতির সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শেষ জন্মদিনের' অভিভাষণে বলিয়াছিলেন :

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।" আজ দেখিতেছি কবির এই ভবিষ্যৎ উপলব্ধি তাঁহার স্বপ্রদেশ সম্বন্ধেই সত্য হইয়া উঠিয়াছে। যে সংঘর্ষের পরিণামে ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটিয়াছে এবং ইংরাজ শাসনের অবসানের সহিত যে সংঘর্ষ উদ্ভূত হইয়াছে সেই উভয় সংঘর্ষসঞ্জাত হলাহল পান করিবার ভার বিধাতাপুরুষ বাঙলা দেশের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।

সাহিত্য সমাজের উপর নির্ভর করে। সমাজ যদি ভাঙ্গে, সাহিত্য কিসের উপর দাঁড়াইবে? সাহিত্যিকের পক্ষে এবং সাহিত্য-সেবীর পক্ষে ইহাই গুরুতর সমস্যা। সাহিত্য কৃত্রিম বস্তু নহে, কৃত্রিমভাবে উহা সৃষ্ট হয় না বা উহার সৃষ্টি করা যায় না। সমাজের মধ্য হইতে রস ও জীবনীশক্তি আহরণ করিয়া উহা আপনিই গড়িয়া ওঠে এবং পরিপুষ্ট হয়। অবশ্য ইহা সত্য যে, যে সাহিত্য দেশ, কাল ও পরিবেশকে যতখানি অতিক্রম করিয়া উঠতে পারে, তাহা ততখানি স্থায়ী সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। তথাপি উহার মূলে সামাজিক স্থিতির অবশ্য প্রয়োজন। এই স্থিতি হইতে ভ্রষ্ট হইলে সাহিত্যের ধারা অবলুপ্ত ও শুষ্ক হইয়া যায়। যাঁহারা দৃষ্টান্ত চাহিবেন তাঁহাদের দৃষ্টি সংস্কৃত সাহিত্য ও পালি সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ করিব। এই উভয় সাহিত্যেরই সম্পদ প্রচুর। কিন্তু কোনটিরই ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নাই। যে সমাজে এবং সমাজের যে অবস্থায় এই দুই সাহিত্য উদ্ভূত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছিল ধীরে ধীরে তাহার অবসানের সহিত সাহিত্যের সজীব ধারাও অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সামাজিক পুনরভ্যুদয়ের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা জাগিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু পালি সাহিত্যের ধারা আর জাগে নাই। কারণ, সেই সমাজ ও সেই সামাজিক পরিবেশের পুনরভ্যুদয় ভারতবর্ষে আর ঘটে নাই। বাঙ্গালীর জীবনে বর্ত্তমানে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে এবং সমাজ যেভাবে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বাঙলা সাহিত্যের এই সম্ভাবিত বিপদের কথা আপনিই মনে আসে।

রাজনীতির সাধনায় বহু বিপদের সম্মুখীন আমরা হইয়াছি, বহু বিপদ বরণ করিয়াছি এবং বহু বিপদ আমরা অতিক্রমও করিয়াছি। বাঙ্গালী সমাজ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তাহার ক্ষয়ক্ষতি আমরা হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছি এবং জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্যে তাহা পূর্ণও করিয়াছি। তাহা আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে নাই, এইজন্য যে, সে আঘাত নিতান্ত বাহিরের আঘাত, অন্তর্নিহিত শক্তিতে তাহার প্রতিরোধ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইয়াছে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের উপর কোন আঘাত বা উহার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে তাহা আমাদিগকে বিচলিত করে। কারণ, সে আঘাত লাগে একেবারে আমাদের মর্ম্মমূলে। রাজনীতির ক্ষতি বাহিরের, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষতি আমাদের পরমৈশ্বর্য্যের হানি। বাঙ্গালী অর্থনৈতিক-ক্ষেত্রে দরিদ্র হইলেও, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার বৈভব অতুলনীয়। এই বৈভবের প্রাচুর্য্যে কেবল ভারতে নহে, সমগ্র বিশ্বে তাহার একটা প্রাধান্য আছে। সাহিত্যই আমাদের সম্বন্ধ ও গৌরবের চিহ্নরূপে সকলের সম্মুখে প্রধান দর্শনীয় বস্তু। কেবল আমাদের নহে, ভারতবর্ষ আপনার পক্ষ হইতে গৌরবের নিদর্শন স্বরূপে বিশ্বের সম্মুখে যাহা উপস্থাপিত করিতে পারে, বাঙলা সাহিত্য তাহার মধ্যে অন্যতম প্রধান। বর্ত্তমান যুগে ভারতের যদি কিছু গৌরব থাকে সে গৌরব বাঙলা সাহিত্যই আহরণ করিয়াছে। কেবল সাহিত্যও নহে, সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য, চারুশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি ললিতকলার সকল অংশেই ভারতবর্ষ তথা বিশ্বসভ্যতা বাঙ্গালীর প্রতিভার দানে সমৃদ্ধ। ভারতের রাজসূয় যজ্ঞশালা হইতে আজ শ্রীর অন্তর্দ্ধান ঘটিবে, যদি তাহা বাঙ্গালীর করস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয়।

যে অবস্থার মধ্যে আজ আমরা সহসা উপনীত হইয়াছি এবং যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছি ইহার মধ্যে সাহিত্যিকের স্থান ও কর্ত্তব্য কি এবং সাহিত্যের উপযোগিতা কোথায় সে কথা আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনুষ্য জীবনের গভীরতম বেদনাই সাহিত্যের প্রধানতম উপকরণ। কেবল এ দেশ নহে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই ইহা সত্য। জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, যাহা স্থায়ী সাহিত্যরূপে সমাজের প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে মানুষের গভীরতম বেদনার অনুভূতি পুঞ্জীভূত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। রামায়ণ মহাভারত, শকুন্তলা বা ইলিয়াডের যুগ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত ইহা সত্য। ফরাসী সাহিত্যে 'লা মিজারেব্‌ল্', রুশীয় সাহিত্যে 'মাদার' জোয়ান্ বোয়ারের 'পিল্‌গ্রিমেজ' প্রভৃতিও আমার কথার দৃষ্টান্তস্থল।

রামায়ণ রচনার সার্থকতা সীতার বেদনা প্রকাশের মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। লঙ্কা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়াছে; সীতা বিজয়ী রামের সম্মুখে আনীতা হইয়াছেন; দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সীতাবিরহিত রাম ও রামবিরহিতা সীতার সাক্ষাৎ। সীতার তখন মনের অবস্থা কল্পনা করিবার। সেই অবস্থায় রামচন্দ্র সীতাকে কি সম্ভাষণ করিলেন। প্রেমের সম্ভাষণ নয়। তিনি বলিলেন—'তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ আসিয়াছে। চক্ষু-রোগীর সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত দীপ যে পীড়া দেয় আমার সম্মুখে তোমার উপস্থিতি আমাকে পীড়া দিতেছে। দশদিক উন্মুক্ত আছে যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাও।' তৎকালীন সীতার যে বেদনা সে বেদনাকে রূপ দিতে পারে একমাত্র সাহিত্য। রামায়ণে সে বেদনা প্রতিফলিত হইয়াছে। সেইজন্য রামায়ণ আমাদের এত প্রিয়।

রামায়ণ হইতে আর একটী উদাহরণ দিতেছি। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সীতা অযোধ্যায় ফিরিয়াছেন। তারপর মিথ্যা অপবাদে পুনরায় তাঁহার বনবাসের আদেশ হয়। দীর্ঘ বনবাসের পর অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় বাল্মীকি যখন রামচন্দ্রের নিকট আবেদন করেন সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য, তখন রামচন্দ্র গ্রহণ করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। যজ্ঞসভায় সর্ব্বসমক্ষে পুনরায় পরীক্ষা দিবার প্রস্তাব হয়। যে স্বামী তাঁহাকে অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন তিনিই পুনরায় পাতিব্রত্যের পরীক্ষা দিতে বলিতেছেন। সীতার হৃদয়ের তৎকালীন বেদনার কি কোনো পরিমাপ আছে? এই পরীক্ষাই সীতার জীবনের চরম পরীক্ষা। তিনি রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন না। ইষ্টদেবতা সূর্য্যের দিকেও তাকাইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন তৎকালীন তাঁহার যে বেদনা—সে বেদনা সহ্য করিবার শক্তি সর্ব্বংসহা বসুমতী ছাড়া আর কাহারও নাই। সেইজন্য সীতা তখনি পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—রাম ছাড়া আর কাহাকেও আমি জানি না—একথা যদি সত্য হয়, কায়মনোবাক্যে আমি রামের অর্চ্চনা করিয়াছি—একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মা পৃথিবী আমাকে তাঁর বুকে স্থান দিন। সীতার মুখ হইতে তিনবার একথা উচ্চারিত হইবার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহা আপনারা জানেন। এই অনন্তকালব্যাপী রূপ দিতে পারিয়াছেন বলিয়াই বাল্মীকি আদি কবিগুরু। মহাভারতের আখ্যায়িকার ভিত্তি দ্রৌপদীর বেদনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কৌরব রাজসভায় দ্রৌপদীর অবমান মহাভারত রচনার মূল প্রেরণা। দ্রৌপদী যখন লাঞ্ছিতা হন—তখন তাঁহার দুইদিকে কুরুকুলের দুই শাখা। দ্রৌপদী একবার দক্ষিণে একবার বামে তাকাইলেন না। কিন্তু তাঁহাকে অবমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাহাকেও তিনি উদ্যত দেখিতে পাইলেন না। মানুষ যখন সেই অবমাননার প্রতিকার করিতে পারিল না তখন দ্রৌপদী আকুল আবেদনে অতীন্দ্রিয়শক্তির নিকট আপনার বেদনা নিবেদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পাইল। অবমানিতা দ্রৌপদীর বেদনা মহাভারতকারের রচনার মধ্যে অমরতা লাভ করিল। ইহাই সাহিত্য—সাহিত্যের মূল ভিত্তি মানুষের বেদনাকে রূপ দিবার ক্ষমতা। পরবর্ত্তীকালে শকুন্তলার মধ্যে, সেক্সপীয়রের রচনায় ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে মানুষের বেদনা রূপ লাভ করিয়া অমর ও সর্ব্বকালস্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে।

জীবনের অগ্রগতির পথে, রাজনীতি ও সমাজের বিবর্ত্তনের পথে মধ্যে মধ্যে বিপর্য্যয় আসে। সেই বিপর্য্যয়ের রথচক্রতলে কত মানুষ নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়। মানুষের জীবনধারা এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সমাজ, সংস্কার ও ঐতিহ্য সহসা ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইতিহাস এইগুলিকে মাত্র ঘটনা হিসাবে এবং ঘটনার অগ্রগতির চিহ্ন হিসাবে উল্লেখ করিয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রকৃত রূপ এবং অন্তর্নিহিত সত্য রক্ষিত ও পরিস্ফুট হয় সাহিত্যে। সাহিত্যিক আপনার অনুভূতিকে প্রসারিত করিয়া মনুষ্যজীবনের ও মনুষ্যসমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অনুভূতিকে গ্রহণ করেন এবং তাহাই পুনরায় আপন কল্পনার বর্ণবিন্যাসে ভাষার মধ্যে রূপ দিয়া সমাজের নিকট ফিরাইয়া দেন। ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণ এইরূপ সাহিত্যিকের উদ্ভবের অপেক্ষা রাখে এবং যুগসন্ধিক্ষণে এইরূপ সাহিত্যিক দেখা দেয়। তাঁহারাই লাভ করেন যুগসাহিত্যিকের পদবী। বাঙলায় ইংরাজ-শাসনের প্রথম যুগে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' দেখা দিয়াছিল; দেশে ও সমাজে বিপর্য্যয় আনিয়াছিল। মানুষের সেই পুঞ্জীভূত বেদনা রূপ ও ভাষা পাইবার জন্য যুগসাহিত্যিকের উদ্ভবের অপেক্ষা করিতেছিল। প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে ইহাই রূপ লইল বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'। মানুষের গভীরতম অনুভূতির আবেদন কখন ব্যর্থ হয় না। স্থূল সত্তার ঊর্দ্ধতর কোন্ স্তরে উহার ক্রিয়া থাকিয়া যায়। সংবেদনশীল মনের ও অধ্যাত্মচেতনার স্পর্শ পাইলেই উহা পরিপূর্ণরূপে রূপায়িত হইয়া ওঠে। বঙ্কিমের মধ্য দিয়া উহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বাঙ্গালীর জীবনসমুদ্রের উপর দিয়া আজ যে মন্থন চলিয়াছে সেই মন্থনের মধ্যে আমাদের চক্ষের সম্মুখে মনুষ্যজীবনের গভীরতম বেদনার ঘটনা ও প্রকাশ অহরহঃ ঘটিতেছে। ইহার বিস্তার ও গভীরতা এতখানি যে, সাধারণ চিন্তা ও কল্পনার সাধ্য নাই যে, ইহাকে ধারণ করে। বাঙ্গালীর জীবনে যে এতবড় দুর্দিন আসিয়াছিল ইহার নিদর্শন রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ইহাকে ভাষা ও রূপ কে দিবে? বাঙ্গলা সাহিত্যের পূর্ব্বগুরুগণ আজ বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাদের চিন্তা ও রচনার ধারা কিরূপ হইত বলিতে পারি না। কিন্তু যাহা দেখিয়াছি ও যাহা দেখিতেছি ইহাকে রূপ দিবার জন্য বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে যুগসাহিত্যিকের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। উৎপীড়িত মানবাত্মার অনুভূতি অধ্যাত্মচেতনার স্তরে যে আঘাত ও যে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তাহা সংবেদনশীল মনে সঞ্চারিত হইয়া আপনিই যুগসাহিত্যিককে জাগাইয়া তোলে একথা সত্য। তথাপি মানব বেদনার এই প্রকাশকে রূপ ও ভাষা দিবার জন্য সাহিত্যিকের যে দায়িত্ব আছে, বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণকে তাহাই বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।*

---

* ৪ঠা জুন মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক উৎসবের সপ্তত্রিংশৎ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণের মর্ম।

—বারো—

—একবার জয়গড়ে আসুন, খুব জরুরি দরকার।

নগেন ডাক্তার খবর পাঠিয়েছেন।

দুপুরে সাধারণত চাকরী থাকে না। এই সময়ে গীতোক্ত কৌন্তেয়—অর্থাৎ কুমার ভৈরবনারায়ণ বিশ্রাম শয্যায় গা এলিয়ে দেন। এই বিশ্রাম পর্বটা দেখবার সুযোগ একবার ঘটেছে রঞ্জনের। ব্যাপারটা শুধু রোমাঞ্চকর নয়—রীতিমতো ভয়াবহ। জাহাজের মতো একখানা সুবিশাল খাটে বপুষ্মান কুমার বাহাদুর পড়ে থাকেন একটি ব্রহ্মদেশীয় শিশু-হস্তীর মতো। দুবেলা কুস্তি-করা দুজন ছাপরাই চাকর তখন সশব্দে তাঁর অঙ্গসেবা করতে থাকে। মহিষ স্নান করাবার দৃশ্য তার চোখে পড়েছে—ডলন-মলনের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় আধ মাইল দূর থেকে। কিন্তু কুমার বাহাদুরের অঙ্গ-মর্দনের ধকল একদিন সহ্য করতে হলে বুনো মোষও জেলী মাছ হয়ে যেত। ষণ্ডা জোয়ান দু দুটি পালোয়ানেরও মুখ দিয়ে ফেনা ছুটতে থাকে; মাথার ওপর বায়ান্ন ইঞ্চি পাখার প্রচণ্ড ঘূর্ণন সত্ত্বেও তাদের গা দিয়ে দরদর করে নামতে থাকে কাল-ঘাম।

রাজা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি—সন্দেহ কী! সকালে-বিকেলে অন্তত কয়েক হাজার লোক হাত বুলিয়ে আসে কাশীর বিশ্বনাথের মাথায়। অবশ্য হাত বুলিয়ে কিছু তারা হাতাতে পারে কিনা কে জানে, কিন্তু বিশ্বনাথকে বসে বসে দিতে হয় ধৈর্যের পরীক্ষা। সে-হিসেবে ভৈরবনারায়ণ নিশ্চয় দেবাংশসম্ভূত। বিশ্বনাথের কাছে কিছু নগদ বিদায় মেলে না, এখানে অন্তত রাজসেবায় দুটি প্রবল-মল্ল প্রতিপালিত হচ্ছে।

বারোটা থেকে পাঁচটা—এইটুকুই সব চেয়ে মূল্যবান সময়। সাময়িকভাবে ঘটোৎকচের পতন। তারপর পাঁচটায় চা—তার মধ্যেই ফিরে এলেই চলবে। তখন কুমার বাহাদুরের চার পাশ ঘিরে বসবে স্তাবকের দল—ডাক্তার, পোষ্ট-মাষ্টার, সদর-নায়েব, সুমীরনবীশ। ঘোড়ার চড়ার গল্প, ভৌতিক কাহিনী, কাঞ্চনগরের যুদ্ধের ইতিহাস, লাট-সাহেবের একখানা আস্তো খাসির রাং খাওয়ার জ্বালাময়ী বর্ণনা। সেই সময় তাকে হাসতে হবে, হেঁ হেঁ করতে হবে—বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হবে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে। তার আগে পর্যন্ত আপাতত ছুটির পালা।

কুমার বাহাদুরের অঙ্গ-মর্দন চলতে থাকুক, এই ফাঁকে তার জয়গড় ঘুরে আসা দরকার।

ঘরটায় একটা তালা দিলে, তারপর বারান্দা থেকে সাইকেলটা নামিয়ে বেরিয়ে পড়ল রঞ্জন।

আবার সেই ধান-ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কুমারীর সিঁথির মতো পথের রেখা। অগণিত পদ্মকোরকের মতো তুঁষের হিরণ্ময় পাত্রে ঘন ক্ষীরের মতো জমে-আসা ধান। দূর-দূরান্তব্যাপী হরিতের ওপর হিরণের দ্যুতি পড়েছে—আর কদিন পরেই পাকতে আরম্ভ করবে। কিন্তু এবার কিছু পোকার উপদ্রব আছে, কিছু নষ্ট হবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া আকাশে কালো মেঘেরও আনাগোনা চলছে—যদি জল আসে তাহলে এদের অর্ধেক ডুবে যাবে এমন আশঙ্কাও জেগেছে লোকের মনে।

দু ধারের ধান ক্ষেতের চড়াই-উৎরাই ভেঙে সে চলল। হাল্‌কা ধুলোর ওপর সাপের রেখা, আর মানুষের পদচিহ্নের ওপর চাকার দাগ টেনে চলল সাইকেল।

এই ক্ষেতটা পার হলে তিন চারটে শিমুল গাছ এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে—; ওইখান দিয়ে ত্রিভুজের একটা কোণের মতো ভৈরবনারায়ণের এলাকার মধ্যে খানিক দূর ঢুকে গেছে ফতেশা পাঠানের জমি। দুজনের মধ্যে ওটা নিয়েই লাঠালাঠি আর ঝামেলা। এই সীমান্ত-রেখার ওপরে পর পর সাঁওতালদের কয়েকখানা ছোট ছোট গ্রাম—ফতে শাহর অবাধ্য প্রজার দল। টুলকু আর ধীরুয়া সাঁওতালের জন্মভূমি।

মাঠ পার হয়ে শন-ঘাসের বন ঠেলে চলতে চলতে মনে

পড়ছিল দিন কয়েক আগে এখানেই সাঁওতালদের বুনো-শুয়োর মারতে দেখেছিল সে। আরো মনে পড়ল সাঁওতালদের ওখানে নাচ দেখবার এবং মাংস-ভাত খাওয়ার একটা নিমন্ত্রণও ছিল তার। সেদিন সেটা রক্ষা করবার সুযোগ হয়নি—একদিন এসে চুকিয়ে যেতে হবে তাকে।

—আদাব বাবু।

তাকিয়ে দেখল পাশের আল্ দিয়ে একদল মুসলমান চাষী এগিয়ে আসছে। সম্ভাষণটা তাদেরই।

—হাজী সাহেব যে। খবর কী?—প্রসন্ন মুখে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল রঞ্জন: জিয়াফৎ আছে নাকি কোথাও?

দলটি তখন রাস্তার সামনে এসে পড়েছে। সকলের আগে আগে পিয়ার হাজী—এ তল্লাটের তিনিই সামাজিক নেতা। সম্পন্ন চাষী। প্রায় একশো বিঘে জমি রাখেন, খান চারেক গরুর গাড়ি আছে। অল্প-সল্প ইংরেজী জানেন—হজ ঘুরে এসেছেন।

মধ্যবয়সী লোক—মুখে একটি প্রসন্ন হাসি লেগেই থাকে। হেসেই বললেন, না, জিয়াফৎ নয়।

—তবে এত সেজে গুজে চলেছেন কোথায়? আজ তো কোনো পরব নয়।

সাজ গোছের ঘটা সকলেরই একটু আছে, সন্দেহ নেই। কারো মাথায় শাদা ধব্‌ধবে গোল টুপি, কারো রাঙা টকটকে ফেজ। শাদা পায়জামার ওপর হাজী সাহেব কালো রঙের একটা লম্বা কোট পরেছেন, পায়ে চকচকে জুতো। বাকী সকলের কারো ফর্সা পাঞ্জাবী, কারো জাপানী-আদ্দির জামা, পাট-ভাঙা লুঙ্গি আর পায়জামা। বেশ সমারোহ করেই বেরিয়েছে দলটা।

হাজী সাহেব বললেন, একটা মিটিং আছে আমাদের।

—মিটিং? কিসের মিটিং?

—লীগের।

—লীগের কাজকর্ম এ তল্লাটেও আছে নাকি?—রঞ্জন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—এতদিন ছিল না—এইবারে হচ্ছে।—হাজী সাহেবের হাসিটা এবারে আর একটু বিস্তৃত হয়ে পড়ল। ফুটে বেরুল একটা আন্তরিক প্রসন্নতা।

—সে তো বেশ কথা। কিন্তু মিটিংটা হচ্ছে কোথায়?

—শাহুর কাছারীতে। কাল ঢোল দিয়ে গেছে গ্রামে গ্রামে।

—শাহুর কাছারীতে!—রঞ্জনের স্মৃতি আবার সজাগ হয়ে উঠল: আলিমুদ্দিন মাস্টারও আছেন নিশ্চয়?

—তিনিই তো গোড়া। তাঁর চেষ্টাতেই সব হচ্ছে।—কৃতজ্ঞতার রেশ লাগল হাজী সাহেবের গলায়: খুব এলেমদার লোক।

—হাঁ, আমার আলাপ হয়েছে তাঁর সঙ্গে—রঞ্জন বললে, আচ্ছা, আপনারা যান। ওদিকে আবার আপনাদের দেরী হয়ে যাবে।—রঞ্জন সাইকেলে উঠল।

—আপনি কোথায় চললেন?

—যাব একটু জয়গড় মহলে।

—আদাব—

—নমস্কার—

শন ঘাসের বনের মধ্য দিয়ে আবার এগিয়ে চলল রঞ্জন।

আলিমুদ্দিন মাস্টার! হুঁ—বার তিনেক নানা উপলক্ষে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। কথাবার্তার সুযোগও ঘটেছে কিছু কিছু। তীক্ষ্ণধী, বিচক্ষণ লোক। চাপা ঠোঁট—মুখের ওপর একটা শান্ত কাঠিন্য। বজ্রগর্ভ মেঘের মতো চেহারা। দেখলেই বোঝা যায়, অনেকগুলি মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি তাঁর আয়ত্ত।

তিনিই লীগের সংগঠন কাজে মন দিয়েছেন! খুব চমৎকার কথা। দেশের প্রতিটি সম্প্রদায় আত্ম-সচেতন হোক, নিজের মর্যাদাকে ফিরে পাক; মুক্তি লাভ করুক সবরকমের হীনমন্যতার পীড়ন থেকে। এর চেয়ে বড় জিনিস আর কী হতে পারে! জাতির এক একটি অঙ্গ যদি শক্তিলাভ করতে পারে, তা হলে তার সমগ্র দেহের পূর্ণ জাগরণে আর কতখানি দেরী হবে!

পৃথক্ জাতীয়তা—পৃথক্ সংস্কৃতিবোধ! হোক—কোনো ক্ষতি নেই। অন্তত বাঙালি মুসলমান যে প্রধানত দীক্ষিতের সন্তান—এ ঐতিহাসিক সত্যকেও ভুলে যাওয়া চলে! আর সংস্কৃতি! অন্ধের মতো চোখ বুজে না থাকলে মানতেই হবে সত্যপীরের পাঁচালী আর মানিক পীরের গানের মধ্য দিয়েও তার ব্যবধানের সীমাটাকে কোনোদিন একেবারে মুছে ফেলা যায়নি।

এমন কি, "দীন-ইলাহী"র ঐক্য মন্ত্র যিনি দিয়েছিলেন, সেই সম্রাট আকবরের সময়েও আগ্রা শহরে মস্‌জিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে সাংপ্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল—এমন কথা ইতিহাস বলে।

সুতরাং পৃথক্ জাতিতত্ত্বে আপত্তি নেই। ইস্‌লাম জাগুক। শুধু আসন্ন বন্যার ওই মেঘগুলোর মতো একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরছে। এই হঠাৎ ঘুম-ভাঙা দুর্দান্ত মানবতা যখন খাদ্য-বস্ত্র-মুক্তি—সংস্কৃতির আকুলতায় ক্ষুধার্ত গরুড়ের মতো প্রশ্ন তুলবে:—কংথাম,—তখন নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকবার জন্যে তাকে প্রতিবেশী কিরাত-পল্লী দেখিয়ে দেবেনা তো এর উদ্গাতারা? তার ক্ষুন্নিবৃত্তি পূরণ করবার মতো পর্যাপ্ত সংস্থান তাদের আছে তো?

সেইখানেই ভয়। আর সে ভয় যে একেবারে অমূলক নয়—তারও আভাস দেখা গেছে নানাভাবে। অন্যকে অবিশ্বাস করা নয়—নিজেকে বিশ্বাস করতে পারাই সব চেয়ে বড় কাজ।

হয়তো আলিমুদ্দিন মাস্টার তা পারবেন।

জয়কালী মন্দিরের বট গাছটা সাইকেলের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ দিগন্ত থেকে সামনে এগিয়ে এল।

এই জয়কালীর মন্দির থেকেই সম্ভবত জয়গড়। গড় হয়তো কোনোদিন ছিল—হয়তো 'পাল-বুরুজে'র গড়খাই এরই সীমান্ত রেখা। কিন্তু গড়ের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। গ্রামের পূব-দক্ষিণ জুড়ে ইংরেজী 'এল্' হরফের মতো অজগর জঙ্গলে ছাওয়া একটা জাঙ্গাল আছে বটে—হয়তো গড়ের প্রাচীরের ধ্বংসশেষ। জয়কালীর পুরোনো মন্দির এখন একটা মাটি ঢাকা ইঁটের পাঁজা—গ্রামের লোক কিছু খরচপত্র করে একটি ছোট মন্দির তুলে দিয়েছে এখন।

পেছনে একটা বড় বট গাছ—তার তলায় একখানা পঞ্চমুণ্ডী আসন। বাংলা দেশে 'ডায়ার্কির' যুগে যখন সারা উত্তর-বাংলা জুড়ে ভয়াবহ অরাজকতার স্রোত বয়ে গিয়েছিল—সেই সময়ে কোনো দস্যুপতি ওই আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তার পাশে একটা মজা-দীঘি'—ওর ভেতরে সন্ধান করলে নাকি এখনো একশো আটটি নরবলির কঙ্কাল-করোটি খুঁজে পাওয়া যাবে। দুর্বল স্নায়ুর মানুষ আজো নাকি রাত-বিরেতে বিভীষিকা দেখে এই পঞ্চমুণ্ডী আসনের পাশে।

নির্জন মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রঞ্জনের মনে হল, আজ আবার নতুন করে এক তন্ত্রসাধনার সূত্রপাত হয়েছে এই জয়গড়ে। এও কত নরবলি দাবী করবে কে জানে। কিন্তু এই সাধনায় শুধু একটিমাত্র মানুষ সিদ্ধিলাভ করবে না—লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তি দেবে।

গ্রামে ঢুকতে গোরুর গাড়ির লিক-আঁকা একটা মেটে রাস্তা পাওয়া গেল। সেই রাস্তা দিয়ে আর একটা বাঁক ঘুরতেই খানিকটা উঁচু ডাঙার ওপর ছোট একটি মহুয়া বন। আর এই মহুয়া বনটির পরেই নগেন ডাক্তারের বাড়ি।

বাড়ির বাইরের ঘরে ডিস্‌পেন্‌সারী। ছোট ডিস্‌পেন্‌সারী—যৎসামান্য আয়োজন। একটা বার্ণিশ-বিহীন চেয়ারে বসে এবং সাম্‌নে কাগজ-পত্র আর ডাক্তারী ব্যাগরাখা টেবিলটার ওপরে পা রেখে কী যেন পড়ছিল নগেন ডাক্তার।

বারান্দায় সাইকেল তোলার সঙ্গে বই সরাল নগেন, পা নামালো। সাদরে ডাকল, রঞ্জনদা? এসো—এসো—

রঞ্জন ঘরে ঢুকে নগেনের মুখোমুখি একটা চেয়ার নিয়ে সশব্দে বসে পড়ল।

সামনে ঝুঁকে পড়ল নগেন। অন্তরঙ্গ গলায় বললে, আমার চিঠিটা পেয়েছিলে তা হলে?

—পেয়েছি।—রঞ্জন হাসল: কিন্তু যত তাড়া আমায় দিয়েছিলে, তোমার মধ্যে সে তাড়া তো দেখছি না। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনো হচ্ছিল। কী পড়ছিলে?

নগেন হাসল লজ্জিতভাবে—গাল দুটো রাঙা হয়ে উঠল। এত ভালো কর্মী, এমন দৃঢ়ব্রত, তবু একটা অপূর্ব শান্ত কমনীয়তা আছে ওর ভেতরে। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ—তবু এখনো ছেলেমানুষি চেহারা। দেখলে মনে হয় আঠারো উনিশের বেশি বয়েস হবে না।

সলজ্জ গলায় নগেন বললে, একটা লিটারেচার পড়ছিলাম।

—কী লিটারেচার?

—আমাদের ডাক্তারীর। বিলিতী ওষুধের কোম্পানি পাঠিয়েছে।—নগেনের চোখ দুটো বিষণ্ণ হয়ে উঠল : কিন্তু এ দিয়ে আমরা কী করব? এ সব পেটেণ্ট ওষুধ প্রেস্‌ক্রীপশন করবে শহরের ডাক্তারেরা—মোটা দাম দিয়ে কিনে খাবে শহরের লোক। তা ছাড়া এদের অধিকাংশই ডাক্তারদের সর্বনাশ করছে।

রঞ্জন বললে, তোমার প্রথম কথাটা বুঝলাম, কিন্তু দ্বিতীয়টা ধোঁয়াটে রয়ে গেল। ডাক্তারদের সর্বনাশ করছে কেন?

নগেন বললে, মেডিসিন তৈরী করতে ভুলে যাচ্ছে ডাক্তাররা—এদের ওপরেই বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছে। তার ফল কী দাঁড়াচ্ছে জানো? কম্পাউণ্ডিং করে দিলে যার দাম পড়ত বারো আনা, পাঁচ টাকা দিয়ে তার পেটেণ্ট ওষুধ কিনে খেতে হচ্ছে লোককে।

রঞ্জন হাসল : পৃথিবীতে দেখছি সমস্যার আর অন্ত নেই। কিন্তু ও কথা যাক—ওসব আমার পক্ষে একেবারে অনধিকার চর্চা। এখন বলো দেখি, এমনভাবে হঠাৎ তাড়া কেন?

নগেন বললে, বলছি সব। কিন্তু এখানে নয়। চলো ভেতরে। অনেকগুলো দরকারী পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বললে, এখন দেড়টা। চারটের মধ্যে আমায় ছেড়ে দিতে হবে—মৃদু হেসে বললে, নইলে আমার চাকরী যাবে, জানো?

—যাওয়াই ভালো—নগেনও হাসল : নাও, ভেতরে চলো।

বাড়িতে মাটির দেওয়াল, টিনের চাল। তবু পাড়াগাঁয়ের নিভুঁল পরিচ্ছন্নতা ঝক ঝক করছে সব জায়গায়। উঠোনে ঢেঁকি আছে, তার পাশে লাউ মাচা। পেছনের প্রাচীর ঘিরে বড় একটা বাতাবী গাছ—অকৃপণ ফলের সমারোহ সেখানে।

নিজের শোবার ঘরে নগেন নিয়ে এল রঞ্জনকে।

আড়ম্বরহীন ঘর। একধারে ছোট একটি শেল্‌ফে খানকতক বই। শীতলপাটি বিছানো তক্তপোষের মাথার কাছে জড়ানো সতরঞ্চির বিছানা।

নগেন বললে, বোসো।

রঞ্জন বিছানায় বসল। সামনে একটা টুল টেনে নিলে নগেন।

—তারপর?

—দাঁড়াও। অনেক দূর থেকে এসেছ—একটু জল খাও আগে।

—পাগল নাকি! এই তো খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি।

—ছ' মাইল সাইকেলের ধাক্কায় সে হজম হয়ে গেছে—নগেন চীৎকার করে ডাকল : উত্তমা, উত্তমা?

—আসছি দাদা—বাড়ির কোনো এক দূরপ্রান্ত থেকে সাড়া এল।

—উত্তমা কে? তোমার বোন বুঝি?

—হাঁ।—নগেন বললে, তুমি ওকে দেখোনি আগে। মামাবাড়ি গিয়েছিল মাস তিনেক আগে—মামীমার খুব অসুখ চলছিল।—একটা প্রসন্ন স্নেহ ফুটে উঠল নগেনের মুখে : ও আমার ডান হাত। সব কাজ-কর্ম করে দেয়। মোটামুটি খানিক কম্পাউণ্ডারী শিখিয়ে নিয়েছি, দরকার হলে ওষুধ-পত্র করে দেয়। ও না থাকায় খুব অসুবিধে হচ্ছিল।

—বিনা পয়সায় বেশ কম্পাউণ্ডার পেয়েছ তো।

—তা পেয়েছি।—নগেন হাসল : কিন্তু ওই কম্পাউণ্ডারটির জ্বালায় আমার ডাক্তারখানা চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্‌সারী হয়ে উঠেছে।

—কেন ডাকছিলে দাদা?

দোরগোড়ায় উত্তমাকে দেখতে পাওয়া গেল।

—কে এসেছে, চিনিস একে?

—বুঝেছি, রঞ্জনদা।—উত্তমা হাসল, এগিয়ে এসে প্রণাম করল রঞ্জনকে।

—আরে ছিঃ ছিঃ—থাক থাক—সসঙ্কোচে পা সরিয়ে নিলে রঞ্জন।

—অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? প্রণামটা পাওনা জিনিস—আদায় করে নিতে লজ্জা নেই।

উত্তমা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। প্রচুর স্বাস্থ্য আর অপরিমিত প্রাণ থাকলে যে হাসি আলোর মতো নির্ঝরিত হয়ে পড়ে—সেই হাসি। রঞ্জন ভালো করে তাকিয়ে দেখল উত্তমাকে।

শ্যামবর্ণের ছোট-খাটো একটি মেয়ে। রূপের

ব্যাকরণে সুশ্রী বলতে বাধে। পরণে আধ-ময়লা ডুরে-শাড়ী। মেধাবী পুরুষের মতো চওড়া কপাল—গ্রাম-বৃদ্ধারা হয়তো সংজ্ঞা দেবেন 'উঁচ কপালী' বলে। সেই কপালের ওপর এক গুচ্ছ অলকের নিচে স্বেদবিন্দু চিকমিক করছে। অটুট স্বাস্থ্যে গড়া শরীর। আর সব চাইতে আগেই চোখে পড়ল পরিপুষ্ট নিটোল দুখানি হাত। আঙুলগুলি কঠিন—মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা। চম্পক-কলির ব্যঞ্জনা কোথাও নেই—পরিশ্রমের নির্ভুল চিহ্ন। হাতে চারগাছা করে কাঁচের চুড়ি—তাদের ওপর মাটির একটা হাল্‌কা আস্তরণ পড়েছে।

—কী করছিলি রে?

—বাগানে মাটি কোপাচ্ছিলাম।

—বেশ করছিলি। তা মাটি কোপানো এখন থাক। রঞ্জনদার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আয়।

—না—না, কিছু দরকার নেই—সন্ত্রস্তভাবে রঞ্জন জবাব দিলে।

—গুরুপাক কিছু নয়, সামান্য কিছু গাছের ফল।—নগেন হাসল, তা ছাড়া আমি ডাক্তার—আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো। যা—যা—দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

উত্তমা বেরিয়ে গেল।

কথা আরম্ভ করার আগে চিন্তাটাকে যেন গুছিয়ে নেবার জন্যে একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো নগেন। জানালার ওপারে মহুয়া বন—তার পেছনে টাঙ্গন নদীর খাড়া পাড়ি। অন্তর্মুখী চোখটাকে সেদিকে রেখে নগেন বললে, তুরী-পাড়ার পঞ্চায়েতে আমি থাকতে পারিনি। তুমি যখন গিয়েছিলে, তখন ওতেই কাজ হয়েছে। কেমন মনে হল?

—চমৎকার। একেবারে বারুদের মতো তৈরী। আগুন ধরিয়ে দিলেই হয়।

—হ্যাঁ—ওরা বেশ গড়ে উঠেছে। ভালো লড়াই করতে পারবে—কচি কচি মহুয়া পাতাগুলোর দিকে চোখ রেখে নগেন বললে, এত বয়েস হয়েছে, তবু সোনাই মণ্ডলের কী রকম জোর দেখেছ?

—তাই দেখলাম।—উৎসাহিত হয়ে উঠল রঞ্জনের স্বর: ওরা তো চাষী। ওদের কাছ থেকে এতখানি আশা আমাদের ছিল না।

—চাষী আর কোথায় দেখছ!—নগেন এবার চোখ ফিরিয়ে এনে সোজা রঞ্জনের দিকে তাকালো: ওদের দেনার অবস্থা জানো? বেশির ভাগেরই এখন ক্ষেত-মজুরের দশা—লাভের মোটা টাকাটা সোজা চলে যায় মহাজনের হাঙর-পেটে। যাও সামান্য কিছু হত—ডাঁড়ার বানে একেবারে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। এবার ডাঁড়ায় বাঁধ না দিলে ওদের আর বাঁচবার জো নেই।

—কিন্তু ডাঁড়ায় বাঁধ দিলে কী হবে বাড়তি জলটার? ওদিকে বান ডাকবে না তো?

—না, না, সে সব ভয় কিছু নেই। ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করলে দক্ষিণের ঢালু মাঠটা দিয়ে জল চলে যাবে। ও তো মরা মাঠ—এমনিতেই বর্ষায় সায়র হয়ে যায়···হাত-খানেক করে জল বাড়বে এই যা। আসলে ক্ষতি শুধু ভৈরবনারায়ণের, জলকর দুটোয় একটু অসুবিধে হবে। কিন্তু কয়েকশো টাকার জলকর বাড়াতে গিয়ে দু হাজার বিঘে জমির ধান এমনভাবে বরবাদ হবে নাকি?

—না, এবার আর তা ওরা হতে দেবে না। কালা পুখ্‌রিতে আগুন জ্বলবে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। নগেন বললে, রঞ্জনদা তোমার কাছ থেকে আসল পরামর্শটাই বাকী। যত দূর মনে হচ্ছে—শুধু তুরীদের একার লড়াইতেই হবে না। এ অঞ্চলের সমস্ত মানুষ-গুলোকে নিয়ে একটা 'কমন্ ফ্রন্ট' তৈরী করতে হবে।

—আহীররা?

—নিশ্চয়। ওরা তো আগুনের মতো গরম হয়ে আছে। হাতের লাঠি ওদের তৈরী! তা ছাড়া জটাধর সিংয়ের খুনের পর পুলিশ এসে ওদের জন-পাঁচেককে ধরে নিয়ে গেছে। শোননি বুঝি?

—না তো!

উদ্দীপ্ত মুখে নগেন বললে, কাল আমি ওদের ওখানে গিয়েছিলাম। এতদিন আমাদের কৃষাণ-সমিতির কথা বলেছি—কিন্তু আমল পাইনি। এবার দেখলাম—আর ভাবনা নেই। একদম তৈরী। এ লড়াইয়ে ওরাই হবে ভ্যানগার্ড। তুরীদের লড়াইয়ের কথা ওদের বলেছি।

—তার পর?

—যা ক্ষেপে আছে, একটা সুযোগ পেলেই হল।

—যাক, এটা একটা সুখবর।

নগেনের চোখ জলতে লাগল : টিলার সাঁওতালদেরও পাওয়া যাবে।

—ওরা তো ফতে শা পাঠানের প্রজা।

—তাতে আটকাবে না। সব জমিদারই ওদের পক্ষে সমান। যদি আমরা ভালো করে অর্গানাইজ্ করতে পারি, তা হলে সমস্ত এরিয়ার মানুষগুলোকে এই লড়াইয়ে টেনে আনতে পারব—নগেনের গলার স্বর একটা আগামী প্রত্যাশায় উঁচু পর্দায় চড়তে লাগল আস্তে আস্তে : ওই সাঁওতালদের ওপর তোমার হাত আছে—ওদের টেনে নামাতে হবে তোমাকে।

—দেখি চেষ্টা করে—রঞ্জন হাসল : কিন্তু তোমাদের জ্বালায় কুমার বাহাদুরের ওখানে আমার অমন ভালো চাকরীটা চলে যাবে দেখছি। কোনো ঝামেলা ছিলনা—শুধু নির্বিঘ্ন গীতাপাঠ। ভবিষ্যতেরও আশা ছিল—হয়তো একটা ব্রহ্মোত্তরও মিলে যেত এক সময়ে।

নগেনও হাসল : আখেরের ভাবনা ভাবতে হবে না। তোমার নাম আমাদের বইতে টোকা আছে। দুনিয়া যখন পাল্টাবে—যখন নতুন করে মাটির বিলি-ব্যবস্থা হবে, সেদিন তুমিও ফাঁক পড়বে না। তবে তার আগে এ অসুবিধেটুকু ভোগ করতেই হবে।

—তার মানে এটা ইন্‌ভেস্টমেণ্ট ?

—তাই—নগেন হেসে উঠল সশব্দে।

উত্তমা প্রবেশ করল। শাড়ীটা বদলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে—ধুয়ে মুছে এসেছে শরীর থেকে মাটি কোপানোর চিহ্ন। গাছ-কোমর বাঁধা আঁচলটিকে বিন্যস্ত করে নিয়েছে শোভন কমনীয়তায়। একহাতে ঝকঝকে পেতলের থালায় সযত্নে কাটা বাতাবী লেবু, কয়েক টুকরো পেঁপে, দুটি কলা আর কিছু নারকেলের নাড়ু, আর এক হাতে কাচের গ্লাসে জল। সব মিলিয়ে যেন অপূর্ব একটি রূপান্তর হয়েছে উত্তমার। একটু আগেকার কঠিনবাহু সেই কর্মী মেয়েটি নয়—চির-পরিচিত একটি বাংলার নন্দিনী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নগেন উঠে আর একটা টুল টেনে দিলে। তার ওপর থালা গ্লাস নামিয়ে রাখল উত্তমা।

—এত কী হবে ?

—খাবেন।—উত্তমা হাসল।

—সব ?

—সব।

—কিন্তু আমি তো একটু আগেই খেয়ে এসেছি।

নগেন বললে, রঞ্জনদা, বিনয় বন্ধ করো। খাওয়াটা শেষ করে নাও—অনেক দরকারী কাজ আছে।

রঞ্জন বললে, আচ্ছা লোক তো দেখছি। এমনি তোমার বুঝি অতিথিকে অভ্যর্থনা করে ?

—অতিথি হলে তো অভ্যর্থনা করব।—নগেন বললে, নাও, নাও। রাজবাড়ির রাজভোগের ব্যবস্থা অবশ্য এখানে নেই। কিন্তু টাট্‌কা গাছের ফল, আর ঘরের নাড়ু—সম্পূর্ণ হাইজিনিক্।

অগত্যা আহারে মন দিতেই হল।

—মা কইরে উত্তমা ?

জ্যাঠামশাইয়ের ওখানে গেছেন। ফিরতে দেরী হবে।

—আমি পছন্দ করি না—মেঘের মতো মুখ করে নগেন বললে।

উত্তমা বললে, মা বলেন, সামাজিকতা রাখতে হবে।

—না রাখাটাই নিরাপদ—নগেনের মুখ আরো কালো হয়ে উঠল।

উত্তমা জবাব দিল না, দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে।

—নীরবে খাওয়া শেষ করল রঞ্জন। ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইল নগেন, আর জানালা দিয়ে বাইরের মহুয়া বন আর টাঙ্গন নদীর উঁচু পাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল উত্তমা।

—আর দেব ?—খানিক পরে মৃদু গলায় উত্তমা জিজ্ঞাসা করল।

—সর্বনাশ—এই ম্যানেজ করতে প্রাণান্ত ! নিতান্তই নগেনের ভয়ে এতগুলো খেতে হল।

থালা আর গ্লাশটা হাতে তুলে নিলে উত্তমা।

বেরিয়ে যাওয়ার মুখে নগেন পিছু ডাকল।

—হাঁ রে, পোস্টারগুলো লেখা হয়ে গেছে ?

—[illegible] বাকী।

—দুপুরেই শেষ করে দিবি—সন্ধ্যের আগে আমার চাই।

—আচ্ছা—উত্তমা বেরিয়ে গেল।

—কিসের পোস্টার?—রুমালে মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল রঞ্জন।

—আমাদের কৃষক সমিতির ঘোষণা। আগামী লড়াইয়ের প্রস্তুতি।—নগেন একটু হাসল: আর এ গ্রামে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, কে জানো? আমার জ্যাঠামশাই।

—ও?—রঞ্জন তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখে। খানিকটা বোধগম্য হচ্ছে—উত্তমা আর নগেনের ব্যক্তিগত আলোচনার তাৎপর্যটা।

—বড় জোতদার। অনেক হাল আর বিস্তর কৃষাণ। তিনি আমাদের সমিতিকে ভাঙবার জন্যে তলে তলে মতলব আঁটছেন। এখনো সুবিধে করতে পারেননি—তবে সময় হলেই ঘা দেবেন। যাক, সে কথা। এবার তোমায় একটু উঠতে হবে রঞ্জনদা।

—আবার কোথায়?

—যেতে হবে আমাদের কিষাণ সমিতিতে। যে প্ল্যান প্রোগ্রাম হচ্ছে, সে সম্বন্ধে ওরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবে একটু।

—আচ্ছা চলো—হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বললে, ঘণ্টাখানেক সময় আছে এখনো।

আগেই খবর পেয়ে কুড়ি পঁচিশজন এসে অপেক্ষা করছিল কৃষাণ সমিতিতে।

বড় একখানা ঘর। ওপরে খড়ের চালা—নিচে চাটাই। মাটির দেওয়ালে কিছু পোস্টার—কিছু ছবি। কাস্তে হাতুড়ীর ওপর জ্বলজ্বলে একটা লাল তারা—ওদের পথের নির্দেশ।

অফিস-সেক্রেটারী মনোহর জানাল, এদিকে ব্যবস্থা আমরা করে এনেছি। অন্তত দুশো লোক নিয়ে যেতে পারব।

—আহীররা আসবে, সাঁওতালদের ভারও নিয়েছেন রঞ্জনদা।—নগেন বললে, এই আমাদের প্রথম লড়াই। মনে রাখবেন এই আমার শক্তি পরীক্ষা। এখানে যদি আমরা জিততে পারি—তাহলে আমাদের পথ কেউ রুখতে পারবে না।

বিপ্লবের জয়ধ্বনিতে ঘরখানা কেঁপে উঠল।

ফেরবার পথে বিকেলের আলোয় বহুদূর থেকে ভৈরব-নারায়ণের প্রাসাদটা যেন আজ আবার নতুন করে চোখে পড়ল। চোখে পড়ল, বাড়িটার মাথার ওপর একপাল শকুন উড়ছে—যেন আসন্ন অপমৃত্যুর আঘ্রাণ পেয়েছে ওরা। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমি
তোমারেই ভালবেসে যাই—
হাসির মতন বাঁশীর মতন
তিমির অন্ধ নাশীর মতন,
শিখার মতন জ্যোতির মতন
প্রেমের মতন ভেসে যাই।
আসে
প্রাণের সাগরে আলোর উৎস নামি'
মোর
মুগ্ধ হিয়ায় অলকনন্দা কামী—!
শুনি'
আরতি-মন্ত্র ভাস্বর তোরণে
তন্দ্রার মত আধো-জাগরণে
চেতনার শত কনক-কিরণে
শরণ-শান্ত দেশে যাই॥
তুমি
শুভ্র দীপ্ত স্নিগ্ধ বহ্নি ভরা,
আমি
যুগে যুগে চাই, তোমারে যায়না ধরা—
এলে
শয়নে স্বপনে অসীমের নীলে,
হে চিরবন্ধু, মরমে-নিখিলে,—
সুপ্তি-ছন্দ হ'তে যেন ভেসে
মুক্তি-ছন্দে এসে যাই।

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ—

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুত কানাইয়ালাল মুন্সীর আবেদন মত গত ১লা জুলাই হইতে ৭ই জুলাই ভারতের সর্ব্বত্র বন-মহোৎসব ও বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করা হইয়াছে। নানা কারণ এদেশে গাছের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে—কেহ বৃক্ষরোপণ করে না। তাহার ফলে অনাবৃষ্টি, জমির উর্ব্বরতা ক্ষয় প্রভৃতি নানা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আমেরিকাতে এই অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় ১৮৭২ সাল হইতে বৎসরে একদিন সর্ব্বত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে বৃক্ষরোপণ উৎসব করা হইতেছে। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তার কথা ঐ দিন সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে বাঙ্গালা দেশের রাষ্ট্রপাল ডাঃ কাটজু কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বারাকপুর গান্ধীঘাটে, মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর ইডেন গার্ডেনে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন। অন্যান্য সকল মন্ত্রীও নানাস্থানে বৃক্ষরোপণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহারা বৃক্ষরোপণ করিয়া বেড়াইবেন—ইহার কোন মূল্য না থাকিতে পারে—কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই যে নিজ নিজ এলাকায় এ সময়ে বৃক্ষরোপণ করা উচিত—এই উৎসবের দ্বারা তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কৃষি বিভাগ ও বন বিভাগ হইতে এ জন্য কয়েক লক্ষ গাছ বিতরণ করা হইয়াছে—সে সকল গাছ হইতে জ্বালানি কাঠ ও ব্যবহারযোগ্য কাঠ পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া অল্পমূল্যে আম ও লিচুর গাছও সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে বিতরণ করা হইয়াছে। ফলের গাছের সংখ্যা দেশে খুবই কমিয়া গিয়াছে—সে জন্য খাদ্যাভাব উপস্থিত। আমরা বার বার বলিয়াছি, আম, লিচু, কাঁঠাল, নারিকেল, জামরুল, জাম, পেয়ারা, কলা, পেঁপে প্রভৃতির গাছ যদি প্রচুর পরিমাণে করা হয়, তবে ঐ সকল গাছের ফল খাইয়াও মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে। আজ বৃক্ষরোপণ উৎসব সেই কথাই সকলকে বলিয়া দিতেছে। এ বিষয় এই উৎসব উপলক্ষে বহু বক্তৃতাদান, প্রবন্ধ রচনা, পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতি হইয়াছে—জনগণের মধ্যে সেগুলি প্রচারিত হওয়ায় লোকে কর্ত্তব্যে অবহিত হইবে বলিয়া মনে হয়। জ্বালানি কাঠের জন্য গাছের চাষ করিলে কয়লার অভাব কমিয়া যাইবে—এমন কি কয়লার মূল্যও হ্রাস পাইবে। আমরা জ্বালানি হিসাবে গোময় ব্যবহার করি; কিন্তু গোময় একটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সার—জমীতে গোময়-সার প্রদান করিলে তাহার উর্ব্বরা শক্তি বহু গুণ বর্দ্ধিত হয়। গোময় জ্বালানি রূপে যাহাতে ব্যবহৃত না হয়, সে জন্য জনগণের পক্ষ হইতে চেষ্টা হওয়া উচিত। গোময়ের পরিবর্ত্তে কাঠ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। অনেক দেশে মানুষের বিষ্ঠাও জমীর সাররূপে ব্যবহৃত হয়—সে সকল স্থানে বিষ্ঠা সংগ্রহ ও তাহা কাজে লাগাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও তাহার চেষ্টা হওয়া উচিত। পশ্চিম বঙ্গের কৃষিবিভাগ এই উৎসব মাত্র ৭ দিনে শেষ না করিয়া ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত অর্থাৎ দেড়মাস কাল যাহাতে চলে, সে জন্য জনগণকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ফলবান বৃক্ষ সংগ্রহ করা সকল সময়ে সহজ নহে—সে জন্য সময় বৃদ্ধির ফলে লোক বৃক্ষ সংগ্রহের সময় ও সুবিধা পাইবে। জ্বালানি কাঠের গাছ বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায় বলিয়া সরকার হইতে তাহার কয়েক লক্ষ চারা বিতরণ করা হইয়াছে—কিন্তু ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিলে কাঠ ও ফল দুইই পাওয়া যাইবে। সে জন্য সে বিষয়ই লোকের অধিক উৎসাহ থাকা প্রয়োজন। দেশবাসী জনগণ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে বিমুখ হওয়ার ফলেই আজ দেশে খাদ্যাভাব এত অধিক দেখা দিয়াছে। এই উৎসব যদি দেশবাসীকে অন্ততঃ তাহাদের কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করে তবেই ইহা সার্থক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আমরা প্রত্যেক দেশবাসীকে বিষয়টি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান জানাইতেছি।

সিঙ্গাপুরের গভর্ণরের আহ্বানে এক ভোজসভায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

'স্বদেশী' প্রচার—

উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া দেশীয় শিল্পসমূহের উন্নতি বিধানের জন্য বহুবিধ চেষ্টায় অবহিত হইয়াছেন। তিনি উৎসাহী কর্ম্মী—তাহার পরিচয় উড়িষ্যায় তিনি দিয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া বণিক সভাসমূহের এক সম্মিলনে তিনি সকলকে আবার স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। বিদেশী শাসনের আমলে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের কথা প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। এখন আর সে অবস্থা নাই। অথচ বাজারে আমরা দেখিতে পাই—বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতার ফলে বহু প্রকারে স্বদেশী শিল্প নষ্ট প্রায় হইতেছে। এ অবস্থায় দেশে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুধু লোককে স্বদেশী ব্যবহার করিতে বলিলেই সরবরাহ সচিবের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না—উপযুক্ত রক্ষা-শুল্কের ব্যবস্থা করিয়া স্বদেশী শিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বিদেশী দ্রব্য আমদানীর সুবিধা বন্ধ করিতে হইবে। দেশে বহু শিল্প-কারখানা নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু বিদেশী লোকের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী মাল বিক্রয় কম হওয়ায় ঐ সকল কারখানা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এনামেল, কাঁচ, পোর্সিলেন বা মাটীর বাসন প্রভৃতির কথা সহজেই বলা যাইতে পারে। ঐ সকল জিনিষের বহু কারখানা প্রায় অচল হইয়াছে। শ্রীযুত মহাতাব যদি এ সকল বিষয়ে উপযুক্ত অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন, তবে শুধু কারখানার মালিকগণ লাভবান হইবেন না, হাজার হাজার বেকার কর্ম্মীরও কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। তিনি যে স্বাধীন দেশের লোককে আবার 'স্বদেশী'র কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি ও আশা করি, তিনি এ বিষয়ে যথা আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর মঙ্গলসাধন করিবেন।

খাদ্য সমস্যা—

গত ২৪শে জুন এক বেতার বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন খাদ্য-সমস্যার কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এদেশে যে চাল উৎপন্ন হয়, তাহাতে মাথা পিছু রোজ মাত্র দেড় পোয়া চাল বরাদ্দ করা যায় আর যে গম উৎপন্ন হয়, তাহাতে বছরে মাথা পিছু মাত্র এক সের গম পড়ে; সেজন্য বিদেশ হইতে প্রচুর চাল

ও গম আমদানী করা প্রয়োজন হয়। ডাল, সরিষা, আখ ও আলুর চাষ এদেশে বৃদ্ধি না করিলে ঐ সকল জিনিষের মূল্য কোন দিন কমিবে না—বিদেশ হইতে আমদানীর ফলে ঐ সকল জিনিষের দাম অত্যন্ত বেশী দিতে হয়—অথচ এদেশের লোক একটু চেষ্টা করিলে বেশী পরিমাণ আখ, আলু, ডাল ও সরিষা উৎপন্ন করিতে পারে। মাছ, মাংস ও ডিমের অভাব পশ্চিম বাংলায় সর্বাপেক্ষা বেশী—অথচ ঐ সকল জিনিষ উৎপাদনে কাহারও কোন চেষ্টা দেখা যায় না। দুধ, ঘৃত ও মাখনের কথা না বলিলেই হয়। এদেশে গো-পালন প্রায় বন্ধ হইয়াছে। কাজেই দুধ, ঘি বা মাখন পাইবার কোন উপায় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যবসা হিসাবে তাঁহাদের গো-পালন ব্যবস্থা কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহা এখনও বলা চলে না। খাদ্য মন্ত্রী মহাশয় খাদ্য-উৎপাদন বাড়াইবার জন্য যে সকল দেশবাসীকে উৎসাহিত করিতেছেন, ইহাই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। অন্যান্য ব্যবসায়ের মত কৃষিকার্য্যকেও যাহাতে ধনীরা ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেন, সেজন্য ধনীদের বাধ্য করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারখানার মালিকগণ যদি কারখানার শ্রমিকদের জন্য তরিতরকারী, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি প্রভৃতি উৎপন্ন করিতে বাধ্য হন, সেজন্য তাঁহাদের উপর চাপ দেওয়া প্রয়োজন। দরিদ্র কৃষকদিগকে অর্থাভাবে কৃষিকার্য্যে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, ধনীরা কৃষিকার্য্য ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করিলে আর সে অসুবিধা থাকিবে না। উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা সুন্দরবন অঞ্চলে গো-সাবায় পরলোকগত সার ডমিয়েনল হ্যামিল্টনের চেষ্টায় লক্ষ্য করিয়াছি। প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঐ ভাবে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে আজ অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আসিয়াছে।

বাঙ্গালার দৈবদুর্ব্বিপাক—

গত জুন মাসের প্রথম ভাগে ১১ই হইতে কয়েকদিন পশ্চিম বাংলায় অতিবৃষ্টির ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। দার্জ্জিলিং জেলায় যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। দার্জ্জিলিং সহরে এবং জেলার নানাস্থানে শত শত বাসগৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় কত লোক যে মারা গিয়াছে, এখনও তাহার সংখ্যা জানা যায় নাই। দার্জ্জিলিং যাইবার রেলপথও এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে তাহা মেরামতে কোটিরও অধিক টাকা ব্যয়িত হইবে এবং তাহা সত্বেও পথগুলি পূর্ব্বের মত কাজের হইবে না। ঐ অঞ্চলের সকল খাদ্যশস্যও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দার্জ্জিলিং অঞ্চল হইতে প্রত্যহ কয়েক শত মন কাঁচা তরকারী কলিকাতায় আসিত, তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে উড়োজাহাজ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে খাদ্যপ্রেরণের সুবিধা নাই—কাজেই স্থানীয় অধিবাসীরা দারুণ খাদ্যাভাব ভোগ করিতেছে। বাসস্থানের অভাবে লোক দলে দলে পদব্রজে দার্জ্জিলিং ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। নূতন যে আসাম-লিঙ্ক রেল তৈয়ারী হইয়াছিল বন্যা ও অতিবৃষ্টির ফলে সে পথেরও বহু অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহা মেরামত করিতে কয়েক মাস সময় লাগিবে। জলপাইগুড়ী জেলার বহু অংশ, বিশেষ করিয়া জলপাইগুড়ী সহর বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেখানেও বহু লোক মারা গিয়াছে ও বহু দরিদ্র ব্যক্তির বাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেখানকার ক্ষতির পরিমাণও কয়েক লক্ষ টাকা হইবে। জলপাইগুড়ীতেও সেজন্য দারুণ খাদ্যাভাব উপস্থিত হইয়াছে। ১৪ মাইল পদব্রজে আসিয়া হলদীবাড়ী ষ্টেশনে রেল ধরিয়া লোক দলে দলে পাকিস্তানের মধ্য দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিতেছে। গৃহ সমস্যা ও খাদ্যসমস্যা জলপাইগুড়ী কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে বিব্রত করিয়াছে। ঠিক ঐ সময়ে নিম্নবঙ্গেও অতিবৃষ্টির ফলে বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার বহু স্থান বিপন্ন হইয়াছে। বর্দ্ধমানে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া কয়েকটি স্থান জলমগ্ন হইয়াছে। বীরভূমে ময়ুরাক্ষীতে প্লাবনের ফলে নূতন যে সেচব্যবস্থা নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমাতেও জলপ্লাবনে কয়েক শত গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাংলা শুধু রাজনীতিক কারণে বিপন্ন নহে, দৈবদুর্বিপাকেও আজ তাহার দুঃখ দুর্দ্দশা চরমে উপস্থিত হইয়াছে। এ সকল বিপদের উপর কাহারও হাত নাই—তথাপি বিপন্ন ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া আমরাও আজ নিজেদের বিপন্ন বোধ করিতেছি।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের সফর—

বাস্তুহারাদের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য ও তাঁহাদের দুরবস্থার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ১ মাসেরও অধিক কাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কয়দিন ধরিয়া নদীয়া জেলা ও মুর্শিদাবাদ জেলার পাকিস্তানী সীমান্তগুলি দেখিয়া বেড়াইয়াছেন। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ সীমান্তে পাকিস্তান হইতে বহু হিন্দু আসিয়া বসবাস করিতেছেন। উভয় জেলায় সীমান্তেই বহু মুসলমান বাস করিত—তাহার মধ্যে অনেকে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে ও এক অংশ উভয় রাষ্ট্রেই গৃহ রক্ষা করিতেছে। ঐ সকল মুসলমান উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াত করার ফলে ঐ সকল অঞ্চলে কালোবাজার জোর চলিতেছে—তাহারা পাকিস্তানের মাল আনিয়া হিন্দুস্থানে বিক্রয় করে ও হিন্দুস্থানের মাল লইয়া গিয়া পাকিস্তানে বিক্রয় করে। হিন্দুস্থান রাষ্ট্র সে জন্য কোন শুল্ক চায় না। তাহা ছাড়া ঐ সকল লোকের সাহায্যে পাকিস্তানের আন্সারগণ মধ্যে মধ্যে হিন্দুস্থানের গ্রাম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া থাকে। ঐ সকল সামান্ত রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। কয়েক মাইল অন্তর সীমান্তে একটি করিয়া পুলিশ থানা আছে—সেখানেও অতি অল্প সংখ্যক লোক বাস করে। শ্যামাপ্রসাদ বাবু নিজে ঐ সকল দুর্গম স্থানে যাইয়া প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন—আমরা আশা করি, ইহার ফলে ঐ অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান হইবে। শ্যামাপ্রসাদ বাবু আসামেও বহু স্থান দেখিয়া আসিয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে কতিপয় আসামবাসী হিন্দু আসাম হইতে বাঙালী বিতাড়নের জন্য মুসলমানগণের সহিত একযোগে কাজ করিতেছে। পাকিস্তান হইতে বহু হিন্দু ও মুসলমান

শিলংএ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—বামে, আসামের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীরোহিণী চৌধুরী

ফটো—শ্রীপান্না সেন

গৌহাটী সারকিট হাউসে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আসামের প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ

ফটো—শ্রীপান্না সেন

আসামে গমন করিয়াছে—তথায় মুসলমানগণকে যে ভাবে বসবাসের সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, হিন্দুদের তাহা করা হয় নাই। আসামে এখনও বাঙ্গালী হিন্দুদের তাড়াইবার জন্য অসমিয়া হিন্দুরা ও আসাম রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। অথচ আসামে চেষ্টা করা হইয়াছে। আসাম কর্ত্তৃপক্ষ যে ভাবে চলিতেছেন, তাহাতে আসামে শীঘ্রই মুসলমান অধিবাসীরা সংখ্যাধিক সম্প্রদায় হইবে ও তাহার ফলে আসাম পাকিস্তান বলিয়া গণ্য হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের এ কথা বুঝিবার বুদ্ধি বা শিক্ষা নাই দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। যাহা

ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে সাগরপাড়া গ্রামে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ—এখানে তিনি বাস্তুহারাদের একটি শিবির উদ্বোধন করেন

ফটো—শ্রীপান্না সেন

বহরমপুর হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে এক গ্রামে কতিপয় নমঃশূদ্রের সহিত কথোপকথনরত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ফটো—শ্রীপান্না সেন

হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা কম নহে। আসামের একদল হিন্দু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তিনি যে সকল সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন, সেখানে গোলমাল করিয়া সভা পণ্ডের হউক, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে বিপন্ন বাঙ্গালী হিন্দুদের রক্ষা করার ব্যবস্থার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি চিরদিন বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন।

লালবাগ—মুর্শিদাবাদের অধিবাসীগণ কর্তৃক ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন—মাইকের সম্মুখে বক্তৃতারত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ

ফটো—শ্রীপান্না সেন

বিশ্বশান্তির উপায়—

গত ১৯শে জুন লেকসেসস্থিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রেডিও হইতে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী পণ্ডিত ডক্টর আইনষ্টাইন ঘোষণা করিয়াছেন—"মহাত্মা গান্ধীর পথই হইল শান্তির পথ—যাহাকে অন্যায় ও পাপ বলিয়া জানি, তাহার সহিত অসহযোগই হইল সেই পথ। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চালাইলে যুদ্ধ বাড়িবে—যুদ্ধ বন্ধ করার পথ তাহা নহে। সমসাময়িক রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা ও মতই হইল সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ। আমাদের সকল প্রচেষ্টা তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া করিতে হইবে।" বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিবে কে? মানুষ নিজেই তাহার ধ্বংস চাহে—তাই সকলেই ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

প্রথম সাধারণ নির্বাচন—

আগামী প্রথম নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ হইতে কেন্দ্রীয় লোক পরিষদের কতজন সদস্য নির্বাচন করা হইবে সম্প্রতি তাহা স্থির হইয়াছে। মোট ৩৪জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন—তাহারা এইভাবে স্থান পাইবেন—কলিকাতা ও সহরতলী—৪, মেদিনীপুর—৫, ২৪পরগণা—৫, বর্দ্ধমান—৩, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ প্রতি জেলায়—২, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ—প্রতি জেলায়—১জন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইবে উহার ৭ গুণ অর্থাৎ ২৩৮ জন। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ১ কোটি ২১ লক্ষ ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকার জনসংখ্যা ২৬ লক্ষ—এই হিসাব ধরিয়া ঐ প্রকার প্রতিনিধি নির্বাচন স্থির হইয়াছে। এ বিষয়ে দেশে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন এবং কোন স্থান যাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণে বঞ্চিত না থাকে, তাহার জন্য চেষ্টা প্রয়োজন। নির্বাচন-কেন্দ্রের উপর প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব নির্ভর করে।

রেশম শিল্প রক্ষা—

গত ২৮শে জুন কলিকাতায় কেন্দ্রিয় রেশম বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিতে আসিয়া শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব বলিয়াছেন, "অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় রেশম শিল্প অন্যান্য দেশের রেশম শিল্পের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে। এই বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায় আমাদের দেশে কাঁচা রেশম উৎপন্ন করা।" গত বৎসর ৩৬ লক্ষ টাকার কাঁচা রেশম বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করা হইয়াছে। এ বৎসর আরও অধিক টাকার রেশম বিদেশ হইতে আসিতেছে। সেজন্য শ্রীযুত মহাতাব দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া কাঁচা রেশম যাহাতে বেশী

উৎপন্ন হয়, সেজন্য চাষীদিগকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদের রেশম উৎপাদন কেন্দ্রগুলিও দেখিয়া আসিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস কেন্দ্রিয় সরকারের সাহায্যের ফলে দেশের লোক কাঁচা রেশম অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া বিদেশীর প্রতিযোগিতার হাত হইতে রেশম শিল্পকে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

আচার্য্যপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নিমতলা শ্মশানঘাটে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক কর্ত্তৃক আচার্য্যের সমাধিক্ষেত্রে মাল্যদান

ফটো—শ্রীপান্না সেন

কলিকাতায় পণ্ডিত নেহরু—

দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ শেষ করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত ২৫শে জুন ২ দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বাংলার সকল শ্রেণীর নেতাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া বাঙ্গালার প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা তিনি বুঝিয়াও কিন্তু বুঝেন না—বাস্তহারাদের দুঃখের কথা শুনিয়াও শুনেন না। এখনও কেন যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যহ কয়েক হাজার করিয়া হিন্দু দেশত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে, পণ্ডিতজী তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকারের কি কোন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? লিয়াকৎ-নেহরু চুক্তি কি ভাবে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে পালিত হইতেছে, তাহা বাঙ্গালা দেশের সংবাদপত্র সমূহে নিত্য প্রকাশিত হইতেছে। তাহা সত্বেও যদি পণ্ডিতজী চক্ষু বুজিয়া বলেন—পাকিস্তানে চুক্তি ঠিক ভাবেই পালিত হইতেছে, তবে এ বিষয়ে আমাদের আর কি বলিবার থাকিতে পারে? শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস নূতন মন্ত্রিত্ব লাভ করিবার পর চাকরীর মোহে কি সত্য যাহা দেখিতেছেন, তাহা প্রকাশ করার সাহস করেন না? ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রি-সভাও কি এসকল বিষয় পণ্ডিত নেহরুকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেন নাই? বাঙ্গালার এই দুর্গতির দিনে কে বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবে কে জানে?

কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন—

গত দুই মাসে ভারতের সর্ব্বত্র স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কেন্দ্র হিসাবে গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ সমূহের সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস সদস্যগণ শুধু এই নির্ব্বাচনে ভোট দিয়াছেন। এবার কংগ্রেস-সদস্য সংগ্রহের সময় বহুলোক কংগ্রেসের প্রতি বিরক্তি বশতঃ কংগ্রেসের সদস্য হন নাই। কাজেই এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারটিতে প্রকৃত প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন নাই। একদল ক্ষমতা-লেভী লোক নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে কংগ্রেস-সদস্য সংগ্রহ করিয়াছিল এবং তাহারাই পঞ্চায়েৎ দ্বার নির্ব্বাচনে নিজের দলের লোকদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়াছে। পাছে ভোট-যুদ্ধ হইলে দলীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়। সে জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধে নির্ব্বাচন শেষ করা হইয়াছে। গ্রাম-পঞ্চায়েৎসমূহের উপর ভবিষ্যতে বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার প্রদান করা হইবে—কাজেই তাহাদের নির্ব্বাচন ব্যাপারটি এইভাবে উপেক্ষা ও অবহেলা করার ফলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। অনেক স্থানে বহু অযোগ্য ও স্বার্থান্ধ লোক নির্ব্বাচিত হওয়ায় দেশের জনগণের মধ্যে ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। নির্ব্বাচন ব্যাপারে যেখানে দলীয় স্বার্থ রক্ষায় বাধা পড়িয়াছে, সেখানে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করায় বহু অপ্রিয় সত্য কথা প্রকাশ পাইয়াছে। একদল নেতা স্বার্থ কায়েমী রাখার জন্য যে সকল দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হওয়ায় দেশবাসী জনগণ কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার ফলে দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা যে আরও বাড়িয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। যে কংগ্রেস এক সময়ে

ত্যাগ ও সেবার প্রতীক ছিল, আজ যদি তাহা স্বার্থান্বেষীর ও দুর্নীতি পরায়ণের সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তবে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? কংগ্রেস নির্ব্বাচনের পর উর্দ্ধতন প্রতিষ্ঠানগুলির নির্ব্বাচনের সময় যাহাতে এই দুর্নীতি পুনরায় অনুসৃত না হয়, সেজন্য সকলের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

সদস্য। জাতীয়তাবাদী মুসলমান হিসাবেও তিনি সর্ব্বজন পরিচিত। পূর্ব্ববঙ্গে ঐ ভাবে শ্রীযুত দ্বারকানাথ বারোরীকেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার নিয়োগের পর পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে শ্রীযুত বারোরী কংগ্রেস বা তপশীলভুক্ত কোন

জাকর্ত্তায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু—বামে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোকর্ণ এবং দক্ষিণে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোহাম্মদ হাতা

সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি নহেন—কাজেই তাঁহার নিয়োগে পূর্ব পাকিস্তানবাসী হিন্দুরা আদৌ সন্তুষ্ট হন নাই। পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের শাসন ব্যবস্থার রীতি এই নিয়োগ হইতে সুপ্রকাশ। আমাদের বিশ্বাস ডাঃ আমেদের নিয়োগে পশ্চিম বাঙ্গালায় কোন অসন্তোষের কারণ হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে নুতন মন্ত্রী—

ডাঃ আর আমেদ নামক কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ দন্ত-চিকিৎসক গত ৪ঠা জুলাই পশ্চিমবঙ্গে নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। দিল্লী চুক্তি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম একজন মুসলমানকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হইল। ডাঃ আমেদের বয়স ৬০ বৎসর—১৯১৫ সালে আমেরিকা হইতে দন্ত চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া আসিয়া তিনি ১৯১৯ সাল হইতে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছেন। ১৯২০ সালে তিনি যে প্রথম দন্ত চিকিৎসা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহার পরিচালন ভার গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও অলডারম্যান ছিলেন এবং পশ্চিম বঙ্গের ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকালটীর

শিয়ালদহ ষ্টেশনে বাস্তুহারা—

গত কয় মাস ধরিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে সকল সময়েই কয়েক সহস্র বাস্তুহারাকে বাস করিতে দেখা যাইতেছে। গত ১লা জুলাই হইতে তাহাদের সংখ্যা নাকি ১০ হাজারেরও অধিক হইয়াছে। তাহাদের অসহনীয় দুঃখ কষ্ট দেখিলে প্রত্যেক মানুষই চঞ্চল হইয়া উঠেন। স্থানগুলি এমন দুর্গন্ধময় যে ট্রেণ যাত্রীদের পর্য্যন্ত তাহাদের

মধ্য দিয়া যাতায়াত করাই কষ্টকর—সময়ে সময়ে বাস্তহারাদের ভিড়ের জন্য লোক যাতায়াত করিতে পারে না ও সে জন্য ট্রেণ ফেল হয়। এই হাজার হাজার লোকের স্নানের জল নাই, পায়খানার ব্যবস্থা নাই—আহার ত দূরের কথা। পূর্ব্বে কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠান খাদ্য রন্ধন করিয়া আনিয়া তাহাদের খাওয়াইত—মধ্যে সরকারী আদেশে সে ব্যবস্থা বন্ধ করা হইয়াছিল—তখন তাহাদের জন্য চিড়া, পাউরুটী প্রভৃতি বরাদ্দ হইত—আবার নাকি রন্ধন-করা-খাদ্য দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল লোককে গভর্ণমেণ্ট কেন কোন ভাল জায়গায় লইয়া না গিয়া ষ্টেশন প্ল্যাটফরমে ফেলিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কলিকাতার যে কোন স্থানে বড় বড় খালি বাড়ী সংগ্রহ করিয়া গভর্ণমেণ্ট ইহাদের তথায় লইয়া যাইতে পারেন। তাহাতে তাহারা অন্ততঃ ভাল বাসস্থান লাভ করিতে পারিবে। সরকারী সকল ব্যবস্থাতেই আমরা ক্ষিপ্রতার অভাব দেখিয়া বিস্মিত হই। সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগে কর্ম্মচারীরও অভাব নাই—অর্থেরও অভাব নাই। তথাপি এত অধিকসংখ্যক লোক এরূপ প্রকাশ্য স্থানে এইভাবে পশুর মত বাস করিতে বাধ্য হয় কেন? কেহ কি তাহাদের অবস্থাটা দেখাও প্রয়োজন মনে করেন না?

আসাম-রেল লিঙ্কের ক্ষতি—

দার্জ্জিলিংয়ের বন্যার ফলে আসাম যাইবার নূতন রেল পথ কিরূপ বিপন্ন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। (১) মনিহারীঘাট হইতে ফকিরাগ্রাম পর্য্যন্ত ২০০ মাইল রেলপথের মধ্যে শিলিগুড়ী হইতে বাগরা-কোট পর্য্যন্ত ২০ মাইল পথ মেরামত হয় নাই—বাকী পথ মেরামত হইয়াছে। (২) তিস্তা ভ্যালী লাইট রেলে শিবক হইতে গেলেখোলা পর্য্যন্ত ১৬ মাইল রেলপথ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ পথ দিয়া শিলিগুড়ী হইতে কালিম্পং, গ্যাংটক ও অন্যান্য স্থানে যাওয়া হইত। ঐ পথ এখন মেরামত করা যাইবে না (৩) কার্সিয়ং হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত ২০ মাইল রেলে এত অধিক স্থান নষ্ট হইয়াছে যে সত্বর উহার মেরামত হইবে না। (৪) শিলিগুড়ী হইতে বাগরা-কোট পর্য্যন্ত ২০ মাইলের মধ্যে নূতন তিস্তা রেল পুলের পূর্বাংশে ৭৬০ ফিট নষ্ট হইয়াছে—উহা মেরামত করিয়া আগামী ১৫ই আগষ্ট ঐ পথে রেল চলিবে বলিয়া মনে হয়।

এই বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পরও ১লা জুলাই হইতে দার্জ্জিলিং জেলায় আবার অতিবৃষ্টি হইয়াছে। তাহার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। তবে ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল যে দার্জ্জিলিং যাতায়াত বন্ধ থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যুদ্ধ ১০ বৎসর চলিবে—

খ্যাতনামা বৃটীশ দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল গত ৩০শে জুন প্রকাশ করিয়াছেন যে রাসিয়া বর্ত্তমান কোরিয়া-যুদ্ধে যোগদান করিবে ও এই যুদ্ধ ১০ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে। ইহাই পৃথিবীর তৃতীয় মহাযুদ্ধ। রাসেলের বয়স ৭৮ বৎসর, তিনি লর্ড উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সে উপাধি কখনও ব্যবহার করেন না। গণিতজ্ঞ বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র তিনি সম্মানিত। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পৃথিবীর সকলকে শঙ্কিত করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই।

বাংলার দুরবস্থা—

গত ৬ই জুলাই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দিল্লীতে বসিয়া পশ্চিম বাংলার দুরবস্থা সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সকল রাজ্যকে প্রাদেশিকতার মনোভাব ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালী-বিতাড়ন চেষ্টা ও ব্যবস্থা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে। ভারত-বিভাগের পর পাঞ্জাব ও বাংলাই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় পাশের তিনটি রাজ্য যদি বাংলার অধিবাসীদের সহিত ভাল ব্যবহার না করে, তবে শুধু বাংলা নহে, ভারত রাষ্ট্রই ভবিষ্যতে বিপন্ন হইবে। মৌলানা আজাদের এই অনুরোধে কেহ কর্ণপাত করিবে কি?

শ্রীমাখনলাল সেন—

খ্যাতনামা প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীমাখনলাল সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯৪৯ সালের 'রামানন্দ বক্তৃতা' দানের জন্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি স্বাধীন ভারতে সাংবাদিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। মাখনবাবু সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর সাংবাদিকতার সহিত সংশিষ্ট আছেন। তিনি প্রথম জীবনে বিপ্লববাদী ছিলেন ও সমগ্র জীবন কংগ্রেসের সেবা করিয়া দেশকে মুক্তির পথে আগাইয়া

দিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে দেশবাসী সকলেই আনন্দিত হইবেন।

মেদিনীপুর বন্যা—

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় কাঁসাই নদীর শাখা খেরাই নদীর জল পর পর বর্দ্ধিত হওয়ায় ময়না থানার ৮৪ খানি গ্রামের মধ্যে ৫৫ খানি গ্রাম গত ১৪ই জুন হইতে জলমগ্ন হইয়াছে—তাহার ফলে প্রায় ৮০ হাজার একর জমী চাষের অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলের ৫০ হাজার অধিবাসী বিপন্ন হইয়াছে। নানা স্থানে এইরূপ দৈব-দুর্বিপাক আজ পশ্চিম বাংলাকে ধ্বংস করিতেছে। কি ভাবে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের রক্ষা করা যাইবে, তাহা চিন্তার অতীত।

ডক্টর শ্রীপরিমল রায়—

খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ও কোবিদ ডক্টর শ্রীপরিমল রায় সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের ডিরেক্টর অব পাবলিক
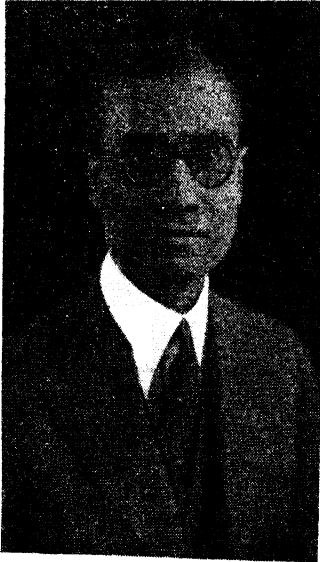
ডাঃ পরিমল রায়

ইনস্ট্রাকসন (শিক্ষা অধিকর্ত্তা) নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। মৈমনসিংহ সহরে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯১৭ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯২৩ সালে অর্থ-নীতিতে এম-এ পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ বৎসর অধ্যাপনার পর তিনি ১৯২৯ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত লণ্ডনে অর্থ-নীতি শিক্ষা করেন ও তথায় পি-এচ্-ডি উপাধি পান। ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট কমার্সিয়াল ইনিষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও পরে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে তিনি ভারত সরকারের প্রচার বিভাগে কাজ করিয়া-ছিলেন। ঢাকায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ সেবা ও পল্লীমঙ্গল সমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরে অছি বিভাগের অর্থ-নীতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন ও সেখানে কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই নূতন পদ পাইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহার কর্ম্মময় সুদীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী—

বিহারের খ্যাতনামা কংগ্রেসনেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী গত ২৬শে জুন মজঃফরপুরে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তপস্যা করিতে যান নাই—তিনি দেশের জনগণের দুঃখদুর্দ্দশা দেখিয়া গত প্রায় ৫০ বৎসর কাল সেই দুঃখদুর্দশা দূর করিবার আন্দোলন পরিচালিত করিয়া-ছিলেন। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুনীতি প্রচারেই তিনি জীবনের অধিক সময় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রয়োজনের সময় তিনি রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমাজ-সংস্কার ও অর্থনীতিক আন্দোলনেই তাঁহার অধিক আগ্রহ দেখা গিয়াছে। তাঁহার মত নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের সংখ্যা খুবই কম।

পরলোকে ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী—

খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাব্রতী কলিকাতা শ্যাম-বাজারস্থ মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রাজসাহী কলেজে ১৪ বৎসর ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৭ বৎসর রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। হুগলী জেলার হোরা গ্রামে তাহার

জন্ম হয়। তিনি সুবক্তা ও লেখক ছিলেন। ১৯৪৩ সালে পাটনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি রসায়ন বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন। কৃষিবিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। শ্যামবাজারে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করার সময় তিনি সহরতলীতে বাগান করিয়া প্রত্যহ তাহার দেখা-শুনা করিতেন।

কোরিয়া-যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ—

এতদিন ধরিয়া ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বলিয়া আসিয়াছেন যে, পৃথিবীর যুদ্ধমান জাতিদের কোন দলে তিনি যোগদান করিবেন না, নিরপেক্ষ থাকিবেন। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধ গত ২৫শে জুন আরম্ভ হইলেই দেখা গেল যে পণ্ডিতজী আমেরিকার দলে যোগদান করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য ভারতবাসী বুঝিল না। পৃথিবীতে একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভের আশায় আমেরিকা যুদ্ধে নামিয়াছে। কম্যুনিষ্ট ভয়ে ভীত বৃটেন, ফ্রান্স ডাচ প্রভৃতিও আমেরিকার দলে যোগ দিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত এই যুদ্ধের সম্পর্ক কোথায় এবং কি জন্য ভারত এই যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষ সমর্থন করিল তাহা কোন ভারতবাসীই বুঝিতে পারে নাই। যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া যে পণ্ডিতজী পাকিস্তানের সহিত আপোষের জন্য এত লালায়িত, সেই পণ্ডিতজী আজ দক্ষিণ কোরিয়াবাসীর দুঃখে বিগলিত হইয়া আদর্শচ্যুত কেন হইলেন, তিনি তাঁহার বিবৃতিতে তাহা আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন নাই। আজ যদি পৃথিবীর তৃতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয় ও সে জন্য ভারতে যুদ্ধের কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তবে সে জন্য ভারতবাসী সকলের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। পণ্ডিতজী মন্ত্রীর আসনে বসিয়া বোধ হয় সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

গ্রাম-সংগঠন কার্য্যের আদর্শ—

শ্রীপঞ্চানন চোংদার কলিকাতার খ্যাতনামা ধনী ব্যবসায়ী। তাঁহার বাড়ী হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত বড়দা গ্রামে। তিনি তাঁহার নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামে অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার অর্থসাহায্যে ঐ অঞ্চলে কয়েকটি বনিয়াদি বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করে। তাহা ছাড়া তিনি ঐ অঞ্চলের কয়েকটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিরও সদস্য থাকিয়া সেই সকল বিদ্যালয়ের উন্নতির ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি তাঁহার নিজ গ্রাম বড়দায় এবং বড়দার কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত রসপুর গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা
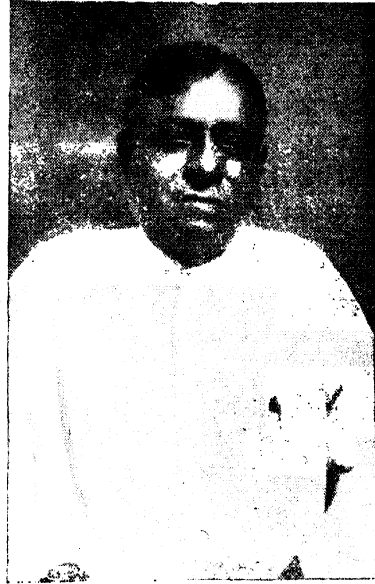
শ্রীপঞ্চানন চোংদার

করিয়াছেন। আমতায় 'রামসদয় কলেজ' তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। গ্রামের মধ্যে দামোদর নদের তীরে কলেজ স্থাপন করিয়া তিনি ঐ অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। ঐ কলেজের সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকিয়া বহু ছাত্র অতি অল্প ব্যয়ে শিক্ষা-লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। পঞ্চাননবাবুর এই গ্রাম-সেবার আদর্শ দেশের সর্ব্বত্র অনুকরণ হওয়ার যোগ্য।

দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—

মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি ৬২ বৎসর বয়সে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ঝাড়গ্রামের রাজার ম্যানেজার ছিলেন। গত ২১ বৎসর কাল তিনি ঐ পদে নিযুক্ত

থাকিয়া রাজ্যের সর্ববিধ উন্নতি বিধান করেন। রাজার কাজের সহিত তিনি বহু বৎসর মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ৪ বৎসর মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও রাজার অর্থে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর হল ও বীরসিংহে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'ঝাড়গ্রাম-রাজগ্রন্থমালা তহবিল' প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঝাড়গ্রাম রাজের অর্থে মেদিনীপুরে ষ্টেডিয়াম, মেটার্নিটি হোম, হোমিওপাথিক কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহারই কৃতিত্ব ছিল। ঝাড়গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়, বালকদের উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয়, বাণী ভবন, কৃষি কলেজ, হিন্দুমিশন, গৌড়ীয় মঠ, সারদা বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ঝাড়গ্রামকে তিনি নবজীবন দান করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—বারাকপুর গান্ধীঘাটে বৃক্ষরোপণ করিতেছেন ফটো—শ্রীপ্রভাতকুমার দেব
(পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির সৌজন্যে)

শ্রীহেমন্তকুমার বসু—

উত্তর কলিকাতার খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের সম্পাদক শ্রীহেমন্তকুমার বসু সম্প্রতি কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে কংগ্রেস এখন আর জনগণের প্রতিষ্ঠান নাই—কংগ্রেস তাহার আদর্শ—কৃষক-মজদুর-প্রজা-রাজ প্রতিষ্ঠা চাহে না। কাজেই এখন আর কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করা যায় না। মানুষ যখন অন্ন ও বস্ত্রের অভাবে বিপন্ন, তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী জাঁকজমক রক্ষা করিতে তৎপর—এই বিসদৃশ ব্যাপার সমর্থন করিতে না পারিয়াই তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হেমন্তবাবু গত ৩০ বৎসর কাল একান্ত ভাবে নিষ্ঠার সহিত দেশসেবা করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগে দেশবাসী মাত্রই চিন্তিত হইবেন। আশা করি, ইহার পর কংগ্রেস—নেতাদের চোখ খুলিবে ও তাঁহারা নিজেদের ঠিকপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন।

পাকতুনীস্তান আন্দোলন—

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নেতা খ্যাতনামা ইপির ফকিরের নেতৃত্বে ওয়াজিরিস্তানে পাকতুনীস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। ওয়াজিরী, মাসুদ, বিঠানী ও ডাওয়ার প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিদের নেতারা এই আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন। সীমান্ত নেতারা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কাবুলে যাইয়া আফগান গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ করিয়াছেন। সীমান্তে পাকতুনীস্তান স্থাপিত হইলে পশ্চিম-পাকিস্তান-রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হইবে বলিয়া পশ্চিম পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে বৃটেন ও আমেরিকার শরণ লইয়াছিলেন। বৃটেন ও আমেরিকা একযোগে আফগানিস্তানকে পাকতুনীস্তান আন্দোলন সমর্থন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—কিন্তু আফগানিস্তান তাহাতে সম্মত হন নাই। পাঠানদের দাবী সমর্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আফগানিস্তান পাকতুনীস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সমর্থন করিবেন। সীমান্ত-সমস্যা সে জন্য বর্ত্তমানে ইঙ্গ-মার্কিণ দলকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৩২৬ ও ৪২৫ (৬ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)

ইংলণ্ড ঃ ১৫১ ও ২৭৪

ইংলণ্ডের বিখ্যাত লর্ডসমাঠে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৩২৬ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে। ইংলণ্ডের মাটিতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এই প্রথম টেষ্ট ম্যাচে জয়ী হ'ল। ১৯২৮ সাল থেকে ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের মধ্যে টেষ্ট ম্যাচ খেলা সুরু হয়েছে। এ টেষ্ট সিরিজের আগে পর্য্যন্ত ৬টি টেষ্ট সিরিজে উভয় দল যোগদান করেছে। ইংলণ্ড 'রাবার' পেয়েছে ৩ বার, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ বার। ২টি টেষ্ট সিরিজ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে, উভয় দল সমান সংখ্যক টেষ্ট ম্যাচ জয়ী হওয়ার জন্যে। এই ৬টি টেষ্ট সিরিজে মোট ২১টা টেষ্ট ম্যাচ হয়। ইংলণ্ড ৮টা টেষ্ট ম্যাচে জয়ী হয়; অপর দিকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ পাঁচটায়।

আলোচ্য বৎসরের টেষ্ট সিরিজের প্রথম টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ২০২ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে হারিয়ে দেয়। লর্ডসের দ্বিতীয় টেষ্টে প্রথম ব্যাটিং ক'রে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রথম দিনের খেলায় ৭ উইকেটে ৩২০ রান তুলে। উল্লেখযোগ্য রান, এ রে ১০৬, উইকস ৬৩, ওরেল ৫২।

দ্বিতীয় দিনে ৩২৬ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ইংলণ্ডের জেঙ্কিনস ১১৬ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫টা উইকেট পান; বেডসার পান ৩টে ৬০ রানে। খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫১ রানে শেষ হয়। রামাধীন ৪৩ ওভার [illegible] ২৭টা মেডেন নিয়ে ৬৬ রানে ৫টা উইকেট পান। [illegible]টাইন পান ৪টে; ৪৫ ওভার বলে ২৮টা মেডেন নিয়ে ৪৮ রান দিয়ে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ডকে 'ফলোঅন' না করিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে।

খেলার তৃতীয় দিনে খেলার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৩৮৬ রান উঠে। উইকস ৬৩ রান করে রান আউট হ'ন। ওয়ালকট এবং গোমেজ যথাক্রমে ১১৪ এবং ৫৭ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৫৬১ রানে অগ্রগামী থাকে। জেঙ্কিনস ৪টা উইকেট পান।

চতুর্থ দিনে ৬ উইকেটে ৪২৫ রান উঠলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ওয়ালকট ১৬৮ রান ক'রে নট আউট থাকেন। গোমেজ ৭০ রানে আউট হ'ন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের থেকে ৬০০ রান পিছনে থেকে ইংলণ্ড ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং চতুর্থ দিনের নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত খেলে ইংলণ্ড ৪ উইকেটে ২১৮ রান করে। ওয়াসব্রুক ১১৪ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। খেলা ড্র করতে ইংলণ্ডের তখন ৩৮২ রান দরকার। হাতে ৬টা উইকেট।

খেলার পঞ্চম দিনে লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের ৯টা উইকেট পড়ে যায়। ২৭৪ রানে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'লে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৩২৬ রানে জয়ী হয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে যে রান তুলেছিল সেই রানের ব্যবধানে খেলায় জয়ী হয়েছে। ইংলণ্ডের দুটো ইনিংসের রান যোগ করলে দেখা যায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটের ৪২৫ রানের সমান হয়েছে। এবারও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের রামাধীন বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করেন ৬টা উইকেট পেয়ে ৮৬ রান দিয়ে। দুটো ইনিংস জড়িয়ে রামাধীন ১১৫ ওভার বল

দিয়ে ৭০টা মেডেন পান আর ১৫২ রান দিয়ে ১১ জন খেলোয়াড়কে আউট করেন। অপরদিকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ভ্যালেনটাইন উইকেট পান ৭টা, ১১৬ ওভার বল দিয়ে ৭৫টা মেডেন নিয়ে এবং বিপক্ষ দলকে ১২৭ রান করতে দিয়ে।

উইম্বলডন টেনিস ঃ

উইম্বলডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ৬৪তম বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। পূর্ব্বাপর বৎসরের মত এ বছরের প্রতিযোগিতায় আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড়রা আমেরিকার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। গত বছর প্রতিযোগিতার ৫টি অনুষ্ঠানের মধ্যে আমেরিকা যথাক্রমে পুরুষ এবং মেয়েদের সিঙ্গলস এবং ডবলস—এই চারটিতে জয়ী হয়। একমাত্র মিক্সড ডবলসে জয়ী হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এর মধ্যে মেয়েদের সিঙ্গলস, পুরুষদের ডবলস এবং মেয়েদের ডবলসের ফাইনালে আমেরিকান খেলোয়াড়রা নিজ দেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অর্থাৎ ফাইনাল খেলাগুলো দাঁড়িয়েছিলো 'All American Affairs.'

আলোচ্য বৎসরের প্রতিযোগিতার ৫টি অনুষ্ঠানের মধ্যে আমেরিকা মেয়ে ও পুরুষদের সিঙ্গলস এবং মেয়েদের ডবলস অর্থাৎ ৩টিতে জয়ী হয়েছে। পুরুষদের ডবলসে অষ্ট্রেলিয়া জয়লাভ করেছে। মিক্সড ডবলস পেয়েছে আমেরিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।

ফাইনাল খেলার ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে বাজ পেট্টি ৬-১, ৮-১০, ৬-২, ৬-৩ সেটে ফ্রাঙ্ক সেজম্যানকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পেট্টি গত বছর ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও উইম্বলডন বিজয়ী হ'ন নি। ১৯৪৭ সালের সেমি-ফাইনালে এবং ১৯৪৮ সালের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন। এবার ফাইনাল খেলার শেষে বাজ পেট্টিকে দৈহিক অবসাদে একেবারে ভেঙ্গে পড়তে দেখা যায়।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস্ লুই ব্রাউ (আমেরিকা) ৬-১, ৩-৬, ৬-১০ সেটে মিসেস মার্গারেট ডিউ পণ্টকে (আমেরিকা) পরাজিত ক'রে পর্য্যায়ক্রমে তিন বছর সিঙ্গলস বিজয়িনী হয়েছেন। ইতিপূর্ব্বে মিসেস হেলেন উইলডস মুডী পর্য্যায়ক্রমে তিনবার (১৯২৭-৩০ সাল)—উইম্বলডন সিঙ্গলস বিজয়িনী হয়েছিলেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে পর্য্যায়ক্রমে ৫ বার (১৯১৯-১৯২৩) জয়লাভ ক'রে উপর্য্যুপরি বেশী বার জয়লাভের রেকর্ড করেছেন সুজানী লেংলেন।

পুরুষদের ডবলসে জন ব্রম্ উইচ এবং এড্রিয়ান কুইষ্ট (অষ্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৩-৬, ৬-৩, ৬-২, ৩-৬ সেটে জিওফ ব্রাউন এবং বিল সিড্ওয়েলকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে মিস লুই ব্রাউ এবং মিসেস মার্গারেট ডিউপণ্ট (আমেরিকা) ৬-৪, ৫-৭, ৬-১ সেটে মিস শার্লি ফ্রাই এবং মিস ডোরিস হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে এরিক ষ্টারগেস (দঃ আফ্রিকা) এবং মিস লুইস ব্রাউ (আমেরিকা) ১১-৯, ১-৬, ৬-৪ সেটে জিওফ ব্রাউন (অষ্ট্রেলিয়া) এবং মিসেস প্যাট্রিকিয়া টডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

আমেরিকার মিস লুই ব্রাউ মহিলাদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলস এই তিনটি বিষয়ে জয়লাভ ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৪৮ সালেও মিস্ ব্রাউ তিনটি বিষয়ে জয়লাভ করেন। গত বছর করেন সিঙ্গলস এবং ডবলসে, ডিউপণ্টের সঙ্গে।

এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণ যোগদান করেছিলেন। ভারতীয় এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় এবং এশিয়ান লন্ টেনিস সিঙ্গলস বিজয়ী দিলীপ বসু প্রতিযোগিতায় 'সিডেড' খেলোয়াড়দের নামের ক্রম-পর্য্যায় তালিকায় পুরুষদের সিঙ্গলসে পঞ্চদশ স্থান লাভ করেছিলেন। এর অর্থ, এ বছরের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ২০ জন টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁর স্থান পঞ্চদশ। ভারতীয় এবং বিদেশী টেনিস মহল আশা করেছিলেন দিলীপ বসু প্রতিযোগিতায় বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারবেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি প্রতিযোগিতার মাত্র কয়েকদিন আগে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন চিকিৎসকের পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ উপেক্ষা

...। এ অবস্থায় তিনি যে বিশেষ কিছু করতে সক্ষম ...তা আগে থেকে সকলেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। প্রথম রাউণ্ডে দিলীপ বসু ৬-১, ১১-৯, ৬-১ সেটে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাপটেন ফ্রাঙ্ক মসট্রীলিকে (জামায়িকা) পরাজিত করেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় সাওলকে (নেদারল্যাণ্ড) প্রথম সেটে ৬-৪ গেমে পরাজিত করেন কিন্তু দ্বিতীয় সেটের খেলায় যখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ৫-৪ গেমে অগ্রগামী হ'ন তখন শারিরীক দুর্ব্বলতার জন্তে খেলা থেকে অবসর নেন্। অন্যান্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ তৃতীয় রাউণ্ডে ৬-৪, ৮-৬, ৬-৩ সেটে ফ্রেড কোভালেস্কির (আমেরিকা) কাছে পরাজিত হ'ন। জোর প্রতিযোগিতা ক'রে নরেশকুমার তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজিত হ'ন আমেরিকান 'সিডেড' খেলোয়াড় গার্ডনার মুলয়ের কাছে ৬-২, ৬-৪ এবং ১২-১০ সেটে। ডবলসে দিলীপ বসু শেষ পর্য্যন্ত দৈহিক দুর্ব্বলতার জন্তে যোগদান করেন নি। একমাত্র সৌজন্তের খাতিরে তাঁর সহযোগিনী মহিলা খেলোয়াড়ের নিরাশার কথা স্মরণ ক'রে তিনি মিক্সড ডবলসে যোগদান ক'রে পরাজয় বরণ করেন।

পুরুষদের ডবলসের দ্বিতীয় রাউণ্ডে নরেশকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ অভিজ্ঞ এবং দক্ষ খেলোয়াড় ব্রাউন এবং বিল সিড ওয়লের (অষ্ট্রেলিয়ান) কাছে পরাজিত হ'ন। মিক্সড ডবলসের চতুর্থ রাউণ্ড পর্য্যন্ত খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন ভারতীয় খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্র এবং মিসেস্ কারগিন। শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় বরণ করলেও প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁরা যে মনোবল নিয়ে খেলেছিলেন তা খুবই প্রশংসনীয়।

ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা যথারীতি চলছে। প্রথম বিভাগের খেলায় এক সময় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে জোর প্রতিযোগিতা চলেছিল ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং রাজস্থান এই তিন দলের মধ্যে। গত বছরের লীগচ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এখনও লীগের খেলায় অপরাজেয় অবস্থায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের থেকে ১ পয়েণ্ট কম পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে মোহনবাগান। রাজস্থান আছে তৃতীয় স্থানে, মোহনবাগানের থেকে ৪ পয়েণ্টের ব্যবধানে। এরিয়ান্সের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে এবং বি এন রেলদলের কাছে ২-০ গোলে হেরে গিয়ে রাজস্থান লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পাল্লা থেকে অনেক নীচে নেমে গেছে। এখন মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের শেষ নিষ্পত্তি হবে। প্রথম বিভাগের লীগের ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গলদল একটা মূল্যবান পয়েণ্ট হারিয়েছে ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে।

ক্যালকাটার বিপক্ষে যাঁরা ফরোয়ার্ডদলে খেলেছিলেন তাঁদের নিয়েই বি এন আর দলের বিপক্ষে ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল ৪-০ গোলে জিতেছিলো। লেফট ব্যাক, সেণ্টার হাফ এবং লেফট হাফ ব্যাকে যে সব খেলোয়াড় নেমেছিলেন ক্যালকাটার মত দুর্ব্বল দলের বিপক্ষে খেলবার যোগ্যতা তাঁদের যথেষ্ট ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য, সে সময় বি এন আর দলের থেকে ক্যালকাটা অনেক পয়েণ্টের নীচে ছিল। ঐ দিন খেলার শেষে ইস্টবেঙ্গল দলের একদল সমর্থক ঐ দিনের খেলোয়াড় নির্ব্বাচন সম্পর্কে ক্লাবের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জোর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলায় মোহনবাগান দলেরও কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় যোগ দেয়নি। খেলা ড্র হয়েছিলো। ঐ দু' দিনের খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ব্যাপারে আমরা দুই দলের ক্লাব কর্তৃপক্ষের কোন অবিবেচক জ্ঞানের পরিচয় পাই না। খেলোয়াড়রা মানুষ; যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার যেখানে নিয়মিত পূর্ণ বিশ্রাম দরকার সেখানে মানুষ খেলোয়াড়দেরও যে বিশ্রাম প্রয়োজন একথা বলা বাহুল্য মাত্র। এর উপর খেলোয়াড়দের সুখ-অসুখ, খেলায় শারীরিক আঘাতের সম্ভাবনা আছে এবং একটানা খেলার দরুণ দৈহিক অবসাদ আসা খুবই স্বাভাবিক। খেলোয়াড় এবং দলের স্বার্থের খাতিরে সেখানে তাদের বিশ্রাম প্রয়োজন এবং তার একমাত্র সুযোগ পাওয়া যায় দুর্ব্বল দলের সঙ্গে খেলার দিনে। দুর্ব্বল দলের সঙ্গে খেলায় দলের নিয়মিত খেলোয়াড়দের ৩।৪ জনকে বিশ্রাম দিয়ে তাদের স্থানে নতুন খেলোয়াড়দের খেলবার সুযোগ দেওয়ার একটা গঠনমূলক সাধু উদ্দেশ্য আছে। শক্তিশালী দলের বিপক্ষে এবং নামকরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে খেলতে নতুন খেলোয়াড়রা খেলায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে; তাদের খেলায় জড়তা এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দূর হয়ে সাহস বৃদ্ধি পায়। বাংলা দেশের ফুটবল খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড নানা কারণে নেমে গেছে। কিন্তু অখ্যাতনামা বাঙ্গালী খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত কোন কোন ফুটবল দল যে অল্ ইণ্ডিয়া অথবা অলিম্পিক প্রত্যাগত ফুটবল খেলোয়াড়দ্বারা গঠিত ফুটবলটীমকে যথেষ্ট বেগ দিয়ে খেলা ড্র বা জয়লাভ করতে পারে তার প্রমাণ এবারের লীগের খেলাতেও পাওয়া গেছে। লীগের ফিরতি খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব ১-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়েছে। এ অপ্রত্যাশিতভাবে গোল দিয়ে জয়লাভ নয়, স্পোর্টিং ইউনিয়নকে রীতিমত জোর দিয়ে খেলে দু' পয়েণ্ট নিতে হয়েছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ২-০ গোলে ই আই রেলদলকেও পরাজিত করে। এরপর এরিয়ান্স ক্লাব লীগের তৃতীয় স্থান অধিকারী রাজস্থানকে লীগের ফিরতি খেলায় খেলা ড্র করতে বাধ্য করেছে। বি এন

আর ২-০ গোলে রাজস্থানকে হারিয়েছে। রাজস্থানের খেলোয়াড়দের নামের ভারত জোড়া খ্যাতির সঙ্গে এরিয়ান্সের খেলোয়াড়দের কি তুলনা চলে! রাজস্থানের এগারটা খেলোয়াড়ের মধ্যে কয়েকজন অলিম্পিক প্রত্যাগত ভারতীয় ফুটবল দলের নির্ব্বাচিত খেলোয়াড় এবং বাকি সকলই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত নামকরা খেলোয়াড়। কিন্তু অনেক সময় দুর্ব্বল দলের টীমওয়ার্কের কাছে নামকরা খেলোয়াড়রাও যে শেষ পর্য্যন্ত দলের জয়লাভে সাহায্য করতে পারে না এরিয়ান্স যেমন গতবার লীগচ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গলের খেলায় প্রমাণ করেছে এবার তেমনি করেছে রাজস্থানকে হারিয়ে। পূর্ব্বে কালীঘাট ক্লাবকে ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান এমন কি বার্মা মুলুক থেকে খেলোয়াড় যোগাড় করতে দেখা যেত। এ কয়েক বছর কালীঘাট ক্লাব স্থানীয় বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে ফুটবল খেলছে। একেবারে বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে টীম ক'রে জর্জ্জটেলিগ্রাফ, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, এরিয়ান এবং কালীঘাট শক্তিশালী দলের বিপক্ষে বেশ খেল)—লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ না পেলেও সেই সব দলের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন থাকবে, যারা লীগ-শীল্ড পাওয়ার উগ্র নেশায় বাইর থেকে খেলোয়াড় আমদানী ক'রে জাতীয় স্বার্থ বলি না দিবে। বাংলা দেশের তরুণ ফুটবল খেলোয়াড়রা আজ রাজনৈতিক এবং সামাজিক অব্যবস্থার চাপে পড়ে ক্ষয়িষ্ণু এবং বিপর্যস্ত হলেও জাতীয় সম্মানের পরীক্ষাক্ষেত্রে তাদের উপর যে আমরা নির্ভর করতে পারি তার অনেক শুভ লক্ষণই এখনও নির্জীব অবস্থায় স্থায়ী রয়েছে। আমরা যদি তাদের উপেক্ষা ক'রে চলি, সমগ্র জাতীয় মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়তে আর বেশী দেরী থাকবে না। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, এবং জনসাধারণের কাছে আবেদন যে, আমাদের মধ্যে শুভবুদ্ধি এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হউক।

১৪. ৭. ৫০

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "পতঙ্গ"—২৷৷০
শিশিরকুমার আচার্য্যচৌধুরী-সম্পাদিত "বাংলা বর্ষলিপি" (১৩৫৭)—২৲
শ্রীসুধাংশুকান্ত আচার্য্য প্রণীত শিকার-কাহিনী "আসামের জঙ্গলে"—৪৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অশোক-দ্বীপে স্বপন"—২৲, "মহাতেজা স্বপন"—২৲, "মৃত্যু-রহস্যে মোহন"—২৲
শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য-অনুদিত "ভারতের জাতি পরিচয়"—৬৷৷০
অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত নাট্য-কাব্য "রবীন্দ্র-প্রতিভা"—১৷০
শ্রীভোলানাথ সাহা প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "বেহুলা কাব্য"—২৲
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কথা কও"—৩৷০
শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত প্রণীত "যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস"—৫৲
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "আজিও যায় তারা"—৩৲
শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল প্রণীত উপন্যাস "শ্মশান ও কবর"—২৷৷০, "ঝটিকায় গেল ঝরে"—২৸০
বিমল কর প্রণীত রহস্যোপন্যাস "গ্যাসবার্ণার"—২৷৷০
শ্রীমদনমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত উপন্যাস "কলির অর্জ্জুন"—২৷৷০

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ড—জুন-জুলাই ১৯৫০

বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের পদাবলীর দু'খানি মধুর কীর্ত্তন গীতি দিয়ে N 31211 রেকর্ডে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর 'খণ্ডিতা' পালা কীর্ত্তনটি এবার সমাপ্ত ক'রেছেন। পাঁচখানি রেকর্ডে পালাটি সম্পূর্ণ হ'লেও প্রত্যেক গানখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ—শিল্পীর ভাবমধুর-কণ্ঠে গানগুলি প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। "তুমি কত দূরে কোন গহন আঁধারে" ও "কেন আঁখি দু'টি ডাকে বারে বারে" N 31212 রেকর্ডে দু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন ক'রেছেন বাংলার জনপ্রিয় গায়ক সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী। শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় N 31213 রেকর্ডে যে দু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন ক'রেছেন—তা ভাব, ভাষা ও প্রকাশ ভংগীমায় নতুনত্বের দাবী করে। শ্রীমতী রমা দেবীর কণ্ঠে দু'খানি আধুনিক গান N 31214 রেকর্ডে বেশ উপভোগ্য হয়েছে। দু'খানি পল্লী গীতি N 31216 রেকর্ডে গেয়েছেন শিল্পী চিত্ত রায়। দেড় কোটি ঘর ভাঙা বাঙালির মর্ম্মন্তুদ মর্মকথা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে গান দুটিতে। দিলীপ রায়ের দু'খানি ভক্তিমূলক গান N 31197 রেকর্ডে ও বিরজা সেনের দু'খানি ভাওয়াইয়া গান N 31208 রেকর্ডে এবার প্রচারিত হ'য়েছে। ভারতখ্যাত ক্লারিওনেটবাদক রাজেন সরকার N 31219 রেকর্ডে দু'খানি জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুরকে মূর্ত্ত ক'রে তুলেছেন।

N 31229 শিল্পী বেচু দত্ত "যুগে যুগে যারা চির বঞ্চিত" একটি গানে তাদের অভিমান ও বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্য গানটিতেও ব্যথিত হৃদয়ের প্রতি সমবেদনায় শিল্পীর কণ্ঠ ভ'রে উঠেছে। N 31230 কুমারী বাণী ঘোষালের একক গানটি, অন্য দিকে প্রসিদ্ধ শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকণ্ঠে "মোর গানে জাগে সুর" সুন্দর উপভোগ্য। N 31232 শিল্পী কমল মিত্র—হিন্দী বাণীচিত্র "বরসাত"এর দু'খানি সুনির্ব্বাচিত ও জনপ্রিয় গানকে বাঁশীর সুরে রূপ দিয়েছেন—গান দুখানির মত তার সুরের প্রকাশ অনবদ্য হয়েছে। N 31233 নবীনা গায়িকার কণ্ঠে দু'খানি মনোরম আধুনিক গান মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে—রচনা সম্ভারে গান দুটি সমৃদ্ধ। N 31234প্রদ্যোত মিত্র—গায়ক অপেক্ষাকৃত নবীন। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক জগন্ময় মিত্রের সুর সংযোগে সমৃদ্ধ দু'খানি গান শিল্পী এই রেকর্ডে পরিবেশন করেছেন—গান দুটি রচনা ক'রেছেন প্রণব রায়।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভাদ্র—১৩৫৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস

সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে আজকাল রূপক ও প্রতীক এই দুটি কথা প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাব্যে, নাটকে এমন কি গল্প-উপন্যাসেও রূপক ও প্রতীকের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি রূপক ও প্রতীকের প্রতি প্রবণতা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রবৃত্তি বলে মনে করা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা একটু পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রূপকের আলোচনাই প্রথমে ধরা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার যে সংস্কৃতে নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ক্ষেত্রে যাকে রূপক বলা হয়েছে, আজকাল রূপক বলতে আমরা তা' মনে করি না। সে ক্ষেত্রে রূপক মানে উচ্চতর শ্রেণীর নাটক, তার আবার গোটা দশেক উপশ্রেণী আছে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'ও রূপক, মৃচ্ছকটিকও রূপক। বোধকরি রঙ্গমঞ্চে আখ্যায়িকাকে নট-নটীর সাহায্যে রূপায়িত করা হ'ত বলেই রাজা-রাজড়ার পৃষ্ঠপোষিত, নাট্যশালায় অভিনীত এবং ভরতাদি আচার্য্যগণের দ্বারা উপদিষ্ট এই সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর নাটককে রূপক বলা হ'ত।

সে অর্থে আজকাল রূপক কথাটা ব্যবহার করা হয়না। অলঙ্কার শাস্ত্রে যে রূপক অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় metaphor, তার সঙ্গেই সাহিত্যের এই প্রয়োগটির বিশেষ সম্পর্ক আছে। রূপকের আসল তাৎপর্য্য হ'ল বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে অভেদের আরোপ। যখন কবি বলেন "তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে" তখন তিনি সুর ও আগুন এই দুই বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষ্য করেন; আগুনের ছোঁয়া লেগে যেমন স্থূল পদার্থ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তার জড় সত্তা দগ্ধ হ'য়ে

যায়, সুরের প্রভাবেও কবির অন্তরের জড়তা তেমন করেই যেন নষ্ট হ'য়ে যায় এবং একটা মহনীয় ভাব ও অনুভূতি তাঁর অন্তরাত্মাকে অধিকার করে। সাময়িক ভাবে এই সাদৃশ্য কবির কাছে একটা ঘনিষ্ঠ ঐক্যের লক্ষণ বলেই প্রতীত হয়েছে, তিনি সুর আর আগুনকে ভিন্ন করে দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি এই দুটি বস্তুর মধ্যে অভেদের আরোপ কচ্ছেন, সুর আর আগুন সমধর্ম্মা হ'য়ে গেছে, আগুনের মত সুরও "লাগিয়ে" দেওয়া যায়, আগুনের মত সুরও সবখানে ছড়িয়ে যায়।

বাক্যালঙ্কার হিসেবে রূপকের ব্যবহার বহু প্রচলিত। কেবল সাহিত্যে আমরা রূপকের ব্যবহার দেখি তা' নয়। আমাদের সাধারণ কথাবার্ত্তায় পর্য্যন্ত রূপকের অজস্র প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়, আমরা না জেনেই রূপক অলঙ্কার সর্ব্বদা ব্যবহার করি। বড়লোকের টাকার গরম দেখলে যখন আমাদের রাগের জ্বালা ধরে, কিংবা বাক্য-বাণে যখন আমরা প্রতিপক্ষকে জর্জ্জরিত করি, তখন আমরা অলঙ্কার শাস্ত্র বা ব্যাকরণ না পড়েই রূপকের প্রয়োগ করি। মানুষের ভাষা—এমন কি অশিক্ষিত বর্ব্বরের ভাষাও যে রূপক-বহুল, তা' ভাষাবিৎ মাত্রেই স্বীকার করেন।

তবে বাক্যালঙ্কার রূপকের কথা এখানে আমাদের মুখ্য আলোচ্য নয়। রূপক বলে বিশিষ্ট এক প্রকারের রচনা আছে, তার লক্ষণাদিই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। বস্তুতঃ রূপক সাহিত্যের অন্যতম একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে রচনা অনেক দেশেই হয়েছে, সেকালেও হয়েছে এবং একালেও হয়েছে। সাহিত্যের এই ধারাকে একটা সনাতন ধারা বলা যেতে পারে।

এই পদ্ধতিকে রূপক বলা হয়, কারণ বাক্যালঙ্কার রূপকের যা তাৎপর্য্য এরও তাই। অর্থাৎ এর আসল কথা হ'চ্ছে এক বস্তুতে আর এক বস্তুর অভেদ আরোপ। এবং এই আরোপের মূলে আছে সেই একই মনোভাব অর্থাৎ উভয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের উপলব্ধি। রূপক রচনায় এই উপলব্ধি কেবলমাত্র একটি বাক্যে বা বাক্যাংশে সীমাবদ্ধ নয়। এই উপলব্ধিতেই সমগ্র রচনাটি বিবৃত। বাক্যা-লঙ্কার রূপকের পরিধি যদি ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়, তা হলেই একটা গোটা রূপক রচনার সৃষ্টি হ'তে পারে। বলা বাহুল্য যে এই জাতীয় রচনায় অনুভূতি ও কল্পনার ব্যাপকতা বিশেষভাবে আবশ্যক, শুধু ক্ষণিক একটা সাদৃশ্যের বোধ যথেষ্ট নয়। বস্তুতঃ এখানে শুধু একটি বস্তুতে অপর একটি বস্তুর অভেদ সাময়িক ভাবে আরোপ করা হয় না। এখানে একটি বস্তু-জগতে অপর একটি বস্তু-জগতের অভেদ আরোপ করা হয়। এই প্রকারের রচনায় যেমন একটা সৃষ্টির ক্ষমতা আবশ্যক, তেমনই একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টিরও প্রয়োজন। একটা ভাবের জগৎকে একটা নূতন বস্তুজগৎ সৃষ্টি করে তার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে, এই দুটো জগৎ এমন ভাবে খাপ খেয়ে যাবে যে তাদের মধ্যে আর ভেদ থাকবে না, বস্তুজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই ভাবজগৎ তার ভেতর থেকে ফুটে উঠ্‌বে। যেমন মাপসই আবরণের ভেতর থেকে অবয়বের সংস্থান আপনিই ফুটে ওঠে। ইংরেজিতে এরকম রচনাকে বলা হয় allegory. ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে সাঙ্গরূপক বলে একটা অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়; সাঙ্গরূপক হচ্ছে রূপক অলঙ্কারের সম্প্রসারিত সংস্করণ। Allegory কথাটার প্রতিশব্দ হিসেবে সাঙ্গরূপক কথাটা কবি হেমচন্দ্র 'আশাকানন' কাব্যের ভূমিকার ব্যবহার করে গেছেন, সে কথাটা আমরাও ব্যবহার কর্ত্তে পারি। তবে সংক্ষিপ্ত ও প্রচলিত বলে allegory বা allegorical অর্থে রূপক কথাটাই আমরা প্রয়োগ কর্ব্ব, তাতে বাক্যালঙ্কার রূপকের সঙ্গে গোলমাল হ'য়ে কোন মারাত্মক ভুল হ'বার আশঙ্কা নেই।

রূপকের সৃষ্টি কি ক'রে হ'ল? কেন লোকে রূপকের প্রয়োগ করে? কেবল কি চটক দেবার জন্যেই রূপকের ব্যবহার করা হয়? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে বাগর্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হয়। সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে, শব্দমাত্রেরই অর্থ একটা সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার জগতের অংশ। এই সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার জগৎ হ'ল আমাদের সকলের সাধারণ জগৎ। দশজনে 'গরু' বলতে যে সব জীবকে নির্দ্দেশ (denote) করে, বা যে সব লক্ষণ (connote) বোঝে, তারই মধ্যে 'গরু' শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধ। সুতরাং মানুষের ভাষা হ'ল লৌকিক ও লোকসামান্য অভিজ্ঞতার ভাষা। কিন্তু যা' অলৌকিক, যা অলোকসামান্য, যা বিশিষ্ট বা নিতান্ত ব্যক্তিগত তাকে প্রকাশ করা যাবে কি করে? তার উপায় হচ্ছে ইঙ্গিত

(suggestion)। নেত্রবিকার যেমন ইঙ্গিত, তেমনি ভাষার বিকার বা বেঁকান ভাষা বা "বক্রোক্তি", অর্থাৎ অলঙ্কৃত ভাষাও একপ্রকার ইঙ্গিত। অন্ধকে বক দেখাতে হ'লে আমাদের কোন রকম ইঙ্গিতের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। একমাত্র যে ইঙ্গিত তার কাছে খাটবে, সে হ'চ্ছে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যের ইঙ্গিত অর্থাৎ 'কতকটা এই রকম', এই বলে তাকে খানিকটা বুঝ দেওয়া যেতে পারে।

বাহুকে ভূমির সমান্তরাল করে কব্জি ও মণিবন্ধ পরস্পরের বিপরীত দিকে বেঁকিয়ে আমরা অন্ধের কাছে হাত নিয়ে আসি ও তাকে স্পর্শ করতে বলি। সেই স্পর্শ থেকে দৃশ্য-বকের মূর্ত্তি সম্বন্ধে একটা অসম্পূর্ণ ধারণা অন্ধ করে নেয়। অলোকসামান্য অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও আমাদের ভাব প্রকাশ কর্ত্তে হ'লে অনুরূপ একটা প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সে অভিজ্ঞতা অপরের উপলব্ধির বাইরের জিনিষ। কাজে কাজেই আমরা পরিচিত শব্দকেই নানাভাবে দুমড়ে বেঁকিয়ে এটার ঘাড়ে ওটাকে চাপিয়ে বা "আরোপ" করে আমাদের অভিজ্ঞতার সদৃশ একটা বোধ শ্রোতার মনে আনবার চেষ্টা করি। এইজন্য সাদৃশ্যালঙ্কারের উৎপত্তি—উপমা ইত্যাদি অলঙ্কার এই পর্য্যায়েই পড়ে। বিজাতীয় দুটি বস্তুর সাদৃশ্যবোধের তীব্রতার ফলে যখন অভেদ বোধ জন্মায়, তখন সৃষ্টি হয় রূপকের। এই বোধ যদি সাময়িক ও সঙ্কীর্ণ হয় তবে বাক্যালঙ্কার রূপকের উৎপত্তি হয়, আর এই বোধ যদি ব্যাপক ও একটা স্থায়ীভাবের সঙ্গে বিজড়িত হয়, তবে রূপক রচনার সৃষ্টি হয়।

কেবল অলোকসামান্য অভিজ্ঞতা নয়, সূক্ষ্ম (abstract) যে কোন ভাবের প্রকাশ কর্ত্তে গেলেই আমরা রূপকের আশ্রয় নিয়ে থাকি। 'টাকার গরম' বা 'বাক্যবাণ' প্রভৃতি রূপক যখন আমরা ব্যবহার করি, তখন আমরা একটা সুপরিচিত অথচ সূক্ষ্ম (abstract) একটা অনুভূতির কথা বলি। প্রথম প্রথম শব্দ মাত্রেই কোন না কোন স্থূল বস্তুকেই নির্দ্দেশ কর্ত্ত। সুতরাং কোন সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ কর্ত্তে হ'লে সদৃশ বস্তুর সঙ্গে তুলনা ক'রে ইঙ্গিতে রূপকের সাহায্যে তা' প্রকাশ করা হ'ত। তবে অনেক অনুভূতিই সাধারণ বলে' ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য এখন সুবিদিত হ'য়ে গেছে। এই রকম রূপক থেকেই সমস্ত ভাব ও গুণবাচক শব্দের উৎপত্তি হ'য়েছে। যেমন 'রাগ' কথাটা আমরা এখন একটা মানসিক ভাব নির্দ্দেশ করার জন্য ব্যবহার করি, কিন্তু গোড়ায় একথাটার মানে ছিল 'রঙ'। রূপক হিসেবে ব্যবহার হ'তে হ'তে এখন একথাটার তাৎপর্য্য স্থূল বস্তু ছেড়ে সূক্ষ্ম ভাবে পর্য্যবসিত হ'য়েছে।

এই ভাবে স্থূলবস্তুর গুণ অথবা কোন প্রকার সূক্ষ্ম অনুভূতি বা মনোভাব নির্দ্দেশ করার জন্যে বাক্যালঙ্কার হিসেবে রূপকের উৎপত্তি হ'য়েছে, আর রূপক-রচনার উৎপত্তি হ'য়েছে অলৌকিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে। অলৌকিক অভিজ্ঞতা সোজাসুজি প্রকাশ করার ক্ষমতা মানুষের ভাষায় নেই। পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে লোক-সামান্য পার্থিব অভিজ্ঞতা নির্দ্দেশ করার জন্যে ভাষার সৃষ্টি হ'য়েছে। কবির কথায়—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে। অবিরত রাত্রি দিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।

এই জন্যে অলৌকিক অভিজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সদৃশ সাধারণ অভিজ্ঞতার নানা কথাকেই এমন ভাবে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ বা আরোপ করে রূপকে বলা হয় যে লৌকিক থেকে অলৌকিকের দিকে একটা ইঙ্গিত তার মধ্যে ফুটে ওঠে। রূপক রচনার মূলে আছে একটা সাদৃশ্য-বোধ। অলৌকিক জগতের পদার্থ-নিচয়ের মধ্যে যে ধর্ম্ম, গুণ বা পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা উপলব্ধি করি, তারই সদৃশ গুণ বা ধর্ম্ম আমাদের লৌকিক জগতের যে যে পদার্থে বর্ত্তমান, তাই দিয়ে আমরা একটা রূপকের সৃষ্টি করি, সদৃশ ও সমধর্ম্মী বলে এই নূতন সৃষ্টি অলৌকিক জগতের প্রতিভূ হ'য়ে দাঁড়ায় এবং তার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতের প্রভাবে আমাদের মন—

"যায় চলি মর্ত্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ।"

রূপকের রচনা মানব-সাহিত্যের আদি কাল থেকেই চলে আসছে। উপনিষদের ঋষি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্পর্ক বুঝাবার জন্যে বলেছেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।

(মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।১)

'দুই সুন্দর পক্ষী একত্র সংযুক্ত হইয়া এক বৃক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল আহার করিতেছে, অপরটি অনশনে থাকিয়া তাহা দেখিতেছে।' রূপকের এটা সুন্দর উদাহরণ।

খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রেও রূপকের ব্যবহার যথেষ্ট আছে। Song of songs রূপক হিসেবে গৃহীত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক, তথা যীশুখৃষ্টের সঙ্গে মানবাত্মার সম্পর্ক বোঝান হয়েছে রূপক সৃষ্টি করে। এই রূপকে ভগবান্ বা যীশুকে বলা হয়েছে প্রেমাস্পদ পুরুষ, আর ভক্ত বা মানবাত্মাকে বলা হয়েছে প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নারী। Song of songs ছাড়াও New testamentএ অনেক জায়গাতেই ভগবান্ ও ভক্তের সম্বন্ধ বর ও বধূর রূপকের দ্বারা প্রকাশ করা হ'য়েছে। বোধহয় এই রূপক রচনার প্রেরণা Bibleএ থাকার জন্তেই আগেকার দিনে সমগ্র ইউরোপেই রূপক সাহিত্য যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হ'য়েছিল। Everyman প্রভৃতির ন্যায় রূপক নাট্য, Faerie queeneর ন্যায় রূপক কাব্য, Pilgrim's Progressর ন্যায় রূপক কাহিনী বহু প্রচলিত হয়েছিল।

আমাদের দেশেও রূপক রচনার অসদ্ভাব ছিল না। ভারতীয় সাধনার তত্ত্ব রূপকের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা হ'ত। বাঙ্‌লা ভাষার প্রাচীনতম কবিতা—

"কায়া তরুবর পঞ্চ বি ডাল
বঞ্চল চীএ পইঠো কাল—"
"কার্য্য ণাবড়ি খাণ্টি মন কেড়ুবাল
সদ্‌ গুরু বঅনে ধর পতবাল।"
"ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বহি
দু আন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গরই।
পারগামি লো অ নিভর তরই॥"—ইত্যাদি
রূপক রচনা।

সুপরিচিত বাউল সঙ্গীত—

খাঁচার মাঝে অচিন পাখী কম্‌নে আসে যায়।
ইচ্ছা করে মনোবেড়ি দিতাম তাহার পায়॥

রূপক সঙ্গীতের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। রামপ্রসাদের "মনরে কৃষি কাজ জান না, এমন মানব-জমিন রইল পতিত আবাদ কল্লে ফলতো সোনা॥" "আয় মন, বেড়াতে যাবি। কালীকল্পতরু-তলে গিয়া চারি ফল, কুড়ায়ে খাবি" ইত্যাদি সঙ্গীতও রূপকের উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের "দুই পাখী"ও রূপক। গীতাঞ্জলির "ঐরে তরী দিল খুলে" রূপক সঙ্গীত। আধুনিক কালে রচিত "আত্মদর্শন" একটি উল্লেখযোগ্য রূপক নাট্য।

রূপক রচনার কয়েকটি লক্ষণ মনে রাখা দরকার। রূপকের মধ্যে দুটো জগতের সন্ধান থাকে। একটা লৌকিক, সেটা প্রত্যক্ষ, আর একটা অলৌকিক, সেটা পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ লৌকিক জগৎটা অপ্রত্যক্ষ অলৌকিক জগতের—আরও শুদ্ধভাবে বল্‌তে গেলে, অলৌকিক ভাব ও প্রত্যয়ের একটা সমাবেশের প্রতিবিম্ব। পদ্মিনীর প্রত্যক্ষ ছায়াটা আর অপ্রত্যক্ষ কায়াটার মধ্যে একটা রূপের ও সংস্থানের সাদৃশ্য আছে। কাজেই পদ্মিনার ছায়া দেখে তার কায়াটার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। অন্ততঃ ছায়াটার দিকে তাকালে কায়া সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা ও কল্পনা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ছায়াটা সুপরিচিত বাস্তব জগতেরই উপাদান দিয়ে তৈরী মনে হ'লেও ঠিক্ তারই একটা অংশ নয়, এরকম একটা বোধ আমাদের আছে। এটা যে কৃত্রিম, একটা পরিকল্পিত রচনা, খাঁটি বাস্তব জগতের একটা ভাঙা টুক্‌রো নয়, এরকম বোধ সহজেই হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই এর অলৌকিক তাৎপর্য্যের দিকে মন আকৃষ্ট হয়। কখনও কখনও স্পষ্ট করেই রচনার এই রূপকত্ব গুণ উল্লেখ করা হয়; আবার কখনও এই রূপকত্বের কথা মোটেই উল্লেখ করা থাকে না। অথচ রচনার ভিতর থেকে একটা সমান্তরাল অলৌকিক জগতের অবয়ব-সংস্থান ফুটে ওঠে।

(২)

এইবার প্রতীকের কথা। রূপক আর প্রতীক একই বলে অনেকে মনে করেন। "যার নাম চাল-ভাজা, তার নাম মুড়ি"—যার নাম রূপক সাহিত্য, তারই নাম প্রতীক সাহিত্য—এই রকম একটা ধারণা অনেকের আছে। কিন্তু প্রণিধান করে দেখ্‌লে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে রূপক আর প্রতীক বস্তুতঃ এক নয়।

রূপকের মূলে আছে সাদৃশ্যবোধ, আর প্রতীকের মূলে

আছে সংস্পর্শবোধ। রূপকের কারবার হচ্ছে দুটি বিভিন্ন চিন্তাক্ষেত্রের অন্তর্গত দুটি বস্তু নিয়ে, প্রতীকের কারবার হ'চ্ছে একই চিন্তাক্ষেত্রের অন্তর্গত দুটি বস্তু নিয়ে। রূপকে লক্ষ্য করা হ'চ্ছে দুটি বস্তুর সমগুণতা, আর প্রতীকে লক্ষ্য করা হ'চ্ছে দুটি বস্তুর সহচারিতা।

উদাহরণ দিলে বক্তব্যটা স্পষ্ট হবে।

শ্রীরামচন্দ্র বনে গেছেন, সিংহাসনে তাঁর স্থানে তাঁর পাদুকা অধিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্র ও পাদুকার মধ্যে কোন সাদৃশ্য কল্পনা করা হচ্ছে না, ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের জন্য পাদুকা রামচন্দ্রের প্রতীক। আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে রামচন্দ্র ও 'তাঁহার' পাদুকার প্রত্যয় আনুসঙ্গিক। এই ভাবে চিন্তা জগতে ক্রুশ খৃষ্টের প্রতীক, রূপক নয়; রাজমুকুট রাজার প্রতীক, রূপক নয়। ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা ভারতের প্রতীক—রূপক নয়। ত্রিশূল ও শালগ্রাম শিলা, মহাদেবের ও নারায়ণের প্রতীক—রূপক নয়। এইভাবে আমাদের মনে বস্তুর সঙ্গে তার প্রতীক ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সুতরাং প্রতীক সহজেই আমাদের মনে প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রত্যয় আন্‌তে পারে। বাক্যালঙ্কারের (metonymy synecdoche) সঙ্গে প্রতীকের ভাবগত ঐক্য আছে। প্রতীক বস্তুর প্রতিনিধি; রূপক বস্তুর প্রতিবিম্ব। রূপকের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক আরোপিত; প্রতীকের সঙ্গে স্বাভাবিক। বস্তুর সঙ্গে রূপকের যোগসূত্র দড়ির বাঁধ, প্রতীকের যোগসূত্র নাড়ীর টান।

প্রতীকের ব্যবহার মানুষের জীবনে বহু বিস্তৃত। হিন্দুদের পূজা-অর্চ্চনা প্রতীকের সাহায্যেই করা হয়ে থাকে। শিলা, ঘট ইত্যাদির মধ্যে আমরা ভগবানের সাদৃশ্য নয়, তার সংস্পর্শই কল্পনা ক'রে থাকি। অবশ্য পট বা মূর্ত্তি ব্যবহারের মধ্যে রূপকের প্রভাবও দেখতে পাওয়া যায়। রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টানদের Eucharist or mass. প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতীকের ব্যবহার স্পষ্ট। সেই অনুষ্ঠানের সুরা, রুটি প্রভৃতি নৈবেদ্য যীশুখৃষ্টের জীবনের একটা প্রধান ঘটনার স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত; তাই আনুষঙ্গিক ভাব ভক্তের মনে জাগিয়ে দেবার জন্যে এই সব উপকরণের ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। প্রিয়জনের একগাছি কেশ বা একতাড়া চিঠি আমরা সযত্নে রক্ষা করি প্রতীক হিসেবেই। (ক্রমশঃ)

ইতিহাস

শ্রীশান্তশীল দাশ

যুগে যুগে এল কত মহাজন জীবনের বাণী কণ্ঠে বহি'
　　বিশ্ববাসীরে শোনালো জীবন গান ;
সাধনা তাদের সফল হ'য়েছে শত দুঃসহ বেদনা সহি'
　　দিয়ে গেল তারা অমৃতের সন্ধান।
উচ্চ কণ্ঠে জানালো সবারে : মাটীর মানুষ,
　　　　তোমরা শোনো,
　　দুঃখের মাঝে নহে জীবনের শেষ,
মৃত্যুবিহীন আছে সে রাজ্য, যেথায় নাহিক দুঃখ কোনো,
　　চির সুন্দর, চির শান্তির দেশ।
তাদের বারতা দিগ্ দিগন্তে প্রচারিত হ'লো অগৌরবে,
　　মুখরিত হ'লো মাটীর এ ধরাতল ;
জেনে গেল তারা পরমানন্দে, মানুষের মাঝে সফল হ'বে
　　দীর্ঘদিনের তাদের সাধন ফল।
মহামানবের দুর্লভ দান আজিও মানুষ স্মরণ করে,
　　তাহাদের কথা হয়নি বিস্মরণ ;
তাদের স্মরণ চিহ্ন বহিছে মঠ মন্দির সাড়ম্বরে
　　দেশে দেশে আর দিকে দিকে অগণন।

ক্রুশের প্রতীক, পাদনখকণা, অস্থি-ভস্ম, কত না আর
　　মানুষ দিয়েছে সুযোগ্য সম্মান ;
তাদের স্মরণে প্রতিবৎসর কলরব ওঠে বন্দনার
　　সাজায় যতনে অর্ঘ্য মূল্যবান।
কোনো ত্রুটী নাই, শুধু এইটুকু : দীর্ঘ তপশ্চর্য্যা করি'
　　দিয়ে গেল তারা যে পথের সন্ধান,
কত শতাব্দী কেটে গেল হায়, মানুষ চলেনি সেপথ ধরি'
　　গ্রহণ করেনি অন্তরে সেই দান।
মরণের পাছে আজও তাই ছোটে, মরণের মাঝে বেঁধেছে বাসা
　　ঘুরে মরে তাই আঁধারের কারাগারে ;
ব্যর্থ হ'য়েছে সকল সাধনা, বৃথা হেথা মহামানবের আশা
　　ধরণী ভরেছে বেদনার হাহাকারে।
　　মন্দিরে জ্বলে শতদীপালোক, নানা উপচারে
　　　　পূর্ণ ডালা
　　শংখ, ঘণ্টা—সুবিপুল আয়োজন ;
শুধু নাই সেথা দেবতা, পূজারী ; বৃথা ধূপ দীপ কুসুমমালা
　　কে করিবে পূজা, করিবে কেবা গ্রহণ ?

কালের মন্দিরা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

একাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন পথে

সত্য যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে মানুষের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হয়, তখন তাহার রূপ যতই অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় হোক, তাহাকে সত্য বলিয়া চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে সহজে স্বাভাবিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার এমন একটি অসন্দিগ্ধ ভঙ্গী সত্যের আছে যে তাহাকে অস্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব।

পৃথার মুখে চিত্রক যখন নিজের পরিচয় শুনিল তখন ক্ষণেকের তরেও তাহার মনে সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মিল না। বরং তাহার অতীত জীবনের সমস্ত পূর্বসংযোগ, তাহার সর্বাঙ্গে অসি-রেখাঙ্ক, সমস্তই যেন এই নূতন পরিচয়ের সমর্থন করিল। কিন্তু তথাপি, চিরাভ্যস্ত দর্পণে নিজের মুখ দেখিতে গিয়া কেহ যদি একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ দেখিতে পায় তাহা হইলে সে যেমন চমকিয়া উঠে, চিত্রকও আদৌ নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য; পরক্ষণেই সে দৃঢ়বলে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার মস্তিষ্ক রন্ধ্রে অযুত উন্মত্ত চিন্তা ঝাঁক বাঁধিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যুৎপন্ন-মতি যোদ্ধার সবল সতর্কতার দ্বারা সে তাহার প্রতিরোধ করিয়াছিল। সঙ্কটকালে বুদ্ধিভ্রংশ হইলে সর্বনাশ।

উপরন্তু এই বাহ্য সংযমের তলে তলে তাহার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শৈশব হইতে যে বিচিত্র বাতাবরণের মধ্যে সে বর্ধিত হইয়াছে, বাঁচিয়া থাকার জৈব চেষ্টায় যে নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা তাহাকে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র দান করিয়াছিল; এই চরিত্র কঠিন, স্বার্থপরায়ণ, নীতি-বিমুখ ও সুযোগসন্ধী—ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এখন নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিবার পর তাহার নিগূঢ় অন্তর্লোকে ধীরে ধীরে একটি পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল; সে নিজেও জানিল না যে তাহার রক্তের প্রভাব—যাহা এতদিন আত্মপরিচয়ের অভাবে সুপ্ত ছিল—তাহা তাহার অর্জিত চরিত্রকে অলক্ষিতে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পৃথার মৃত্যুর পরদিন প্রাতঃকালে চিত্রক যখন রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মুখের ভাব ক্লান্ত, ঈষৎ গম্ভীর; তাহার অন্তরে যে শীততন্দ্রাচ্ছন্ন বুভুক্ষু নাগ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা কেহ জানিতে পারিল না। চারিদিকে সূর্যকরোজ্জ্বল পুরভূমি, চূর্ণবিলেপিত ভবনগুলি ইতস্তত শুভ্র বুদ্বুদ্-বিম্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্রক ভাবিতে লাগিল—আমার! আমার! এ সকলই আমার!

কিন্তু—একথা কাহাকেও বলিবার নয়। বলিলে লোকে হাসিবে, উন্মাদ বলিয়া ব্যঙ্গ করিবে। একজন সাক্ষী ছিল, সে মরিয়া গিয়াছে। সে যদি বাঁচিয়া থাকিত তাহাতেই বা কী হইত? তাহার কথাও কেহ বিশ্বাস করিত না, অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিম্বা যদি বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে পরিস্থিতি আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত; চিত্রককে বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইত না। বরং এই ভাল। শুধু সুগোপা জানিল। তাহাতে ক্ষতি নাই; সুগোপা-ভগিনী শপথ করিয়াছে কাহাকেও বলিবে না। কিছুদিন নিভৃতে চিন্তা করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। তারপর—

এদিকে লক্ষ্মণ কঞ্চুকী গত রাত্রে দুশ্চিন্তায় নিদ্রা যায় নাই। কিন্তু আজ প্রভাতে চিত্রক যখন পলায়নের কোনও চেষ্টা না করিয়া স্বেচ্ছায় রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল; তাহার মনে হইল চতুরভট্ট বৃথাই চিত্রককে সন্দেহ করিয়াছিলেন।

সে দ্বিগুণ সমাদরের সহিত চিত্রকের সেবা করিতে লাগিল।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর চিত্রক বিশ্রামের জন্য শয্যাশ্রয় করিলে কঞ্চুকী লক্ষণ বলিল—'আজ আপনাকে কিছু অধিক বিমনা দেখিতেছি। চিন্তার কোনও কারণ ঘটিয়াছে কি?'

চিত্রক বলিল—'জীবন-মৃত্যুর অচিন্তনীয় সম্ভাব্যতার কথা ভাবিতেছি। পৃথা পঁচিশ বৎসর অন্ধকূপে বন্দিনী থাকিয়াও মরিল না; যেমনি মুক্তি পাইল, সেবা-যত্ন পাইল, অমনি মরিয়া গেল। বিচিত্র নয়?'

লক্ষণ বলিল—'সত্যই বিচিত্র। মানুষের ভাগ্যে কখন কী আছে কেহই বলিতে পারে না; আজ যে রাজা, কাল সে ভিক্ষুক। এই পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে কতই যে দেখিলাম!' বলিয়া সে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

চিত্রক কঞ্চুকীকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'কঞ্চুকী মহাশয়, আপনি কতকাল এই কার্য করিতেছেন?'

'কঞ্চুকীর কার্য? তা প্রায় বিশ বছর হইল। আমার পিতা আমার পূর্বে কঞ্চুকী ছিলেন—' লক্ষণের স্বর নিম্ন হইল—'রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি হত হন। তারপর নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কয়েক বছর গেল; ক্রমে বর্তমান মহারাজ আর্য্যভাবাপন্ন হইলেন। তদবধি আমি আছি।'

'পূর্বতন রাজার কী হইল?'

'শুনিয়াছি বর্তমান মহারাজ তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন।'

'আর রাণী?'

'রাণী বিষ ভক্ষণে দেহত্যাগ করেন। তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই।'

উদ্‌গত নিশ্বাস চাপিয়া চিত্রক অবহেলাভরে প্রশ্ন করিল—'রাজপুত্রটাও নিশ্চয় মরিয়াছিল?'

'সম্ভবত মরিয়াছিল। কিন্তু তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই।'

চিত্রক আর অধিক প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না, তন্দ্রার ছলে জৃম্ভন ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

দিনটা বিরস শূন্যতার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে চিত্রক উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া ভবন হইতে বাহির হইল। কঞ্চুকী আজ আর তাহার সঙ্গ লইবার চেষ্টা করিল না, শুধু জিজ্ঞাসা করিল—'পুরীর বাহিরে যাইবেন নাকি?'

চিত্রক বলিল—'না, ভিতরেই একটু ঘুরিয়া বেড়াইব।'

সূর্য অস্ত গিয়াছে। প্রাসাদের বলভিতে কপোতগণ কলহ-কূজন করিয়া রাত্রির জন্য নিজ নিজ বিশ্রামস্থল সংগ্রহ করিতেছে। ক্রমে পূর্বদিগন্ত জ্যোতির্মণ্ডিত করিয়া চন্দ্রোদয় হইল।

পুরভূমি প্রায় জনশূন্য, কদাচিৎ দুই একজন কিঙ্কর-কিঙ্করী এক ভবন হইতে অন্য ভবনে যাতায়াত করিতেছে। চিত্রক অনায়াস-পদে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে একটি শীর্ণ সোপান অতিবাহিত করিয়া প্রাকারে উঠিল।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রাকারচক্র রৌপ্য নির্মিত অংসুলির * ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার উপর উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া চিত্রক সহসা থামিয়া গেল।

অদূরে প্রাকার কুড্যের উপর একটি নারী বসিয়া আছে। জ্যোৎস্না-কুহেলির মধ্যে শুভ্রবসনা রমণীকে তুষারীভূত জ্যোৎস্নার মতই দেখাইতেছে। চিত্রকের চিনিতে বিলম্ব হইল না—কুমারী রট্টা যশোধরা।

রট্টা অন্য মনে চন্দ্রের পানে চাহিয়া আছেন। কোন্ বহির্মুখী বৃত্তির আকর্ষণে তিনি আজ প্রাসাদ-শীর্ষের ছাদে না গিয়া একাকিনী এই প্রাকারে আসিয়া বসিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন, কিম্বা হয়তো তিনিও জানেন না। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া তিনি কী ভাবিতেছেন তাহাও বোধকরি তাঁহার সচেতন মনের অগোচর।

নিশ্বাস রোধ করিয়া চিত্রক ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ললাটে ধীরে ধীরে তিলক ফুটিয়া উঠিল; তপ্ত সূচির ন্যায় জ্বালাময় অসূয়া হৃদয় বিদ্ধ করিল। ইনি রাজনন্দিনী রট্টা—এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিশ্বরী! আর আমি—? এক ভাগ্যান্বেষী অসি-জীবী সৈনিক—

অধর দংশন করিয়া চিত্রক নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে মৃদু কণ্ঠের আহ্বান আসিল—'আর্য চিত্রক-বর্মা!'

---

* হাঁসুলি।

চিত্রক ফিরিল। রাজকুমারীর কাছে গিয়া যুক্ত করে অভিবাদন করিল, গম্ভীর মুখে বলিল—'দেবদুহিতা এখানে আছেন আমি জানিতাম না। জানিলে আসিতাম না।'

রট্টা ঈষৎ হাসিলেন; বলিলেন—'কোনও হানি হয় নাই, বরং ভালই হইয়াছে। অবরোধে একাকিনী অতিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তাই এখানে আসিয়া বসিয়াছি। আপনিও বসুন।'

চিত্রক বসিল না; কুড্যে বসিলে রাজকন্যার সহিত সমান আসনে বসা হয়; ভূমিতে বসিলে অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করা হয়। সে কুড্যের উপর বাহু রাখিয়া দাঁড়াইল; বলিল—'আপনার সুগোপা সখী বোধ করি আজ আসিতে পারেন নাই।'

'সুগোপা আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না—প্রভাতে একবার মুহূর্তের * জন্য আসিয়াছিল। আপনার কত কথা বলিল। সারারাত্রি জাগিয়া আপনি তাহার পাশে তাহাকে সাহায্য ও সাহচর্য দান করিয়াছিলেন। এমন কেহ করে না।'

'সুগোপা আর কিছু বলে নাই?'

রট্টা ঈষৎ বিস্ময়ে চক্ষু ফিরাইলেন—'আর কী বলিবে?'

'না, কিছু না—' প্রসঙ্গান্তর উত্থাপনের জন্য চিত্রক চন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিল—'আজ বোধ হয় পৌর্ণমাসী।'

'হাঁ।' রট্টাও কিয়ৎকাল চাঁদের পানে চক্ষু তুলিয়া রহিলেন—'শুনিয়াছি আর্যাবর্তের অন্যত্র আজিকার দিনে উৎসব হয়—বসন্ত ঋতুর পূজা হয়। এখানে কিছু হয় না।'

'হয় না কেন?'

'ঠিক জানিনা। পূর্বে বোধহয় হইত, এখন হূণ অধিকারের পর বন্ধ হইয়াছে। হূণদের মধ্যে বসন্ত উৎসবের প্রথা নাই। তবে বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন উৎসবের প্রথা মহারাজ পুনঃপ্রবর্তিত করিয়াছেন।'

এই সকল অলস কথাবার্তার মধ্যে চিত্রক দেখিল, রট্টা প্রাকার কুড্যের উপর এমন ভাবে বসিয়া আছেন যে তাঁহাকে একটু ঠেলিয়া দিলে কিম্বা আপনা হইতে ভারকেন্দ্র বিচলিত হইলে তিনি প্রাকারের বাহিরে বিশ হাত নীচে পড়িবেন; মৃত্যু অনিবার্য। চিত্রকের বুকের ভিতর দুষ্ট বাষ্পের মতো একটা অশান্ত উদ্বেগ পাক খাইতে লাগিল। তৃতীয় ব্যক্তি এখানে নাই; রট্টা যদি পড়িয়া যান কেহ কিছু সন্দেহ করিতে পারিবে না। যে বর্বর হূণ তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, যাহার হস্তে তাহার পিতা নৃশংসভাবে হত হইয়াছিলেন, এই যুবতী তাহারই কন্যা—

চিত্রকের চোখে জ্যোৎস্নার শুভ্রতা লোহিতাভ হইয়া উঠিল।

রট্টার কিন্তু নিজের সঙ্কটময় অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য নাই; তিনি স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে কুড্যের উপর বসিয়া আছেন। চিত্রক সহসা যেন নিজেকে ব্যঙ্গ করিয়াই হাসিয়া উঠিল; বলিল,—'রাজকুমারি, আপনি কুড্য হইতে নামিয়া বসুন। ওখান হইতে নিম্নে পড়িলে প্রাণহানির সম্ভাবনা।'

রট্টা একবার অবহেলা ভরে নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন—'ভয় নাই, আমি পড়িব না। কিন্তু আপনি হাসিলেন কেন?'

ক্ষোভে অধর দংশন করিয়া চিত্রক বলিল—'ক্ষমা করুন, আমি কৌতুকবশে হাসি নাই। আপনার নির্ভীক অপরিণামদর্শিতা—কিন্তু যাক। রাজনন্দিনি, যদি ধৃষ্টতা না হয়, একটি প্রশ্ন করিতে পারি?'

'কি প্রশ্ন?'

'আপনি হূণ-দুহিতা। আর্য জাতি অপেক্ষা হূণ জাতির প্রতি আপনার মনে নিশ্চয় পক্ষপাত আছে?'

কিছুক্ষণ নীরবে মনন করিয়া রট্টা ধীরে ধীরে বলিলেন, —'আর্য—! হূণ—! আমার মাতা আর্য ছিলেন, পিতা হূণ। আমি তবে কোন্ জাতি? জানিনা। সম্ভবত মনুষ্য জাতি।' রট্টা একটু হাসিলেন—'আর পক্ষপাত? দূত মহাশয়, এই আর্যভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের সকলের প্রতি আমার পক্ষপাত আছে। কারণ তাহাদের ছাড়া অন্য মানুষ আমি দেখি নাই।'

'সকলকে আপনি সমান বিশ্বাস করিতে পারেন?'

'পারি। যে বিশ্বাসের যোগ্য সে আর্যই হোক আর হূণই হোক, বিশ্বাস করিতে পারি।' রট্টা লঘুপদে কুড্য হইতে অবতরণ করিলেন—'এবার আমি অন্তঃপুরে ফিরিব; নহিলে আর্য লক্ষণ রুষ্ট হইবেন।'

চিত্রক বলিল—'চলুন আমি আপনার রক্ষী হইয়া যাইতেছি।'

---

* মুহূর্ত=দুই দণ্ড=৪৮ মিনিট।

'আসুন—' বলিয়া রট্টা যেন কোন্ গোপন কৌতুকে সুন্দর মুখ উদ্ভাসিত করিয়া হাসিলেন; চন্দ্রালোকে সেই হাসি তরঙ্গের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

চিত্রক ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে বলিল—'হাসিলেন কেন?'

রট্টা এবার বঙ্কিম দৃষ্টিতে চটুলতা ভরিয়া তাহার পানে চাহিলেন; মুখ টিপিয়া বলিলেন—'ও কিছু নয়। স্ত্রীলোকের হাসি-কান্নার কি কোনও অর্থ আছে?—চলুন।'

* * *

গভীর রাত্রে রট্টা শয্যা হইতে উঠিলেন। তাঁহার শয্যার শিয়রে প্রাচীরগাত্রে একটি কুটঙ্গক* ছিল, তন্মধ্যে একটি মণিময় ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি থাকিত। সিংহল দ্বীপে রচিত নীলকান্তমণির অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এই বুদ্ধমূর্তি মহারাজ রোট্ট ধর্মাদিত্য কন্যাকে উপহার দিয়াছিলেন।

শয্যা হইতে উঠিয়া রট্টা একটি দীপ জ্বালিলেন। ধ্যানাসীন বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে দীপ রাখিয়া তিনি যুক্তকরে তদ্‌গতচিত্তে দীর্ঘকাল ঐ দিব্যমূর্তির পানে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার বান্ধুলি-পুষ্পতুল্য অধর অল্প অল্প নড়িতে লাগিল। তাঁহার কুমারী হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রার্থনা তথাগতের চরণে নিবেদিত হইল তাহা কেবল তথাগত জানিলেন।

তারপর দীপ নিভাইয়া রট্টা আবার শয়ন করিলেন।

* * *

পরদিন অপরাহ্নে চষ্টন দুর্গ হইতে বার্তাবহ ফিরিয়া আসিল। মহারাজ রোট্ট ধর্মাদিত্য পত্র দিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রী চতুরানন ভট্ট চিন্তিত মনে রট্টার কাছে গেলেন।

'মহারাজের শরীর ভাল নয়, তিনি আরও কিছুকাল চষ্টন দুর্গে থাকিবেন। কিন্তু কন্যাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন বড় উতলা হইয়াছে।'

রট্টা বলিলেন—'আমি পিতার কাছে যাইব।'

চতুরানন বলিলেন—'কিন্তু—যাওয়া উচিত কিনা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।'

'যাওয়া অনুচিত কেন?'

ইতস্তত করিয়া চতুরানন বলিলেন—'কিরাত লোক ভাল নয়। সে চষ্টন দুর্গের সর্বময় কর্তা; তাহার মনে যদি কোনও কুবুদ্ধি থাকে—'

রট্টার মুখ রক্তবর্ণ হইল—'কিরূপ কুবুদ্ধি? আপনি কি সন্দেহ করেন, কিরাত পিতাকে নিজের কবলে পাইয়া এখন ছলনা দ্বারা আমাকেও কবলে আনিতে চায়?'

'কে বলিতে পারে? সাবধানের নাশ নাই।'

রট্টা সদর্পে বলিলেন—'আমি বিশ্বাস করি না। মহারাজের সহিত এরূপ ধৃষ্টতা করিবে কিরাতের এত সাহস নাই। আপনি ব্যবস্থা করুন, কাল প্রাতেই আমি চষ্টন দুর্গে যাইব। পিতৃদেবকে দেখিবার জন্য আমারও মন অস্থির হইয়াছে।'

'উত্তম।—মহারাজ মগধের দূতকেও চষ্টন দুর্গে আহ্বান করিয়াছেন।'

রট্টার চোখের উপর অদৃশ্য আবরণ নামিয়া আসিল। তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'ভাল। তিনিও আমার সঙ্গে যাইবেন। তাঁহাকে সংবাদ দিন।'

চতুর ভট্ট বলিলেন—'সঙ্গে একদল শরীর-রক্ষীও থাকিবে।—ভাল কথা, চষ্টন দুর্গের পথ দীর্ঘ ও ক্লেশ-দায়ক; পৌঁছিতে দুই দিন লাগিবে। মধ্যে এক রাত্রি পান্থশালায় কাটাইতে হইবে। দেবদুহিতার জন্য দোলার ব্যবস্থা করি?'

'না, আমি অশ্বপৃষ্ঠে যাইব।'

'দাসী কিন্নরী কেহ সঙ্গে যাইবে না?'

'না।'

রট্টার নিকট হইতে চতুরানন চিত্রকের কাছে গেলেন। চিত্রক সমস্ত কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া রহিল। তাহার বক্ষে যে অদৃশ্য তুষানল জ্বলিতেছিল তাহা সহসা লেলিহ শিখায় আলোড়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া উদাস নিস্পৃহ স্বরে বলিল—'আমি এখন আপনাদের অধীন; যাহাই বলিবেন তাহাই করিব।'

পর দিবস প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রট্টা এবং চিত্রক অশ্বারোহণে রাজপুরী হইতে বাহির হইল। এক সেনানী পাঁচজন সশস্ত্র আরোহী লইয়া সঙ্গে চলিল।

কপোতকূট নগর তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। পথে পথে গৃহ ও বিপনীর দ্বার খুলিয়াছে, নাগরিকগণ ইতস্তত

* কুলঙ্গী।

যাতায়াত করিতেছে; নাগরিকারা কলসী কক্ষে জল ভরিতে যাইতেছে; কেহবা পূজার অর্ঘ্য লইয়া দেবায়তন অভিমুখে চলিয়াছে। পথের উপর বালকবৃন্দ দল বাঁধিয়া ক্রীড়া করিতেছে। বৈদেহক স্কন্ধে পণ্য লইয়া হাঁকিতেছে—অয়ে লাজা—!

পুরুষবেশা রট্টা যখন অশ্বক্ষুর ধ্বনিতে চারিদিক সচকিত করিয়া রক্ষীসহ রাজপথ দিয়া চলিলেন, তখন জনগণ সকলে পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সগর্বে উৎফুল্ল নেত্রে দেখিল।

পণ্য পাটকের ভিতর দিয়া যাইবার সময় রট্টা দেখিলেন, চতুষ্পথের উপর একটা কিম্ভূত-কিমাকার মানুষকে ঘিরিয়া ভিড় জমিয়াছে। লোকটা রোমশ রুক্ষকেশ স্থূলকায়; অঙ্গে বস্ত্রাদি আছে কিনা ভিড়ের মধ্যে বুঝা যায় না। সে উচ্চকণ্ঠে সকলকে কী একটা কথা বলিতেছে; শুনিয়া সকলে হাসিতেছে ও রঙ্গ তামাসা করিতেছে।

রট্টা অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কে? কী বলিতেছে?'

পথচারী রাজকন্যার সম্বোধনে কৃতার্থ হইয়া হাস্যমুখে বলিল—'ও একটা গড্ডল্—বলিতেছে নাকি ও কোথাকার রাজদূত!'

চিত্রক একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই চিনিয়াছিল—শশিশেখর! সে আর সেদিকে মুখ ফিরাইল না।

রট্টা আবার অশ্বচালনা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা নগরের উত্তর দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

এইখানে শশিশেখরের কথা শেষ করা যাক। সেইদিন সন্ধ্যাকালে নগরের কোট্টপাল মন্ত্রী চতুর ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন—'একটা বিকৃতবুদ্ধি বিদেশী নগরে প্রবেশ করিয়াছে। সে বলে সে মগধের রাজদূত; কোনও এক তস্কর নাকি তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া তাহাকে দিগম্বর করিয়া মৃগয়া কাননে ছাড়িয়া দিয়াছিল।—লোকটা লতাপাতা দিয়া কোনও ক্রমে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে।'

চতুরানন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শুনিলেন।

'তারপর?'

'নগররক্ষীরা তাহাকে আমার কাছে ধরিয়া আনিয়াছিল। দেখিলাম, লোকটার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। কখনও এক কথা বলে, কখনও অন্য কথা বলে, কখনও বুদ্বুদাক্ষ হইয়া ক্রন্দন করে। তাহাকে লইয়া কি করিব বুঝিতে না পারিয়া কোর্ত ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।'

চতুর ভট্ট বলিলেন,—'বেশ করিয়াছ। গর্ভদাসটা একদিন আগে আসিতে পারিল না! এখন আর উপায় নাই। আপাতত কিছুদিন লপ্সিকা ভক্ষণ করুক, তারপর দেখা যাইবে।'

অতঃপর এ কাহিনীর সহিত শশিশেখরের আর কোনও সম্বন্ধ নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই আখ্যায়িকা শেষ হইবার পূর্বেই সে মুক্তি পাইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে আর কখনও দেশ পর্যটনে বাহির হইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

সিংহলে কলিঙ্গ উপনিবেশ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

প্রাচীন পালিগ্রন্থ মহাবংশ হইতে জানা যায় বঙ্গাধিপের ঔরসে কলিঙ্গ রাজকন্যার গর্ভে সুর্প দেবীর জন্ম হয়। তিনি যৌবনকালে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন এবং ছদ্মবেশে একটি বণিকদলে মিশিয়া মগধের দিকে পলায়ন করেন। লালের (রাঢ়ের?) জঙ্গলে একটি সিংহ (বিহারের সিংহ উপাধিক বন্যদস্যু?) তাঁহাদের আক্রমণ করে। সঙ্গীরা সর্বস্ব ফেলিয়া পলাইয়া যায়, সুর্প পলাইতে পারেন না। সিংহ তাঁহাকে নিজ গুহায় লইয়া যায়। সিংহের ঔরসে তাঁহার পুত্র সিংহবাহুর ও কন্যা সিংহশ্রীবলীর জন্ম হয়। এই সিংহবাহু রাঢ়ের অধিপতি হন। সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়-সিংহ ও মধ্যম পুত্র সুমিত্র। বিজয় তাঁহার পিতার অবাধ্য ও প্রজাপীড়ক হইয়া উঠেন। তাঁহার সঙ্গীগণও মন্দ প্রকৃতির লোক ছিল। সেজন্য প্রজারা তৃতীয়বার অভিযোগ করিলে সিংহবাহু আদেশ দেন যে, বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীদের অর্দ্ধেক মাথা মুড়াইয়া সাগরে ফেলিয়া দেওয়া হোক। এই ভাবে বিজয় ও তাঁহার অনুচরদের সাগর যাত্রা আরম্ভ হইল। তাঁহাদের সঙ্গে অন্য দুইখানি নৌকায় তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রগণও দেশছাড়া হইলেন। নাগদ্বীপে আসিয়া পুত্রগণের নৌকা লাগিল, মহেন্দ্র নামক স্থানে আসিয়া স্ত্রীগণের নৌকা লাগিল এবং সুর্পারকপত্তনে সপারিষদ বিজয়ের নৌকা লাগিল। বিজয়কে কিন্তু সুর্পারকপত্তনে টিঁকিতে দিল না। সেখান হইতে

বিতাড়িত হইয়া তিনি তাম্রপর্ণীতে আসিয়া নামিলেন। সেখানে আসিয়া বিজয় দেখিলেন কুবেণী নামক যক্ষিণী সেখানকার রাণী। এই যক্ষিণীকে বশীভূত করিয়া তিনি তাম্রপর্ণীর অধীশ্বর হন। সিংহবাহুর বংশ বলিয়া বিজয়কে সীহল (সিংহল) বলা হইত। বিজয় যেদিন তাম্রপর্ণীতে নামেন সেই দিনই (৫৩৩ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে) বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভ হয়। বিজয় পাণ্ড্য দেশের রাজার নিকট তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব জানান। পাণ্ড্যরাজ সম্মত হইয়া তাঁহার কন্যার সহিত বহু নরনারীকে তাম্রপর্ণীতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও বিজয় কোন সন্তান লাভ করিতে পারেন না। সেজন্য তিনি নিজের ভ্রাতা সুমিত্রকে আসিয়া রাজ্যভার লইতে বলেন। সুমিত্র তখন রাঢ়ের রাজা। এজন্য সুমিত্র নিজ পুত্র পাণ্ডুবাসদেবকে সিংহলে পাঠান। কিন্তু পাণ্ডুবাসদেব সিংহলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে ৩৮ বৎসর রাজ্য করিয়া (৫০৫ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে) বিজয় সিংহ তখন মারা গিয়াছিলেন। পাণ্ডুবাসদেব সিংহলে গিয়া জ্যেষ্ঠতাতের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম, সেই আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাম্রপর্ণীতে কি করিয়া বিজয় সিংহ আসিলেন। আর দেখিলাম, কি করিয়া ভারতের প্রথম উপনিবেশকারীর বংশপরিচয়ে দেশের নাম বদলাইয়া সিংহল হইল। তখন যক্ষগণের বাসভূমি ছিল সে দেশে। যক্ষরা সম্ভব মুঘল (Mongolian) জাতির লোক। তাহাদের বংশধররা ভারতেরও আদিবাসী। বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে তাঁহারা ছড়াইয়া পড়েন। বাঙলা দেশের পূর্ব্বাংশে বর্ম্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র স্ত্রী-প্রাধান্য ছিল, এখনও কিছুটা আছে। চিত্রাঙ্গদার বিবরণে তাহা জানা যায়। কাজেই সিংহলে তখন মেয়ে-রাজা ছিল শুনিয়া বিচিত্র জ্ঞান করার কিছুই নাই। কিন্তু বিজয়সিংহ ভারতীয় রমণীকেই বিবাহ করেন। তিনি সিংহলের পরপারে পাণ্ড্য দেশের রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণ করেন। পাণ্ড্য দেশকেই ক্ষত্রিয়নামী উপনিবেশ স্থান বলা হয়। স্থানটি দক্ষিণ ভারতের উপকূলে। ইহার পূর্ব্বসীমা সমুদ্র। কিন্তু মহাভারতে সিংহলের নাম আছে। মহাবংশ অপেক্ষা মহাভারত প্রাচীন। মহাভারতকে বিশ্বাস করিলে বৌদ্ধ বিবরণ মতো সিংহলের নামকরণের কাহিনী প্রভৃতি সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এখন যে মহাভারত আমরা পাই তাহাতে 'সিংহল' নামটি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। গুপ্তযুগে পুরাণ সকল পুনর্লিখিত হওয়ার সময়, বহু পুরাণে বহু কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ইহা বিশেষজ্ঞগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাভারতে সিংহল নামটি আসা ইহার অন্যতম নিদর্শন বলা যাইতে পারে। মহাভারত অতিমাত্রায় বৌদ্ধ-বিরোধী। এই বৌদ্ধ বিবরণটি নস্যাৎ করিয়া দিবার জন্য এরূপ করা হইয়াছে মনে করার হেতু আছে। ভারতের বৌদ্ধ ধারার অভিভাবকত্ব করিয়াছে এক সময় সিংহল। সেই সিংহলকে সুনজরে দেখিতেন না নিশ্চয় ব্রাহ্মণ্য ধারার বাহক মহাভারতের গৌরববর্দ্ধনকারী-গণ। বর্ণাশ্রমলোপকারী বৌদ্ধ নিধনে দেবতারাও আসেন, কাব্যগ্রন্থও আসে। মহাভারত ঐরূপ একখানি মহাকাব্য। তাহাতে বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কথা দেখিয়া ইহাও মনে করিবার হেতু আছে যে, তাহার রচনাকাল ভারতে বৌদ্ধ প্রাধান্যের পরে। বিজয়সিংহ যে সময়ে তাম্রপর্ণী দ্বীপে গেলেন, তখন সবেমাত্র বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধযুগের শুরুতেই তিনি যান। তখন মোটেই বৌদ্ধ প্রাবল্য আরম্ভ হয় নাই। মহাভারতে প্রবল বৌদ্ধ নিন্দা থাকায় তাহা প্রমাণ করে যে, বিজয়সিংহের পূর্ব্বে তাহা নিশ্চয় লেখা হয় নাই। অব্যবহিত পরেও নয়, বরং অনেক পরে।

সাম্প্রতিক উড়িষ্যার ইতিহাসে বিজয় সিংহকে উৎকলবাসী বলিয়া দাবী করা হইতেছে (Glimpses of Kalinga History by Prof. Manmothonath Daso of Balasore College)। পূর্ব্বে বাঙালী ঐতিহাসিকগণ বিজয় সিংহকে বাঙালী বলিয়াছেন।

উড়িষ্যার এই ঐতিহাসিক বলিতেছেন—এই লাল (বালাড) নামক স্থান, যেখানে বিজয় সিংহের পিতামহী সিংহ কর্ত্তৃক অপহৃত হন, তাহা বঙ্গ ও মগধের মধ্যে। সুতরাং তাহা উৎকলের কোন স্থান। কারণ বঙ্গ ও বিহারের মধ্যপথেই উৎকল প্রদেশ। কিন্তু উক্ত ঐতিহাসিক ঐ সিংহকে উৎকলবাসী বলিতেছেন না! বলিতেছেন—তিনি বিহার প্রদেশবাসী সিংহ-উপাধিধারী কোন লোক। আমরা এই ঐতিহাসিকের দেশপ্রিয়তার প্রশংসা করিলেও ঐতিহাসিকের সত্যপ্রিয়তার অভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি। যুক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে লাল—রাঢ় না হইয়া উৎকলের কোন স্থান হইলে, সেখানকার জঙ্গলে উৎকলবাসীই থাকিবে, সেখানে কোন বিহারী আসিবে কেন? আমরা বেশ বুঝিতেছি উক্ত ঐতিহাসিক বিভ্রাটে পড়িয়াছেন এই সিংহকে দেখিয়া। এই সিংহ যে পশুরাজ নয়, মানুষ সিংহ, অর্থাৎ সিংহ উপাধিধারী কোন লোক, তাহা তাঁহার মতো আমরাও স্বীকার করিতেছি। তবে এই উড়িষ্যার ঐতিহাসিক এই সিংহ মহাশয়কে বিহারী বলিলেন কেন? তাহার প্রধান কারণ উড়িষ্যার লোকের সিংহ উপাধি ছিল না, এখনও নাই। সিংহ উপাধিটি বিহারীদের প্রায় একচেটিয়া। এই বিহারী সিংহের ঔরসে যে সিংহবাহু হইলেন, তাঁহাকে বরং বাঙালী, উড়িয়া ও বিহারী মিশ্রণজাত বলা উচিত। তাঁহার পুত্রের দেহেও এই তিন দেশের রক্ত ছিল। সুতরাং উড়িষ্যার ঐতিহাসিক কোন মতেই সিংহবাহুকে উৎকলবাসী বলিতে পারেন না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে তিনি বহু ঐতিহাসিক তথ্য দুমড়াইয়াছেন, বহু কথা ঢোক গিলিয়া বলিয়াছেন। সিংহবাহু দ্বারা সিংহপুর নামক শহরটি স্থাপিত হওয়ার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। শহরটি কোথায় ছিল তাহা জানা গিয়াছে, উক্ত ঐতিহাসিক বলিতেছেন। তাঁহার মতে গঙ্গাবংশের তাম্রশাসনে লিখিত সিংহপুর ও সিংহপথ (হাতীগুম্ফায় উৎকীর্ণ স্থান) অভিন্ন। এই অনুমান কতদূর ভয়াবহ বলা যায় না।

এতকাল বাঙালী ঐতিহাসিক ও কবিগণ বিজয় সিংহকে বাঙালী বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন। তাঁহারাও সিংহপুর কোথায় তাহা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন মনে হয় না। অন্ততঃ এখন তাঁহাদের দাবী সমর্থনের জন্য তাহা করা প্রয়োজন। কারণ

উড়িষ্যা সিংহবাহুকে তাঁহাদের দেশের লোক বলিয়া টানাটানি শুরু করিয়াছেন।

বাঙালীরা সিঙ্গুরকে প্রাচীন সিংহপুর বলিয়া থাকেন। হুগলী জেলার তারকেশ্বরের রেলপথে শেওড়াফুলীর পরে তৃতীয় ষ্টেশন এই সিঙ্গুর। ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে (অজেয় ঢেকুর কাহিনীতে) লাউসেন প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে। পালরাজত্বে লাউসেন একজন বড় সেনাপতি। তিনিই কামরূপ জয় করেন।

গঙ্গাবংশের পূর্ব্ব পরিচয় আমাদের আলোচ্য বিষয়ে সাহায্য করে না। অনন্তকৃষ্ণ-চোর-গঙ্গা উৎকলের প্রথম গঙ্গাবংশীয় রাজা (১১৩২ খ্রীঃ)। কেশরী বংশের অবসানে তাঁহার শক্তি বিস্তারের বিবরণ পাওয়া যায়। ১৫৩৪ খ্রীঃ গঙ্গাবংশের অবসান হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে উড়িষ্যার ইতিহাস নামক আর একখানি পুস্তক হইতে জানিতে পারা গিয়াছে চোরগঙ্গার আদিপুরুষ দক্ষিণ রাঢ়ের লোক ছিলেন। (History of Orissa by B. C. Muzumdar)।

দক্ষিণ রাঢ় বলিতে হুগলী ও হাওড়া জেলাকে বুঝায়। উত্তর রাঢ় বলিতে (দামোদর, অজয় ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে) বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কতটাকে বুঝায়। গঙ্গাবংশীয়েরা উৎকল দখল করিলে দক্ষিণ রাঢ় পর্য্যন্ত উৎকলের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্ততঃ চৌরগঙ্গার সময় তাহাই ছিল, তা' তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের লোক হউন বা না-হউন। এইরূপে উৎকলের ও রাঢ়ের সংস্কৃতি ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে চৈতন্যদেবের তথায় অবস্থানকাল (১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) পর্য্যন্ত প্রায় অব্যাহতভাবে মিশ্রণের সুবিধা পাইয়াছিল। প্রায় বলিলাম এইজন্য যে মুসলমান-ভীতি আরম্ভ হইয়াছিল বখতিয়ার খিলিজির নবদ্বীপ বিজয়ের (১১৯৯ খ্রীঃ) পর হইতে। বখতিয়ার মগধ জয়ের পর নবদ্বীপে আসেন ১৭জন অশ্বারোহী লইয়া ইহা অবশ্য মিথ্যা ইতিহাস। এখানে তাহা লইয়া বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সামান্যভাবে কিছু বলিব। মুসলমান ঐতিহাসিকের এই বিবরণ বিলাতী ঐতিহাসিকরা সেদিনও কিন্তু সমর্থন করিয়াছেন। এখন প্রমাণিত হইয়াছে অন্ধকূপ-হত্যার মতো ইহা অসত্য কথা। মুসলমান ঐতিহাসিকের রায় লছমনিয়া, রাজা লক্ষ্মণ সেন নহেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপের পতনের হয়তো পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। রায় লছমনিয়া সেন বংশের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন অনুমান করা হইতেছে। সেন রাজাদের আসল রাজধানী তখন লক্ষ্মণাবতী (গৌড়ে) অথবা বিক্রমপুরে ছিল। যাহা হোক দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল পাঠানরা খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত জয় করিতে পারে নাই। রাজনৈতিক দিক দিয়া রাঢ় উড়িষ্যার অধীন ছিল। কতলু খাঁ উড়িষ্যা বিজয় করিলে (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীতে) তথায় পাঠান রাজত্ব স্থাপিত হয়।—প্রসঙ্গ হইতে দূরে চলিয়া আসিয়াছি জানিয়াও এইটুকু বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, পাঠান আসার মূলে সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্য প্রচারের নব আন্দোলন (Neo Brahminical revival) সম্পূর্ণ দায়ী। তাহাতে পাল আমলের ধনিক (বণিক) শ্রেণীকে সমাজে অধঃপতিত করা হইল। সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া জাতিকে অর্থশূন্য করা হইল। অর্থহীনতায় জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিল। পাঠানরা তাই বাধা পায় নাই, বিদ্রোহী সমাজ বরং তাহাকে বরণ করিয়াই আনিল।

আমরা বলিয়াছি যে, বাঙলাদেশে পাঠান রাজত্বকালেও উড়িষ্যার সীমারেখা হাওড়া জেলার ভাগীরথী তীর এবং হুগলী জেলার কিয়দংশ (আরামবাগ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং উড়িষ্যার সঙ্গে বাঙালীর যোগাযোগ, মায় ভাষার সমতা অতি দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত ছিল। মৈথিলি সমাজের ভাষার সঙ্গেও বাঙলার সমতা খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভাল-ভাবে ছিল। রঘুনাথ শিরোমণির মিথিলা গমনও মৈথিলি ভাষা এবং ভাবধারার সহিত বাঙলার নিকট সম্পর্ক ছিল প্রমাণ করে।

এইভাবে বিহার, উড়িষ্যা ও বাঙলার ভাষা ও কৃষ্টির সমতা থাকিলেও বিজয়সিংহকে লইয়া এই তিন প্রদেশ সমানভাবে টানাটানি করে নাই। তাঁহার বাঙালিত্বের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত আসিল উড়িষ্যা হইতে। কোমর বন্ধের-নিচে-আঘাত ভাবিয়া ইহা যেন বাঙালী ঐতিহাসিকগণ উপেক্ষা না করেন। প্রাদেশিকতা ঐতিহাসিকদের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে।

বিজয়সিংহের প্রায় ৩০০ বৎসর পরে বৌদ্ধ কলিঙ্গ প্রদেশের সঙ্গে বৌদ্ধ সিংহলের যোগাযোগ হয়।

উড়িষ্যা ও তাহার দক্ষিণ দিকের অনেকটা অংশকে তখন কলিঙ্গ বলা হইত।

অশোক (বিন্দুসারের পুত্র প্রসিদ্ধ ২য় অশোক) ২৫৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার উৎকল জয়ের পরের ঘটনা। তিনি নিজের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিতাকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে সিংহলে পাঠান। অশোকের সময়ে ভারত ও সিংহলে বিশেষ সদ্ভাব স্থাপিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থও সিংহলে যায়। সুতরাং পালিভাষার পঠন-পাঠনও সিংহলে আরম্ভ হয়।

কলিঙ্গ দেশের পরপারেই সিংহল।

অশোকের প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকগণ সিংহলে গেলে, সিংহলরাজ তাঁহার বিনিময়ে অশোকের নিকট বহুপ্রকার উপঢৌকনাদি সহ নিজ অমাত্যদের পাঠান। এই সিংহলবাসীরা ফিরিবার সময় অশোক, তাঁহাদের বোধিবৃক্ষের একটি শাখা প্রদান করেন। ঐ শাখাটি সিংহলরাজ অতি শ্রদ্ধার সহিত নিজের অনুরাধাপুরের উদ্যানে রোপণ করেন। সিংহলে যাতায়াতকালে কোন্ বন্দর ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা জানা যায় না। তবে তাহা বাঙলার কোন বন্দর এরূপ কেহই দাবী করেন নাই। এজন্য তাহা কলিঙ্গের কোন বন্দর এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতি ছিল উত্তর ভারতে। অশোকের সময় তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল কি-না ঠিক বলা যায় না। তবে সেখানে একটি বিরাট অশোকস্তম্ভ ছিল। ৫ম খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান, তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে জলযানে

সিংহলে যান। ৬৩৫ খ্রীঃ অপর একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েন্থসাং এই বন্দরে একটি বৌদ্ধ মঠ ও ২০০ হাত উচ্চ একটি অশোক স্তম্ভ দেখেন। এই বন্দর হইতে বড় বড় অর্ণবপোতে রেশমী কাপড় ও রেশম সমুদ্রপারে রপ্তানি হইত তিনি তাহারও বিবরণ দিয়াছেন। এই বন্দর হইতেই সিংহলের রাজা মেঘবর্ণের সময় (৩৫২—৩৭৯ খ্রীঃ) বৌদ্ধ-ভারতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বুদ্ধদন্ত ভারত হইতে সিংহলে স্থানান্তরিত হয়। কলিঙ্গের রাজা বৌদ্ধ গুহশিব যখন হিন্দুরাজা সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় ভয়ে ভীত, তখন নিজ কন্যা হেমলতা ও জামাতা দন্তকুমারের দ্বারা তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতেই বুদ্ধদন্ত সিংহল-রাজের নিকট পাঠান, এইরূপ জানা যায়। কলিঙ্গরাজকন্যার সহিত নিশ্চয় একদল দেহরক্ষী ও পরিচারক সিংহল যাত্রা করে। তাঁহারা সকলেই সিংহলে বসতি স্থাপন করেন। কারণ তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের কথা কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে নাই। সিংহলের অন্যতম প্রধান নগর কান্দিতে একটি মন্দির মধ্যে এই বুদ্ধ দন্তটি রক্ষিত হইতেছে। প্রতিবৎসর আগষ্ট মাসে কান্দির দন্তোৎসব আষাঢ়-মাসে পুরীর রথযাত্রা উৎসবের অনুরূপ। কান্দির উৎসব ১৪ দিন ব্যাপী চলে। ইউরোপীয়রা বলিতেছেন, কান্দির এই বুদ্ধ দন্তটি মনুষ্যদন্ত নয়, তাহা কুম্ভীর দন্ত। সিংহল ও ভারতের বিশেষজ্ঞদের এই কথা খণ্ডন করা প্রয়োজন।

এখন সমুদ্রের গতি বদলাইয়া গিয়াছে। তাম্রলিপ্তকে (তমলুক) আমরা রূপনারায়ণ নদের তীরে দেখিতে পাইতেছি।

যযাতি কেশরীর-তাম্রশাসনে (৫ম খ্রীঃ) 'লাল' জয়ের কথা আছে, উড়িষ্যার উক্ত সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক বলেন।

একজন উৎকল দেশের রাজা শত্রু ভয়ে সিংহলে গিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু-জীবন যাপন করেন জানা যায়। হয়তো উত্তর হইতে রাজা হর্ষবর্দ্ধন অথবা দক্ষিণ হইতে চালুক্যরাজ ২য় পুলকেশীর আক্রমণ ভয়ে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন (৬০৯ খ্রীঃ)।

সিংহলের রাজা ৪র্থ মহেন্দ্র একজন উৎকল কন্যার পানি গ্রহণ করেন (১০ম খ্রীঃ)। সিংহলরাজ বিজয়বাহু কলিঙ্গরাজকন্যা তিলকসুন্দরীকে বিবাহ করেন (১১শ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে)। এই সব বৈবাহিক আদানপ্রদানে সিংহলের সঙ্গে কলিঙ্গের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল।

উৎকলের বিক্রমবাহু সিংহলের সেনানায়ক ছিলেন (১২শ খ্রীঃ প্রথম পাদে)। তিনি রাজকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার ইঙ্গিতেই তখন রাজকার্য্য চলিত।

সিংহলরাজ মহান পরাক্রমবাহু (১১৫৩ খ্রীঃ) ভারতের দক্ষিণে কাবেরী নদীর উত্তরাংশেস্থিত প্রাচীন চোলরাজ্য আক্রমণ করেন। সিংহলের প্রজাদের হিতার্থে তিনি কিছু করিয়াছিলেন। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে উদ্যান ও প্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করান। তিনি নিজ কন্যাকে উৎকল রাজপুত্র নিঃশঙ্কমল্লের সহিত বিবাহ দেন। উৎকলের সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক বলেন—সিংহলের ইতিহাসে আছে যে, এই নিঃশঙ্কমল্ল উৎকলের সিংহপুরে (১১৫০ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। সিংহলের কোন্ ইতিহাসে তিনি ইহা পাইয়াছেন তাহা উক্ত ঐতিহাসিক বলেন নাই। সিংহপুর উৎকল মধ্যে অবস্থিত ছিল ইহা বলিবার তিনি যে বহুপ্রকার উদ্যম করিয়াছেন, ইহা তাহার অন্যতম।

পরাক্রমবাহুর মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় বিজয়বাহু এক বৎসর (১১৮৭ খ্রীঃ) সিংহলের রাজা ছিলেন। তাঁহার হত্যাকারীকে বধ করিয়া নিঃশঙ্কমল্ল সিংহলের রাজমুকুট ধারণ করেন। তাঁহার সময়ে (১১৮৭-১১৯৬ খ্রীঃ) সিংহলের গৌরব রবি মধ্যাহ্ন গগনে উঠে। নিঃশঙ্কমল্লের বহু অনুশাসন সিংহলের পোরনারুয়া নামক স্থানে পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি সিংহলের প্রথম রাজা বিজয়সিংহের বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। আত্মগৌরবচ্ছলে তিনি ইহা বলিলেও ইতিহাস তাহা স্বীকার করিতে পারে না। নিঃশঙ্ক তিনবার পাণ্ড্যদেশ আক্রমণ করেন। নিঃশঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বীরবাহু এক রাত্রের জন্য সিংহলের রাজা হন। সেনানায়কদের চক্রান্তে তিনি রাজদণ্ড ধারণে অক্ষম হন। কিন্তু নিঃশঙ্কের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজা সাহসমল্ল সাহস করিয়া এই সময়েও কিছুদিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সিংহলের আদিবাসী প্রকর্ম্মপাণ্ড্য তিনবৎসর কাল সিংহলের রাজদণ্ড হস্তগত করিয়া রাখেন। ১২১৫ খ্রীঃ কলিঙ্গ দেশ হইতে মঘ নামক কোন ব্যক্তি কেরল ও মালব সৈন্য নিয়া সিংহল আক্রমণ করেন। তিনি প্রকর্ম্মপাণ্ড্যকে অন্ধ করিয়া দিয়া সিংহলের সিংহাসন হস্তগত করেন। মঘ, গোঁড়া বর্ণাশ্রমী হিন্দু ছিলেন। তিনি সিংহলের বৌদ্ধাচার প্রায় উৎসাদিত করিয়া দেন। বৌদ্ধ সিংহলীরা তখন দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে থাকে। তিনি ঐ সব বৌদ্ধদের পরিত্যক্ত বাসভবন, কৃষিক্ষেত্রাদি নিজ অনুগামী হিন্দুদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। এই ভাবে তাঁহার আনীত শতসহস্র কেরল ও মালববাসী সিংহলের পাকা বাসিন্দাতে পরিণত হয়। তিনি দীর্ঘ একুশ বৎসরকাল সিংহলের একছত্র রাজা ছিলেন। তারপর দীর্ঘকাল সিংহলের সঙ্গে কলিঙ্গ-সম্পর্ক ছিন্ন ছিল। বৌদ্ধগণ বলেন, বিজয়বাহুকে না'কি চীনারা অপহরণ করে। তাঁহার রাণী দুইটি নাবালক পুত্রদের নিয়া আত্মগোপন করেন। বড়কুমার পরাক্রমবাহু সাবালক হইয়া বুদ্ধদন্তের মন্দির নির্ম্মাণ করান। মাতা সুমিত্রা দেবীর স্মরণার্থে তিনি কলম্বোর নিকট একটি বিরাট বিহার নির্ম্মাণ করান। তাঁহার পালিতপুত্র সিংহলের নিকটবর্ত্তী জাকলা দ্বীপটি দখল করেন। তখন জাকলার অধীশ্বর নিজেকে আর্য্যচক্রবর্ত্তী ও কলিঙ্গের গঙ্গাবংশের লোক বলিতেন।

তারপর সিংহলে আসিল পর্ত্তুগীজরা (১৫০৫।১৫ই নভেম্বর)। কলিঙ্গ তথা ভারতের সঙ্গে সিংহলের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নষ্ট হইল।

আমরা কিন্তু দেখিলাম খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতক হইতে খ্রীঃ ১৫শ শতক পর্য্যন্ত—দীর্ঘ দুই হাজার বৎসর সিংহলে কলিঙ্গবাসীরাই প্রধানভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। যদিও নিঃসন্দেহে বলা যায় বাঙালী বিজয় সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সদলে আসিয়া সেখানে আদি

উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু তারপর এখানে বহুদিন দলে-দলে কলিঙ্গবাসীরাই আসিয়াছেন।

বাঙালী এইভাবে তাহার ভাবধারা নিয়া গিয়াছেন বহু স্থানে, শুধু সিংহলেই নয়। ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে একদল লোক এখনও নিজেদের বাঙালী বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের মহিলারা কপালে সিন্দুর ব্যবহার করেন। বাঙালীর মতো হুলুধ্বনি দেন মাঙ্গলিক কাজে, যাহা বাঙালী মহিলার বৈশিষ্ট্য। গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণরা এখনও নিজেদের বাঙালী বলিয়া থাকেন। হিমাচল রাজ্যে, অর্থাৎ সিমলা ও পাঞ্জাবে এখনও বাঙালী সেন-রাজবংশের শাখা রাজত্ব করিতেছেন। যবদ্বীপ, ইন্দোনেসিয়া, শ্যামদেশে ও ইন্দোচীনে বাঙালী সভ্যতার ভূরি-ভূরি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। জাপানে (১০ম খ্রীঃ) বাঙলা অক্ষরে লেখা পুঁথি হরিউজী বৌদ্ধ মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। সুদূর মধ্য এমেরিকার মেকসিকো প্রদেশে 'বাঙলো' ধরণের বাড়ি পাওয়া গিয়াছে। চড়কগাছ, শিবলিঙ্গ প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। সেখানেও মেয়েদের কপালে সিন্দুরবিন্দু দিতে দেখা গিয়াছে।—এ সমস্তই বাঙালীদের সেই সব দেশে উপনিবেশের নিদর্শন। বাঙালী ঐতিহাসিককে বিশেষভাবে এই সমস্ত আদি উপনিবেশিকের তথ্য অনুসন্ধানে তৎপর হইবার অনুরোধ জানাইতেছি।

পরিশেষে উড়িষ্যার সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক (অধ্যাপক শ্রীমন্মথনাথ দাস) মহাশয়ের নিকট উপকরণ ভাগের কতকাংশের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তিনি ভারতের এই প্রদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসে বহু স্থানে আলোকপাত করিয়াছেন। সিংহলে গিয়া তিনি তাঁহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বিলাতে বিশেষজ্ঞগণের নিকট তিনি তাঁহার সম্পাদিত ইতিহাস (Glimpses of Kalinga History) পাঠাইয়াছেন শুনিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে কয়েক স্থানে আমাদের ভিন্ন মত হইলেও তাঁহার পরিশ্রমের বিশেষ প্রশংসা করিতেছি।

কোরিয়ার যুদ্ধ

ভাস্কর গুপ্ত

মাত্র অল্পকাল পূর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্টে মার্কিণ সেক্রেটারী অব ষ্টেট, মিঃ একসনের স্পেশ্যাল এ্যাসিট্যান্ট জন ফষ্টার ডিউলস্ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন: আপনারা নিঃসঙ্গ নন। আপনারা কোনদিনই নিঃসঙ্গ থাকবেন না, যতদিন আপনারা মানবের স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট রূপ নির্ধারণে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন।

কিন্তু হায়! তিনি বোধহয় সেদিন ভাবতে পারেন নি তাঁর কথাগুলি এত তাড়াতাড়ি কোথাও প্রতিক্রিয়ার রূপ নেবে। তিনি বোধহয় আজ শুধু মাত্র বিস্মিত হ'য়েছেন। কিন্তু বড় আঘাত লেগেছে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদে। সমগ্র সুদূর প্রাচ্যে এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় মার্কিণ আধিপত্য আতঙ্কিত হতে পারে। মার্কিণ ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের কথা: It's almost as if they were invading a bit of America. সুদূর-প্রাচ্যে কোরিয়া আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিবর্গের কূটনৈতিক ক্ষমতা রক্ষার ক্ষেত্র বিশেষ।

কোরিয়াকে জাপানের কবল-মুক্ত করার পর যদি সেদিন রাশিয়া ও আমেরিকা তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভার তাদের হাতেই ছেড়ে দিতো তাহ'লে দুই কোটি কোরিয়া-অধিবাসী দেশ বিভাগের দুঃসহ বিদ্বেষের হাত থেকে রক্ষা পেতো। রাশিয়া ও আমেরিকা সেদিন তাদের অধিকার ত্যাগ করে নি। তারা কোরিয়া দুইভাগে ভাগ কোরে উত্তর ও দক্ষিণে দুটি রাষ্ট্রের প্রবর্তন করে। প্রত্যেক ভারতবাসী এই 'বিভাগ'-এর ব্যথা সহজেই অনুমান করতে পারে।—যেন একটি মানুষকে কেটে দু'ভাগ করা হোলো—উত্তরে থাকলো শিল্প, দক্ষিণে কৃষি। দুই অংশে যে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হোলো, তার একটি (উত্তরে) রাশিয়া প্রবর্তিত সমাজতন্ত্র, অপরটি (দক্ষিণে) মার্কিণ প্রবর্তিত গণতন্ত্র। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত নীতির আশ্রয়-সীমায় ভাগ হ'য়ে গেল একটি অখণ্ড দেশ, নির্বিরোধ একটি জাতি। আজ দুটি রাষ্ট্রে যে বিরোধের তীব্রতা প্রকাশিত হ'য়েছে তার আসল কারণ রয়ে গেছে এই খণ্ডিত স্বার্থের অন্তরালে। দৃশ্যত এটা দক্ষিণ ও উত্তর-কোরিয়ার যুদ্ধ হ'লেও বস্তুত যুদ্ধের উদ্যোক্তা একদিকে রাশিয়া, অপরদিকে আমেরিকা।

এর পূর্বে কোথাও কখনো রাশিয়া ও আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের সঙ্গে বুলেট বিনিময় করে নি। এক্ষেত্রে এটা অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কোরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়া জাপানকে যাতে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্যও প্রস্তুতি চলেছে। জাপানের তটরেখায় আত্মরক্ষাব্যূহ রচনা করতে হয়েছে আমেরিকাকে। এই প্রয়োজন প্রতিধ্বনিত হ'য়েছিলো গত বছর ১২ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক হেরল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায়: The strategic aim of United States is to turn Japan into a great Anti-Communist bastion in the pacific. বহুদিনের ঠাণ্ডা যুদ্ধ আজ উত্তপ্ত আকার ধারণ করেছে—বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই—এই যুদ্ধের পরিণতি কি বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হবে?

বৃটিশ দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাশেল বলেন—"এসিয়ায় রাশিয়া তার

অধিকার ত্যাগ করবে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে এসেই পড়েছি।"

লেকসাকসেসে নিরাপত্তা পরিষদের সভায় সকলেই একবাক্যে একটি লক্ষ্যের কথা উচ্চারণ করে। তারা বলে: to get the measure of the conflict and devise means to end it. ওরা নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা যুদ্ধ জিইয়ে রাখবার কথা বলে নি। উপরন্তু তারা পরোক্ষভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছে সুদূর প্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থকে। সেই অনুযায়ী স্বস্তি-পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবে সম্মতি ও আমেরিকার নেতৃত্বে পরিকল্পিত আক্রমণ প্রতিহত করার প্রচেষ্টায় তারা তাদের সামরিক সাহায্য দানের সদিচ্ছা প্রকাশ করেছে। আজ কোরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত কোরে কোরিয়াকে যদি কম্যুনিষ্টদের কবলমুক্ত করা যায়, তাহ'লে আমেরিকা পরবর্তী পর্যায়ে এসিয়া বাদ দিলেও অন্যত্র কম্যুনিষ্টদের অধিকার সহ্য করতে পারবে কি না, এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের উপরই নির্ভর করছে—কোরিয়ার যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণতি লাভ করবে কি না! কিন্তু আমেরিকার মনোভাব পরবর্তী পর্যায়ে কিভাবে স্থিতি লাভ করবে, কে জানে? আমেরিকার হাউস অফ্ ফরেন এ্যাফেয়ার্স কমিটির বৈঠকে কথা উঠেছিলো: We got a rattlesnake... The sooner we pound his head off the better. অনেকের আশঙ্কা, কোরিয়া যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সহজেই ইউরোপে জার্মাণীতে প্রতিফলিত হ'তে পারে। একটা ঘটনার খুব মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জার্মাণীতে ও কোরিয়াতে। কোরিয়ায় কম্যুনিষ্টরা দেশের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার অজুহাতে প্রচার চালাচ্ছিলো যে You Americans, leave us in peace to hold our own elections and have a freely elected Government.

অনুরূপ জার্মাণীতেও সম্প্রতি এই রকম ইলেকশনের প্রচার চলছে। তারা বলে: Tommy go home. Take Adenauer and Schumacher with you, Tommy go home. Leave us Germans in peace to hold our own elections and have a freely elected Government. জানিনা এর পরের অবস্থা কি! কোরিয়ায় দেখা গেছে এই উদ্দেশ্যে তিনজন কম্যুনিষ্ট দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকার তাদের গ্রেপ্তার করলে সেখানকার কম্যুনিষ্টরা আন্দোলন সুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় সীমারেখার সংঘর্ষ। যদি জার্মাণীতেও অনুরূপ ঘটনার অবতারণা হয় তাহ'লে আমেরিকা ও তার সহযোগী অন্যান্য জাতিসমূহ নিঃসন্দেহে কোরিয়াতেই যুদ্ধের পূর্ণচ্ছেদ টানতে পারবে না। ভুল থেকে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম ভস্মস্তূপে। তাই আজ আগুন ঠেলে বাইরে প্রকাশিত হ'য়ে পড়েছে। তখন যুদ্ধক্লান্ত বিজয়ী শক্তিবর্গ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হ'য়েই উঠেছিলো বেশী। একটা অখণ্ড দেশকে সেই প্রয়োজনেই বিভক্ত করতে হ'য়েছে। বিস্ময়ের কথা, সকলের সমবেত মিলিত প্রচেষ্টা এই অকৃত্রিম প্রয়োজনে সহযোগিতা করেছে। ইউ. এন. ও তারই প্রতীক হিসেবে কাজ করে এসেছে কোরিয়ায় যুদ্ধ ঘোষিত হবার পূর্বদিন পর্যন্ত। ইউ. এন. ও-র বিরুদ্ধে এ অভিযোগ মিথ্যা নয়। ইউ. এন. ও তাই অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্য সম্ভারে ছুটে গেছে কোরিয়ায়, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তাকে ছুটে বেড়াতে হবে সমগ্র বিশ্বে।

ভারতও এযুদ্ধের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারবে না। অবশ্য ভারত সরকার তাঁর নীতি ঘোষণা করেছেন—নিরপেক্ষ। আমার বিশ্বাস এটা অর্থহীন। কারণ যে নীতি যুদ্ধের প্রয়োজনের নীতির সমগোত্রীয়, তার নিরপেক্ষতা শুধু ঘোষণার সীমাতেই টিকে থাকে। আজ যে যুদ্ধের প্রয়োজন হ'য়েছে সেটা কম্যুনিজম প্রতিরোধের জন্য। ভারত বরাবরই এই কম্যুনিজম প্রতিরোধের দৃঢ়তা প্রকাশ ক'রে এসেছে। কে জানে ভারতেও সিভিল-ওয়ার বাধিবে কি না। যুদ্ধ তো এই নীতি প্রতিষ্ঠারই ভয়াবহ অভিব্যক্তি। বারট্রাণ্ড রাসেলের কথা: On religious grounds alone, India would strongly oppose communism. মিঃ রাসেল ভারতের অন্তরের কথাই বলেছেন। এক্ষেত্রে ভারতের ঘোষিত নীতি ভারতের অন্তরকে বাদ দিয়ে চলতে পারে এ ধারণা করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ঠিক ঐ কারণে ভারতের নিরপেক্ষতা ভারতীয়রা মেনে নেবে বিশ্বাস হয় না। অবশ্য ইতিহাসের গতি ইতিহাসেই তার প্রবাহ-শক্তি আহরণ করে। ভারত যাই ভাবুক, তার প্রভাবের বাইরে সে কিছুতেই যেতে পারবে না।

চাহিদা

শ্রীজ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

(১)

কলেজ-জীবনে ষোড়শী ও সুন্দরী স্বপ্নার সহিত পরিচয় হইবার সুযোগ হইয়াছিল। সে ছিল আর্টসের ছাত্রী, আমি বিজ্ঞানের। পরিচয়টা হইয়াছিল পার্কে।

পার্কে বসিয়া তাহার সহিত অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছি। দেখিয়াছি, সে জগতের দুঃখে ভীষণ বিচলিত। সে বলিত, জগতের সব দুঃখ সহ্য করা যায়, কিন্তু শরীরের দুঃখ দেখাই বড় কষ্টকর। খাবার নাই তাই কৃশদেহ, বস্ত্র নাই তাই নগ্নদেহ এবং দেহের যত্নের সামর্থ্য নাই তাই রুগ্নদেহ—এগুলি চোখে পড়িলে স্বপ্নার মুখ বেদনায় মলিন

হইয়া যাইত। হঠাৎ আলোচনা করিতে করিতে এক সময়ে মৃদু হাসি হাসিয়া বলিত—"আমার অনেক টাকা থাকলে এদের খাওয়া, পরা ও চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করে যেতাম।"

স্বপ্নার হৃদয়ের এই বেদনা-কাতর ভাবটি আমার বড় ভাল লাগিত।

(২)

চাকরি-জীবনে স্বপ্নাকে বিবাহ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। আমার চাকরি পাওয়ার জন্য স্বপ্নাকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলেও বিবাহে আমরা সুখী হইয়াছি। আমার আয় বেশী নয়, কাজেই স্বপ্না অনেক টাকা পায় নাই। তবুও প্রথম পরিচয়ের পর দীর্ঘ নয় বৎসর কাটিয়া গেলেও আমাদের প্রেম ফিকা হয় নাই।

বিবাহের পরদিন অনেক রাত্রে চৈত্রের পূর্ণ চাঁদের আলোকে দুইজনে ছোট্ট বাগানে বেড়াইতেছি। অস্ফুটে প্রণয়কূজন চলিতেছে। সে যেন এক স্বপ্নাচ্ছন্ন মোহাবস্থা! কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে স্বপ্না বলিল—"টাকা থাকলে আজ কি করতাম জানো?"

—"কি?"

—"একটা প্রকাণ্ড ফুলের বাগান—ফুলে ফুলে ভরা। কৃষ্ণচূড়ার ডালে দুটো পাশাপাশি ফুলে-ঢাকা দোলনা।—তোমার দোলনা দুলে যাচ্ছে উত্তরে, আমার যাচ্ছে দক্ষিণে,—মাঝখানে শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য তুমি আমি একত্র হচ্ছি। চৈত্রের হাওয়ায় উড়ে উড়ে আমার খোলা চুলের রাশি লাগছে তোমার গালে—তোমার সূক্ষ্ম সুগন্ধি উত্তরীয় উড়ে পড়ছে আমার চোখে-মুখে।—ঝর ঝর ক'রে ঝরে যাচ্ছে কৃষ্ণচূড়ার লাল পাপ্‌ড়ি সেই দোলায় দোলায়—নির্বাক হাসিতে জ্যোৎস্নালোকে দু'জনে শুধু দুলে চলেছি নিস্তব্ধ রাত্রিতে!"...

(৩)

ভালোবাসার জোয়ার কাটিয়া যাইবার পরে স্বপ্নাকে গৃহিণীরূপে পাওয়ার আমার সুযোগ হইয়াছিল। (মানে, তার আগে আমরা কেউ মরিনি!) ছোট্ট আমার ঘর; সে তাই নিয়াই আনন্দ করিয়া ফিরিত। এককোণে একটু লাউয়ের মাচান তোলা—বাগানটায় রকমারি ফুল লাগানো। চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের মেজে ঝকঝকে—দেয়ালে দাগ নেই।

রবিবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে খবরের কাগজ নিয়া ইজিচেয়ারে আরাম করিতেছি। স্বপ্না—মানে প্রৌঢ়া স্বপ্না—পান সাজিয়া নিজে খাইল ও আমাকে দিল। তারপর বেড্‌কভারে ফুল তুলিতে তুলিতে বলিল,—"টাকা থাকলে একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ী করতাম। যাই বলো, একতলা বাড়ী কোনো কাজের নয়। গরমের দিনে দোতলার বারান্দা আর ছাদ—সত্যি চমৎকার!" তারপর একটু থামিয়া সলজ্জ হাসিয়া বলিল—"একটা রেডিও না হ'লে—যাই বলো, গ্রামোফোন আজকাল অচল।"

(৪)

বৃদ্ধা স্বপ্নার সঙ্গেও বাঁচিয়া থাকার সুযোগ হইয়াছিল। ভগবানের অসীম দয়া। দু'জনে গাঁয়ের শিব-মন্দিরে যাই। শিবরাত্রিতে সেখানে শিবপূজা করিয়া ইংরাজী-পড়া স্বপ্নার দুই চক্ষু সত্যিকার প্রশান্তিতে ভরিয়া যায়। রাস্তায় আসিতে আসিতে বলে—"টাকা থাকলে, সত্যি, সমস্ত তীর্থগুলো দু'জনে ঘুরে আসতুম।—এমন শান্তি আসে মনে!"

(৫)

জরাতুরা, গলিত-কেশ-চর্ম-দশনা স্বপ্নার সাথে আমি আজিও বাঁচিয়া আছি। স্বপ্নার গাঁটে গাঁটে বাতের প্রকোপ, বাম অঙ্গে সাময়িক অসাড়তা এবং মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রংশ হইতেছে। স্থানীয় ডাক্তার কবিরাজ দেখাইতে ত্রুটি করি নাই। বিশেষ কিছু হয় না। তারিণী কবিরাজ বাহিরে আসিয়া বলিয়াই দিয়াছেন—"ব্যাধিটা বৃদ্ধ বয়সের—কাজেই কতটা আর হইবেক!"

ফিরিয়া স্বপ্নার শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া বসি। বলি—"কেমন লাগছে আজ?

পাশ ফিরিয়া বেদনা-বিকৃত মুখে স্বপ্না উত্তর দেয়—"আর কেমন!—এখন গেলে বাঁচি!...এসব হাতুড়ে ডাক্তার কবিরাজের কারবার!" তারপর খানিকক্ষণ থামিয়া বলে—"টাকা থাকলে কলকাতায় একবার বড় ডাক্তার দেখাতাম।"

টাকার অভাবে কলিকাতায় যাওয়া হয় নাই।

(৬)

দুই দিন পরে স্বপ্না পরলোকে যাত্রা করিয়া গিয়াছে। সেখানে টাকা আছে কিনা এবং অনেক টাকা থাকিলে কেহ কিছু করিতে চায় কিনা জানিবার সুযোগ নাই।

রাশিফল

জ্যোতি বাচস্পতি

কর্কট রাশি

যদি কর্কট আপনার জন্ম-রাশি হয় অর্থাৎ চন্দ্র যে সময়ে আকাশে কর্কট নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন সেই সময়ে যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই রকম ফল হবে—

প্রকৃতি

আপনি ভাবপ্রাণ প্রকৃতির লোক। আপনার মধ্যে মনোবেগ খুব প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনি বুদ্ধি বিবেচনার চেয়ে আবেগের দ্বারাই পরিচালিত হবেন বেশী।

আপনার মধ্যে সহানুভূতি প্রবল ব'লে, আপনি যেখানেই যান নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন এবং সামাজিক ও সদালাপী ব'লে প্রশংসা পাবেন।

পারিবারিক আবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব আপনার উপর খুব বেশী এবং অনেক সময় এই প্রভাব দিয়েই আপনার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হবে।

আপনার স্মরণশক্তি খুব প্রখর এবং অনুকরণ-স্পৃহাও আপনার মধ্যে যথেষ্ট আছে। অপরের ভাবধারা গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের মত ক'রে নেওয়ার শক্তি আছে ব'লে অনেক সময় আপনি অপরের ভাব গ্রহণ ক'রে তা নিজের বলে প্রচার করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনার মধ্যে একটা আত্মপ্রতারণার ভাব লক্ষিত হওয়া সম্ভব।

অধিকাংশ ব্যাপারে আপনি যুক্তিতর্কের চেয়ে নিজের আবেগের দ্বারাই পরিচালিত হবেন বেশী এবং প্রত্যেক বস্তুকে আপনার মনোভাবের অনুকূল যুক্তিতর্ক দিয়ে গ্রহণ বা বর্জন করতে চাইবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তার অসঙ্গতি আপনি দেখেও দেখতে চাইবেন না।

রোম্যান্টিক ব্যাপারের দিকে আপনার একটা আকর্ষণ আছে এবং সাধারণতঃ আপনি কল্পনাপ্রিয় হবেন। অনেক সময় বাস্তব কার্যক্ষেত্রেও আপনি আপনার কাল্পনিক ধারণা নিয়ে কাজ করতে অগ্রসর হবেন, যাতে করে অনেক ক্ষেত্রেই আপনার কাজ সুপ্রযুক্ত হবে না।

আপনার মধ্যে সহানুভূতি প্রবল ব'লে অপরের সুখ-দুঃখ আপনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন এবং সেইজন্য কারো উপর বিদ্বেষ প্রায়ই স্থায়ী হয় না; এমন কি ঘোর শত্রুকেও মার্জনা করতে আপনার আটকায় না।

আপনার মধ্যে পরিবর্তনপ্রিয়তা যেমন আছে, পরিবার ও গৃহস্থালির দিকে তেমনি আকর্ষণও আছে। সেইজন্য আপনি যেমন ভ্রমণ বা প্রবাস ভালবাসেন, তেমনি প্রবাসেও গৃহসুখ চান। এর আসল অর্থ হচ্ছে এই যে, আপনি সর্বত্র চান আপনার মনোভাবের অনুকূল পরিবেশ। প্রতিকূল ও সহানুভূতিশূন্য পারিপার্শ্বিক আপনার পক্ষে নিতান্ত পীড়াকর হ'য়ে ওঠে এবং সেখানে আপনি কোনমতেই স্থির থাকতে পারেন না।

একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থা আপনি মোটেই পছন্দ করেন না। সেইজন্য গৃহ হ'তে দূরে গেলেও আপনি নিজের চারপাশে একটা আত্মীয়তার গণ্ডী গ'ড়ে তুলতে চান। অপরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান না হ'লে আপনার কোনমতেই স্বস্তি আসে না। আপনার এই প্রকৃতির জন্য আপনি প্রায়ই লোকপ্রিয় হ'য়ে থাকেন এবং জনসাধারণ প্রায়ই আপনার দিকে আকৃষ্ট হয়। আপনার এই সঙ্গপ্রিয়তার জন্য, এমন কি আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপারেও আপনি নির্জন সাধনের চেয়ে স্বজনসাধনের পক্ষপাতী হবেন এবং অনেকে একসঙ্গে মিলে উপাসনা, নামকীর্তন ইত্যাদি আপনার ভাল লাগবে বেশী।

কাব্য, কলা, সঙ্গীত, চিত্র, অভিনয় ইত্যাদির দিকে আপনার একটা সহজ আকর্ষণ আছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আপনি রোম্যান্টিক ব্যাপারের দিকে আকৃষ্ট হবেন। এসব বিষয়ে আপনি আর্টের চেয়ে আপনার বৈচিত্র্য ও ভাবের প্রাবল্যই কামনা করবেন বেশী।

মোট কথা আপনার প্রকৃতির মূলসূত্র হচ্ছে ভাবপ্রবণতা। এই ভাবপ্রবণতা আপনার মধ্যে এত বেশী যে তার জন্য আপনি যে কোন ত্যাগস্বীকার করতে পারবেন। যদি তা ঠিক পথে চালিত হয়, তাহ'লে একদিকে তা যেমন আপনাকে সু-উচ্চ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দিতে পারে তেমনি বিপথে গেলে আপনাকে দুর্নীতির নিম্নতম স্তরে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে। পারিবারিক ও সামাজিক আবেষ্টনের উপর আপনার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে খুব বেশী।

অর্থভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনি সাধারণতঃ হিসাবী ও সাবধানী লোক হবেন। অপব্যয় মোটে পছন্দ করবেন না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয় ব্যয়ের খুঁটিনাটি হিসাবও রাখবেন। আপনার কাছে অর্থের বেশ একটা মূল্য আছে; তবুও এক এক সময় আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সহসা এমন বহু ব্যয় করতে পারেন যার জন্য পরে অনুতাপ করতে হবে। আর্থিক ব্যাপারে ও অর্থ উপার্জন সম্বন্ধে আপনার মাথায় নানারূপ কল্পনা উপস্থিত হবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা ঠিক কাজে পরিণত করা সম্ভব হবে না। প্রথম জীবনে আর্থিক ব্যাপারে

একটা বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। কোন কোন সময় বেহিসাবীভাবে অর্থনিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্তও হ'তে পারেন। চুরি কি প্রতারণার দ্বারা অর্থহানির আশঙ্কাও আছে।

কর্মজীবন

কর্মজীবনে আপনাকে অনেক বাধাবিঘ্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হ'তে হবে, কিন্তু ধীরভাবে অগ্রসর হ'তে পারলে আপনি তা অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। প্রথম বয়সে পারিবারিক বিপর্যয়ে আপনার উন্নতির কোন বিঘ্ন হ'তে পারে অথবা পারিবারিক স্বার্থের জন্য আপনার প্রকৃতির প্রতিকূল কাজে আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন হ'তে পারে। জীবনের শেষার্ধে আপনার খ্যাতি ও সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। কৃষিকর্ম, গৃহভূমি, পথ প্রভৃতি সংক্রান্ত কাজ এবং জলজ বা তরল পদার্থের কোন ব্যবসা আপনার প্রকৃতির অনুকূল। শিল্প, কলা, সাহিত্য ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট সবরকম কাজে আপনি বেশ পটুত্বের পরিচয় দিতে পারবেন। জীবনের একেবারে শেষের দিকে সকল বিষয়-কর্ম পরিত্যাগ করে জনহিতকর কাজে অথবা আধ্যাত্মিকতার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

পারিবারিক

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আপনার বিশেষ অসদ্ভাব থাকবে না বটে এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের কাছ থেকে আপনি সাহায্যও পেতে পারেন, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের জন্য আপনাকে অনেক ব্যয় করতে হবে এবং পারিবারিক কারণে নিজের মনোমত কর্ম নির্বাচনে বিঘ্নও উপস্থিত হ'তে পারে। কোন কোন সময় পারিবারিক ব্যাপারের জন্য আপনার কর্মহানি বা কর্মস্থানে কোনরূপ বিভ্রাট হওয়াও অসম্ভব নয়। আপনাকে মধ্যে মধ্যে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে হবে এবং কোন সময়ে গৃহের থেকে বহু দূরে বা কোন দুর্গম স্থানে বাস করতে পারেন। কিন্তু দূরে থাকলেও পারিবারিক দায়িত্ব আপনাকে অনুসরণ করবে এবং আপনাকে পরিবার সম্বন্ধে কম-বেশী চিন্তাও করতে হবে।

স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। অনেক সময় অবস্থাগতিকে আপনাকে বাধ্য হয়ে প্রীতির পাত্র থেকে দূরে থাকতে হবে। আপনি স্বভাবতঃ স্নেহপরায়ণ হ'লেও, বিবেচনার অভাবে অনেক সময় এমন কাজ করতে পারেন যা প্রীতির পাত্রের দুঃখ কষ্টের কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে। সন্তানাদির ব্যাপারেও আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। অকস্মাৎ সন্তানের সঙ্গে বিরোধ অথবা বিচ্ছেদ হওয়াও অসম্ভব নয়। শেষ বয়সে আপনি ইচ্ছা করে সন্তানাদির সংস্রব থেকে দূরে থাকতে পারেন।

বিবাহ

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন আপনার কর্মের উপর কম-বেশী প্রভাব স্থাপন করবে। আপনার বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন সাধারণের আলোচনার বিষয় হ'তে পারে, তা সে ভালর জন্যই হোক্, আর মন্দের জন্যই হোক্। সাধারণতঃ আপনি স্ত্রীর প্রতি স্নেহশীল হবেন কিন্তু আপনার কর্মের জন্য অনেক সময় তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে হবে। মোটের উপর আপনার স্ত্রী আপনার অনুগতই হবেন কিন্তু আপনার নিজের দোষে দাম্পত্যজীবনে অশান্তি সৃষ্টি হ'তে পারে। যাঁর জন্মমাস শ্রাবণ অগ্রহায়ণ মাঘ অথবা চৈত্র, কিম্বা যাঁর জন্মতিথি কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী বা ত্রয়োদশী অথবা শুক্লপক্ষের চতুর্দশী বা পূর্ণিমা, এমন কারো সঙ্গে বিবাহ হ'লে আপনার দাম্পত্যজীবন বেশ সুখকর হবে।

বন্ধুত্ব

আপনার পরিচিত খুব বিস্তৃত হবে এবং আপনার বহু বিশ্বস্ত অনুচর পরিচর থাকবে। আপনার অধীনস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে আপনি অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু পারেন যাঁরা আপনার উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করবেন। বন্ধুর জন্য কিন্তু আপনাকে কম-বেশী ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। বিশেষতঃ অধীনস্থ ব্যক্তির কোন রকম বিপদের জন্য আপনার অনেক সময় অশান্তি বা দুঃখ উপস্থিত হবে। আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হবে তাঁদের সঙ্গে যাঁদের জন্মমাস শ্রাবণ অগ্রহায়ণ অথবা চৈত্র এবং যাঁদের জন্মতিথি কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী কি ত্রয়োদশী অথবা শুক্লপক্ষের চতুর্দশী বা পূর্ণিমা।

স্বাস্থ্য

আপনার মধ্যে সংরক্ষণী শক্তি প্রবল, সুতরাং আপনি চেষ্টা করলে আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারবেন। মধ্যে মধ্যে শ্লেষ্মাজনিত পীড়া বা উদর রোগের সম্ভাবনা হ'লেও আপনি নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে রোগ দূর করতে পারবেন। আহার-বিহারে যত মিতাচার অবলম্বন করবেন আপনার স্বাস্থ্য তত ভাল থাকবে। মধ্যে মধ্যে উপবাস ও খাদ্যের মধ্যে তরল পদার্থের আধিক্য আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। জলাশয়ের নিকটে বাস, নিয়মিত স্নান প্রভৃতিও আপনার স্বাস্থ্য-বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। অনেক সময় জল-চিকিৎসায়—আপনার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে পারে। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে জলই আপনার প্রাণ।

অন্যান্য ব্যাপার

আপনার বহু ভ্রমণ হবে। অনেক সময় কোন গোপনীয় ব্যাপারের সংস্রবে আপনার ভ্রমণ হ'তে পারে। ভ্রমণের মধ্যে কোন দুর্গম প্রদেশে বা দূর বিদেশে আপনার জীবনও বিপন্ন হ'তে পারে, কিন্তু একটা অদৃশ্য দৈবশক্তি আপনাকে রক্ষা ক'রে যাবে। দূর ভ্রমণে বা বিদেশে অকস্মাৎ কিছু প্রাপ্তি হওয়াও অসম্ভব নয়।

স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ৮, ২০, ৩২, ৪৪ এই সকল বর্ষে আপনার নিজের অথবা

পরিবারের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ২, ৪, ১৪, ১৬, ২৬, ২৮, ৩৮, ৪০, ৫০ এই সকল বর্ষগুলিতে কোন আনন্দজনক অভিজ্ঞতা হ'তে পারে।

বর্ণ

আপনার প্রীতি-প্রদ ও ভাগ্যবর্দ্ধক বর্ণ হচ্ছে নীল। বিশেষতঃ ফিকে নীল, ফিরোজা প্রভৃতি আপনার বিশেষ উপযোগী। দেহ-মনের অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু সবুজরঙের ব্যবহারে বেশী উপকার পাবেন। ঘোর লাল রঙ্ ব্যবহার না করাই ভাল।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন নীলা, পান্না, ফিরোজা পাথর (Turkuyge) প্রভৃতি।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জন-কয়েকের নাম—শ্রীশ্রীরামচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, লেনিন, ফন্ হিণ্ডেনবার্গ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, এমারসন, জন্ রাস্কিন্, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, ডক্টর ভাণ্ডারকর, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বঙ্গীয় সরকার সংস্কৃত শিক্ষা সম্প্রসারণের নিমিত্ত যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তা' অল্প-বিস্তর সকলের সুবিদিত। কয়েক মাসের মধ্যে কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে কয়েকজন নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত এবং নবদ্বীপে একটি নূতন সংস্কৃত টোল সংস্থাপিত হয়েছে। ১০টি বড় টোলে মাসিক ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা এবং ৯০টি অন্যান্য টোলে মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এতদ্ভিন্ন বাৎসরিক দশ হাজার টাকা যা' পূর্ব্বে Imperial grant নামে চলতো—তাও এবার বৃত্তি হিসাবে ১২৫জন পণ্ডিতকে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব্বে পণ্ডিতমণ্ডলীকে যা' মাগ্গি-ভাতা দেওয়া হতো তার থেকে অনেক অধিকসংখ্যক পণ্ডিতমহাশয়দের মাগ্গি ভাতা দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় করপোরেশন এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড-সমূহও উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক পণ্ডিতকে সাহায্য প্রদান করবেন। সরকারের পরিকল্পনানুসারে কাশিতে সরকারী সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলে এবং আজীবন সংস্কৃতসেবী পণ্ডিতবর্গদের নিমিত্ত আজীবন-বৃত্তি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত হলে পণ্ডিতমণ্ডলীর ক্লেশের আরো লাঘব হবে সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের আরো অভিমত এই যে, যদি অর্থের সংকুলান হয় প্রতি বৎসর আরো ১০টি অধিকসংখ্যক ছোট টোল এবং ২টি অধিকসংখ্যক বড় টোলে মাসিক যথাক্রমে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ও ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা বৃত্তি প্রদান করবেন, সর্ব্বসমেত ১৪০টী ছোট এবং ৩০টী বড় টোল বৃত্তি পেতে পারে। এই পরিকল্পনার সার্থকতা প্রার্থনা করি।

আদ্য পরীক্ষায় ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক এই বিষয়ত্রয়কে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আজ আর এই বিষয়ে কারো মতদ্বৈধ নাই যে, পাঠ্যতালিকায় এই বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্তি পণ্ডিতসমাজের প্রভূত কল্যাণপ্রসূ হবে। এই সমস্ত বিষয়ব্যপদেশে সংস্কৃতের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং বর্ত্তমান জগতের নিকটতর সম্পর্ক সুসংস্থাপিত হবে এবং উত্তর জীবনে আমাদের ছাত্রসমাজ এতে বিশেষ উপকৃত হবেন।

১৯৪৭ সালে বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির সমাবর্ত্তন অভিভাষণে আমি বলেছিলাম—'আমাদের মূল লক্ষ্য বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি ও সংস্কৃত কলেজের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। বর্ত্তমানে আমরা পরীক্ষা-গ্রহণ-সমিতিই মাত্র। কিন্তু আমরা চাই সংস্কৃত সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুযায়ী ও তুলনামূলক প্রাচ্য গবেষণাদির সর্ব্বসুযোগসম্বলিত অপূর্ব্ব গবেষণা বিভাগ, গ্রন্থ-প্রকাশক বিভাগ প্রভৃতি সম্বলিত একটি পূর্ণায়তন বিশ্ববিদ্যালয়।"

সুখের বিষয় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বিচারপতি ডক্টর শ্রীবিজন-কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দসহ—

(১) শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, (২) ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, (৩) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, (৪) মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী, (৫) মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য, (৬) ডক্টর শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার দত্ত, (৭) ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে, (৮) কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক, (৯) ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, (১০) পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, (১১) ডক্টর শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, (১২) ডক্টর শ্রীস্নেহময় দত্ত, পশ্চিমবঙ্গের ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌স্‌ট্রাক্‌শন্, (১৩) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার, (১৪) অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, সম্পাদক—

যে সংস্কৃত বিদ্যোন্নয়ন সমিতি গঠিত করেন, সে সমিতিও পাঁচ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনই মৌলিক লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন।

এই সমিতির সদস্যবৃন্দের সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার বঙ্গীয়-সংস্কৃত-সমিতিকে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ এই নূতন নামে অভিহিত করে বহুল সংস্কৃতোন্নয়ন কর্ম্ম প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। যদিও বঙ্গদেশের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী ও সংস্কৃতানুরাগিবৃন্দের লক্ষীভূত এই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের দিক্ থেকে এটি যে অবশ্য শুভ সূচনা তদ্বিষয় সন্দেহের অবকাশ নাই,

তথাপি অদ্যাপি আমরা পূর্ব্বের মত পরীক্ষা গ্রহণ সমিতি এবং বর্ত্তমান সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে বৃত্তি বিতরণ সমিতি মাত্র। অবশ্য আমরা সর্ব্বথা এ আশা পোষণ করি যে, যে শিক্ষামন্ত্রী ও সভাপতি ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রোৎসাহে অল্পদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের সূচনা সম্ভবপর হয়েছে, তাদেরই সাহায্যবলে আমরা আমাদের অভীষ্টলাভে সমর্থ হব। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত আমাদের মুখ্য প্রয়োজনাবলী এই—

১। একটী স্থায়ী নিজস্ব বাসভবন। বর্ত্তমান কার্য্যালয়ের ভাড়াটে গৃহটী প্রথমতঃ এত ক্ষুদ্রাকার যে তাতে আমাদের অভিলষিত কোন কাজই চলিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই গৃহটী বিপজ্জনক এলাকায় অবস্থিত। বিশেষতঃ পণ্ডিতমণ্ডলীর যাতায়াতের পক্ষে এ অঞ্চল বিশেষভাবে অসুবিধাজনক। সেজন্য অতি শীঘ্রই এ বাসভবন পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

২। একটী গবেষণা-বিভাগ সংস্থাপন।

৩। একটী গ্রন্থাগার সংস্থাপন। পূর্ব্ববঙ্গাগত উদ্‌বাস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলী যে সমস্ত অমূল্য পুঁথি ও গ্রন্থ নিয়ে এসেছেন, সেই সমুদয়ের সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। বিশেষতঃ সরকারী বৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক যে ২২৫টী টোল পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড্ প্রভৃতি যে সমস্ত টোলের অর্থসাহায্যবিধানপূর্ব্বক সহায়তা করছেন, বঙ্গীয় সরকারও মাগ্‌গী ভাতা প্রদানপূর্ব্বক যে পাঁচশতাধিক টোলের সংরক্ষণে তৎপর হয়েছেন এই সমস্ত টোলের দরিদ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর সর্ব্ববিধ পঠন-পাঠনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত সমিতির একটী কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় স্থাপন অচিরে প্রয়োজন। পণ্ডিতমণ্ডলী অশেষ দুঃখদারিদ্র্য সত্ত্বেও যেসব গ্রন্থ বিরচিত করেছেন তৎসমূহের সংরক্ষণও এ গ্রন্থালয়ের অবশ্য লক্ষীভূত হবে।

৪। গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ স্থাপন। ১৯৪৮ সালে উদ্‌বাস্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। তদ্‌ভিন্ন আমাদের পরিষদের পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকাবলীর অধিকাংশই ছাপা নাই। এই জন্য গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ স্থাপন অবিলম্বে অত্যাবশ্যক। বলা বাহুল্য, এতে যে কেবল ছাত্র ও সংস্কৃতানুরাগিবৃন্দের উপকার সাধিত হইবে তা নয়, পরন্ত পরিষদের ভবিষ্যৎ আয়েরও একটী প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বিত হবে নিঃসন্দেহ।

৫। পরিষদের মুখপত্ররূপে সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙ্গালা ও ইংরাজী রচনাসংবলিত একটী গবেষণা পত্রিকা পরিচালনা। এই পত্রিকাই সমগ্র ভারতের সর্ব্বত্র যত চতুষ্পাঠী ও কেন্দ্র আছে সেইসব কেন্দ্রের ছাত্র অধ্যাপক ও হিতৈষিবৃন্দের মধ্যে একটী বিশিষ্ট সংযোগসূত্র সংস্থাপনের অন্যতম উপায়। তদ্ব্যতীত, সমগ্র বিশ্বে সংস্কৃত জ্ঞান সম্প্রসারণের নিমিত্ত এ পত্রিকা পরিচালনা অত্যাবশ্যক।

৬। বৃদ্ধ, অসমর্থ, অতিদুঃস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিমিত্ত একটী স্থায়ী সাহায্যভাণ্ডার সংস্থাপন। বিশেষতঃ যাঁরা সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনের নিমিত্ত প্রথিতযশাঃ, অথচ বর্ত্তমানে জীবিকার্জ্জনের উপায়বিহীন, তাঁরা যাতে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে সসম্মানে বাকী জীবন অতিবাহিত করতে পারেন তজ্জন্য তাঁদের নিয়মিত মাসিক বৃত্তি প্রদান অত্যাবশ্যক।

৭। বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে সরকারী টোল স্থাপন। কাঁথিতে অচিরে সরকারের পরিচালিত টোল স্থাপন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৮। আয়ুর্ব্বেদ, অর্থনীতি প্রভৃতি নূতন বিষয়সমূহের পরীক্ষা প্রচলন ব্যবস্থা, এবং ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, সংস্কৃত সাহিত্য ও সভ্যতার ইতিহাস বিরচনের ব্যবস্থা।

আকস্মিক বিপদে অভিভূত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত উদ্বাস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর দুঃখে আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের এই বিপৎপাতে পরিষৎ কিছুতেই উদাসীন থাকতে পারে না। ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে তৎকালীন বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির সম্পাদকের পরিকল্পনানুসারে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার উদ্বাস্ত পণ্ডিতগণের সাহায্যার্থ ত্রিশ হাজার টাকা তৎকালীন বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েসনের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাপাত্র হয়েছেন। এই পরিকল্পনার একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল—পণ্ডিত মহাশয়দের সসম্মানে অর্থার্জ্জনের ব্যবস্থা। অনুবাদ, পুঁথি নকল, প্রবন্ধ বিরচন, অভিধান সঙ্কলন প্রভৃতি শ্রেয়ঃ কার্য্যের বিনিময়ে অর্থার্জ্জন তাঁরা করেছিলেন। এই ব্যবস্থানুসারে ১৬৫জন পণ্ডিত মাসিক ৯০্ নব্বই টাকা পর্য্যন্ত আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর অবধি সাহায্যলাভ করেছিলেন। দেশ বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীও এই ব্যবস্থার প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। বর্ত্তমানেও এরূপ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক।

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব সম্পদ্ সংস্কৃত। এই সংস্কৃতই ভারতবর্ষীয় সমস্ত ভাষার জননীরূপে সর্ব্বজনবন্দ্যা। এই সংস্কৃতেই ভারত-জননীর পূর্ণ রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কৃতানুশীলনে তাই যাঁরা দত্তপ্রাণ, তাঁদের আমি স্তুতি নিবেদন করি। সংস্কৃতের অশেষ দীপ্তি মনীষীবৃন্দের চিত্ত অনুরঞ্জনপূর্ব্বক অত্যুচ্চ হিমাচল-গলে কিরীটদ্যুতিরূপে শোভা পাবে। শত শত প্রাজ্ঞ ও মনীষিগণের পদপ্রান্তে আজ আমি আমাদের পরম আশা ও আনন্দস্থল নবজাত এই সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের জন্য তাঁদের অশেষ আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে ভারতবর্ষই দেখাবে মুক্তির পথ। ভারতবর্ষের শাশ্বত শান্তি, প্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর অমৃতময়ী বাণী সমগ্র বিশ্বে আজ প্রচারিত হোক্ এবং তারি ধারক ও বাহক গীর্ব্বাণবাণীর অশেষ মহিমা দিগ্‌দিগন্তে উদ্ভাসিত হোক্।

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ২।৩।২২।২৪

অর্থাৎ "অন্য সব দেশ ভোগভূমি, ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি; তাই দেবতাদের মধ্যেও ভারতবর্ষের সম্পর্কে এই পৌরগীতি প্রচলিত আছে যে ভারতভূমি হচ্ছে স্বর্গ ও ধর্ম্মাদি অপবর্গলাভের মার্গস্বরূপ। সেই ভারতভূমিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা দেবতার চেয়েও ধন্য।"

রুসো

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

রুসোর রাজনৈতিক মত তাঁহার Social Contract-এ বিবৃত আছে। এই গ্রন্থে ভাবুকতা বেশী নাই, যুক্তিতর্ক প্রচুর আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আছে "মানুষ জন্মিয়াছে স্বাধীন, কিন্তু সর্ব্বত্রই সে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। একজন আপনাকে অন্যের প্রভু বলিয়া মনে করে, কিন্তু বস্তুতঃ সে তাহাদিগের অপেক্ষাও অধিকতর পরাধীন।" স্বাধীনতাই দৃশ্যতঃ রুসোর চিন্তার লক্ষ্য হইলেও, সাম্যই তাঁহার নিকট অধিকতর মূল্যবান ছিল এবং স্বাধীনতার বিনিময়েও তিনি সাম্য-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন।

গ্রন্থে প্রজাতন্ত্রের প্রশংসা আছে। কিন্তু প্রজাতন্ত্র বলিতে রুসো প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের মত (City State) ক্ষুদ্র রাষ্ট্রই বুঝিয়াছিলেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই রাষ্ট্রশাসনের সহিত সংযুক্ত থাকা সম্ভবপর, কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রের অসংখ্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। এই জন্য বড় বড় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রজাতন্ত্র তাঁহার মতে উপযোগী নহে। বর্ত্তমানে যাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়, রুসো সেই প্রতিনিধিমূলক শাসনকে (Representative Government) নির্ব্বাচনমূলক অভিজাত তন্ত্র (Elective aristocracy) বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ছোট ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে "প্রজাতন্ত্র"ই ভাল; মধ্যম আকারের রাষ্ট্রের পক্ষে "অভিজাত তন্ত্র" এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে রাজতন্ত্র উৎকৃষ্ট।

"নির্ব্বাচনমূলক অভিজাত তন্ত্র"ই রুসোর মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহা সকল দেশের উপযোগী নহে। যে দেশের জল বায়ু নাতিশীতোষ্ণ, যে দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, এই শাসন কেবল সেই দেশেরই উপযোগী। কোন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের অধিবাসিগণ বিলাসী হইয়া পড়ে। সমগ্র সমাজের মধ্যে বিলাসের প্রসার অপেক্ষা দেশের রাজাও তাঁহার সভাসদ্গণের মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ থাকাই মঙ্গলকর। এই মত অনুসারে পৃথিবীর বহু দেশই প্রজাতন্ত্র শাসনের উপযুক্ত নহে, যথেচ্ছাচারী রাজশাসনই তাহাদের উপযোগী। ইহা সত্ত্বেও ফরাসী গভর্ণমেন্ট যে এই গ্রন্থের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করিতেন, তাহার কারণ ইহাতে প্রজাতন্ত্রের প্রশংসা ছিল এবং রাজাদিগের "ঈশ্বর দত্ত অধিকার" (Divine Right of Kings) ইহাতে স্পষ্টতঃ অস্বীকার করা না হইলেও, "চুক্তি" হইতে রাষ্ট্রশাসনের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত দ্বারা তাহা অস্বীকৃত হইয়াছে।

মানুষের যখন সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন তাহারা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত না। প্রত্যেকেই স্বাধীন ছিল ও নিজের ইচ্ছানুসারে চলিত। কিন্তু কালক্রমে এইরূপে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব হইল না। পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি না করিয়া পরস্পরের রক্ষার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হইল। সকলের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা প্রত্যেকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়া কিরূপে প্রত্যেকের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়, ইহাই হইল তখনকার সমস্যা। "সামাজিক চুক্তি" দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। এই চুক্তি অনুসারে প্রত্যেকের যাবতীয় অধিকারসহ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজের নিকট সমর্পণ করিতে হয়; কোনও অধিকারই নিজের জন্য রাখিয়া দেওয়া চলে না। কিন্তু ইহাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষিত হইল কোথায়? ইহার উত্তরে রুসো বলিয়াছেন—"প্রত্যেকেই যদি সম্পূর্ণভাবে আপনাকে দান করে, তাহা হইলে সমাজের সকলের অবস্থাই সমান হইয়া যায়, সুতরাং এই অবস্থা কাহারও পক্ষে কষ্টকর করিয়া তুলিবার ইচ্ছা কাহারও মনে উদিত হয় না। যদি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে দান না করিয়া প্রত্যেকে কতকগুলি অধিকার রাখিয়া দিত, তাহা হইলে ফল হইত এই যে রক্ষিত অধিকারসমূহ সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিবার কেহই থাকিত না। ইহার ফলে প্রত্যেকেই আপন ইচ্ছামত আপনার অধিকারের ব্যাখ্যা করিত; সমাজ-সংহতি বিনষ্ট হইয়া যাইত, নতুবা সমাজই যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িত।" এই মতে প্রকৃত-পক্ষে ব্যক্তির কোনও অধিকারই থাকে না. সমস্ত অধিকারই রাষ্ট্রে সমর্পিত। অন্যত্র রুসো বলিয়াছেন "যদিও সামাজিক চুক্তি দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রকে পূর্ণ ক্ষমতাই প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি মানুষের স্বাভাবিক অধিকারও আছে। সার্ব্বভৌম শক্তি অধীনস্থ লোকদিগকে রাষ্ট্রের পক্ষে অনাবশ্যক কোনও শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিতে পারেন না। এরূপ করিবার ইচ্ছাই তাহার হইতে পারে না।" কিন্তু সার্ব্বভৌম শক্তিই যখন সমাজের প্রয়োজনের বিচারকর্ত্তা, তখন রাষ্ট্রের অত্যাচার ইহা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কম।

Bertrand Russel এইভাবে সামাজিক চুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন: আমাদের প্রত্যেকে তাহার দেহ ও সমস্ত ক্ষমতা সর্ব্বনিয়ন্তা (General Will) সাধারণ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থাপিত করি; এবং আমাদের সম্মিলিত অবস্থায় প্রত্যেককে সমগ্রের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গ্রহণ করি।" এই সমবায় দ্বারা একটি নৈতিক সমবায়ী অঙ্গীর সৃষ্টি হয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় এই অঙ্গীকে 'রাষ্ট্র' বলে; ক্রিয়মান অবস্থায় ইহার নাম Sovereign (সর্ব্বশক্তিমান) এবং সদৃশ অন্য সমবায়ীর সম্পর্কে ইহার নাম শক্তি (Power)। 'সাধারণ ইচ্ছা'• বলিতে রুসো সমাজের

অন্তর্গত সকল ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছার সমষ্টি বোঝেন নাই, অথবা তাহাদের অধিকাংশের ইচ্ছা বোঝেন নাই, সকলের সমবায়ে যে অঙ্গীর উদ্ভব হয়, তাহার ইচ্ছাই বুঝিয়াছেন। হবসের (Hobbs) মতে বহুর সমবায়ে গঠিত সমাজ একটি পুরুষ (Person)। এই মত গ্রহণ করিলে পুরুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই অঙ্গীর আছে। সুতরাং ইচ্ছাও আছে। কিন্তু সমবায়ী পুরুষের এই ইচ্ছার নিদর্শন কি? সাধারণ ইচ্ছা সকল সময়েই ন্যায়সঙ্গত এবং সাধারণের মঙ্গলদায়ক বলা হইয়াছে। কিন্তু "সাধারণ ইচ্ছা" ও "সকলের ইচ্ছা" এক পদার্থ নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির রাজনৈতিক মত তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু প্রত্যেক "স্বার্থের"ই দুইটি অংশ আছে। একটি ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়টি সকল ক্ষেত্রেই অভিন্ন। যদি ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পরের মধ্যে কোনও চুক্তি না হয়, তাহা হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বার্থের কাটাকাটি হইয়া যাইবে, তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না; সকল ক্ষেত্রে অভিন্ন অংশই অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অভিন্নাংশই "সাধারণ ইচ্ছা"। পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণু বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করে। আমাদের উপরস্থিত বায়ু আমাদিগকে ঊর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ করে, পদতলস্থ মৃত্তিকা নিম্নদিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই সমস্ত বিভিন্ন "স্বার্থপর" আকর্ষণ কাটাকাটি হইয়া অকার্য্যকর হইয়া পড়ে; অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীকে সমাজ বলিয়া গণ্য করিলে, তাহার কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণকে তাহার সাধারণ ইচ্ছা বলা যায়। "সাধারণ ইচ্ছা সর্ব্বদাই ন্যায়সঙ্গত"—ইহার অর্থ এই যে—এই ইচ্ছা সকল ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সামান্যের প্রতীক বলিয়া, ইহা দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সমবেত স্বার্থসিদ্ধি সম্ভবপর হয়।

Sovereignএর ইচ্ছাই "সাধারণ ইচ্ছা"। তাহা সকল সময়ই ন্যায়সঙ্গত। প্রত্যেক নাগরিকের ইচ্ছা ইহার অন্তর্গত। কিন্তু সাধারণ ইচ্ছার বিরোধী তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছাও তাহার আছে। কেহ এই ব্যক্তিগত ইচ্ছার বশে যদি সাধারণ ইচ্ছার আদেশ পালন না করে, তাহা হইলে তাহাকে তাহা পালন করিতে বাধ্য করা প্রয়োজন। রুসো বলিয়াছেন এই বাধ্য করার অর্থ—তাহাকে "স্বাধীন" হইতে বাধ্য করা।

Bertrand Russel বলেন—"এই স্বাধীন হইতে বাধ্য করার অর্থ অত্যধিক পরিমাণে দার্শনিকতাজড়িত (very metaphysical)! গ্যালিলিওর সময় কোপারনিকাসের মত সাধারণে গ্রহণ করে নাই। পৃথিবী যে সূর্য্যের চর্তুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে তাহা কেহ বিশ্বাস করিল না। তখন "সাধারণ ইচ্ছা" নিশ্চয়ই কোপারনিকাসের বিরোধী ছিল। Inquisition যখন গ্যালিলিওকে সেই মত প্রত্যাহার করিতে বলিল, তখন কি গ্যালিলিওকে স্বাধীন হইতে বাধ্য করা হইল? দুরাচার ব্যক্তিকে অপরাধের জন্য যখন কারাগারে আবদ্ধ করা হয়, তখন কি তাহাকে স্বাধীন হইতে বাধ্য করা হয়? রুসোর Romanticism দ্বারা অনুপ্রাণিত বায়রণের রচিত Corsair গ্রন্থে যে নৌ-দস্যু অতল নীল সমুদ্রের বক্ষে সমুদ্রেরই মত অসীম চিন্তা ও স্বাধীন হৃদয় লইয়া বিচরণ করিত, তাহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলে কি সে অধিকতর 'স্বাধীন' হইত? হেগেলও রুসোর মতই "স্বাধীনতা" শব্দের অপব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রের আদেশ পালন করিবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলিয়াছেন।" এই সমালোচনা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে, স্বার্থপর ইচ্ছার আবিলতা হইতে মুক্ত হওয়াকেই রুসো স্বাধীনতা বলিয়াছেন। মদ্যপ যখন পানাসক্তির দাস হইয়া পড়ে, তখন বলপ্রয়োগ দ্বারাও তাহাকে সেই অভ্যাস হইতে মুক্ত করিলে, তাহাকে যে স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর রুসোর শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকলের সম্পত্তির রাষ্ট্রই মালিক।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসনে এই "সাধারণ ইচ্ছা" বাধাপ্রাপ্ত হয় কেন, ইহার উত্তরে রুসো রাষ্ট্রের অধীনস্থ বহু সমবেত মণ্ডলীর অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত মণ্ডলীরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "সাধারণ ইচ্ছা" আছে, সেই ইচ্ছার সহিত সমগ্র সমাজের "সাধারণ ইচ্ছার" সংঘাত সম্ভবপর। এই সমস্ত নিম্নস্থ সাধারণ ইচ্ছার অস্তিত্ববশতঃ, যত লোক তত ভোট থাকে না, যত মণ্ডলী তত ভোট হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণ ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের শাসনে ব্যক্ত করিতে হইলে, রাষ্ট্রের মধ্যে অধীনস্থ মণ্ডলী গঠন নিষিদ্ধ করিতে হয় এবং প্রত্যেক নাগরিককে তাহার নিজের চিন্তা দ্বারাই চালিত হইতে হয়। লাইকারগাস প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রে তাহারই ব্যবস্থা ছিল। Machiavel এই মত পোষণ করিতেন বলিয়া রুসো লিখিয়াছেন।

এই মতের পরিণতি কোথায় বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, ইহাতে চার্চ্চ, রাজনীতি, ট্রেড ইউনিয়ন, অথবা আর্থিক স্বার্থসমতাপ্রসূত কোনও দলেরই স্থান নাই। "সামগ্রিক রাষ্ট্রে" (Totalatarian state) স্পষ্টতঃই ইহার পরিণতি। সে রাষ্ট্রে ব্যক্তির কোনও ক্ষমতাই নাই। সর্ব্ববিধ মণ্ডলী নিষিদ্ধ করা যে দুরূহ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রুসো লিখিয়াছেন, যে নিম্নস্থ মণ্ডলীগঠন নিষিদ্ধ করা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই ভাল; বহুসংখ্যক মণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরের বিরোধ বশতঃ তাহাদের কার্য্যকারিতার নাশ হইয়া যাইবে।

শাসনের বিষয় আলোচনা করিবার সময়, দেশের শাসন বিভাগ যে একটি স্বতন্ত্র স্বার্থ ও সাধারণ ইচ্ছাবিশিষ্ট মণ্ডলী, তাহা রুসো স্বীকার করিয়াছেন। বড় বড় রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু এই বিভাগকে Sovereign দ্বারা সংযত করিবার প্রয়োজনও অধিক। শাসন বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর তিনটি ইচ্ছা—নিজের ব্যক্তিগত, তাহার দলগত ও "সাধারণ" ইচ্ছা। ইহাদের মধ্যে বিরোধে রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছা সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইতে পারে না।" যখন কোনও লোক শাসকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাহার প্রজ্ঞা ও ধর্ম্মজ্ঞান অপহরণের সহায়তা করে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে

"সাধারণ ইচ্ছা সর্ব্বসময়েই বিশুদ্ধ ও অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও, তাহা দ্বারা অত্যাচারের প্রতিবিধান হয় না, সে সমস্যা অমীমাংসিতই রহিয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে রুসোর Social Contract বিশেষ কিছুই সাহায্য করে নাই।

রুসোর ধর্ম্মমত তাহার Emile প্রবন্ধ Confession of a Savoyard Vicar শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এই বিশ্বাস বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; হৃদয়ের অনুভূতি ছিল তাঁহার ভিত্তি। একবার কোনও মহিলাকে তিনি লিখিয়াছিলেন "কখনও কখনও নির্জ্জন অধ্যয়ন কক্ষে অন্ধকারের মধ্যে, অথবা দিবালোকে হস্তদ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া আমার মনে হইয়াছে ঈশ্বর নাই; কিন্তু প্রভাতে যখন উদীয়মান সূর্য্য নয়নগোচর হইয়াছে, যখন তাহার আলোকে কুজ্ঝটিকার আবরণ উন্মোচিত হইয়া প্রকৃতির দীপ্যমান বিচিত্র মূর্ত্তি দৃষ্টিসমীপে আবির্ভূত হইয়াছে, তখনই আমার অন্তরের সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে, আমার বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে, আমার ভগবানকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি।" অন্য একজনকে লিখিয়াছিলেন "অন্য সত্যে যেমন, ঈশ্বরেও তেমনি আমার প্রবল বিশ্বাস আছে। কেননা আমার বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস আমার নিজের উপর নির্ভর করে না।" এক সময়ে এক ভোজে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করায় রুসো বিরক্ত হইয়া ভোজগৃহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

দার্শনিকদিগের যুক্তিতর্কে সন্দেহ অপগত না হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় দেখিয়া রুসো দার্শনিক আলোচনা বর্জন করিয়া অন্তরের আলোকের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "আমি বুঝিতে পারিলাম আমি আছি। আমার ইন্দ্রিয়গণও আছে, যাহা দ্বারা আমি জ্ঞানলাভ করি। বাহিরের যাহা কিছু আমার ইন্দ্রিয়ে আঘাত করে, তাহাকে আমি জড় বলি। দার্শনিকদিগের পরমার্থ ও প্রত্যক্ষ (Reality or appearance) সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কের কোনও মূল্য আমার নিকট নাই। আমি বিশ্বাস করি জ্ঞানবান শক্তিশালী কোনও ইচ্ছাশক্তি কর্তৃক জগৎ শাসিত হয়। সেই শক্তিকে আমি দেখিতে পাই—"আমি অনুভব করি" বলিলেই ঠিক হয়। এই জগৎ কেহ সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা চিরকাল বর্ত্তমান আছে, একই অথবা বহু উৎস হইতে যাবতীয় কিছু দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমি জানিনা, জানিবার কোনও প্রয়োজনও আমার নাই। জড় সনাতনই হউক অথবা সৃষ্ট পদার্থ হউক, আদৌ ইহা সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় থাকিয়া থাকুক, সমগ্র জগৎ যে এক এবং একই বুদ্ধিমান পুরুষের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, তাহা নিঃসন্দেহ। এই পুরুষকেই আমি ঈশ্বর বলি। তাঁহার ইচ্ছা আছে, তিনি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তাঁহাতে করুণা আছে বলিয়াও আমি বিশ্বাস করি, করুণা তাহার বুদ্ধিশক্তিও ইচ্ছার অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহা ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আমার ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়ের নিকটই তিনি আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। আমি বেশ জানি তিনি আছেন, তিনি স্বয়ম্ভু তাহাও জানি। আমার অস্তিত্ব তাহার উপর নির্ভর করে, আমার পরিজ্ঞাত প্রত্যেক দ্রব্যই তাঁহার উপর নির্ভরশীল। সর্ব্বত্র তাঁহার কার্য্যের মধ্যে আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি, আমার অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে অনুভব করি, আমার চতুর্দ্দিকে তাহাকে দেখিতে পাই। কিন্তু যদি তাঁহার বিষয় চিন্তা করি, তিনি কোথায় আছেন অথবা তাঁহার স্বরূপ কি, যদি জানিতে চেষ্টা করি, তিনি অন্তর্হিত হন। আমার অশান্ত চিত্ত তখন কিছুই দেখিতে পায় না।"

"প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য; কিন্তু মানব জাতির মধ্যে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা। পৃথিবীর দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখনই "পাপ" (Evil) দৃষ্টিগোচর হয়।

"মানুষ স্বাধীন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সক্ষম। নিজের ইচ্ছানুসারে মানুষ কর্ম্ম করে; স্বাধীন ইচ্ছার বশে যাহা করে, তাহা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত এবং তাহা ঈশ্বরে আরোপ করা যায় না। স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া মানুষ অমঙ্গল সৃষ্টি করে, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত নহে। ঈশ্বর মানুষকে পাপ করিতে বাধাও দেন না। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে মানুষের মত ক্ষুদ্র জীবে যে অমঙ্গলের সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহা অতি সামান্য। ইহাও অসম্ভব নয় যে—এই অমঙ্গল রোধ করিতে হইলে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অমঙ্গল সৃষ্টি এবং মানুষের প্রকৃতি হীনতর করিতে হয়। পুণ্য ও পাপ, ভাল ও মন্দের মধ্যে মানুষ পুণ্যই বাছিয়া লইবে, পাপ বর্জন করিবে, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর তাহাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। মানুষ যদি তাহার বৃত্তি সকলের উপযুক্ত ব্যবহার করে, তাহা হইলেই এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের ক্ষমতা এতই সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, যে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াও মানুষ প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। মানুষ যে পাপ করে, তাহার নিজের উপরই তাহার ফল উৎপন্ন হয়। জাগতিক শৃঙ্খলার উপর তাহার কোনও ক্রিয়া নাই।

আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহারই আমাদের দুঃখের হেতু। প্রকৃতি হইতে যে সমস্ত অমঙ্গলের উদ্ভব হয়, আমাদের দোষেই আমাদিগকে তাহা ভোগ করিতে হয়। স্বকর্ম্মের ফল দুঃখকষ্ট হইতে মুক্ত হইবার উপায় মৃত্যু। প্রকৃতি কাহাকেও চিরকাল কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না।

অমঙ্গল-স্রষ্টা অন্য কাহারও আমি অনুসন্ধান করি না, মানুষ নিজেই অমঙ্গলের স্রষ্টা। জগতে সকলই মঙ্গলকর। অবিচার সেখানে নাই। সুবিচার ও মঙ্গল অবিচ্ছেদ্য সংসর্গে বদ্ধ। অসীম ক্ষমতা এবং যাবতীয় চেতন পদার্থের আত্মপ্রীতির অব্যভিচারী ফল "কল্যাণ"। সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার সৃষ্ট পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট। সৃষ্টি এবং পালন, শক্তির চিরন্তন কার্য্য। যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার উপর শক্তির কোনও ক্রিয়া নাই। * * * আপনার ক্ষতি না করিয়া তিনি ধ্বংস অথবা ক্ষতি করিতে পারেন না। যাহা মঙ্গল, কেবল তাহা ইচ্ছা করাই তাহার পক্ষে সম্ভব। সর্ব্বশক্তি মান বলিয়াই তিনি সর্ব্বমঙ্গলময় ও ন্যায়বান্।

তাহা না হইলে তাহার মধ্যে স্ব-বিরোধ উৎপন্ন হইত। যে শৃঙ্খলা-প্রীতি হইতে শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাহাই মঙ্গল, যে শৃঙ্খলা-প্রীতি দ্বারা শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়—তাহাই ন্যায় বিচার।

আত্মা যদি জড়পদার্থ না হয়, তাহা হইলে দেহের বিনাশের পরেও তাহার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়। অস্তিত্ব যে থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে পৃথিবীতে অধার্ম্মিকের জয় ও ধার্ম্মিকের প্রতি পীড়ন দৃষ্ট হয়। বিশ্বব্যাপী সামঞ্জস্যের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যা কোথায়? আমি বলিব জীবনের সমাপ্তিতেই সকল শেষ হয় না, মৃত্যুতে যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা সে প্রাপ্ত হয়।" তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দেহের যখন বিনাশ হয়, তখন আত্মার কি হয়? যখন দেহ ও আত্মার সংযোগ বিনষ্ট হয়, তখন একটির ধ্বংস হইলেও অন্যের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। দেহ ও আত্মা স্বরূপে এতই বিভিন্ন, যে তাহাদের সংযোগ স্বভাবতঃই অস্থির। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হুইবার পরে আত্মার যে শক্তি নিষ্ক্রিয় দেহকে চালনা করিতে ব্যয়িত হইত, আত্মা তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পরে আত্মার প্রকৃত জীবন আরব্ধ হয়। কিন্তু সেই জীবন কি অবিনশ্বর? তাহা আমি জানি না। সীমাবদ্ধ অসীমের ধারণা করিতে আমি অক্ষম।...কিন্তু ইহা জানি যে দেহের বিভিন্ন অংশ ব্যবহারে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় বলিয়াই দেহের বিনাশ হয়। কিন্তু চৈতন্যের এতাদৃশ বিনাশ সম্ভবপর নহে। এই অনুমান শান্তিদায়ক। যখন ইহা অসঙ্গত নহে। তখন ইহা স্বীকার করায় ভয় কি। (ক্রমশঃ)

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পোর্টব্লেয়ার সহরটি কিরূপ, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া যায় এই বলিয়া যে ইহা সমুদ্র মধ্যস্থ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ কালিম্পং সহর। ইহার গাছপালা, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট অধিকাংশই কালিম্পং সহরের ন্যায়। কালিম্পং-এর প্রশস্ত ডাকবাংলোর ন্যায় ইহার গেষ্ট হাউস, কালিম্পং সহরের বাজারের ন্যায় ইহার বাজার, কালিম্পং-এর ন্যায় ইহার অসংখ্য কাঠের বাড়ী। অধিকাংশ বাড়ীর ছাতই কাঠের, কতকগুলি সরকারী বাড়ীর ছাত করোগেট টিনের প্রস্তুত, উপরে লাল রঙ দেওয়া। এখানকার গাছপালা কালিম্পং-এরই মত, কালিম্পং-এর অসংখ্য পাইন গাছের পরিবর্ত্তে এখানে অসংখ্য নারিকেল গাছ দেখা যায়। এখানকার পথ ও মাঠের উচ্চ-নীচতা কালিম্পং সহরের মতই। এখানকার চাষ-আবাদের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোপানকৃষির (Terrace cultivation) যে ব্যবস্থা আছে, তাহা কালিম্পং-এর কৃষিক্ষেত্রের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই পোর্টব্লেয়ারই আন্দামানের একমাত্র সহর। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে Blair সাহেব এইখানেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। এইখানেই কুখ্যাত সেলুলার জেল গঠন করিয়া ইংরাজরাজ তাঁহাদের কয়েদী উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৯৪২ পর্য্যন্ত এই দ্বীপ ইংরাজের অধীনেই ছিল। ১৯৪২-এ দেখা যায় যে, এই পোর্টব্লেয়ারকে কেন্দ্র করিয়া ১০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে লোকবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ১০০ বর্গমাইলের মধ্যে ৬৩ খানি গ্রাম এবং পোর্টব্লেয়ার হইতে দক্ষিণ আন্দামানের নানা স্থানে ৭৫ মাইল পাকা রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৯৪২ হইতে সাড়ে তিন বৎসরকাল জাপানী অধিকারের সময় এবং পরেও বহু লোক উদ্বাস্তু হইয়া পলায়ন করে বা মারা যায়। ফলে পুরাতন ৬৩ খানি গ্রামের মধ্যে ২৫ খানি গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়ে। এদিকে জাপানীরা যুদ্ধের জন্য পোর্টব্লেয়ার সহর ও গ্রামগুলির উন্নতি সাধন করে। সহরের পাহাড়গুলিতে গভীর গর্ত্ত করিয়া নিম্নে নানারূপ গুদাম এবং অন্যান্য আশ্রয় স্থল প্রস্তুত করে। বর্ত্তমানে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অগম্য হইয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রের তীরে তীরে বড় বড় কংক্রীটের নিরাপদ আস্তানা করিয়া জাপানীরা তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড কামান স্থাপন করে। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে কংক্রীটের পিল্‌বক্স ইত্যাদি জাপানী কীর্ত্তিগুলি এখনও সকলেই দেখিয়া থাকে। শুনিলাম একজন বড় মার্কিনী জেনারেল যুদ্ধের পর আন্দামান দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'যুদ্ধ করিয়া এই দ্বীপ জয় করা অসম্ভব' এত সুন্দরভাবে ইহা সুরক্ষিত হইয়াছিল। জাপানী আমোলে দক্ষিণ আন্দামানে আরও ৩০ মাইল পাকা রাস্তাও নির্ম্মিত হয়। কাজেই পোর্টব্লেয়ার যে দেশের সহর, সেই দেশটির ২,১০০ বর্গমাইল এখনও বনজঙ্গল, কেবল ১০০ বর্গমাইল মাত্র লোকালয়, উহার মধ্যে ৪৮ খানি গ্রামে লোকবসতি আছে, ২৫ খানি লোকহীন পরিত্যক্ত গ্রাম, এবং ১০৫ মাইল ট্রাঙ্ক রোড জাতীয় পাকারাস্তা, একটি বন্দর ও জাপানীদের দ্বারা প্রস্তুত ও বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত একটি এরোড্রাম আছে। স্থপতিদের মতে এই বিমানক্ষেত্রকে কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে অন্ততঃ দুইলক্ষ টাকা ইহার জন্য মেরামতি খরচ করিতে হইবে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হইবার সময় ভারত সরকার এইরূপ আন্দামানকেই পাইয়াছিলেন।

পোর্টব্লেয়ার সহরে একটি হাই ইংলিশ স্কুল আছে, ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা অনুমোদিত। এখানে বর্ত্তমানে ম্যাট্রিকুলেশান পর্য্যন্ত পড়া হয়, ইন্টারমিডিয়েট পড়িবার আয়োজন সম্প্রতি করা হইতেছে। গত বৎসর ১৫ জন ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল

তন্মধ্যে ৭ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। এ ছাড়া আন্দামানের গ্রামগুলিতে সর্ব্বসমেত ১৪টি নিম্ন ও উচ্চ প্রাইমারী স্কুল আছে। হাইস্কুলের পরিচালন করেন High School Managing Committee এবং প্রাইমারী স্কুলগুলি পরিচালিত হয় The Education Advisory Committee-র দ্বারা। প্রাইমারী স্কুলগুলিতে সর্ব্বসমেত প্রায় বারশত ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। পোর্টব্লেয়ার সহরে একটি ভালো টকী সিনেমা আছে। সিনেমায় মধ্যে মধ্যে বাংলা ও ইংরাজী ছবিও দেখান হইয়া থাকে, তবে হিন্দী ছবিই অধিক হইয়া থাকে। এখানকার হাসপাতালটি সুসজ্জিত এবং হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসকও আছেন অনেক। এখানে কোন ডাক্তারকেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করিতে দেওয়া হয় না। যে কোন অসুখের জন্যই পোর্টব্লেয়ারবাসীকে হাসপাতালে যাইতেই হইবে এবং হাসপাতালই বিনাব্যয়ে ঔষধ দিবে, কাজেই এখানকার বাজারে ঔষধ বিক্রয় হয় না। সহরে টেলিফোন এবং ইলেকট্রিকের সুবন্দোবস্ত আছে। কংক্রীট ও পীচের চওড়া রাস্তা, রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, স্যানিটারী পায়খানা, ঘরে ঘরে রেডিও, গ্রামোফোন ইত্যাদি যন্ত্রের এবং ভারতের নানা প্রদেশের নানাভাষার কণ্ঠ সঙ্গীত, স্বাস্থ্যবান সুবেশ নরনারী, সাইকেল-আরোহী তরুণ বালকবৃন্দ সমস্ত মিলিয়া এখানকার আবহাওয়া বড় মনোরম। পোর্টব্লেয়ারবাসীর সান্ধ্য-বিনোদনের জন্য officer, local born, বাঙ্গালী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন ক্লাব, বৃদ্ধের ভ্রমণের জন্য সমুদ্রতীরের নির্জ্জন রাস্তা, খেলোয়াড়দের জন্য বিখ্যাত জীমখানা ক্লাব, শিকারীদের ছুটীর দিনে শিকার করিবার জন্য সহর হইতে পাঁচ-সাত-দশ মাইল দূরে হরিণের প্রাচুর্য্য এ সমস্তই আছে। জঙ্গলে সুবিধা এই যে, হিংস্র জন্তু একেবারেই নাই। সহরে আরও একটি প্রকাণ্ড সুবিধা, এখানে কোন সংবাদ-পত্র বা কোন রাজনৈতিক পার্টির অফিস নাই। মাইক্রোফোন সহযোগে কোন নেতা অথবা চিৎকার করিয়া এখানকার আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলেন না, বা খবরের কাগজ পড়িয়া লোকে উত্তেজিত হইবার সুবিধাও পায় না। এখানে সরকারী ছাপাখানা হইতে একখানা মাত্র সিকি ফুলস্ক্যাপ সাইজের দৈনিক সরকারী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। উহাতে পি-টি-আই ও ইউ-পির টেলিগ্রামগুলি এবং স্থানীয় সরকারী কোন সংবাদ থাকিলে মাত্র সেইটুকুই ছাপা হইয়া থাকে।

পোর্টব্লেয়ারের সমস্তই হিসাব করিয়া সরকারী পয়সায় গঠিত বলিয়া এখানকার ধর্ম্ম ব্যবস্থাও সেইরূপ নিক্তি মাপিয়া করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব-বর্ণিত 'রস্' দ্বীপের গির্জ্জা ছিল বড় সাহেবদের নিজেদের জন্য। সেই গির্জ্জাটির কথা বাদ দিলে এখানকার অর্থাৎ পোর্টব্লেয়ারের গির্জ্জা ছোট এবং সামান্য। সেইরূপেই এখানে একটি কালীমন্দির, একটি মসজিদ্, একটি শিখ সঙ্গৎ, একটি প্যাগোডা সরকারী অর্থে নির্ম্মিত আছে। ইহার উপর মুসলমানদের অর্থে আরও দুইটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে, হিন্দুরা একটি গোবিন্দজীর মন্দির করিয়াছেন। এখানে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক আপাতঃ দৃষ্টিতে বন্ধুত্বপূর্ণ হইলেও যতটা দেখায় ততটা নয়। পূর্ব্ববর্তী চীফ্ কমিশনার মিঃ মজিদ্ এখানে সাম্প্রদায়িকতার বৃক্ষে আলোভাবেই জলসেচন করিয়াছিলেন এবং ভারত বিভক্ত হইবার পর হইতে যে দেড়-বৎসরকাল তিনি ভারত সরকারের অধীনে আন্দামানের চীফ্ কমিশনার রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই তিনি ভারতসরকারের নিযুক্ত ও কলিকাতায় অবস্থিত মুসলমান Liason officer 'রিজ্‌ভি' সাহেবের সাহায্যে আন্দামানে বহু মুসলমান আমদানী করিয়া তলে তলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, আরও কিছুদিন এইরূপে চলিলে আন্দামান মুসলমান-প্রধান দ্বীপে পরিণত হইত এবং একবার মুসলমান প্রধান হইয়া পড়িলে তখন এই সুন্দর শস্যশ্যামল এবং নৌ ও বিমান ঘাঁটী গঠনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত দ্বীপটি যে কাশ্মীরের অবস্থা প্রাপ্ত হইত বা খোলাখুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত, এই আশঙ্কা অনেকেই করেন। যাহা হউক বর্ত্তমানে হিন্দু মুসলমানের বাহ্যিক মিলন দেখা যায়। আমরা দেখিলাম হিন্দুর দুর্গোৎসব ব্যাপারে মুসলমানগণ আনন্দ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছে। এখানকার ইঞ্জিনীয়ার ও সরকারী Harbour Master শ্রীমিহির সান্ন্যালের বাংলো সংলগ্ন ভূমিতে এখানকার সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। শুনিলাম যে, মুসলমানগণও এই উৎসবের আনন্দপর্ব্বে হিন্দুর সহিত একত্রেই যোগদান করে।

পোর্টব্লেয়ারের বাজার অঞ্চলটি সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বাজারে অনেকগুলি দোকান আছে। কাপড়ের ও দর্জ্জির দোকান, জুতার দোকান, বাটা কোম্পানী, মনোহারী দোকান, রুটী, বিস্কুট, লজেঞ্জুসের দোকান, মুদিখানা, সোডা লেমনেডের ছোট কারখানা, বরফ কল, নানা-বিধ মাদ্রাজী খাবারের দোকান, ভাতের হোটেল, পান সিগারেটের ছোট ছোট দোকান, নারিকেল, কলা, পেঁপে ইত্যাদি স্থানীয় ফল এবং আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, আপেল ইত্যাদি আমদানী-করা ফলের দোকান, ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, রেডিও, গ্রামোফন প্রভৃতির দোকান ও মেরামতের কারবার অনেক গুলি আছে। যুদ্ধের সময় হইতে আটা, চাউল ও চিনির বরাদ্দ ব্যবস্থা বা রেশন কার্ডের বন্দোবস্ত চলিতেছে। রাস্তার উপর এই সমস্ত দোকান এবং এই দোকানগুলির পিছনে কাঁচা বাজারের দোকান। বাজার সকাল বিকাল সব সময়েই হয়। শাক, আলু, কপি, কুমড়া ইত্যাদি সমস্তই পাওয়া যায়, তবে আলু এখানে তেমন উৎপন্ন হয় না, অধি-কাংশই কলিকাতা এবং মাদ্রাজ হইতে চালান আসিয়া থাকে। ডিম, কাঁকড়া এবং মাংস সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, এ ছাড়া সমুদ্রের নানাজাতীয় মাছও আছে। ভোজনবিলাসিরা সকালে সমুদ্রের ধারে আসিয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ সংগ্রহ করেন, বাজারেও টাটকা এবং শুটকী মাছ বিক্রয় হয়। পোর্টব্লেয়ারে মাত্র ৭২ জন রেজেষ্ট্রীকৃত ধীবর আছে, তবে এ ছাড়াও বহু লোকেই মাছ ধরে। পোর্টব্লেয়ারে আর একটি জিনিষ দেখিলাম, উহার ইংরাজী নাম "edible bird's nest", অর্থাৎ ভোজন-যোগ্য পাখীর বাসা। উহার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এই যে, একজাতীয় সামুদ্রিক পাখী আছে যাহারা সমুদ্রের জলের ধারে পাথরের মধ্যে কোন

গভীর গর্ত্ত পাইলে উহার ভিতর নিজেদের বাসা বাঁধে। অন্যান্য পাখীর ন্যায় উহারা খড় কুট দিয়া বাসা বাঁধে না, পরন্তু উহাদের মুখ দিয়া এক প্রকার লালা নিস্‌সৃত হয়, সেই লালা দিয়া উহারা বাসা নির্ম্মাণ করে। সেই বাসার সন্ধান পাওয়া শক্ত, তবে ঐ পাখী কোথায় উড়িয়া যাইতেছে, সমুদ্রের জেলেডিঙ্গি হইতে জেলেরা তাহা লক্ষ্য করিয়া সেইখানে গিয়া পাথরের গর্ত্ত হইতে ঐ বাসা ভাঙ্গিয়া লইয়া আসে। প্রথমতঃ ঐ প্রকার পাখীর বাসা সংখ্যায় নিতান্ত কম হয় বলিয়া এবং বিপজ্জনক স্থান হইতে আনিতে হয় বলিয়াও ইহার মূল্য খুবই বেশী। ঐরূপ একটি গোটা বাসার মূল্য ৩০০৲ হইতে ৪০০৲ টাকার মত। ইহা রবারের ন্যায় জমাট ও নরম, ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভরি' দরে বিক্রী করা হয়। এক তোলা ওজনের পাখীর বাসার দাম ৬৲ হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা গরম মসলার ন্যায় অতি সামান্য পরিমাণে তরকারীর সহিত দেওয়া হয়। ইহা মৃগনাভির ন্যায় সুগন্ধী ও তেজস্কর এবং য়ুরোপীয়দের ইহা অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য।

পোর্টব্লেয়ারে অনেকগুলি বিখ্যাত ব্যবসায়ী আছেন। ইহাদের নাম না করিলে এখানকার বাজারের কথা শেষ হয় না। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী R. Akooji & Sons। এই কারবারের ইতিহাস পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার নিজস্ব জাহাজ এবং সমগ্র কার-নিকোবরের নারিকেলের একচেটিয়া ব্যবসা আছে। দ্বিতীয় ব্যবসায়ী Krishnaswamis & Sons। এই কারবার পোর্টব্লেয়ারগামী সমস্ত জাহাজে জাহাজের প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ করিয়া থাকেন। এ ছাড়া Govinda Rajula & Co, Sukram & Co, Arungar & Co, Kesholal & Co ইত্যাদি কতকগুলি বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আছে। ইহারাই এখানকার আমদানী রপ্তানির বাণিজ্য করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে ইহারা কাপড়, চাউল, আটা, আলু, পিঁয়াজ ইত্যাদি আমদানী করেন এবং কাঠ, নারিকেল, কচ্ছপের খোলা, আহারযোগ্য পাখীর বাসা ইত্যাদি রপ্তানি করেন। (এখানে ১৯৪৯এর হিসাব অনুমিত হয় যে, ঐ বৎসর প্রায় ১০০০ টন চাউল এখানে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ১,৪৪০ টন চাউল ও ৯০০ টন গম আমদানী হইয়াছিল।) পোর্টব্লেয়ারের এই আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য কলিকাতা ও মাদ্রাজের সহিত হইয়া থাকে। এখানকার শতকরা ৭৫ ভাগ আমদানী ও শতকরা ৯০ ভাগ রপ্তানী বাণিজ্য কলিকাতার সহিত এবং অবশিষ্ট বাণিজ্য মাদ্রাজের সহিত হইয়া থাকে। তবে এই সংখ্যাগুলি সমস্তই আনুমানিক, কারণ এই প্রসঙ্গে কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব আন্দামানের সরকারী দপ্তরে পাওয়া যায় না। National Chamber of Commerceএর পক্ষ হইতে শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয় আন্দামানের সংবাদ লইয়া ভারত সরকারকে যে রিপোর্ট দেন তাহার মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন, "There is in particular no record showing the total value of exports and imports, from and to the islands, and the one fact that struck me was the absence of any statistical literature maintained by the Administration"।

পোর্টব্লেয়ারের এবার্ডিনের বাজারের কিছু দূরে সেলুলার জেলের পথের ধারে এখানকার 'পাওয়ার হাউস'। পাওয়ার হাউসটি ছোট, এখানে তিনটি ডিজেল-চালিত এবং একটি পেট্রল-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদক জেনারেটর আছে। তিনটি ডিজেলে যথাক্রমে ১০০, ৫০ এবং ৩৬ কিলোওয়াট এবং পেট্রলে ২৪ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হয়। সহরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দুই ঘণ্টা অর্থাৎ সকাল ৮ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত আলো জ্বলে না। শুধু আলো জ্বালিবার জন্য ইলেকট্রিক লইলে বাড়ীতে মিটার থাকে না, প্রতি আলোর জন্য মাসিক দু'টাকা করিয়া বিল দিতে হয়; কাজেই দিনে রাতে কেহই আলো নিভাইবার জন্য তেমন ব্যস্ত হয় না। পোর্টব্লেয়ারে বৈদ্যুতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি পরিকল্পনা চলিতেছে। ঐ পরিকল্পনায় ৫৫০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করিবার কথা আছে; ইহার জন্য একটি বয়লারও বসান হইয়াছে। ঐ বয়লারের অভিনব ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ইহাতে কয়লার পরিবর্ত্তে করাত-গুঁড়া (Saw Dust) দিয়া কাজ চালানো হইবে। এখানকার করাত কল হইতে যে প্রচুর করাত গুঁড়া এতদিন নষ্ট হইত, সেই করাত-গুঁড়াগুলি এই ভাবে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

পোর্টব্লেয়ার সহরে তিনটি ছোট কারখানা আছে। একটি সরকারী বনবিভাগের অধীনে Saw mill বা করাত কল। ইহা 'চাথাম' দ্বীপে জাহাজ ঘাটের পার্শ্বেই অবস্থিত। এই কারখানায় মাসিক ২,৪০০ টন পর্য্যন্ত কাট চেরাই হইতে পারে। আন্দামানের বনবিভাগ হইতে বর্ত্তমানে মাসিক ৪,০০০ টন কাঠ কাটা হয়, তন্মধ্যে ২,৪০০ টন কাঠ 'চাথামে' চেরাই হইয়া রপ্তানী হয়, বাকী ১৩০০।১৪০০ টন কাঠ দেশলাই তৈরীর জন্য Wimco Match Factory ক্রয় করে এবং ২০০।৩০০ টন শিমুল জাতীয় কাঠ ভ্যানেস্তা (Plywood) করিবার জন্য চালান হইয়া যায়। কাঠের ব্যবসাই আন্দামানের প্রধান কাজ এবং সেই জন্য সমগ্র আন্দামানই সরকারী বনবিভাগের অধীনস্থ করিয়া এখনও পর্য্যন্ত রাখা আছে।

দ্বিতীয় কারখানা, Wimco Match Factory। ইহা Aberdeen-এ অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতে অবস্থিত হইলেও মূলধন এবং পরিচালনায় ইহা একরূপ বিদেশী। এই West India Match Company সরকারী বনবিভাগ হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত ১৩০০, ১৪০০ টন নরম কাঠ কিনিয়া দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স তৈয়ারী করিয়া ভারতবর্ষে চালান দেয়। বর্ত্তমানে পাকিস্তান ভাগ হইয়া যাওয়ার পর ভ্যানেস্তা ও দেশলাইয়ের উপযুক্ত নরম কাঠের (soft wood) বিশেষ অভাব হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ কাঠ পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, আসাম ও আন্দামান হইতে। বর্ত্তমানে প্রথম দুইটি স্থান হইতে কাঠ পাওয়ার উপায় নাই, সেইজন্য আসাম ও আন্দামানের উপরই বিশেষ করিয়া নির্ভর করিতে হইতেছে।

তৃতীয় কারখানা, সরকারী ডক্ইয়ার্ড ও মোটর মেরামতির প্রতিষ্ঠান। ইহা পোর্টব্লেয়ারের Phoenix Bay নামক সমুদ্রকূলে অবস্থিত। এখানে নৌকা তৈয়ারী হয় এবং জাহাজের অল্প স্বল্প মেরামত এবং মোটর গাড়ী ইত্যাদির যাবতীয় মেরামত কার্য্য হইয়া থাকে। জাপানী অধিকারের সময় এই স্থানে ১০০ ফিট লম্বা ৮০ হইতে ১০০ টনের নৌকা ও ছোট ছোট ষ্টীমলাঞ্চ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইত। এখানে দুইটি ছোট ড্রাই ডকও আছে।

জেলখানা, হাসপাতাল, পুলিস ষ্টেশন, সরকারী অফিস, কাছারী (কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে জজকোর্ট পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনস্থ করা হইয়াছে) জাহাজী অফিস, বনবিভাগ ও পূর্ত্তবিভাগের অফিস, পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাম (পোর্টব্লেয়ারের টেলিগ্রামগুলি সমস্তই বিনাতারে পাঠানো হয়, মাদ্রাজ উহা গ্রহণ করিয়া টেলিগ্রাম রূপে যথাস্থানে প্রেরণ করে।) ছাড়া উপরোক্ত কয়েকটি মাত্র উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে পোর্টব্লেয়ারে আছে। পোর্টব্লেয়ারে কুলি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত লইয়া মোট প্রায় সাড়ে নয় হাজার ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। ভারতের সর্ব্বপ্রদেশ হইতেই কর্ম্মচারীবৃন্দ আসিয়াছেন, তবে কুলি মজুর অধিকাংশই ছোটনাগপুর হইতে আনীত। ইহারা রাঁচীর অফিস হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া 'রাঁচী-কুলি' নামে অভিহিত। এই সমস্ত কুলিদের একবছরের চুক্তিতে চাকুরীতে বহাল করা হয়। যেদিন রাঁচীতে চাকুরীতে লওয়া হয় সেই দিন হইতে পুনরায় রাঁচীতে ফিরিয়া যাওয়ার দিন পর্য্যন্ত ইহারা নিয়মিত বেতন পাইয়া থাকে। জাহাজে আসিবার ভাড়া এবং জাহাজের খাওয়ার ব্যয় সমস্তই সরকার বহন করিয়া থাকেন। আন্দামানে শ্রমিকের অভাবের জন্য এই ভাবে overseas চাকুরীর সুবিধা দিয়া ভারত হইতে শ্রমিক আমদানী করিতে হয়।

এখানে বর্ত্তমানে শ্রমিকের মজুরীর হার এইরূপ :—

সাধারণ শ্রমিক মাসিক বেতন ১৬৲+২৫৲ টাকা মাগ্‌গীভাতা।

জাহাজে মাল তোলা-নামানোর কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিক দৈনিক ২৲ টাকা+মধ্যাহ্নের আহার।

ঐ কাজে নিযুক্ত সর্দ্দার (mate) দৈনিক ৩৷৵০+মধ্যাহ্নের আহার।

জাহাজের ডকে নিযুক্ত শ্রমিকের সর্ব্বনিম্ন দৈনিক বেতন ১।০+২৫৲ টাকা মাসিক হিসাবে মাগ্‌গীভাতা।

ঐ সর্ব্বোচ্চ দৈনিক বেতন ৮৲+২৫৲ টাকা মাসিক হিসাবে মাগ্‌গীভাতা।

বনবিভাগের শ্রমিকদের মাসিক বেতন ১৭৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা +২৫৲ টাকা মাসিক মাগ্‌গীভাতা+৫৲ টাকা বনবাস ভাতা।

আন্দামানের শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় শ্রমিক, কেবল ডকের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের প্রায় শতকরা ৯০ জন আন্দামানের Local Born হইতে সংগৃহীত। আন্দামানে একজনও বেকার নাই, উপরন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেখানে বহু লোকের উপজীবিকার উপযুক্ত স্থান আছে।

এই সূত্রে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, প্রতিমাসে এই দ্বীপ হইতে এখানকার কর্ম্মচারী ও শ্রমিকগণ সরকারী ট্রেজারীর মারফৎ আড়াই লক্ষ টাকা ভারতে নিজেদের আত্মীয়বর্গের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন।

এখানকার বাণিজ্য ও শিল্প সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার সময় একটি বিষয় বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, এখানে কোনও ব্যাঙ্কের শাখা বা কোন বীমা কোম্পানী আদৌ নাই। একমাত্র পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ছাড়া লোকের টাকা রাখিবার জন্য কোন স্থানই নাই। বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা যদি এখানে কোন শাখা প্রতিষ্ঠান খোলেন, তাহা হইলে এখানকার অধিবাসী এবং যে-কোম্পানী এইরূপ শাখা খুলিবেন, তাহারা উভয়েই লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

বাল্য-লীলা

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

ইন্দিরাসম সুন্দরী সাজে নবীনা মাতার মুরতি ধরি
ক্রন্দনরোল তুলিছে পুতনা আজো শত শিশু শোণিত হরি'।
আজিও ভারতে তৃণাবর্ত্তের দেখি প্রতিদিন ঘূর্ণীপাক
উড়াইয়া দেয় সকল শান্তি রচিয়া দারুণ দুর্বিপাক।
বৎসের রূপে কংশের দূত আজিও কৃষ্ণে হানিতে চায়,
পাপ অঘাসুর পল্লী-বালকে আপন কবলে টানিতে ধায়।

বকের কপট ছলনার জালে জড়াইয়া পড়ে আজিও লোক,
বাড়াইয়া তোলে প্রতিটি দিবস মানুষের যত দুঃখশোক।
ভাবি তাই মনে শুনিতে পাইব আবার মধুর মুরলী গান,
বৃন্দাবনের ধ্বংস সাধনে নিষ্ফল হবে এ অভিযান।
ছল-খল-দল-দমন-কঠোর কুটিল মারণ মুরতি ধরি।
জানি আমি জানি শুনিতেছি ধ্বনি আসিছে দর্পহরণ হরি।

বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী

দার্শনিক নিট্শের পত্র সঙ্গীত-শাস্ত্রী ওয়াগনারের নিকট

পত্রপরিচয় :

নবীন নিট্শে, প্রবীণ ওয়াগনার, দার্শনিক নিট্শে, সুরস্রষ্টা ওয়াগনার। নিট্শের খ্যাতি তখনও জার্ম্মান দেশে প্রথম প্রভাত রাগ রেখা। ওয়াগনারের প্রতিভায় তখন জার্ম্মান সংস্কৃতি অনুপ্রাণিত। ওয়াগনারকে জার্ম্মান জাতির প্রতীক বলে সমস্ত দেশ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কৃতার্থমন্য। ত্রিশ বৎসর বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও নিট্শে ওয়াগনারের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে অনুরঞ্জিত। ওয়াগনারের সঙ্গীতের জন্য নিট্শে শব্দ যোজনা করে ধন্য। একদা নিট্শে নিবেদন করলেন, "সঙ্গীত বিয়োগ দিলে মানুষের জীবন নিরর্থক। জার্ম্মান জাতির জীবন ওয়াগনারের সঙ্গীত মুখরিত।" নবীন দার্শনিকের স্তুতি প্রবীণ ওয়াগনারের অহঙ্কারকে অত্যুঙ্গ করে তুলছে।

১৮৬৯ সাল। জার্ম্মানজাতি অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করেছে। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের জন্য জার্ম্মান জাতি প্রস্তুত, জাতির প্রতি অঙ্গে অঙ্গে জীবনের অনুভূতি। নিট্শে বাস্‌ল বিশ্ববিদ্যালয়ে শব্দশাস্ত্রের অধ্যাপক। ওয়াগনার বাস্‌লে সুর-সৃষ্টিতে ধ্যানমগ্ন। ওয়াগনারের গৃহে নিট্শে খৃষ্টমাসের অতিথি। ওয়াগনার গুরু, নিট্শে শিষ্য।

ওয়াগনারের অনুপ্রেরণায় নিট্শে "সঙ্গীতের প্রচ্ছদপটে বিয়োগান্ত কাব্যের জন্ম" (Birth of Tragedy Out of Music) নামক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করলেন। এই রচনার আবেগে নিট্শে তাঁর সর্ব্বোত্তম দার্শনিক তথ্য আবিষ্কার করলেন। সে তথ্যের মূলবস্তু হল "আমি অনুভব করি যে, মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ও সর্ব্বোত্তম প্রেরণা কৃচ্ছ্রতম জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে পারে না। সংগ্রামের অভিলাস, শান্তিলাভের অভিলাস, বিজয়ের অভিলাসের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনী শক্তি চরম প্রকাশ হবে।"

শিষ্য নিট্শে ওয়াগনারকে অভিনন্দন জানালেন, "আপনি দ্বিতীয় গ্রীক সঙ্গীত-বিশারদ এসকাইলাসের প্রতীক ; আমি আপনাকে তুলনা করি ডায়োনিসাসের সঙ্গে।" ওয়াগনার এই স্তুতিকে ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস বলে গ্রহণ করেন নি বরং সমগ্রজাতির শ্রদ্ধাবলে গ্রহণ করলেন। নিট্শে ছিলেন জার্ম্মান জাতির মনোমন্দিরের প্রদীপ-বাহক, ওয়াগনার ছিলেন সেই মন্দিরের দেবতা।

হঠাৎ একদিন ওয়াগনারের সঙ্গীত আলোচনার অবকাশে নিট্শে সমালোচনার পর্য্যায়ে উপনীত হলেন। শিষ্যের সমালোচনায় ওয়াগনার ক্ষুব্ধ হলেন ; তিনি চকিত হলেন। তিনি নিট্শেকে করলেন পত্রাঘাত, সুকল্পিত ভ্রান্তি দিলেন দেখিয়ে। বিচক্ষণ নিট্শে দিলেন প্রত্যুত্তর। উত্তর প্রত্যুত্তরের পরিণতি হল দুই বন্ধুর বিচ্ছেদে।

নিট্শে প্রচার করলেন, "প্রতি মানবসত্তার দুইটী রূপ আছে— পুং-রূপ ও স্ত্রী-রূপ। সঙ্গীত স্ত্রী রূপেরই বিকাশ। সঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে মানব মনের ঔপন্যাসিক স্তরে অসংলগ্ন বাক্‌বিন্যাস, আদর্শগত মিথ্যার রূপান্তর, মানুষের বিবেকের লঘু প্রকাশ। আমি দেখেছি সঙ্গীত একটি বিরাট মানব মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।"

রচনা, আলোচনা এবং সমালোচনা দুই বন্ধুর মধ্যে এমন বিচ্ছেদ সৃষ্টি করল, নিট্শে ওয়াগনারের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হলে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন নি। কিন্তুরচনার মধ্য দিয়ে দুইজন মণীষীই পরস্পরকে আঘাত করে চলেছেন। ওয়াগনার লিখলেন Parsifal দিলেন একখণ্ড নিট্শেকে উপহার। নিট্শে লিখলেন Human All-too-Human, পুস্তকের মধ্যে ছিল সঙ্গীত ও শিক্ষা সম্পদে তাঁর তীব্র শ্লেষ ; এবং পরোক্ষে ছিল ওয়াগনারের প্রতি আঘাত। নিট্শে পুস্তকখানি ছদ্মনামে প্রকাশ করবেন বলে স্থির করলেন, কারণ হয়ত ওয়াগনার-পন্থীগণ আঘাত পাবেন। নিট্সের মন্তব্যে লিখিতদের অনেকেই ছিলেন নিট্শের বন্ধু। নিট্শে তাঁদের সঙ্গে বিরোধ ইচ্ছা করেন নি। কিন্তু ওয়াগনারের নিকট পুস্তকের পিতৃত্ব স্বীকার করে লিখলেন পত্র :—

পত্রানুবাদ :—

আপনার নিকট আমি Human, All-too-Human, পুস্তকখানি পাঠিয়েছি। এর মধ্য দিয়ে আপনার ও আপনার সহধর্ম্মিণীর নিকট এই পুস্তকের রচনার দায়িত্ব স্বীকার কচ্ছি, আমার মনের গোপন কথাগুলি প্রকাশ করলাম। আমার বিশ্বাস আছে যে আপনারা দু'জনই আমার বিশ্বাসের-পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করবেন। এই পুস্তক আমারই রচনা। এই পুস্তকের মধ্য দিয়ে আমি মানুষ ও বস্তুর বিষয়ে আমার গোপনতম ধারণাগুলি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেছি, এর মধ্য দিয়ে আমি আমার চিন্তা রাজ্যের পরিধি পূর্ণ পরিক্রমণ করেছি। এই রচনা আমার প্রচণ্ড দুঃখের দিনে আমাকে প্রচুর সান্ত্বনা দিয়েছে ; যখন পৃথিবীর সকল বস্তু আমার নিকট রসহীন, তখন এই রচনা আমার মধ্যে রসসঞ্চার করেছে। আমি যে এই রকম একখানি পুস্তক রচনা করতে পেরেছি, তাতে মনে হয় আমি এখনো জীবন্ত।

আমি কয়েকটী কারণে এই পুস্তক রচনায় ছদ্মনাম গ্রহণ করেছি। প্রথমতঃ আমার পুরাতন রচনার প্রভাবকে আমি ক্ষুণ্ণ করতে ইচ্ছা করি না ; দ্বিতীয়তঃ, আমি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমার ব্যক্তিগত

মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে প্রত্যাশী নই; সর্ব্বশেষে আমি ইচ্ছা করি যে, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই অংশ গ্রহণ করবেন। আমার নামে পুস্তক প্রকাশিত হলে অনেকেই অপ্রিয় আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করবেন। আমার নামে পুস্তক প্রকাশিত হলে অনেকে এই পুস্তকের আলোচনা থেকে দূরে সরে যাবেন।

আমি জানি, অন্ততঃ একজন মনীষী আছেন যিনি আমার প্রকাশিত ধারণাগুলি যথার্থ বলে বিবেচনা করবেন, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে এই ধারণাগুলির বিরুদ্ধতা করবেন।

আমি একজন আহত সৈনিক। বহু আঘাত সহ্য করেও আমি জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছি। আমি পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করেছি, নিশান উড়িয়েছি। আমার চতুষ্পার্শ্বে নানা বীভৎস দৃশ্য নিরীক্ষণ করছি, দুঃখের অভিজ্ঞতাই আমার অধিক। আনন্দ আমার জীবনে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা।

আপনি জানেন যে, আমি কখনো ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করিনি, সমষ্টিগত চিন্তাই আমার প্রধান মূলধন। আবার সমাজ ও ব্যক্তি দুইই আমাকে সমভাবে আকর্ষণ করে। আমি সুদূর পথ অতিক্রম করেছি—তবু আমি নিতান্ত নিঃসঙ্গ, আমি পশ্চাতে লক্ষ্য করে দেখিনি আমার অনুগামী সহযাত্রী কত দূরে; তাঁরা মৃত কি জীবিত তাও দেখবার অবসর আমার ছিল না।

পত্র পরিণাম :—

এই পত্র ওয়াগনারের হস্ত স্পর্শ করেছিল কিনা সন্দেহ। পুস্তক-প্রকাশক বলেছিলেন যে নিট্‌শের নাম উল্লেখ না থাকলে পুস্তক বিক্রয় হবে না, নিটশে পুস্তকের বহু অংশ পরিবর্ত্তন করেছিলেন কারণ ওয়াগনার হয়ত আহত হবেন। পুস্তকখানি নিট্‌শে বিনা ভূমিকাতেই ওয়াগনারের নিকট পাঠিয়েছিলেন। শুধু উপরে লিখেছিলেন :—

"আমাদের মধ্যে আর কোন বন্ধনই অবশিষ্ট নেই। আমরা সাগ্রহে পরস্পরের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়েছি, যদিও অনেক সময় আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধপথচারী ছিল।"

কিন্তু অভিমানী ওয়াগনার নিজের ধারণাকে কখনো নৈর্ব্যক্তিক বলে বিবেচনা করেন নি। তিনি দাবী করতেন অকুণ্ঠ অর্ঘ, নিরঙ্কুশ প্রশংসা এবং দ্বিধাহীন আনুগত্য। কিন্তু ওয়াগনার পুস্তক পাঠ করে দেখলেন—তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন শিষ্যের গুরুদ্রোহ; না, না, আরো বেশী, প্রিয় শিষ্যের প্রতিভার আঘাত। এই পুস্তক পাঠের পরে ওয়াগনার এমন আঘাত পেলেন যে নিট্‌শের সঙ্গে আর পুনর্মিলনের কোন অবসর রইল না।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে (১৯০০ খৃঃ) নিট্‌শে তার গৃহ প্রাচীরে বিলম্বিত ওয়াগনারের তৈলচিত্র নিরীক্ষণ করে মূর্চ্ছার আবেগে বলেছিলেন, "ঐ ঐ, আমি তাঁকে যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম, অত্যন্ত ভালোবাসতাম।"

ব্যাসের সর্ব্বস্ব

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত এম-এ

ছাত্রাবস্থায় "শকুন্তলা" পাঠকালে অধ্যাপক মহাশয়ের মুখে প্রায়ই এই শ্লোকটি শুনিতে পাইতাম—

> কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান শকুন্তলম্।
> তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্ক স্তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্॥

কালিদাসের সর্ব্বস্ব (অর্থ বোধ করি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা) হইতেছে "অভিজ্ঞান শকুন্তল" (অর্থাৎ শকুন্তলা নাটক), তার মধ্যে চতুর্থ অঙ্ক, তার মধ্যে চারিটি শ্লোক।

শকুন্তলার ঠিক কোন চারিটি শ্লোক কালিদাসের "সর্ব্বস্ব" বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য এ প্রশ্ন অধ্যাপক মহাশয়কে যতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি ততবারই এক উত্তর পাইয়াছি, "ভাল, তোমরাই বল না কোন কোন চারিটি শ্লোক এবং যার যার মতের সমর্থনে একটি ছোট খাটো রচনা লিখিয়া আমাকে দেখাও।"

বহু বৎসর পরে আজ সেই কথাটা মনে পড়াতে ভাবিতেছি, আচ্ছা, কালিদাস হইতে বহু গুণে বড় ও বরেণ্য ব্যাসদেব-সম্পর্কে যদি ঐ রকম একটা প্রশ্ন করা যায়, তাহা হইলে তার কি উত্তর হইতে পারে? যদি জনশ্রুতি নিতান্ত অমূলক না হয় তাহা হইলে ব্যাসদেব—বেদব্যাস শুধু বেদবিভাগ করেন নাই, জগতের বিপুলতম গ্রন্থ "মহাভারত", একখানি দুইখানি নয়, আঠারখানি পুরাণ, কয়েকখানি উপপুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদান্তদর্শন (ব্রহ্মসূত্র) ইত্যাদিও রচনা করিয়াছেন। এমন কি পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভাষ্যও তাঁহারই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থগুলির প্রত্যেকেরই মর্য্যাদা বিপুল হইলেও ইহাদের মধ্যে অবশ্যই ইতর-বিশেষ আছে। সেইজন্য কোনখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা এরূপ প্রশ্ন বোধ করি নিরর্থক নয়। প্রশ্নটি আমি সমুচিত বিনয়সহকারে পাঠকবর্গকে করিতেছি।

আমার জ্ঞান অতি সামান্য; আমি সেই জ্ঞান হইতে কেবল পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপিত করিবার জন্য কয়েক প্রকার উত্তর দিয়ে দিতেছি। প্রশ্নের সুপরিচিত ও জ্ঞানপ্রদীপ্ত উত্তরের জন্য আমি

(এবং সম্ভবতঃ এই প্রবন্ধের অনেক পাঠকও) সুধী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব।

প্রশ্নটির প্রথম অনুমেয় অতি সহজ উত্তর এই যে, অধিকার-বিশেষে ও রুচিভেদে অর্থাৎ যে যেমন অধিকারী—ও যার যেমন রুচি তদুপযোগী ও তদনুরূপ গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ। এই মতের বিপক্ষে বক্তব্য এই, এরূপ উত্তরে প্রশ্নটিকে এড়াইয়া যাওয়া হয় মাত্র, উহার মীমাংসা কিছুই হয় না। অধিকার ও রুচিভেদে মতভেদ অনিবার্য্য এবং কোনও মতই নিতান্ত নিঃসার নয় ইহা চিরকাল স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও যে দর্শনশাস্ত্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে, এমন কি এক বেদান্ত দর্শনেরই দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বাদের মধ্যে এবং শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে স্বমতের শ্রেষ্ঠতা ও অন্য মতের হীনতা স্থাপনের চেষ্টাও চিরকালই হইয়া আসিতেছে এবং হইতে থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণ ব্যাসদেবের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধীয় আমার প্রশ্নটির উত্তর দিন, এই আমার প্রার্থনা। উত্তর ভিন্ন ভিন্ন হইবে ইহা খুবই সম্ভব। প্রামাণিক ব্যক্তিবর্গের ভিন্ন ভিন্ন মীমাংসা দ্বারাও আমাদের মত সাধারণ জিজ্ঞাসুগণ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

প্রশ্নের অন্যবিধ উত্তর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মনীষীগণ বলিতে পারেন এবং ফলতঃ বলিয়াছেনও—ব্যাসের কোন গ্রন্থ তাঁহার সর্ব্বস্ব তাহা তিনি নিজেই সেই গ্রন্থমধ্যে অতি স্পষ্টরূপেই বলিয়া দিয়াছেন। বেদবিভাগ ও নানা পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবন্ধাদি রচনার পরও চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে না পারিয়াই না দেবর্ষি নারদের উপদেশে ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবতই যে ব্যাসকৃত সকল গ্রন্থের চূড়ামণিস্বরূপ সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? ভাগবতকে বলা হইয়াছে নিগম কল্পতরুর ফল—যাহা শুকমুখ হইতে অমৃতদ্রবযুক্ত হইয়া পতিত হইয়াছে। যে শ্লোকে এই কথা বলা হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন, ন কেবলং সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ অস্যশ্রবণং বিধীয়তে, অপিতু সর্ব্বশাস্ত্রফলরূপমিদম্ অতঃ পরমাদরেণ সেবিতব্যম্। কেবল সর্ব্বশাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে ভাগবত-শ্রবণ বিহিত তাহাই নহে, ভাগবত হইতেছে সর্ব্বশাস্ত্রের ফলস্বরূপ, অতএব পরমাদরে ইহা সেব্য। ভাগবতের শেষ স্কন্ধের শেষ অধ্যায়েও "সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে" ইত্যাদি নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক কয়েকটী শ্লোক আছে। সেই জন্য এককালে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মুখ্য আচার্য্যগণ ভাগবত ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের চর্চ্চা আবশ্যক মনে করিতেন না। শ্রীমদ্ জীবগোস্বামীর "ষট্‌সন্দর্ভ"-নামক পরম পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ভাগবত অবলম্বনেই রচিত, ভাগবতে প্রতিপাদিত তত্ত্বাবলীর বিশ্লেষণে ও আবশ্যক স্থলে অন্বয়সাধনে নিযুক্ত। ইহারই এক সন্দর্ভে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, পুরাণের স্থান বেদের উপরে এবং পুরাণসমূহের মধ্যে ভাগবতের স্থান সর্ব্বোচ্চ উপরে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়গণ স্ব স্ব মতস্থাপন জন্য প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যা করিতেন অর্থাৎ শ্রুতিপ্রস্থানরূপে দশ উপনিষদের, ন্যায়প্রস্থানরূপে ব্রহ্মসূত্রের এবং স্মৃতিপ্রস্থানরূপে গীতার ভাষ্য করিয়াছিলেন। আদি গৌড়ীয় আচার্য্যগণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে একটি বাদের প্রতিষ্ঠা করিলেও তন্মতানুসারে প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যা অর্থাৎ ভাষ্য প্রণয়ন আবশ্যক মনে করেন নাই। ভাগবতই তাঁহাদের ছিল প্রথম ও শেষ সম্বল। ফলে উত্তরকালে জয়পুরে রামানুজী সম্প্রদায়ের সহিত বাদে আহূত হইয়া তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয় মনীষী (অতি বৃদ্ধ বলিয়া জয়পুর গমনে স্বয়ং অশক্ত) বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর প্রতিভাবান্ শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণকে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইতে হইয়াছিল। পরে তিনিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐ অপূর্ণতা দূর করেন।

ভাল, যদি ভাগবত ব্যাসের সর্ব্বস্ব হয়, তাহা হইলে পরের প্রশ্ন হইতেছে উহার কোন অংশ শ্রেষ্ঠ। এ প্রশ্নের উত্তর বোধ করি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে হইবে—দশম স্কন্ধের রাস-পঞ্চাধ্যায়। কেননা উহাই তাঁহাদের পরম প্রিয় বলিয়া—পাঠ, কথকতা ইত্যাদিতে অধিক প্রচলিত। মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিলেন—

শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?

রামানন্দ উত্তর দিলেন—

রাধা কৃষ্ণ প্রেম কেলি কর্ণ রসায়ন।

অবশ্য ভাগবতে রাধার উল্লেখ নাই; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মনে করেন, ভাগবতের রাসলীলার বর্ণনায় তিনি অনতিপ্রচ্ছন্নভাবেই আছেন।

রাস-পঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে কোন কয়টি শ্লোক শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে আর আমি অনুমানের স্পর্দ্ধা করিলাম না। বৈষ্ণবগণ বলুন।

আবার ভাগবতের সাররূপে তথাকথিত চতুঃশ্লোকী ভাগবতের মর্য্যাদা ও বৈষ্ণবগণের চক্ষে বড় কম নয়। স্বয়ং মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের সহিত বিচারকালে উহার উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক বৈষ্ণব প্রত্যহ উহা পাঠ করেন। শ্লোক চারিটি এই:

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং য দেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ (২।৯।৩২-৩৫)

সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, স্থূল, সূক্ষ্ম ও তাহাদের কারণ যে প্রধান সে সমস্ত কিছুই ছিল না। আমিও তখন কেবল ছিলামই (কোনও ক্রিয়া ছিল না)। সৃষ্টির পরে আমিই আছি, এই যে বিশ্ব তাহাও আমি,

প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমিই। বাস্তব বস্তু না থাকিলেও যা কিছু অধিষ্ঠান আত্মায় প্রতীত হয়, আবার সত্য হইয়াও যাহা প্রতীত হয় না, তাহাই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। দৃষ্টান্ত যথা দ্বিচন্দ্র, যথা রাহু। যেমন মহাভূতসকল ভৌতিক বস্তুসকলের মধ্যে সৃষ্টির পরে প্রবিষ্টও বটে, অপ্রবিষ্টও বটে, সেইরূপ ভূত ভৌতিক সকলের মধ্যে আমি আছি, আবার নাইও। আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির ইহাই বিচার্য্য কার্য্য সকলের মধ্যে কারণরূপে অনুবৃত্ত হইয়া এবং কারণাবস্থায় যে সকল হইতে ব্যতিরিক্তরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যা আছে তাহাই আত্মা।

এই চারিটি শ্লোক কিন্তু দশম স্কন্ধের অন্তর্গত নয়; দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের অন্তর্গত। আর ইহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে ইহাতে রাসলীলার বা রাগানুগা ভক্তির নাম গন্ধও নাই।

বস্তুতঃ রাস-পঞ্চাধ্যায় আদিরসপ্রধান বলিয়া কাব্যাংশে অত্যুত্তম হইলেও সাধারণের দিক দিয়া উহার উৎকর্ষ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে (অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন)। এই মতে আদিরসের পিচ্ছিলতা ধর্ম্ম-সাধকের পতনেই আনুকূল্য করে; শান্তরস নিরাপদ বলিয়া সর্ব্বাধিক বরেণ্য। এই দিক দিয়া দেখিলে জ্ঞান ও ভক্তি উভয় প্রধান বলিয়া তৃতীয় স্কন্ধের অন্তর্গত কপিল-দেবহূতি সংবাদ অনেকের অধিক প্রিয়। আবার ভাগবতের সমস্ত শিক্ষা নয়টি প্রসঙ্গে বিভক্ত করিয়া—একত্র পুনর্বিবৃত করায় একাদশ স্কন্ধের অন্তর্গত নিমি ও নবযোগীন্দ্র সংবাদও ভাগবতের সারাংশের মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে।

ব্যাসের রচনাসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রথমটি এই যে, শ্রীমদ্‌-ভাগবত ব্যাসের রচনাই নয়। আধুনিক গবেষকগণের মতে উহা বিষ্ণু, বায়ু প্রভৃতি পুরাণের বহু পরে দাক্ষিণাত্যবাসী কোনও পণ্ডিতের রচিত। ইহার ভাষা অন্য পুরাণের ভাষা হইতে অত্যন্ত জটিল এবং অনেকাংশে কৃত্রিম। এই আধুনিক মত এ প্রবন্ধে উপেক্ষা করিয়াও ইহা বলিতেই হইবে যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও মহাভাগবত (দেবীপুরাণ) এই দুই গ্রন্থের মধ্যে কোনটি ব্যাসকৃত ভাগবত মহাপুরাণ, সে বিষয়ে প্রবল বিতর্ক বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণবগণ প্রথমটির এবং শৈব ও শাক্তগণ দ্বিতীয়টির সমর্থক।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে মর্য্যাদা দিয়াছেন, অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাহা দেন নাই। বিশেষতঃ রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য বিষ্ণুপুরাণকেই সমধিক প্রামাণিকরূপে মর্য্যাদা দান করিয়াছেন, উহা তাঁহাদের প্রণীত বেদান্তভাষ্য হইতে অতি-স্পষ্টরূপেই অনুমান করা যায়।

আরও একটি মত আছে—তদনুসারে পুরাণসমূহের মধ্যে অগ্নি-পুরাণের বৈশিষ্ট্য সর্ব্বাতিরেকী। ইহাতে একদিকে যেমন পরাবিদ্যার সমুচিত বিশ্লেষণ করা হইয়াছে সেইরূপ অন্যদিকে অপরাবিদ্যারও বহু শ্রেষ্ঠ শাখার—যথা ছন্দঃশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, ব্যাকরণ, অভিধান, জ্যোতিষাদিরও সম্যক্ সমালোচনা করা হইয়াছে—যাহা হইতে ঐ সকল শাস্ত্রের পরবর্ত্তী বিশ্লেষকগণ বহু সাহায্য পাইয়াছেন। এইরূপে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণে পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণাদিরও বহু পক্ষপাতী পণ্ডিত আছেন।

এই স্থানে এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে এই প্রবন্ধের অনেক পাঠকই হয়ত বলিবেন, ব্যাসের সর্ব্বস্ব অনুসন্ধানের চেষ্টায় পুরাণ অরণ্যের মধ্যে গিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়া নিতান্তই একটা শোচনীয় ব্যাপার। ব্যাস কি জগতে পুরাণকার বলিয়া প্রসিদ্ধ, না মহাভারত-কার বলিয়া প্রসিদ্ধ? কোন পুরাণের মর্য্যাদা মহাভারতের তুল্য? সূর্য্যের কাছে যেমন দীপ, তেমনই মহাভারতের কাছে এক একটি পুরাণ। মহাভারত সর্ব্ববিদ্যার খনি। "যাহা নাই—'ভারতে' তাহা নাই ভারতে" এ কথা ত এদেশে বহুকাল হইতে স্বীকৃত। ইহা একাধারে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র। সবদিকেই ইহার অগাধতা যুগে যুগে দেশে বিদেশে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। মহাভারতই ব্যাসের সর্ব্বস্ব এ বিষয়ে কি আর কোনও সন্দেহ হইতে পারে? মহাভারত লিখিয়া চিত্তের প্রসন্নতালাভ করিতে না পারিয়া ব্যাস নিজস্ব রচনারীতি ত্যাগ করিয়া উৎকট জটিল ভাষায় ভাগবত-পুরাণ লিখিতে বসিয়াছিলেন—এ কথা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? উহা কেবল অন্ধ বিশ্বাসীরাই মানিবে।

ভাল, মহাভারতই যদি ব্যাসের সর্ব্বস্ব হয়, তাহা হইলে উহার শ্রেষ্ঠ অংশ কোনটি? ইহার উত্তর কিন্তু সহজ নয়। কেহ হয়ত বলিবেন, শান্তি পর্ব্ব; কেহ বনপর্ব্ব, কেহ স্বর্গারোহণ পর্ব্ব; অধিকাংশ লোকে বলিতে পারেন ভীষ্ম পর্ব্ব, গীতা যাহার অন্তর্গত। এইস্থানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, গীতা কি সত্যই মহাভারতের অংশ? বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই গীতার মর্য্যাদা সম্যক্‌রূপে মানিয়া লইয়াও উহা মূল মহাভারতের অন্তর্গত কিনা এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ মতের প্রতিধ্বনিরূপে অনেক ভারতীয় পণ্ডিতও বলিয়াছেন ওটা প্রক্ষিপ্ত। বিচারপতি তেলাং এই বিষয়টি বিচার করিয়া রায় দিয়াছেন, গীতাকে মূল মহাভারতের অঙ্গ (integral part) বলিয়া মানিয়া লওয়ার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কোনও বাধা নাই। আর একথাও এখানে বলা যাইতে পারে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও একজন যিনি গীতাখানি সমধিক প্রযত্নের সঙ্গে পড়িয়াছেন, সেই জার্ম্মান পণ্ডিত Dr. Rudolf Otto গীতার মধ্যে আটটি স্বতন্ত্র স্তর আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াও বলিয়াছেন, কাল-ক্রমে এইসকল সাম্প্রদায়িক স্তর গীতার মধ্যে জমাট বাঁধিলেও মূল গীতা মহাভারতেরই অঙ্গ এবং উহার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যযুক্ত। আমরা আধুনিক মত সকল এ প্রবন্ধে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছি। সুতরাং গীতার ষোল আনাই মহাভারতের অন্তর্গত ইহা আমাদের স্বীকার্য্য।

আচ্ছা, গীতা যদি মহাভারতের সর্ব্বস্ব বা শ্রেষ্ঠ অংশ হয়, তাহা হইলে পরের প্রশ্ন করা যাইতে পারে গীতার শ্রেষ্ঠ অংশ কি? অনুমান হইতে বলি, অনেকে হয়ত বলিবেন, কেন? একাদশ সর্গ…যেখানে

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শন ও তৎসম্পৃক্ত উক্তি অতি মনোরম ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। অনুবাদিগণ বলিতে পারেন, কাব্যাংশে একাদশ সর্গ শ্রেষ্ঠ হইলেও কাব্য গীতার সর্ব্বস্ব নয়—গীতার সর্ব্বস্ব তত্ত্ব। "কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্।" তত্ত্ববাদিগণের মধ্যেও ঐকমত্য আশা করা যায় না। তাঁহাদের কেহ হয়ত বলিবেন, দ্বাদশ সর্গ শ্রেষ্ঠ, কেহ ত্রয়োদশ, কেহ পঞ্চদশ। ভক্তগণ বলিতে পারেন এবং অনেকে বলিয়াও থাকেন জানি, গীতার সর্ব্বমনোরম অংশ নবম সর্গ এবং তাহার মধ্যেও বিশেষ করিয়া—এই পাঁচটি শ্লোক—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যস্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রা স্তেপি যান্তি পরাংগতিম্॥
কিং পুন ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

স্বভাবতঃ দুষ্কৃতপ্রবণ মানবের পক্ষে ইহার অধিক আশার কথা, ইহার অধিক জানিবার ও মনে রাখিবার বিষয় আর কি হইতে পারে? আর ব্যাসদেবও কি এই অধ্যায়ের নাম রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ দেন নাই?

ভক্তগণ ভাবের দিক ধরিয়া চলেন, যোগীদিগের (এবং জ্ঞানীদিগেরও) তাহা তাদৃশ মনঃপূত নয়। যোগিগণের নিকট ষষ্ঠ অধ্যায় অধিক আদরণীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

আবার, চতুঃশ্লোকী ভাগবতের ন্যায় সপ্তশ্লোকী গীতাও আছে। উহাও বহু যুগ যাবৎ অনেকের নিত্য পাঠ্য। সেইজন্য এরূপও অনুমান করা যায়, অনেকে বলিবেন সমগ্র গীতার সার উহাতে সংগৃহীত আছে বলিয়াই উহার ঐরূপ মর্য্যাদা। এই সাতটি শ্লোক আর এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিলাম না।*

মহাভারত সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। পুরাণের ন্যায় মহাভারতকেও ব্যাসের গৌরবের চূড়া বলিয়া স্বীকার না করিতে পারেন এইরূপ বাদীও অনুমানযোগ্য। এ পক্ষ বলিতে পারেন, প্রাচীন ভারতের এই শ্রেষ্ঠ কোবিদের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে তাঁহার বেদব্যাস এই উপাধি দ্বারা প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে তাহার কারণ বেদবিভাগই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বেদ অবশ্য তাঁহার রচনা নয়, কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ডের শিক্ষার সার প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি যে বেদান্তদর্শন ব্রহ্মসূত্র নাম দিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাই কি এত শতাব্দী পরেও ভারতের নাম য়ুরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের কাছে চির আদরণীয় করিয়া রাখে নাই? অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত—ব্রহ্মসূত্রের যে ব্যাখ্যাই বল (এবং প্রকৃতপক্ষে এই বাদগুলির মধ্যে ভেদ অতি অল্পই), বেদান্ত দর্শন বিশ্ব দর্শনের মুকুটমণি ইহা প্রায় অবিসংবাদিত সত্য। শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত গীতায় প্রমাণরূপে (১৩।৪) ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যে পরে কা কথা? অতএব যদি ব্যাসের সর্ব্বস্ব বলিয়া তাঁহার গৌরবময়ী কৃতিসকলের মধ্যে কোনওটিকে নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে ব্রহ্মসূত্রই সেই কৃতি। আর ব্রহ্মসূত্রের সার হইতেছে প্রথম চারি সূত্র—"চতুঃসূত্রী" যাহার শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃতভাষ্য দার্শনিক মনীষার উচ্চতম সীমা বলিয়া—দেশে বিদেশে স্বীকৃত হইয়াছে।

* শ্লোক সাতটির ঠিকানা যথাক্রমে এই: ৮।১৩, ১১।৩৬, ১৩।১৩, ৮।৯, ১৫।১ ১৫।১৫, ও ১৮।৬৫

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভ্রমণ

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বুকেনীতে আমরা (ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিনিধি, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের সন্ন্যাসীবৃন্দ মাত্র তিন দিন থাকবার মনস্থ কোরেছি। আটাশে সেপ্টেম্বর বিকালে স্থানীয় হিন্দু মহিলাদের একটা সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটা মহিলা মণ্ডল স্থাপিত হোল—যার কর্ম্মপদ্ধতি স্থির হোলো.—এই দূর বিদেশে ঘর সংসারে হিন্দু রীতি-নীতি আচার অনুষ্ঠান পালন কোরে চলার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন ও নির্দ্দেশ দান করা। সাপ্তাহিক অধিবেশনে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, পূজা, আরতি, ভজন কীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে সহরে হিন্দুত্বের ভাব জাগিয়ে রাখা। সন্ধ্যায় আমাদের শেষ বক্তৃতার আয়োজন হোয়েছে। সভার বহির্ভারতে হিন্দুদের কী ভাবে থাকা দরকার, স্বাধীন ভারতের নাগরিকের দায়িত্ব কি—এই সব বিষয়ে বক্তৃতা কোরলেন—মিশনের সহকারী নেতা স্বামী পরমানন্দজী। বক্তৃতার পর স্থানীয় অবস্থা,আফ্রিকানদের মধ্যে কী ভাবে হিন্দুত্ব প্রচার করা যায়—সেই সব বিষয়ে বহু প্রকার আলোচনা হোল। রাত্রি প্রায় ১২টায় লোকজন বিদায় নেওয়ার পর আমরা শোওয়ার ঘরে গেলাম। শেঠ অমৃতলালের সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা চললো। বাংলা ও পাঞ্জাবের দাঙ্গা সেবা কার্য্যের জন্য তাঁর ব্যক্তিগতভাবে ২৫ হাজার শিলিং পাঠানোর রসিদ পত্র সব দেখালেন। অমৃতলালের বয়স নিতান্তই অল্প। ২৮।২৯ বছর হবে। কিন্তু ব্যবসায়ে প্রবীণ। তিনটি মিলের মালিক। অত্যন্ত অমায়িক, নিরহঙ্কারী এবং আত্মশ্রদ্ধালু।

রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুকেনী ত্যাগ কোরতে হবে। এ নির্দ্দেশ আজ সভার পরে জনৈক শ্রোতার নিকট হোতে পেয়েছি। তবে সেই নির্দ্দেশ বাধ্যতামূলক নয়। "আপনারা ভোরেই প্রস্তুত থাক্‌বেন—আমার মোটর এসে আপনাদের নিয়ে যাবে"—এই ছিলো স্থানীয় একজন ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুত কুরজী ভীমজীর নির্দ্দেশ। বুকেনী থেকে ২৪ মাইল দূরে জেগা নামে একটি গ্রাম্য সহরে তাঁর আরও একটি ব্যবসায় কেন্দ্র আছে ; সেখানেও প্রায় ৬।৭ টি হিন্দু পরিবারের বাস। তাই তাঁর বিশেষ ইচ্ছা সেই গ্রামেও আমাদের নিয়ে যান। অমৃতলালকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা প্রার্থনা সেরে সবে মাত্র শুয়েছি,—এমন সময় বাইরের দরজায় টক্ টক্ কোরে ঘা পড়লো। বাড়ীর মালিক অমৃতলাল শশব্যস্তে গিয়ে দরজা খুল্‌লেন "May I come in Sir" প্রশ্ন এলো ; Of course বলে একটি ইংরেজ মহিলাকে অমৃতলাল ঘরের মধ্যে ডেকে নিলেন। এতরাত্রে একাকিনী একটি ইংরাজ মহিলা কোথা থেকে এলো—কেন এসেছে সেটা জানার ইচ্ছা মনে জাগলেও—সে রাত্রে আর সে ইচ্ছা পুরণ না কোরে শুয়ে পড়লাম। ভোরে পাঁচটায় স্নান-আহ্নিক সেরে নিয়ে তৈরী হোয়ে মোটরের অপেক্ষায় রইলাম। বাইরের বারান্দায় বসে আছি—এমন সময় সেই ইংরাজ মহিলাটি ঘর থেকে এসে আমার হাত ধরে বললেন—"Already I have heard from Mr. Amritlal about your mission. I am also a woman of that type. We are also preaching the ideals of Universal Brotherhood. I wish all success of your Mission. Now that India is free and it is hoped that now she will depute the Preachers of Her glorious Culture to the corners of the world."—বলে বেশ একটা আনন্দ-প্রকাশ কোরলেন। প্রত্যুত্তরে আমিও তাঁর প্রচারের সাফল্য কামনা করলাম। দুঃখ কোরে জানালেন "সময়াভাবে আমি আপনার সঙ্গে বেশীক্ষণ আলাপ আলোচনা করতে পারছি না—কারণ আমাকে ৬-৪৫ মিনিটের ট্রেণে অন্যত্র যেতে হবে। এই বলেই পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে মোটরে রেল-ষ্টেশনের দিকে রওনা হোয়ে গেলেন। তখন বেলা প্রায় ৬৷৹টা। প্রাতরাশের পর সেই বারান্দায় বসে আছি, হঠাৎ দেখি সেই ইংরাজ মহিলাটি ফিরে এলো। একেবারে আমার সামনে এসে বল্লেন—Fortunately the train is coming a few minutes late, so I have got sometime to talk with you—এই বলে আলাপ সুরু কোরলেন। পূর্ব্ব আফ্রিকার কোথায় কোথায় গিয়েছি, কোথায় কোথায় যাবো, আমাদের প্রচার্য্য বিষয় কি—ইত্যাদি জেনে নিয়ে প্রায় ২০।২৫ মিনিটের মধ্যে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় মন্তব্য কোরে গেলেন—It has been proved that the Western Culture has already failed to establish peace in the world. To solve the present problems of the world the Universal ideals of India are essentially needed." ভাবলাম-স্বাধীন ভারতের নাগরিকের ন্যায্য-মর্য্যাদা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দিতে ইংরেজেরাও আজ শিখেছে। এতদিন "কালা-আদমী" বলতে যাদের বুক খানা অহংকারে ফুলে উঠ্‌তো,—প্রভুসুলভ ব্যবহারে যারা এতদিন অভ্যস্ত হোয়ে গিয়েছিলো, তারাই আজ এত গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতীয়দের সহিত আলাপ আলোচনা কোরছে। স্বাধীনতার মর্ম্ম কতকটা অনুভব করলাম।

এখনই আমাদের জেগায় যাওয়ার কথা। মোটর আসতে একটু দেরী হোল। এদিকে স্কুলের ছেলেমেয়ে এবং ছোট সহরের হিন্দুরা প্রায় সকলেই এসে হাজির হোলো—আমাদের বিদায় দিতে। সমবেত স্বরে মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ কোরে আমাদের পথের সমগ্র বাধা বিপত্তি সরিয়ে দিলো। মোটর আসতেই উঠে বোসলাম। ড্রাইভার একজন আফ্রিকান। সহর ছেড়ে মোটর কিছুদূর আসলে ড্রাইভার তার নিজস্ব কিসোয়েলী (Kiswelli) ভাষায় আমাদের সম্বন্ধে গাড়ীর মালিক শ্রীকুরজী ভীমজীর সহিত আলাপ সুরু কোরলো। শ্রীযুত কুরজী আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ড্রাইভারকে বল্লেন। কিন্তু ড্রাইভার জানালো—এই সমস্ত মহৎ ব্যক্তির সহিত তার কথা বলা সাজে না। এ কথা শুনে যখন আশ্বাস দিয়ে উপযাচক হোয়েই আমি তার সঙ্গে কথা বোল্‌তে সুরু কোরলাম—তখন সে হৃষ্টচিত্তে বার্ত্তালাপ সুরু কোরলে। দেখ্‌লাম অশিক্ষিত হোলেও কত শিষ্টতা তার আলাপের মধ্যে—এবং ভারতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কত উচ্চ আশা সে রাখে। বললো—"এখন ভারত স্বাধীন হোয়েছে, এ দেশে এসে আমাদের দুঃখ কষ্ট দেখে তা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে নিশ্চয়ই। অতি শীঘ্রই জাহাজের ভাড়া কমিয়ে দেওয়া হবে তখন বহু ভারতীয় আমাদের দেশে আসতে পারবে এবং আমরাও ওদেশে যেতে পারবো।" তারপর আমাকে বললে—"আমাদের দুঃখ কষ্টের কথা অনুগ্রহ কোরে আপনি ভারতে প্রচার কোরবেন।" তাদের সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের জানাবো বোলে যখন আশ্বাস দিলাম—তখন তার ক্ষুদ্র অন্তরটা যেন বিরাট, ও উদার হোয়ে গেলো বলে মনে হোল। যাহাদের মধ্যে ক্রূরতা বাসা বাঁধে নাই—সরলতা যাদের হৃদয়খানা জুড়ে রয়েছে তারা রাজনৈতিক চালবাজীর কথা কী বুঝবে? যে দেশের অধিবাসী স্বভাবতঃই ভারতের প্রতি এতখানি শ্রদ্ধাবান্ ও বিশ্বাসী হোয়ে উঠেছে, পাছে সেই ভারতবাসী কর্ত্তৃক এই শ্রদ্ধালু জনগণের অন্তরে দেশপ্রেম জাগিয়ে দেওয়া হয় সেই আশঙ্কায় সরকারের নূতন আইনে স্বাধীন ভারতের নাগরিকের পক্ষে এদেশে আসা বা বসবাস করা একপ্রকার নিষিদ্ধই হোয়েছে—এবং পরাধীন ভারতে দুঃখ দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত হোয়ে যারা ভারত বক্ষ ত্যাগ কোরে এদেশে এসে অপেক্ষাকৃত সুখে শান্তিতে বসবাস কোরছে তাদেরও এদেশ থেকে বিতাড়নের ষড়যন্ত্র চলছে। কোনো ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এসে এ দেশবাসীর (native's) কল্যাণ কামনায় কোনো কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে কাজ কোরতে পারবে না তাও প্রকারান্তরে সরকার সিদ্ধান্ত কোরে নিয়েছে। এরূপ কোরলে এ দেশবাসী ভারতের জনগণ তথা রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হোয়ে উঠতে পারে সেই জন্য এই আফ্রিকানগণকে সরকার থেকে বেশ সাবধানতার

সঙ্গে 'রিজার্ভ' কোরে রাখা হোয়েছে। শিক্ষার ব্যবস্থা সরকার থেকে যা করা হবে—উন্নতির প্রচেষ্টা সরকার যা করবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ভারতীয়গণের কোনো বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এ দেশবাসীর জন্য কিছু কোরতে পারবে না—মোটামুটি এই হোল আইন।

কথা প্রসঙ্গে সেই ড্রাইভার রাস্তার পাশের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর (গরীব আফ্রিকানদের বাড়ী) গুলি দেখিয়ে জিজ্ঞেস কোরতে লাগলো—এইরূপ ঘর ভারতে আছে কি না? নিজেই মন্তব্য করে বললো—নিশ্চয়ই এত গরীব লোকের বাস ভারতে নেই। নিজেই প্রমাণ দেখায়—কেন—এই দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। সরকার থেকে কত রকমে তাদের শোষণ করা হ'চ্ছে তার ইতিহাস আমাদের কাছে বলতে লাগলো—জন প্রতি ১২ শিলিং কর, গোরু প্রতি ২ শিলিং খাজনা, আরও কত রকমের কর যা তাদের সরকারকে দিতে হয় সে সব জানালো। ঐ প্রকার নানা সুখ-দুঃখের কথা শুনতে শুনতে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল জেগায় পৌঁছুলাম। মোটরে আমাদের দেখেই তো লোকজন অবাক্। কোথা থেকে এলো এই অদ্ভুত মানুষগুলো, মাথার পাগড়ী থেকে পায়ের জুতো পর্য্যন্ত গৈরিক রংএ রঞ্জিত। জেগার ইতিহাসে সন্ন্যাসী পদার্পণ এই প্রথম এবং অধিবাসীর জীবনেও সাধু দর্শন এই প্রথম। শ্রীকুরজী ভীমজীর বাড়ীতেই আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হোয়েছে। আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে শ্রীশ্রীসঙ্ঘদেবতার আসন প্রতিষ্ঠা কোরে কাপড় জামা বদলাতেই খাওয়ার ডাক পড়লো। শ্রীকুরজীর পরিবার বুকেনীতেই ছিলো—তাই একজন আফ্রিকান পাচক পাকক্রিয়াদি সম্পন্ন কোরেছে। শ্রীকুরজী অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত অনুনয় কোরে জানালো—অতিথি সৎকারের ত্রুটীই হবে খাদ্যদ্রব্যের অস্বাদুতায়। কিন্তু আশ্চর্য্য হ'লাম—খাদ্যের স্বাদ ও সৌন্দর্য্যের পরিপাটিতায়। যারা নিজেরা কোনো দিন এত সুন্দরভাবে পাক করে খায় না; যারা আজও কাঁচা মাংস ফলমূলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে, তারা যে এত সুন্দর সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করতে পারবে তা আমাদের কেন—বোধ হয় শ্রীকুরজীরও ধারণার বাইরে ছিলো। যাই হোক খাওয়া তো বেশ তৃপ্তি সহকারেই শেষ কোরলাম। নানা রকম সংবাদ জানা বা আলাপ আলোচনার জন্য লোকজন বাইরে এসে অপেক্ষা কোরছিলো—তাই খাওয়ার পরই বাইরে এলাম। নানা রকম কথাবার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দাঙ্গা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সঙ্ঘের কর্ম্মপদ্ধতির ইতিহাস, সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবনী আলোচনাও হোল। প্রত্যেক স্থানেই আমাদের পেয়ে প্রথমেই আমাদের এদেশে প্রেরক ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের কর্ম্মপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠাতার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সকলে জানতে চায়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে একে একে সকলেই বিদায় নিলো। তখন ভিতরের ঘরে গিয়ে কী যেন কাজে মনোনিবেশ করেছি এমন সময় শ্রীকুরজী একজন আফ্রিকান রাজার সঙ্গে আমাদের ঘরে প্রবেশ কোরলেন। রাজার পরিচয় দিয়ে শ্রীকুরজী বল্লেন—"ইনি এই জেলার রাজা, নাম মিঃ হুম্বি" (Humby)। আমাদের পরিচয় তিনি মিঃ হুম্বিকে পূর্ব্বে নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন—তবু রীতি অনুযায়ী পুনরায় আমাদের সাক্ষাতে পরিচয় দিয়ে দিলেন। মিঃ হুম্বি বেশ শিক্ষিত লোক, তাই ইংরাজীতেই বার্ত্তালাপ সুরু হোলো। কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন আমরা জাঞ্জিবার দ্বীপের সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ কোরে তাঁর রাজ্যের অধিবাসীদের বিষয় দোভাষীর সাহায্যে আলোচনা কোরেছিলাম তখন এত বেশী আনন্দ পাইনি। কারণ তিনি ইংরাজী জানতেন না। মিঃ হুম্বি প্রথমেই তাঁদের দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রচারের জন্য যে আমরা এসেছি তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—"এতদিনে যে ভারতবর্ষ আমাদিগকে অজ্ঞানতার অন্ধকার হোতে উদ্ধার কোরে উন্নতির পথ প্রদর্শনের জন্য তার মহান সভ্যতার আলোকবর্ত্তিকা জ্বালিয়ে দিতে আপনাদের এদেশে প্রেরণ কোরেছেন সেজন্য আমরা আজ আনন্দিত। ভারত সরকার যে আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অনুভব কোরে তা' লাঘবের জন্য চেষ্টা কোরতে আপনাদের পাঠিয়েছেন এবং আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা গত কয়েক মাস ধরে যা শুনে আসছি তা আমার প্রজাদের জানাবো। সেই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য আমার দুঃখী প্রজাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের মিশনকে।"

তার পর একে একে তাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট জানাতে জানাতে বললেন—"কী যে দুঃখকষ্টের মধ্যে আমাদের রাখা হোয়েছে তা' আপনাদিগকে জানাবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। অজ্ঞানতার আড়াল দিয়ে আমাদিগকে সভ্যতার আলোক থেকে সরিয়ে রাখা হোয়েছে। কত রকম কর চাপানো হোয়েছে—আমাদের উপরে—" বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—স্বামীজি! সভ্যতা কী এমনই জিনিষ,—স্বাধীনতা কী এতই দুর্লভ যা আমাদের ভাগ্যে সেগুলো লাভকরা সম্ভবপর হবে না। সেগুলো কী জগতের কতকগুলো লোকেরই করায়ত্ত থাকবে? আমাদের দেশের লোক কি তার আস্বাদ পাবে না? মিঃ হুম্বির চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বিস্মিত হ'লাম—প্রশ্ন শুনে। আশ্বাস দিয়ে বল্লাম—"ভাই, তা কখনই হোতে পারে না। আমরা যে দেশের বুকে জন্মেছি—যে মহান্ সভ্যতার আলোকরশ্মি আমাদের অন্তরকে আলোকিত কোরেছে—আমরা চাই সেই দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদর্শ ও আলোক—বিশ্বের সকলকে সূর্য্যকিরণের মতো সমান ভাগে ভাগ কোরে দিতে। ভারত চায় জগতের উচ্চ-নীচ সকলকেই তার মহান সভ্যতার উদার বুকে তুলে নিতে;—চায় তার অন্তরের অফুরন্ত প্রেমরাজি বিশ্বকল্যাণে বিলিয়ে দিতে। সেই আদর্শ নিয়েই আজ আমরা দেশের বাইরে এসেছি। সেই মহান্ সভ্যতার চিরন্তন সত্য ও উদার নীতির প্রচারই আমাদের মিশনের কার্য্যপদ্ধতি।"

তার পর মিঃ হুম্বি ভারতীয় সভ্যতার বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ যে সমগ্র জগতে প্রচারিত হওয়া দরকার তার উপর জোর দিয়ে বল্লেন—"ভারতের আদর্শই একমাত্র জগতকে ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার কোরতে সমর্থ। সেই আদর্শ নিয়েই যে আপনারা এই আফ্রিকা মহাদেশে এসেছেন তাতে আফ্রিকাবাসী ভারতের নিকট চিরকৃতজ্ঞ

থাকবে। আপনাদের প্রচার স্থায়ীভাবে এদেশে প্রয়োজন। এদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণকে উন্নত, সুসভ্য কোরে প্রকৃত মানুষ কোরে তুলতে হোলে স্থায়ীভাবে আপনাদের এই নিঃস্বার্থ সেবার প্রয়োজন। যারা আজ আমাদের পরম হিতৈষী সেজে আমাদিগকে তথাকথিত উন্নতির পথ প্রদর্শনের চেষ্টা কোরছে তারা যে প্রকৃতই আমাদের কল্যাণ চায় না তা' আজ সুস্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। তাদের এই কুটচক্রজালে আজ আমরা আবদ্ধ হোয়ে পড়েছি।" এইভাবে নানাপ্রকার আলোচনায় প্রায় একঘণ্টা অতিবাহিত হোয়ে গেলো।

মিঃ হুম্বি গত মহাযুদ্ধের সময় আফ্রিকান সরকারের পক্ষ থেকে ভারতে অবস্থানকারী নিগ্রো সৈনিকদের তত্ত্বাবধানের দোষ ত্রুটী অনুসন্ধানের জন্য ভারতবর্ষে গিয়ে একটী বছর পরাধীন ভারতের বুকে কাটান। পরাধীন ভারতে মাত্র একটা বছর কাটিয়ে ভারতের সভ্যতা ও আদর্শের যে সামান্য পরিচয় পেয়েছেন তাতেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি কী গভীর প্রেম ও আন্তরিক শ্রদ্ধা এই ভদ্রলোকের। শুধু এই একজনেরই নয়, লক্ষ লক্ষ আফ্রিকান যারা জীবনে ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শও করেনি তাদের অন্তরখানিও আজ ভারতীয় আদর্শের প্রেরণা লাভের জন্য উৎসুক হোয়ে রোয়েছে।

রাত্রে সভায় হাজিরার সংখ্যা বেশ ভালই হোল। শুণে দেখলাম পঁয়ত্রিশজন। যে সহরের জনসংখ্যা (হিন্দুর) চল্লিশ জন সেখানের সভায় পঁয়ত্রিশজনের উপস্থিতি ভালই বৈকি। সভায় "হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য" বিষয়ে আলোচনা হোল। বক্তৃতার পরে কয়েকটি প্রশ্ন করা হোল। এদেশে কোনরকম বক্তৃতার পর বক্তাকে বক্তব্য বিষয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন কোরে অবোধ্য বিষয়সমূহ জেনে নেওয়ার নিয়ম। এ নিয়ম ইউরোপের নিকট থেকে শেখা।

পরদিন বিকালে একটি সভার পর আমাদের কাহামা নামে একটা গ্রামে যাওয়ার ঠিক হোলো। রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম কোরে ট্রেণের "বার্থ রিজার্ভ" করা হোল। বিকালে সভার পর রওনা হোয়ে আমরা বুকেনী পৌঁছুলাম। শ্রীযুত অমৃতলালের বাড়ীতে নৈশ ভোজনের পর আমরা ষ্টেশনে গেলাম। বুকেনীর ষ্টেশনমাষ্টার একজন বাঙ্গালী। তাই আতিথেয়তার আতিশয্যটুকু সহ্য কোরতেই হোল। খাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ কোরলেন—কিন্তু না খাওয়ায় তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র ঠিক্‌ঠাক্ কোরে দিয়ে শোওয়ার ব্যবস্থা কোরে দিলেন। ট্রেণ আসবে রাত বারটায়। আমাদের গন্তব্যস্থল কাহামা যেতে হোলে যে ষ্টেশনে নামতে হবে সেখানের ষ্টেশনমাষ্টারকে টেলিফোন কোরে রাত্রে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করার জন্য এখানের ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুত বাগ্‌চী বলে দিলেন। শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম আর হোল না। ট্রেণ আসার ঘণ্টা বাজলো। ডার-এস-সালাম হোতে আগত মাউঞ্জা-গামী মেল এসে ঠিক রাত বারটায় বুকেনী ষ্টেশনে দাঁড়ালো। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কামরায় উঠে বোসলাম। ট্রেণ ছাড়লো। ভীষণ অন্ধকারের বুক চিরে আমাদের গাড়ী ছুটছে। শুধু কতকগুলো আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছাড়া এই গহন অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, তাই বাইরের দৃশ্য দেখার আশা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত আড়াইটায় আমরা ইসাকা ষ্টেশনে নামলাম। ষ্টেশনমাষ্টার শিখ। নিজে এসে আমাদের কামরা থেকে নামিয়ে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই কোরে রেখেছিলেন—কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই কাহামা থেকে আমাদের নেওয়ার জন্য মোটর এলো। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাহামা অভিমুখে রওনা হলাম। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। তার উপর দারুণ অন্ধকার। শুধু মোটরের সামনের আলোয় দু'একটা নাম-না-জানা জন্তুকে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে চলে যেতে দেখলাম—তাছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। প্রায় দু'ঘণ্টা চলার পর কাহামায় পৌঁছুলাম। মোটরে যাওয়ার জন্য শীতও বেশ কোরছে। যখন আমরা কাহামায় পৌঁছুলাম—তখন শুকতারাটা চোখের সামনে জ্বলজ্বল্ কোরে জ্বলছে; গাছে গাছে পাখীরা গাঝাড়া দিতে সুরু কোরেছে। মোটরের আওয়াজে গ্রামের কুকুরগুলো চীৎকার কোরে ডেকে উঠলো। মোটরের হর্ণ শুনেই গ্রামের লোকজন এলো। হাত পা ধোয়ারও জল দিয়ে আলো ও বিছানাপত্র ঠিক্‌ঠাক্ কোরে দিয়ে আমাদের ঘুমোতে বলে চলে গেলো। আমরা আর না শুয়ে স্নান আহ্নিক সেরে নিলাম। ক্রমে গাঢ় অন্ধকার, ধূসর হোতে হোতে একেবারে ফর্সা হোয়ে গেলো। বিহগকুল আহারের সন্ধানে নীড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। পূবের আকাশ ক্রমশঃ রক্তিম হোয়ে উঠলো। সূর্য্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করার জন্য অনেক লোকজনেরও আবির্ভাব ঘটলো।

(ক্রমশঃ)

বাদশার প্রেম

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। বাদশা কাম্বিসেশ-সাইরাশ বাদশার সন্তান—তখন ইরাণের সিংহাসনে মিশরের ফারাও-আমেশিসের কন্যা পরমাসুন্দরী শুনে সেই কন্যাকে বিবাহ করবেন, স্থির করলেন। কন্যাকে তিনি চক্ষে কখনো দেখেন নি···তখনকার দিনে দেশ বিদেশে বেড়ানো সহজ ছিল না। তার উপর ইরাণ থেকে মিশরে যাওয়া···পাঁচ-ছমাসের কমে যাওয়া চলে না।

মানুষের পক্ষে এতদূর যাওয়া-আসা শক্ত হলেও মানুষের মুখে মুখে খবরাখবর আসতো সহজেই···সে খবর শুনে বিশ্বের লোক জেনে ফেলেছিল, ফারাও আমেশিসের কন্যার মতো সুন্দরী দুনিয়ায় দুর্লভ।

ইরাণের বাদশা কাম্বিসেশ···প্রবল তাঁর প্রতাপ, প্রচুর তাঁর রাজৈশ্বর্য্য···দুনিয়ায় অর্দ্ধেকটা তিনি জয় করেছেন···তিনি পাঠালেন ফারাওর কাছে দূত···প্রস্তাব জানিয়ে···তোমার কন্যাকে আমি বিবাহ করবো!

ফারাওর এক সন্তান ঐ কন্যা···কন্যা তাঁর নয়নের মণি···তাকে সুদূর বিদেশে পাঠিয়ে তিনি কি করে বাঁচবেন···অতদূরে কন্যাকে পাঠানো চলে না···না-না এ বিবাহ অসম্ভব। কিন্তু আবার ভয় হয়···বাদশার যে রকম প্রতাপ, বিবাহে অমত করলে সসৈন্যে বাদশা করবেন মিশর আক্রমণ···বিপদের সীমা থাকবে না তখন। উপায়?

ভেবে উপায় স্থির করলেন। সন্ধান করে এক কিশোরী বাঁদী পেলেন···সেরা রূপসী···সেই বাঁদীকে কন্যা-পরিচয়ে তিনি পাঠালেন ইরাণে···তাকে ফারাও-কন্যার মতো শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে যোগ্য রত্নভূষণে সাজিয়ে।···

ইতিহাসে লেখা আছে, এই বাঁদীকে দেখে ইরাণের বাদশা প্রমত্ত হয়ে উঠলেন···বাঁদীকে প্রেয়সী করে বাদশার আনন্দের আর সীমা নেই···এই বাঁদীর প্রেমে তিনি মশগুল!···কিন্তু এ সুখ দীর্ঘ হলো না···কি করে' রহস্য প্রকাশ হয়ে গেল···বাদশা জানতে পারলেন, এ ফারাওর কন্যা নয়···এ হলো মিশরী বাঁদী।

বাদশা রাগে জ্বলে উঠলেন···এমন স্পর্দ্ধা এই বাঁদীর! বাঁদী হয়ে বাদশাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেছে···বাদশা বাঁদীকে···এক তুচ্ছ বাঁদীকে বুকে নিয়ে সেই বাঁদীর অধরে অধর মিশিয়ে সুধা বলে বিষ পান করেছেন! বাদশা ডাক্‌লেন ঘাতককে···হুকুম দিলেন···বাঁদীর গর্দ্দানা!···বাদশার হুকুমে বাঁদীকে গর্দ্দানা দিতে হলো···যে বাঁদীর হাস্যেলাস্যে বাদশা অমন বিভোর বিহ্বল—

নিশ্বাস ফেলে বাদশা বললে—বাঁদীর স্পর্দ্ধার শাস্তি হলো! এবারে ঐ দুর্বৃত্ত ফারাও।

বাদশা এলেন দরবারে···মলিন মুখ! দরবারে উজীর, ওমরাওদের দল বসে···বড় টেবিলের উপর সরবৎ, সিরাজি, মিঠাই, ফল—

বাদশা বললেন—তোমরা শুনেছো মিশরের ফারাওয়ের স্পর্দ্ধার কথা? এমন জঘন্য অপমান করে আমায়! আমি ইরাণের বাদশা···একটা হীন বাঁদীকে করেছি আমার শয্যা-সঙ্গিনী···আদরে ভালোবাসায় উপহারে অলঙ্কারে এক নীচ বাঁদীর মনস্তুষ্টি সাধন করেছি···

রোষে আক্রোশে বাদশার কণ্ঠ হলো স্খলিত রুদ্ধ! নিশ্বাস ফেলে বাদশা ডাকলেন—উজীর···

উজীর সেলাম করে উঠে দাঁড়ালো।

বাদশা বললেন—আমি মিশর আক্রমণ করবো।

বিনীত ভঙ্গীতে উজীর বললে—কিন্তু জাঁহাপনা···মিশরে ফৌজ নিয়ে যেতে হলে বহু উটের প্রয়োজন···প্রথমে চাই বিশ হাজার উট সংগ্রহ···তাতে কত দীর্ঘ সময় লাগবে···বহু ব্যয়···

বাদশা তুললেন হুঙ্কার—তাহলে এ অপমান আমাকে সয়ে থাকতে হবে? বলো—

উজীর বললে—না, জাঁহাপনা···তা নয়···আপনার হুকুম অচিরে তামিল করা হবে।

—হাঁ···লক্ষ ফৌজ তোয়ের করো···অধিনায়ক···তোমরা জানোনা, আমার সর্ব্বশরীর ঘৃণার বিষে জর্জ্জরিত

···একটা হীন বাঁদীকে আমি বুকে নিয়েছি···তার মুখে মুখ মিলিয়ে···অসহ্য ! অসহ্য !

উজীর বললে—যথার্থ জাঁহাপনা···এ কলঙ্কের কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে অনন্তকালের মতো। ···তাই আমি চাই এ কথাটা মোচনের কাহিনী মিশরের ফারাওয়ার রক্তে ধুয়ে মুছে দিতে···

লক্ষ ফৌজ নিয়ে বাদশা কাম্বিশেস্ বেরুলেন মিশর অভিযানে···খবর শুনে বৃদ্ধ ফারাও আমেশিস্ কাঁদতে কাঁদতে মারা গেলেন—তাঁর ভাইপো সামেথিক ভয়ে মিশর ছেড়ে পালিয়ে গেল, আর ফারাওর সেই রূপসী কন্যা—তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

বাদশা কাম্বিশেসের মিশর অভিযান সফল হলো !

কিন্তু যাঁরা ইতিহাসের চর্চ্চা করেন, তাঁরা বলেন, মিশরী বাঁদীর গর্দ্দানা নেননি বাদশা কাম্বিসেশ—হারেমের এক মিনিষ্টারের হাতে দান করেছিলেন। যাই হোক্, বাদশার অমন বিহ্বলতা, অত প্রেম—বাঁদীর পরিচয় জানবামাত্র যে ধোঁয়ার মতো উবে গিয়েছিল যে, সে সম্বন্ধে কারো মনে এতটুকু সংশয় নেই ! এই জন্যই লোকে বলে—বাদশার প্রেম, তার কোনো দাম নেই !

(রুশ-লেখক মাইকেল জোশেনকোর লেখা গল্পের মর্ম্মানুবাদ)

পুরীতে বিশিষ্টাদ্বৈত মত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তির তিলক শ্রীবৈষ্ণব (অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত মতে) রচিত হয়। মন্দিরে সিংহ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া ভিতরে প্রথমে যে লাল পাথরের দ্বার দেখা যায়, তাহার উপর শ্রীবৈষ্ণব তিলক এবং শঙ্খ, সুদর্শন চক্র ও গরুড়ের মূর্ত্তি দেখা যায়—এ সকলই শ্রীবৈষ্ণব নিদর্শন। শ্রীবৈষ্ণব প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায় জগন্নাথ মন্দিরের অন্তর্গত লক্ষ্মী মন্দিরে। আমি প্রথমে ইহা লক্ষ্য করি নাই। লক্ষ্মী মন্দিরে কিছুক্ষণ বসিতে হয়, তাই বসিয়াছিলাম। একটি প্রৌঢ়া বিধবা পাণ্ডা রমণী আমাকে চরণামৃত দিল এবং শ্রীবৈষ্ণব চিহ্ন সকল দেখাইয়া দিল। জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরও কয়েকটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। যে অংশকে মোহন বা জগমোহন বলা যায়, তাহার চারিদিকে দেয়ালের উর্দ্ধাংশে কতকগুলি শ্রীবৈষ্ণব তিলক, সুদর্শন চক্র, শঙ্খ প্রভৃতি চিত্রিত আছে। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ছত্রিশটি আচার্য্যের ক্ষুদ্রাকার মূর্ত্তি চিত্রিত আছে এবং অধিকাংশ স্থলে মূর্ত্তির নীচে নাম লেখা আছে। প্রথম আচার্য্যা শ্রীমহালক্ষ্মী—তিনিই শ্রীবৈষ্ণব মত প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন—এজন্য লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে শ্রীবৈষ্ণব চিহ্নের সার্থকতা।

লক্ষ্মীনাথ সমারম্ভাম্ নাথযামুনমধ্যমাং।
অস্মদাচার্য্যপর্য্যন্তাং বন্দেগুরুপরম্পরাং॥

"আমি আমাদের (শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের) গুরু পরম্পরাকে প্রণাম করি,—যাঁহাদের সর্বপ্রথম হইতেছেন শ্রীবিষ্ণু, যাঁহাদের মধ্যস্থলে নাথ মুনি এবং যামুনাচার্য্য, এবং যাঁহাদের শেষে আমাদের আচার্য্য।" আচার্য্যদের যে সকল ছোট চিত্র রহিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে এই সকল নাম সমধিক পরিচিত :—অণ্ডন স্বামী, তোতাদ্রি, যামুনাচার্য্য, গোষ্ঠীপূর্ণ, শঠকোপ, গোদা অম্মা (ইনি রাজকন্যা ছিলেন, শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুর বিগ্রহের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল), বরবর মুনি, মহাপূর্ণ, শৈলপূর্ণ, পরাশর, ব্যাস, নাথমুনি, মধুর কবি। এইরূপ ৩৬টি চিত্র আছে। রামানুজের চিত্রটি দ্বারের পার্শ্বেই, ইহা প্রায় মনুষ্য আকৃতির সমান। তাঁহার ক্রোড়ে সম্পৎকুমার নামক বিষ্ণু বিগ্রহের চিত্র। এই বিগ্রহটি সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। ইনি রামানুজকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন দিল্লীর বাদশাহকন্যার নিকট তিনি আছেন। বাদশাহ হিন্দু মন্দির লুণ্ঠন করিয়া সেই বিগ্রহটি লইয়া গিয়াছিলেন, বাদশাহের কন্যা বিগ্রহটি লইয়া খেলা করিতেন। রামানুজ দিল্লী গিয়া যখন বিগ্রহটি প্রার্থনা করেন তখন বিগ্রহটি স্বয়ং চলিয়া আসিয়া রামানুজের ক্রোড়ে উঠিলেন। সম্পৎকুমারের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া বাদশাহ-কন্যা বিগ্রহের সহিত দিল্লী ত্যাগ করেন, বিগ্রহটি পাল্কীতে আসিতে-ছিলেন, বাদশাহকন্যাকে পাল্কীতে তোলা হয়, পাল্কীর দরজা বন্ধ থাকে, পরে যখন খোলা হয় তখন বাদশাহ কন্যাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ কন্যার ভ্রাতাও সঙ্গে আসিয়াছিল, সে আর ফিরিয়া যায় নাই, বৈষ্ণব হয়, রামানুজ বলেন "তুমি পুরী যাও, সেখানে পতিতপাবনকে দর্শন করিয়া তোমার মুক্তি হইবে।" পুরীতে জগন্নাথদেবের সিংহ দরজায় ঢুকিয়াই জগন্নাথদেবের একটি মূর্ত্তি আছে, তাহাকে পতিতপাবন মূর্ত্তি বলা হয়, কারণ জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করা পতিতদের শাস্ত্রনিষিদ্ধ,

তাহারা মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া জগন্নাথদেবের পতিতপাবন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে। বাদশাহের পুত্রের সমাধি পুরীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারিদিকে দেওয়ালের উপর অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক লেখা আছে। কতকগুলি শ্লোকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত সুন্দরভাবে দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি শ্লোক দেওয়া হইল।

দূরে গুণান্তব তু সত্ত্বরজস্তমাংসি
তেন ত্রয়ী প্রথয়তি ত্বয়ি নির্গুণত্বম্।
নিত্যং হরে নিখিল সদ্গুণসাগরং হি
ত্বামামনন্তি পরমেশ্বরমীশ্বরাণাং ॥

শ্লোকটি রামানুজের প্রিয় শিষ্য কুরেশ স্বামিকৃত ইহাও শ্লোকের নীচে লেখা আছে। ইহার অনুবাদ,—"হে হরি, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ তোমার অনেক দূরে (তুমি এই সকল গুণের বহু উর্দ্ধে)। এজন্য বেদ তোমাকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি নিখিল সদ্গুণের সমুদ্র, এজন্য বেদ তোমাকে সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর বলিয়াছেন।" বেদে ব্রহ্মকে নির্গুণ ও সগুণ উভয়ভাবে বলিয়াছেন। এই শ্লোকে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে।

"ব্যাসবাক্য" বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ভুজমুথাপ্য চোচ্যতে।
ন বেদাচ্চ পরং শাস্ত্রং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥

"সত্য, সত্য, পুনঃ সত্য,—ভুজ উত্তোলন করত বলিতেছি। বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই, কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই।"

ব্রহ্মসংহিতা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

প্রথমোঽনন্তরূপশ্চ দ্বিতীয়ো লক্ষ্মণস্তথা।
তৃতীয়ো বলরামশ্চ কলৌ রামানুজো মুনিঃ ॥
দ্বাপরান্তে কলেরাদৌ পাষণ্ডপ্রচুরে জনে
রামানুজেতি ভবিতা বিষ্ণুধর্মপ্রবর্ত্তকঃ ॥

এখানে অনন্তের বিভিন্ন অবতারের উল্লেখ আছে—"প্রথম অবতার অনন্ত, দ্বিতীয় লক্ষ্মণ, তৃতীয় বলরাম, এবং কলিতে রামানুজ মুনি। দ্বাপরের শেষে এবং কলির আদিতে, যখন নাস্তিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে তখন বিষ্ণুধর্মপ্রবর্ত্তক রামানুজের আবির্ভাব হইবে।"

আর একটি শ্লোক (কাহার রচনা তাহার উল্লেখ নাই) এইরূপ—

নচেৎ রামানুজেত্যেষা চতুরা চতুরাক্ষরী।
কামবস্থাং প্রপদ্যন্তে জন্তবো হন্ত মাদৃশাঃ ॥

"যদি চারি অক্ষরযুক্ত "রামানুজ" এই কথা না হইত, তাহা হইলে আমার ন্যায় জীবদের কি অবস্থা হইত?"

শ্রীরামানুজ প্রণীত বেদার্থসংগ্রহ হইতে নিম্নলিখিত স্তবটি উদ্ধৃত হইয়াছে:—

অশেষচিদচিদ্বস্তু শেষিণে শেষশায়িনে।
নির্মলানন্তকল্যাণনিধয়ে বিষ্ণবে নমঃ ॥

"বিশ্বের যাবতীয় চেতন ও অচেতন বস্তু যাঁহার অংশ যিনি শেষ শয্যাশায়ী, যিনি অনন্ত নির্মল কল্যাণ গুণের আধার সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করি।"

নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিও উদ্ধৃত আছে—

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥
"তৈত্তিরীয় ১১ অনুবাক"

"এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শোনা যায় সকলের অন্তঃ ও বহিঃপ্রদেশ ব্যাপ্ত করিয়া নারায়ণ অবস্থিতি করিতেছেন।"

শঙ্খচক্রধরো বিদ্বান্ মালাং তুলসীজাং দধৎ স জীবন্মুক্তঃ (যজুর্বেদ)

"যে বিদ্বান্ দেহে শঙ্খ ও চক্রের চিহ্ন ধারণ করেন, এবং তুলসীমালা ধারণ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত।"

(ইহা যজুর্বেদে আছে বলা হইয়াছে, কোথায় আছে তাহা বলা হয় নাই।)

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈশরণমহং প্রপদ্যে
(শ্বেতাশ্বতর অঃ ৯ মঃ ৮?)

"আমি মোক্ষলাভের ইচ্ছায় সেই দেবতার শরণ গ্রহণ করিতেছি, যিনি আত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত।"

বিষ্ণুপত্নীং ক্ষমাং দেবীং সাধবীং মাধবপ্রিয়াং।
বিষ্ণুপ্রিয়াং সখীং দেবীং নমাম্যচ্যুতবল্লভাং ॥

"বিষ্ণুর পত্নী মাধবের প্রিয়া বিষ্ণুর প্রিয়া ও সখী অচ্যুতের বল্লভা মাধবী দেবীকে প্রণাম করি।" ইহা বোধহয় ভূদেবীর প্রণাম মন্ত্র।

রামানুজ বহু বৈষ্ণবের সহিত পুরী আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন এখানে নারদ পঞ্চরাত্র অনুসারে পূজা করিতে হইবে। পাণ্ডাগণ তাহাতে রাজি হয় নাই। তর্কে পাণ্ডাগণ হারিয়া যায়। এজন্য রাজা রামানুজকে সমর্থন করেন। পাণ্ডারা অনশন করে। রামানুজ রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে জগন্নাথদেব তাঁহাকে বলিতেছেন—পাণ্ডাদিগকে পূর্ব্বের প্রথায় পূজা করিতে দাও। সকালে উঠিয়া রামানুজ দেখেন কে তাঁহাকে রাত্রির মধ্যে পুরী হইতে কূর্মক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছে। কূর্মক্ষেত্র পুরী হইতে বহুদূরে, ওয়ালটেয়ারের পথে আধুনিক চিকাকোল ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়। রামানুজের সহিত একটি গোপাল বিগ্রহ ছিল, সেটি পুরীতে থাকিয়া যায়। জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে স্বর্গদ্বারঘাট (সমুদ্র) যাইবার পথে বেণু গোপাল মঠে সেই গোপাল মূর্ত্তি এখনও পূজিত হন। পুরীতে প্রায় কুড়িটি শ্রীবৈষ্ণব মঠ আছে। তন্মধ্যে এমার মঠ সর্বাপেক্ষা ধনী।

জগন্নাথ মন্দিরে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। মন্দিরের বাহিরে অবশ্য গোবর্দ্ধন মঠ আছে। তাহার মধ্যে একটি শিবালয়, একটী গোপাল মন্দির ও একটি শঙ্করাচার্য্যের মন্দির আছে। এই মঠের মধ্যে দেয়ালের উপর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি দেখিলাম।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জব দয়াতোষং সত্যং পীযুষবৎ ভজ ॥

"বৎস, মুক্তি ইচ্ছা কর তাহা হইলে বিষয়সকল বিষেরন্যায় ত্যাগ করিবে এবং ক্ষমা, সরলতা, সন্তোষ ও সত্যকে অমৃতের ন্যায় ভজনা কর।"

নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং।
অদ্যৈব মে মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

"যাঁহারা নীতিকুশল তাঁহারা নিন্দাই করুন, বা স্তব করুন, লক্ষ্মী অবস্থান করুন বা অন্যত্র চলিয়া যান, আমার অদ্যই মরণ হউক বা যুগান্তরে হউক,—কিছুতেই ধীর ব্যক্তিগণ ন্যায় পথ হইতে একপদও বিচলিত হন না।"

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বিভিন্ন মহাপুরুষদের প্রভাবের আলোচনা করিতেছিলাম। সুতরাং এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব ও উল্লেখ করা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব যে গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি-দর্শন করিতেন, সেই স্তম্ভের উপর তাঁহার শ্রীকরের অঙ্গুলির চিত্র এখনও দেখা যায়, তিনি বাসুদেব সার্বভৌমকে যে ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাও মন্দির গাত্রে অঙ্কিত আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার পদচিহ্নের উপর একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণ দরজার পার্শ্বে একটি মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীত রাধাকান্ত মঠে যে গম্ভীরা গৃহে চৈতন্যদেব বাস করিতেন সেই গম্ভীরা গৃহে তাঁহার ব্যবহৃত কন্থাও খড়ম রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অন্য সকল মহাপুরুষের যত প্রভাব পড়িয়াছে তদপেক্ষা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবই অধিক।

দম্ভের পরিণাম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

রূপের দম্ভ করেছে যে বারে বারে
রোগে শোকে আর শ্বিত্র চর্ম্মে অকাল জরার ভারে
বিকৃতাঙ্গ সে দুই দিন পরে চেনা নাহি যায় তারে।
কুলের দম্ভ করেছে যে-জন সভাজন সাক্ষাতে,
কন্যা তাহার একদা গভীর রাতে,
শুনেছি গিয়েছে ঘর ছেড়ে চলে এক চাঁড়ালের সাথে।
মত্ত যে ছিল জাত্যভিমান নিয়ে
পুত্র তাহার এক পাদ্‌রির কন্যাকে ক'রে বিয়ে
বাস করিতেছে খৃষ্টানদের পল্লীর মাঝে গিয়ে।
ধনের দম্ভ করেছে যে বার বার,
ছয় মাস পরে দেখেছি সহসা ভিখারীর দশা তার,
ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়ে ফেল হ'য়ে কারবার।
গর্ব্ব যে-জন করিত আপন সুপুত্র জামাতার,
দেখেছি তাহার স্কন্ধে চেপেছে বিধবা কন্যাভার,
পুত্র তাহার যক্ষ্মা ব্যাধিতে অস্থিচর্ম্মসার।
যানের দম্ভে পথচারীদের চলিত যে চাপা দিয়ে,
তার সে সাধের মোটরটি উল্‌টিয়ে
পুড়াল একদা তার দেহটাই পেট্রোল জ্ব'লে গিয়ে।
মানের দম্ভী ভোটের জোরে যে হয়েছিল জাঁহাবাজ,
বার বার হেরে ভোটের সমরে পেয়ে অপমান লাজ,
মানের সঙ্গে ধনও হারায়ে হয়েছে ফকির আজ।
হায় মহাকাল সবার কপাল চূর্ণিছে অবিরাম,
দেখিয়াছি নিতি দম্ভের পরিণাম,
দুই দণ্ডই কুম্ভকর্ণ জেগে করে সংগ্রাম।
উদ্যতচূড়া উদ্ধতশির গুঁড়ায় বজ্রপাণি,
সকলেই দেখে কেউত না শেখে; মনে মনে লয় মানি'
রঙ্গমঞ্চে অভিনয় বুঝি, নয় সতর্কবাণী।
হায় মায়া মূঢ় নর,
তুমি যে শুধুই খেলার পুতুল নিয়তির কিংকর,
গর্ব করিতে কাঁপে না ও অন্তর?

দম্ভ যখন কর'
আপনারে ভাবো সকলের চেয়ে বড়,
বিধাতা তখন হাসে অলক্ষ্যে অসি করে খরতর।
দম্ভ কি চলে উদ্যত ঐ খর খড়্গের তলে
বিল্বপত্র চর্ব্বিয়া কুতূহলে?
বলির পশুর দম্ভ ত নাহি চলে।
স্ফটিক স্তম্ভে বসিয়া তোমার দম্ভ কি ভাই সাজে?
ঐ স্তম্ভের মাঝে
বক্ষোবিদারী নরসিংহ যে রাজে।
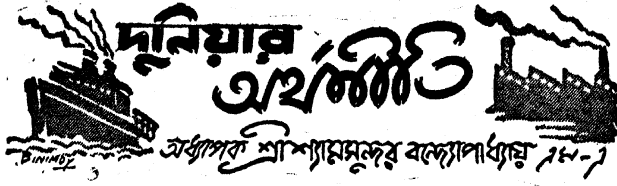
ভারতীয় চা ও ভারতের অর্থনীতি

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যত জিনিষ রপ্তানী হয়, তন্মধ্যে পাটের পরই চায়ের স্থান। এই চা রপ্তানীর দ্বারা ভারত বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ অর্থোপার্জ্জন করে। ভারতীয় চায়ের আন্তর্জ্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ভারতের চা-শিল্প সম্প্রসারিতও হইয়াছে যথেষ্ট এবং এখনও এই শিল্পের বহু উন্নতিসাধন সম্ভব। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে যে চা বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার মূল্য ছিল ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ভারত বিভাগের পর শ্রীহট্টের কিছু চা বাগান ছাড়া অখণ্ড ভারতের অধিকাংশ চা বাগান ভারতের ভাগে থাকিয়া যাওয়ায় চা রপ্তানীর হিসাবে ভারতের ক্ষতি হয় নাই। গত বৎসর বা ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দেও ভারত হইতে বিদেশে ৭২ কোটি টাকা মূল্যের ৪৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের মত চা রপ্তানী হইয়াছে। ভারতীয় চা ডলার এলাকাতেও প্রচুর চলে। গত বৎসর চা রপ্তানী বাবদ ডলার এলাকা হইতে ভারতের ১১ কোটি টাকা আয় হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এদেশে চা শিল্পের উন্নতি করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদি ডলার এলাকায় চায়ের রপ্তানী বাড়াইতে পারিলে বর্ত্তমান ডলার সঙ্কটের তীব্রতা হইতে ভারত অনেকটা মুক্তি পাইতে পারে। চা নেশার সামগ্রী, কাজেই ইহার দর সহজেই সঙ্কোচন ও প্রসারণ করা যায়। সাম্প্রতিক ডলার সঙ্কটের চাপ কমাইতে হইলে ডলার এলাকায় অধিকতর ভারতীয় পণ্য রপ্তানী ও ডলার এলাকা-জাত পণ্য আমদানী যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রণ,—এই দুই পথ অবলম্বন করিতেই হইবে।

তবে বিদেশে রপ্তানীর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বিদেশে এখন যেমন চায়ের সমৃদ্ধ বাজার সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতেও ক্রমে ভারতীয় চায়ের চাহিদা সেই পর্য্যায়েই বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় চা যাহাতে ভারতবাসী ও বিদেশী উভয়ের চাহিদা সমান হারে মিটাইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা কাম্য। ভারতের চা শিল্প এখনও প্রধানতঃ অভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন। শোনা যায় উচ্চশ্রেণীর চা সরবরাহের ব্যাপারে ভারতীয় ক্রেতাগণ বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়া থাকেন। ভাল ভারতীয় চা চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ভারতের বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত না হইলে তাহা নিশ্চয়ই দুঃখের কথা।

তাছাড়া ভারতীয় চা বিদেশে যে দরে বিক্রয় হয় ভারতে (পাঠাইবার খরচ বাঁচিয়া যাইবার জন্য) তাহার দর অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়া উচিত। কিন্তু যে কারণেই হউক, ভারতীয় চা ভারতের বাজারে বেশী দরে বিক্রীত হয়। এখন এদেশে ব্যবহারযোগ্য এক পাউণ্ড চায়ের দর কম পক্ষে দু টাকা, অষ্ট্রেলিয়ায় কিন্তু সমশ্রেণীর ভারতীয় চায়ের খুচরা মূল্য ১৮৩ পাই। এই দর আবার সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ায় চায়ের রেশন উঠিয়া যাওয়ায় হইয়াছে। রেশন ব্যবস্থা বলবৎ থাকা কালে অষ্ট্রেলিয়া সরকার আমদানী চায়ের মূল্য হারে সমতা রক্ষার জন্য যে সাবসিডি বা সরকারী সাহায্য দিতেন, এখন রেশন উঠিয়া যাওয়ায় তাঁহারা সেই সাহায্য প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই চায়ের দাম একটু বাড়িয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, স্বদেশীয় চা ব্যবহার করিতে গিয়া ভারতবাসীর এইভাবে ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য হওয়া অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার। এই অন্যায় ব্যবস্থার জন্য বণ্টনকারী বা যে কেহই দায়ী হউক, ভারতসরকারের উচিত অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিয়া বিদেশের ও ভারতের চায়ের বাজারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা। অবশ্য ভারতীয় চায়ের রপ্তানী বাজার যাহাতে কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সর্ব্বদাই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

জাতীয়-করণের পর ব্রিটেনের কয়লা শিল্প

জাতীয় স্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করা ব্রিটিশ সরকার নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই নীতি অনুসারেই ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কয়লা শিল্পের জাতীয়করণ হয়। জাতীয়করণের ফলে ব্রিটেনের কয়লা শিল্পের লক্ষণীয় সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে। শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা শিল্পপ্রসারের অনুকূল, ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা অর্জ্জনের সম্ভাবনা থাকিলে শিল্পপতি তাঁহার অর্থ ও অভিজ্ঞতা অধিকতর ফলপ্রসূরূপে কাজে লাগাইবে,—এই ধরণের একটি বদ্ধ ধারণা অনেকের আছে এবং এইরূপ ধারণা রাষ্ট্রের জাতীয়করণ নীতির বিরোধিতা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্রিটিশ কয়লাশিল্পের উন্নতি এই ধারণার পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিবে। ভারতে রাষ্ট্রীয়-করণের নীতি যথাসত্বর কার্য্যকরী হইবে বলিয়াই সকলে আশা করিয়াছিলেন, উপরোক্ত ধারণার বশেই এবং দেশের পণ্যাভাবের বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনা দশ বৎসরের জন্য স্থগিত হইয়াছে।

সম্প্রতি ব্রিটেনের ন্যাশনাল কোল বোর্ড বা জাতীয় কয়লা পরিষদের ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টে ব্রিটিশ কয়লা শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির স্পষ্ট পরিচয় আছে। খনি হইতে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, রপ্তানী বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা দিক হইতে সাফল্যলাভ করিয়া ব্রিটেনের কয়লাশিল্পে আলোচ্য বৎসরে ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড মুনাফা হইয়াছে। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বৎসর সরকারী পরিচালনাধীনে ব্রিটিশ

কয়লাশিল্পে মারাত্মক দুর্ঘটনার সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় নিম্নতম হইয়াছে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনের খনি হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছিল ১৮,৭২,০০,০০০ টন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিমাণ ১০ লক্ষ টন এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে বা আলোচ্য বৎসরে ১৫ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্ব্বসমেত ব্রিটেনে এবৎসর বিক্রয়যোগ্য কয়লার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১,৫০,০০,০০০ টন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ব্রিটেনের আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য (Economic survey turget) ২১,৫০,০০,০০০ টন হইতে ২২,০০,০০,০০০ টন। ব্রিটেনের কয়লা শিল্পের ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে উন্নতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রিটেনের কয়লাশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাবে এ বৎসর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ২ হন্দর করিয়া বেশী কয়লা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হইবার আগের বৎসরে ব্রিটেনের প্রতিটি কয়লাখনি-শ্রমিক পিছু যে পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল, আলোচ্য ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মাথাপিছু উত্তোলন (২৩ হন্দর) তাহার চেয়েও বেশী।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ৩০ লক্ষ টন বাড়িয়া ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনের কয়লা রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টন। এই কয়লা রপ্তানী দ্বারা ব্রিটেন ৫ কোটি পাউণ্ডের সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করিয়াছে। এছাড়া ব্রিটিশ বন্দরসমূহে বিদেশী জাহাজে কয়লা তুলিয়া দিবার হিসাবে এবং জাহাজী বীমা প্রভৃতিতে ব্রিটেনের আরও ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড লাভ হইয়াছে। *

ভারতীয় বাণিজ্যিক নৌবহর

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব উপকূল ভাগের পরিমাণ ৩২০০ মাইলের মত। এই উপকূলভাগের বাণিজ্য ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের ব্যাপারে প্রচুর জাহাজের দরকার হয়। পণ্যবাহী নৌবহরের হিসাবে ভারতের অবস্থা এখনও শোচনীয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে এদিক হইতে ভারতের মর্য্যাদা আলোচনারই উপযুক্ত ছিল না, সম্প্রতি ভারতসরকার যথেষ্ট আগ্রহান্বিত হওয়ায় এবং সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন, ইণ্ডিয়ান ষ্টীমসিপ কোম্পানী, ভারত লাইন ইত্যাদি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দায়িত্বগ্রহণে অগ্রসর হওয়ায় অবস্থার তবু কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সমুদ্রগামী জাহাজের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার টনের মত, ইহা এখন পৌনে চার লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। এই পৌনে চার লক্ষ টন জাহাজের মধ্যে ভারতের উপকূলভাগে নিযুক্ত আছে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টন এবং বাকীটা ভারতের সহিত ইয়োরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। এই বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা বর্ত্তমানে ২৪ খানি। ভারতে জাহাজ তৈয়ারীর উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই, সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে ভিজাগাপত্তনে যে জাহাজ কারখানাটি রহিয়াছে তাহার উন্নয়নের জন্য প্রভূত চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এখনও বড় বাণিজ্যপোত নির্ম্মাণে এ কারখানা সাফল্যলাভ করে নাই। ভারত সাধারণতঃ বিদেশ হইতে জাহাজ কেনে, অনেক সময় কেনে পুরানো জাহাজ, এই সব জাহাজের কর্ম্ম-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। এই জন্যই দেখা যায় ভারতের উপকূল বাণিজ্যে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টন ভারতীয় জাহাজ যে পরিমাণ মাল ও যাত্রীবহন করে, তাহা ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন বিদেশী জাহাজের সমানও হয় না।

ভারতসরকার অংশীদার হিসাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়ায় সম্প্রতি ভারতীয় বাণিজ্যিক নৌবহরের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। এই নৌবহরের পরিমাণ আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ টনে তোলা ভারতসরকারের ইচ্ছা। বলা নিষ্প্রয়োজন, সরকার প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করিলে যুদ্ধোত্তর মন্দাবাজারে বেসরকারী প্রচেষ্টায় এই অগ্রগতি সম্ভব নয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই যৌথভাবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই ব্যবসা পরিচালনায় অগ্রসর হইয়াছেন।

উপস্থিত সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর সহিত ভারতসরকার সম্মিলিত ভাবে ইষ্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশন নামে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। এইরূপ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা আছে। তবে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলেও ইহা কার্য্যকরী হইতে সওয়া দুই বৎসর লাগিয়াছে এবং ঠিক যতটা সচ্ছলতার সহিত কোম্পানী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। প্রস্তাব হয় যে, ইষ্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশনের মোট মূলধন হইবে দশ কোটি টাকা এবং ভারতসরকার ইহার শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার বা অংশ গ্রহণ করিবেন। এই প্রস্তাবে সিন্ধিয়া কোম্পানীকে শতকরা ২৬ ভাগ ছাড়া সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে শতকরা ২৩ ভাগ শেয়ার বণ্টন করিবার কথা ছিল। বর্ত্তমান মন্দাবাজারে দেশবাসীর নিকট শেয়ার বিক্রয়ে অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এখন ভারতসরকার কোম্পানীর শতকরা ৭৪ ভাগ শেয়ার গ্রহণ করিতেছেন এবং সিন্ধিয়া কোম্পানী গ্রহণ করিতেছেন শতকরা ২৬ ভাগ। মূলধন ১০ কোটি টাকা থাকিলেও মাত্র ২ কোটি লইয়া কোম্পানী কাজ আরম্ভ করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এবারের ভারতসরকারের বাজেটে এই উপলক্ষে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীকেই ম্যানেজিং এজেন্টস্ হিসাবে ইষ্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশনের পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতসরকারের ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত সি এইচ ভাবা হইয়াছেন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। এই কর্পোরেশনের পরিচালকমণ্ডলীতে ৬ জন সরকারের প্রতিনিধি ও ৩ জন সিন্ধিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি থাকিবেন। এই কোম্পানীর জন্য সম্প্রতি ভারতসরকার প্রত্যেকটি ১০ হাজার টনের

* ব্রিটেনের কয়লা শিল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহে ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের প্রচারপত্র হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

দুইখানি ক্যানাডীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন। প্রস্তাব আছে, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে এই কোম্পানীর জাহাজের পরিমাণ ১ লক্ষ টন করা হইবে। ইষ্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশনের জাহাজগুলি বহির্বাণিজ্যে চলাচল করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। উপস্থিত ইহারা ভারতের সহিত সিঙ্গাপুর, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রভৃতির বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিবে।

দেশবাসীর নিকট উক্ত কোম্পানীর অংশ বিক্রীত হইলে পরিচালনার ব্যাপারে দেশবাসীর কিছুটা হাত থাকিত বলিয়া এই পরিকল্পনা বাতিল হওয়ায় সকলেই দুঃখিত হইবেন। সিন্ধিয়া কোম্পানীর জাহাজ ব্যবসায় অভিজ্ঞতা প্রচুর, তাহাদের ম্যানেজিং এজেন্সিতে ক্ষুণ্ণ হইবার কিছু নাই, কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথাটিই ত্রুটিবহুল বলিয়া সরকারের অংশ সমন্বিত কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনার ব্যাপারে সরকারী প্রতিনিধিদের সহিত সাধারণ দেশবাসীর প্রতিনিধিদের স্থান থাকিলেই ভাল হইত। আমাদের মনে হয়, জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের পরিকল্পনা বাতিল করিবার পূর্ব্বে সরকারের আর একটু ধৈর্য্যসহ অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, উপরোক্ত কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতীয় বাণিজ্যিক নৌবহরের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনায় সকলেই আনন্দিত হইবেন।

ঋষি টলষ্টয়

শ্রীপ্রভাত হালদার

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট লিঁয়ন নিকোলভিচ্ টলষ্টয় রাশিয়ার এক ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম হয় তাঁহাদেরই জমিদারীর অন্তর্গত "ইয়াস্নায়া পোলিয়ানা" নামক স্থানে। তাঁহার মাতা রাশিয়ার জারের নিকট-আত্মীয়া ছিলেন।

এই মনীষী ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও 'দরিদ্রের মহামানব' রূপে বিশ্বমানবের বেদনা আপনার অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনার হৃদয়ে দারিদ্র্য এবং নিপীড়িত মানবের মর্ম্মবেদনার অংশ গ্রহণ করিয়া জগতের মাঝে তাহাদের দুঃখ বেদনা প্রচার করিলেন।

কিশোর বয়সেই তিনি 'কাজান' বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন, কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়াই বিলাসীর জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, বিলাসের জীবন তাঁহার অন্তরকে তিক্ত করিয়া তোলে। সেই কারণে তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের উদ্দেশে ককেশাস পর্ব্বতের এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন। এই নির্জ্জন বাসের পূর্ব্বে অজস্র ভোগের মধ্যে শান্তি খুঁজিয়া পান নাই বলিয়াই তিনি নির্জ্জনে বাস করেন।

এই ককেশাস পর্ব্বতের নির্জ্জন প্রান্তে তাঁহারই এক ভ্রাতা তাঁহাকে সৈনিক হইবার জন্য প্ররোচিত করেন। অতঃপর সৈনিক বিভাগে তিনি একটি দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেন। এই সৈনিক বিভাগেই তাঁহার হৃদয়ের সাহিত্যের বৃত্তিগুলি পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায়।

এই স্থানে কার্য্যের অবসরে তিনি প্রথম প্রথম গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন ও সেই গল্পগুলি তথাকথিত সাহিত্য-সমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

সৈনিক জীবন আর ভাল না লাগায় তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেণ্ট পিট্রসবার্গে ফিরিয়া আসেন। এই স্থানেই তাঁহার সাহিত্যজীবনের সুরু হয়। সেণ্ট পিট্রস্-বার্গের সাহিত্যিকরা সমাদরে তাঁহাকে তাঁহাদের সাহিত্য গোষ্ঠীর মধ্যে টানিয়া লন। এই স্থানেই টুর্গেনিভের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় লাভ ঘটে। War and Peace এই সময়ে রচিত হয়।

কোন কোন সমালোচকের মতে War and Peace (1862-69) তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। তৎকালীন রাশিয়া অথবা ইহার সাহিত্যকে জানিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম War and Peace পড়া আবশ্যক। কারণ এই পুস্তকে রাশিয়ার প্রকৃত রূপ-ই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

Maurice Baring বলিয়াছেন—"For the first time is an historical novel instead of saying.

This is very likely true, or what a wonderful work of historical reconstruction! We feel that we were ourselves there, that we know those people; that they are a part of our very own past."

সৈনিক বিভাগের কার্য্য ত্যাগ করিবার পর তিনি সেণ্ট পিট্‌স্‌বার্গ হইতে জার্ম্মাণী, ইটালী ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করিয়া আবার সেণ্ট পিট্‌স্‌বার্গে ফিরিয়া আসেন ও বিবাহ করিয়া আপন জমিদারির উপর দৃষ্টি রাখেন।

এই জমিদারির মধ্যে যখন তিনি বাস করিতেছিলেন তখন দরিদ্র কৃষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা তাঁহার অন্তরকে আকর্ষণ করে। এই দরিদ্র কৃষকদের দুঃখ দৈন্য তাঁহার অন্তরকে এতদূর বিচলিত করে যে তিনি তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তাহাদের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কৃষকদের জীবনযাত্রা প্রণালী লক্ষ্য করিয়া আসেন। এই সময়ে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "Anna Karenina" রচনা করেন (1875-77.)।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট পিট্‌স্‌বার্গের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই "Anna Karenina"র জন্ম হয়। পুস্তক খানির মধ্যে রাশিয়ার প্রকৃত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

টলষ্টয় শেষ জীবনে একখানি বিরাট উপন্যাস রচনা করেন। এই পুস্তকখানির নাম "Resurrection." এই পুস্তক রচনা কালে লেখকের বয়স ছিল ৭০ বৎসর (1898)। কেহ কেহ ইহাকেই টলষ্টয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা বলেন। টলষ্টয় আর একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে—এই পুস্তকখানির নাম "Kreutzar Sonata."

তাঁহার অন্যান্য পুস্তকগুলি এই—"Boyhood, Childhood and Youth." "The Two Hussars." "Family Happiness." "The Cosacks." (সৈনিক জীবনের ইতিহাস লইয়া এই পুস্তক রচিত হয়) "Polikuska." "The Death of Ivan Ilych." "Holstomer." "The Story of a Horse." "Master and Men." এবং তাঁহার মৃত্যুর পর "Hadji Murad," (ইহাও কশাক সৈনিকদের লইয়া লিখিত) প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত গল্পগুলিও অতি সুন্দর; "Sevastopal." নামক পুস্তকখানির মধ্যে তাঁহার সৈনিক বৃত্তির চমৎকার রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ছোট গল্পের যে সঞ্চয়ন আছে তাহাও অতি সুন্দর। "Twenty Three Tales." নামক গল্প সঞ্চয়নখানি তাঁহার মৃত্যুর পর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প-সঞ্চয়ন হিসাবেই প্রকাশিত হয়।

টলষ্টয়ের রচনার মধ্যে "সৌন্দর্য্য কি?" তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার রচনার মধ্যে সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং সততার রূপ পরিষ্কার পাওয়া যায়। এই সকল ছোট গল্পের মধ্যে "বর্ত্তমান সাহিত্যের রূপ"ই লেখক দিয়াছিলেন। সাহিত্যের প্রাথমিক পাঠ হিসাবে যদি এই গল্পগুলিকে লওয়া হয়, তাহাতেও কোনও রূপ ভুল হয় না। একথা প্রাচ্যের সকল সমালোচকই স্বীকার করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে টলষ্টয় "Kreutzar Sonata." নামক স্মরণীয় পুস্তকখানি রচনা করেন। তাহাতে খৃষ্টধর্ম্ম মতে বিবাহ, কৌমার্য্য, সতীত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি অতি নিপুণতার সহিত সুন্দর ভাবে আলোচনা করেন। এই পুস্তকখানি যে কেবল মাত্র রাশিয়ার জন্য লিখিত হইয়াছিল তাহা নহে। নানা দেশের সামাজিক সমস্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় একটি ট্রেণের কয়েকজন যাত্রীর আলোচনার মধ্য দিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

সমাজের প্রতি তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী এবং যাহা তিনি সমাজের নিকট দাবী করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর রূপ গ্রহণ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

টলষ্টয় চিরকালই ঋষি প্রকৃতির ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি নিজের দেশের নিপীড়িত মানবের মধ্য দিয়া বিশ্ব-মানবের দুঃখ, দৈন্য ও বেদনার সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই তিনি সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া মানবের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের ব্রতে লেখনি ধরিয়াছিলেন। সেই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার লেখনিতে দুঃখ-দৈন্য ও অভাব অনটনের চিত্রই অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অসংখ্য উপন্যাসের মধ্যে "Child hood" (1852). "Cosacks" (1862). "War and Peace" (1862-69). "Anna Karenina" (1875-77). "The Kreutzar

Sonata". "Darkness" (1886). "Resurrection" (1898) এই উপন্যাসগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে অতি উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এক ভীষণ দুর্য্যোগময়ী শীতের রাত্রে সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অতি দীন বেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। তাহার পর হইতে দুই বৎসর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অতঃপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার একটি সাধারণ রেলওয়ে ষ্টেশনে নিউমোনিয়া আক্রান্ত এক ভিখারীকে পাওয়া যায়। ইনিই ঋষি টলষ্টয়। এই রেলওয়ে ষ্টেসনেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জয়দেবের ছন্দ

শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে লেখা দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত একটি গীত-কাব্য। ইহাতে ৮০টি শ্লোক ও ২৪টি গীত আছে। ইহাদের মধ্যে ৭৭টি শ্লোক বিভিন্ন বৃত্তছন্দ। একটি শ্লোক জাতিছন্দে ও অবশিষ্ট ২টি শ্লোক ও ২৪টি গীত অপভ্রংশ ছন্দে রচিত। আমরা প্রথমে জয়দেবের সংস্কৃত ছন্দ ও পরে তাঁহার অপভ্রংশ ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জয়দেব সংস্কৃত ছন্দ রচনায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। গীতগোবিন্দের কয়েকটি শ্লোকে শিখরিণী, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, পুষ্পিতাগ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা ও স্রগ্ধরা—এই কয়টি সংস্কৃত ছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্লোকগুলি যে ঐ সকল ছন্দে রচিত ইহা বুঝাইবার জন্য কবি ছন্দের নাম কৌশলে শ্লোকগুলিতে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র তিনি যে ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন শুধু তাহাই নহে, ছন্দ সম্বন্ধে তিনি নিজেও যেমন সচেতন থাকিতেন, সেইরূপ ছন্দের প্রতি পাঠক ও শ্রোতাদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহিতেন। নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে ছন্দের নামটি (শিখরিণী) কবি কিরূপ কৌশলে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় :

> দুরালোকঃ স্তোকস্তবক-নবকাশোক লতিকা
> বিকাশঃ, কাসারোপবন-পবনোঽপি ব্যথয়তি।
> অপি ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গী রণিত রমণীয়া ন মুকুল
> প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি॥ (২, ২০)

শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ ভবভূতির ন্যায় জয়দেবেরও বিশেষ প্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি ৭৮টি শ্লোকের মধ্যে ৩৭টিই এই ছন্দে লিখিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দে কোন্ ছন্দ কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া হইল :

বৃত্তছন্দ	
শার্দ্দূলবিক্রীড়িত	৩৭
বসন্ততিলক	৮
দ্রুতবিলম্বিত	১
শিখরিণী	৮
মালিনী	৩
বংশস্থ	৩
হরিণী	৮
অনুষ্টুপ	৩
উপেন্দ্রবজ্রা	২
পুষ্পিতাগ্রা	৩
স্রগ্ধরা	১
জাতিছন্দ	
আর্য্যা	১

আশ্চর্য্যের বিষয় মন্দাক্রান্তা ছন্দে একটি শ্লোকও নাই। অবশ্য কালিদাস মন্দাক্রান্তা ছন্দে যেরূপ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পর অন্য কবির পক্ষে মন্দাক্রান্তা ব্যবহারে কুণ্ঠা হওয়া স্বাভাবিক।

জয়দেবের কয়েকটি বৃত্তছন্দের উপর অপভ্রংশ পদ্ধতির প্রভাব পড়িয়াছে। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লেখা নিম্নলিখিত শ্লোকটি পড়িলেই ইহা বুঝা যাইবে :

> বেদানুদ্ধরতে। জগন্তিবহতে। ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
> দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
> পৌলস্ত্যংজয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
> ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায়তুভ্যং নমঃ॥
> (১, ১৬,)

এখানে যতি ও মধ্যানুপ্রাসের সাহায্যে এক একটি পংক্তিকে স্পষ্টত : তিন ভাগে ভাগ করিয়া শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এক প্রকার তরঙ্গ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই মিত্রাক্ষরতা ও যতি-প্রাধান্য অপভ্রংশ এবং পরবর্ত্তী প্রাদেশিক ভাষার বৈশিষ্ট্য। উক্ত শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত চরণগুলিতে বাংলা দীর্ঘ ত্রিপদীর আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

অপভ্রংশ ছন্দ

অবশ্য এই সকল শ্লোক অপেক্ষা গীতগোবিন্দের ২৪টি গীতই অধিক প্রসিদ্ধ। এই গীতগুলি অপভ্রংশ মাত্রাছন্দে রচিত। ইহাদিগকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণী

এই শ্রেণীর ছন্দগুলি প্রাচীন জাতিছন্দের আদর্শ-অনুসারে রচিত। ২৪টি গীতের মধ্যে ১৯টিই এই জাতীয় ছন্দে লেখা হইয়াছিল। জাতিছন্দের অপর নাম মাত্রা ছন্দ। একটি পদ্য পংক্তিতে ব্যবহৃত মাত্রা সমষ্টির উপর এই ছন্দের গঠন নির্ভর করে। কিন্তু ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। জাতিছন্দের এক একটি চরণ চার মাত্রার 'গণ' দ্বারা বিভক্ত করা যাইতে পারে। আর্য্যা ছন্দেই চার মাত্রার গণের সূত্রপাত হইয়াছিল, বৈতালীয় ও ঔপচ্ছন্দসিক ছন্দে এই নূতন গণবিভাগ আরও স্পষ্ট। কিন্তু তখনও উচ্চারণে স্বরাঘাত-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই ও কবিতা তখন সুর করিয়া পড়া হইত বলিয়াই বোধ হয় প্রাচীন জাতিছন্দের চার মাত্রার চলন ছন্দের গঠনকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। অপভ্রংশ যুগের উচ্চারণে স্বরাঘাত প্রাধান্য লাভ করায় কবিতা আবৃত্তির সময় এক প্রকার ঝোঁক উৎপন্ন হইয়া পদ্য পংক্তিকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিত। মিত্রাক্ষরতা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এই ঝোঁক বিভাগগুলি আরও স্পষ্টতা লাভ করে। পূর্ব্বে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের একটি উদাহরণে তাহা দেখান হইয়াছে। একপ্রকার জাতিছন্দে এই ঝোঁক, মিল ও চার মাত্রার 'গণ' বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে এই ছন্দ-গোষ্ঠীর নাম মাত্রাসমক ছন্দ। আমাদের আলোচ্য প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গীতগুলি এই মাত্রাসমকের আদর্শে রচিত। এই শ্রেণীর মধ্যে নানাপ্রকার ছন্দের প্যাটার্ণ পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের আবার কয়েকটি উপবিভাগ আছে :—

(ক) একপ্রকার মাত্রাসমক ছন্দের নাম পাদাকুলক। ইহাও চার মাত্রার চারিটি অংশে বিভক্ত ১৬ মাত্রার ছন্দ; তবে অন্যান্য মাত্রাসমকের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, পাদাকুলকে লঘু গুরু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ নাই। ইহাই খাঁটি অপভ্রংশ ছন্দ। প্রসিদ্ধ মোহমুদ্গরের শ্লোকগুলি এই ছন্দে রচিত। অনেকে ইহাকে পজ্ঝটিকা ছন্দও বলেন। পাদাকুলকের সহিত জয়দেবের এই ছন্দের সামান্য পার্থক্য এই যে, পাদাকুলক 'চতুষ্পদী' ছন্দ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু জয়দেবের ঐ জাতীয় ছন্দে দুই চরণের এক একটি স্তবক (stanza)। এই ছন্দ-রীতি পরবর্ত্তী বাংলা ছন্দে অনুসৃত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দের ৪টি গীত (গীত সং ৯, ১২, ১৪, ১৮) এই রূপ ৪+৪+৪+৪=১৬শ মাত্রার দ্বিপাদ পাদাকুলক ছন্দে রচিত। একটি দৃষ্টান্ত :—

> স্তনবিনি। হিতমপি ॥ হারমু। দারম্।
> সা মনুতে কৃশ তনুরিব ভারম্ ॥
> সরস মসৃণপি মলয়জ পঙ্কম্।
> পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥ (গীত, ৯)

(ক১) জয়দেব এইখানেই প্রাচীন শাস্ত্র-সম্মত ছন্দ পদ্ধতির নিকট হইতে বিদায় লইলেন। কারণ অবশিষ্ট সমস্ত ছন্দই কতকটা নূতন ধরণের। আমরা প্রথমে পাদাকুলক হইতে উৎপন্ন এক নূতন ছন্দের উল্লেখ করিতে পারি। প্রচলিত পাদাকুলক পংক্তির শেষে একটি মাত্রা কমাইয়া এই নূতন ছন্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার মাত্রা-বিন্যাসে— ৪+৪+৪+৩=১৫ | ১৬ সংখ্যার গীতিটি এই ছন্দে রচিত।—

> অনিল ত-। রল কুব-। লয়-নয়। নেন।
> তপতি ন সা কিশলয় শয়নেন ॥
> শ্রীজয়দেব ভণিত বচনেন।
> প্রবিশতু হরিরাপি হৃদয় মনেন ॥

(খ) এবার আমরা যে ছন্দের কথা বলিব, তাহাকে জয়দেবের বিশেষ প্রিয় ছন্দ বলা যায়, কেননা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ১৯টি গীতের মধ্যে নয়টিই (গীত সং—৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১৭, ২০, ২২, ২৩) এই ছন্দে রচিত। ইহাও পাদাকুলকের ন্যায় চার মাত্রার গণ-বিভক্ত ছন্দ। কিন্তু ইহার উভয় চরণেই ১৬ মাত্রার পরিবর্ত্তে ৪+৪+৪+৪+৪+৪+৪= ২৮ মাত্রা পাওয়া যায়। এই ছন্দের উদাহরণ :—

> (১) ফেলিক। লাকুতু। কেন চ। কাচিদ। মুং যমু। না জল কূলে।
> মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে ॥
> (গীত, ৪)
>
> (২) উন্মদ মদনমনোরথপথিক বধূ জন জনিত বিলাপে।
> অলিকুল সঙ্কুল কুসুম সমূহ নিরাকুল বকুল কলাপে ॥
> (গীত, ৩)

(খ১) এই ছন্দে ১৬ মাত্রার পর প্রধান যতি-পতন হয়। কিন্তু ১১ সংখ্যক গীতের প্রতি পংক্তির দুই স্থানে (৮ ও ১৬ মাত্রার পরে) প্রধান ঝোঁক পড়ায় এবং ঐ দুই স্থানে মিল ব্যবহৃত হওয়ায় এই ছন্দের এক একটি পংক্তি স্পষ্টতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই জাতীয় ছন্দকে বাংলা ত্রিপদীর পূর্ব্বাভাষ বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দৃষ্টান্ত :—

> পততি প। তত্রে ॥ বিচলিত। পত্রে ॥ শঙ্কিত। ভবদুপ। যানম্।
> রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥
> মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
> চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলম্ ॥

(খ২) খ-শাখা বর্ণিত ছন্দের আরও দুইটি নূতন রূপ গীত-গোবিন্দের দুইটি গীতে পাওয়া যায়। ইহার একটিতে উক্ত ১৮ মাত্রার ছন্দ-পংক্তি হইতে এক মাত্রা কমাইয়া ও পূর্ব্ব-বর্ণিত উপায়ে প্রবল যতি-পতন ও মিলের সাহায্যে এক একটি পংক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া (৪+৪ | ৪+৪ | ৪+৪+৩=২৭) ছন্দ বৈচিত্র্য উৎপন্ন করা হইয়াছে। যেমন :—

ঘনচয়। রুচিরে॥ রচয়তি। চিকুরে॥ তরলিত। তরুণা। ননে।

কুরুবক কুসুমং চপলা সুষমং রতিপতি মৃগকাননে॥ (গীত, ১৫)

(খ ৩) দ্বিতীয়টিতে ঐ ছন্দের শেষে এক মাত্রা যোগ করিয়া (৪+৪+৪+৪। ৪+৪+৫=২৯ মাত্রা নূতনত্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে।

নয়ন কু-। রঙ্গ ত-। রঙ্গ বি-। কাশ নি-॥ বাস ক-। রে শ্রুতি। মণ্ডলে।

মনসিজ পাশবিলাস ধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে॥ (গীত, ২৪)

(গ) এ পর্য্যন্ত চার মাত্রার 'গণ'-গঠিত সম-পাদ (অর্থাৎ যে-ছন্দের চরণগুলি মাত্রা দৈর্ঘ্যে সমান) ছন্দের কথা বলা হইল। কিন্তু পংক্তিগুলির মাত্রা-দৈর্ঘ্য ছোট-বড় করিয়াও ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে। গীত-গোবিন্দের একটি গীতে স্তবকের প্রথম চরণে পাঁচটি 'গণ' অর্থাৎ ৪×৫=২০ মাত্রা এবং দ্বিতীয় চরণে চারটি 'গণ' অর্থাৎ ৪×৪=১৬ মাত্রা পাওয়া যাইতেছে। প্রসিদ্ধ দশাবতার স্তোত্রটি এই ছন্দে রচিত :—

প্রলয় প-। য়োধি জ-। লে ধৃত। বানসি। বেদম্।

বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম্॥ (গীত, ১)

(ঘ) গীতগোবিন্দের দ্বিতীয় গীতটিতে অসম-পাদ ছন্দের বৈচিত্র্য আরও অধিক। আমরা ইহাকে অমিল অসম ত্রিপাদ ছন্দ বলিতে চাই। ইহার প্রথম চরণে তিন 'গণ' ও ১২ মাত্রা (৪+৪+৪), দ্বিতীয় চরণে ছয় মাত্রা (২+৪) এবং তৃতীয় চরণে ১১ মাত্রা (৪+৪+৩)। যেমন :—

শ্রিত কম-। লা কুচ। মণ্ডল।
ধৃত। কুণ্ডল।
কলিত ল-। লিত বন-।মাল।
দিনমণি মণ্ডল মণ্ডন।
ভব খণ্ডন।
মুনিজন মানস হংস।

রবীন্দ্রনাথের

কোকলি নৃপতির। তুলনা নাই। জগৎ জুড়ি যশোগাথা।

এই ছন্দের সহিত উক্ত জয়দেবী ছন্দের পাঠনিক সাদৃশ্য সামান্য হইলেও তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী

এ পর্য্যন্ত ৪ মাত্রার 'গণ' দ্বারা গঠিত ছন্দের কথা বলা হইল। কিন্তু গীতগোবিন্দে আর এক শ্রেণীর ছন্দ পাওয়া যায়, ইহা পাঁচ মাত্রার 'গণ' দ্বারা গঠিত। দুইটি গীতে এইরূপ পাঁচ মাত্রার চলন পাওয়া যাইতেছে।

(১) ইহার উভয় চরণেই ৫×৪=২০ মাত্রা। যেমন,

অহহ কল-। য়ামি বল-। য়াদি মণি। ভূষণম্।
হরিবিরহ দহন বহনেন বহু দূষণম্॥
কুসুম সুকুমার তনুমতনু শরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতি বিষম শীলয়া॥ (গীত, ১৩)

(২) ইহা দীর্ঘ-ছন্দ, প্রতি চরণে ৩৪ মাত্রা ; মাত্রা সমাবেশ— ৫+৫।৫+৫।৫+৫+৪। যথা—

বদসি যদি। কিঞ্চিদপি॥ দন্তরুচি। কৌমুদী॥
হরতি দর-। তিমিরমতি। ঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদন চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন চকোরম্॥
(গীত, ১৯)

ইহার সহিত তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের—

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে ক'রেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

অথবা—

একদা তুমি। অঙ্গ ধরি। ফিরিতে নব। ভুবনে.
মরি মরি অ-। নঙ্গ দেব। তা,
কুসুম রথে মকরকেতু উড়িত মধু-পাবনে
পথিক বধূ চরণে প্রণতা।

তৃতীয় শ্রেণী

এই গোষ্ঠীর ছন্দ সাত মাত্রার গণ' দ্বারা গঠিত। একটি মাত্র গীত এই ছন্দে রচিত হইয়াছিল। এই দ্বিপাদ ছন্দের প্রতি চরণে ৭+৭+৭ +৩=২৪ মাত্রা থাকিবে। উদাহরণ :—

মামিয়ং চলি-। তা বিলোক্য বৃ-। তং বধূ নিচ-। য়েন।
সাপরবিতয়া ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন॥
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ॥
(গীত ৭)

এই ছন্দের সপ্তমাত্রিক 'গণ' গুলির প্রথম ও চতুর্থ মাত্রায় এক একটি গুরু অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার ফলে কবিতাটিতে বৃত্তছন্দের ন্যায় একটি বিশেষ প্যাটার্ণ-সৃষ্টি হইয়াছে। অক্ষর গুণিয়াও এই ছন্দের বিশ্লেষণ করা সম্ভব। বৃত্তছন্দের গণ-পদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ করিলে এই সপ্তদশাক্ষর ছন্দের গণ-বিন্যাস হইবে র-স-জ-জ-ভ গ-ল।

চতুর্থ শ্রেণী

চতুর্থ শ্রেণীর অপভ্রংশ ছন্দগুলিকে মিশ্র-ছন্দ বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন মাত্রা-দৈর্ঘ্যের 'গণ' দ্বারা এই ছন্দ গঠিত। গীতগোবিন্দের দুইটি গীতে দুই প্রকার মিশ্র ছন্দ পাওয়া যাইতেছে।

(১) ১ম চরণ—৫+৫+৫+২=১৭ মাত্রা
২য় চরণ—৮+৫+২ = ১৫ „
বা
৩+৫+৫+২ = „ „
বা
৪+৪+৫+২ = „

উদাহরণ :—

মধুমুদিত। মধুপকুল। কলিত রা-। বে।
বিলস মদন রস-। সরস ভা-। বে॥
মধুরতর পিক নিকর-নিনদ মুখরে॥
বিলস দশনরুচি রুচির শিখরে॥

(গীত, ২১)

(২) এবার যে মিশ্র ছন্দটির কথা বলিব তাহাতে জয়দেব অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাকে 'চতুষ্পাদ' ছন্দ বলিয়া গণ্য করিতে চাহি, ক-খ—ক-খ—এইভাবে মিত্রাক্ষর-বিন্যাস করা হইয়াছে।

১ম চরণে—৩+৩+৫=১১ মাত্রা, মিল ক
২য় চরণে—৩+৩+৩=৯ " " খ
৩য় চরণে—৩+৫+২=১০ " " ক
৪র্থ চরণে—৪+৪+৫=১৩ " " খ

উদাহরণ :—

দহতি। শিশির। ময়ূখে।
মরণ। মনুক। রোতি।
পততি। মদন বিশি। খে।
বিলপতি। বিকল ত। রোতি॥
ধ্বনতি মধুপ সমূহে।
শ্রবণমপিদধীতি।
মনসি বলিত বিরহে।
নিশিনিশি রুজমুপযাতি॥

(গীত, ১০)

এই ছন্দটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার প্রতি চরণের প্রথম ছয়টি অক্ষর লঘু এবং অবশিষ্টাংশ (১) গুরু+লঘু, (২) লঘু+গুরু+গুরু, (৩) লঘু+লঘু+গুরু এবং (৪) লঘু+লঘু+গুরু+লঘু অক্ষর দ্বারা রচিত। সুতরাং ইহাকেও অক্ষর ছন্দ বলা যাইতে পারে। বৃত্তছন্দ অনুসারে ইহার গণ-বিন্যাস হইবে—ন-ন-য, ন-ন-গ-ল, ন-ন-স, ন-ন-স-ল।

জয়দেবের অপভ্রংশ ছন্দে গুরু অক্ষরের প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দুই একটি কথা বলিব। যুগ্ম-মাত্রিক ছন্দে (অর্থাৎ চার মাত্রার 'গণ-গঠিত ছন্দে) গুরু অক্ষর সাধারণতঃ অযুগ্ম মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৪, ৭, ১১, ১৫ প্রভৃতি মাত্রা অপেক্ষা ১, ৫, ৯, ১৩ প্রভৃতি মাত্রায় গুরু অক্ষরের প্রয়োগই বেশী। ইহার ফলে ঐ সকল অক্ষর উচ্চারণকালে এক প্রকার তরঙ্গ-ভঙ্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জয়দেবের সমস্ত অপভ্রংশ ছন্দেই শেষ 'গণে' অন্ততঃ একটি গুরু অক্ষরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য পংক্তির শেষ অংশে একটি ঝোঁক অনুভূত হয়। অধিকাংশ বাংলা ছন্দেও এই বৈশিষ্ট্যটুকু পাওয়া যাইবে।

জয়দেবের ছন্দ বিশ্লেষণ করিবার সময় কোন কোন গণের মাত্রা-দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে পাঠকগণের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে। আমরা যাহাকে ৪+৪ এইরূপ দুইটি 'গণ' বলিয়াছি, অনেকে হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে উহা ৮ মাত্রার একটি ঝোঁকে পড়িবেন, অথবা ঐরূপ কোন কোন গণকে ২+৬ বা অন্য কোন ভাবে গ্রহণ করিবেন। অনেক সময় যুগ্ম মাত্রায় গুরু অক্ষর ব্যবহার করিয়া আটমাত্রার এক একটি যুক্ত গণ সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন, ধূমকেতুমিব', 'কনকদণ্ড-রুচি', 'বন্ধুজীবমধু'। সুতরাং এক একটি গীতের গণবিভাগ ও গণ-দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আমরা যেরূপ বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছি, সমগ্র গীতের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে দুই এক ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। জয়দেবের ছন্দের প্রধান তিন শ্রেণীর চলন, অর্থাৎ চার, পাঁচ ও সাত মাত্রার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন মতভেদ হইবে না।

'গণ' বিভাগ সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। জয়দেবের সময়েও ছন্দ সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় পংক্তি-নির্ভর ছিল, বাংলা ছন্দের মত পর্ব্ব-নির্ভর হয় নাই অর্থাৎ একটি চরণে মোট কত মাত্রা ব্যবহৃত হইল তাহার উপরেই ছন্দের গঠন নির্ভর করিত। 'গণ' বিন্যাস তখন ছন্দের গঠন-নির্ণয়ে সহায়তা করিত না। কিন্তু বিভিন্ন পর্ব্বের বা পদের মাত্রা-দৈর্ঘ্যের উপরেও বাংলার ছন্দ-প্রকৃতি নির্ভর করে। প্রকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দেই যে এই প্রকার যতি বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'গণ' বা পর্ব্বের সূত্রপাত হইয়াছিল, ইহা দেখাইবার জন্যই চার, পাঁচ সাত মাত্রার গণের কথা বলা হইল।

গীতগোবিন্দে গীতগুলির রাগ ও তালের উল্লেখ দেখা যায়। ঠিক এই সকল রাগ ও তাল জয়দেবের সময় হইতেই প্রচলিত ছিল কিনা জানিনা এবং সমস্ত সংস্করণই এক একটি গীতের রাগ ও তাল সম্বন্ধে একমত বলিয়াও মনে হয় না। তথাপি মিথিলা হইতে প্রকাশিত লোচন কবি কৃত 'রাগ তরঙ্গিনী'তে এই সকল রাগ রাগিণীকেই ছন্দের নাম বলিয়া গণ্য করার চেষ্টা হইয়াছে। রাগ ও তাল অনুযায়ী গীতগুলির শ্রেণী বিভাগের সহিত ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা যেরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়াছি, তাহার কোন মিল নাই। যেমন, ১০টি গীত ৪×৭=২৮ মাত্রার ছন্দে রচিত। কিন্তু এই গীতগুলি বসন্ত ও যতি, রামকিরী ও যতি, গুর্জ্জরী ও যতি, মালব ও একতালি, কর্ণাট ও যতি গুর্জ্জরী ও একতালি, ভৈরবী ও যতি, বসন্ত ও যতি, দেশ বরাড়ী ও রূপক এবং রামকিরি ও যতি—এই সকল রাগ ও তালে গীত হইবার কথা। সুতরাং রাগ-রাগিণীর এমন কি তালের নাম অনুসারেও জয়দেবের ছন্দের শ্রেণীবিভাগ সমর্থন করা যায় না।

জয়দেব সংস্কৃত যুগের শিক্ষা এবং অপভ্রংশ যুগের রুচি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল অনাগত নব-যুগের দিকে। সেজন্য তাঁহার সাহিত্যে একাধারে প্রাচীন কাব্যের প্রভাব ও অপভ্রংশোত্তর প্রাদেশিক সাহিত্যের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেবের ছন্দ আলোচনা করিয়া আমরা কবির প্রতিভার এই দিকটি দেখাইতে চেষ্টা করিলাম।

মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবস প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পালন করা উচিত। ঐ দিবস গুলিতে মহাপুরুষদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতে ছেলেদের উৎসাহিত করা উচিত। মহাপুরুষদের জন্মস্থান, কর্ম্মক্ষেত্র প্রভৃতি ম্যাপের সাহায্যে শিশুদের দেখাইলে তাহারা আনন্দ পাইবে এবং দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও করিতে পারিবে। মহাপুরুষদের বাণী হইতে সার্ব্বজনীন বিভেদহীন অংশগুলি বাছিয়া শিশুদের মধ্যে যাহাদের হাতের লেখা ভাল তাহাদের দ্বারা লিখাইয়া দেওয়ালে টাঙ্গান উচিত। মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তাঁহাদের বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রের ছবি, শিক্ষক মহাশয় শিশুদের সাহায্যে আঁকিবার চেষ্টা করিবেন। মহাপুরুষদের জন্ম, কর্ম্ম ও বাণী দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শিশুদের বয়স ও বোধ-শক্তির অনুযায়ী করিয়া তাহাদের কাছে সাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা যাইতে পারে। —বাঙলার শিক্ষক

* * * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ও আই, এস-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরীক্ষায় গতবারের তুলনায় অনেক কম ছাত্রছাত্রী পাশ করিয়াছে। প্রায় ১৭ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ২৯ জন এবং আই, এস-সি পরীক্ষায় মাত্র শতকরা ৩১ জন ছাত্র ও ছাত্রী উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। অপর দিক হইতে হিসাব করিলে আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৭১ জন ও আই, এস-সি পরীক্ষায় শতকরা ৬৯ জন ছাত্রছাত্রী ফেল করিয়াছে। এই অত্যধিক ফেলের সংখ্যা যেমন উদ্বেগজনক, তেমনি হতাশাব্যাঞ্জক। যদিও এক বিষয়ে অকৃতকার্য হইবার জন্য ২১ শত পরীক্ষার্থী পুনরায় সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিবার দ্বিতীয় সুযোগ পাইবে, তথাপি সে পরীক্ষায় পাশ হইলেও তাহাদের কার্যতঃ একটি বৎসর নষ্টই হইবে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শতকরা মাত্র ২৯ জন বা ৩১ জন ছাত্র পাশ হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজ-গুলির পক্ষে ইহা অগৌরবের বিষয়। ছাত্রগণ যথাযথভাবে পড়া-শুনা করে না বলিয়াই পরীক্ষার ফল এত খারাপ হয়—ইহাও যেমন আংশিক সত্য, অন্যদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা দিতে পাঠান না, ইহাও তেমনি সত্য। —যুগান্তর

* * *

ভারতের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতে কোথায় কতজন ভারতবাসী আছেন এ বিষয়ে আজ সকলেই জানিতে বেশ উৎসুক। বিশেষ ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া এই সব প্রবাসী ভারতীয়দের বর্ত্তমান দাবী ও তার নানা প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির সহিত সকলেই কিছু কিছু পরিচিত আছে। একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের প্রবাসে থাকাকালীন এই ভাবে আনুগত্য রক্ষার বিষয়ে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ (west Indies) থেকে জনৈক ভারতীয় ভারত থেকে রাষ্ট্রভাষার কিছু কিছু শিক্ষক প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছেন। ভারত থেকে পৃথিবীর নানা দেশে ভারতীয়দের এইভাবে ছড়িয়ে পড়া গত দেড়শ' বছর ধরে যে ভাবে চলেছিল, যার ফলে কোন কোন দেশে ভারতীয়রাই এখনও কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য জীবিকায় শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিয়া আছে। এক্ষণে স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে যোগসূত্র রক্ষায় তারা ভারতের রাষ্ট্র ভাষায় তাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষিত করে তুলতে চায়। প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষে অপর একটি দেশকে জন্মস্থান, কর্ম্মস্থান ও বর্ত্তমানে বাসস্থান বলে মুখ্যত গ্রহণ করে নিয়েও কেবল আদিস্থান ভারতরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ও ভাষার চর্চ্চায় ভারতীয় পরিচয়টুকু কতখানি সুফলদায়ক হইবে একথা রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের প্রণিধান যোগ্য। —সত্যাগ্রহ পত্রিকা

* * *

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি লইয়া পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র যে ভাবে প্রাদেশিক তথা ভারত সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন তাহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে পশ্চিম বাংলার জন্য ৫ লাখ টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কোথা হইতে বা কি ভাবে এই পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহাও তিনি জানাইয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত মৈত্র বিশেষভাবে নদীয়া জেলার খাদ্য পরিস্থিতির সংবাদ দিয়া জানাইয়াছেন যে নদীয়া জেলাতে চাউলের দর মণ করা ৪০৲ টাকা উঠিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলা সম্বন্ধে অবহিত হইলে তিনি বলিতে পারিতেন যে এই জেলার কোনও কোনও স্থানে ৪২৲ টাকা মণ দরেও চাউল বিক্রয় হইয়াছে এবং ৩৫৲ হইতে ৪০৲ দরে বহু ইউনিয়নে বিক্রয় হওয়ার সংবাদও আমরা পাইয়াছি। কাজেই খাদ্য-সমস্যা যে কেবল নদীয়া জেলাতেই জটিল হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, মুর্শিদাবাদ জেলাতেও খাদ্য সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। —মুর্শিদাবাদ সমাচার

* * *

বাঁকুড়া জেলার অধিবাসীদিগকে দুইটি গুরুতর শঙ্কার মধ্যে অবস্থান করিয়া জীবন যাপন করিতে হয়—একটি শঙ্কা ম্যালেরিয়া, অপরটি কুষ্ঠ। অর্থাৎ জেলাবাসীকে জলে কুমীর ও ডাঙ্গায় বাঘ লইয়া প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত হইতে হইতেছে। বিষ্ণুপুর মহকুমা ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতেছে, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া

ডুগিয়া গ্রামের লোক মরিয়া ভূত হইয়া স্বর্গে (!) দুন্দুভি বাজাইতেছে। সদর মহকুমার কয়েকটি থানাতেও, এমন কি বাঁকুড়া সহরেও ম্যালেরিয়ার প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে—তাহার উপর কুষ্ঠরোগ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়া যাইতেছে—বিশেষজ্ঞদের মতে জেলায় প্রায় একলক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। জেলায় ম্যালেরিয়া দমনের কার্য্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরম্ভ করিয়াছেন—কিন্তু কুষ্ঠ রোগ দমনের জন্য কোন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

—প্রচার

*　　*　　*

…"যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, দেশ বিভাগ হইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে শরণার্থী-সমস্যা ও কাশ্মীর-সমস্যার সৃষ্টি হইল। কাশ্মীরের ব্যাপারে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু আন্তর্জাতিক জটিলতার অজুহাতে ভারত সরকার পূর্ব্ববঙ্গ সম্পর্কে চুপ করিয়া গেলেন। আড়াই কোটি হিন্দুর জীবন ও মর্য্যাদার প্রশ্নে কেন যে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। পণ্ডিত নেহেরু যেভাবে চলিতেছেন, তাহাতে জাতির কোনই সাহায্য হইবে না। তিনি যেন চুক্তির বিষয় পুনর্বিবেচনা করেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের সাজানোগোজানো সফর করিয়া আসিয়া যাঁহারা রিপোর্ট পেশ করেন, দিল্লীতে বসিয়া সেই রিপোর্ট পড়িয়া যেন তিনি মতামত নির্দ্ধারণ না করেন।" শিলচরে নাগরিকদের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি উপরি উক্ত ভাষণ দেন।

—সমাধান

*　　*　　*

টিকিট পাওয়ায় অসুবিধা, টিকিটের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা, রিক্সাওয়ালা ও কুলির জুলুম প্রভৃতি এড়াইবার জন্য অনেক কলিকাতা-যাত্রী এখন বড় বড় নৌকাযোগে যাইতেছেন। ইহাতে ষ্টীমার কোম্পানীর উপর চাপ কমিতেছে। অন্যথা যে হারে লোক যাইতেছে, তাহাতে ২।৩ মাসেও ভিড় কমিত না—বানরীপাড়া, গৈলা, ঝালকাঠী, ভোলা, চরচন্দ্রমোহন, লালমোহন ইত্যাদি হইতে হাজারে হাজারে লোক নৌকা আশ্রয় করিতেছে! ইহাতে অধিকসংখ্যক জালিয়া, বাড়ৈ, কুমার, তাঁতি প্রভৃতি যাইতেছে—আবার ঝালকাঠীনিবাসী বরিশালের কবিরাজ শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাশগুপ্ত শ্রেণীর লোকও এই নৌকায় যাইতেছে।

—বরিশাল হিতৈষী

*　　*　　*

বিগত বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ—জার্ম্মানী ও জাপানের একসঙ্গে পতনের ফলে ইংলণ্ডের খুব সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু জাপান এবং পশ্চিম জার্ম্মানীর একাংশের শাসক হিসাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এক্ষণে আর এই দুইটী দেশকে শিল্প ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখা সমীচীন মনে করিতেছেন না। কারণ শিল্প ব্যবসা না থাকার দরুণ উভয় দেশেরই জনসাধারণের মধ্যে দুঃখদুর্দ্দশা ও বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়াছে এবং উহার ফলে উহারা কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িবে এরূপ আশঙ্কা হইয়াছে। ফলে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শাসকগণ জাপানকে অধিকতর পরিমাণে সাইকেল ও বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ দিয়াছেন। পশ্চিম জার্ম্মানীর আমেরিকান অধিকৃত অঞ্চলেও কলকব্জা অধিকতর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানী করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। উহার ফলে ইংলণ্ডের সুযোগ সুবিধা বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ বস্ত্র, সাইকেল ইত্যাদির ব্যাপারে জাপানের সহিত এবং কলকব্জার ব্যাপারে জার্ম্মানীর সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান থাকা ইংলণ্ডের সাধ্যায়ত্ত নহে। কাজেই এই ব্যাপার লইয়া ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইয়াছে।

—আর্থিক জগৎ

*　　*

সম্প্রতি যে সকল ভ্রমণকারী শরণার্থী এবং ব্যবসায়ী চীন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণে জানা যায় যে চীনের ক্রমবর্দ্ধমান দুরবস্থা রোধ করিবার জন্য চীনা কম্যুনিষ্টগণ যে 'পরীক্ষা' আরম্ভ করে তাহা ব্যর্থ ত হইয়াছেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে দুরবস্থাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

হংকংএর জনৈক দলত্যাগী বিশিষ্ট চীনা কম্যুনিষ্টের কথায় প্রকাশ যে লেনিনের 'গ্রাম সংগঠনের' মতবাদ অনুসরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মাও-সে-তুং চীনের অধিবাসীদের সমর্থন লাভ করিয়াছেন। ঐ মতবাদ কৃষকদের দুঃখদুর্দ্দশা ক্রমশঃ দূর করিবার উপর জোর দিয়া থাকে। প্রকাশ ষ্ট্যালিনের কথায় মাও সে প্রতিশ্রুতি উড়াইয়া দিয়া উহার পরিবর্ত্তে লেনিনের অপর মতবাদ 'সহর সংগঠনের' নীতি গ্রহণ করেন। উহাতে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য শিল্পসমৃদ্ধ সহরগুলিকে সামরিক উদ্দেশ্যে সুসংহত করিবার উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে।

—সারথি

*　　*　　*　　*

বর্দ্ধমান জেলার জঙ্গলমহল সার্কেল পঞ্চাশটী গ্রাম লইয়া গঠিত। জেলার মধ্যে ইহা অন্যতম বৃহৎ সার্কেল। কিন্তু এ অঞ্চলে কোন ইউনিয়ন বোর্ড না থাকায় গ্রামবাসীরা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। জেলার মধ্যে একমাত্র এই সার্কেলেই কোন ইউনিয়ন বোর্ড নাই। বৃটীশ শাসনের আমল হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। সংবাদে জানা যায়, উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা এ সম্পর্কে উচ্চতম সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও এখন পর্য্যন্ত কোন ফল পান নাই। উক্ত অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড না থাকায় রাস্তা জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি অবহেলিত হইতেছে।

—আর্য্য

*　　*　　*　　*

ভারত গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তটির মূল কথা এই যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট আর দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন না। দৃশ্যতঃ ইঁহা ভারত গবর্ণমেণ্টের অনিচ্ছা মাত্র; কিন্তু কার্যতঃ ইঁহা তীব্র প্রতিবাদ। ভারতের বর্তমান গবর্ণমেণ্ট একান্তভাবেই শান্তিপ্রয়াসী এবং উদার পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক। পৃথিবীর সমস্ত পররাষ্ট্রের সহিত সতত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন। তথাপি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে মালান গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভারতের কোন বোঝাপড়া কেন সম্ভব হয় নাই এবং হইতেছে না, তাহা যেমন নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনা তেমনি গভীর উপলব্ধির বিষয়।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

* * * *

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী বেকার কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ভারতের সব প্রদেশ ও রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশী। বিরাটসংখ্যক বেকার বুদ্ধিজীবীর বেকারসমস্যাই পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের দৈন্য-পীড়িত শিক্ষিত অথচ বিত্তহীন সমাজ জীবিকার অভাবে যে সমস্যায় পড়িয়াছে, তাহা বস্তুতঃ বাঙালীর সমগ্র সংস্কৃতির অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান পরিষদ শিক্ষিতের বেকার সমস্যা সমাধানে কি প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। তবে সমূহভাবে যে ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহা আঞ্চলিক কর্মসংস্থান পরিচালকের একটি মন্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। "একমাত্র এপ্রিল মাসে ১২৪৫৬ জন কেরাণিগিরির কাজের জন্য আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র ত্রিশজনকে কাজ দিতে পারা গিয়াছে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

* * * *

পূর্ব্ববঙ্গ সফর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত ভারতের মাইনরিটি মন্ত্রী শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের বিবৃতি পশ্চিমবঙ্গের সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন। এই আগ্রহ প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের বর্তমান অবস্থা জানিবার আগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নহে। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির পর দুই মাস অতীত হইয়াছে। এই দুই মাস চুক্তির ফলাফল পশ্চিমবঙ্গে কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা এই রাজ্যে অবস্থানকারী মাত্রই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে কি হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার সংবাদ পূর্বের ন্যায় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইতেছে না বলিয়াই তথাকার প্রকৃত অবস্থা জানিবার ও উপলব্ধি করিবার আগ্রহ এবং কৌতূহল এখন প্রবল হইয়াছে। মাইনরিটি মন্ত্রী শ্রীযুত বিশ্বাস সেই কৌতূহল চরিতার্থ করার চেষ্টা করিয়াছেন বটে; তবে বিবৃতির প্রায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে তালগোল পাকাইয়া এমনভাবে কথা বলিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার মতামত উভয় বঙ্গ সম্বন্ধে বলিয়া ভ্রম হয়। পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে পৃথক্‌ ও পরিষ্কার করিয়া কোন অভিমত ভারতের মাইনরিটি মন্ত্রী এই বিবৃতিতে যেন প্রকাশ করিতে চাহেন নাই।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

* * * *

তুলা-ব্যবসায়ী এবং মিল-মালিকদের প্রবল আন্দোলন এবং টেক্সটাইল উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশে, তুলার মূল্য প্রতি 'কাণ্ডি' (৭৮৪ পাউণ্ড) দেড় শত টাকা বৃদ্ধি করিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্মতি দান করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র বলিতেছেন, তুলার মূল্যবৃদ্ধির ফলে আগামী ৬ মাসকাল কাপড়ের মূল্য কোনোপ্রকার বৃদ্ধি পাইবে না। তাহার পরে শতকরা ১০।১১্‌ টাকা মাত্র বৃদ্ধি পাইবে। তুলার মূল্য বৃদ্ধির অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য গূঢ় কারণের আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কারণ সংবাদপত্রে এই সকল আলোচনার মূল্য সরকারী মহলে প্রায় শূন্য বলিলেও চলে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সরকারকে একটা কথা পরম শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সহিত স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। যুদ্ধ-উত্তর কালে, গত তিন বৎসর কংগ্রেস সরকার শাসন ক্ষমতা হাতে লইয়াছেন, এই দীর্ঘকালে তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য এবং পরিধেয় কোনো দ্রব্যের মূল্য কমাইতে পারেন নাই। বস্ত্রের মূল্য গত দুই মাস বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে, তুলার মূল্য বৃদ্ধির কারণে আরো বৃদ্ধি পাইবে। বস্ত্র যে ক্রমশঃ জনগণের সাধ্যের বাহিরে যাইতেছে, এ-সংবাদ রাখার দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য বোধ হয় কাহারো নাই। ব্যবসায়ী এবং মিল-মালিকদের অতি-লাভের পরিমাণ কমাইবার সাহস কাহারো নাই। সর্ব্বপ্রকার চাপ এবং মূল্যবৃদ্ধির গুরুভার জনগণের দুর্ব্বল স্কন্ধে আর কতকাল সহ্য হইবে বলা শক্ত। বস্ত্র-ব্যবসায়ে বর্ত্তমানে লাভের পরিমাণ যেমন, তাহাতে বস্ত্র-মূল্য আরো বৃদ্ধি করিবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। কিন্তু উপায় কি, শিশুরাষ্ট্রের কল্যাণে ঝুনো ব্যবসায়ী এবং মিল-মালিকদের দাবী অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

—দৈনিক বসুমতী

* * *

উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ এবং পূর্বে ব্রহ্ম সীমান্ত যেমন সামরিক প্রশ্নে গুরুতর, তেমনই যোগাযোগ, রাস্তাঘাট, সংবাদ আদান-প্রদান ইত্যাদির দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের সহিত ইহা অচ্ছেদ্য। ইহার মাঝখানে রহিল পূর্ব পাকিস্থান, রণ-নীতির ভাষায় যাহাকে একটি কীলক বলা যাইতে পারে। আসামবাসীদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগ দীর্ঘকাল যাবৎ আসামের এই অভিনব ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য উহাকে পাকিস্থানের কুক্ষীগত করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন এবং সেই আন্দোলন ব্যর্থ হইবার মূল কারণ বাঙ্গালী হিন্দুর বিরোধিতা। মুসলিম লীগের মন হইতে আসামের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধির অবসান হইয়াছে একথা মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কেবল পাকিস্থান হইতেই আসামের বিপদ সম্ভাবনা নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গেও আসামের ভাগ্য জড়িত। ব্রহ্মদেশ, আসাম ও পূর্ববঙ্গ সম্ভবতঃ কোনও কমিউনিষ্ট পরিকল্পনার অন্তর্গত এবং ইহার সামরিক দিকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ১৯৪২-৪৩এর জাপানী যুদ্ধের সময়—যখন পশ্চিমবঙ্গ ও কলিকাতা ছিল আসামকে রক্ষা করিবার মূল সরবরাহ কেন্দ্র ও সামরিক ঘাঁটি। এই

সমস্ত তথ্য আমরা উল্লেখ করিলাম এজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামকে পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে হইবে—বিরোধের পথ উভয়ের পক্ষে আত্মহত্যার পথ মাত্র। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আসাম পরিভ্রমণ, আশা করি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যকে অধিকতর বন্ধুতা ও সহযোগিতার পথে আনয়ন করিবে। —যুগান্তর

* * *

পানাগড় মিলিটারী বেসের সন্নিকট কৃষ্ণরামপুর বা কুলুপুকুর গ্রামে দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক অগ্নি সংযোগের ফলে প্রায় দুই শত গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। কয়েক সহস্র মণ ধান্য ও বহু কাহন খড়ও পুড়িয়াছে। আটজনের প্রাণহানি ঘটিয়াছে, ইহাদের মধ্যে পাঁচজন নারীও আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মাড়ো গ্রামে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। গ্রামবাসীগণের ধারণা মিলিটারী বেসের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার সহিত জড়িত আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিলিটারী বেসের লোকগণ কুলুপুকুর আক্রমণ করিয়া অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল এবং দুর্বৃত্তগণ দল বা আদালত কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিল। মিলিটারী বেসটী ঐ অঞ্চলের আতঙ্কের কারণ হইয়াছে। এই অঞ্চলে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। —বর্দ্ধমানের কথা

* * *

বিহার প্রাদেশিক সরকার শিক্ষা প্রসারের জন্য নূতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। শিক্ষা প্রসারের জন্য, বিশেষ করিয়া বিহারের মাতৃভাষা সকলের কণ্ঠে জুড়িয়া দিবার জন্য প্রচার কার্য চালাইতেছেন। জানা গেছে ১৯৫৭ সাল হইতে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার মাধ্যম হইবে বিহারের মাতৃভাষা।

সম্প্রতি মানভূম জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে এই মর্মে প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে মানভূম জেলাবাসীর মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে হীন প্রচেষ্টার দ্বারা উচ্ছেদ ও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিনষ্টের যে প্রচেষ্টা অন্যায়ভাবে গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই জিলায় চলিতেছে, অবিলম্বে প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ও ভারত সরকারের নিকট ইহাই প্রতিবিধান ও প্রতিকার করার দাবী জানাইতেছি। —সৈনিক

* * *

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট প্রদেশের কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যেক জেলার জন্য একটি করিয়া কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যাহাতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ১ হাজার ছাত্র নূতন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কৃষি শিক্ষা পাইয়া বাহির হইতে পারে ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য। বর্ত্তমানে এই প্রদেশে মাত্র ৩টি কৃষি কলেজ ও ১৪টি কৃষি স্কুল আছে। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাকাল দুই বৎসর হইবে এবং যাহাতে ছাত্রেরা নিজেরা স্বাধীনভাবে নিজেদের কৃষি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারে সেইভাবে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইবে। —শিক্ষক

* * *

সকলকে স্থিরচিত্তে ও ধৈর্য্য সহকারে ভাবিয়া দেখিতে বলি, স্বাধীনতা লাভের পর সকল প্রকার সুখ শান্তি পাইতে হইলে সত্যই কি আমাদের জনসাধারণের কিছুমাত্র দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য নাই? কেহ যদি এক বিঘা জমি লাভ করেন, বা একটী গাভী লাভ করেন, তবে সেইদিন হইতেই সেই জমিখানি আবাদ করিবার, তাহাতে সার দিয়া ভাল বীজ বপন করিবার, ফসল উৎপন্ন করিবার ও সেই জমির কর আদায় দিবার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে এবং সেই গাভীকে প্রতিদিন ভালভাবে খাওয়াইবার, ভালভাবে রাখিবার, স্নান করাইবার, তাহার গোয়াল প্রস্তুত করিবার ও তাহা প্রত্যহ পরিষ্কার করিবার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। এই কর্ত্তব্য ও দায়িত্বগুলি যদি তিনি পালন না করেন তবে তিনি সেই জমির ফসল পাইবার বা গাভীর দুগ্ধ পাইবার আশা করিতে পারেন না, বরং অল্পদিনেই সেই জমি বাকী করের দায়ে নীলাম হইবার এবং গাভীটী খাদ্যাভাবে মারা যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা হয়। কিন্তু এতবড় মহামূল্যবান্ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা সকলে যদি মনে করি যে আমাদের কিছুমাত্র দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য নাই, কেবলমাত্র কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের উপরই দায়িত্ব আসিয়াছে, অতএব আমরা সকলে নিশ্চিন্তভাবেই নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাই, তাহা হইলে আমাদের সুখ শান্তি ত কোনও দিন আসিবে না, বা দুঃখ দারিদ্র্য ও অভাব কোনও দিন ঘুচিবে না, বরং এই স্বাধীনতা রক্ষা করাই সম্ভব হইবে না। —সত্যাগ্রহ পত্রিকা

* * * * * *

রেয়ন

(নকল রেশম)

শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

ভারতবর্ষে রেয়ন বা নকল রেশম শিল্প সম্বন্ধে সামান্য কিছু গবেষণা চলিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে নকল রেশম তৈয়ারীর ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত এদেশে হয় নাই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ও প্রথমদিকে বিশ্বের রেয়ন উৎপাদনকারী দেশগুলি ছাড়া অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ সব চাইতে বেশী রেয়ন ব্যবহারকারী দেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৯৪০ সালে ভারতে রেয়ন আমদানী হয় সব চাইতে বেশী। ঐ বৎসর এদেশে রেয়ন আমদানী হয় ৩ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাইবার" নামক সাময়িকীর ১৯৪৮ সালের সংস্করণে দেখা যায় যে, ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত ভারতে রেয়নের আমদানী ছিল অব্যাহত কিন্তু ১৯৪২ সালে ঐ আমদানীর পরিমাণ হঠাৎ কমিয়া যায় চারিদিককার ব্যবসা বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলার জন্য। ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৬ সালের মধ্যে প্রথম চারি বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে যথাক্রমে এদেশে রেয়নের আমদানী হয় যথাক্রমে ১৫৩ লক্ষ, ২৬৩ লক্ষ, ৩৪০ লক্ষ ও ২৩৮ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪২ সালে ঐ আমদানীর পরিমাণ কমিয়া দাঁড়ায় মাত্র ৯ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ পূর্ব্বের চারিটি বৎসরের তুলনায় মাত্র শতকরা ৩ হইতে ৫ ভাগ। ১৯৪২ সালের তুলনায় ১৯৪৩ সালে রেয়ন আমদানীর পরিমাণ আরো কমিয়া দাঁড়ায় মাত্র ১ লক্ষ পাউণ্ডে। তাহার পর হইতে অবশ্য ঐ আমদানীর পরিমাণ বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৪৪, ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে রেয়ন আমদানীর পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৮ লক্ষ, ১৬ লক্ষ ও ৩১ লক্ষ পাউণ্ড। (১) ১৯৪৮-৪৯ সালে এই আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে তিন কোটি নিরানব্বুই লক্ষ পাউণ্ডে, যাহার মূল্য হইতেছে ১২ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা।

শেষোক্ত বৎসরের আমদানীর হিসাব হইতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যুদ্ধ পূর্ব্বকালের চাইতেও আপাততঃ এদেশে রেয়নের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তুলা বা রেশম-জাত বস্ত্রের মূল্য না কমিলে রেয়নের ব্যবহার আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। কারণ তুলা বা রেশম হইতেছে প্রকৃতির সৃষ্ট। আবহাওয়া, ভুমি, পারিপার্শ্বিকতা ও অনুকুল পরিবেষ্টনী ব্যতিরেকে উহাদের উৎপাদন সম্ভব নয়। তাছাড়া উহাদের উৎপাদনও কতকটা সীমাবদ্ধ বলা চলিতে পারে। কিন্তু রেয়নের ক্ষেত্রে ঐ কথা প্রযোজ্য নহে। কারণ উহা সম্পূর্ণভাবে মানুষের সৃষ্ট—মানুষের বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের উহা একটি চরম অভিব্যক্তি, সুতরাং প্রয়োজনের অনুপাতে উহার উৎপাদন বৃদ্ধি, মূল্যের সমতা রক্ষা করা মানুষের নিজের সৃষ্টির মধ্যেই আবর্ত্তিত হইবে। ফলে সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো এমন একদিন আসিতে পারে যখন এই রেয়ন বা নকল রেশমের মূল্য, গুণাগুণ বা প্রচারের দিক হইতেই বর্ত্তমান তন্তুশিল্পকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে।

১৯৪১ সালে সমগ্র পৃথিবীতে রেয়নের উৎপাদন সব চাইতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ বৎসর উৎপন্ন রেয়নের মোট পরিমাণ ছিল ১২৫ কোটী ৯ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু ঐ সালের পর হইতেই রেয়নের উৎপাদন কমিতে থাকে এবং ১৯৪৫ সালে উৎপন্ন হয় মাত্র ৯০ কোটী পাউণ্ডের মত। অবশ্য ঐ কম উৎপাদনের মূলে ছিল জার্মান, জাপান ও ইটালির রেয়ন উৎপাদনে ঘাটতি। কারণ ১৯৩৮ সাল বা তৎপূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কয়েকটী বৎসরে উপরোক্ত তিনটী দেশে মোট উৎপন্ন রেয়নের পরিমাণ ছিল সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা ৬৭ ভাগ। ১৯৩৯ সালে জাপানে রেয়ন উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ছিল বৎসরে ২৩ কোটী ৮৫ লক্ষ পাউণ্ড, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৫ সালে ঐ উৎপাদন কমিয়া হয় মাত্র ৩৮ লক্ষ পাউণ্ড। তাহার পর ১৯৪৬ সালে ঐ উৎপাদন পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৫২ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইলেও যুদ্ধ-পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় যে অপ্রত্যাশিতভাবে কম একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। জার্মান ও ইটালীর পক্ষেও সেই একই কথা বলা চলে। ১৯৩৯ সালে যথাক্রমে জার্মান ও ইটালীতে রেয়ন উৎপন্ন হইয়াছিল ১৬ কোটী ৯৯ লক্ষ ও ১১ কোটী ৬৩ লক্ষ পাউণ্ড। আর ১৯৪৬ সালে সেইখানে উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ১ কোটী ৮৩ লক্ষ ও সাড়ে ছয় কোটী পাউণ্ড। উপরোক্ত তিনটী দেশের শিল্পসমূহে যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগে যে কি ভাবে ভাঙ্গন ধরিয়াছে ইহা তাহারই একটা অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৯৪১ সালে পৃথিবীতে রেয়নের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল সব চাইতে বেশী। নিম্নে দশ বৎসরের যে ছকটি দেওয়া হইল তাহা হইতেই প্রত্যেকেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পৃথিবীর রেয়ন উৎপাদন। (২)

(কোটী পাউণ্ড)

বৎসর	উৎপন্ন রেয়ন	বৎসর	উৎপন্ন রেয়ন
১৯৩৭	১২০·০	১৯৪২	১১৯·১
১৯৩৮	১০০·১	১৯৪৩	১১৪·৭
১৯৩৯	১১৫·১	১৯৪৪	১০৫·৭
১৯৪০	১১৮·২	১৯৪৫	৮৯·৫
১৯৪১	১২৫·৯	১৯৪৬	১১০·০

(১) Industrial Fibre 1948.

(২) Industrial Fibre 1948.

উপরোক্ত ছকটীতে দেখা যায় যে, ১৯৪৫ সালে উৎপাদন অত্যন্ত ব্যাহত হইলেও ১৯৪৬ সালে রেয়ন উৎপাদনকারী দেশসমূহ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কিছুটা প্রয়াস পাইয়াছিল। অবশ্য এই উৎপাদনের মূলে আছে আমেরিকা যুক্তসাম্রাজ্য ও গ্রেট-ব্রিটেনের শিল্প প্রচেষ্টা। যুদ্ধ-পূর্ব্বকালে অন্যতম প্রধান রেয়ন-উৎপাদনকারী দেশ বলিলে বুঝাইত জার্মান, জাপান ও ইটালি; কিন্তু বর্ত্তমানে বোঝায়—আমেরিকা যুক্ত-সাম্রাজ্য ও গ্রেট-ব্রিটেনকে। তাহাদের এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। ১৯৪৬ সালে পৃথিবীতে যে মোট ১১০ কোটী পাউণ্ড রেয়ন উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৬৭ কোটী ৭৫ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল আমেরিকা যুক্তসাম্রাজ্যে। ঐ বৎসর রেয়ন উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল গ্রেট ব্রিটেন। তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১ কোটী পাউণ্ড। ইহাদের পরই উৎপাদনের দিক হইতে নাম করা চলে ফ্রান্স ও ইটালীর। ঐ বৎসর ইহাদের রেয়ন উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬ কোটী ৮১ লক্ষ ও ৬ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ব্রেজিল, ক্যানাডা, জার্মানী, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও স্পেনের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২৩২ লক্ষ, ২১০ লক্ষ, ১৮৩ লক্ষ, ১৮০ লক্ষ, ১৭৫ লক্ষ ও ১৬৪ লক্ষ পাউণ্ড। আর কিছু কম বেশী এক কোটী পাউণ্ড রেয়ন উৎপন্ন হইয়াছিল সুইজারল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা ও জাপানে এবং বাকী ৭ কোটী পাউণ্ডের মত রেয়ন উৎপন্ন হইয়াছিল অন্যান্য দেশে। ভারতবর্ষে রেয়ন একেবারেই উৎপন্ন হয় নাই, অথচ ঐ বৎসর রেয়ন আমদানী হইয়াছিল ৩১ লক্ষ পাউণ্ড।

বর্ত্তমানে এই রেয়ন বা নকল রেশম শিল্পের দ্রুত বিস্তার ঘটিতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। অধুনাতম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইতেছে এবং সেই সঙ্গে চেষ্টা হইতেছে ইহাকে অধিকতর প্রয়োজনীয় করিয়া তোলার ও সহজ লভ্য করার। বৈজ্ঞানিকগণ অনেকাংশে সফলও হইয়াছেন এবং আশা করা যায় যে তাহারা আরও সফলকাম হইবেন। দামে সস্তা হইলে এবং স্থায়িত্বে ও মসৃণতায় রেশমের সমতুল্য বা অধিকতর উপযোগী হইলে রেয়নের প্রচার বৃদ্ধি পাইবে সত্য। কিন্তু ভারতে এই শিল্পের প্রচলন ও প্রসার না হইলে আমাদের কোন স্বার্থেই লাগিবে না, বরঞ্চ আমদানীকৃত রেয়নের প্রাচুর্য্যে জাতীয় স্বার্থই বিপন্ন হইবে।

রেয়ন উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হইতেছে 'সেলুলোজ' (Cellulose)। আর 'সেলুলোজ' পাওয়া যায় তুলা ও কাঠ হইতে। ঐ দুইটী উপকরণেরই এদেশে অভাব নাই, অভাব আছে শুধু চেষ্টার। কাজেই আজিকার দিনে একথা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষও অন্যতম প্রধান রেয়ন উৎপাদনকারী অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

'সেলুলোজ' তৈয়ারীর জন্য সাধারণতঃ পরিত্যক্ত সূতা ও ছোট আঁশের অপেক্ষাকৃত অব্যবহার্য্য তুলা ব্যবহার করা হয়। তবে কাঠ হইতে সংগৃহীত 'সেলুলোজ' অপেক্ষাকৃত সস্তা দরের হয়, সেইজন্য কাঁচা মাল হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি বেশী। "এই কার্য্যে ব্যবহৃত তুলাকে প্রথমেই তেল, চর্ব্বি, মোম ও অন্যান্য রঙ সৃষ্টিকারী পদার্থ হইতে মুক্ত করা হয়। পরে পরিশোধিত দ্রব্যগুলিকে শুষ্ক করিয়া গ্রহণযোগ্য হইলে রসায়নের সাহায্যে 'লেই' বা 'মণ্ড'এ (Pulp) পরিণত করা হয় ও পরে পিচবোর্ডের মত পাত তৈয়ার করা হয় পরবর্ত্তী কাজের সুবিধার জন্য (৪)। কাঠ হইতে 'সেলুলোজ' গ্রহণ করিবার পদ্ধতি একটু অন্য ধরণের। "বাছাই করা কাঠ (সাধারণতঃ ফার, হেমলক্ প্রভৃতি কাঠ) লইয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ও রসায়নের সাহায্যে সেলুলোজ পৃথকীকরণ করা হয় ও পরে একপ্রকার 'লেই' (Bleached Sulphite wood pulp) বাজারে ছাড়া হয়।" (৫) ইহার পরও বহুবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ও রসায়নের সাহায্যে ঐ লেইকে পরিণত করা হয় একপ্রকার সূক্ষ্ম তন্তুতে। ঐ তন্তু হইতে হয় সূতা।

বর্ত্তমানে প্রধানতঃ চারিটি প্রক্রিয়ায় রেয়ন উৎপাদিত হইয়া থাকে, চারিটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমে আবিষ্কৃত হয় 'নাইট্রো সেলুলোজ' (Nitro cellulose) পদ্ধতি। তাহার পর আবিষ্কৃত হয় যথাক্রমে 'কাপ্রামোনিয়াম' (Cuprammonium), 'ভিসকোস্' (Viscose) ও 'এ্যাসেটেট' (acetate) পদ্ধতি, এই সমস্ত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার মূলে আছে যে ইতিহাস, তাহা যেমনই চমকপ্রদ, তেমনি ঘটনাবহুল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভব নয় তাই মিঃ ই, হুইলার প্রণীত 'মানুফ্যাকচার অব আর্টিফিসিয়াল সিল্ক' নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত সামান্য ইতিহাস নিম্নের ছত্র কয়টাতে দিলাম।

একথা অবশ্য প্রত্যেকেই জানেন যে অকৃত্রিম রেশম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইতেছে গুটীপোকার শুষ্ক লালা মাত্র। কীট বিশেষের মুখনিসৃত লালা শুষ্ক হইয়া সৃষ্টি করে তন্তুর; সেই তন্তু হইতে সৃষ্টি হয় রেশমের। মানুষের মনে প্রকৃতির এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যই এনে দেয় নকল রেশম বা রেয়নের সন্ধান। ফলে প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মতই বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠে মানুষের সৃষ্ট রেশম বর্ণ—ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্বে। ১৬৬৫ সালে হুকস্ (Hookes) তাঁহার 'মাইক্রোগ্রাফিয়া' (Micrographia) নামক গ্রন্থে এই রেয়ন প্রস্তুতির আভাষ দেন। তারপর মিঃ রেমার (Mr. Reaumar) গুটি পোকা সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রসঙ্গে নকল রেশম প্রস্তুতির সম্ভাবনার কথায় উল্লেখ করেন। এমন কি ১৭৭০ সালে ফরাসী দেশের মিঃ ডুবে (Dubet) কয়েকটী মৃত গুটীপোকার দেহ হইতে সংগৃহীত আঠাল পদার্থ হইতে তন্তু প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। অবশেষে ১৮৫৫ সালে বিলাতের অন্দেমার (Andemars) নামক এক ব্যক্তি নাইট্রোসেলুলোজ তৈয়ারীর পদ্ধতি পেটেন্ট করিয়া লন। ১৮৮৩ সাল বা ঐ কাছাকাছি সময়ে অনেকেই নাইট্রো সেলুলোজ লইয়া কাজ আরম্ভ করেন।

(৪) ও (৫) The Manufacture of, artificial silk by E. .Wheeler

এবং কাউণ্ট এইচ, ডি কাড্রানেট (Count H. De Chadrannet) ১৮৮৯ সালে প্যারিসের প্রদর্শনীতে নকল রেশম ও নকল রেশমের বোনা বস্ত্র প্রদর্শন করেন। সেই হইতে 'নাইট্রো সেলুলোজ' পদ্ধতি কাড্রানেট পদ্ধতি নামেও প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে নকল রেশম তৈয়ারী হয়।

১৮৯০ সালে এই পদ্ধতি কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইয়া 'কাপ্রামোনিয়াম' পদ্ধতি নামে প্রচলিত হয় এবং তখন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যবসায়ের জন্য নকল রেশম বা রেয়ন তৈয়ারী হইতে থাকে। ১৮৯১ সালে কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কতিপয় ব্যক্তি সেলুলোজ লইয়া কাজ করিতে করিতে 'কার্ব্বন বাই সালফেট' (Carbon bishalphite) সহযোগে সহসা এক অদ্ভুত পন্থা আবিষ্কার করেন এবং প্রমাণ করেন যে এই পদ্ধতিই নাকি সব চাইতে সহজ পদ্ধতি। ফলে ১৯০০ সাল হইতে 'ভিস্‌কোস্' (Viscose) নামে পরিচিত এই পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে চালু হইয়া যায়। 'এ্যাসেটেট' পদ্ধতি অবশ্য প্রচলিত হইয়াছিল ১৮৬৯ সালে। কিন্তু ঐ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ স্থানে, আর বিশেষ করিয়া জার্ম্মানীতে।

যদিও কাউণ্ট কাড্রানেট ১৮৮৪ সালে প্রথম এই ধরণের সংশ্লেষিত তন্তু সৃষ্টি করেন তবুও ব্যবসায়ের কাজে এই তন্তু লাগে অনেক পরে। "সস্তা কাঁচামাল হিসাবে মালবেরী (Mulberry) গাছের শাখা ও গুঁড়ি হইতে সংগৃহীত সেই হইতে মিঃ কাড্রানেট প্রথম সংশ্লেষিত তন্তু সৃষ্টি করেন।" (৬) তাহার পর ১৯২৪ সালের একটী হিসাবে (৭) দেখা যায় যে ঐ সময় সমগ্র পৃথিবীতে রেয়নের মধ্যে শতকরা ৭৬ ভাগ উৎপন্ন হইত 'ভিস্‌কোস' পদ্ধতিতে, বাকী ২৪ ভাগের মধ্যে ১৮ ভাগ 'নাইট্রো সেলুলোজ', ৫ ভাগ 'কাপ্রামোনিয়াম' আর ১ ভাগ 'এ্যাসেটেট' পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়। ১৯৪৬ সালের অন্য একটী হিসাবে (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাইবার ১৯৪৮) দেখা যায় যে ঐ সালে 'এ্যাসেটেট' পদ্ধতিতে রেয়ন উৎপন্ন হইয়াছে মোট উৎপন্ন রেয়নের শতকরা ২৩ ভাগ, বাকী ৭৭ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে অপর তিনটি প্রথায়।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে এই নবাবিষ্কৃত সংশ্লেষিত তন্তু (Synthetic fibre) বা নকল রেশমের নাম কিন্তু রেয়ন ছিল না। "১৯২৪ সালে অমেরিকায় ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে এই বস্তুটীর নামকরণ করা হয় রেয়ন "(৮) সেই হইতে উহার চালু আছে। বর্ত্তমানে রেয়ন ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে মাথাপিছু রেয়ন ব্যবহারের গড় পরিমাণ হইতেছে ৫.৯ পাউণ্ড বৎসরে। সুইজারলাণ্ড, ক্যানাডা ও বেলজিয়মে রেয়ন ব্যবহৃত হয় বৎসরে গড়ে মাথাপিছু যথাক্রমে ৪.২ পাউণ্ড, ৩.৩ পাউণ্ড ও ৩.৩ পাউণ্ড। গ্রেট-বৃটেন ও ফ্রান্সে ব্যবহৃত হয় মাথাপিছু ২.৪ পাউণ্ড করিয়া। ভারতবর্ষের রেয়ন ব্যবহারের পরিমাণ আপাততঃ মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু যে পরিমাণে রেয়নের আমদানী প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে রেয়ন ব্যবহারের পরিমাণের দিক হইতে উপরোক্ত দেশগুলির কোন কোন দেশকে ছাড়াইয়া গেলেও তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ রেয়নের ব্যাপক প্রচারের মূলে আছে ইহার সস্তা দাম ও ঔজ্জ্বল্য এবং সবার উপরে ইহা বেশ টেকসই। এই গুণগুলিই রেয়নের প্রচলনের পক্ষে যথেষ্ট।

(৬) ও (৭) The Rayon Industry by Mois H. Avran.

(৮) The Rayon Industry by Mois H. Avran.

বিগত দিনের ভুলের ফসল আজ হোক কাটা শেষ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের যত অন্যায় আজ দানা বাঁধি উঠিয়াছে,
আমাদের ত্যাগ আনিয়াছে বহি শুধুই অকল্যাণ।
প্রশ্রয় পেয়ে ঘৃণ্য শ্বাপদ হিংসায় মাতিয়াছে ;
ম্লান মুখ কেন, এতো আমাদের পিতামহদের দান !
ক্ষয়-ক্ষতি-লাভ যত কিছু সাথে লভেছো অত্যাচার ;
তিলে তিলে যারে স্পর্দ্ধা দিয়েছে আপোষ-বিলাসী মন।
প্রতিকার খোঁজ কার কাছে গিয়ে ব্যর্থ ও চিৎকার ;—
উত্তাপহীন ক্ষীণ শোণিতে কি জাগিল না কম্পন।

দূষিত রক্ত সজীব হয়েছে, করিয়াছে বিদ্রোহ,
লোল চর্ম্মের প্রাচীর ভেদিয়া চাহিছে নিষ্ক্রমণ ;
রুধিয়া রাখিতে চাহ তার পথ, বৃথাই মোহ,
গলিত মাংস গন্ধে জাগিছে কীটের আমন্ত্রণ।
বিগত দিনের ভুলের ফসল আজ হোক কাটা শেষ,
বন্ধ্যা মাটির অঙ্গে জাগুক সৃজনের শিহরণ।
মেদ ও মজ্জার অপচয়টুকু হোক আজ নিঃশেষ ;
মাটির ক্ষতির ক্ষত ঢেকে দিক শষ্প-আস্তরণ।

প্রাচ্যে শক্তি-সজ্ঘাত

অতুল দত্ত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিবার সময়ে সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলি ইহা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, অতঃপর প্রাচীন সাম্রাজ্যনীতি আর চলিবে না : ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বলপূর্ব্বক দমন করা অসম্ভব। পূর্ব্বানুসৃত সাম্রাজ্যনীতির অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্য এই সময় সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় একমাত্র ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত সর্ব্বত্র জাপানীরা প্রথমে মুক্তিদাতা বলিয়াই অভিনন্দিত হইয়াছিল। ফিলিপাইন্‌সের বাটানে জেনারল ম্যাক-অর্থারের প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা গণসমর্থন লাভ করে এই কারণে যে, ১৯৪৬ সালে রাজনৈতিক স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি ফিলিপিনোরা পূর্ব্বেই পাইয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়ার অন্যান্য দেশে "মুক্তিদাতা" জাপানীদের আচরণে জনসাধারণের ভুল ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। এই গণ-আন্দোলন পীত সাম্রাজ্যবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় নাই; ইহাকে দমন করিয়া প্রাচীন পদ্ধতিতে শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা যে অসম্ভব, ইহা চতুর সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝিয়াছিল।

যুদ্ধোত্তর প্রাচ্য—

এই কারণে যুদ্ধের পর দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের রাজনীতি হইতে সাম্রাজ্যবাদীদের কায়িক অপসরণের এক পরিকল্পনা স্থির হয়। স্থানীয় পুঁজিপতি স্বার্থের সহিত ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের সহিত আপোষ করিয়া যবনিকার অন্তরালে সরিয়া যাওয়া এই পরিকল্পনার মূলকথা। পরিকল্পনা-রচয়িতারা আশা করিয়াছিলেন—ইহাতে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, অথচ জনসাধারণের মনে এই ধারণার সঞ্চার হইবে যে, বৈদেশিক শক্তির প্রভুত্ব হইতে তাহারা মুক্ত; সর্ব্বোপরি, যে সাম্যবাদী আদর্শ প্রাচ্য অঞ্চলে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে স্থানীয় পুঁজিপতি স্বার্থের ও দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সকল শক্তি নিয়োজিত হইতে পারিবে। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দূরদৃষ্টির কম-বেশী অনুযায়ী এই পরিকল্পনা অনুসৃত হয় বিভিন্নভাবে। আমেরিকা তাহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফিলিপাইন্‌সকে নিজের অর্থনীতির নাগপাশে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেখানকার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। বৃটেনের শ্রমিক-গবর্ণমেণ্ট ভারতকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দিয়া এদেশের রাজনীতিক অধিকার প্রত্যাহার করে; ব্রহ্মদেশ হইতে সরিবার পূর্ব্বে সে অর্থনৈতিক ও সামরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে; সিংহলে তাহার নজর থাকে আরও কিছু কড়া। মালয়েও সে একটা রাজনৈতিক গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। অদূরদর্শী ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরা ঔপনিবেশিক অধিকার শিথিল করিবার পূর্ব্বে অত্যধিক গোঁয়ারতমি করিয়া তিক্ততা বৃদ্ধি করিয়াছে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ একবার ইন্দোচীনের জাতীয়তা-বাদীদের সহিত আপোষ করিয়াছিল; কিন্তু সে আপোষকে উপনিবেশ শোষণের যৌথ কারবারে পরিণত করা অসম্ভব বুঝিবামাত্র পুনরায় সশস্ত্র আক্রমণ আরম্ভ করে। ইহাই মোটামুটি যুদ্ধোত্তর প্রাচ্যে শ্বেত প্রভুত্বাধীন উপনিবেশগুলির চিত্র। প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদী জাপান যুদ্ধের পর মার্কিণ উপনিবেশে পরিণত হয়; জাপানের অধিকৃত কোরিয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়, ফরমোজা চলিয়া যায় চীনের অধিকারে। আর প্রাচ্যের আধা ঔপনিবেশিক দেশ—বিশাল চীন গৃহ-যুদ্ধে আলোড়িত হইতে থাকে।

যুদ্ধোত্তর প্রাচ্যে দুইটি রাজনৈতিক শক্তির প্রচণ্ড সজ্ঘাত দেখা দিয়াছে। এই শক্তি-সজ্ঘাত বিশেষভাবে মূর্ত্ত হইয়া ওঠে চীনের গৃহ-যুদ্ধে। ইহাকে কম্যুনিষ্ট শক্তির সহিত জাতীয়তাবাদী শক্তির সজ্ঘর্ষ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, চীনের গৃহ-যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদী নীতির সহযোগী শক্তি এবং অন্য পক্ষে ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রকৃত জাতীয়তাবাদী শক্তি। শেষোক্ত শক্তির নেতৃত্ব কম্যুনিষ্টরা করিয়াছে। কিন্তু সে নেতৃত্ব সম্ভব হইয়াছিল তাহাদের কর্ম্মসূচীতে আধা-ঔপনিবেশিক জাতির সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়াই। কৃষিপ্রাণ প্রাচ্যে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার জনগণের সর্ব্বপ্রধান দাবী। চীনের কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব এই দাবী পূরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল এবং অবস্থা অনুকূল হইবামাত্র সে প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিল অক্ষরে অক্ষরে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রাচ্যের মানুষ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর বোঝা বহিয়াছে; তাহার মনুষ্যত্ব অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে পদে পদে। আজ আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইবার পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন হইতে পরিপূর্ণ মুক্তি তাহার অমোঘ দাবী। স্থানীয় অনুচরদের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির যুদ্ধোত্তর নীতি তাহাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। চীনের কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে এই মুক্তির নিশ্চিত আশ্বাস ছিল। এমন কি, চীনের কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বাধীন মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সোভিয়েট রুশিয়ার নৈতিক সমর্থন যতই থাকুক, তাহার প্রত্যক্ষ সংস্রব এই সংগ্রামের সহিত কোথাও ছিল না। চীনের মুক্তি-সংগ্রাম যে সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত, এই বিষয়ে জনগণের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই। পক্ষান্তরে, তথাকথিত জাতীয় শক্তির নেতা কুয়োমিণ্টাং দল ছিল সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার সমর্থনপুষ্ট, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের রক্ষক ও বৈদেশিক সামরিক শক্তির সাহায্যপ্রার্থী।

সাম্রাজ্যবাদীর সহযোগী—

চীনে যে শক্তি আজ বিজয়ী, প্রাচ্যের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে সেই শক্তি দেশীয় ও বিদেশীয় প্রতিক্রিয়ার অশুভ মিলনের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। এই শক্তিকে কম্যুনিষ্ট বলিয়া অভিহিত করিলে উহা নিন্দিত হয় না; বরং কম্যুনিষ্টরাই উহাতে সম্মানিত হয় —প্রাচ্যের জনগণের অখণ্ড নেতৃত্ব যে তাহাদের, এই অপ্রীতিকর সত্য ইহাতে মানিয়া লওয়া হয়। প্রাচ্যের জাগ্রত গণশক্তির বিরোধিতার জন্য "গণতন্ত্র" রক্ষার নামে যাহারা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর সহযোগী হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে তথাকথিত কম্যুনিষ্ট-বিরোধী অভিযানের নৈতিক দৌর্ব্বল্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। চীনে গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহী হন চিয়াং কাই-শেক্, কোরিয়ায় সিগ্ম্যান্ রী, ইন্দোচীনে বাও-দাই, ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জে কুইরিণো, শ্যামে বিপুল সংগ্রাম। চিয়াং কাই-শেক ও তাঁহার নৈতিক মেরুদণ্ডহীন সহকর্ম্মীরা চীনের জনসাধারণকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে দিয়াছিল দলীয় এক-নায়কত্ব, দুর্নীতিদুষ্ট আমলাতন্ত্র, অর্থনীতি-ক্ষেত্রে দিয়াছিলেন বৈদেশিক স্বার্থের অসঙ্গত অধিকার; ভূম্যধিকারীর উৎপীড়ন, সাধারণ মানুষের জন্য দারিদ্র্য, অনশন, মহামারী ও অচিকিৎসা। আমেরিকার ৫ শত কোটী ডলার চিয়াং গোষ্ঠীর দুর্নীতির অতল গর্ভে বিলীন হইয়াছে। কোরিয়ায় যিনি তথাকথিত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহী, সেই সিগ্ম্যান্ রীকে মার্কিণ গণতন্ত্রীরাই "দ্বিতীয় চিয়াং" বলিয়া বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি কোরিয়াবাসীকে দিয়াছেন মাতৃভূমির দ্বিধা-বিভাগ, জাপানী জমিদার ও শিল্পপতিকে দিয়াছেন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি, আর দিয়াছেন ফ্যাসিস্ত শাসনপদ্ধতি, জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা। আমেরিকার ৭ কোটী ডলার মূল্যের সমরোপকরণ এবং ৫ শত সমরবিশেষজ্ঞের দ্বারা দক্ষিণ কোরিয়ার সমর বিভাগকে ইনি কি ভাবে গঠন করিয়াছেন, তাহার নিদারুণ পরিচয় কোরিয়ার রণাঙ্গনে পাওয়া গিয়াছে। ইন্দোচীনের বাও-দাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আনামের রাজধানী হিউর রাজপ্রাসাদে প্রাচীন রাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক সাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেন। যুদ্ধের সময় জাপানী তাঁবেদাররূপে ইনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর হংকং এ আশ্রয় লইয়া সেখানকার এক হোটেলে বিলাসিতার পঙ্কে ডুবিয়া যান। পশ্চিমের গণতন্ত্রনিষ্ঠ ধুরন্ধররা এ হেন বাও-দাইকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন এবং তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া লক্ষাধিক সঙ্গীণ মুক্তিকামী ইন্দোচীনাদের উদ্দেশ্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে কুইরিণো বৈদেশিক স্বার্থের বিশ্বস্ত অনুচর। ইনি কতকগুলি অসঙ্গত চুক্তিতে দেশকে বৈদেশিক স্বার্থের সহিত আবদ্ধ করিয়াছেন, বৈদেশিক বিলাসোপকরণে স্বদেশের বাজার ভরিয়া দিয়াছেন; ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার হয় নাই, শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয় নাই। ফিলিপাইন্সের শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি, সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা সীমাহীন। শ্যামে পাশ্চাত্য "গণতন্ত্রের সহযোগী" হইতেছেন জাপানী সমর নায়কদের মিত্র কুখ্যাত ফ্যাসিস্ত বিপুল সংগ্রাম।

কোরিয়ার গৃহ-যুদ্ধের পটভূমি—

প্রাচ্যের জাগ্রত গণ-শক্তি চীনের রণাঙ্গনে দেশীয় ও বিদেশীয় প্রতিক্রিয়ার অশুভ মিলনকে পরাভূত করিয়াছে। বর্ত্তমানে দুইটি শক্তির সামরিক সজ্বর্ষ চলিতেছে কোরিয়ায়। চীনের সামরিক সজ্বর্ষে প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষের বৈদেশিক সহযোগী ছিল যবনিকার অন্তরালে; কোরিয়ায় সে নিজে রাইফেল কাঁধে লইয়া রণক্ষেত্রে নামিয়াছে। কিন্তু গত এক মাসের যুদ্ধের গতিতে চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাসের পুনরভিনয়ই এখানে সূচিত।

কোরিয়ার বর্ত্তমান যুদ্ধের পটভূমি এইরূপ। এই রাজ্যটি আয়তনে বৃটেনের সমান; ইহার মোট লোকসংখ্যা ৩ কোটী। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের চাকায় এই দেশটি নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে সোভিয়েট রুশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর তাহার সেনাবাহিনী মাঞ্চুরিয়া ভেদ করিয়া কোরিয়ায় পৌছায় এবং জাপ-বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করে। ইহার পর জাপগভর্ণমেণ্ট আত্মসমর্পণ করিলে মার্কিণ সেনাবাহিনী কোরিয়ায় গমন করে। তখন মিত্র শক্তির মধ্যে সামরিকভাবে এই ব্যবস্থা হয় যে, ৩৮তম অক্ষরেখার উত্তরে সোভিয়েট বাহিনী অবস্থান করিবে এবং দক্ষিণে থাকিবে মার্কিণ সেনাবাহিনী। ১৯৪৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কোরিয়া এই ভাবে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিল। ইহার পর ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে মস্কোয় ত্রিশক্তির সম্মেলনে স্থির হয় যে, জাপানী শাসনের কলঙ্কচিহ্নগুলি মুছিয়া ফেলিয়া অতি সত্বর কোরিয়াকে স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে। উত্তর কোরিয়ায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্কচিহ্ন অপনোদনের ভার গ্রহণ করে সোভিয়েট রুশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ায় দায়িত্ব লয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। উত্তর কোরিয়ায় সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের উৎসাহে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিলনে "পিপ্লস্ কমিটী" গড়িয়া ওঠে। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে ভূমি বণ্টন করা হয়, বৃহৎ বৃহৎ শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ কোরিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপ অপরিবর্ত্তিত থাকে। জাপানী শাসক ও শোষকের দল মার্কিণ প্রভুদের মনস্তুষ্টি করিয়া সেখানে নিরাপদ হয়। ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার হয় না; শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে পূর্ব্বের ব্যবস্থা বলবৎ থাকে, জাপানী ও মার্কিণ পুঁজিপতিদের মিলনে উহার মালিকগোষ্ঠী নূতন রূপ পরিগ্রহ করে মাত্র। জাপানীদের পরিবর্ত্তে কোরিয়ান্ ও মার্কিণ প্রতিক্রিয়াপন্থীদের এই যৌথ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবল বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। ১৯৪৬ সালে অক্টোবর মাসে সমগ্র কোরিয়াব্যাপী ধর্ম্মঘট ও সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। উহা দমন করিবার জন্য যে হিংস্র আক্রমণ চলে, তাহাতে ৪ হাজার কোরিয়ান্ নিহত অথবা নিখোঁজ হইয়াছিল; আহত হইয়াছিল ৩ হাজার, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় ২৫ হাজার।

সোভিয়েট ও মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের অনুসৃত নীতির বৈপরীত্যের জন্য সোভিয়েট-মার্কিণ মিলিত কমিশনের কাজ অচল হইয়া ওঠে। সোভিয়েট

রুশিয়া তখন কোরিয়া হইতে উভয়পক্ষের সৈন্য অপসারণের দাবী তোলে। ১৯৪৬ সালের হিংস্র অত্যাচার সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে মার্চ্চ মাসে মার্কিণ সৈন্যের অপসারণের দাবীতে আবার দেশব্যাপী অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। সৈন্য অপসারণের প্রশ্নটা মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বড়ই অসুবিধাজনক। তাই, তখন তাঁহারা জাতিসঙ্ঘের মারফৎ কোরিয়ায় একটি বিশেষ কমিশন পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

জাতিসঙ্ঘের কমিশন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমানে সমগ্র কোরিয়ায় নির্ব্বাচন সম্ভব না হইলে যতদূরব্যাপী অঞ্চলে উহা সম্ভব, তত দূরে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার পর বৈদেশিক সৈন্য অপসারিত হইবে। কোরিয়াকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করিবার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া এবং বহু সংখ্যক লোককে কারারুদ্ধ করিয়া ১৯৪৮ সালের মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় নির্ব্বচনের ব্যবস্থা হয়। এই নির্ব্বাচনে নানাবিধ দুর্নীতির কথা শুনা যায়। যাহা হউক, ইহার পরই উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার নেতারা এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে সমগ্র কোরিয়াব্যাপী নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিগ্‌ম্যান্ রী-গভর্ণমেন্টের হিংস্রতা উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণ অঞ্চল সহ সমগ্র কোরিয়ায় নির্ব্বাচনের আয়োজন হইয়াছিল। এই সম্মিলিত নির্ব্বাচনের সময় রী-গভর্ণমেন্টের অত্যাচারে ৩ শত লোক নিহত এবং প্রায় ১০ হাজার লোক গ্রেপ্তার হয়। ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে সম্মিলিত নির্ব্বাচনে উত্তর কোরিয়ার প্রায় সমস্ত নির্ব্বাচক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার শতকরা ৭৭ জন নির্ব্বাচক যোগ দিয়াছিল। এই নির্ব্বাচনের পর ৩২টি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া 'সুপ্রীম্ পিপ্‌ল্‌স্ এসেম্বলী' গঠিত হয়। এই এসেম্বলীতে নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হইয়া "কোরিয়ান্ পিপ্‌ল্‌স্ ডিমোক্রেটিক রিপাবলিক্" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ডিমোক্রেটিক রিপাবলিকই এখন উত্তর কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত; সমগ্র কোরিয়ায় কর্ত্তৃত্ব বিস্তার ইহার সঙ্গত দাবী। এই দাবী উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমর্থিত। দেশীয় ও বিদেশীয় প্রতিক্রিয়ার প্রভাব হইতে মুক্তির জন্য—মাতৃভূমির দ্বিধা-বিভাগ অপনোদনের জন্য জাগ্রত কোরিয়াবাসীর বর্ত্তমান সংগ্রামে উত্তর-দক্ষিণের ভেদাভেদ নাই। বর্ত্তমানে উত্তর কোরিয়ানরা কেবল সামরিক শক্তিতেই জয়লাভ করিতেছে না, তাহাদের একটানা বিজয় সম্ভব হইতেছে মুক্তিকামী দক্ষিণ কোরিয়ানদের ঐকান্তিক সহযোগিতায়। প্রতীচীর প্রচার ঢাকগুলি অতি সযত্নে এই অপ্রীতিকর সত্যকে চাপা দিতেছে।

পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্কট—

প্রাচ্যের এই মুক্তি-সংগ্রামে প্রাধান্য কম্যুনিষ্টদের এবং ইহার নৈতিক সংযোগ সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে রুশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়ায় বাল্‌টিক হইতে বেরিং সাগর পর্য্যন্ত বিশাল অঞ্চলের অর্থনীতি পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব-অর্থনীতির আওতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব্ব ইউরোপ পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রভাবমুক্ত হয়। সম্প্রতি এশিয়ার বিশালতম দেশ—৪০ কোটী নরনারী অধ্যুষিত চীনও সমাজতান্ত্রিক পক্ষে চলিয়া গেল। ইহার পর, প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মুক্তি-সংগ্রাম যদি সফল হয়, তাহা হইলে বিশ্বের পুঁজিতান্ত্রিক এলেকা আরও সঙ্কুচিত হইবে। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি তাহার উন্নত অবস্থায় নিজ নিজ দেশের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; বিদেশের অর্থ-নীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তৃতি উন্নত পুঁজিবাদের স্বভাবধর্ম্ম। তাই, পুঁজিতান্ত্রিক এলেকার ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্কোচনে পাশ্চাত্যের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল প্রমাদ গণিয়াছে। চীনের পর প্রাচ্যের আর কোথাও গণশক্তি যাহাতে ক্ষমতা হস্তগত করিতে না পারে, তাহার জন্য এই মহলের এখন দৃঢ়পণ। কম্যুনিজম বিরোধিতার মুখোস পরিয়া পাশ্চাত্যের সমরযন্ত্র যে ক্রমে ব্যাপকতর ও হিংস্রতররূপে প্রাচ্যে নিয়োজিত হইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির আত্মরক্ষার এই একান্ত প্রয়োজনীয়তা। উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়া জাতিসঙ্ঘে প্রস্তাব পাশ করানো, সেখানকার গৃহ-যুদ্ধে মার্কিণ নেতৃত্বে পুঁজিতান্ত্রিক শক্তির সশস্ত্র হস্তক্ষেপ, ফরমোজায় কুয়োমিন্টাং চক্রকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আগ্রহ, ইন্দোচীনে মার্কিণ সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা, শ্যাম-মার্কিণ সামরিক চুক্তির আয়োজন প্রভৃতি সবের পশ্চাতেই পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বার্থ রক্ষার—তাহার বাঁচিয়া থাকার প্রবল তাগিদ।

ক্রেম্‌লিনে উৎসব (!)—

কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিমের পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি অধিকতর সমরায়োজনে মাতিয়াছে; স্বভাবতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে অগ্রণী। রণ-বিক্ষত ইউরোপের জনসাধারণ যুদ্ধের ঘোর বিরোধী; এমন কি মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রেও সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চাহে না। তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াই এই বিপুল সমরপ্রস্তুতি। যুদ্ধায়োজনের জন্য, অর্থাৎ জনসাধারণের অব্যবহার্য্য পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যয় করিবার মত শক্তি ইউরোপের কোনও দেশেরই আর অবশিষ্ট নাই। ইহারা এখন স্বভাবতঃ অধিক পরিমাণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীল হইবে এবং স্বদেশে জনকল্যাণমূলক কাজে অমনোযোগী হইবে। ইহার ফলে বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠীর এবং সমরকামী মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইউরোপে প্রবল গণবিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। প্রাচ্যের মুক্তি-আন্দোলন দমনের জন্য পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দৃঢ়তা এইভাবে তাহাদের নিজেদের শিবিরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করিবে। আর প্রাচ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে জনসাধারণ অধিকতর সংহত ও অধিকতর নির্ম্মম হইয়া উঠিবে। প্রাচ্যে বিভিন্ন দেশের মুক্তি-

সংগ্রাম একটি নৈতিক যোগসূত্রে গ্রথিত হইলেও বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ইহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে বিচ্ছিন্নভাবে। এই সংগ্রামের জাতীয় রূপ অবিকৃত। এই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের সমরপ্রচেষ্টা যে নৈতিক সমর্থন-বিবর্জ্জিত, তাহার জীবন্ত প্রমাণ সাম্রাজ্যবাদীদের সহচর চিয়াং, রী, বাও-দাই, কুইরিণো প্রভৃতি জীবগুলি। এই সব নৈতিক মেরুদণ্ডহীন জাতিদ্রোহীদিগকে আশ্রয় করিয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর সামরিক শক্তি নিয়োজিত হইতেছে। কম্যুনিজম-বিরোধিতার ক্ষীণ মুখোসের অন্তরালে এই শক্তির প্রকৃত রূপ প্রাচ্যের জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পাশ্চাত্য "গণতন্ত্রীদের" এই নৈতিক ক্ষতির গুরুত্ব বিশাল; সামরিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। জনপ্রিয় ও সর্ব্বতোভাবে জনসমর্থিত সেনাবাহিনীর শক্তি কিরূপ দুর্জ্জয়, তাহার পরিচয় বর্ত্তমানে কোরিয়ায় পাওয়া যাইতেছে। ইহা অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত মালয়। এখানে তিন হাজার গেরিলাকে দমনের জন্য ৬০ হাজার সৈন্য দুই বৎসর যাবৎ ব্যর্থকাম হইতেছে; বৃটেনের কোটী কোটী পাউণ্ড এখানে জলের মত ব্যয় হইতেছে। কয়েকটি দেশদ্রোহী অপদার্থকে সম্মুখে রাখিয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর সমরশক্তি যত অধিক পরিমাণে প্রাচ্যে নিয়োজিত হইবে, এখানে মুক্তিকামী জনগণের মৃত্যুপণ দৃঢ়তা ততই বেশী প্রবল হইবে; তাহাদের ঐকান্তিক সমর্থনে নিয়মিত সেনাবাহিনী ও গেরিলার দল অজেয় হইয়া উঠিবে। এইভাবে কোরিয়ায়, ফরমোজায়, ইন্দোচীনে, মালয়ে, ব্রহ্মদেশে এবং পরে ফিলিপাইন্‌সে ও শ্যামেও যদি পাশ্চাত্য শক্তিবৃন্দের সমররথের চাকা আঁটকাইয়া যায়, তাহা হইলে ক্রেম্‌লিনের ঐ ব্যক্তিটি পাইপ মুখে গুঁজিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন; তাঁহার নাগাল কোরিয়ায় যেমন পাওয়া যাইতেছে না, প্রাচ্যের অন্য কোনও অঞ্চলেও তেমনি পাওয়া যাইবে না। ঐ সময়ে পশ্চিম ইউরোপের কোনও কোনও দেশে গণ-বিক্ষোভ যদি সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পরিণত হয়, তাহা হইলে ক্রেম্‌লিনে সেদিন হয়ত উৎসবের আয়োজন হইবে।

প্রভাতী তারা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বল দেখি, ফিরে এলে কতদিন পরে ?
আমার এ ঘরে
তোমারে ধরিয়া রাখি ছিলনাক হেন আয়োজন
ছিল না বাসর-সজ্জা, করিনিক কুসুম চয়ন;
গন্ধদীপ ছিল নাক; মাটির প্রদীপ ছিল জ্বালা;
আর ছিল হৃদয়ের ডালা
পরিপূর্ণ কামনার ফুলে।
তুমি এসেছিলে ভুলে,

ভুলে যদি গিয়ে থাক চলে
সন্ধ্যাদীপ আজিও ত জ্বলিছে বিরলে
আলোকিয়া শূন্য মোর ঘর;
বিরহ দুর্ভর
সেও ভালো; বেঁচে থাক শুধু মোর আশা
মিলনের অশান্ত তিয়াসা
তীব্র হ'তে হোক তীব্রতর,
বিচ্ছেদ কামনা স্রোত হোক খরতর।

জাগ্রত আঁখির আগে শূন্য পথ ধরি
আবার যেদিন তুমি আসিবে সুন্দরী,
সাজিয়া নূতন সাজে নব অভিসারে—
সেদিন সে অন্ধকারে
কঙ্কণে ধ্বনিয়া তুলি নবতন সুর
একান্ত নিকট করি' দুরান্ত সুদূর
ডাক দিবে পরিচিত স্বরে,—
মনে হবে,—এলে যেন নব স্বয়ম্বরে।

সেদিন আমার ঘরে ফুলের উৎসবে
গন্ধদীপ জ্বালি দিবে উৎসর্গের আনন্দ-গৌরবে।
তবু জানি সে মিলন-রাত্রি অবশেষে
মলিন আননে ক্ষণে মৃদু হাসি হেসে
নতনেত্রে চাহিবে বিদায়।
কতক্ষণ ধ'রে রাখা যায়
প্রভাতী তারার দীপ্তি, ক্ষণস্থায়ী আয়ুর সমান
এই আছে, এই নাই, পলক মেলিতে অন্তর্ধান।

দ্বারমণ্ডল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
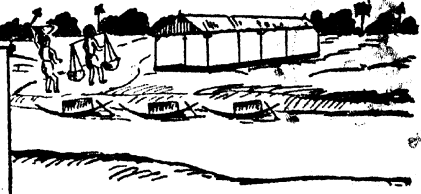
(পূর্বানুবৃত্তি)

অরুণার খুব বেশী দুর্ভোগ পোহাইতে হইল না। আই-বি ইনস্পেক্টর রণদাপ্রসাদ তাহাকে অল্পেই ছাড়িয়া দিল। রণদাপ্রসাদ এই জেলাতেই সাধারণ সাব-ইনস্পেক্টর হিসাবে কাজ সুরু করিয়া আপন কৃতিত্বে এখানকার আই-বি ইনস্পেক্টর হইয়াছে। সেদিক দিয়া কর্ম্ম-জীবনের গোড়ার দিকে তাঁহার খ্যাতি এবং কৃতিত্ব এস-পি-সমশের খান এবং দারোগা দরবারী শেখের খ্যাতি ও কৃতিত্ব এক খাতের জল-স্রোতের মত স্বাদে বর্ণে পলির পরিমাণে একরকমই ছিল। কিন্তু সমশের খানের মুসলীম প্রীতি এবং হিন্দু বিদ্বেষ রণদাপ্রসাদকে সৎপথে বা সত্যের পথের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে।

প্রথমেই দরবারী রণদাকে চটাইয়া দিল—সে থানার ইনস্পেকসন রুমে অরুণাকে হাজির করিয়া বলিল—দেখুন স্যার কি রকম ভোল পালটেছে দেখুন!

সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে রণদা দরবারীর মুখের দিকে চাহিল। দরবারীর কথাটা ঠিক তাহার মাথায় ঢোকে নাই। দরবারী অরুণাকে বলিল—এখনও তো বুড়ী হও নি তুমি—এরই মধ্যে তপস্বিনী সাজলে যে?

অরুণার মুখ লাল হইয়া উঠিল। বক্যটা কৌশলে ব্যবহার করিলেও—মূল প্রবাদ বাক্যে ব্যবহৃত 'বেশ্যা' শব্দটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তবু সে কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল। রণদাবাবুও চকিত হইয়া দরবারীর দিকে চাহিল। রণদা নিজেও কথাটা ব্যবহার করিতে পারিত, ইহার পূর্ব্বে এ অপেক্ষাও কুৎসিত কথা সে স্বচ্ছন্দে অনর্গল ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—আঃ দরবারী! তবে জোরে ধমক দিতে সাহস হইল না। কিছুক্ষণ পরেই সমশের খাঁ আসিতেছে। মনে পড়িয়া গেল—বৎসর দুয়েক আগে যখন জেলায় ষড়যন্ত্র মামলা আবিষ্কারে খাঁ মাতিয়া উঠিয়াছিল—সেই সময় একটা ছিঁচকে চুরিকেও সমশের সুকৌশলে ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছিল—সেই সময় রণদা বলিয়াছিল—এটা বাদ দিন—লোকে বলবে কি? না—না! সমশের তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সোজা সহজ সুরে বলিয়াছিল—'আমি দেখছি রণদাবাবু তোমাকে আবার সেই সাবইনস্পেক্টর-শিপেই রিভার্ট করতে হবে।' এখন রণদাবাবু পাকা ইনস্পেক্টর—তবুও সমশের খানের মুখ মনে পড়িলে খানিকটা দমিয়া যাইতে হয়।

ওদিকে দরবারী ওইটুকু ধমকে দমিল না। সে বলিল—না স্যার ঢঙ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। দেখুন না—থান কাপড় প'রে—হাত শুধু ক'রে—রুখু চুলে এলোকেশী হয়ে একেবারে গোঁসাই ঠাকরুণ সেজেছেন। মুসলমান হয়ে কলমা পড়ে বিয়ে করে—ফের হিঁদু হয়ে—

এবার রণদা দৃঢ় হইয়া ধমক দিল—দরবারী সাহেব ওগুলো আমাদের জিজ্ঞাসার বিষয় নয়। আপনি বাইরে যান, ওঁকে যা জিজ্ঞাসা করবার আমি করছি। যান—।

এ-আদেশ লঙ্ঘন করিতে দরবারীর সাহস হইল না। দরবারী এখনও ঠিক আই-বি বিভাগের লোক'ও নয়। রণদার ব্যক্তিত্বও আছে।

দরবারী বাহিরে যাইতেই রণদা বলিল—কিছু মনে করবেন না। ওদের আসল রাগটা হ'ল আপনি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে বিয়ে করে ফের হিন্দু হলেন কেন? এরা—। পুলিশ বিভাগের লোক না-হইলে রণদা হয় তো আরও অনেক কথা বলিয়া ফেলিত। সমশের খাঁ এখানকার এস-পি না হইলেও বলিত। নিজেদের দলের লোক এস-পি হইলেও বলিত। প্রাণ ভরিয়া—পেট খোলসা করিয়া বলিত। আত্মদমন করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল—তারপর বলিল,—কি বলব বলুন? এর

জন্যে দায়ী হচ্ছেন আপনারা। কংগ্রেস, রেভলিউসনারী পার্টি। স্বাধীনতা—স্বাধীনতা রব তুলে হুজুক করে—আন্দোলন করে আর বোমা পিস্তল ফুটিয়ে দেশটাকে এদের হাতে তুলে দিতেন না। আপনারাই এর জন্যে দায়ী!

অরুণা বসিয়া ছিল পাথরের মত। প্রথম বয়সে—অর্থাৎ সে যখন কুমারী অবস্থায় তাহার দাদার সঙ্গে এই দলে যোগ দিয়াছিল—তখন—দুইবার তাহাকে কলিকাতার আই-বি আপিসে যাইতে হইয়াছিল। তখন সে মুখে তুবড়ী ফুটাইয়াছিল। দু-মাস পূর্ব্বে হইলেও সে কাটা কাটা জবাবই দিত। কিন্তু এই দু-মাসে সে একেবারে পাল্টাইয়া গিয়াছে; দেখিলে মনে হয় যে—একটা কঠিন জীবন-সঙ্কট রোগে ভুগিয়া—তাহার ধাতুটাই পাল্টাইয়া গিয়াছে। রণদার কথার জবাবে সে এতক্ষণে কথা বলিল—আমি কংগ্রেসের মেম্বর পর্য্যন্ত নই; বোমা-পিস্তল ছুঁড়ে যারা স্বাধীনতা আনবেন—তাদের সঙ্গেও আমার কোন সংশ্রব নেই!

আজ না হইয়া অন্যদিন হইলে রণদা টেবিলে একটা কিল মারিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিত। ন্যাকামি, প্যাঁচ কষিয়া উত্তর সে আদৌ সহ্য করিতে পারে না। আজ কিন্তু তাহার মেজাজ আলাদা। সে এই হিন্দুকন্যাটিকে কোন রকমে ছাড়িয়া দিতে পারিলে বাঁচে। অরুণার উত্তরে মুখ একটু বিকৃত করিয়া সে বলিল—তা জানি, আপনারা আবার কম্যুনিষ্ট! বলিতে বলিতে সে ক্ষেপিয়া উঠিল—বলিল—আপনারা আবার জাত মানেন না, ঈশ্বর মানেন না। হুঁ—তাইতেই এমন ভাবে মুসলমান হ'তে বাধে নি। কিন্তু—। সত্যিই তো দরবারী মিথ্যে বলে নি—আবার মরতে হিন্দু হলেন কেন?

অরুণা বলিল—এ কথার উত্তর আমি দেব না।

—দেব—না? ছয় ফুট লম্বা জোয়ান রণদা চেয়ারে দেহখানাকে শিথিল করিয়া বসিয়াছিল। সে সহসা চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি খানাকে ফুলাইয়া—সোজা হইয়া বসিল।

হাঁকটা বাহির পর্য্যন্ত গিয়াছিল। দরবারী দরজার গোড়ায় আগাইয়া আসিল। পদশব্দে রণদা ঘুরিয়া তাকাইতেই বলিল—দেখছেন স্যার—ত্যাঁদড়ামা!

রণদা ঘুরিয়া অরুণাকে বলিল—আপনি তা হ'লে অরুণা সেন? বিশ্বনাথ ভটচাজকে মুসলমান হয়ে বিয়ে করেছিলেন। ফের হিন্দু হয়ে এখন অরুণা ভটচাজ হয়েছেন?

—হ্যাঁ। এ তো গোপন করি নি আমি।

—করেছেন। এখানে যখন গার্লস ইস্কুলে কাজ নেন—তখন এ পরিচয় দেন নি। স্বামীর নাম লিখেছেন—বিশু ভটচাজ।

—আমার স্বামী ওই নামই ব্যবহার করতেন। বিশ্বনাথ বলতেন না নিজেকে। আর এখানকার কেউ আমাকে কোন প্রশ্নও করেন নি। এ দেশে শুধু 'বিশু' বলে কেউ নাম লেখে না, তবুও কেউ প্রশ্ন করেন নি, 'বিশু' লিখেছেন কিন্তু পুরো নাম কি?

—হুঁ। আপনি কম্যুনিষ্ট?

—এ যুগে সাধারণ শিক্ষিত লোকে সবাই চায় কম্যুনিজম সম্মত ব্যবস্থা।

—তা—না। আপনি কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বর?

—না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল অরুণা। মিথ্যা তাহাকে বলিতে হইল।

—আপনার স্বামী? বিশ্বনাথ তো মেম্বর ছিলেন?

—আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন দেখছি—

—তার মানে?

—তার মানে—আপনারা যা বলেছেন, যা জেনেছেন—সে সব কথা আমি তো জানি না। তা ছাড়া, আমি তো নিজে কোন রাজনৈতিক দলে কখনও যোগ দিই নি। আমার দাদা অবশ্য জেল খেটেছেন, ডেটিন্যু ছিলেন; তাঁর বন্ধু ছিলেন আমার স্বামী সেই হিসেবেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়—সেই পরিচয় ক্রমে—

থামল অরুণা। মুখে বোধ হয় বাধল। একটু থেমেই বললে—শেষ বিয়ে করি দুজনে।

—হুঁ। মুসলমান হয়েছিলেন কেন? হিন্দু থেকেও তো বিয়ে করতে পারতেন। দশ বিশটাতেও তো বাধা নেই।

—ও কথার জবাব দেব না। একবার তো বলেছি।

—না দেন দরকার নেই জেনে। এখন যেতে পারেন আপনি।—না—আর একটা কথা। এখানকার দেবু

ঘোষই আপনাকে এখানে এনেছিল এ কথা কি ঠিক? এবং তার সঙ্গে আপনার এত হৃদ্যতাই বা কিসের?

—উনি আমার স্বামীর বন্ধু, আমার স্কুলের সেকেণ্ড মিস্ট্রেস স্বর্ণের স্বামী, পাশাপাশি বাসায় থাকি। সজ্জন ব্যক্তি। এই পর্য্যন্ত। উনি আমাকে চাকরীর খবরটা দিয়েছিলেন। আমি ওঁকে লিখেছিলাম—আমার স্বামীর দেশে থাকতে চাই।

—আচ্ছা যান আপনি। বলিয়াই গলা নামাইয়া মৃদুস্বরে তাড়াতাড়ি কি বলিতে গেল, তাও না বলিয়া একটা কাগজে খসখস করিয়া কি লিখিয়া—কাগজটার দিকে অরুণার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অরুণা দেখিল—রণদা লিখিয়াছে—"এখান থেকে পত্রপাঠ চলে যান, সমশের খানের হাত থেকে বাঁচা বোধ হয় অসম্ভব।" কাগজখানা সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠায় তালগোল পাকাইয়া ছোট্ট একটি গোল পিণ্ডে পরিণত করিয়াও ক্ষান্ত হইল না রণদা শেষে সেটাকে মুখে পুরিয়া চিবাইতে সুরু করিল।

অরুণা উঠিয়া দাঁড়াইল।

—দাঁড়ান। আর একটা কথা।

অরুণা জবাব দিল না, প্রশ্নের প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইল।

রণদা বলিলেন—থাকবেন কোথায়? নিজের বাসাতেই থাকবেন তো?

অরুণা বলিল—হ্যাঁ।

—থাকবেন ক' দিন?

অরুণা সবিস্ময়ে রণদার দিকে অসঙ্কোচে তাকাইয়া রহিল—তারপর বলিল—আমি তো এখানে চাকরী করি—

—আপনি তো রেজিগনেশন দিয়েছেন। চার্জ্জ বুঝিয়ে দিতে এসেছেন। রণদার দৃষ্টিতে ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিল—'এখান থেকে পত্রপাঠ চলে যান'।

অরুণা শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইল—যেন নিজের মনের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিয়া লইল; তারপর সেই শূন্য দৃষ্টি রণদাবাবুর মুখের উপর তুলিয়া ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কয়েক শব্দ বলিয়া গেল, অসংলগ্ন হইল—কিন্তু সুস্পষ্ট অর্থ এবং দৃঢ়তায় তাহার সে উত্তর রণদাকে বিস্মিত এবং নিরুত্তর করিয়া দিল। অরুণা বলিল—আমি—রেজিগনেশন—উইদড্র করব।

নিরুত্তর রণদার বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিল—' আমি যে কথা তোমাকে লিখে জানালাম—তার পরেও থাকতে চাও এখানে?

নারী না হইয়া পুরুষ হইলে—রণদা মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গালে অন্তত প্রচণ্ড একটি চপেটাঘাত কষাইয়া দিত। নারী—আবার অরুণা না হইয়া—অন্য কেহ হইলে সমশের দরবারীর সঙ্গে বিরোধটা—সুস্পষ্টরূপে হিন্দু মুসলমান বিরোধের ভিত্তির উপর গজাইয়া না উঠিলে রণদা ছাড়িত না। দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া গালাগালি করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া কাণ্ড বাধাইয়া তুলিত। উনিশশো সাতাশ আঠাশ হইতে বিপ্লবীদের দলে মেয়েরা ঢুকিতে সুরু করিয়াছে—আই বি বিভাগের কর্ম্মচারী রণদাকে মেয়েদেরও শায়েস্তা করার অভ্যাস আয়ত্ত করিতে হইয়াছে, সে—অভ্যাস তাহার আছে। কিন্তু অরুণা মেয়েটি আজ অভিনব মূর্ত্তি লইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। নিরুচ্ছ্বসিত অথচ অনমনীয়—একটি মেয়ে। সে অবাক হইয়া অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দরবারী একখানা হুকুম নামা আনিয়া রণদার সম্মুখে ধরিল। পুলিশ সাহেবের সই করা—হুকুম নামা; নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে দুইদিন থানায় হাজিরা দিতে হইবে; কোথাও যাইতে হইলে জানাইতে হইবে—ইত্যাদি। হুকুম-নামাটায় অরুণার নাম বসাইয়া লইয়া আসিয়াছে দরবারী।

রণদা সেখানা নিজের হাতেই রাখিয়া দিল, বলিল—আচ্ছা যান আপনি। বলিয়াই আবার বলিল—চলুন—বাইরে আমি পৌছে দিচ্ছি।

অরুণা অগ্রসর হইল। দরজার কাছে গিয়া কিন্তু থমকিয়া দাঁড়াইল। দরজার একটা বাজু ধরিয়া যেন আত্মসম্বরণ করিতেছিল। রণদা প্রশ্ন করিল—কি হল?

—কিছু না। কেমন একটু—

—অসুস্থ বোধ করছেন?

—না। ঠিক আছে। সে আবার পা বাড়াইল।

—জল খাবেন?

—না। সে অগ্রসর হইল।

* * *

বাহিরে সুরপতি চেয়ারে বসিয়াছিল। ওদিকে বসিয়াছিলেন—ন্যায়রত্ন তাঁহার পাশে দেবকী সেন।

তাঁহাদের কাছেই বসিয়াছিল স্বর্ণ। গৌর দাঁড়াইয়া আছে রাস্তার উপরে। নেলো বসিয়া কাঠী দিয়া মাটীর উপর একটা ছবি আঁকিতেছে।

ওদিকে বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে। শেষ অপরাহ্ণের সূর্য্যের আলোয় লালচে রেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আলো পরিপূর্ণ ভাবে পড়িল অরুণার সর্ব্বাঙ্গে। পশ্চিমমুখী থানাটার বারান্দাটি যেমন দাওয়া উঁচু—তেমনি প্রশস্ত।

সুরপতি চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—কি? মিসেস ভটচাজ্জি—?

দেবকী সেনও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেও বলিল—কি হয়েছে? অরুণা দেবী?

স্বর্ণের দৃষ্টি যেন জ্বলিতেছিল। এ কি মুখ হইয়াছে অরুণা দিদির? সে যেন এখনি এই মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িয়া যাইবে।

ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শান্ত বার্দ্ধক্য দুর্ব্বল কণ্ঠে ডাকিলেন—দিদি!

অস্ফুটস্বরে অরুণা সবিস্ময়ে যেন প্রশ্ন করিয়া উঠিল—আপনি? অর্থাৎ আপনিও আসিয়াছেন? আমার জন্য?

স্বর্ণ আসিয়া তাহার হাত ধরিল—বলিল—অরুণাদি? ওইটুকুর মধ্যে অনেক প্রশ্ন নিহিত ছিল—এবং সেগুলি সুস্পষ্ট।

অরুণা পূর্ব্বের মতই ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে বলিল—ছাড়।

—কি হয়েছে বলুন? স্বর্ণের কণ্ঠস্বর প্রদীপ্ত, রি-এনফোর্সড কংক্রিটের ছাদের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া রণ রণ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

রণদাবাবু বলিলেন—উনি বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গোড়া থেকেই কেমন যেন দেখাচ্ছিল। হঠাৎ—এই বেরিয়ে আসবার মুখে—এ রকম হয়ে গেলেন।

স্বর্ণ বলিল—বসুন—আপনি—বসুন।

—না, ছাড়, দাদুকে প্রণাম করব।

অরুণা গিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিল।

ন্যায়রত্ন তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—ওঠ। নিজেই তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন, বোধহয় অরুণাকে হাত ধরিয়া তুলিবার জন্য! অরুণা বলিল—আমি নিজেই উঠতে পারব।

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—না। এ বয়সে কাউকে ধরে তুলবার সামর্থ্য আমার নাই ভাই। আমি—। বলিয়াই অরুণার ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন—তুমি অসুস্থ?

অরুণা ক্লান্ত ভাবেই উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—না—দাদু!

সুরপতি একটু অগ্রসর হইয়া আসিল—বলিল—আপনার মুখ দেখেই বুঝা যায় মিসেস ভটচাজ।

দেবকী বলিল—আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন। বসুন।

স্বর্ণ বলিল—গৌর, দেখ তো, ষ্টেশনে গরুর গাড়ী আছে কিনা?

ন্যায়রত্ন অরুণার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, বার্দ্ধক্য স্তিমিত দৃষ্টিতে অরুণাকে দেখিয়া বুঝিতে চাহিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন—সত্যই তো। তোমার মুখে যে—কোন দুরন্ত ক্লেশের ছাপ ফুটে উঠেছে!

—না—দাদু—না। অরুণা যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

সে সিঁড়ি দিয়া নামিতে সুরু করিল। এখান হইতে পালাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে।

—দাঁড়ান অরুণাদি, এমন ক'রে ছুটবেন না। পড়ে যাবেন।

—না। পড়ব না।

—দিদি!

অরুণা সিঁড়ির শেষ ধাপে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

দেবকীর হাত ধরিয়া ন্যায়রত্ন ধীরপদক্ষেপে সিঁড়ি নামিয়া কাছে আসিয়া বলিলেন—একটু ধীরে চল ভাই। যতক্ষণ এক সঙ্গে চলা যায়—এক সঙ্গেই যাই চল।

স্বর্ণ বলিল—বলুন অরুণাদি কি হয়েছে বলুন। সকলের সামনে এখুনি বলুন। বলতে হবে আপনাকে। ওঁদের অসাধ্য তো কিছু নাই। বলুন!

অরুণা এবার বিচিত্র দৃষ্টিতে স্বর্ণের দিকে চাহিয়া বলিল—আজ একাদশী স্বর্ণ।

অন্ধকার রাত্রে অত্যুজ্জ্বল আলোয় ভরিয়া দিয়া একটি উল্কাপাত হইয়া গেল যেন। চমকিয়া উঠিল সকলেই—সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল সকলের দৃষ্টিতে। শুধু স্বর্ণ বলিল—প্রশ্ন করিল—একাদশী?

—হ্যাঁ !

—নির্জ্জলা ?

—না। তা পারব না। প্রয়োজনও নেই।

—থান কাপড়ও পরেছেন দেখছি।

এ কথার উত্তর দিল না অরুণা। নতমুখে ক্লান্ত-পদক্ষেপে ন্যায়রত্ন ও দেবকী সেনের সঙ্গে অগ্রসর হইল।

সুরপতি রণদার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—মাই গড !

রণদা ললাটের কুঞ্চন রেখায় প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া স্থির দৃষ্টিতে অরুণাকে দেখিতেছিল। উত্তর আবিষ্কার করিতে চাহিতেছিল। সুরপতির প্রশ্নে তাহার দিকে ফিরিয়া সেও মুচকি হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই কাঁধ স্রাগ করিয়া হাত দুইটা উল্টাইয়া দিয়া বলিতে চাহিল—কে জানে বাবা !

থানার দাওয়ার উপর হইতেই দাওয়ায় ঠেসানো সাইকেলখানায় চাপিয়া বসিয়া প্যাডেলে চাপ দিয়া চালাইয়া দিয়া সুরপতি রণদাকে বলিল—আচ্ছা। চলি এখন। হবে দেখা পরে।

সেও চলিল—অরুণা ন্যায়রত্ন দেবকী সেন যে পথে গিয়াছে—সেই পথে। প্রশ্ন তার মনেও জাগিয়াছে। একাদশী করিয়াছে অরুণা ? আবার সে আপন মনে মুচকি হাসিল।

থান কাপড় পড়িয়াছে—একাদশী করিয়াছে। অরুণা ভটচাজ ? (ক্রমশঃ)

বৌদ্ধযুগে দাসত্ব

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাকালে পৃথিবীর সকল দেশে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। শুধু যে ভারতবর্ষেই এই প্রথা সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, তুরস্ক, মিশর, পারস্য, গ্রীস, রোম, চীন প্রভৃতি দেশেও ইহা আরও কঠোরভাবে ছিল। নরনারীকে পশুর ন্যায় বাজারে বিক্রয় করা হইত। ধনী, শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ইহাদিগকে হীন চক্ষে দেখিত। আবার উদারচেতা ব্যক্তিরা ইহাদের ভালবাসিত।

গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন এই দেশে দাসদাসীর অবস্থা অনেকটা নিয়মাবদ্ধ ছিল। তখন অন্যান্য দেশে ইহারা অত্যন্ত নির্যাতিত হইত। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশের অনেক মহাপুরুষ এই প্রথার অশেষ নিন্দা করিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই আর্য্যেরা দাসত্বের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ম্লেচ্ছরা তাহাদের পুত্রকন্যাদের এই কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য গৃহে প্রতিপালন করিয়া বাজারে বিক্রয় করিত। অত্যাচারী লোকেদের হাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম ও শাস্তির বিধান ছিল। ইহাদিগকে মৃতদেহ বহন, মলমূত্রাদি পরিষ্কার প্রভৃতি নীচ কাজে নিযুক্ত করিলে, ইহাদিগকে উলঙ্গ অবস্থায় রাখিলে, মিথ্যা গালাগালি করিলে, প্রহার করিলে, কোন দাসীর জোরপূর্ব্বক সতীত্বনাশ করিলে, পাশবিক অত্যাচারীকে সাহায্য করিলে বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। দাসদাসী যদি তাহার ক্রীতমূল্য প্রভুকে ফিরাইয়া দিত তাহা হইলে সে এই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইত। যদি কোন প্রভু তাহা সত্ত্বেও তাহাকে মুক্তিদান না করিত তাহা হইলে ঐ প্রভুকে শাস্তি পাইতে হইত। কোন প্রভু যদি তাহার গর্ভবতী দাসীর কোন ব্যবস্থা না করিয়া তাহাকে [illegible] বিক্রয় বা বন্ধক দিত, এই অন্যায় কার্য্যের জন্য উভয়কেই শাস্তি পাইতে হইত। মুক্ত দাসদাসীকে যদি কেহ আবার বিক্রয় করিত বা বন্ধক দিত তাহাকেও শাস্তি পাইতে হইত। শাস্তির নিয়মানুসারে দাসদাসীকে ক্রীতমূল্যের সহিত আরও কিছু অর্থ দিতে হইত এবং রাজসরকারে দ্বিগুণ অর্থ-দণ্ড দিতে হইত।

যবন, কাম্বোজ, গান্ধার, সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সমাজে প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল : ইহার উল্লেখ নিকায় ও মহাভারতে পাওয়া যায়। বিদুরপণ্ডিত জাতক হইতে জানা যায় দাসদাসীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(১) যাহারা দাস ও দাসীর গর্ভজাত, (২) অর্থের বিনিময়ে যাহারা বিক্রীত হইত, (৩) আইন অমান্যকারীকে দাসত্ব করিতে হইত, (৪) যাহারা স্বইচ্ছায় দাসত্ব গ্রহণ করিত। মনুসংহিতার মতে ইহাদিগকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) যুদ্ধে পরাজিত ও ধৃত বন্দিগণ, (২) যাহারা নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য দাসত্ব করিত, (৩) যাহারা গৃহে জন্মগ্রহণ করিত, (৪) যাহারা বিক্রীত হইত, (৫) যাহাদিগকে অপরের নিকট দান করা হইত, (৬) পুরুষানুক্রমে যাহারা দাসত্ব করিত, (৭) আইনানুসারে যাহারা দাসত্ব করিতে বাধ্য হইত।

অর্থশাস্ত্রে দশ প্রকার দাসদাসীর কথা আছে এবং নারদস্মৃতিতে ইহারও বেশী সংখ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকে দাসদাসীর বিক্রয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি অপদান গ্রন্থ হইতে

ইহাদের বিষয় অনেক কিছু জানা যায়। সাধারণতঃ পুরুষানুক্রমে ইহাদের পুত্রকন্যারা দাসদাসীর কাজ করিত। বাড়ীতে ইহারা রন্ধন কার্য্য করিত, বাজার করিত, জল আনিত, ধান ভানিত, চাউল তৈয়ার করিত, ভিক্ষা দিত, খাবার সময় প্রভুকে বাতাস করিত, গোয়াল পরিষ্কার করিত, চাষের কাজ করিত, প্রভৃতি যাবতীয় গৃহস্থালী কাজ করিতে হইত। রোমের ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর ন্যায় ইহাদের উপর প্রভুদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল এবং ইহারা গৃহস্বামীর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইত। বৌদ্ধ গ্রন্থে আরও দেখিতে পাই ইহাদিগকে অপরের নিকট দান করা হইত। ইহাদের নিজস্ব স্বত্ত্বা এবং স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই ছিল না। এমন কি বিবাহ করিতে হইলে প্রভুদের মত লইতে হইত।

যেমন একদিকে এইরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতির প্রভু ছিল, আবার স্নেহান্ধ পিতার ন্যায় কতকগুলি প্রভু এই সব অস্ত্যজ, নিপীড়িত ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীকে ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন, ইহাদের দুঃখ বুঝিতেন এবং সেই দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করিতেন। বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন প্রভুরা এই সকল দাসদাসীকে নিজেদের সংসারের স্ত্রী, পুত্র কন্যা ও আত্মীয়দের মধ্যে স্থান দিতেন। ইহাদের সুখ দুঃখের কথা শুনিতেন প্রয়োজন হইলে ইহাদের সুপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইহাদিগকে উন্নত করিবার জন্য নিজেদের পুত্রকন্যাদের ন্যায় লেখাপড়া ও শিল্পকার্য্য শিখাইতেন। প্রভুর সুখ দুঃখে ইহারা জড়িত ছিল। প্রভুদের রন্ধনাদি করিয়া দিত, বেশ পরিধান কাজে সাহায্য করিত, গৃহ পরিষ্কার এবং নানাপ্রকার গৃহকাজ করিত। তথাপি প্রভুরা ইহাদের অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন না। এই অশিক্ষিত অনুন্নত নিম্নশ্রেণীর দাস দাসীরা যাহাতে সমাজে স্থান পায় সেজন্য চেষ্টা করিতেন। মহাপ্রাণ প্রভুরা ইচ্ছা করিলে ইহাদের এই দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে পারিতেন। দানবীর শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডকের কোন এক ক্রীতদাসীর কন্যা তর্কে ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করিয়া মুক্তি পাইয়াছিল। অনুন্নত সমাজের এই সকল মেয়েদের সহিত উচ্চতর সমাজের পুরুষদের বিবাহের উল্লেখ বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ মল্লিকা নামে এক ক্রীতদাসীর কন্যাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রভুর অনুমতি লইয়াছিলেন।

যাহারা যুদ্ধে পরাজিত বা ধৃত হইত, বিচারে যাহাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইত, কিংবা যাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িত, তাহারা দাসত্ব করিতে বাধ্য হইত। আবার অনেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দাসত্ব করিত। একটি পরমাসুন্দরী যুবতী রণক্ষেত্রে বন্দিনী হইয়া দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দাস দাসীর দুঃখ কষ্টের পরিসীমা ছিল না। অতি সামান্য দোষে ইহাদিগকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইত। কোন এক গৃহস্থের স্ত্রীর কাছে কালী নামে একটী ক্রীতদাসী ছিল। সে সমস্ত কাজ অতি সুচারুরূপে করিত। একদিন ঘুম হইতে উঠিতে তাহার দেরী হয়, সে জন্য গৃহকর্ত্রী তাহার উপর বড়ই বিরক্ত হন। পরদিন সে আবার দেরী করিয়া উঠিলে তিরস্কৃত হয়। তৃতীয় দিন আরও দেরী করিয়া উঠিলে গৃহকর্ত্রী রাগান্বিত হইয়া কালীকে এরূপ প্রহার করে যে তাহার মাথাটি একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। ক্রীতদাসের অপেক্ষা ক্রীতদাসীর অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। গৃহেজাত দাস-দাসীর মধ্যে বিরনীর নাম পাওয়া যায়। দাসী সুন্দরী হইলে অপরকে উপহার স্বরূপ দান করা হইত। সুবিধা পাইলে দাস দাসীরা মনিবের অর্থ ও জিনিষ পত্র চুরি করিত। অনেকে এই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিত। মুক্ত ও স্বাধীন জীবন যাপনের জন্য, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর প্রভুদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য, নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, ইহারা প্রভুর বাটি হইতে পলায়ন করিত।

কেবল যে রাজা ও ধনীরা ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী রাখিত তাহা নহে—ব্রাহ্মণেরা, শ্রমনেরা, গ্রামবাসীরা, কৃষকেরা সকলেই তাহাদের কাজের জন্য ইহাদিগকে নিযুক্ত করিত। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাই অত্যাচারী লোকদিগকে রাজার আদেশে দাসত্ব করিতে হইয়াছিল। কোনও এক গ্রামের মোড়ল রাজার সম্মুখে গ্রামের লোকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা নিন্দা করার ফলে দাসত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এমন কি রাজমন্ত্রীরাও হিংসাবশতঃ যদি অন্যায় করিতেন কিংবা অন্যায় কাজের সাহায্য করিতেন তাহা হইলে তাহাদের শাস্তি স্বরূপ দাসত্ব করিতে হইত। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে সমাজে দাসত্ব অতি ঘৃণ্য ও নীচ কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত।

অহিংস ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামানব বুদ্ধদেবের বাণী জনগণের হৃদয়ে এক নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছিল। এই হৃদয়হীন দাস প্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত করিতে তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। মানবের মুক্তিকামী বুদ্ধদেব দাসত্বকে কারা-যন্ত্রণা-ভোগ, ঋণ, রোগ, এবং কণ্টকাকীর্ণ পথের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহা অতীব কষ্টকর এবং দুঃখপ্রদ কার্য্য। তাঁহার অমৃত বাণী বহু অনুন্নত দাস দাসীর চরিত্র গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। বৌদ্ধ সংঘে ক্রীত দাস দাসীর ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির স্থান ছিল না। তিনি উপাসকদের দাস দাসী ক্রয় ও বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য দাস দাসীদের অবস্থার উন্নতির জন্য বুদ্ধদেব সৎ গৃহস্থকে অতি প্রয়োজনীয় পাঁচটি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন—(১) শক্তি এবং সামর্থ্যানুযায়ী ইহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, (২) ইহাদিগকে উপযুক্ত খাদ্য এবং বেতন দিবে, (৩) পীড়িত হইলে ইহাদিগের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবে। (৪) নিজেদের মুখরোচক ও ভাল খাদ্য হইতে ইহাদিগকে ভাগ দিবে, (৫) মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে ছুটি উপভোগ করিতে দিবে।

প্রাচীন ভারতে সমাজে দাসত্ব ছিল এবং দাস দাসীর সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় না। বহু কষ্টকর কার্য্য হইলেও, বৌদ্ধযুগে দাসত্বের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই।[১]

১। এই প্রবন্ধ প্রণয়ন কালে যে সমস্ত পুস্তক হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—বুদ্ধিষ্ট, ইণ্ডিয়া (রিধু ডেভিডস্), অর্থশাস্ত্র (শ্যাম শাস্ত্রী), এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া (ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল), মঝিম নিকায়, পপঞ্চসুদানি, বিনয় পিটক, মনুসংহিতা, অঙ্গুত্তর নিকায়, অপদান, আচারঙ্গসূত্র, ধম্মপদ ভাষ্য বিনয়বত্থু ভাষ্য, দীঘ নিকায়, মহাবংশ ইত্যাদি।

—তেরো—

প্রায় দুহাজার লোক জড়ো হয়েছে শাহুর কাছারীর সামনে।

একদল লোক যথাসাধ্য সেজে গুজে এসেছে—যেন ইদের নামাজের জমায়েৎ। আর একদল উঠে এসেছে সোজা ক্ষেত থেকে, তাদের গায়ে লাল মাটির স্বাক্ষর। খড়ি-ওড়া রুক্ষ শরীর—তেলের অভাবে জমাট বাঁধা লাল চুল; হাতে হাঁসুয়া আছে, লাঠিও আছে। ময়লা গামছায় বেঁধে চিঁড়ে মুড়ির নাস্তাও নিয়ে এসেছে কেউ কেউ—সঙ্গে আছে টিনের চৌকো দেশী লণ্ঠন। অনেক দূরে যেতে হবে—কত রাত হবে ফিরতে, কে জানে! আর বলা যায় না—জমায়েতের পরে হয়তো গানের ব্যবস্থাও থাকতে পারে—এমন আশাও কারো কারো মনে স্থান পেয়েছে। রাতটা মন্দ কাটবেনা তা হলে।

আর আছে জনকয়েক চৌকিদার। নিজেদের তাগিদেই তারা এসে জুটেছে। রং-জলে-যাওয়া উর্দির ওপর চকচক করছে পেতলের চাপরাশ—এই বিশেষ উপলক্ষ্যটির জন্যেই মেজে ঘষে তাদের পরিষ্কার করা হয়েছে। অনাহূতভাবেই সভার শান্তিরক্ষা করছে তারা।

—কী হচ্ছে উদিকে? গোলমাল করিবেন না?

—এই মিঞা, চুপ করি বৈসো ক্যানে। খামোকা ওইঠে ফির্ কিবা ঝামেলা লাগাইলে হে?

—চিল্লাবা হয় তো এইঠি নাকি উঠি যাও। ইটা তামাসা নহো, ওয়াজ হবি।

রোদে ঝক্‌ঝকে চাপরাশ আর গম্ভীর মুখেও তারা যথোচিত পদমর্যাদা রাখতে পারছে না। নানারকম টীকা-টিপ্পনি আসছে তাদের লক্ষ্য করে।

—ইস্, ত্যালখানা ছাখো হে! য্যান্ দারোগা হছেন!

আর একজন চিম্‌টি কাটল: আইতের (রাতের) ব্যালা চোর দেখিলে বাপ বাপ করি পালাবা পথ পায় না; এইঠে আসি মেজাজ ছাখাছে।

—সিটাই কহো না। কামের ব্যালায় কিছু নাই—আইতে আসি খামোকা চিল্লাই চিল্লাই ঘুমের দফা রফা করি দেয়। ফের চৌকিদারী ট্যাকেসা না দিবা পারিলে ঘটি বাটি ক্রোক্ করিবা চাহে!

—এই চুপ চুপ—আট দশ জন ধমক দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দু হাজার লোকের দৃষ্টি ধাবিত হল একই দিকে।

একখানা পুরোনো টেবিলের আশেপাশে খানকতক চেয়ার। তার পেছনে একটা উঁচু বাঁশের মাথায় অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি হরিৎ পতাকা। পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকালে ঐস্‌লামিক ভ্রাতৃত্বের প্রতীক; ইদের চাঁদের চির প্রত্যাশা—একটি ধ্রুব-নক্ষত্রে সত্যধর্মের চির-ইঙ্গিত, গাঢ় সবুজের বর্ণলেখায় চির-তারণ্যের প্রদীপ্ত প্রতিশ্রুতি। মোহম্মদ রসুলের (দঃ) কদমে কদমে অনুসরণ করে দুরন্ত অভিযানের দিগ্বিজয়ী ঝাণ্ডা।

হাওয়ায় উড়ছে সবুজ পতাকা। শাহুর কাছারী থেকে নেমে সেই পতাকার তলায় এসে আস্তে আস্তে দাঁড়ালেন পাঁচ সাত জন—আজকের অনুষ্ঠানের যাঁরা কর্ণধার। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে এসেছেন ফতেশা পাঠান—পরণে কালো আলপাকার লংকোট, আদ্দির পাজামা, মাথায় জরির কাজ-করা টুপি; বুকে সোনার চেনে বাঁধা একটা ঘড়িও সেঁটে নিয়েছেন। প্রশান্ত গাম্ভীর্যে এসে তিনি মাঝখানের চেয়ারটা দখল করলেন—আজকের সভায় অনির্বাচিত হলেও অনিবার্য সভাপতি তিনি। পেছনে পেছনে এলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার, এন্তাজ আলী ব্যাপারী, জন দুই স্কুল-মাস্টার, থানার জমাদার শাহেব, পালনগর মস্‌জিদের ইমাম এবং ইস্‌মাইল। শাহু আসন নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হাততালি দিলেন—সমবেত জনতাও আনন্দে কর-তালি দিয়ে উঠল।

বাকী সকলে কেউ কেউ চেয়ারে, কেউ কেউ সামনে পাতা দুখানি বেঞ্চিতে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময় আকাশে মুঠি তুলে ইসমাইল চীৎকার করে উঠল: মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ—

সহস্র সহস্র গলায় শোনা গেল আন্তরিক প্রতিধ্বনিঃ মুস্‌লিম লীগ জিন্দাবাদ—

—পাকিস্তান—

—জিন্দাবাদ!

—কায়েদে আজম—

—জিন্দাবাদ!

—এইবার বসুন সব, এখনি সভার কাজ আরম্ভ হবে—ইসমাইল আদেশ করল। বছর বাইশ বয়েস হবে ইস্‌মাইলের। একটু কুঁজো—একটু ঢ্যাঙা। অযত্নে এলোমেলো মাথার চুল; মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। শার্টের আস্তিন কনুইয়ের ওপর আরো খানিকটা গোটানো—সংকল্পে মুঠো-করা হাত। চোখের দৃষ্টিতে একটা উগ্র চাঞ্চল্য—যেন যে কোনো মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর কিছু করবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে সে।

—গোড়াতেই আমাদের উদ্দেশ্যটা একটু স্পষ্ট করে আপনাদের খুলে বলা যাক। ইস্‌মাইল আরম্ভ করলঃ অবিশ্বাস্ত হলেও এটা সত্যি যে আমাদের অনেকেই পাকিস্তান কথাটার মানে পর্যন্ত জানেন না। এমন কি আমাদের মহান্ নেতা কায়দে আজম জিন্নার নাম পর্যন্ত শোনেন নি, এমন লোকও এ সভায় আছেন। সুতরাং—

সুতরাং জ্বলন্ত ভাষায় পাকিস্তানের কথা বলতে আরম্ভ করল ইসমাইল। আরম্ভ করল আরবের মরুভূমি থেকে কোরাণ আর জুল্‌ফিকারের দুর্নিবারের অগ্রগমনের ইতিহাস; আগুন-ঝরা ভাষায় বলে গেল, কেমন করে কাফেরদের রক্তে তরবারি আর বর্শা ফলককে স্নান করিয়ে, সিন্ধু সোমনাথ-গুর্জর জয়ের ধারা বয়ে গৌড়-বঙ্গের প্রত্যন্তে প্রত্যন্তে এল শেষ-ধর্মের প্রাণবন্যা। বর্ণনা করে গেল কেমন করে বাদশাহ আলমগীর সারা হিন্দুস্থানের কোরেশ-দের ভাঙা বিগ্রহের শিলা দিয়ে রচনা করলেন মস্‌জেদের সিঁড়ি; তারপরে এল ইংরেজ—এল হিন্দুর চক্রান্ত। সে চক্রান্তের আজো শেষ নাই।

এই পর্যন্ত এসে ইসমাইল একবার থামল। সমস্ত সভা গাম্ভীর্যে গম গম করছে। বলবার শক্তি আছে ইসমাইলের। সভা কেমন করে জমিয়ে নিতে হয় সে তা জানে।

ইসমাইল মাথার ওপর হরিৎ পতাকাটার দিকে তাকিয়ে নিলে একবার। উড়ছে সূর্যের আলোয়—উড়ছে একটা সগৌরব প্রসন্নতায়। আজাদী কি ঝাণ্ডা।

—বন্ধুগণ, মন দিয়ে আমার কথাগুলো একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, উনিশশো ছয় সালে, আমাদের লীগ জন্ম নেবার পরে তাকেও অনেকখানি পথ কেটে এগোতে হয়েছে। আমরাও একদিন হিন্দু কংগ্রেসের হাতে হাত মিলিয়েছিলাম। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে এক সঙ্গে আজাদীর লড়াইয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা, লড়েছি খেলাফতের দিনে। সেদিন আমাদের জিন্না সাহেবও নিজেকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বলতেন। তারপর স্বাধীনতার লড়াইয়ে একধাপ এগিয়ে গিয়ে যেদিন আমরা পুরো স্বাধীনতা চাইলাম—সেদিন—সেই ১৯২২ সালে হিন্দু কংগ্রেসই "স্বরাজের" ভাঁওতা তুলে লড়াই থামিয়ে দিলে। শুধু লড়াই থামাল না—এল হিন্দু মহাসভা। দেখা গেল কংগ্রেসের পথ হিন্দুর পথ—আর মুসলমানের যদি কোনো রাস্তা থাকে তা হলে তা এই মুস্‌লিম লীগ—

একটা তিক্ত হাসি ইসমাইলের ঠোঁটের আগায় দেখা দিলেঃ কিন্তু দেশের মুসলমান তখনো জাগেনি। ১৯৩৭ সালে যেদিন কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের প্রথম বোঝাপড়া, সেদিন আমাদের ভাইয়েরা কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছিল। নিজেদের দলাদলিতে আমরা হেরে গেলাম। কিন্তু হারতে পারেনা আমাদের লীগ—আলী ভাইদের আদর্শ—মুসলমানের সত্য। এগিয়ে এলেন কায়দে আজম জিন্না তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে। গড়ে তুললেন সারা ভারতের মুসলমানকে। আমরা বুঝলাম—হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি থাকা আমাদের চলবে না। নতুন দেশ চাই, নতুন রাস্তা চাই—নতুন পথ চাই ইস্‌লামী তমদ্দুন বিকাশের জন্তে। সেই আমাদের 'পাকিস্তান'। সেই পাকিস্তানের জন্তেই আপনাদের এক হতে বলছি! আসুন—দলে দলে লীগের মেম্বার হোন—সকলে এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুনঃ পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

—পাকিস্তান জিন্দাবাদ!—সভার মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া গর্জন করল। রুমালে ঘর্মাক্ত মুখখানা মুছে নিয়ে বসতে বসতে ইসমাইল বললে, এবার মস্‌জিদের ইমাম সাহেব আপনাদের দুচার কথা বলবেন।

সভায় আবার প্রচণ্ড করতালি পড়ল।

ইমাম সাহেব একবার হাসলেন। চুমরে নিলেন ধুসর রঙ-ধরা শাদা দাড়ির গোছা। তারপর উচ্চকণ্ঠে কোরাণের একটা 'সুরা' আউড়ে বললেন, এর অর্থ হ'ল, বিধর্মী কাফেরের সঙ্গে পাশাপাশি কখনো মুসলমানের বাস করা চলবে না, তাকে লড়াইয়ের জন্যে সব সময় তৈরী থাকতে হবে—দরকার হলে প্রাণ দিতে হবে—

উত্তেজনার যে বারুদ ইতিমধ্যেই সঞ্চিত করে রেখেছিল ইসমাইল, তাতে আগুনের উত্তাপ সঞ্চার করে আসন নিলেন ইমাম সাহেব।

সভায় তখন মধুচক্রের মতো গুঞ্জন উঠেছে। ইস্‌মাইলের শহুরে বক্তৃতা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু ইমাম সাহেবের কথাগুলো নির্মম এবং তীক্ষ্ণ। কোথাও কোনো আড়াল নেই—নেই বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতার আভাস।

—হাঁ, পাকিস্তান নিবা হবে হামাদের।

—কাফেরের সাথ্ হাম্‌রা আর নি থাকিমু।

—পাকিস্তান জান মান দিই কায়েম করিবা হেবে।

—মোক্ খালি একটা কথা কহেন। পাকিস্তান হই যায় তো খুব ভালই। ফের প্যাট ভরি খাবা পামু তো হামরা? সার্টিফিকেট, উচ্ছেদ তো উঠি যাবে? শাহু তো ব্যাগার ধরিবে না? বকেয়া খাজনা তো মাফ করি দিবে?

কথাগুলোর কোনো স্পষ্ট জবাব কেউ দেবার আগেই আবার সাড়া উঠল: এই চুপ, চুপ! মাস্টার সাহেব কহোছেন।

এবার প্রচণ্ডতম করতালি। সব চাইতে জনপ্রিয়, সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলিমুদ্দিন মাস্টার এইবার দাঁড়িয়েছেন তাঁর বক্তব্য বলবার জন্যে। সকলের দুঃখে কষ্টে অকৃত্রিম বন্ধু। প্রয়োজনের বান্ধব। দুর্দিনের একনিষ্ঠ আশ্বাস।

পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়েছে সবুজ পতাকায়—যেন একটা অপূর্ব দীপ্তি ছড়াচ্ছে তার থেকে। 'নূর—এ—পাকিস্তান'! সে দীপ্তি পড়ছে আলিমুদ্দিনেরও প্রশস্ত মুখে। কঠিন ভাস্কর্যে গড়া একটা তাম্র পিত্তল মূর্তির মতো তাঁর দেহের রেখাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট আর প্রকট হয়ে উঠেছে। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের কোনো ছায়া-ঘন গর্ত গৃহে দীপ-দীপিত দেবমুখের মতোই দেখাচ্ছে তাঁর মুখখানা।

তারপর কয়েকবার নিঃশব্দে নড়ে উঠল তাঁর ঠোঁট দুটি। বলবার আগে কিছু একটা যেন আউড়ে নিলেন নিজের ভেতর। একবার তাকালেন মাথার ওপরকার পতাকার দিকে। পতাকা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে। ওই সবুজ পতাকার ওপর যে কিরণ-লেখা বিম্বিত হয়ে পড়েছে তাকি পাকিস্তানের পূর্বাভাস না, কোনো আগামী শূন্যতার প্রতিভাস?

তারও পরে জনতার মধ্যে নামল তাঁর দৃষ্টি। একদল মানুষ। তাঁর কাছ থেকে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, প্রতীক্ষা করে আছে। কিন্তু একদল মানুষ? না—এক হয়ে গেছে। একটা শক্তি—একটা বিশ্বজয়ী শক্তি। যা অপ্রতিহত প্রভাবে এগিয়ে গিয়েছিল মক্কা থেকে মরোক্কা, মরোক্কা থেকে মস্কোভী। শক্তি। সহস্র ছাড়িয়ে লক্ষ—লক্ষ ছাড়িয়ে কোটি। শিথায়িত রক্তধারায়, বজ্রবাহী পেশীতে পেশীতে। The great human dynamo! Liberator of oppressed and exploited earth!

কিন্তু!

কোন্ লক্ষ্যে? সব সত্য কি বলতে পেরেছে ইসমাইল? তথ্য দিয়েছে, আবেগ দিয়েছে তার চাইতেও বেশি। কিন্তু তারপর? কোন্ পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই শক্তির বন্যাকে—এই চল-বিদ্যুতের ধারাকে? কারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এই বিপুল human dynamo?

একবার নিজের আশেপাশে তাকালেন আলিমুদ্দিন। একটা উগ্র চঞ্চলতা ইস্‌মাইলের চোখে মুখে—কোনো নিশ্চিত লক্ষ্য নেই যেন। জ্বলতে চায়—জ্বালাতে চায়। ফতেমা পাঠান? চমৎকার সেজেগুজে এসেছেন, গা থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে—নির্বোধ আনন্দে ঘন ঘন পাক দিচ্ছেন কাঁকড়া বিছের লেজের মতো গোঁফ জোড়ায়। থানার জমাদার সাহেব অল্প অল্প হাসছেন, নীচু গলায় কথা কইছেন পাশের একজন স্কুল মাষ্টারের সঙ্গে: হিন্দু ইন্‌সপেক্টারটা থাকাতেই ডিগ্রেড্ হয়ে গেলাম, বুঝলেন। যদি কোনো মুসলমান থাকত—

ঘুষের দায়ে লোকটা ডিগ্রেডেড্ হয়েছিল—দোষ দিচ্ছে হিন্দু কর্মচারীর। এরা—এই এরা হবে রাষ্ট্রের কর্ণধার। আলিমুদ্দিনের রক্ত তেতে উঠল, জ্বালা ধরল মাথার ভেতর। ফতেমা পাঠান—খোদাবক্স খন্দকার—

ইসমাইল অধৈর্যভাবে তাঁকে স্পর্শ করল।

—বলুন, বলুন মাস্টার সাহেব। প্রায় তিন মিনিট ধরে যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন!

হাঁ—বলতে উঠে বড় বেশিক্ষণ ধীরে ভাবছেন তিনি। চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন। তড়িৎ তরঙ্গের স্পর্শে উচ্চকিত একটা শবদেহের মতো নড়ে উঠলেন। তারপর:

ভাইসব, আমার বন্ধু ইস্‌মাইল সাহেব আপনাদের সব মোটামুটি খুলে বলেছেন। কাজেই আমার আর নতুন কিছু বলবার নেই। পাকিস্তান এবং মুসলিম লীগের সার্থকতা সম্বন্ধে আপনাদের যে কোনো সন্দেহ নেই, আশা করি, সে কথাও আমাকে নতুন করে বলতে হবে না। শুধু একটা প্রশ্ন আমার আছে। আমরা, যারা আজ এমন করে পাকিস্তানের কথা আপনাদের বলতে এসেছি—বুকে হাত দিয়ে আমাদের বলতে হবে—সে ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের আছে তো?

জনতা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ঠিক ধরতে পারছে না। আর চেয়ারে বেঞ্চিতে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বুলিয়ে নিলেন—কোন্ পথে—কোন্ দিকে এগোতে চাইছেন মাষ্টার?

আলিমুদ্দিন বললেন, আমি জানতে চাই—কার জন্যে পাকিস্তান?

অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে উঠল ইসমাইল: কেন মুসলমানের?

—বেশ কথা। কিন্তু মনে রাখবেন, ১৯০৬ সালে লীগের জন্মদিনে সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল ইংরেজ। সেদিন সে আশা করেছিল, এই লীগের আশ্রয় নিয়েই দেশের আজাদীর লড়াইকে সে ডুবিয়ে দেবে।

ইসমাইল আর বসতে পারল না, ছটফট করে উঠে দাঁড়াল।

—মাস্টার সাহেব এতদিন পরে কেন তুলছেন ওসব পুরোনো কথা? ১৯০৬ সালে যা হয়েছিল, তারপরে অনেক বছর পার হয়ে গেছে। আজ তো মুসলমান সত্যিকারের লড়াইয়ে নেমেছে।

আলিমুদ্দিন বললেন, মানি সব মানি। কিন্তু একটা কথা আমার বলবার আছে। লর্ড মিণ্টোর আমলে যে স্বার্থপরের দল নিজেদের পেট-মোটা করবার জন্যে লীগের খাতায় নাম লিখিয়েছিল, তারা কি আজো আমাদের মধ্যে নেই?

ইসমাইল তিক্তকরে বললে, নেই।

—আমি আপনাকে জবাব দিতে বলছি না ইস্‌মাইল সাহেব, আপনি বসুন।—তীব্র চোখে আলিমুদ্দিন ইসমাইলের দিকে তাকালেন।

মুঠো-করা হাতটাকে আরো শক্ত মুঠোয় ধরে ইসমাইল বললে, আপনিই অনাবশ্যক কথা বলছেন মাস্টার সাহেব, আপনারই বসে পড়া উচিত।

সভায় একটা কলরব উঠল।

আলিমুদ্দিন সোজা শাহুর দিকে তাকালেন: প্রেসিডেণ্ট সাহেব, আমি কি বসে পড়ব, না আমায় বলতে দেওয়া হবে?

সামনে যারা ছিল, তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল: বলুন, বলুন, বলে যান আপনি।

ফতেশা বিব্রতভাবে তাকালেন এদিকে। গোঁফে পাক না দিয়ে টেনে টেনে লম্বা করতে লাগলেন সেটাকে। বললেন, না, না, আপনি বলুন। বোসো হে ইসমাইল, এখন ওঁকে বাধা দিয়োনা।

অসন্তুষ্ট মুখে বিড় বিড় করতে করতে ইসমাইল বসে পড়ল। অধৈর্যভাবে তাকালো হাতের ঘড়িটার দিকে।

শরীরটাকে আরো ঋজু করে দাঁড়ালেন আলিমুদ্দিন। মাথার ওপর রাঙা আলোয় পতাকা ঝলমল করছে—মহিমাময় হয়ে উঠছে 'নূর-এ-পাকিস্তান।' এই পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলা যাবে না, কোনো কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। সত্য চাই, আত্মদর্শন চাই। এখন থেকেই পরিষ্কার করে নিতে হবে সব হিসেব নিকেশ। জেনে নিতে হবে কে দোস্ত, কে দুশমন। কে চলেছে সম্মুখের পথ কেটে, কারা পায়ের তলায় গড়ে তুলেছে নিঃশব্দ চোরাবালি।

সেই 'নূরী ঝাণ্ডা'? নিচে তাঁকে মনে হতে লাগল

তাম্র-পিত্তলের নির্ভুল, স্পষ্টরেখ দীপ্ত মূর্তি। তাঁকে বলতে হবে—সত্য ঘোষণাই তাঁকে করতে হবে।

আলিমুদ্দিন বললেন, আরো সোজা কথায় আমি আসব। ধরুন, এই সভাতেই এমন লোক উপস্থিত আছেন, যাঁদের মতো মুসলমানের শত্রু আর কেউ নেই। তাঁদেরই আগে আমাদের চেনা দরকার।

—কারা তারা?

চেষ্টা করেও একটা কটু প্রশ্ন এড়াতে পারলনা ইস্‌মাইল।

—কারা তারা?—মূর্তির চোখদুটো জলজল করে উঠল—দক্ষিণী মন্দিরের নটরাজের হীরক নেত্রের মতো। যেন দেখা দিল, অগ্নি-বর্ষণের পূর্ব-সংকেত।

আলিমুদ্দিন বললেন, যদি বলি, আমাদের এই ইমাম সাহেব—যিনি একজন হাজী এবং বিখ্যাত আলেম, তিনি আমাদেরই সমাজের অংশ—আমাদের ভাই ধাওয়াদের মস্‌জিদে ঢুকতে দেন না? তা হলে কি বলতে হবে তিনি ইস্‌লামের বন্ধু?

—মাস্টার সাহেব!—যেন আর্তনাদ করে উঠলেন শাহু।

—হঁ্যা, আপনার কথাও আমি বলব।—আলিমুদ্দিনের চোখ দিয়ে এবার সত্যিই আগুন ঝরতে লাগল: প্রজাদের আপনি বেগার খাটান। গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে খান। অনবরত অত্যাচার করে দেশের লোককে আপনি শেষ-দফায় এনে ফেলেছেন। যে মেয়ে আপনাকে ধর্মবাপ বলে—বিহ্বল স্তব্ধ সভাটার ওপর রক্তচক্ষু মেলে আলিমুদ্দিন বললেন, আপনি তার সর্বাঙ্গে পারার ঘা ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেন। বলুন—আপনারাই কি নেতা? আপনাদের হাতেই কি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ?

—চুপ করুন—বসে পড়ুন—পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল ইস্‌মাইল।

—লোকটা ক্ষেপে গেছে—চীৎকার করলেন ইমাম সাহেব।

ফতেশার মুখ দিয়ে শুধু একটা অব্যক্ত ধ্বনি বেরুল। এত জোরে সরু গোঁফটাকে আকর্ষণ করলেন যে ছিঁড়ে যাবার উপক্রম করল সেটা।

—না, আমি বসবনা, আমি বলবই—আলিমুদ্দিনও চীৎকার করলেন এইবারে।

সভায় বিশৃঙ্খলার ঝড় বইছে। নানা কণ্ঠে নানা রকম কোলাহল উঠছে। যেন ক্ষেপে গেল ইসমাইল। জামাটা ধরে সজোরে টান দিলে আলিমুদ্দিনের।

আলিমুদ্দিন তিন পা পেছনে হটে এলেন।

—আমি বলবই—আমি বলবই—

—না—না—

—বেশ!—স্বরগ্রামকে সমুচ্চতর পর্দায় তুলে দেবার বললেন আলিমুদ্দিন: তা হলে আমি জানিয়ে যাচ্ছি, পাকিস্তানের লড়াইয়ে আজ থেকে দুশমন মুসলমানও আমার শত্রু। তাদের বিরুদ্ধেও আজ থেকে আমার লড়াই—

প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সভা থেকে একটা জলন্ত হাউইয়ের মতো ছুটে চলে গেলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার।

* * *

বাতাস নেই। একটা গমগমে গুমোট সন্ধ্যা ঘনিয়েছে ঘরের মধ্যে। দিগ্‌বিস্তৃত বরেন্দ্রভূমির মাঠের ওপরে হাওয়া যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা দামাল্ ছেলের মতো খেলে বেড়ায়, বয়ে নিয়ে যায় মাটির গন্ধ, ঘাসের গন্ধ; গোখরো সাপের নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কেয়াফুলের সৌরভ বয়ে নিয়ে যায় তালগাছের মর্মর থেকে, শুরু করে শঙ্খচিল আর গিন্নী শকুনের কান্না,—সেখানে হঠাৎ সব থমকে দাঁড়িয়েছে যেন কোন্ অদ্ভুত ভানুমতীর মন্ত্রোচ্চারণে। যেন আকাশ থেকে ঘনাচ্ছে কোনো দিগ্‌দিগন্তব্যাপী অশরীরীর অপচ্ছায়া—আসন্ন মৃত্যু, আসন্ন ঝড়, আসন্ন দুর্বিপাক। আলেয়া-জ্বলা বরিন্দের মাঠে ঘর-পালানো রাত-চরা গোরুর দল যেন আচমকা ভয় পেয়ে বসে পড়েছে কোনো ঝুরি-নামা ডাইনির মতো অন্ধকার বটের ছায়ায়—তাদের সবুজ পিঙ্গল চোখে কিসের আতঙ্কিত জিজ্ঞাসা।

শাহুর বৈঠকখানা ঘরেও সেই স্তব্ধতা, সেই গুমোট।

ফরাসের সামনে দুটো জোরালো লণ্ঠন। ঘরটা অতিরিক্ত আলো হয়ে আছে। সেই আলোর সঙ্গে কুয়াশার মতো জমছে বন-গন্ধী তামাকের ধোঁয়া। রাশীকৃত স্তব্ধতার মধ্যে শুধু অনুরণিত হচ্ছে মশার শ্রান্তিহীন গুঞ্জন।

মুখোমুখি দুজন। শাহু আর ইসমাইল।

ইস্‌মাইল তিক্তভাবে হাসল। তির্যক চোখে তাকালো শাহুর দিকে।

—আপনি ত লোকটার প্রশংসা করেছিলেন।

—হুঁ, তা করেছিলাম। —অনুতাপবিদ্ধ শোনালো শাহুর গলা: তখন কি জানতাম, একেবারে পাগল? কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই?

—পাগল? —ইস্‌মাইল আবার বাঁকাচোখে শাহুর দিকে তাকালো: না, পাগল নয়। কিন্তু বিপদজনক।

—তাই দেখছি।

—যা বলবার ছিল—ইস্‌মাইলের মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল: সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, তারও তো একটা জায়গা আছে! সমস্ত সভাটা বন্ধ করে দিলে।

ফতেশা উত্তর দিলেন না। সজোরে একবার গোঁফ-টাকে আকর্ষণ করলেন, তারপর মনের অসহ্য জ্বালাটা দূর করবার জন্তে চটাস্ শব্দে গোটা কয়েক মশা মারবার চেষ্টা করলেন।

ইস্‌মাইল বললে, আমার সন্দেহ হয়—লোকটা প্রজা ক্ষ্যাপাবে।

—কী রকম? তড়িৎগতিতে উঠে বসলেন ফতেশা।

—আজকাল ওইসব রেওয়াজ হচ্ছে। আমাদের আন্দোলনকে নষ্ট করবার জন্তে সোস্যালিজমের একটা ধুয়া তুলছে হিন্দুরা। আমার মনে হয়, ওদেরই কারো সঙ্গে যোগ-সাজস আছে মাস্টারের। মুখে এরা লীগের বন্ধু, ভেতরে ভেতরে পাকা ন্যাশনালিস্ট্। তা ছাড়া—সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ইসমাইল বললে, উনি তো কংগ্রেসের হয়ে বার কয়েক জেল-টেলও খেটেছেন, তাই না?

—ঠিক ঠিক।—ফতেশা যেন অকূল অন্ধকারে আলো দেখতে পেলেন: তাই তো! সে কথাতো খেয়াল ছিল না।

ইস্‌মাইল মৃদু হাসল: এসব লোক আমি অনেক দেখেছি, এদের আমি চিনি। যাক—সেজন্তে আটকাবে না। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

অসহ্য ক্রোধে ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন শাহু: আমার খেয়ে আমারই বদনাম গাইবে। ইস্কুল থেকে ওই মাস্টারকে আমি তাড়াব। সাহস কত! খোদাবক্সের গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছিল!

ইস্‌মাইল বললে, সব হয়ে যাবে। ভালো কথা, বিদ্রোহী প্রজা আছে আপনার?

—অভাব কি। টিলার সাঁওতালরাই তো—

—সাঁওতাল!—ইস্‌মাইল আঁত্‌কে উঠল: সাংঘাতিক জীব। সাপ পুষে রেখেছেন চাচা! ওই সবই হল এসব লোকের বিষ দাঁত। দাঁতটা উপড়ে দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—কী করে?—শাহু সাগ্রহে জানতে চাইলেন।

—পলিটিক্স। আগে এককাট্টা হওয়ার পথ বন্ধ করতে হবে! সে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। হাঁ—আপনাকে একটা কাজ করতে হবে চাচা। টিলায় একটা মস্‌জিদের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—টিলায় মস্‌জিদ!—শাহু হাঁ করে রইলেন: কেন?

—সব জিনিস বড় দেরীতে বোঝেন আপনি—ইস্‌মাইল আবার মৃদুমন্দ হাসল।

শুদ্ধ গুমোট হাওয়ায়, ঘনীভূত তামাকের ধোঁয়ায় খানিকক্ষণ ইস্‌মাইলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝতে চাইলেন শাহু। তারপর কোনো কিছু বুঝতে না পেরে একটা অসহায় ক্রোধে চটাস্ চটাস্ করে আবার গোটা কয়েক মশা মারলেন। (ক্রমশঃ)
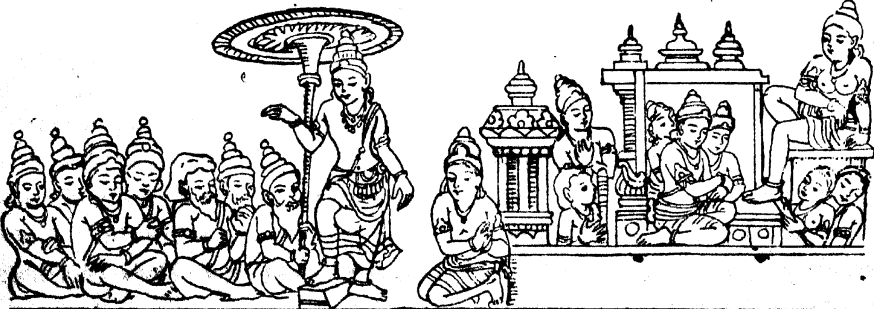
শিয়ালদহে পাকিস্তানীদের দুরবস্থা—

একমাস পূর্ব্বে আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে পাকিস্তান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের দুরবস্থার কথা আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহার পর একমাস অতীত হইয়াছে, এখন ঐ ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমসমূহে সর্ব্বদা ১০।১৫ হাজার লোক পশুর মত জীবন যাপন করিতেছে। দারুণ বর্ষার সময় তাহাদের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না। তাহাদের খাদ্যাদি দানেরও কোন সুব্যবস্থা নাই। তাহাদের জন্ম কোনরূপ অস্থায়ী শৌচাগার পর্য্যন্ত নির্মিত হয় নাই। তাহাদের দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিতে হইতেছে। স্নানের জল নাই। ফলে প্রত্যহ বহু লোক কলেরা ও অন্যান্য ব্যাধিতে মারা যাইতেছে। শিশুগুলি দিন দিন ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে ও ক্রমে ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। কেন যে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বা প্রতীকার হইতেছে না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। লিয়াকৎ-নেহরু চুক্তি হইবার পর তিন মাস হইয়া গিয়াছে, এখনও প্রত্যহ ৫।৭ হাজার হিন্দু পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে পশ্চিমবাংলায় চলিয়া আসিতেছে। এই ৫০ লক্ষের অধিক গৃহহারার সমস্যা যদি আমরা সমাধান করিতে না পারি, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কে এ বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবে?

চাউলের মূল্য—

পশ্চিম বাংলার বহু স্থানে এ বৎসর চাউলের দাম এখনই ৪০।৪৫ টাকা মণ হইয়াছে। কাজেই লোকের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। আমাদের খাদ্য মন্ত্রী আশ্বাস দিতেছেন দেশে দুর্ভিক্ষ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অথচ চাউলের দাম যখন ৪০ টাকা মণ হয়, তখন তাহাকে দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কি বলা যায়। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বহু সহস্র আশ্রয়প্রার্থী আসায় ঐ সকল জেলায় চাউল শুধু দুর্মূল্য নহে, গ্রামাঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ২৪ পরগণনার বারাকপুর মহকুমার ইউনিয়ন-বোর্ড-অঞ্চল গুলিতেও চাউলের মণ ৩৫ টাকা হইয়াছে—অথচ তাহারই পাশে মিউনিসিপাল এলাকায় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ১৭ টাকা মণ দরে চাউল পাওয়া যায়। এই অব্যবস্থার জন্ম দায়ী কে? সরকারী সরবরাহ বিভাগ চক্ষু কর্ণ হীন—তাঁহারা কিছু দেখিতে বা শুনিতে পান না। শুধু নিজেদের কথা বলিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন। এ অবস্থায় দেশবাসী যে কি করিবে তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। যদি চাউলের পরিবর্ত্তে প্রচুর গম পাওয়া যাইত, তাহা দ্বারা মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইত। আমরা দেশের ভবিষ্যত ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছি।

আগামী নির্ব্বাচন—

ভারতের প্রধান নির্ব্বাচন কমিশনার শ্রীসুকুমার সেন সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে আগামী নির্ব্বাচনের জন্ম প্রাথমিক ভোটার তালিকা আগামী অক্টোবর মাসে ও ভোটদাতাদের চূড়ান্ত তালিকা আগামী জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হইবে। আগামী এপ্রিল মাসে সে জন্ম আগামী নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানে কোন অসুবিধা হইবে না। কি ভাবে ভোটের খরচ কমান যায়, ভোটের সময় কি ভাবে জুয়াচুরি বন্ধ করা যায়, এ সকল বিষয়ে আলোচনার জন্ম ও বিভিন্ন প্রদেশের স্বতন্ত্র সমস্যার সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণের জন্ম শ্রীযুত সেন ভারতের সকল প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। প্রতি এক হাজার ভোটদাতার জন্য যদি স্বতন্ত্র ভোটদান-কেন্দ্র করা যায়, তাহা হইলে ভোটের সময় জুয়াচুরি বন্ধ হইতে পারে। ভোটদাতা লইয়া যাওয়ার জন্ম যান-খরচও তাহাতে কমিয়া যাইবে। ভোটের কাগজ দেওয়ার সময় যদি তাহাতে টিপ সহি লওয়া হয় ও ২৪ বা ৪৮ ঘণ্টা পরে ভোটদাতাকে যদি সেই কাগজ লইয়া ভোট দিতে যাইতে হয়, তাহা হইলেও দুর্নীতি অনেক কমিয়া যাইবে। রাষ্ট্র পরিচালকগণ যে এ সকল বিষয় চিন্তা করিতেছেন, ইহার দেশবাসীর পক্ষে আনন্দের সংবাদ।

কয়লার খুচরা দাম—

সাধারণ গৃহস্থের ব্যবহারের কয়লা এখনও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। সরকার হইতে প্রতি মণের দাম

১ টাকা ১৪ আনা পর্য্যন্ত করার অনুমতি দেওয়া আছে।' কিন্তু কোন কোন স্থানে সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতিগুলি ১ টাকা ১০ আনা মণ দরে কয়লা বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহারা যে একেবারে কোন লাভ করেন না, এ কথা বলা যায় না। কাজেই যাহারা ১ টাকা ১৪ আনা মণ দরে কয়লা বিক্রয় করে, তাহারা যে অত্যধিক মুনাফা করিয়া থাকে, সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। যদি কয়লার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়, তাহা হইলে হয় ত কয়লার দাম সকল স্থানেই দেড় টাকা পর্য্যন্ত মণে বিক্রীত হইতে পারে। সাধারণ মানুষ আজ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য অত্যধিক মূল্যে ক্রয় করিতে যাইয়া বিব্রত হইয়াছে। এ অবস্থায় একটি জিনিষও যদি কম মূল্যে পাওয়া যায়, তাহা কম আশা ও সুবিধার বিষয় নহে। আমরা এ বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি ও বিশ্বাস করি, তাঁহারা দরিদ্র জনগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়—

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী হইয়াই বাংলার প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়া সরকারী পল্লী-স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল ইউনিয়নের অধিবাসীরা প্রথমেই এ জন্য জমী ও অর্থ দান করিয়াছেন, সে সকল ইউনিয়নে বাকী টাকা সরকারী তহবিল হইতে দিয়া কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য যদি ঐ সকল কেন্দ্র উপযুক্তভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে স্থানীয় জনগণের একটি অভাব দূরীভূত হইবে। কেন্দ্রে ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র ছাড়াও আকস্মিক বিপদে চিকিৎসার জন্য ২টি শয্যা ও প্রসূতিদের জন্য ২টি শয্যা রাখা হইবে। তাহা ছাড়া কেন্দ্রের কর্মীরা গ্রামে গ্রামে যাইয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য চালাইবেন ও রোগের প্রথম হইতেই রোগীর যাহাতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা হয়, সেজন্য চেষ্টা করিবেন। অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে আমাদের মধ্যে দুর্নীতির অত্যধিক প্রসারের ফলে সর্বত্র সরকারী অর্থ ব্যয়িত হইলেও কেন্দ্রের গৃহগুলি ভাল করিয়া নির্মিত হয় নাই। যাহাদের উপর নূতন গৃহ-নির্মাণের ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা যে কোন প্রকারে কাজ শেষ করিয়াছেন—বাড়ীগুলির ৬ মাস পরেই মেরামতের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ-কর্তৃপক্ষের যত্নের অভাবে কেন্দ্রগুলিতে কর্মী যাইতে বা ঔষধাদি যাইতে বিলম্ব হওয়ায় সরকারী অর্থ কি ভাবে অপব্যয়িত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। অথচ সরকারী দপ্তরে পরিদর্শনকারী কর্মচারীর অভাব নাই। কেন যে এরূপ অব্যবস্থা স্থায়ী হইতেছে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। এই দুর্দিনে জনহিতকর কার্য্যের জন্য লোক জমী দান করিয়াছে, চাঁদা করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার যদি অপব্যয় হইতে দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ঐ ভাবে নানা স্থানে নূতন বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। সে জন্যও উৎসাহী ব্যক্তিরা জমী দিয়াছেন—জেলা বোর্ড ও সরকারী শিক্ষা বিভাগ হইতে অর্থ দিয়া বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করা হইতেছে—কিন্তু শুনা যাইতেছে, পল্লী স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের গৃহের ন্যায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণেও গলদ থাকিয়া যাইতেছে। এই সকল কার্য্য সম্পাদনের সময় কর্তৃপক্ষ কেন যে জনগণের সহযোগিতা ও সাহায্য গ্রহণ করেন না, তাহাও আমরা বুঝি না। বে-সরকারী কমিটীকে গৃহ-নির্মাণ কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতে দিলে এইভাবে অর্থের অপব্যয় হইত না। আমরা এ বিষয়ে স্বাস্থ্য, স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষা বিভাগের কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি ও আশা করি, ভবিষ্যতে এই সকল অনাচার বন্ধের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী—

খ্যাতনামা পণ্ডিত, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী সম্প্রতি কলিকাতায় লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের স্থায়ী প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করার পর বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ্ ফিলসফি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ও তাঁহার স্বামী ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচারের জন্য 'প্রাচ্যবাণী-মন্দির' প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু বিষয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ প্রচার

করিতেছেন। বেঙ্গল রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিরও তিনি সর্ব্বপ্রথম মহিলা ফেলো। তিনি দেশনেতা স্বর্গত আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের পৌত্রী।

কাশ্মীর মীমাংসার সর্ত্ত—

গত ২১শে জুন শ্রীনগরে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী সেখ আবদুল্লা কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসার দুটি প্রধান সর্ত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১) সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টকে রাজ্যের সমগ্র এলাকা প্রত্যর্পণ ও তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের ও তাহার সৈন্যদলের বিলোপ সাধন (২) হানাদারগণের আক্রমণের ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা হওয়ায় যাহারা বাস্তত্যাগ করিয়াছে তাহাদের পুনর্ব্বাসন। এই দুইটি বিষয় সকল মীমাংসার মূল সূত্র। সর্ত্ত দুইটি পূরণে কেহ অসম্মত হইলে কাশ্মীরবাসীদিগকে মূলনীতি হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে।—সেখ আবদুল্লার এই উক্তির পর কাশ্মীর মীমাংসার পথ সম্বন্ধে সকলের নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত। এই কথা শুনার পরও রাষ্ট্রসংঘ-প্রতিনিধি মীমাংসার পথে কেন যে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। আমাদের বিশ্বাস কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কাশ্মীরবাসীদিগকে শেষ পর্য্যন্ত সন্তোষ দান করিবে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ—

গত ৬ই আগষ্ট বহু স্থানে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভা হইয়া গিয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করিয়াছেন—তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের জন্মদাতা, এ কথা বলিলে আদৌ অত্যুক্তি করা হয় না। কিন্তু দেশ আজ তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কলিকাতা সহরে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু যে বারাকপুর সহরের গঙ্গাতীরে তিনি প্রায় ৫০ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন, তথায় এখনও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যে স্থানে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল, সে স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের চেষ্টাও এখন পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যে গৃহে তিনি বাস করিতেন, সে গৃহ এখন ভাড়া দেওয়া আছে। ঐ গৃহটি যাহাতে সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া তথায় একটি জাতীয় যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়, সে জন্যও স্বাধীন বাংলার নেতৃবৃন্দের সচেষ্ট হওয়া উচিত। সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভার কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার পরলোকগমনের পর ২৫ বৎসর অতীত হইলেও তাঁহার কোন জীবনী এখনও প্রণীত হয় নাই। তিনি তাঁহার যে আত্মজীবন রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বহু তথ্যপূর্ণ হইলেও তাঁহাকে পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলা যায় না। স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার তাঁহার জীবনী ইংরাজিতে ২ খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাতে শুধু প্রথম জীবনের ঘটনা ও রচনাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার জন্যও ভারত-সভা কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগী হওয়া উচিত। আমরা তাঁহার স্মৃতি দিবসে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই ও সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা জানাই, বর্ত্তমান সময়ে যেন তাঁহার আদর্শ প্রচারের উপযুক্ত চেষ্টার অভাব না হয়।

মহারাজ নন্দকুমার—

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট কলিকাতা গড়ের মাঠে ফাঁসিতলা নামক স্থানে জাল করার অপরাধে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল। সে সময়ে নন্দকুমারের বয়স ৭০ বৎসর। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং নিজ বুদ্ধি ও শক্তি দ্বারা শুধু অর্থার্জন করেন নাই, দেশের মধ্যে একজন অসাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তি হইয়াছিলেন। সে যুগেও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুসলমান শাসকদিগকে তাড়াইবার জন্য বৃটিশকে প্রশ্রয় দেওয়া বা সাহায্য করা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না। তৎকালীন ইংরাজ-প্রধান ওয়ারেণ হেষ্টিংস নন্দকুমারকে কোন প্রকারে বশীভূত করিতে না পারিয়া শেষ পর্য্যন্ত এক ষড়যন্ত্র করেন ও জাল করার অভিযোগে তাঁহার বিচার হয়; বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে ঐ সামান্য অপরাধে তাঁহার ফাঁসির আদেশ দেন। নন্দকুমার হাসি মুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন। যখন তাঁহার গলায় ফাঁসির দড়ি দেওয়া হয়, তখনও তিনি মালা হাতে করিয়া জপ করিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি সামান্য ভূসম্পত্তি ও নগদ ৫২ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর সহরের উত্তর প্রান্তে কুঞ্জঘাটা নামক স্থানে তিনি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। সে গৃহ আজও বর্ত্তমান। গত ৫ই আগষ্ট শনিবার ঐ গৃহে মহারাজা নন্দকুমারের এক স্মৃতি উৎসব হইয়াছিল। স্থানীয় নেতা শ্রীছত্রপতি রায়

উৎসবে পৌরোহিত্য করেন এবং কলিকাতা হইতে শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তথায় যাইয়া অতিথিরূপে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধে তথ্য ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের লিখিত বিবরণের মধ্যেই অধিক পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর ১০৭ বৎসর পরে বঙ্গদর্শন পত্রিকার নবম খণ্ডে আষাঢ় সংখ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনকার দিনে লেখকের নাম ছাপা হইত না কাজেই ঐ প্রবন্ধ কাহার লেখা ৬৮ বৎসর পরে আজ আর জানিবার উপায় নাই। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী লিখিত মহারাজা নন্দকুমারের একখানি জীবনী গ্রন্থ আছে। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার জীবনী রচনার উপযুক্ত দিন আসিয়াছে। নূতন অবস্থায় তাঁহার জীবনী রচিত হইলে দেশবাসী নন্দকুমার সম্বন্ধে সত্য কথা জানিতে পারিবে। সে দিন সভায় স্থির হইয়াছে—নন্দকুমারের বংশধর কেহ নাই —আর অর্থও তাঁহাদের নাই। কাজেই সরকার হইতে কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীটি দখল করিয়া লইয়া ঐ স্থানে কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত। তাহা হইলে নন্দকুমারের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ গৃহটি রক্ষিত হইবে—নচেৎ উহা সত্বর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। যে স্থানে কলিকাতায় বিডন স্কোয়ার অবস্থিত, তথায় নন্দকুমারের কলিকাতার বাসগৃহ ছিল। সেখানে ও গড়ের মাঠে ফাঁসিতলায় নন্দকুমারের দুইটি স্মৃতিস্তম্ভও নির্ম্মিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমরা দেশবাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যাঁহারা স্বাধীন বাংলায় নন্দকুমারের স্মৃতি উৎসবে উদ্যোগী হইয়া সেই মহাপুরুষের আদর্শ আবার দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলের প্রশংসার পাত্র সন্দেহ নাই।

গোপীনাথ বড়দলই—

আসামের প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলই গত ৬ই আগষ্ট শনিবার রাত্রি ২টা ৪০ মিনিটের সময় সহসা ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শনিবারই শিলং হইতে ফিরিয়া আসেন ও রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত স্ত্রী ও দুই কন্যার সহিত অভিনয় দেখিয়া আসেন। রাত্রি ১২টায় হৃদযন্ত্রে যন্ত্রণা উপস্থিত হয় ও কোন চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। তাঁহার স্থানে অস্থায়ীভাবে অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীযুত বিষ্ণুরাম মেধী প্রধান-মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। গোপীনাথ ১৯১৫ সালে কলিকাতায় এম-এ ও বি-এল পাশ করিয়া গৌহাটিতে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া তিনি ১৯৩৭ সালে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন ও ১৯৩৮ সালে প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৪০ সালে ১ বৎসরের জন্য ও ১৯৪২ সালে ২ বৎসর তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালে পরিষদ সদস্য হইয়া তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি গণপরিষদেরও সদস্য হইয়াছিলেন। আসামী ভাষায় তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

অখিলচন্দ্র দত্ত—

বাংলার খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী-সভাপতি অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ৫ই আগষ্ট শনিবার বিকালে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৬৯ সালে ত্রিপুরা জেলার ভরগাছ গ্রামে তাহার জন্ম হয় ও ১৮৯৭ সাল হইতে তিনি কুমিল্লায় ওকালতী আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়া প্রচুর অর্থার্জ্জনে সমর্থ হন। ১৯১৬ সালে তিনি ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের চুঁচড়া অধিবেশনের সভাপতি হন। তিনি ১৯২৩ সালে আবার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন ও ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হন। ১৯৩২ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও ডেপুটী সভাপতি হন। ১৯৩৭ সালে সপরিবারে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি ডেপুটী সভাপতির কাজ করেন। তিনি বহু ব্যবসা, বীমা ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন। ২ বৎসর পূর্ব্বেই তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল।

পরলোকে শ্রীশচন্দ্র জ্যোতিরত্ন—

বাংলার খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ ও দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র জ্যোতিরত্ন মহাশয় গত ১৫ই আষাঢ় ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপের ভারত-বিখ্যাত জ্যোতিষী স্বর্গত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণবের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন ও নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যাপীঠের জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েসন

ও নবদ্বীপ বঙ্গ বিবুধ জননী সভার সদস্য হিসাবে বহু ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে হায়দ্রাবাদে প্রেরণ—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ৫০ হাজার বাস্তহারাকে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে লইয়া যাইয়া পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা হইবে। তন্মধ্যে ৩২ হাজার লোক ঔরঙ্গাবাদ জেলার বোকারদান তালুকে স্থান লাভ করিবে। ইহার পূর্ব্বে কোন হিন্দু বাস্তহারাকে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে লইয়া যাওয়া হয় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ৭ লক্ষ মুসলমান বাস্তহারা নিজাম রাজ্যে গমন করিয়াছিল—তাহারা এখন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে; পশ্চিমবঙ্গের বাস্তহারাদের এই সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নহে। বাঙ্গালী বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। হায়দ্রাবাদে যাইলেও তাহারা বাঙ্গালীই থাকিবে—অথচ তথায় অন্ন বস্ত্রের সমস্যা থাকিবে না। তথায় বহু জমী পতিত আছে, শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগও কম নাই—বাঙ্গালী সে সকল সুযোগ গ্রহণ করিয়া তথায় সুখে বাস করিতে পারিবে।

বাস্তহারাদের শিক্ষার জন্য দান—

পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে যে সকল বাস্তহারা আসিয়াছে, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রকে ৬৭ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন স্থির হইয়াছে। ঋণ হিসাবে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে ও ১৭ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ দান হিসাবে পাইবে। গত ১৯৪৯-৫০ সালেও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ঐ জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রকে ২৪ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন—তন্মধ্যে মাত্র ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য এই অর্থ যাহাতে ভালভাবে ব্যয়িত হয়, সে জন্য সরকার ও জনসাধারণ উভয় পক্ষেরই সাবধানতার সহিত কাজ করা উচিত। অতি দুঃখের বিষয় এই যে, বাস্তহারা ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত বহু অর্থ জনগণ কর্তৃক অপব্যয়ের কথা শুনা গিয়াছে। সে জন্য সরকার পক্ষেরও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

দেশের পথ সংস্কার ও যান-ব্যবস্থা—

কলিকাতায় সম্প্রতি যে নিখিল ভারত পেট্রল বিক্রেতা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে তাহার সভাপতিরূপে হাওড়া মোটর্সে'র শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে তাঁহার অভিভাষণে দেশের একটি বড় সমস্যার বিষয়ে দেশবাসীর ও সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দেশের পথ সংস্কার ও নূতন পথ নির্ম্মাণ সমস্যা আজ সকলকে বিব্রত করিয়াছে। তাহা না হইলে গ্রামে লোকের বসতি, কৃষি ও বাণিজ্য—কোন বিষয়ই সম্ভব হইবে না। সে জন্য পেট্রল ও মোটর গাড়ী হইতে প্রাপ্ত সকল রাজস্ব পথ নির্ম্মাণ

শ্রীসুশীলকুমার দে

ও সংস্কার কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য সরকারকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাইয়া সম্মিলনে প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। দেশের মোটর যান চলাচল ব্যবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করার সম্পর্কেও সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পেট্রল-বিক্রেতারা আজ দেশের এই প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য জমি দখল—

বাংলা সরকারের জমি-দখল বিভাগ হইতে কলিকাতার সহরতলীর বহু জমি তথাকথিত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য দখল-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহাদের জন্য জমি দখল করা হইতেছে, তাহারা আদৌ আশ্রয়প্রার্থী বা গৃহহারা নহেন। তাহাদের মধ্যে

অধিকাংশ লোক গত ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া কলিকাতা সহরে বা সহরতলীতে বাস করিতেছেন—এখন সুযোগ বুঝিয়া তাহারা বহু পতিত জমি জোর করিয়া দখল করিয়া বসিয়াছেন। তাহার পর সে সকল স্থানে গৃহ-নির্ম্মিত হইতে দেখিয়া সরকার ঐ সকল জমি সরকারী আইনে দখল করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম—সহরতলীতে যে সকল বাসযোগ্য জমি গত ২০ বৎসর কাল ধরিয়া ব্যবহৃত হয় নাই, সরকার যদি সে সকল জমি দখল করিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তবে তাহাতে কাহারও আপত্তি করা উচিত হইবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ সরকার তাহা না করিয়া, যে সকল জমি তথাকথিত বাস্তহারারা জোর করিয়া দখল করিয়াছেন, সে গুলি দখলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই নূতন ব্যবস্থার কোন যৌক্তিকতা দেখা যায় না। পূর্ব্ব হইতে ঐ সকল জমির মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে, যাহাদের ক্রয়ের শক্তি আছে শুধু তাহারাই ঐ সকল জমিতে যাইত। যাহারা জমি জোর করিয়া দখল করিয়াছে, তাহাদের জমির দাম দিবার শক্তি আছে কি না জানা নাই। জমীর মূল্য এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। যে সকল জমী জোর করিয়া দখল করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবার যোগ্য। অথচ তাহার অনতিদূরে অল্প মূল্যের জমী পাওয়া যাইত—সে সকল জমীর মূল্য দেওয়াও সাধারণের পক্ষে সম্ভব হইত। সরকারী নিয়ামক ও কর্ম্মচারীরা যদি শুধু ভাবপ্রবণ হইয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির না করেন—অবস্থা বুঝিয়া যদি তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই অভিযোগের কারণ থাকিবে না। যাহারা জোর করিয়া জমী দখল করিয়াছে, তাহাদের যদি কোনরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা না করা হয়, তবে দেশে ঐ ভাবে আইন-অমান্য কার্য্য দিন দিন বাড়িয়া যাইবে ও কোন সরকারের পক্ষেই শাসন কার্য্য পরিচালন করা সম্ভব হইবে না।

দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার সফর—

ডাঃ বা ম এক সময়ে ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্প্রতি দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ায় সফর করার পর ডাঃ বা ম একটি বিবৃতিতে সে বিষয়ে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—(১) নেহরু চিয়াং-কাইসেকের স্থানে এসিয়ার নেতা হইবার চেষ্টা করিতেছেন (২) দক্ষিণ পূর্ব এসিয়াবাসী ২০ লক্ষ ভারতীয় নেতাজী সুভাষ বসুর অনুগত, পণ্ডিতজী তাহাদের আনুগত্য লাভ করিতে গিয়াছিলেন (৩) ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির হাতের পুতুল হইয়া পণ্ডিতজী সাম্যবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছেন (৪) দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার আদিম অধিবাসী-দের প্রতি পণ্ডিতজীর নজর নাই; তিনি ঐ অঞ্চলের ভারতীয়দের জন্যই দরদ প্রকাশ করিয়াছেন।—কথাগুলি বিবেচনার বিষয়। কোরিয়ার যুদ্ধে ভারত যোগদান করায় ডাঃ বা ম মহাশয়ের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। সত্যই পণ্ডিতজী ভারতকে কোন পথে লইয়া চলিয়াছেন সে চিন্তা আজ সকলকে বিব্রত করিয়াছে।

মাদ্রাজে খাদ্যাভাব—

শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, মাদ্রাজ প্রদেশেও দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। ত্রিচিনপল্লী, কইম্বাটোর, উত্তর আর্কট ও মালাবার জেলায় খাদ্যাবস্থা এত খারাপ যে লোক গাছের পাতা, লতাগাছ প্রভৃতি খাইতে বাধ্য হইতেছে। ঐ সকল জেলায় খাদ্যাভাবে বহু লোক মারা যাইতেছে। এরোদ জেলাতেও খাদ্যাভাবে বহু লোক মারা গিয়াছে। কোন প্রদেশেই চাল অধিক নাই—মাদ্রাজের লোক বেশী পরিমাণে চাল খায়—তাহাদের অন্য কোন খাদ্য নাই। কি ভাবে দুভিক্ষের কবল হইতে জনগণকে রক্ষা করা যায়, তাহার পরিকল্পনাই চলিতেছে—আর ও দিকে মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালী—

স্বাধীনতা লাভের পর দলে দলে বাঙ্গালী ছেলেদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করার আহ্বান জানানো হলেও দেশে তেমন সাড়া দেখা যায় নাই। ইহার বহু কারণ বর্ত্তমান। সত্যই যাহাতে ছেলেরা সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, সে চেষ্টা এখনও হয় নাই। ভাল করিয়া ঐ বিষয়ে প্রচার কার্য্য করা হইলে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য বাঙ্গালী যুবকের অভাব হইবে না। সে জন্য বাংলার প্রতি সহরে সৈনিক মেলা আয়োজন করা, গ্রামাঞ্চলে ছাত্রবাহিনীর সম্মিলিত কুচ-কাওয়াজ দেখানো,

কাঁচরাপাড়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত চাষী ছেলেদের দল বাঁধিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে রুট-মার্চ্চ করা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজন। নানাভাবে ছবি দেখাইলে লোক সেনাবাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আমরা এ সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

নয়া দিল্লীর হেলী রোডে পশ্চিম বাংলার শ্রম-মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বৃক্ষরোপণ

মুর্শিদাবাদের খাদ্য পরিস্থিতি—

মুর্শিদাবাদ জেলা ধান উৎপাদন সম্পর্কে বাড়তি জেলা বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল অর্থাৎ ঐ জেলায় জেলাবাসীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান উৎপন্ন হইত। কিন্তু গত ১ বৎসরের মধ্যে কয়েক লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া ঐ জেলায় বাস করায় এখন ঐ জেলাতেও দারুণ খাদ্যাভাব উপস্থিত হইয়াছে। স্থানীয় ছাত্র-কংগ্রেস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে—ঐ দেশকে ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়া খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন না করিলে লোক খাদ্যাভাবে মারা যাইবে; এখনও মুর্শিদাবাদ জেলায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার বিঘা জমী পতিত আছে। বঙ্গ বিভাগের পর সকল জেলায় অর্থনৈতিক অবস্থাই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—নদীয়ায় খাদ্যাভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ মুর্শিদাবাদ জেলাও বিপন্ন। গত ৩রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে মুর্শিদাবাদ জেলার কোন স্থানে ধান বা চাল নাই। সহরের লোক চালের জন্য গ্রামে ও গ্রামের লোক ঐ একই কারণে সহরে আসিতেছে। শনিবার ৫ই আগষ্ট বহরমপুর সহরে কালো বাজারে ৭৪৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। ফলে বহু লোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে। ঐ দিন সহরের লোক মিছিল করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটর বাড়ী যাইয়া চাল চাহিয়াছিল—সেখানে নাকি পুলিস জনতার উপর লাঠি চালাইয়াছে ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিয়াছে। অবিলম্বে জেলার সর্ব্বত্র চাল সরবরাহের ব্যবস্থা না হইলে বহু লোক মারা যাইবে। ১৩৫০এর দুর্ভিক্ষের সময় মুর্শিদাবাদ জেলায় চাউলের মণ ২৪ টাকার অধিক হয় নাই—এবার সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার ক্রটির জন্যই এই দুরবস্থা হইয়াছে। ক্রটির জন্য যাহারা দায় তাহাদেরও শাস্তি বিধান করা প্রয়োজন।

বাঁকুড়ায় খাদ্য-সমস্যা—

বাঁকুড়া জেলায় প্রতি ৫ বৎসরে একবার করিয়া দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। ঐ জেলায় এখনও প্রায় ৬ লক্ষ বিঘা জমী পতিত অবস্থায় আছে। এ বৎসর বাঁকুড়ায় দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। ঐ জেলায় অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা খুব কমই দেখা যায়। মনুসংহিতায় আছে—যে ব্যক্তি যে ভূমিকে বনাদি কর্ত্তন-পূর্ব্বক কর্ষণাদি দ্বারা উদ্ধার করে সে ভূমি তাহারই হইয়া থাকে। ঐ প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় কৃষক আর কৃষির

প্রতি উৎসাহী হয় না। বাঁকুড়া জেলার চাষের জমির উন্নতি সাধন না করিলে বাঁকুড়ায় এই দুর্ভিক্ষ বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমান বৎসরে আগামী ২।৩ মাসে কি অবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া লোক শঙ্কিত হইতেছে।

গ্রাম্য-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা—

ভারতের গ্রামে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রামে ব্যাঙ্ক না থাকায় লোক নানারূপ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করে। এক সময়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে বহু জেলা ও মহকুমা সহরে সরকারী ব্যাঙ্কিং কার্য্য করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। সে ব্যবস্থা অধিক বিস্তৃতি লাভ করে নাই। অনেক স্থানে এখনও ট্রেজারি বা সরকারী তোষাখানা হইতে টাকা আদান প্রদানের ব্যবস্থা আছে। তাহার অসুবিধা অনেক। তাহা পরিবর্তন করিয়া ব্যাঙ্কের উপর সে কাজের ভার দেওয়া হইলে লোক চেকের সাহায্যে আদান প্রদান কার্য্য চালাইতে পারে। পোষ্টাফিসে যে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আছে, তাহার কার্য্যও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। গ্রামে গ্রামে সরকারী ব্যাঙ্ক খোলা হইলে সে দিক দিয়াও সঞ্চয়কারীরা লাভবান হইবে। এ বিষয়ে দেশের সর্ব্বত্র প্রচার ও আলোচনা প্রয়োজন। বহু বেসরকারী ছোট ছোট ব্যবসায়ী-ব্যাঙ্ক ফেল করায় লোক আজ আতঙ্কগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত। ভবিষ্যতে সঞ্চয় করিয়া লোক যাহাতে এই ভাবে বিপন্ন না হয়, সে জন্যই নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন।

কলিকাতায় মাছ সরবরাহ—

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ, আগ্রা, আলিগড়, কাশী, চুনার, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ ও মীরাট জেলা হইতে, উড়িষ্যার বালেশ্বর, কটক, বালুগাঁ, ছত্রপুর, কুহুরী, খালিকোটা ও কালুপাড়া ঘাট (চিল্কা) হইতে এবং বিহারের সামাই, বারুণি জংসন, মোকামা জংসন, পাটনা সিটি ও সিমরী-বক্তিয়ারপুর হইতে পশ্চিমবঙ্গে মাছ আমদানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাস হইতে মাদ্রাজ ও বোম্বাই হইতেও কলিকাতায় মাছ আসিতেছে। সংবাদটি শুনিয়া সকলের আশ্বস্ত হইবার কথা। কিন্তু কলিকাতার বাজারে এখনও মাছের সের সাড়ে ৩ টাকা, ৪ টাকা। দর সুলভ না হইলে আমদানীর ফল বুঝা যায় না। দর সুলভ করার কি কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না। শুনা যায়, একদল ব্যবসায়ী মাছের দর কমাইতে দেন না। এ কথা কি সত্য?

লাল-আলুর চাষ—

পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন 'লাল আলুর চাষ' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ঐ বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"মিষ্টি আলুর তুলনায় আলুর দাম সব সময়েই বেশী ও সেই দামেই আলু কিনে সকলেই মিষ্টি আলুর চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে ব্যবহার করে থাকেন। অথচ আলুর চেয়ে মিষ্টি আলু অনেক বেশী পুষ্টিকর। এতে অবশ্য আলুর তুলনায় প্রোটীন কিছু কম থাকে, কিন্তু আলুর তুলনায় প্রায় ৬ গুণ স্নেহজাতীয় পদার্থ, দেড়গুণ শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ, ৪ গুণ ক্যালসিয়াম বা চুণ, ৯ গুণ খাদ্যপ্রাণ (ক) ও আড়াই গুণ খাদ্য প্রাণ (খ) আছে। কাজেই মিষ্টি আলু যে একটি পুষ্টিকর খাদ্য সে বিষয়ে সন্দেহের কিছু নেই।" আমরা দেশের সকলকে মিষ্টি আলুর চাষ করিয়া খাদ্যাভাব দূর করিতে অনুরোধ করি। এক বিঘা জমীতে ৫০।৬০ মণ মিষ্টি আলু হয়—সার দিয়া চাষ করিলে উহা ১০০ মণও হইতে পারে। শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয়ের প্রবন্ধটি যাহাতে অধিক প্রচারিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

কণ্ট্রোল ব্যবস্থা সমস্যা—

কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে কণ্ট্রোল ব্যবস্থা রাখা উচিত কিনা, সে বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই কমিটী কণ্ট্রোল-ব্যবস্থা রাখার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সে নির্দ্দেশ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুন মাসে কাগজের উপর কণ্ট্রোল ও জুলাই মাসে পেট্রলের উপর কণ্ট্রোল প্রত্যাহার করা হইয়াছে। একদল অর্থনীতিকের বিশ্বাস, ধনী ব্যবসায়ীদের চাপে তাহাদের সুবিধা বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই দুইটি জিনিষের উপর কণ্ট্রোল ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে দেশবাসী উপকৃত না হইয়া বরং অপকৃত হইবে। কাগজের বাজার স্থিরতা লাভ

করিবার পূর্ব্বেই কাগজের উপর কণ্ট্রোল চলিয়া গেল—ফলে কাগজ আবার দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইবে বলিয়াই মনে হয়। পেট্রলের দামও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আমরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।

পাকিস্তানে মাইকেল স্মৃতিসভা—

পূর্ব্বপাকিস্তানে এখনও যে সকল লোক বাস করিতেছেন, তাঁহাদের যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা কমে নাই, তাহা সম্প্রতি যশোহর সহরে রামকৃষ্ণ

যশোহরে মাইকেল উৎসবে সমবেত সুধীবৃন্দ

আশ্রম বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি উৎসব হইতে বুঝা যায়। যশোহর সাহিত্য সংঘের উদ্যোগে উক্ত সভা হয় এবং সুসাহিত্যিক শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী তথায় সভাপতিত্ব ও শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার উহার উদ্বোধন করেন। জনাব মোসারফ হোসেন, আবদুল শোভান প্রভৃতি সভায় মাইকেলের প্রতিভা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মিলন—

গত ৩১শে আষাঢ় চন্দননগর অম্বিকাচরণ স্মৃতি মন্দিরে শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মিলন হইয়াছিল। তথায় ‘হুগলী জেলার ইতিহাস’ রচনা করার জন্য শ্রীযুত সুধীরকুমার মিত্র মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সুধীরবাবু অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করিয়া ঐ ইতিহাস রচনা করায় বহু বক্তা তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করেন। সভার প্রবর্ত্তক সংঘের শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

জলপাইগুড়ির দুর্দ্দশায় সাহায্য—

গত অতিবৃষ্টির ফলে জলপাইগুড়ি সহর ও জেলার ৩টি থানার ১৪টি ইউনিয়নের লক্ষাধিক লোক দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে—রেলে যাতায়াত বন্ধ—সে জন্য দারুণ খাদ্যাভাব

—ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকারও অধিক। জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা—বন্যাপীড়িত দুর্গতগণকে সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য; সে জন্য তথায় প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদিগকে লইয়া একটি সাহায্য কমিটী গঠিত হইয়াছে—সাহায্য জলপাইগুড়িতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে প্রেরণ করিলে কমিটী তাহা বিতরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। জলপাইগুড়ি হইতে যাহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের নিকট দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনী শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমাদের বিশ্বাস—বাংলার চা-শিল্পের কেন্দ্র জলপাইগুড়িকে রক্ষা করার জন্য বাঙ্গালীর উৎসাহের অভাব হইবে না।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
(অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতারত)

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার—

কলিকাতার খ্যাতনামা এডভোকেট, বসিরহাট-নিবাসী শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার গত ১৫ই জুলাই ২৪ পরগণা জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯২৮ সালে ছাত্র-জীবনে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্রবে আসেন ও তদবধি দেশে নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সমাজ-সেবা করিতেছেন। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় ও ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি নানাভাবে দুর্গতদের রক্ষা করিবার ব্যবস্থা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার

করিয়াছিলেন। গত তিন বৎসর কাল তিনি কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদকরূপেও সাফল্যের সহিত কাজ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ২৪পরগণা জেলায় প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার হউক—আমরা সর্ব্বান্তকরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

ভারতে খাদ্যাভাব—

গত প্রায় ১০ বৎসর ধরিয়া ভারতে দারুণ খাদ্যাভাব চলিতেছে এবং এখন পর্য্যন্ত তাহার প্রতীকারের কোন উপায় নির্ণীত হয় নাই। অথচ আমেরিকায় বর্ত্তমানে এত অধিক খাদ্য উৎপন্ন হয় যে তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমেরিকায় প্রচুর গম ও অন্যান্য খাদ্য শস্য মজুত আছে—তাহা মাল গাড়ীতে ভর্ত্তি করিলে ১৭৬৭৯ মাইল দীর্ঘ মালগাড়ীর সারিতে পরিণত হইবে। তথায়

এত অধিক শুষ্ক ডিম জমিয়া গিয়াছে যে রুটিওয়ালারা আগামী ৮ বৎসরেও তাহা খরচ করিতে পারিবে না। মাখন, দুগ্ধচূর্ণ, পনির, সয়াবিন, শুকনা ফল প্রভৃতিও ঐরূপ পরিমাণেই তথায় জমা হইয়াছে। আমেরিকা হইতে ঐ সকল জিনিষ কিনিয়া আনিবার উপযুক্ত অর্থ ভারতের নাই—কাজেই ভারতবাসীকে ঐ সংবাদ পাঠ করিয়া অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ভারত-সরকার কি এদেশে ঐভাবে খাদ্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না? কবে এ বিষয়ে ভারতবাসী জনসাধারণের তথা ভারত সরকারের চৈতন্য উদয় হইবে, তাহা কে জানে?

দিল্লী প্রত্যাগত নূতন কেন্দ্রীয় সচিব—শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত—

ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ১৮৮৯ সালে ত্রিপুরা জেলার চুণ্টা গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি ১৯১৮ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' দৈনিক পত্রে প্রথম সাংবাদিকের কাজ আরম্ভ করেন ও পরে কিছুদিন 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' ও 'সার্ভাণ্ট' পত্রে কাজ করিয়াছিলেন। 'ফ্রি প্রেস' নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে তিনি তাহার কলিকাতা শাখার ভারগ্রহণ করেন ও পরে ১৯৩৩ সালে 'ইউনাইটেড প্রেস' প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সর্বপ্রকারে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবী-সংঘের সভাপতি ও নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর সদস্য হিসাবে তিনি এ দেশের সাংবাদিকতার উন্নতি বিধানের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে যোগ্যের সমাদর দেখিয়া দেশবাসী সকলেই আনন্দিত হইবেন।

সাংবাদিক সম্মিলনে ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাস্তত্যাগীর সংখ্যা—

৬ই জুলাই তারিখের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ, গত ১লা জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত ২৫ লক্ষ বাস্তত্যাগী পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে ভারতীয় রাষ্ট্রে আগমন করিয়াছে। তন্মধ্যে ১৭ লক্ষ পশ্চিম বাংলায়, ৬ লক্ষ আসামে ও ২ লক্ষ ত্রিপুরায় গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাদের জন্য প্রত্যহ ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। ১৯৫০ সালে এই বাবদ পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের মোট ১২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই টাকা যে ঠিকভাবে ব্যয়িত হয় না, তাহা ৫ই জুলাই প্রকাশিত নেতৃবৃন্দের এক বিবৃতি হইতে বুঝা যায়। শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি

ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ কার্য্যের জন্য বহু লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে ও বহু টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের কোন পরিকল্পনা না থাকায় প্রকৃত কাজ হইতেছে না। আমরা এ বিষয়ে বহু-বার বহু অভিযোগ প্রকাশিত করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। দেশে এখনও নিঃস্বার্থ দেশ-সেবকের অভাব নাই—তাঁহাদের যে কেন এই কার্য্যে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আহ্বান করা হয় না, তাহা বুঝা যায় না।

দেশবন্ধু স্মৃতি তর্পণ—কলিকাতা

ভারতের ৫০ কোটি টাকা ক্ষতি—

শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও অর্থ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি সম্প্রতি এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন—পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী সম্পর্কে ভারত সরকারের কর্ত্তব্য-ক্রটির ফলে সম্প্রতি ভারতের ৫০ কোটি টাকা ক্ষতি হইতেছে। নির্দ্ধারিত রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে গোপনে ও বেসরকারীভাবে পাটজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়াছে, ফলে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব খাতে ২০ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে এবং পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানী সমূহের অংশীদারদিগের ৩০ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতির জন্য যাহারা দায়ী, তাহাদের কি শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হইতে পারে না। দেশে এইরূপ মুনাফা-খোরদের রাজত্ব আর কতদিন চলিবে?

সমবায় অর্থনীতি—

কলিকাতায় সমবায় অর্থনীতি আলোচনার একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে গত ৩রা আগষ্ট কলিকাতায় গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে পশ্চিম বাঙ্গালার নূতন সমবায় মন্ত্রী ডাঃ আর, আমেদকে এক ভোজ সভায় সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। ভোজসভায় সমবায় মন্ত্রী বলিয়াছেন—"সমবায় নীতি সমাজকল্যাণমূলক একটি মহান ও সার্ব্বভৌম আর্থিক ব্যবস্থা। সমবায় নীতিকে ভিত্তি করে পাশ্চাত্য দেশে আজ এক দিকে অর্থ শক্তি, অন্য দিকে ব্যক্তি-প্রাধান্যহীন লোক-করায়ত্ত আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে সমবায় অর্থনীতি বিশেষ প্রয়োজন।" আজ বাংলা দেশে সর্ব্বত্র এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করি, নূতন মন্ত্রী এ বিষয়ে প্রকৃত চেষ্টা করিয়া দেশের কল্যাণ বিধান করিবেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিন্দা—

সম্প্রতি কলিকাতা কলেজ-স্কোয়ারস্থ থিয়সফিকাল সোসাইটি হলে অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে রূপ সনাতন স্মৃতি সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—"পুরীধামে রথযাত্রা উপলক্ষে এ বৎসর উড়িয়া সরকার কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকায় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে উড়িয়ার অবনতি হইয়াছে—এইরূপ অনৈতিহাসিক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানিকর উক্তি প্রকাশিত হওয়ায় এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। ঐতিহাসিক প্রমাণে উড়িয়ার ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পকলা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেরণায় সংশোধিত বৈষ্ণবতা প্রসারের সহিত অবিচ্ছেদ্য। সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায় ঐ মন্তব্যের প্রত্যাহার দাবী করিতেছে।" —এই প্রস্তাব সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, উড়িষ্যা সরকার নিজেদের ভুল বুঝিয়া কর্ত্তব্য পালনে বিলম্ব করিবেন না।

পাকিস্তানী আক্রমণ—

গত ৪ঠা আগষ্ট নয়া দিল্লীতে ভারতীয় পার্লামেণ্টে পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী শ্রীযুত কেশকার বলিয়াছেন —গত ১লা এপ্রিলের পর হইতে এ পর্য্যন্ত পাকিস্তানীরা ভারতীয় সীমান্তের গ্রাম গুলিতে ৫৭ বার হানা দিয়াছে। ঐ সকল হানা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের নিকট প্রতিবাদ করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। খবরটি চমৎকার—এক পক্ষ এইভাবে ক্রমাগত হানা দিতেছে। আর এক পক্ষ দিল্লী-চুক্তি (নেহরু-লিয়াকৎ) রক্ষা করার জন্য আগ্রহশীল। কতদিন এই অবস্থা চলিবে? ইহার ফলই বা কিরূপ হইবে? সাধারণ মানুষ ইহা বুঝিতে অসমর্থ।

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল লীগ ঃ

১৯৫০ সালের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ বিজয়ী হয়ে পর্য্যায়ক্রমে দু'বছর লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব অর্জ্জন করেছে। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৫-৪৬ সালেও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব পর্য্যায়ক্রমে দু'বার লীগ পায়। এ বছরের লীগ পাওয়ার বিশেষত্ব, তারা শেষ পর্য্যন্ত লীগের কোন খেলাতেই হার স্বীকার করেনি। খেলোয়াড় সংগ্রহ এবং দল গঠন ব্যাপারে ক্লাবের প্রচেষ্টা এবং দলগত সার্থ সার্থক হয়েছে। ভারতীয় ক্লাবের মধ্যে ১৯৪৮ সালে লীগে প্রথম অপরাজেয় রেকর্ড স্থাপন করে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। যে সময় মহমেডান স্পোর্ট ক্লাব পর্য্যায়ক্রমে পাঁচবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে লীগে নতুন রেকর্ড করেছে সে সময়ে তারা অপরাজেয় রেকর্ড স্থাপন করতে পারেনি। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এ পর্য্যন্ত ৮ বার লীগ পেয়েছে, গত দশ বছরের মধ্যে পেয়েছে তিনবার। এর মধ্যে ২ বার (১৯৩৬ এবং ১৯৪০) একটা ক'রে খেলায় তাদের হার হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং লীগ বিজয়ী হয়ে সব থেকে বেশী হেরেছে পাঁচবার ১৯৩৮ সালে, যে বছর লীগে কাষ্টমস এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলায় সমান পয়েণ্ট উঠে।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ পর্য্যন্ত লীগ পেয়েছে ৫ বার, গত দশ বছরের মধ্যে। প্রথম লীগ পায় ১৯৪২ সালে। মাত্র ১টা খেলায় হার হওয়ার জন্যে তারা তিনবার অপরাজেয় রেকর্ড করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। লীগ বিজয়ী হয়ে সব থেকে বেশী হেরেছে তিনবার ১৯৪৯ সালে।

মোহনবাগান এ পর্য্যন্ত লীগ পেয়েছে ৩ বার, গত দশ বছরের মধ্যে ২ বার। প্রথম পায় ১৯৩৯ সালে। উপর্য্যুপরি ২ বার লীগ পেয়েছে ১৯৪৩-৪৪ সালে। মাত্র ১টা খেলায় হার হয়েছে ২ বার ১৯৩৯ এবং ১৯৪৩ সালে। ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান হেরেছে ১-২ গোলে ভবানীপুরের কাছে এবং ১৯৪৩ সালে ০-১ গোলে ইষ্টবেঙ্গলের কাছে।

আলোচ্য বছরের লীগের মোট খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে না যদিও কোন কোন খেলায় তারা দলের সুনাম অনুযায়ী না খেলতে পেরে খেলা ড্র করেছে অথবা জয়লাভ করেছে। লীগের ফিরতি খেলায় মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং এবং রাজস্থান এই তিনটি বড় দলের সঙ্গে খেলে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব খেলা ড্র করেছে। লীগের ফিরতি খেলায় তাদের মূল্যবান ১ পয়েণ্ট নষ্ট হয়েছে ক্যালকাটার সঙ্গে।

এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগান ক্লাবের খুব জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। ১৫ই জুলাই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের ফিরতি খেলার আগে পর্য্যন্ত ইস্টবেঙ্গল দলের ২১টা খেলায় ৩৭ পয়েণ্ট ছিল অপর দিকে মোহনবাগানের ছিল ১৯টা খেলায় ৩২ পয়েণ্ট। মোহন-বাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের ফিরতি খেলা ড্র যাওয়ার ফলে উভয়দলের খেলা এবং পয়েণ্টের সঙ্গে এক ক'রে যোগ হয়। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলদলের ফিরতি খেলার ফলাফলের উপর উভয় দলের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের যে ভাগ্য নির্ভর করছিল খেলাটি ড্র যাওয়ার ফলে ইস্টবেঙ্গল দলের কিছুটা সুবিধা হয়। তবে মোহনবাগানের সমস্ত আশা একেবারে নষ্ট হয় নি। কারণ উভয় দলের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ খেলা তখনও বাকি ছিল। স্পোর্টিং ইউনিয়ন

দলের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পাল্লা থেকে মোহনবাগান পিছিয়ে পড়ে, ইস্টবেঙ্গলক্লাব কিছুটা নিরাপদ স্থানে উঠে যায়। এরপর মোহনবাগান অকস্মাৎ এরিয়ান্সের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায়। প্রথম খেলায় মোহনবাগান ৪-০ গোলে এরিয়ান্সকে হারিয়েছিল। এই পরাজয়ের ফলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নাগালের বাইরে চলে যায়। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তখন মোহনবাগান ও রাজস্থানের মধ্যে কে লীগে রাণার্স আপ হবে এ গবেষণা মাঠে চলতে লাগলো। উভয়ের তখন ২৪টা খেলায় সমান ৩৬ পয়েণ্ট। অপর দিকে বেশী খেলে ইস্টবেঙ্গলের ৪২। রাজস্থানকে ২-০ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান যে ২ পয়েণ্টে এগিয়ে গেল পরবর্ত্তী খেলায় ই আই রেলদলের কাছে ০-২ গোলে হেরে আবার রাজস্থানের সমান পয়েণ্টে নেমে এলো। ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার মোহনবাগান-স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা ড্র যায় এবং সেই সময় থেকেই মোহনবাগানের ভাগ্য বিড়ম্বনা আরম্ভ হয়েছে। দলের খেলোয়াড়দের অসুস্থতা এবং আঘাত শেষের দিকে লেগেই আছে। ২টো হার এরিয়ান্স এবং ই আই আর রেল দলের কাছে সত্যই ক্রীড়া মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী স্পোর্টিং ইউনিয়ন, এরিয়ান্স, কালীঘাট এবং জর্জ্জটেলিগ্রাফের খেলার কথা গতবার বলেছি। ফিরতি খেলায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্পোর্টিং ইউনিয়ন ড্র করেছে মোহনবাগানের সঙ্গে এবং হারিয়েছে রাজস্থানকে। লীগে তারা ৪র্থ স্থানে আছে। এরিয়ান্স হারিয়েছে মোহনবাগানকে। কালীঘাট ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় মহমেডান স্পোর্টিংকে।

বি এন রেল দলের কাছে রাজস্থানের পরাজয় এবারের খেলার মাঠে আর এক বিস্ময়। ক্যালকাটা গ্যারিসন ৪-১ গোলে ই আই রেল দলকে হারায় এবং ২-০ গোলে এরিয়ান্সকে ক্যালকাটা ক্লাব হারিয়ে শেষ পর্য্যন্ত লীগের শেষ ধাপেই রইলো। ক্যালকাটা গ্যারিসন লীগের শেষের দিকে ভাঙ্গা টীম জোড়া লাগিয়ে বেশ খেলেছে। এবার লীগের ফিরতি খেলায় ক্যালকাটাকে ৭-২ গোলে হারিয়ে সব থেকে বেশী গোল দিয়ে জয়লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে ভবানীপুর ক্লাব। ভবানীপুরের রঞ্জিৎ সিং একাই ৫টি গোল করেন। একটি খেলায় ব্যক্তিগতভাবে কোন খেলোয়াড় এত বেশী গোল এ বছর প্রথম বিভাগের লীগে করতে পারে নি।

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ওয়েষ্টইণ্ডিজ

ইংলণ্ড ঃ ২২৩ ও ৪২৬

ওয়েষ্টইণ্ডিজ ঃ ৫৫৮ ও ১০৩ (কোন উইকেট না হারিয়ে)

ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলায় ওয়েষ্টইণ্ডিজ ১০ রাণে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে। প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ড জয়ী হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করায় তারা ২-১ ম্যাচে এগিয়ে রইলো। চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ খেলার ফলাফলের উপরই উভয়দলের 'রাবার' করছে। চতুর্থ ম্যাচটি অন্ততঃ ড্র গেলেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ 'রাবার' পাবে।

ইংলণ্ড টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে। এক ঘণ্টার খেলায় মাত্র ২৫ রাণে ৪টা উইকেট পড়ে যায়। অসুস্থতার জন্যে হাটন এবং গিমব্লেট দলে যোগদান করতে পারেন নি। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জোন্সের যায়গায় জনসন খেলতে নামেন। ২২৩ রাণে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস শেষ হয়। ডি স্যাকলটন দলের সর্ব্বোচ্চ ৪২ রাণ করেন। ইয়ার্ডলে করেন ৪১। জনসন এবং ওরেল ৩টে করে উইকেট পান। রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইন পান ২টো ক'রে। প্রথম দিনের খেলার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ১ উইকেটে ৭৭ রাণ করে।

খেলার দ্বিতীয় দিনের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ সারাদিন পিটিয়ে খেলে মাত্র ৩ উইকেটে ৪৭৯ রাণ তুলে। ওরেল ২৩৯ রাণ এবং উইকস ১০৮ রাণ করে নট আউট থাকেন। রে এবং ষ্টলমেয়ারের যথাক্রমে ৬৮ এবং ৪৬ রাণ উল্লেখযোগ্য। ওরেল নট আউট ২৩৯ রাণ করায় ১৯৩৮ সালে ট্রেণ্ট ব্রীজ গ্রাউণ্ডে প্রতিষ্ঠিত এস ম্যাক্‌কেবের ২৩২ রাণের রেকর্ড ভেঙ্গে যায়। ইতিপূর্ব্বে ট্রেণ্ট ব্রীজ গ্রাউণ্ডে কোন দেশের খেলোয়াড়ই ওরেলের সমান রাণ তুলতে পারে নি। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হাটনের ১৯৬ রাণ এতদিন ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-ওয়েষ্টইণ্ডিজ টেষ্ট সিরিজের সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ ছিল। ওরেল সে রাণের

রেকর্ডও ভেঙ্গে ফেলেন। ঐ দিন ওরেল এবং উইকসের জুটিতে যে রাণ উঠলো ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের পক্ষে যে কোন উইকেটের যে সর্ব্বোচ্চ ২২৮ রাণের (১৯২৯ সালের এম হেডলে এবং আর হুলেন্স কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত) রেকর্ড ছিল তাও ভেঙ্গে গেল। ওরেলের খেলা দর্শকদের মুগ্ধ করে। তিনি ১টা ওভার বাউণ্ডারী করেন এবং 'চার' ১৪টা। খেলার তৃতীয় দিনে ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের পূর্ব্ব দিনের রাণের সঙ্গে ৭৯ রাণ যোগ হ'লে পর তাদের ১ম ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে যায়। ওরেল ২৬১ রাণ করেন। ওরেলের এই ২৬১ রাণ হ'ল ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট সিরিজের উভয় দলের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রাণ। এই রাণ তুলতে ৫ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় লাগে। রাণে ৩৫টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার বাউণ্ডারী ছিল। ৩০,০০০ হাজার দর্শক (সভ্যরাও) দাঁড়িয়ে উঠে ওরেলকে সম্ভাষণ জানায় এবং মাঠ থেকে প্যাভিলন পর্য্যন্ত ওরেলকে হাততালি এবং জয়-ধ্বনি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ওরেল তাঁর ২৬১ রাণের মাথায় বেডসারের ইনসুইং বল লেগে জোর পিটিয়ে মারেন। বলটা সজোরে গিয়ে ইংলণ্ডের ক্যাপটেন ইয়ার্ডলের হাতে পড়ে; ইয়ার্ডলে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় তবে ওরেলের বলটা হাতে বাগাতে পারেন। ওরেল এবং উইকসের চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ২৮৩ রাণ উঠে। এই ২৮৩ রাণ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের পক্ষে যে কোন উইকেটের সর্ব্বোচ্চ রাণ হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। উইকস ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে ১২৯ রাণ তুলে আউট হন। মোট ১৮টা বাউণ্ডারী করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদের প্রথম ইংনিসের এই ৫৫৮ রাণ ইংলণ্ডের বিপক্ষে তাদের দলের সর্ব্বোচ্চ রাণ হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। খেলার তৃতীয় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সাতটা উইকেট ৮০ মিনিটের মধ্যে ৭৯ রাণে পড়ে যায়। ইংলণ্ডের বেডসার একাই ঐদিন ৩৬ রাণে ৫টা উইকেট পান।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের থেকে ৩৩৫ রাণ পিছনে পড়ে থেকে ইংলণ্ড খেলার তৃতীয় দিনের বেলা ১টার পর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। লাঞ্চের সময় খুব জোর বৃষ্টি পড়তে থাকে এবং খেলা পুনরারম্ভ হ'তে ১৫ মিনিট দেরী হয়। লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের কোন উইকেট না পড়ে ৮ রাণ উঠে। চা-পানের আগে বৃষ্টির জন্যে খেলা বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ রেখে খেলোয়াড়রা প্যাভিলয়নে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। চা-পানের সময় কোন উইকেট না পড়ে ইংলণ্ডের ৪৯ রাণ উঠে। বৃষ্টির জলে খেলার পীচের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে; জনসন একবার বল দিতে গিয়ে একেবারে কুপোকাৎ হয়ে পড়েন এবং বাঁ কাঁধে আঘাত পান। তৃতীয় দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের কোন উইকেট না পড়ে স্কোর বোর্ডে ৮৭ রাণ উঠতে দেখা যায়।

চতুর্থ দিনের খেলায় ইংলণ্ডের ওপনিং ব্যাটসমেন সিম্পসন এবং ওয়াসব্রুক যথাক্রমে ৯৪ এবং ১০২ রাণ করে প্রথম উইকেটের জুটিতে ২১২ রাণ করেন। ইংলণ্ড—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টেষ্ট ম্যাচে এই ২১২ রাণ (ওয়াসব্রুক ১০২ এবং সিম্পসন ৯৪) প্রথম উইকেটের রেকর্ড হয়েছে। লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের কোন উইকেট না পড়ে ১৬৮ রাণ উঠে। চতুর্থ দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইংলণ্ডের ৫ উইকেট পড়ে গিয়ে ৩৫০ রাণ উঠে। পার্কহাউস ৬৯ রাণ এবং ডিউজের নট আউট ৫৫ রাণ উল্লেখযোগ্য।

টেষ্ট খেলার পঞ্চম দিনে অর্থাৎ শেষ দিনে ইংলণ্ড সময় এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের স্পিন বোলার রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইনের বিপক্ষে প্রচণ্ড মনোবল নিয়ে খেলতে নামলো, হাতে পাঁচটা উইকেট। তিন হাজার দর্শক অধীর আগ্রহে ক্রিকেট খেলায় ইংলণ্ডের মান ইজ্জত রাখার খেলা দেখতে লাগলো। ৮৬ রাণে ইংলণ্ডের বাকি পাঁচটা উইকেট পড়ে গেলে ২য় ইনিংস ৪৩৬ রাণে শেষ হয়ে যায়। ডিউজ এবং ইভেন্স যথাক্রমে ৬৭ এবং ৬৩ রাণ করেন। রামাধীন খেলার শেষ দিনে ৩টে উইকেট পান; মোট ৫টা উইকেট পান ১৩৫ রাণে। এরপর ভ্যালেনটাইনের ৩টে ১৪০ রাণে। লাঞ্চের পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের রে (৪৬) এবং ষ্টলমেয়ার (৫২) ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১০২ রাণ তুলেন। কোন উইকেট না হারিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসে ১০৩ রাণ উঠলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে জয়ী হয়।

জুলেস রিমেট কাপ ঃ

রিও ডি জেনিরোয় (ব্রেজিল) অনুষ্ঠিত 'জুলেস রিমেট ওয়ার্লড সোকার কাপ' প্রতিযোগিতার ফাইনালে উরুগোয়া ২-১ গোলে শক্তিশালী ব্রেজিল একাদশ দলকে হারিয়ে সারা পৃথিবীর ফুটবল ক্রীড়াজগতে বিস্ময়ের সাড়া

এনে দিয়েছে। খেলার এই ফলাফলে মাঠে উপস্থিত ২০০,০০০ লক্ষ ব্রেজিলবাসী (দর্শক সংখ্যায় হিসাবে পৃথিবীর রেকর্ড) হতবাক হয়ে পড়ে। খেলার বিবরণ যিনি রেডিও যোগে বিতরণ করছিলেন তিনিও শেষ পর্য্যন্ত স্পেন-সুইডেনের অপর খেলার খবরটির ফলাফল ঘোষণা করতে ভুলে গিয়েছিলেন। ব্রেজিলদলের খেলোয়াড়রা পরাজয়ে মুহ্যমান হয়ে অবনত মস্তকে ধীরপদে মাঠ পরিত্যাগ করেন। ফ্রান্সের এম জুলেস রিমেট (যিনি এই কাপটি দান করেছেন) বিজয়ীদলকে নিজ হাতে কাপটি প্রদান করেন। জয়লাভের জন্যে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়রা স্বর্ণপদক ছাড়া এক হাজার পাউণ্ড বোনাস পায়।

ফুটবল খেলায় সমস্যা ঃ

খেলাধূলায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা কোন দল বা ব্যক্তিগত খেলোয়াড়ের পক্ষে মস্ত বড় লাভ। খেলায় দোষ ত্রুটি আবিষ্কার করা বা অপর কোন শক্তিশালী খেলোয়াড়ের ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং খেলার বৈশিষ্টগুলি আয়ত্ত করার পক্ষে একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল খেলায় জয়-পরাজয়ের চিন্তা মন থেকে দূর ক'রে প্রতিযোগিতায় যোগদান করা। জীবনে যাঁরা অসাফল্য এবং পরাজয়ের ঝুঁকি নিতে সাহসী হ'ন তাঁরাই পরে সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। জীবনে সাফল্যলাভ যাঁদের লক্ষ্যবস্তু তাঁরা অসাফল্য এবং পরাজয়ে হতাশ হ'ন না। পরাজয় যাঁদের জীবনে বিভীষিকা এবং পরাজয়কে যাঁরা জীবনে অত্যন্ত হীনতা মনে করেন তাঁরা স্বভাবতই নিষ্ক্রীয় পরমুখাপেক্ষী অথবা আত্মপ্রবঞ্চক হ'ন। বাংলা দেশের বর্ত্তমান ফুটবল খেলার অবস্থাটা ঠিক এই পর্য্যায়ে দাঁড়িয়েছে। ক'লকাতার কোন কোন নামকরা ক্লাব খেলায় জয়লাভ ক'রে লীগ-শীল্ড পাওয়াটা বড় মনে করে। ফলে খেলায় পরাজয় দলের পক্ষে তথা সমর্থকদের পক্ষে মস্ত বড় অক্ষমতা এবং হীনতা মনে করা হয়। কোন কোন নামকরা ফুটবল ক্লাবের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় খেলোয়াড়দের উপর আস্থা না রেখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমদানী করা খেলোয়াড়দের উপর বেশী আস্থা রাখেন। তার কারণ, স্থানীয় খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করতে গেলে লীগ-শীল্ড খেলায় অনেক বেশী ঝুঁকি নিতে হয় এবং দলের পক্ষে সাফল্যলাভ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে সুদীর্ঘ সময় ধরে ক্লাব পরিচালনায় দলগত এবং ব্যক্তিগত প্রভাব বজায় রাখতে হলে ক্লাবের সমর্থকদের হাতে রাখা দরকার। ক্লাবের সমর্থকদল চায় লীগ-শীল্ড এবং খেলায় বিবিধ রেকর্ড; দলগত নামের উগ্রতা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ সভ্য এবং সমর্থকদের মধ্যে এতখানি বেশী যে, তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের একান্ত অভাব দেখা যায়। ফলে যে বছরের পরিচালক মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় দল লীগ বা শীল্ড পায়, পরবর্ত্তী বাৎসরিক নির্ব্বাচনের সময় সেই দলই সভ্যগণের বিপুলভাবে সমর্থন লাভ করে। দল গঠনের এই নীতি দ্বারা ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে দলের সভ্য এবং সমর্থকদের উপর বেশী দিন প্রভাব বিস্তার করা যায় বটে কিন্তু এ নীতি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি এবং আত্মপ্রবঞ্চনার সমতুল্য।

বাইরের খেলোয়াড়রা নিছক ফুটবল খেলার আকর্ষণেই কি স্বদেশ, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে ক'লকাতায় খেলতে আসেন? বর্ত্তমান বাস্তব জগতের অর্থ-নৈতিক পটভূমিকায় রুজি-রোজগারের চিন্তা উপেক্ষা ক'রে একমাত্র খেলার প্রেরণায় এমনভাবে যে কেউ নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে তা ধারণার অতীত। এমন কিছু একটা বড় আকর্ষণ আছে যার জন্যে তাঁরা নিজ দেশের ফুটবল খেলায় যোগদান করার মত পবিত্র কর্ত্তব্যবোধ থেকেও নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে কর্ত্তব্যচ্যুত হ'তে সঙ্কোচ বোধ করেন না। সে আকর্ষণ গোপনীয় হলেও ক্রীড়া-মহলে অজ্ঞাত নয়। ফুটবল খেলার মরসুম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা প্রতিযোগিতায় দলের পরাজয় ঘটলেই এঁদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এঁদের বেশীর ভাগ স্বদেশে ফিরে যায়। এইভাবে এঁদের ভাড়াটে খেলোয়াড়দের মত না খেলিয়ে বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের ফুটবল খেলা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যদি এঁদের দলভুক্ত করা হ'ত তাহলে কোন অভিযোগ থাকে না। আজ পনের বছর ধরে অবাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়দের ক'লকাতায় আমদানী অব্যাহত গতিতে চলেছে কিন্তু তাঁদের খেলিয়ে দলের লীগ ও শীল্ড পাওয়া ছাড়া বাঙ্গালী জাতির কোন গঠনমূলক উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে কি? বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের উপর ক্লাব কর্তৃপক্ষ আস্থা রাখতে পারেন

না কারণ অনেকগুলি ক্লাবের পক্ষে বাছা বাছা নামকরা বাঙ্গালী খেলোয়াড় পাওয়া মুস্কিল সুতরাং তাঁরা যে সহজ পথটা আবিষ্কার করেছেন সেটা বাইর থেকে খেলোয়াড় আমদানী করে দলগঠন করা। লীগ-শীল্ড পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মোটেই দোষণীয় নয় কিন্তু উৎকট নেশায় জাতীয় স্বার্থ বলি দিয়ে যখনই জয়লাভের বাহাদুরী দেখানো হয় তখনই দোষণীয়। বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের উপযুক্ত ফুটবল খেলা শিক্ষা দিয়ে দলে খেলানোই দেশের প্রকৃত গঠনমূলক কাজ। কোন কোন নামকরা সঙ্গত সম্পন্ন ক্লাবের প্রধান কাজ হ'ল বাহির থেকে বাছাই করা খেলোয়াড় ফাঁদ পেতে ধরে আনা, খেলোয়াড় তৈরী করা নয়। খেলোয়াড় সংগ্রহের সঙ্গে যদি খেলোয়াড়দের খেলা শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে তাহলে সমালোচনার মুখ অনেকটা বন্ধ হয়।

ইংলণ্ডে বিদেশ থেকে খেলোয়াড় আমদানী করার প্রথা চালু আছে এবং এদেশের থেকে বরং অনেক বেশী। এইতো আমাদের দেশের লালা অমর নাথ, ভিনু মানকড়, উমরী গড় প্রভৃতি নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে সেখানের বিভিন্ন দলে ক্রিকেট খেলছেন। এখানকার সঙ্গে তফাৎ এই, সেখানে এই খেলোয়াড় আমদানী নীতির ফলে স্থানীয় খেলোয়াড়দের খেলায় যোগদানের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেনা এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্নগামীও হয় না। কারণ ইংরেজ চরিত্রে অপরদিকে একটি গঠনমূলক শক্তি সদা জাগ্রত রয়েছে। বিদেশী খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্যে দর্শকেরা কেবল মুগ্ধ হয়ে চিত্ত বিনোদন করে না, এই শক্তিই স্থানীয় দর্শকদের বিদেশী খেলোয়াড়দের কাছ থেকে যা কিছু শিক্ষণীয় এবং অভিনব তা আয়ত্ব করতে অনুপ্রেরিত করে। নিছক খেলায় সাফল্যলাভ অথবা খেলা দেখে চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে সেদেশে খেলোয়াড় আমদানী করা হয় না। এখানে খেলার মধ্যে আমরা খেলোয়াড় এবং দর্শকদের অখেলোয়াড়োচিত কাজে যে উৎসাহ এবং নির্লিপ্তভাব লক্ষ্য করি তার মূলে আছে বহুদিনের পুঞ্জিভূত অবিচার এবং অসন্তোষ। এমন কি প্রধান প্রধান ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলি এবং আই এফ এ নিজেও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই দর্শকদের মধ্যে বিক্ষোভ দিন দিন বেড়ে চলেছে। কেবল খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে অথবা কঠোর সমালোচনা এবং পুলিশের পাহারা দিয়ে খেলার মাঠের স্বাভাবিক আবহাওয়া রাখা যায় না। দর্শকদের মনে শুভবুদ্ধি উদ্রেকের জন্যে আমাদেরও যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ এবং আই এফ এ-র কতকগুলি গঠনমূলক কাজের উপরই দর্শক এবং খেলোয়াড়দের যে শুভবুদ্ধি নির্ভর করছে, দুঃখের বিষয় এটা তাঁরা কেউ চিন্তা ক'রে সেইমত গঠনমূলক কাজে উৎসাহ দেখান না। আই এফ এ, বিভিন্ন ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ, খেলোয়াড়, দর্শক, সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার সমবেত চেষ্টায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন খেলাধূলার উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে না। বাঙ্গালী জাতি আজ এক চরম জাতীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। আজ আমাদের একান্ত দরকার ধৈর্য্য, সাহস, একতা এবং শুভবুদ্ধি। খেলার মাঠে যে উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়েছে তার প্রভাব আমাদের জাতীয় নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করে সর্ব্বনাশের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; এখনও যদি আমরা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত না হই তাহলে আমাদের কপালে আরও অনেক দুর্ভোগ আছে। জাতই যদি এভাবে মরণের মুখে এগিয়ে যায় তাহ'লে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ভাল ভাল তত্ত্বকথা এবং লীগ-শীল্ড পাওয়ার গৌরব কাদের জন্যে?

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "যৌবনের অভিশাপ"—২৸৹
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় প্রণীত নাটক "ভাঙ্গন কূল"—২৲
শ্রীনেপালশঙ্কর সরকার-সম্পাদিত "বর্ষ-দীপিতা" (১৩৫৭)—৩৷৹
শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য "Voice of Silence"—৪৲
কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য "যুগের কাব্য"—১৲
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত "প্রভু বিধান"—৩৲
শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "চতুঃশ্লোকী ভাগবত"—২৷৹
শ্রীসুধাংশুকান্ত আচার্য্য প্রণীত শিকার-কাহিনী "আসামের জঙ্গলে"—৪৲
বরেন বসু প্রণীত "জঙ্গী ভিয়েৎনাম"—১৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ফুটন্ত ফুল"—২৲
শরৎ-সাহিত্য ভবন প্রকাশিত "পুরুষ ও প্রকৃতি বা রতি শাস্ত্র"—১৲,
"নতুন-পাওয়া প্রিয়া বা প্রেমপত্র"—১৲
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "বিদ্যালয়ে বাদল"—১৲,
"এ টেল অব্ টু সিটিজ"—১৷৹
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত "সীতারাম"—১৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "বিপ্লবী শরৎচন্দ্র বসু"—।৹
কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "ভ্রমরী"—৩৷৹
স্বামী ভৈরবানন্দ প্রণীত দর্শন-আলোচনা "বহুরূপে সম্মুখে তোমার"—২৷৹

এইচ্-এম্-ভি বাংলা রেকর্ড—আগষ্ট ১৯৫০

N 31240—অগ্নিযুগের গুরু, সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দের চরণে অন্তরের ভক্তির উচ্ছাস এই শ্রীঅরবিন্দ প্রণতি। লালগোলারাজ এটি রচনা ক'রেছেন, আবৃত্তিও নিজেই ক'রেছেন—গীতাংশে যোগ দিয়েছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী জগন্ময়। N 31241—যে কঠিন সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ ক'রেছে, তার চেয়েও কঠিন বেদনাদায়ক সংগ্রামের পথে তাকে আত্মশুদ্ধি করতে হবে। শতাব্দীর সঞ্চিত আবর্জনাকে পুড়িয়ে ফেলতে বাইরের কেউ তাকে সাহায্য ক'রবে না। সু-সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত "স্বাধীনতার স্মরণে" তারই ইংগীত রয়েছে। N 31242—শিল্পী সত্য চৌধুরীর দরদী কণ্ঠে দুখানি ভজন গীতি বিশেষ সময় উপযোগী হ'য়েছে। গান দুটি রচনা করেছেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। N 31243—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় দু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন, যার সুর সংযোগ করেছেন জনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। N 31244—শ্রীমতী কল্যাণী মজুমদারের "একি বেদনায় হায়" ও "আবেশে পরাণ কাঁপে" আধুনিক গান দু'খানি শিল্পীর ভাবপ্রবণ কণ্ঠের অনুভূতি। N 31245—কুমারী মাধবী ঘোষের কণ্ঠের আধুনিক গান। N 31246—শৈলেশ রায় ও অমর দত্তের বাঁশী ও ম্যাণ্ডোলিনের যন্ত্র-গীতি জনপ্রিয় হিন্দী বাণী চিত্র 'প্যার কি জিৎ'এর দু'খানি গানকে মূর্ত ক'রে তুলেছে। N 31230—রেকর্ডে রঞ্জিত রায় ও তাঁর সম্প্রদায়ের গাওয়া দু'খানি গান বিশেষ উপভোগ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূজার ভারতবর্ষ—শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আগামী আশ্বিন সংখ্যা "ভারতবর্ষ" ভাদ্রের ৩য় সপ্তাহে এবং কার্ত্তিক সংখ্যা আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ৫ই ভাদ্রের মধ্যে আশ্বিনের এবং ২৫শে ভাদ্রের মধ্যে কার্ত্তিকের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইবেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাণ্ডুলিপি না পাইলে বিজ্ঞাপন ছাপা না হইবার সম্ভাবনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

পাকিস্তানস্থ গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

আমাদের পাকিস্তানস্থ গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা আমাদের কার্য্যালয়ে "ভারতবর্ষ"-এর চাঁদা পাঠাইতে বা জমা দিতে অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতঃপর ইচ্ছা করিলে ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর উল্লেখপূর্ব্বক The Asutosh Library, 78-6, Lyall Street, Dacca, East Pakistan—নিকট চাঁদা পাঠাইতে বা জমা দিতে পারেন। নূতন গ্রাহকগণ টাকা জমা দিবার সময় "নূতন গ্রাহক" কথাটি উল্লেখ করিবেন। ইতি— বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

লামবাদী গোপিনী

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

রেখা
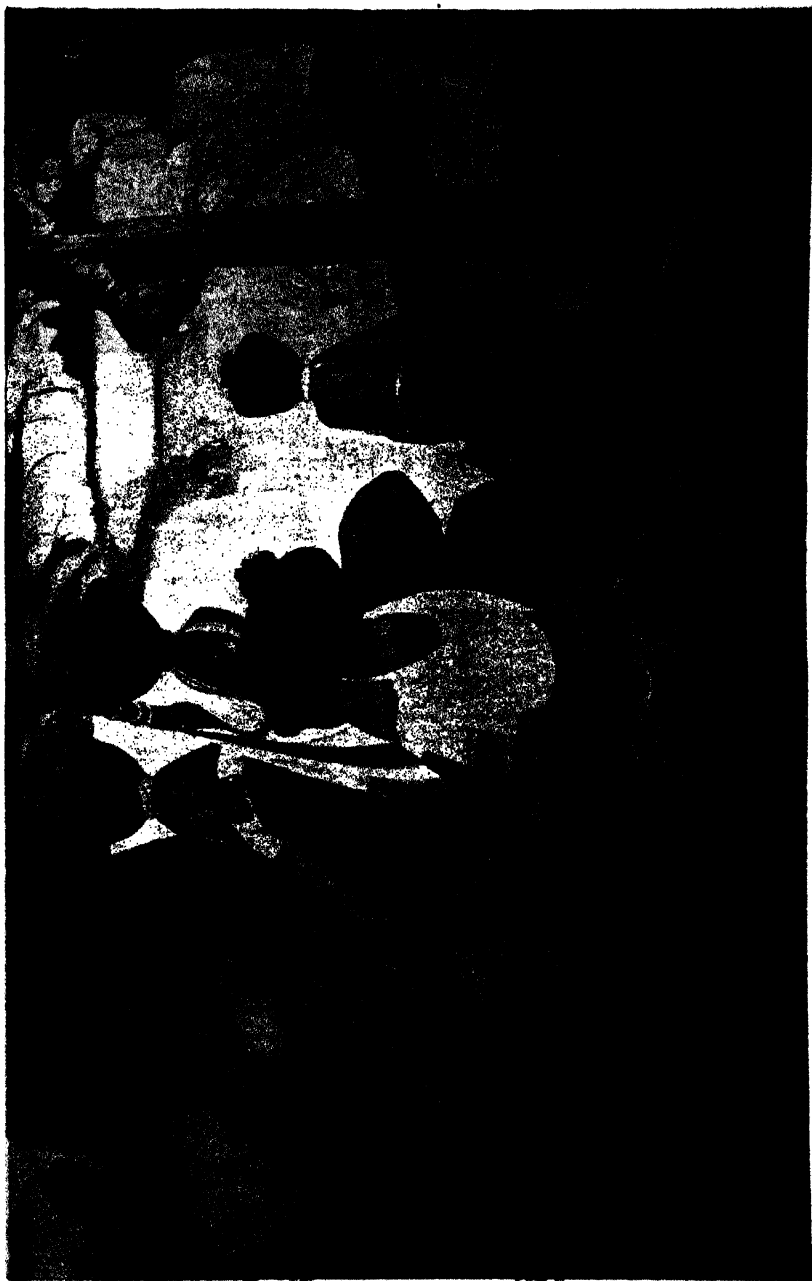
একেবারে তুলি দিয়া আঁকা

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

একান্ত অশান্ত হইয়া শান্তি খুঁজিতেছিল, আমি তোমাকে শান্তিলাভের উপায়স্বরূপ এই অষ্টমার্গ দেখাইয়া দিয়াছি। এই পন্থা অনুসরণ করিলে তুমি নিজেই সত্য দর্শন করিবে, আত্মদীপ হইবে, তোমার সব প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। তপোনির্ম্মল চিত্ত না হইলে কোন প্রশ্নেরই সত্য উত্তর পাওয়া যায় না এবং নিজের মনেই নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হয়, তা না হইলে কোন উপদেশই কার্য্যকরী হয় না।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আজকের যুগের পরিভাষায় দেখিলে তখনকার সামাজিক পরিবেশে বুদ্ধদেব যে কত বড় বিপ্লব আনিয়াছিলেন তা পরিমাপ করা যায়। বাস্তবনিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায় বৈশেষিক দর্শন, কনাদ, সাংখ্যে ও বৌদ্ধবাদে। এদের বলা হতো হেতুবাদী।

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এবচ
কপিলশ্চোক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ।

একজন সুপরিচিত লেখক বলিয়াছেন 'সমাজ জীবনে যাহা পাথেয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাহাই পথ—ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা, চেষ্টা করিতেন। আর এক দল হলেন 'মহাসঙ্ঘিকা'—যাঁরা নিজেদের টীকাটিপ্পনি দ্বারা বুদ্ধদেবকে করে তুললেন লোকোত্তর। দিগ্‌নিকায়ের ব্রহ্মজালসূত্রে বলা আছে যে বুদ্ধের জীবনান্তে 'কায়স্থভেদে'র পর, দেবতা ও মানুষ কেহই তাঁর দর্শন পাবেন না—তার তখন 'অপ্রমতিকা' ভাব non-comprehensible state, তিনি শুধু লোকোত্তর নন্, অরূপাতীত, অরূপ ব্রহ্মাতীত। এদিকে গড়িয়া উঠিল ত্রিপিটক, বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম্ম। এমন সময় ভারতের আকাশে এক পরম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের উদয় হইল—তিনি মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী অশোক—রুদ্ররৌদ্ররসিক চণ্ডাশোক নন্, কলিঙ্গবিজয়ের পর ধর্ম্মাশোক, রাজ্যজয়ে বিগতস্পৃহ। গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ রাজা প্রিয়দর্শীর অনুশাসনগুলি আজও কালের সীমানা পার হ'য়ে সাক্ষ্য দিচ্চে মহামানবের শিক্ষার ধারা। 'সবা মুনিষে পজা মম' অদস্থেন অসথেন বিজয়েৎ' 'পোরাণ পোকিতি'র শিক্ষা দিলেন তিনি—ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তরে গিরিদরী শৈলমালার ওপর থেকে এপারে। বল্লেন—ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করতে হবে, শিক্ষার,

বুদ্ধের শরণে

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু বরুত্তমং
বুদ্ধো যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।
নমো বুদ্ধায় গুরুবে
ধর্ম্মায় তারণে
সঙ্ঘায় মহত্তমায় চ।

জন্মমৃত্যুর চাকায় ঘুরতে ঘুরতে মানুষ পৃথিবীতে আসে, ছক্-কাটা পরিধির ধারে ধারে জীবনের গোনা দিনগুলি কাটিয়ে দেয়। হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, ওঠা পড়া, ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে চিরন্তনীর রথ চলে। তারই ভিতর অতর্কিতে একদিন নিত্যকালের সত্যমানুষ জেগে ওঠে, যে মানুষকে মাপা যায় না, যে মানুষ অপরিমেয়, যে মানুষ অপরাজেয়, যে মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ, যে মানুষ জাতবিদ্রোহী, অনবনমিতশির, নিঃশঙ্কবিজয়ীবীর, মরণকে যে মানেনা, পরাভবকে যে ডরে না—দ্বিধাহীন, ক্লান্তিহীন, পরিপূর্ণপ্রাণ, বীর্য্যবান, যে মানুষ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেনেয়, স তপোহতপ্যৎ, যে মানুষ রাত্রির তপস্যায় বসে উদয় দিগন্তের সন্ধানে। চলোর্ম্মি ইতিহাসের ত্রিস্রোতা যখনই অবরুদ্ধ হয়, পঙ্কিল হয়, জটিল জটাজালে জড়িত হয়, আবার বিচার বাহ্যানুষ্ঠানের অচলায়তনে নির্ব্বিষ নির্বীর্য্য হয়ে ওঠে, তখনই যুগে যুগে ধরিত্রীর শত পতিত অবজ্ঞাত অখ্যাতকে প্রাণের পাবন শিখায় জলন্ত করে তোলবার জন্য আবির্ভূত হন দেবতার দীপ হাতে মহামানবরা—'সম্ভবামি যুগে যুগে'—দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে—ঐ মহামানব আসে'। তাঁরা নিয়ে আসেন মুক্ত দীপ্ত দৃপ্ত জীবনের সন্ধান, মহতী আশার বাণী—কানে দেন অভয় অশোক মন্ত্র। পৃথিবীতে দেবদত্তের মত লোকের অভাব নেই। সামান্য পাখীও তাদের তূণীরের তীর থেকে রক্ষা পায় না। পথে ঘাটে

নয়, সদর্থক—এ নির্ব্বাণ নেতিবাচক্ নয়, ইতিবাচক—এ মুক্তি কর্ম্মত্যাগ নয়, সাধুকর্ম্মের মধ্যে আত্মত্যাগে, শুধু রাগদ্বেষবর্জ্জনে নয়, অপরিমেয় মৈত্রী সাধনায়। এ তপস্যা শুধু 'ইহাসনে শুষ্যতুমে শরীরং' বলে ত্বক অস্থি মাংস মেদের উৎসর্গে নয়, এ তপস্যা সম্বোধির জন্য—ঘনান্ধকারের মাঝে আলোর জন্য—কোথায় আলো, কোথায় আলো—দীপ জ্বালো, দীপ জালো—আত্মদীপোভব। জ্ঞানের প্রদীপ অন্ধ তমিস্রাকে দূর করে দীপান্বিতা করুক সমস্ত সত্তা। অন্তরের পূর্ণিমা ঝলমল করে বাইরের আকাশভরা পৌর্ণমাসীর সঙ্গে মিলে মিশে অপরূপ হবে, তাইতো পূর্ণিমাই বোধির দিন। ফুটে উঠবে অন্তরে বাহিরে আলোর শতদল। তখনই সবাইকে ডেকে বলবার দিন—শরণ লও সেই বোধির, সেই জীবন-বেদের, সেই সঙ্ঘ শক্তির—আমি জেনেছি, আমি অরিহন্তা, মারকে জয় করেছি—ভয় নেই, পথ আছে—আর্য্য অষ্টমার্গ ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন, শীলের অনুশীলন—শুধু চাই সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যগ্ সংকল্প, সম্যগ্ বাক্, সম্যগ্ কর্ম্মান্ত, সম্যগ্ জীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যগ্

বর্ষাগমের মেঘছায়া পড়িয়াছে দেখিয়া পরমকারুণিক জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হইয়াছে সারিপুত্র। তিনি উত্তর দিলেন—প্রভু আপনি ত শুধু বলিলেন, অষ্টমার্গ অনুসরণ করো, সেগুলি ত কয়েকটি নীতিসূত্র মাত্র, অধ্যাত্ম জগতের কোন তথ্য তাতে পরিস্ফুট নয়, আত্মা কি, তাহার সহিত দেহের কি সম্বন্ধ, দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মার কি গতি হয়, অনুপরমাণু কিসে লীন হয়, বিদেহী আত্মার অবস্থান কোথায়, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তিনি আছেন কি নেই এসব কোন প্রশ্নেরই ত আপনি মীমাংসা করিলেন না—

ভগবান হেসে উত্তর দিলেন—দেখো একজনকে কে শরাহত করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে, অপর একব্যক্তি তাহার হৃদয় হইতে সেইটি তুলিয়া ফেলিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন যদি শরবিদ্ধ লোকটি বলে যে—আগে উত্তর দাও এই বাণটি উত্তর পূর্ব্ব পশ্চিম বা দক্ষিণ কোন দিক হইতে আসিয়াছে, কোন ব্যাধ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য উহা সন্ধান করিয়াছে তবে তোমাকে উহা তুলিতে দিব তোমার প্রশ্নও সেই অবোধ ব্যক্তির মত। তোমার চি

একান্ত অশান্ত হইয়া শান্তি খুঁজিতেছিল, আমি তোমাকে শান্তিলাভের উপায়স্বরূপ এই অষ্টমার্গ দেখাইয়া দিয়াছি। এই পন্থা অনুসরণ করিলে তুমি নিজেই সত্য দর্শন করিবে, আত্মদীপ হইবে, তোমার সব প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। তপোনির্ম্মল চিত্ত না হইলে কোন প্রশ্নেরই সত্য উত্তর পাওয়া যায় না এবং নিজের মনেই নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হয়, তা না হইলে কোন উপদেশই কার্য্যকরী হয় না।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আজকের যুগের পরিভাষায় দেখিলে তখনকার সামাজিক পরিবেশে বুদ্ধদেব যে কত বড় বিপ্লব আনিয়াছিলেন তা পরিমাপ করা যায়। বাস্তবনিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায় বৈশেষিক দর্শন, কনাদ, সাংখ্যে ও বৌদ্ধবাদে। এদের বলা হতো হেতুবাদী।

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এবচ
কপিলশ্চোক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ।

একজন সুপরিচিত লেখক বলিয়াছেন 'সমাজ জীবনে যাহা পাথেয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাহাই পথ—ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা, আর্য্য অষ্টমার্গ, ইন্দ্রিয় লালসারও নয়, ইন্দ্রিয় সংহারেরও নয়, ভোগ ও ত্যাগের জীবননিষ্ঠ মধ্যপথই সাধারণ মানুষের সাধ্য। তাই গড়ে উঠেছিল যাহাকে বলা হইয়াছে সমন্বয়-সন্ধানী সমাজ চেতনা এবং তার প্রকাশ হইয়াছিল তিনদিকে (১) এক কেন্দ্রাভিমুখী সংঘটন a centralised organisation (২) এক জনসমন্বয়ী ব্যবস্থা a socialised synthesis (৩) এক জীবন নীতির নির্দ্দেশ a code of Ethics.'

এই জীবন-বেদকে স্বীকার করিয়া লইলে ভগবান আছেন কি নেই, এই প্রশ্ন হয় অবান্তর। তিনি আরণ্যিকের ভ্রান্ত দুঃস্বপন না মহান্ প্রভু বৈ পুরুষ অনাদি, অব্যয় ক্ষর, অক্ষর হিরণ্যগর্ভ, প্রেমের ঠাকুর—একে বিচার বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করবার দরকার হয় না। সত্যপথের সন্ধান পাইলে, সম্যক্ অনুভব হইলে সমস্ত প্রশ্নেরই আপনি মীমাংসা হইয়া যায়।

শাস্তার পরিনির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ হয়। একদল যাঁদের বলা হইত "থেরাবাদিন্" তাঁরা বুদ্ধের অনুশাসনগুলি কায়মনোবাক্যে পালন করিবার চেষ্টা করিতেন। আর এক দল হলেন 'মহাসঙ্ঘিকা'—যাঁরা নিজেদের টীকাটিপ্পনি দ্বারা বুদ্ধদেবকে করে তুললেন লোকোত্তর। দিগ্‌নিকায়ের ব্রহ্মজালসূত্রে বলা আছে যে বুদ্ধের জীবনান্তে 'কায়স্তভেদে'র পর, দেবতা ও মানুষ কেহই তাঁর দর্শন পাবেন না—তার তখন 'অপ্পন্নত্তিকা' ভাবং non-comprehensible state, তিনি শুধু লোকোত্তর নন্, অরূপাতীত, অরূপ ব্রহ্মাতীত। এদিকে গড়িয়া উঠিল ত্রিপিটক, বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম্ম। এমন সময় ভারতের আকাশে এক পরম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের উদয় হইল—তিনি মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী অশোক—রুদ্ররৌদ্ররসিক চণ্ডাশোক নন্, কলিঙ্গবিজয়ের পর ধর্ম্মাশোক, রাজ্যজয়ে বিগতস্পৃহ। গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ রাজা প্রিয়দর্শীর অনুশাসনগুলি আজও কালের সীমানা পার হ'য়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে মহামানবের শিক্ষার ধারা। 'সবা মুনিষে পজা মম' অদস্তেন অসথেন বিজয়েৎ' 'পোরাণ পোকিতি'র শিক্ষা দিলেন তিনি—ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তরে গিরিদরীশৈলমালার ওপর থেকে এপারে। বল্লেন—ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করতে হবে, শিক্ষার, সেবার, ধর্ম্মের শরণ লও—যে ধর্ম্ম মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, দৃষ্টি দেয়, সৃষ্টি করে, যা মানুষকে দেয় শক্তি, প্রাণ, তেজ, বীর্য্য, সম্ভ্রম, মনুষ্যত্ব, যার জন্য চাই সেবা, সংযম, বচগুপ্তি। ব্রাহ্মণরা গালাগালি দিলে যে তিনি মোহাত্মা, বুদ্ধদেবকে বলা হলো 'বৃষল', কিন্তু সত্যের জয়রথ তাতে থামলো না। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—'চলে গেছ আজ তুমি মহারাজ, রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে টুটে' কিন্তু আমাদের হৃদয় সিংহাসনে আজও তিনি মহারাজ। H. G. Wellsএর কথা মনে পড়ে "Amidst the tens and thousands of name of monarchs that crowd the columns of History, their majestics, graciousnesses and Serenities royal highnesses and the like, the name of Asoka shines almost alone like a Star"

এই প্রেমাভিযান শুধু চণ্ডাশোককেই ধর্ম্মাশোক করেনি, কত উপালি উদ্ধার করলে, কতো শ্রীমতীকে, কত আনন্দকে পথ দেখালে কত চণ্ডালিনীকে, কত ব্রাহ্মণ

কত শূদ্র, কত পাপী তাপী উদ্ধার পেয়ে গেলো ত্রিশরণের মন্ত্র নিয়ে। ডাইনে বামে ছন্দ নামলো নবজনমের মাঝে, বন্দনা গিয়ে মিশলো সঙ্গীতে ভঙ্গীতে, রূপে অরূপে, মন্দিরে মূর্ত্তিতে 'ক্রোতস্যক্রোতম'।

অশোক বৈভাজ্যবাদীদের অর্থাৎ যারা সূত্রগুলিকে বিচার বিতর্ক করে গ্রহণ করতেন তাদেরই বেশী আদর করতেন। কিন্তু মূল বুদ্ধবাণীকে অবলম্বন করে নানা মতবাদের সৃষ্টি হতে থাকে। এলেন অশ্বঘোষ শূণ্যবাদী, নাগার্জ্জুন লিখলেন বিভাষ, 'সিদ্ধনাগার্জ্জুন কক্ষপুটে' হলো তান্ত্রিক বৌদ্ধের সাধনার ইতিহাসের সুরু, এলেন আর্য্যদেব, সম্রাট কনিষ্ক, মিলিন্দ, স্থবির মৈত্রেয় নাথ, বিজ্ঞান বাদ, যোগাচারবাদ, সর্ব্বাস্তিবাদ, মহাসুখবাদ, বজ্রযান, মহাযান, বোধিসত্ত্বযান, হীনযান, পরিমিত ন্যায়, মন্ত্রন্যায় প্রভৃতি।

আর্য্যদেব বল্লেন :

"নাহি সূর্য্য, নাহি চন্দ্র নাহি গ্রহ নক্ষত্র নিকর
নাহি তৃণ তরুলতা নদনদী পর্ব্বত প্রান্তর
শূণ্য শূণ্য মহাশূণ্য.........
নাহি জন্ম নাহি মৃত্যু ইহলোক নাহি পরলোক
স্বপ্ন সম শূণ্য সব মরীচিকা সম কার তরে করিতেছ
শোক

কে তোমার প্রিয়জন? কার তরে কর অশ্রুপাত
কে মারিল? কে মরিল? কে করিল কারে অস্ত্রাঘাত
ছিন্ন হোক্ মোহবন্ধ সব মিথ্যাদৃষ্টি হোক তিরোহিত
মহাব্যোম সমান শূণ্যতা, শঙ্কেশিব প্রপঞ্চ অতীত
(প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯)

মিলিন্দ প্রশ্নেও এই সমস্যা—ভদন্ত নাগসেন তিনিই—তিনি? না অন্য কেউ? স্থবিরের উত্তর হইল—নচ সো, নচ অজ্ঞ ক্রোতি তিনিও নহেন, অন্যও নহেন। প্রথম প্রহরে যে দীপ জ্বালানো হয় শেষ প্রহরে তার যে শিখা সে শিখা কি প্রথম প্রহরের প্রদীপের অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা শূণ্যবাদীদের বেদ বিশেষ—তাঁরা নির্ব্বাণকে করিলেন অনির্ব্বচনীয়—এমন একটা কিছু যাকে ব্যক্ত করা যায় না—এ শুধু নেতি নয়, সম্পূর্ণ ইতি বাচক্। এই সব মতবাদের মহাসাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলেন সদ্ধর্ম্মীরা—তর্ক হতে লাগলো নির্ব্বাণ কার জন্য, নিজের জন্য না সবার জন্য। মুক্তি-লাভের আশায় দেবতাদের ও শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া অনেকে মনে করিতে লাগিলেন। শক্তি মানেই বিভূতি, বিভূতি মানেই ক্ষমতা। কেউ বলেন—'রসবন্ধং দদস্ব মে' রসকে বাঁধবো—রস মানে পারদ না উপনিষদের রস—না শক্তির সাধনা জানিনা—এই শক্তি লাভের চেষ্টাতেই তান্ত্রিকতার জন্ম। এলেন তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, হেবজ্র। আচার্য্য পদ্মসম্ভব গেলেন তিব্বতে। তন্ত্রের নাম হ'লো সেথায় ধ্বাগযুগ। গুরু সম্প্রদায় জেগে উঠলো, প্রহ্লাদানন্দ নাথ প্রভৃতি, দূতীরাগ, যোগিনীসাধন চারিচন্দ্রসাধন প্রভৃতি। কিন্তু তখনও প্রাচীন আদর্শের প্রতি ভক্তি লুপ্ত হয় নাই। কারন্ডব্যূহ নামক মহাযানসূত্রে দেখি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর করুণামহার্ণব রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। বলা হইতেছে এবম্ ময়া শ্রুতম এই রকম শুনিয়াছি যে, একদিন ভগবান জেতবনে বিহার করিতেছিলেন এমন সময় এক অপূর্ব্ব আলোকে সারা বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, শিষ্যেরা সবাই জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভু এই আলো কোথা হইতে আসিতেছে—ভগবান উত্তর দিলেন যে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর অবীচি নরকে অধোমুখসত্ত্ব পাপীতাপীদের উদ্ধারের জন্য গমন করিতে-ছেন। ঐ কারণ্ডব্যূহের দ্বিতীয় অংশে দেখি, বোধিসত্ত্ব মহাদেব ও উমাকে সদাক্ষরী বিদ্যাদান করিতেছেন এবং মন্ত্র দিচ্ছেন 'ওম্ মণিপদ্মে হুম্—ওম্ শূলে শূলে শূণ্যে স্বাহা। তাদের মতে (The Indian Historical quarterly vol XXIV no 4) আদি বুদ্ধ ছিলেন স্বয়ম্ভু, তারপর এলেন অবলোকিতেশ্বর। অবলোকিতেশ্বর হচ্চেন জ্ঞানের ও ধ্যানের চরম বিকাশ (Highest point of meditation) এবং তাই থেকে এলেন সূর্য্য চন্দ্র ব্রহ্মা নারায়ণ, সরস্বতী, তারা, প্রজ্ঞা প্রভৃতি। এই হতে দেখা যায় যে বুদ্ধ ক্রমশঃ স্বয়ম্ভু ভগবানে পরিণত হয়ে গিয়েছেন—যে দেবতাকে তিনি নিজে স্বীকারও করেনি, অস্বীকারও করেন নি—সেই পরম দেবত্বে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের তত্ত্বরূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত। নির্ব্বাণের জন্য লোকে ততটা কাতর নয়,

ভক্তেরা চায় সিদ্ধি, তারা চায় শক্তি। তিব্বতে, নেপালে, কামরূপে, পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত মহাযানী বজ্রযানী বৌদ্ধতান্ত্রিকতাবাদ নিয়ে এসেছিল আচার অভিচার! ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রায় শেষ ইতিহাস কিছুটা তান্ত্রিকতার মধ্যেই, কিছুটা বৈষ্ণব আগমে, কিছুটা সহজিয়া, আউলবাউল নাথেদের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে গেল।

ভগবান তথাগতের বাণী কিন্তু সেইখানেই আত্ম-গোপন করে নাই। তাঁর পুণ্য আবির্ভাবের সময় হতেই এই অমৃত মন্ত্র ভারতের শ্রমণ, ভারতের নাবিক, ভারতের পথিক, ভিক্ষু ভিক্ষুণী পথে পথে দেশদেশান্তরে বহন করে নিয়ে গেছে—তারা গেছে মরুকান্তার গিরিদরীসমুদ্র লঙ্ঘন করে গান্ধার হতে জলধিশেষ। এই বৃহত্তর মহাভারতে অমেয় প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঃ

"পদ্মাসন্ রয়েছে স্থির, ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাচীন চিরদিন
মৌন যায় শান্তি অন্ত হারা, বাণী যার সকরুণ সান্ত্বনার ধারা"

ভারতবর্ষ বর্ম্মে বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া শূলশল্যভল্ল লইয়া রণতরী সাজাইয়া দিগ্বিজয়ে যায় নাই, সে গিয়াছিল কৌপীনবস্ত্র হইয়া দণ্ডকমণ্ডলু হাতে। তিব্বত, চীন, জাপান, দ্বীপময় ভারত, শ্যাম, সিংহল, চম্পা, কাম্বোডিয়া খোটান সর্ব্বত্র আজও সেই পুণ্য শরণ আকাশে বাতাসে ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত। এ যাত্রা প্রেমের, এ যাত্রা মৈত্রীর, এ যাত্রা জপমালাধৃত গৈরিক কাষায়বস্ত্র-পরিহিত মানুষের, যার শেষ প্রকাশ মহাত্মাজী—এ যে কতো বড় অভিযান্, কতো মধুর, কতো উদার, কতো বিরাট, কতো মর্ম্মস্পর্শী,তার একটি পাথুরে প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

প্রায় আটশো বছর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল রাজা অলংসিথু। তিনি পাগানে আনন্দ-মন্দিরে প্রস্তরফলকে পালিভাষায় যে প্রার্থনাগীতি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা আন্তরিকতায় ও ভাবসম্পদে অপূর্ব্ব। চার হাজার বছর পূর্ব্বে প্রাচীন ইজিপ্টের সম্রাট্ ইখ্‌নাটোনের সূর্য্যস্তোত্র আমরা পড়িয়াছি Breasleadএর Dawn of Conscience নামক পুস্তকে। রাজার প্রার্থনা বা King's prayer বলিয়া তাহা অভিহিত। পৃথিবীর আর এক প্রান্তে হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসকে পিছনে ফেলে এসে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক আর এক নরপতির আকুল প্রার্থনা আজও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। বর্ম্মা রিসার্চ্চ সোসাইটির ১৯২০ সালের পত্রিকায় অধ্যাপক পে মংটিন্ ও অধ্যাপক লুস্ এই Shwegngyi Pagoda Inscriptionটি সুধী ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে আনেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রেঙ্গুন শাখার তৎকালীন সহসম্পাদক শ্রীযুক্ত পরেশপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় "সুবর্ণভূমি" পত্রিকার মারফৎ এই প্রশস্তিটি আমাদের গোচরে আনেন। রাজা মন্দিরটি সদ্ধর্ম্মীদের দান করিয়া বলিতেছেন—

"এ দানের পুণ্যফল চাহি শুধু আমি
সর্ব্বজীবহিত ; অন্তরে কামনা যত
সবারি অন্তরতম এ মোর কামনা!
যেই মহাপুণ্য আজি করিনু অর্জ্জন
বিনিময়ে তার, এ জন্ম কি জন্মান্তরে
নাহি চাহি কভু ব্রহ্মলোক, সুরলোক
কিম্বা মারলোক, যত অমর বৈভব
হীরামুক্তামণিময় রাজার মুকুট
একচ্ছত্র ধরণীর রত্ন সিংহাসন—
নহে নহে কাম্য মোর ; বুদ্ধ শিষ্যপদে
যে গৌরব তাও নাহি চাহি। আমি চাই
সংসার নদীর বক্ষে বাঁধিবারে সেতু
যে পথে অনন্তকাল যাবে পরপারে
আনন্দধামের যাত্রী! সেই সেতু বেয়ে
যাব আমি লয়ে বিশ্ববাসী জনে
সংসার সমুদ্র স্রোতে ডুবিছে অতলে
তুলে নেব সবাকারে—আমি চাই
আপনি সংযত হয়ে, অসংযত জনে
শিখাই সংযম ; সান্ত্বনার বাণী লভি
আপন অন্তরে শোনাই তা জনে জনে
সান্ত্বনা পায়নি যারা! অভয় বিতরি
ভীতজনে—আপনি জাগিয়া
সুপ্ত জনে করি জাগরিত—শান্ত করি অন্তরের
দাবাগ্নি দাহন, নিভাই পরের জ্বালা
হিংসার ঝটিকা যত দিই থামাইয়া।
সৃষ্টির আদিম পাপ লোভ হিংসা মোহ

মোর চিত্ত মাঝে হোক্ তারা অঙ্কুরে বিনাশিত।
রূপে রসে শব্দে আর গন্ধে পরশনে
ইন্দ্রিয়ের সুখস্পৃহা—দূর হোক আজি।
নরলোকে শ্রেষ্ঠ যিনি, যে মহামানব
ত্যজিলেন রাজৈশ্বর্য্য যশের গৌরব
তুচ্ছ ধূলিকণাসম, ঠিক সেই মত হায়
আমারো বাসনা ত্যজি যাই বহু দূরে
ধর্ম্মের আশ্রয় আশে ত্রিরত্ন শরণে।
আজি হতে আমি চাই ধর্ম্মের বিধান
মানব মঙ্গল তরে—ছোট বড় সবি
যেন সম শ্রদ্ধাভরে করিগো পালন।
দীক্ষিত ত্যাগের মন্ত্রে বোধিতত্ত্বসুধা
নিত্য করি পান। মুক্ত হোক মোর কাছে
সূত্র অভিধর্ম্ম আর বিনয়ের দ্বার।
মানুষের ব্যথা হেরি সর্ব্বশক্তি দিয়ে যেন
করি প্রতিকার
অন্তহীন কালসিন্ধু আবর্ত্তন মাঝে
ঘুরিতেছে গ্রহ তারা দেব নর যত
মুক্ত করি সবাকারে হেন শক্তি চাই।

যে প্রার্থনা সেদিনকার এই নগণ্য নরপতি করেছিলেন, তার ভগ্নাংশও কি আমরা আজ এই বিংশশতাব্দীর আণবিক বিজয়রথদৃপ্ত বিজ্ঞানের যুগে বলতে পারি। আমরা কি বলতে পারি

সর্ব্ব পাপস্স অকরণং কুশলস্স উপসম্পদা
সচিত্ত পরিশোধনং এতং বুদ্ধানুশাসনং

সকল প্রকার পাপবর্জ্জন, কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান, চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন।

অভিত্থরেথ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে
দন্ধং হি করাতো পুঞ্ঞ এতং পাপস্মিং রমতী মনো

কল্যাণলাভের জন্য তোমরা অতি ত্বরায় ধাবমান হও, পাপ হইতে মনকে নিবৃত্ত করো, আলস্যের সহিত পুণ্য কর্ম্ম করিলে মন পাপে নিরত হইয়া থাকে

যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্‌ঠী ন সমতি বিজ্ঝতি
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতি বিজ্ঝতি

যে গৃহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত তাহাকে ভেদ করিয়া যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না—যে চিত্ত সুভাবনাযুক্ত তাহাতেও সেইরূপ আসক্তি প্রবেশ করিতে পারে না।

যথাপি রুচিরং পুপফং বন্নবন্তং আগন্ধকং
এবং সুভাষিতা বাচা অফলা হোতি কুব্বতো

যেমন সুন্দর বর্ণযুক্ত পুষ্প গন্ধহীন হইলে নিষ্ফলা হয় তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য কার্য্যে পরিণত না হইলে নিষ্ফল হয়।

অক্কোধেন জিনে কোধং
অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ং দানেন
সচ্চেন অলিক বাদিনং

ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা জয় করিতে হয়, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা, মিথ্যাবাদীকে সত্যের দ্বারা।

আজ এই শরণেরই কামনা করি যা আমাদের কর্ম্ম-বিমুখ করিবে না, রাজসিকতায় মত্ত করিবে না, তামসিকতায় লিপ্ত করিবে না, সাত্ত্বিকতায় অহংকৃত করিবে না। শরণ লবো সেই বাণীর—যে বাণী সকলের, যে বাণী পৃথিবীর, যে বাণী কাহাকেও দূরে রাখে না, বর্জ্জন করে না, যে বাণীর মহাসাগরে যুক্ত হয়েছেন সব দেশের সব মণীষীরা, সমস্ত তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা নীচতার উর্দ্ধে যে বাণী, যেখানে কোন বিরোধ নেই, বিবাদ নেই, বিতণ্ডা নেই—মা মা হিংসা বলে যে মন্ত্র ভারতের গভীর সত্তায় যুগে যুগে জাগ্রত ভগবানকে ডেকেছে সেই বুদ্ধেরই শরণ লইলাম, মাথা নত করি সেই ধর্ম্মের কাছে, আশ্রয় চাই সেই সঙ্ঘ-শক্তির কাছে, সেই শরণই জয়যুক্ত হোক্। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সনাতন সত্য ভারতবর্ষের মুক্তিমন্ত্র ত শুধু ফ্রীডম্ নয়, এ মুক্তি কর্ম্মের বাসনা, জনসংঘের আঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি"—

এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব সব মানুষের জন্ম সার্থক করেছিলেন আজ—

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অমৃত বাণী
শান্ত হে মুক্ত হে হে অনন্ত পুণ্য
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্ক শূন্য।

জনমত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(১)

মোড়ের মাথায় কেষ্টঠাকুরের দোকান—

জি-টি-রোড হইতে যে রাস্তাটা এই শিল্পাঞ্চলের গ্রামে ঢুকিয়াছে তাহারই মোড়ে ছোট্ট দোকান। দোকানের কোন খ্যাতি নাই কিন্তু প্রাধান্য আছে। বালক বৃদ্ধ, ধনী নির্ধন সকলেই এই দোকানে বসিয়া আড্ডা দেয় এবং গলির মোড়ে বলিয়া এইস্থানে গ্রামের বা কলিকাতার শেষ সংবাদ পাওয়া যায়—এটি গ্রামের রয়টার অফিস্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেষ্টঠাকুরটি ক্ষুদ্রকায়, অপ্রিয় সত্যবাদী, কিন্তু ব্যবহারে ভদ্র ও রসিক। তাঁহার সবচেয়ে বড় ক্ষমতা যে, সব রকম লোকের সহিত তিনি একই রকম নৈকট্যের সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন।

গ্রামের অধিবাসীদের বেশীর ভাগ চট্‌কলের চাকুরিয়া, না হয় কলিকাতার ডেলি-প্যাসেঞ্জার। তাঁহারা বৈকালে বা সন্ধ্যার পর আসেন এবং গ্রামস্থ নিষ্কর্ম্মা যুবকগণ বাকী সময়ে ঠাকুরের দোকানে আড্ডা দেয়।

ঠাকুর দোক্তাযুক্ত পানে গাল ফুলাইয়া তর্জ্জনীর মাথায় চুণ লইয়া বসিয়া থাকেন এবং মাঝে মাঝে মিষ্ট তিক্ত কথায় নানারূপ টিপ্পনী দ্বারা হাস্যরস পরিবেশন করেন।

সুতরাং ঠাকুরের দোকানটি কেবলমাত্র রয়টার অফিস নয়, তা গ্রামের ক্লাবও বটে।

যাঁহারা এই ক্লাবের নিয়মিত সভ্য তাদের মধ্যে নিষ্কর্ম্মা যুবক—বটু, বাদলা, ল্যাটা, মণি এবং গ্রামস্থ জমিদার বাবুদের বাড়ীর—ভূতো, পটলা, শচীনবাবু, সতীশবাবু ও পাঁচুবাবু প্রধান। বলা বাহুল্য ইঁহাদের সকলেই একবয়সী নয়, বালক হইতে প্রৌঢ় সবই আছেন।

সেদিন সকালে বটু বাদলা মণি পটলা ও শচীনবাবু বসিয়া নূতনতম সিনেমা ছবির আখ্যানভাগ, সঙ্গীত অভিনয় প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীর ও গূঢ় গবেষণা করিতেছিল। পটলার হাতে নট-নটীগণের ছবিযুক্ত একখানি মাসিক পত্রিকা—সে তাহা হইতে কি একটা পড়িয়া শুনাইলেঠাকুর বিশেষ সুরে—হ্যাঁ-হ্যাঁ—বলিয়া উঠিলেন। কথাটা অর্থবোধক, তাই সকলে হাসিল। এই হ্যাঁ হ্যাঁ—টিপ্পনীটি ঠাকুরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—তাহা নানা অর্থে নানা ভাবে প্রায়শঃই পরিবেশিত হয়।

একটি ভদ্রলোক গেঞ্জি গায় দিয়া রাস্তার অপর পারের দোকান হইতে তেল ডাল প্রভৃতি কিনিয়া লইয়া যাইতেছিল। শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন—লোকটা কে হে? নতুন দেখছি—

পটলা বলিল—ঐ ত নবীনবাবুদের ভাড়াটে—রেফুজি বাঙ্গাল।

—কোন বাড়ীটা?

—ওই ত ভিয়েন বাড়ীটা, সেইটে ৩০৲ টাকায় ভাড়া নিয়েছে—

—তা হ'লে শাঁসালো আছে—কি করে?

বটু বলিল—তা জানি না, তবে ৯টা-১৫রয় রোজ ক'লকাতা যায়, আর বোধ হয় ৬টা ১৩'য় আসে—

মণি বলিল—লোকটা নাকি এম-এ শুনেছি।

শচীনবাবু কহিলেন—ধ্যোৎ, এম-এ পাশ লোকের চেহারা অমনি হয়—গেঞ্জিগায় দোকানে আসে—

ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন—তবে চেহারা কি রকম হয়—

পটলা বলিল—সেবার হরিদাস যখন ম্যাট্রিক পাশ ক'রলে, তখন সে গ্রামে কা'রো সঙ্গে কথাই ব'ল্‌তো না—পাম্পসু আর পাঞ্জাবী ছাড়া ঘর থেকেই বেরুত না—

মণি কহিল—তবে ত ওর মটকার জামা পরে বাজার করা উচিত—

শচীনবাবু মন্তব্য করিলেন—যতই বল ও চেহারায় এম-এ পাশ করা যায় না—বড় জোর ম্যাট্রিক—

পটলা কহিল—কিন্তু বাঙ্গাল যে!

ঠাকুর বাঙ্গাল, তিনি কহিলেন—তবে হ'তেও পারে বা—হ্যাঁ হ্যাঁ।

অর্থব্যঞ্জক হ্যাঁ হ্যাঁ শুনিয়া সকলে হাসিল—

আড্ডা চলিতে লাগিল—

ন'টার সময় দেখা গেল ঐ ভদ্রলোকই হন্ত-দন্ত হইয়া

ষ্টেসন পানে ছুটিতেছেন। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী, কিন্তু পরিষ্কার, চোখে চশমা। শচীনবাবু তাহার গমন লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—এখন ত চেহারাটা মন্দ দেখাচ্ছে না—

ঠাকুর কহিলেন—মানুষের মতই ত দেখাচ্ছে—

পটলা প্রতিধ্বনি করিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

ভদ্রলোক প্রসঙ্গেই নানা আলাপ আলোচনা চলিতেছিল, এমন সময় পাঁচুবাবু আসিয়া জলচৌকী দখল করিয়া বসিলেন—কহিলেন—কার কথা বলছ হে ?

পটলা বুঝাইয়া বলিল। পাঁচুবাবু কহিলেন—লোকটার সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে ট্রেণে। উচ্চশিক্ষিত এম-এ, রেফুজি—টালিগঞ্জে যায় রোজ।

পটলার সিনেমার ঝোঁক আছে, টালিগঞ্জ শুনিয়াই সে কহিল—ফিলিমে কাজ করে নাকি ?

পাঁচুবাবু বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—পথে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যে রকম আলাপ হ'ল তাতে সেই রকমই মনে হয়—

—তবে ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রতে হয়—

বাদলা বলিল—কি ক'রে ? বিদ্বান লোক, তার পরে হয়ত বড়লোকও—যখন ফিলিমে কাজ করে—আলাপ ক'রতে ভয় ক'রবে না ?

পটলা চিন্তিত হইয়া কহিল—তাই ত—কি করা যায়—ধোপ-দুরস্ত কাপড় জামা পরে যাবো—

কিছুদিন পরের কথা—

উক্ত ভদ্রলোক স্থানীয় একটা সভায় পৌরোহিত্য করিতে নিমন্ত্রিত হইলেন—এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়া ফেলিলেন।

ঠাকুরের দোকানে সমবেত সকলে সেইদিন সেই প্রসঙ্গের আলাপ করিতেছিলেন। পাঁচুবাবু জলচৌকীতে উপবেশন করিয়াছিলেন, অন্তের প্রশংসা শুনিয়া মন্তব্য করিলেন—বাঙ্গালদের ঐ গুণটা আছে, ভিটে মাটি বিক্রি করেও তারা পড়ে। আমাদের মত কেরাণী হয়ে ডেলি-পাষণ্ড হ'য়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে না—

ঠাকুর বাঙ্গালের প্রশংসায় সুর করিয়া কহিলেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

উপস্থিত অনেকে ঠাকুরকে বাঙ্গাল বলিয়া ঠাট্টা করিলেন, কেহ কেহ বলিলেন—ওদের জ্বালায় মাছ খাবার যো নেই, ইলিশমাছ চারটাকা হ'য়ে গেছে—

মণি বলিল—ঠিক, ওই ভদ্রলোক রোজ ক'লকাতা থেকে মাছ নিয়ে আসে—

তাহার পর কথাটা অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া গেল।

আরও কিছুদিন পরে ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত হইলেন এবং লোকটিকে সকলে মিশুক ও নিরহঙ্কার বলিয়া ধরিয়া লইল এবং আরও কিছুদিন পরে ঠাকুরের দোকানেও তিনি মাঝে মাঝে বসিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আর কাহারও সংশয় রহিল না যে, লোকটি শিক্ষিত এবং সত্যই নিরহঙ্কার ভদ্রলোক—নাম তাহার বীরেনবাবু।

বীরেনবাবু মাঝে মাঝে বসিলে পাকিস্থানের কথা উঠে, তিনি পাকিস্থান ত্যাগের ইতিহাস ও কারণ বর্ণনা করেন, অনেকে শোনে। কেহবা প্রশ্ন করে—পাকিস্থানে এখন ত গোলমাল নেই, আপনারা থাম্‌কা এলেন কেন ?

বীরেনবাবু হাসিয়া বলেন—সে আপনারা বুঝবেন না। অর্থের চেয়ে আদর্শকে যারা বেশী ভালবাসে, তারা এমনি ভুল করে।

কেহ বোঝে কেহ বোঝে না—কেহ না বুঝিয়াই হেঁ হেঁ করিয়া হাসে। বীরেনবাবু তাহার কথা বুঝাইবার চেষ্টা করেন এবং সেটা আন্তরিকভাবেই।

আর একদিনের কথা—

শচীনবাবু শীকার করিতে গিয়া একটি ঘুঘু মারিয়াছেন সেই কথা হইতেছিল—এমনি সময় বীরেনবাবু আসিয়া বসিলেন। শীকারের গল্প চলিতে লাগিল, পাখী হইতে শৃগাল নেউল, পরিশেষে ব্যাঘ্র শীকার।

ল্যাটা স্থানীয় একটি ব্যাঘ্র শীকারের কাহিনী ও শীকারীর মৃত্যু প্রসঙ্গে গল্প বলিয়া যখন শেষ করিল, তখন বীরেনবাবু কহিলেন—মাটিতে দাঁড়িয়ে শীকারীর গুলি করা ত ঠিক নয়, কোন অভিজ্ঞ লোকই তা করে না। ভদ্রলোক বোধহয় নতুন শীকারী—

—না না, তিনি বহু বাঘ মেরেছেন।

—তা হ'লে দুর্মতি হ'য়েছিল—নেহাত মরণ বুদ্ধি। আমি যাঁর সঙ্গে প্রথম শীকার করি তিনি দু'টি উপদেশ দিয়েছিলেন—একটী মাটিতে দাঁড়িয়ে গুলি না করতে

এবং আর একটি আহত বাঘের সাম্‌নে না যেতে। মাটিতে দাঁড়িয়ে গুলি করলে বিটারদের গায়ে লাগতে পারে, আর বাঘের প্রায়ই দুর্ব্বল অঙ্গ পাওয়া যায় না।

বীরেনবাবু একটি ব্যাঘ্র শীকারের কাহিনী বলিলেন, সকলে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া শুনিল। শচীনবাবু কহিলেন, —খেলাধূলোও ক'রতেন?

—হ্যাঁ, কিছু কিছু করেছি সব খেলাই, তবে ফুটবল ও ভলিটাই পারতাম ভাল।

পটলা কহিল—চলুন না, কাল ভলি খেল্‌বেন।

—এখন বয়স হ'য়েছে, তোমাদের সঙ্গে তাল রেখে খেলা ত হবে না। আচ্ছা উঠি, রাত্রি হল। বীরেনবাবু উঠিয়া গেলেন।

পটলা বিস্মিত হইয়া বলিল—লোকটার ত সবদিকেই বেশ আছে—লেখাপড়া, খেলাধুলো।

ল্যাটা কহিল—হ্যাঁ—গুল্ মেরে গেল কিনা তা কি করে জানবে?

পাঁচুবাবু কহিলেন—ভদ্রলোক, তার কথা অবিশ্বাস করে গুল বলাটা ঠিক নয়—

ল্যাটা প্রতিবাদ করিল—দেখুন না, যদি ভাল খেলতে পারে, তবে কুকুরের নামে নাম দেবেন।

পটলা কহিল—হ্যাঁ, দেখে শুনে বল—আগেই এ রকম বলা ঠিক নয়।

শচীনবাবু মন্তব্য করিলেন—গ্রামে এ রকম দু'চার জন শিক্ষিত উৎসাহী লোক থাকলে হয়ত ছেলেপুলেগুলি মানুষ হবে—

ল্যাটা বলিল—কি করে?

—শিক্ষিত লোক, তাদের দেখে উৎসাহ পাবে—উচ্চাকাঙ্ক্ষা হবে—

পটলা কহিল—শিক্ষা, দীক্ষা পেয়ে লাভ কি—বাড়ী গাড়ী ত শিক্ষিত কারও নেই—বরং কালোবাজার-টাজার ক'রতে শিখ্‌লে কাজ হ'তো—

ঠাকুর অনুনাসিক স্বরে স্বর করিয়া কহিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—লেখাপড়া শিখে আর মানুষ হ'ল কে?

(২)

প্রায় বৎসরাধিক পরের কথা—

বীরেনবাবু নিকটস্থ একটি স্কুলে মাষ্টারী আরম্ভ করিয়াছেন। পাকিস্থান হইতে যাহা আনিয়াছিলেন তাহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে এবং উদ্বাস্তদের সাহায্যকারী আফিসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। উপায়ান্তর না পাইয়া উদরান্নের জন্য মাষ্টারী লইতে হইয়াছে—টিউসনিও করিতে হয়—

ঠাকুরের দোকানে বসিবার সময় আজকাল প্রায়ই তাঁহার হয় না। রবিবার বা বন্ধের দিনে সন্ধ্যার সময় হয়ত একটু বসেন। পূর্ব্বে তিনি আসিলে পাড়ার যুবকদল আসন ছাড়িয়া বসিতে দিত, আজকাল তাহারা উঠেও না, বসিতেও বলে না। কেহ কেহ তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া করুণা করিয়া বলে—ব'সবেন নাকি বীরেনবাবু?

—না, না, তোমরা ব'সো।

তাহারা দ্বিতীয়বার বসিতে বলে না, বীরেনবাবুও বসেন না।

সেদিন ঠাকুরের দোকান সরগরম। বিশুবাবুর রাঁধুনী বামুনটি একটু ছিটগ্রস্ত, নিষ্কর্মা যুবকগণ তাহাকে রাগাইয়া খুব আমোদ উপভোগ করিতেছে এবং হোঃ হোঃ করিয়া দোকান ও রাস্তার মোড় মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে; ঠিক এমনি সময়ে বীরেনবাবু উপস্থিত হইলেন।

বিশুবাবুর বামুনটি তিরস্কার করিতে করিতে চলিয়া গেল, কিন্তু যুবকগণের উৎসাহ তবুও কমে নাই। বীরেন-বাবু একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করিলেন—লোকটি হয়ত মনে ব্যথা পায়—দরকার কি?

যুবকগণের মাঝে একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল—অর্থ সুপরিষ্কার—এখন বীরেনবাবুর পিছনেই লাগা যাক্।

পটলা বলিল—আচ্ছা বীরেনবাবু, আপনার সে সিনেমার বই কি হ'ল?

বীরেনবাবু কহিলেন—কি জানি, মামলা মোকর্দ্দমা হ'য়ে কি হয়েছে—

—খোঁজই রাখেন না?

—না, প্রয়োজনও নেই, সময়ও নেই—

ল্যাটা কহিল—আচ্ছা গত বছর রোজই আপনি সেজেগুজে কলকাতা যেতেন কি ষ্টুডিওতে?

—না, না—চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরতাম, তা জুটল না।

ভুতো প্রশ্ন করিল—আপনার ছাত্রেরা কি পাশ ক'রবে?

—কেউ ক'রবে, কেউ ক'রবে না—

—ছাত্র—ঐ শেতলা আপনার কাছে পড়ে বুঝি ?

—হ্যাঁ—

পট্‌লা কহিল—সে ত কলেজে পড়ে, সে আবার ওঁর কাছে পড়বে কি ? তাকে বাগালেন কি ক'রে ?

বীরেনবাবু অবাক হইলেন। ল্যাটা কহিল—ফেল ক'রবে বলেই ত পড়ছে !

ভয়ানক একটা রসিকতা হইয়াছে এমনি ভাবে সকলে হাসিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বীরেনবাবু ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বুঝিলেন সবই, কিন্তু কিছুই বলিলেন না—

ঠাকুর পান তৈয়ারী করিতেছিলেন, তিনি বীরেনবাবুর অসহায় মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—এই যে পান খান বীরেনবাবু !

বীরেনবাবু পানটী মুখে দিতে ঠাকুর বলিলেন—আপনি আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন ?

—একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছি—

—আমি কিন্তু হইনা। আমি জানি কিনা ?

—কি ?

ঠাকুর হাত ঘুরাইয়া কহিলেন—ওসব কিছু না—কিছু না—

আর এক দিনের কথা—

পাড়ার নির্ম্মলের সঙ্গে বীরেনবাবু আলোচনা করিতেছিলেন। নির্ম্মল একটা কিছু করিতে ইচ্ছুক, বীরেনবাবু তাই বলিতেছিলেন—এখানে যখন ইলেকট্রিসিটি আছে তখন একজোড়া ঘানিতে মাসে ২০০৲ টাকা, এমনি কি একটা খড়-কাটা কলে মাসিক ১৫০৲ টাকা হ'তে পারে—

বীরেনবাবু হিসাব করিয়া জিনিষটা প্রমাণ করিতেছিলেন, এমন সময় শচীনবাবু অফিস-ফেরৎ আসিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন—ট্রেন লেট্—কি হ'চ্ছে আজ বীরেনবাবু ?

ঠাকুর কহিল—ঘানি—খড়ের কল—

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন—বেশ আছেন, অযাচিত উপদেশে বীরেনবাবুর জুড়ি নেই।

বীরেনবাবু কহিলেন—তা একটু অযাচিতই দিচ্ছি—যদি এরা কিছু করে—

—আপনি কি ক'রলেন—এত থাকতে ৫০।৬০৲ টাকায় মাষ্টারী কেন করেন ?

বীরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন—মূলধনের মধ্যে দেহ ছাড়া যে কিছু নেই আর !'

শচীনবাবু এক টিপ নস্য লইয়া চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ বাদে পাঁচুবাবু, পটলা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত। গল্প চলিতে চলিতে শীকারের কথা উঠিল—পাঁচুবাবু কহিলেন—এক ফায়ারে ৬টার বেশী পাখী আমি কখনও মারিনি—তাই মেলে না—

ভুতো কহিল—কাকা সেবার এক ফায়ারে ২১টা পাখী মেরেছিল।

নানারূপ তর্ক চলিতে লাগিল—এক ফায়ারে কতপাখী মারা সম্ভব। পাঁচুবাবুর কথা ৮।১০টার বেশী মরিতেই পারে না। ভুতো বলে, সে চাক্ষুষ দেখিয়াছে ২১টা মরিতে। তর্ক যখন অনেকটা জমিয়া উঠিয়াছে তখন ঠাকুর কহিল—কেন বীরেনবাবু ত বাঘ-টাঘ মেরেছেন, ওঁর কাছে শোনো না—

ভুতো প্রশ্ন করিল—আপনার জীবনে কত বেশী মেরেছেন বলুন—

বীরেনবাবু নির্ব্বিকারভাবে বলিলেন—৪৮টা—অবশ্য চ্যাগা অর্থাৎ স্নাইফ—১০নং ছররায় মেরেছিলাম—

পাঁচুবাবু কহিলেন—ঐ রকমই বাঘ মেরেছেন বুঝি—একগুলিতে দশটা—

পটলা কহিল—সব গুল্—কামারের কাছে স্থচ চুরি ? বন্দুক ছুড়েছেন ত ?

কথাটা লইয়া হাসি ব্যঙ্গ চলিয়া যখন আসর একটু ঠাণ্ডা হইল তখন বীরেনবাবু কহিলেন—আপনারা আপনাদের জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা দ্বারা অন্যকে বিচার করেন—তার বাইরে সব মিথ্যা। কিন্তু সেটা এ দেশ নয়—আমাদের সে সব বড়বিলে কখনও কখনও এত পাখী পড়ে যে জল দেখা যায় না—তাতে চোখ বুজে গুলি করলেও ৫০টা পাখী পড়তে পারে !

—সে দেশটা কোথায় ?

—পূর্ব্ববঙ্গে—

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভুতো কহিল —আমাদের এখানে বিল কোথায় যে পাখী পড়বে— হাস্‌লেই ত হয় না—

পাঁচুবাবু কহিলেন—ঐ জন্যেই ত ছেলেরা আপনার পিছনে লাগে—

বীরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন—কেন? বলুন ত?

—আপনি বড্ড ছ্যাবলা, ওদের সামনে এসব গুল কি বলতে হয়! পাঁচুবাবু বিজয় গর্ব্বে হাসিয়া উঠিলেন।

বীরেনবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—ছ্যাবলা?

—হ্যাঁ, সকলের সঙ্গেই আপনি মেশেন—বসে গল্প করেন, তাতে ওরা মান্‌বে কেন আপনাকে— আপনার বয়স ও শিক্ষাদীক্ষার কথা ভেবে সংযত হয়ে থাক্‌বেন—

—সকলের সঙ্গে মিশবো না কেন? প্রতিবেশী, পাড়ার ছেলে—না মিশলেই সেটা অন্যায় ও অহঙ্কারের হবে— মিশতে হবে, তাদের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে—তাইত উচিত জানি—

—তাই ত ফলটা দেখছেন—

বীরেনবাবু একটু উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—সেজন্য নয় পাঁচুবাবু, কারণ জানি আমি।

বীরেনবাবু উঠিয়া চটি পায় দিতেছিলেন—পাঁচু বলিলেন—কারণটা কি?

—ওরা—মানে যাঁরা আমাকে অসম্মান করে, তারা শেখেনি কি ক'রে চল্‌তে হয়। অর্থাৎ যতটুকু শিক্ষাপেলে বৃদ্ধ বা মানীর সম্মান রাখা যায় ততটুকু শিক্ষা এরা পায় নি—যে অন্তর থাকলে অন্যের বেদনা বোঝা যায় সে অন্তর তাদের নেই—

বীরেনবাবু চলিয়া গেলেন। পট্‌লা কহিল—বাপরে অহঙ্কার! তবুও যদি মাষ্টার না হ'ত!

কেষ্টঠাকুর হাত নাড়িয়া কহিল—কিছু না!

—কি?

—লোক্‌টা কিছু না! বাড়ী নেই, গাড়ী নেই, নগদ টাকা নেই—কিছু না—

কি বুঝিয়া জানি না সকলে হাসিয়া উঠিল—ঠাকুর কহিলেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

(৩০)

বছর খানেক পরে—

বীরেনবাবুর ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তিনি কলিকাতার এক কলেজে বর্ত্তমানে অধ্যাপক হইয়াছেন এবং মামলা-বিড়ম্বিত সিনেমার ছবিখানা এতদিনে কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিয়া বেশ নাম করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাহিনীও বিক্রয় হইয়াছে। তিনি একটু জায়গা কিনিয়া বাড়ী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঠাকুরের দোকানে তাই বড় আসা হয় না—

ঠাকুরের দোকানে তেমনি আড্ডা চলিতেছে—পট্‌লা-ভুতোরা আছে, তাহার সঙ্গে পাঁচুবাবু ও তাঁহার শ্যালক দোকানে আসীন। কি একটা বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল। হঠাৎ একখানা মোটর মোড়ের উপর থামিল এবং বীরেনবাবু নামিয়া আসিলেন।

দোকানের নিকটবর্ত্তী হইয়া বীরেনবাবু কহিলেন— কী ঠাকুর ভাল?

—আছি একরকম। খোঁজত নেন না—

—সত্যিই সময় পাই না ভাই, পেটের দায়ে ঘুরতে হয় —তবুও প্রডিউসারের গাড়ীতে এসে পৌছেছি আটটায়। পট্‌লা সসম্মানে জলচৌকীটা ছাড়িয়া দিয়া কহিল—বসুন, বীরেনবাবু—

পাঁচুবাবু প্রতিধ্বনি করিলেন। বীরেনবাবু বসিয়া কহিলেন—দিন ঠাকুর, অনেকদিন আপনার হাতের পান খাই নি—

ঠাকুর পান দিলেন। অবান্তর একটু কথাবার্ত্তার পরে বীরেনবাবু চলিয়া গেলেন।

পাচুবাবু শ্যালককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন— লোকটাকে চেন?

—না। কে?

—'পথশ্রান্ত' দেখেছ লাইট-হাউসে?

—হ্যাঁ।

—তারই কাহিনী-কার।

শ্যালকটি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—সত্যি?

পটলা কহিল—শুধু তাই নয়, কলেজের প্রফেসর— কলকাতায়—

পাঁচুবাবু কহিলেন—বিদ্বান—জ্ঞানী—বিখ্যাত পুরুষ—

শ্যালকটি কহিল—অথচ এমনি দোকানে বসে গল্প ক'রে গেলেন—

—হ্যাঁ।

পাঁচুবাবু কহিলেন—তাই ত্যাখো। ছোকরারা কেরাণী হ'য়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, অথচ অত বড়লোক, কিন্তু যেমন নিরহঙ্কার তেমনি অমায়িক—

পটলা কহিল—সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার—আমাদের সঙ্গে পর্য্যন্ত—

কেষ্টঠাকুর হাত ঘুরাইয়া কহিল—কিছু না—যা ছিল তাই আছে—

পাঁচুবাবু কহিলেন—তার মানে—এ রকম অমায়িক লোক পাওয়া যায় না—

ঠাকুর কহিল—যখন মাষ্টারী ক'রত তখন ছ্যাবলা ছিল, সম্প্রতি সিনেমার টাকা পেয়ে অমায়িক হ'য়ে গেছে—

পটলা প্রতিবাদ করিল—না—না—

কেষ্টঠাকুর রমণীসুলভ ভঙ্গিতে ও সুরে, মেয়েলী কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

রাশি ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

সিংহ রাশি

যদি সিংহ আপনার জন্ম রাশি হয় অর্থাৎ যে সময় চন্দ্র আকাশে সিংহ নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন সেই সময় যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই রকম ফল হবে—

প্রকৃতি

আপনার মধ্যে অনুভূতি অত্যন্ত গভীর এবং আপনার সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় আপনার হৃদয় দিয়ে। সব রকম স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে আপনার মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রকাশ পায় এবং প্রীতির পাত্রের জন্য আপনি ত্যাগ স্বীকার করতেও পরাঙ্মুখ হন না।

আপনার মধ্যে বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় বেশ সুপরিণত, সেইজন্য ছোট বড় যে কোন জায়গাতেই হোক্ কর্তা, পরিচালক, নেতা অথবা দলপতি হ'য়ে থাকা আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়। আপনার মধ্যে যেমন উচ্চাভিলাষ বা প্রভুত্বপ্রিয়তা আছে তেমনি উদারতা ও বদান্যতারও অভাব নেই।

সৌন্দর্যের দিকে আপনার একটা সহজ আকর্ষণ আছে, কাজেই চিত্র সঙ্গীত কাব্য অভিনয় প্রভৃতি কলাবিদ্যার দিকে আপনার কম-বেশী ঝোঁক প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু এই সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিপথে চালিত হ'লে, আপনি অতিমাত্রায় ভোগী ও বিলাসী হ'য়ে উঠতে পারেন, সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। আহার-বিহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে সর্বত্রই আপনার সৌন্দর্যপ্রিয়তা লক্ষিত হবে। সুন্দর পোষাক, আসবাব, অলঙ্কার, গন্ধ-দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে আপনি ভালবাসেন।

আপনার মধ্যে কল্পনা খুব প্রবল এবং আদর্শের দিকে কম বেশী ঝোঁক আপনার মধ্যে দেখা যাবে। আদর্শকে অনেক সময় আপনি কাজে পরিণত করতে চাইবেন। একটা আদর্শ খাড়া ক'রে, তা দিয়ে আপনার সকল কর্ম-নিয়ন্ত্রিত করতেও পারেন। এর জন্য অনেক সময় আপনাকে নিন্দা-অপবাদের সম্মুখীন হ'তে হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি আপনার আদর্শ অনুসরণ করতে বিরত হবেন না।

আপনার যে মত বা ধারণা একবার আপনার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হবে, সহস্র বাধা, বিঘ্ন, যুক্তি তর্ক কিছুতেই তা বদলাবে না। যদি আপনি আধ্যাত্মিকতার দিকে যান তাহ'লে আপনার ভক্তি ও বিশ্বাস আপনাকে সাধনার উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে পারে।

ভাল মন্দ যাই করুন আপনি তা একাগ্রভাবে এবং দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাবেন; কাজেই আপনার হৃদয় যদি সুপথে চালিত হয়, তাহ'লে তা যেমন উচ্চপ্রতিষ্ঠা ও সাফল্য দেবে, অপরদিকে বিপথে চালিত হ'লে আপনাকে তা পশুত্বের নিম্নস্তরে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তবে সাধারণতঃ খোলাখুলি ব্যবহার ভালবাসেন ব'লে, গোড়াতে একটু চেষ্টা করলেই আপনি সহজেই নিজের ভুল বুঝতে পারবেন এবং তখন নিজের চরিত্র সংশোধন করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে না।

অর্থভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলা চলে। দানসূত্রে অথবা অপ্রত্যাশিতভাবে আপনি বহু অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। কিন্তু অর্থের উপর আপনার খুব বেশী মায়া-মমতা কখনই থাকবে না। অনেক সময় আপনার সঞ্চিত অর্থ কোন আকস্মিক বিপদে নষ্ট হ'তে পারে, কিম্বা কোন আদর্শের জন্য আপনি অর্থ বা সম্পত্তি ত্যাগ করতে পারেন। তাহ'লেও অর্থের বিশেষ অভাব আপনার না হওয়াই সম্ভব। অভাব হ'লেই অনেক সময় তা সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হ'য়ে যাবে।

কর্মজীবন

কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আপনার উপর এসে পড়বে এবং আপনি যদি সুযোগ অবহেলা না করেন তাহ'লে গুরু দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজ থেকে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন। কিন্তু নিজের অবিবেচনা বা হঠকারিতার জন্য অনেক সময় সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারবেন না। যদিও আপনি আপনার ব্যক্তিগত গুণপনার জোরে কম-বেশী খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করবেন—অপরের সাহায্য না নিয়েও, তবু সাবধান থাকা উচিত, যাতে কোন ভ্রান্ত ধারণা অনুসরণ ক'রে নিজের সকল প্রতিষ্ঠা না নষ্ট করে ফেলেন। সকল কাজে আপনার সংযম ও মন্ত্রগুপ্তি একান্ত আবশ্যক। ভাবপ্রবণতার জন্য ও বাড়াবাড়ি করার জন্য অনেক সময় নিশ্চিত সাফল্যেও বিঘ্ন এসে উপস্থিত হবে।

আপনার সেই সকল কাজ ভাল লাগে যাতে অপরকে আনন্দ দেওয়া যায়, যার সঙ্গে কম বেশী গোপনীয়তা জড়িত থাকে বা যাতে কোন রকম বৈচিত্র্য বা অসাধারণত্ব থাকে। সঙ্গীত, চিত্র-অভিনয়, বক্তৃতা প্রভৃতিতে কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে। যে সকল কাজের সঙ্গে সৃষ্টির আনন্দ জড়িত থাকে, তা সে স্থূল স্তরেই হোক্ বা সূক্ষ্ম স্তরেই হোক্ সেই সকল কাজের দিকে আপনার একটা সহজ আকর্ষণ থাকা সম্ভব। কাজেই কৃষি, বাগ-বাগিচার কাজ, উৎপাদন শিল্প প্রভৃতি, খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসায়, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বেকারি প্রভৃতির যে কোন কাজে আপনার যোগ্যতা প্রকাশ পেতে পারে। তেমনি আবার সূক্ষ্ম স্তরে গ্রন্থ-কর্তৃত্ব উদ্ভাবনা প্রভৃতিতে আপনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন। স্পেকুলেশান, লগ্নী কারবার, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতিতেও আপনার দক্ষতা থাকা সম্ভব। মোট কথা যে সকল কাজে পরিশ্রমের সঙ্গে কিছু আনন্দ ও পরিশ্রমের পর দীর্ঘ অবসর থাকে এবং যাতে নিজের গুণপনার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে খ্যাতি বা প্রশংসা পাওয়া যায় সেই সব কাজ করতে পারলে আপনি বিশেষ সাফল্য লাভ করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আপনি খ্যাতি চান বটে, কিন্তু সস্তা জনপ্রিয়তা আপনাকে তৃপ্তি দিতে পারে না।

পারিবারিক

আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে আপনার নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। সাধারণতঃ তাঁদের সঙ্গে আপনার প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক সময় তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আপনাকে দূরে থাকতে হবে। তা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনের সংশ্রবে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে যার জন্যে আপনাকে মধ্যে মধ্যে অশান্তি বা মনোকষ্ট ভোগ করতে হবে।

পারিবারিক ব্যাপারে ও গৃহস্থালীর সংশ্রবে আপনার বহু ব্যয় হবে। আপনার পৈতৃক সম্পত্তি বিভক্ত হওয়া সম্ভব এবং তা নিয়ে কম-বেশী ঝঞ্ঝাট হ'তে পারে। ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য বা অন্য কারণে আপনি সম্পত্তি বিক্রয়ও করতে পারেন।

পিতা-মাতার জন্য আপনার কম-বেশী চিন্তা উপস্থিত হ'তে পারে, তাঁদের জন্য আপনার কিছু আর্থিক ক্ষতি অথবা উন্নতিতে বিঘ্ন হওয়াও অসম্ভব নয়। পিতার ভ্রমণকালে কোন রকম দুর্ঘটনা অথবা জীবন-সংশয় হওয়ার আশঙ্কা আছে।

সন্তানাদির জন্যও আপনার কম-বেশী অশান্তি ভোগ করতে হবে। সন্তান লাভে বিঘ্ন হ'তে পারে, সন্তান হ'লেও তাদের ব্যাপার নিয়ে কম-বেশী চিন্তা থাকবে। সন্তানের মধ্যে কারো কোন রকম দৈহিক অথবা মানসিক অসাধারণত্ব থাকতে পারে—তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্।

বিবাহ

আপনার দাম্পত্য-জীবন সাধারণতঃ ভাল হ'লেও সে সম্বন্ধে কম-বেশী চিন্তা উপস্থিত হ'তে পারে। আপনার স্ত্রী (অথবা স্বামী) আপনার অনুগত হবেন কিন্তু আপনাকে অনেক সময় তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে হবে তা ছাড়া অনেক সময় বন্ধু বান্ধবের জন্য অথবা বিষয়-কর্মের জন্য আপনার দাম্পত্য জীবনে বিঘ্ন উপস্থিত হ'তে পারে। আপনি যদিও আপনার স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) প্রতি স্নেহশীল হবেন তথাপি অবস্থা গতিকে অনেক সময় তাঁর উপর আপনার কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করতে পারবেন না এবং তার জন্য মধ্যে মধ্যে দাম্পত্য জীবনে কিছু অশান্তি উপস্থিত হবে অবশ্য তা খুব বেশী গুরুতর না হওয়াই সম্ভব। যাঁর জন্ম-মাস বৈশাখ, ভাদ্র, পৌষ অথবা ফাল্গুন, কিম্বা যাঁর জন্ম-তিথি শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী বা ত্রয়োদশী অথবা কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী, চতুর্দশী বা অমাবস্যা এ রকম কারো সঙ্গে বিবাহ হ'লে আপনার দাম্পত্য জীবন বিশেষ সুখকর হবে।

বন্ধুত্ব

বন্ধুর সংশ্রবে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। অনেক বিচিত্র ধরণের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব। বন্ধু সংসর্গ অনেক সময় আপনার বিবাদ বিসম্বাদ, সম্মানহানি বা অপযশের কারণ হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। আপনি সাধারণতঃ জনপ্রিয় হবেন এবং আপনার অনেক অনুচর পরিচরও থাকবে, কিন্তু তাদের সাহায্য আপনার বিশেষ কোন কাজে লাগবে না। অনেকক্ষেত্রে তাদের দ্বারা গুপ্ত-শত্রুতা হ'তে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জন্য আপনার গুরুতর ক্ষতিও হ'তে পারে। আপনি নিজে বন্ধু-বৎসল হবেন কিন্তু বন্ধুর কাছ থেকে মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া অন্য কোন সাহায্য কমই পাবেন। যাঁর জন্ম মাস বৈশাখ, ভাদ্র, অথবা পৌষ কিম্বা যাঁর জন্মতিথি শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী কি ত্রয়োদশী অথবা কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী, চতুর্দশী কি অমাবস্যা এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্ব আপনার পক্ষে কিছু আনন্দদায়ক হবে।

স্বাস্থ্য

আপনার জীবনীশক্তি বেশ প্রবল হবে বটে, কিন্তু কোন দীর্ঘস্থায়ী জটিল ব্যাধি সম্বন্ধে আপনার সতর্ক থাকা উচিত। আপনার এমন কোন বিচিত্র ব্যাধি হ'তে পারে যা সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা দূর হওয়া সম্ভব নয় এবং যার জন্য দৈব কর্ম অথবা মানসিক চিকিৎসা প্রয়োজন হবে। রক্ত

সঞ্চালনের ব্যাঘাত এবং স্নায়ুর ও অন্ত্রের বৈকল্য সম্বন্ধে আপনার সতর্ক থাকা উচিত। আপনার দেহ ভাল রাখতে হ'লে আনন্দ একান্ত আবশ্যক। সুন্দর ও সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ, সুন্দর দৃশ্য দর্শন, সুমিষ্ট সঙ্গীত-শ্রবণ প্রভৃতি আপনার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। অসুস্থ অবস্থায় লাল, গোলাপী, গেরুয়া প্রভৃতি রঙের দ্রব্যাদির ব্যবহার আপনার রোগ নিরাময়ে সাহায্য করবে। খাদ্যে জলীয় পদার্থের বেশী ব্যবহার আপনার না করাই ভাল। উপবাস ও একটানা অতিরিক্ত পরিশ্রমও আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

অন্যান্য ব্যাপার

আপনার বহু ভ্রমণ হবে। অনেক তীর্থ ভ্রমণও হ'তে পারে। কর্মোপলক্ষে ভ্রমণ বা দীর্ঘ প্রবাসও অসম্ভব নয়। কিন্তু তীর্থযাত্রা আপনার পক্ষে খুব সুবিধাজনক নয়। কেন-না সমুদ্রে বা তীর্থস্থানে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা আছে। এমন কি জীবনের আশঙ্কা পর্যন্ত উপস্থিত হ'তে পারে, কিন্তু স্থলপথে ভ্রমণে আপনার লাভ ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। তা ছাড়া কর্মোপলক্ষে আপনাকে অনেক সময় বিদেশ বাস করতে হবে।

যৌন প্রেমের ব্যাপারে আপনার মধ্যে একনিষ্ঠতার একটী আদর্শ ধারণা থাকবে। কিন্তু সে সম্বন্ধে আপনার কোনরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হওয়া সম্ভব, যাতে করে সে আদর্শে স্থির থাকা আপনার পক্ষে কঠিন হবে। যৌন প্রীতির ব্যাপারে আপনাকে কম-বেশী দুঃখ পেতেই হবে। প্রণয় পাত্রীর (বা পাত্রের) সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর মৃত্যু অথবা কোন দুর্ঘটনা আপনার মনোকষ্টের কারণ হ'তে পারে। প্রণয় ব্যাপারে কোনরকম কলঙ্ক বা অপবাদ হওয়াও বিচিত্র নয়।

স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ৭, ১৯, ৩১, ৪৩, এই সকল বর্ষগুলিতে নিজের অথবা কোন আত্মীয়ের সংশ্রবে কোনরকম দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব এবং ১৩, ২৫, ৩৭, ৪৯, প্রভৃতি বর্ষে কোন সুখকর ঘটনা ঘটতে পারে।

বর্ণ

আপনার প্রীতিপ্রদ ও আনন্দবর্ধক বর্ণ হচ্ছে সব রকমের মিশ্র ও বিচিত্র রঙ্। রামধনুর মত রঙ্। ময়ূরকণ্ঠি রঙ্, সমুদ্রের বা আকাশের মত নীল রঙ্ও আপনার পক্ষে উপযোগী—যে সব রঙের মধ্য থেকে অন্য রঙের আভা পাওয়া যায় বা ভিন্ন ভিন্ন রঙের সমবায়ে বিচিত্র যে সকল রঙ্ হয় তাও আপনার পক্ষে ভাল। দেহ মনের অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু লাল রঙ্ ব্যবহার করলে উপকার পাবেন। সবুজ রঙ্ বর্জন করাই ভাল।

রত্ন

আপনার উপযোগী রত্ন বৈদুর্য (Cats eye) বিশেষতঃ স্বর্ণক্ষেত্রে বৈদুর্য। ওপ্যাল (Opal), চন্দ্রকান্ত মণি (Moon stone) প্রভৃতিও আপনার ধারণের উপযোগী।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জন-কয়েকের নাম—শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ডবলিউ সি ব্যানার্জি, অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফি, প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা রবার্ট শুম্যান, শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দার, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, প্রভৃতি।

রুসো

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাপিগণের অনন্তকালস্থায়ী শাস্তিতে আমার বিশ্বাস নাই। ঈশ্বরই একমাত্র নির্বিকল্প পদার্থ (absolute), তিনিই একমাত্র চিন্তা-বেদনা-ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট সক্রিয় পুরুষ; আমাদের চিন্তা, বেদনা ও ইচ্ছা তাঁহার নিকট হইতেই আমরা প্রাপ্ত হই। যতই তাঁহার অসীমত্ব চিন্তা করি, ততই তাঁহাকে বুঝিবার অসামর্থ্য বোধ করি। যতই কম বুঝি, ততই বেশী ভক্তি করি। নতজানু হইয়া বলি, "হে সমস্ত সত্তার সত্তা, তুমি আছ, তাই আমি আছি। তোমাতে চিত্ত স্থির রাখিয়া আমার সত্তার উৎসে আমি উপনীত হই। তোমাতে বুদ্ধি সমর্পণ করাতেই বুদ্ধির সার্থকতা। তোমার অসীম সত্তায় নিমজ্জিত হইয়া আমার মন আনন্দে পূর্ণ হয়, আমার অপূর্ণতা সুখ প্রাপ্ত হয়।"

আমাদের হৃদয়ের তলদেশে একটি বৃত্তি আছে, তাহাদ্বারাই কর্মের দোষগুণ আমরা বিচার করি। এই বৃত্তির নাম—ধর্ম্মবিবেক (Conscience)। এই বিবেক প্রত্যেকের অন্তরেই বর্ত্তমান। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকেই তাহার আদেশ পালন করে। প্রকৃতির ভাষায় তাহার আদেশ প্রদত্ত হয়, সংসারের মধ্যে সে ভাষা আমরা ক্রমশঃই ভুলিয়া যাই।

ঈশ্বরকে আমি ভক্তি করি, তাঁহার দয়ায় আমি অভিভূত, কিন্তু তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করি না। তাঁহার নিকট কি চাহিব? আমার জন্য তিনি জগতের নিয়ম ভঙ্গ করিবেন? আমার জন্য অপ্রাকৃতিক ব্যাপার সংঘটিত করিবেন? যে জগৎ-শৃঙ্খলার জন্য আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আমার জন্য সেই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার জন্য অনুরোধ

করিব? সেরূপ প্রার্থনার জন্য শাস্তি হওয়া উচিত। আমি চাই তিনি আমার ভুল সংশোধন করিয়া দিন, যদি সে ভুলে আমার বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ধর্ম্মের বাহ্যিক রূপ ও ধর্ম্ম এক পদার্থ নহে। ঈশ্বর চাহেন অন্তরের সেবা। অকপট অন্তরের সেবা সর্ব্বত্রই একরূপ।

বুদ্ধিদ্বারা বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সরল ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অবোধ্য ও স্ববিরোধী অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্মকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রচার করিলে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঈশ্বর অন্ধকার ভালবাসেন না; তিনি আমাকে যে বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহা ব্যবহার করিব না, ইহা তাহার ইচ্ছা নহে। আমার বুদ্ধি অন্যকে সমর্পণ করিতে বলার অর্থ যিনি বুদ্ধি দিয়াছেন, তাঁহাকে অপমান করা।

আমি প্রত্যেক ধর্ম্মকেই মঙ্গলদায়ক বলিয়া মনে করি। মানবজাতির দুই তৃতীয়াংশ য়িহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের বাহিরে। কোটি কোটি লোক মুসা, যিশু ও মহম্মদের নামও কখনও শোনে নাই। ঈশ্বরকে যখন অন্তরের সঙ্গে পূজা করা হয়, তখন সকল পূজাই সমান। হৃদয়ের পূজাই পূজা, যদি আন্তরিক হয়, তাহা হইলে কাহারও পূজা ঈশ্বর অগ্রাহ্য করেন না। পুণ্যবান হৃদয়ই ঈশ্বরের মন্দির। নৈতিক কর্ত্তব্য পালন হইতে কোনো ধর্ম্মেই অব্যাহতি দেয় না। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক ধর্ম্মেই সকলের উপরে ঈশ্বরকে ভালবাসা, এবং প্রতিবাসীদিগকেও আপনার মত ভালবাসাই সকল কর্ত্তব্যের সার।

যাহারা প্রকৃতির ব্যাখ্যাব্যপদেশে মানুষের অন্তরে ধ্বংসের বীজ বপন করে, তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিও। দম্ভভরে তাহারা মনে করে যে একমাত্র তাহারাই জ্ঞানী, এবং তাহাদের কল্পনাসৃষ্ট দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলে। মানুষ যাহা যাহা শ্রদ্ধা করে, সকলই তাহারা উৎপাটিত করিয়া পদদলিত ও ধ্বংস করে; দুঃখার্ত্ত জনগণের শেষ সান্ত্বনা তাহারা অপহরণ করিয়া লয়; ধন-ও-ক্ষমতাশালী লোকদিগের রিপুর চরিতার্থতার পথে একমাত্র বাধা তাহারা অপসারিত করিয়া ফেলে; মানুষের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে পাপের জন্য অনুতাপ ও সাধুজীবনপ্রাপ্ত সমস্ত আশা উন্মূলিত করে এবং মানবজাতির উপকারী বন্ধু বলিয়া গর্ব্ব করে। তাহারা বলে সত্য কখনও অনিষ্ট করেনা। সে কথা আমিও বিশ্বাস করি। আমি ইহাও বিশ্বাস করি, তাহারা যাহা বলে, তাহা সত্য নহে।

উদ্ধত দর্শনের (Philosophy) পরিণাম নাস্তিকতা, অন্ধ ভক্তির পরিণাম ধর্ম্মোন্মত্ততা। এই উভয়ই বর্জ্জন কর। ধর্ম্মের পথে দৃঢ় হইয়া থাক, দার্শনিকদিগের নিকট নির্ভয়ে বল যে তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, যাহারা পরমতাসহিষ্ণু তাহাদিগকে সদয় ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেও। হয়তো তোমাকে একাই পথ চলিতে হইবে; কিন্তু তোমার অন্তর্যামী তোমার সাক্ষী থাকিবেন, তাঁহার নিকটে বাহিরের সাক্ষীর মূল্য কি?

Bayle প্রমাণ করিয়াছেন ধর্ম্মান্ধতা নাস্তিকতা হইতেও অনিষ্টকর। তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একথাও সত্য, যে নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু হইলেও ধর্ম্মান্ধতা হৃদয়-আলোড়নকারী একটি প্রবল বৃত্তি, যাহা মৃত্যুকে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেয় এবং মানুষকে বিপুল কর্ম্মশক্তি দান করে। ইহাকে যদি যথোচিত ভাবে চালনা করা যায়, তাহা হইলে মহত্তমগুণ ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মহীনতা কি করে? ধর্ম্মহীনতা ও তার্কিক দার্শনিক প্রবৃত্তি জীবনের শক্তি ক্ষয় করে, হীনতম স্বার্থবোধের মধ্যে হৃদয়ের প্রবল বৃত্তিদিগকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, হীনতার পঙ্কে মানবাত্মাকে নিমজ্জিত করে এবং অলক্ষিতে সমাজের ভিত্তি দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। কেননা ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সাধারণ অংশ এতই কম, যে তাহা বিরোধী স্বার্থাংশ দমন করিয়া রাখিতে পারে না। নাস্তিকতা হইতে যে রক্তপাত হয় না, তাহার কারণ নাস্তিকদিগের শান্তিপ্রিয়তা নহে; যাহা মঙ্গলকর, তাহার প্রতি ঔদাসীন্যই এই কারণ। অধ্যয়নকক্ষে নিজে নিরাপদে থাকিতে পারিলে, অন্যের কি হইল না হইল, তাহা গ্রাহ্য করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই। তাহাদের মতদ্বারা নরহত্যা হয় না সত্য, কিন্তু জন্ম প্রতিরুদ্ধ হয়, যেন না যে নীতি দ্বারা মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়, তাহার ধ্বংস হয়। মানুষ হইতে মানুষকে তাহারা পৃথক করে, তাহাদের সমস্ত ভালবাসা গূঢ় স্বার্থপরতায় পরিণত হয়।

দার্শনিকদিগের ঔদাসীন্য যথেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের শান্তির সমতুল্য। এই শান্তি মৃত্যুর শান্তি। যুদ্ধ ইহা অপেক্ষা অধিক ধ্বংসকারী নহে।

যদিও ধর্ম্মান্ধতার অব্যবহিত ফল তথাকথিত "দার্শনিকতার" ফল অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর, ইহার পরবর্ত্তী ফলের অনিষ্টকারিতা তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

Profession de foi গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রুসো ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের (Divine Revelation) যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধি প্রত্যাদেশের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে অক্ষম। বাইবেলের সরলতা ও মহত্ত্বই প্রত্যাদেশের প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। খৃষ্ট যে কেবল মানুষমাত্র ছিলেন না, তিনি যে ধর্ম্মান্ধ ও ইতর সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট ছিলেন না, তাঁহার বিনয়নম্র আচরণ ও চরিত্রের বিশুদ্ধি, তাঁহার জ্ঞান-গম্ভীর বচনের মাধুর্য্য, তাঁহার ব্যক্তিত্বের মহিমা এবং তাঁহার উপদেশের মহত্ত্ব দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হয়। সক্রেটিশ দার্শনিকের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, দার্শনিকের মতই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। যিশুর জীবন ও মৃত্যু, উভয়ই ঐশ্বরিক-ভাবাপন্ন। যিশুর চরিত্রের মত মহৎ চরিত্র বাইবেল-লেখকগণ কোথায় পাইয়াছিলেন? এমন মহৎ চরিত্রনীতির উৎস কোথায় বর্ত্তমান ছিল? এতাদৃশ চরিত্রের সৃষ্টি ও এতাদৃশ সত্যের আবিষ্কার যিশুর বাস্তব জীবন অপেক্ষাও অলৌকিক ব্যাপার। তাঁহার সম্বন্ধে যুক্তিতে যে সন্দেহের উদয় হয়, হৃদয়ের নিশ্চিতি দ্বারা তাহা বিদূরিত হয়।

রুসোর মত দুর্ব্বল-চরিত্র ও যৌন বিষয়ে শিথিল-নীতি ব্যক্তির মুখে এই সকল উক্তি বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রুসোর সমগ্র চরিত্রই তাহার ভাবপ্রবণতা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত এবং তাঁহার বুদ্ধি ও ইচ্ছা তাঁহার বেদনার (feelings) বশীভূত। এই বেদনা কত প্রবল ছিল, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত হিউমের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার

ঈশ্বরানুরাগ, বন্ধুপ্রীতি, দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্মবিস্মৃত নিমজ্জন প্রভৃতি যেমন তাঁহার ভাবালুতার ফল, আসঙ্গ-লিপসা প্রভৃতিও সেই উৎস হইতেই উদ্ভূত। তিনি বেদনার উপাসক ছিলেন এবং ভাবাবেগের আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। বেদনায় উত্তেজিত কল্পনা তাঁহার যৌন লিপ্‌সার উদ্বোধন করিলেও, হৃদয়ের মহত্তম প্রবৃত্তিসমূহও তাহা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইত। তাঁহার ধর্ম্ম-মত ও রাজনৈতিক মত ও এই বেদনাদ্বারা প্রভাবিত এবং তাহার সৃষ্ট সাহিত্যও বেদনার রাগে রঞ্জিত। ইয়োরোপের Romantic movement এর তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রজ্ঞাবাদিগণ (Rotionalist) সর্ব্ববিষয়ে যুক্তিকেই বিচারের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু রুসো যুক্তি অপেক্ষা হৃদয় বৃত্তিকে (feeling) প্রাধান্য দিতেন। Pascalএর মত তিনিও বলিতেন "হৃদয়ের ও যুক্তি আছে, যাহা মস্তকে বুঝিতে পারে না।" (The heart has reasons, which the head cannot understand)। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ যে সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিতেন,সে সকলই বুদ্ধির যুক্তি (intellectual arguments)। কিন্তু রুসো বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিদর্শন অন্বেষণ করিয়াছিলেন, এবং তথায় ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা-মিশ্র ভয়, উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও সামাজিক ব্যাপারে বেদনাদ্বারা প্রভাবিত হওয়াই Romanticism। ভাবে বিগলিত হওয়া, দরিদ্রের দুঃখে অশ্রু-বিসর্জ্জন, বিলাস-বহুল কোলাহলপূর্ণ নাগরিক জীবনে বিতৃষ্ণা, পল্লীর শান্ত, সন্তুষ্ট, সরল জীবনে প্রীতি, সম্পদে বিরাগ, দারিদ্র্যের স্তুতি প্রভৃতি Romanticism এর বিশেষত্ব। রুসোর পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও রচনায় এই সকল লক্ষণ অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও তাঁহার হস্তেই এই ভাব পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

রুসোর প্রভাব রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জার্ম্মাণ দর্শন ইহা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। Romain Roland লিখিয়াছেন Emile পাঠ করিয়া Kant মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এক সময় ছিল, যখন মনে করিতাম জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বস্তু। এই জন্য গর্ব্বভরে অজ্ঞ লোকদিগকে অবজ্ঞা করিতাম। রুসো আমার চক্ষু খুলিয়া দিয়া মিথ্যা শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটই মানুষকে সম্মান করিতে শিখিয়াছিলাম।" Social Contract এর প্রভাবও Kant এর উপর কম ছিল না। "যে স্বাধীনতা মানুষের বিশেষত্ব" তাহার ধারণা তিনি এই গ্রন্থ হইতেই পাইয়াছিলেন। * * * জার্ম্মাণির Sturm and Drang আন্দোলনের নায়কগণ—Lessing ও Herder হইতে আরম্ভ করিয়া Goethe ও Schiller পর্য্যন্ত সকলেই—রুসোর মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। Schiller রুসোর বন্দনা সূচক একটি গীতি কবিতাও লিখিয়াছিলেন।

রুসোর মধ্যে বিভিন্নমুখী প্রতিভার একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার চিন্তাই যে কেবল বিপ্লবমুখী ছিল, তাহা নহে। তাঁহার রচনার রীতি দ্বারা বেদনার প্রকৃতি ও বেদনা প্রকাশের ভঙ্গীতেও বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভবিষ্যতের কলারীতি (Art) তিনি রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্‌পটুতা অসাধারণ ছিল। এক Bossuet ব্যতীত ফ্রান্সে এ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান বাগ্মিতা তিনি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কতিপয় রচনার বাক্যপটুতায় একান্তই অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। Demosthenes এর রচনার সুষমা, উচ্ছ্বাস এবং জ্বালাময় প্রবাহে তাঁহার রচনা সমৃদ্ধ। মনের নিভৃত চিন্তার রূপায়নেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার রচনা-কৌশলে তাঁহার চিন্তা বাহ্যমুখ হইয়া পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। তাঁহার Confessions পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করে। তাঁহার সমস্ত দোষ-গুণের মূল, তাঁহার মানসিক ও দেহাভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, তাঁহার আত্মমগ্নতার (Egotism) অবশ্যম্ভাবী ফল। সামাজিক প্রথা ও সাহিত্যিক রীতি অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি কেবল নিজের কথাই বলিয়াছেন। তিনি সত্য "আমির" সন্ধান পাইয়াছিলেন। মনের অন্ধকার কক্ষে তিনি যে যে রেখা অঙ্কিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন।......"সহস্র সহস্রলোক যাহা দমন করিয়া রাখে, তিনি নির্লজ্জভাবে আপনাকে নগ্ন করিয়া তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। আধুনিক মানুষের মনকে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এবং শৃঙ্খলভঙ্গ করিয়া আপনাকে জানিতে ও প্রকাশ করিতে শিখাইয়াছেন।

"এই নূতন জগৎকে প্রকাশিত করিবার জন্য তাহাকে নূতন বন্ধনমুক্ত ও অধিকতর নমনীয় ভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন "আমার শৈলী আমি বাছিয়া লইয়াছিলাম। তাহার একরূপতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করি নাই। যাহা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি এবং অসংকোচে তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছি। যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা যেমন দেখিয়াছি বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিয়াছি, ফলের কথা ভাবি নাই। বিগত ঘটনার এবং তজ্জাত বেদনার স্মৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া আমি আমার মনের অবস্থার দ্বিবিধ চিত্র অঙ্কিত করিব, একটি ঘটনার সমকালীন অবস্থা, দ্বিতীয়টি বর্ণনকালের অবস্থা। * *"

ছন্দ ও ভাবাবেগের এই প্রাচুর্য্য বিশৃঙ্খলায় পর্য্যবসিত হইতে পারিত। কিন্তু রুসোর সহজাত সুষমাবোধ তাহা হইতে দেয় নাই। ১৭৬০ সালে তাহার মুদ্রাকরকে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমি প্রধানতঃ গায়ক, রচনাশৈলীতে সুষমার মূল্য আমার নিকট এত অধিক, যে সুগমতার অব্যবহিত পরেই, এমন কি সত্যানুগতির পূর্ব্বেও তাহার স্থান।" প্রয়োজন হইলে এই সুষমার জন্য আখ্যানের সত্যানুগতি বিসর্জন দিতেও তাহার কুণ্ঠা ছিল না। সুষমারক্ষার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাঁহার কাছে ছন্দের স্থান ভাবের পূর্ব্বে। তিনি বাক্য ও বাক্যাংশগুলি প্রথমে মনের মধ্যে গাহিয়া লইতেন, তাহার পর তাহাদিগকে শব্দে গ্রথিত করিতেন। তিনি যে একজন বড় গদ্য কবি ও ফরাসী Romanticismএর অগ্রদূত ছিলেন, তাঁহার ছন্দ ও ছন্দরীতি, তাঁহার ভাবালুতা এবং তাঁহার প্রত্যয় সকলের (idea) বিষয় বিবেচনা করিলে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। Chateaw briand এবং La-

Martine রুসো হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। Michelet ও George sandএর মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট।

"শিক্ষাসম্বন্ধীয় আধুনিক সকল মতই রুসোর শিশু সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তাঁহার Emile দ্বারা প্রভাবিত। জেনিভার প্রসিদ্ধতম নবশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রুসোর নামে প্রতিষ্ঠিত। নিজের সম্বন্ধে দুর্ব্বল হইয়াও তিনি ধর্ম্মবিবেক-সম্বন্ধে দৃঢ় অথচ কঠোরতাবর্জিত, সুস্পষ্ট, শ্লাঘ্য চালক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। সত্য চরিত্রোৎকর্ষ আবিষ্কারে তাহার একটি উদার সহজাত পটুতা ছিল। তাঁহার অনুমত চরিত্র-নীতিতে উগ্রতা অথবা অসহিষ্ণু দার্ঢ্য ছিল না। তাহা পরিবেশ-নিরপেক্ষ ছিল না এবং কোনও বিশেষ তত্ত্ব অথবা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিতও ছিল না। তাহার মূলে ছিল গভীর সহানুভূতি এবং মানুষের দুর্বলতার প্রতি অনুকম্পা। তাহা মানুষের ন্যায়ানুগত প্রয়োজনের উপযোগী ও জীবন্ত ছিল।

"অবচেতন মনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া তিনি তাহার অবজ্ঞাত ও দমিত সম্পদ এবং libidoর রহস্য সাহিত্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। Freud তাঁহার নিকট অংশতঃ ঋণী।

"Tolstoi তাঁহার নিকট হইতেই যৌবনে "বজ্রাঘাত" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুবক Tolstoi রুসোর চিত্র সমন্বিত একটি পদক পবিত্র মূর্ত্তির মত শ্রদ্ধাভরে গলদেশে ধারণ করিতেন। তাঁহার নৈতিক পুন-র্জন্ম এবং তাঁহার Iasnaia Polianaর বিদ্যালয় রুসোর উপদেশ ও দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিতেন। ধর্ম্ম ও কলা, উভয়ত্রই তুল্যরূপে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। Tolstoi লিখিয়াছেন "রুসোর রচনা আমার হৃদয় এতই স্পর্শ করে, যে আমার বিশ্বাস আমিও ঐরূপ লিখিতে পারিতাম।" সত্যই তিনি রুসোর লেখাই পুনরায় লিখিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান যুগের Jean Jacques। বর্ত্তমান যুগের চিন্তার উপর রুসোর প্রভাবের এখনও শেষ হয় নাই। যুবক জাপান এবং নব চীন তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।"

ইহার পরে Romain Rolland তাঁহার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন "যে লেমান্ হ্রদের চতুর্দ্দিকে তাঁহার অন্তর অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইত বলিয়া রুসো লিখিয়াছেন, তাহার তীরে ভ্রমণ কালে আমি অনেকবার তাঁহার ছায়ার (shade) সাক্ষাৎ পাইয়াছি। Villeneuveএর গৃহে বসিয়া যখন আমি এই পংক্তিগুলি লিখিতেছি, তখন বাতায়নের ভিতর দিয়া Clarensএর উপসাগর ও সানুদেশ আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহার শীর্ষদেশে বৃক্ষরাজির মধ্যে জুলির গোপালরাগরঞ্জিত স্বপ্নাতুর গৃহ দাঁড়াইয়া আছে।"

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

নয়

আন্দামানে জাপানী-রাজ

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে মনিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল, নাগা পর্ব্বতের প্রধান সহর কোহিমা এবং বর্ম্মা সীমান্তের কাবো উপত্যকা অঞ্চলে ভ্রমণ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ঐ সমস্ত স্থানে যুদ্ধের মধ্যভাগে কিছুদিনের জন্য জাপানী সৈন্য আসিয়াছিল এবং সেই সময়ে যে সমস্ত লোক তথায় বাস করিয়াছে তাহাদের অনেকেরই নিকট হইতে একবাক্যে জাপানীদের সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম। জাপানীরা নিরতিশয় ভদ্র, পরিশ্রমী, নিয়মানুবর্ত্তী এমন কি খাদ্যাভাবে মরিয়া গেলেও অপরের নিকট হইতে জোর করিয়া কিছু গ্রহণ করেনা, এইরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়াছিলাম। আরও মজার কথা শুনিয়াছিলাম যে, ইম্ফলের কোন লোকই বুঝিতে পারে নাই যে, নেতাজী সুভাষ বা কোন ভারতীয় এই অভিযানে ছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, যুদ্ধের অবসানের পর তাঁহারা এই সমস্ত সংবাদ শুনিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের সময় কেবলমাত্র হাফ্-প্যাণ্ট ও গেঞ্জী পরা, ষ্টেন গান বা ছোট রাইফেল শোভিত জাপানী সৈনিকই তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, কোন ভারতীয়কে আদৌ দেখিতে পান নাই।

জাপানী সম্বন্ধে মনিপুরের এই কাহিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত বিবরণ শুনিলাম পোর্টব্লেয়ারে। পোর্টব্লেয়ারে ৪৩ মাস জাপানী রাজত্ব ছিল। তাহা নিদারুণ অত্যাচার, দুঃখ এবং বিভীষিকায় পরিপূর্ণ। অথচ মজা এই যে, পোর্টব্লেয়ারের অধিবাসীরা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, 'চন্দ্র বোস' (কণ্টিনেণ্টাল কায়দায় সুভাষ চন্দ্র বোসকে S. Chandra Basu বলা হইত) এই অভিযানের নায়ক এবং ১৯৪৩-এর নভেম্বর মাসে পোর্টব্লেয়ারের জিমখানা গ্রাউণ্ডে তাহারা নেতাজীর বক্তৃতাও শুনিয়াছিলেন। জাপানী-আন্দামানে বাস করিয়াছেন, এইরূপ হিন্দু বা মুসলমান যাহাকেই জাপানীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারাই পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া আর একবার ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।

আন্দামানে জাপানীদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ওখানকার স্থানীয় লোকদের নিকট যে কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহার সন, তারিখ এবং সমস্তই ওখানকার লোকের স্মৃতি হইতে গৃহীত, কোন কাগজে বা পাথুরে প্রমাণ কিছুই দেখি নাই। মিঃ রাহা, মিঃ রউফ প্রমুখ অনেকের নিকট হইতে অল্পে অল্পে নিম্নলিখিত ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপানীদের হাতে সিঙ্গাপুরের পতন হওয়ার মাস খানেক পর হইতেই আন্দামানে বিভীষিকা দেখা দেয় এবং তদানীন্তন ইংরাজ রাজ তিনখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া আন্দামানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুইখানি জাহাজ পথিমধ্যে জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন হয় এবং একখানি মাত্র জাহাজ পোর্টব্লেয়ারে আসে। ঐ শেষ জাহাজ 'S. S. Neurolia' পোর্টব্লেয়ারের বন্দর হইতে ১২ই মার্চ্চ ১৯৪২ সালে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে। ঐ জাহাজে আন্দামানের সমস্ত অস্থায়ী ভারতীয় অধিবাসীদের ভারতে প্রেরণ করা হয়, শ্বেতাঙ্গরাও অনেকেই চলিয়া যান, কেবল আন্দামানের Local Born-রা আন্দামানেই থাকিয়া যান। উচ্চপদস্থ সাহেবদের মধ্যে তদানীন্তন চিফ্ কমিশনার মিঃ ওয়াটারফল্‌স্, তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ বার্ড, এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ লিণ্ডসে, আন্দামানের বেতারকেন্দ্রের অধ্যক্ষ মিঃ লেণ্টি, জেলখানার অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাক্‌মিলন্ এবং আরও কয়েকজন পোর্টব্লেয়ারেই থাকিয়া যান। আন্দামানের সামরিক রক্ষা ব্যবস্থা কিছুই ছিল না, প্রকৃতপক্ষে উহা খোলা সহর (open town) হিসাবে অরক্ষিতভাবেই পড়িয়া ছিল।

১৯৪২-এর ২১শে মার্চ্চ তারিখে সকাল বেলা হইতে পোর্টব্লেয়ার সহরে সরকারীভাবে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, জাপানীরা এই স্থানে অবতরণ করিলেই তোপ দাগিয়া সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই তোপের কারণ ছিল এই যে, পোর্টব্লেয়ারের বেতার কেন্দ্রের (Wireless Station) নীচে ডিনামাইট বসান হইয়াছিল, এবং ঠিক ছিল যে, জাপানীরা দ্বীপে অবতরণ করিলেই ঐ ডিনামাইটের দ্বারা বেতার কেন্দ্র উড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারই শব্দে স্থানীয় অধিবাসীবর্গ জাপানীদের অবতরণ বুঝিতে পারিবে। পরদিন রাত্রে অর্থাৎ ২২ ও ২৩ তারিখের সংযোগ স্থলে ২০।২৫ খানি জাপানী জাহাজ হইতে জাপানীরা আন্দামানে অবতরণ করিতে আরম্ভ করে। তাহারা রস্ দ্বীপ, করবাইনোস্কোপ, রুক্‌সাবাদ এবং মেমিওর দিক হইতে আন্দামানে অবতরণ করে এবং পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুসারে সেই মধ্য রাত্রেই ইংরাজগণ ডিনামাইট দিয়া বেতার কেন্দ্র ধ্বংস করেন।

পরদিন, অর্থাৎ ২৩-এ মার্চ্চ সকালে সূর্য্যোদয়ের পর হইতেই পোর্ট-ব্লেয়ারের পথে ঘাটে জাপানীদের গমনাগমন সুরু হয়। তাহাদের আকৃতি দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা অনেকেই গুর্খা সৈন্য আসিয়াছে বলিয়া প্রথমে ভুল করে কিন্তু পরে বুঝিতে পারে যে গুর্খা নয়, জাপানী। প্রথমতঃ ইহাদের সহিত কাহারও কোন বিবাদ হয় নাই, উপরন্তু স্থানীয় লোকেরা ইংরাজ রাজত্বের অবসান বুঝিয়া আনন্দিত হইয়া জাপানীদের অভি-নন্দনও জানাইয়া ছিল। কিন্তু জাপানীরা খাদ্যাভাবেই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, স্থানীয় লোকের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া খাদ্য-সামগ্রী চাহিতে আরম্ভ করে, এমন কি জোর করিয়া জিনিষপত্র লুটপাট করিতেও সুরু করে। ইহার ফলে দুই তিন দিনের মধ্যেই জাপানীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকেরা বিরূপ হইয়া পড়ে।

জাপানী অধিকারের তৃতীয় দিবসে এবার্ডিনের বর্ত্তমান লোক্যাল বর্ণ্ ক্লাবের সন্নিকটে বেলা বারোটার সময় কয়েকজন জাপানী আকবর আলি নামক এক মুসলমান লোক্যাল-বর্নের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ সুরু করে এবং এই কারণে উত্তেজিত হইয়া আকবর আলির যুবক পুত্র জুলফিকর আলি তাহার নিজের বন্দুক লইয়া ইহাদের তাড়া করে। ফলে একজন জাপানী সামান্য আহত হয় এবং সকলেই লুঠ করার মতলব ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করে। বেলা আন্দাজ তিনটার সময় একদল জাপানী সৈনিক অফিসার সহ ঐ পাড়ায় আসিয়া আততায়ীকে ধরিবার চেষ্টা করে, কিন্তু জুলফিকর আত্মগোপন করিয়া পলায়ন করে। তখন জাপানীরা আকবর আলির বাটীতে আগুন লাগাইয়া দেয়। কাঠের বাড়ীতে আগুন দেওয়ার ফলে সেই অঞ্চলের সমস্ত বাড়ীতেই আগুন লাগে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিকটবর্ত্তী সমস্ত বাড়ী ভস্মীভূত হয়। এই সমস্ত গৃহের প্রায় ২৫০।৩০০ অধিবাসীকে জাপানীরা সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া বলে যে, আততায়ীকে বাহির করিয়া না দিলে উহাদের সকলের উপর মেশিনগান্ চালাইয়া সকলকেই হত্যা করা হইবে। ইহাতে জুলফিকর নিজেই আসিয়া ধরা দেয়। রাত্রে জাপানীরা জুলফিকরকে বন্দী করিয়া রাখে।

পরদিন সকালে Local-Born Club-এর খেলার মাঠে (এই ক্লাবের অপর নাম ছিল Browning Club এবং অধুনা ইহার নামকরণ হইয়াছে Netaji Club) জুলফিকারের বিচার আরম্ভ হয়। এই বিচার দেখিবার জন্য স্থানীয় সমস্ত লোককে সৈনিকদের দ্বারা জোর করিয়া ধরিয়া আনা হয় এবং মাঠের মাঝখানে সর্ব্বসমক্ষে জুলফিকারকে একটি মাত্র ছোট আণ্ডারওয়ার পরাইয়া মারপিট সুরু হয়। দশজন জাপানী সৈনিক এই প্রহার আরম্ভ করে। এইরূপ প্রহারের উদ্দেশ্য অপরাধীকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করানো। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, প্রহারের তাড়ায় অপরাধী নিরুপায় হইয়া অপরাধ স্বীকার করিলেই তাহার প্রাণদণ্ড সাব্যস্ত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গেই জুজুৎসু প্রণালীতে তাহাকে বধ করা হইত। অবশ্য জুলফিকারের অপরাধ সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং তাহার আর স্বীকারোক্তির প্রয়োজন ছিল না, একেবারেই তাহার উপর জুজুৎসু সুরু হইয়া গেল। মাঠের চারিদিকে তিন চারিশত স্থানীয় অধিবাসী নিরস্ত্র ভাবে দাঁড়াইয়া এই শাস্তি দেখিতেছে ও দুইশত আন্দাজ জাপানী সশস্ত্র সৈনিক এই লোকগুলিকে পাহারা দিতেছে,—দর্শকদের মধ্যে জুলফিকারের পিতা, মাতা এবং স্থানীয় অসংখ্য নারী ও শিশু সকলেই ছিলেন। কাহারও মাঠ ছাড়িয়া যাইবার হুকুম ছিল না। "Zulficar Khan was jujutsued and killed" অর্থাৎ জুলফিকারের উপর জুজুৎসু প্রয়োগ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। এই জুজুৎসু যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই স্তম্ভিত হইয়াছে এবং বহু লোক মাঠেই মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। মূর্চ্ছিত ব্যক্তিদের লাথি মারিয়া জাপানী সৈনিকরা মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইয়া দিত।

জুজুৎসুর প্রথম পত্তন হইল একজন সৈনিক অপরাধীকে কাঁধে তুলিয়া মাটীতে আছড়াইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন তাহার একটি হাত ধরিয়া মুচড়াইয়া কাঁধের হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল, অপর একজন

এইরূপে অপরাধীর অপর হাত ভাঙ্গিয়া দিল। অপরাধী মাটীতে পড়িয়া খানিকক্ষণ ছটফট করিল, অতঃপর পায়ের টিবিয়া নামক হাড়ের উপর বন্দুকের কুঁদা মারিয়া সৈনিকরা অপরাধীর দুইটি পায়ের হাড়ই ভাঙ্গিয়া দিল। এই পর্য্যন্ত করিয়া সৈনিক-জল্লাদগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরে তাহাদের 'তেইজু' অর্থাৎ অফিসার সমবেত দর্শকদের বুঝাইয়া দিল যে, জাপানীদের বিরুদ্ধাচরণ করিলে এইরূপ অবস্থাই হইবে। অপরাধী ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় জল প্রার্থনা করিতে থাকিলে একজন সৈনিক মাঠ হইতে কিছু ধুলা লইয়া তাহার মুখে চোখে ছড়াইয়া দিল। হাত পা ভাঙ্গা অবস্থায় অপরাধী চোখ মুখ হইতে ধুলা সরাইয়া ফেলিতেও অক্ষম। তাহার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় প্রতিবেশী সকলেই কাঠের পুতুল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য। মুখে কোন শব্দ করিলে জাপানী রক্ষী সৈনিক বন্দুকের কুঁদা দিয়া বা লাথি মারিয়া আঘাত করিবে। নিরুপায় দর্শকগণ এ অবস্থায় অপরাধীর দ্রুত মৃত্যুই কামনা করে।

অতঃপর জাপানী জল্লাদেরা অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল, কেবল কতকগুলি সৈনিক প্রহরী রহিল। এই সময় রৌদ্র উঠিতে লাগিল। ক্রমে রৌদ্রের তেজ বাড়িয়া গেল। ধুলায়, রৌদ্রে, অসংখ্য মাছির তাড়নায় হস্তপদ ভগ্ন অবস্থায় হতভাগ্য মাটীতে পড়িয়া ছটফট করিতে থাকিল, অথচ দর্শকগণের কাহারও মাঠ ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই বা হতভাগ্যের নিকটেও আসিবার উপায় নাই। সকাল হইতে এইরূপে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল। জুলফিকারের চোখ দুইটি জবা ফুলের মত লাল হইয়া গিয়াছে ও গলা দিয়া কেমন একটা গোঁয়ানির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই, হাত ও পায়ের যে স্থানে হাড়গুলি ভাঙ্গা হইয়াছে, সেই স্থান গুলি ভীষণভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছে, শরীরের অন্যান্য নানাস্থানে রক্ত জমিয়া কালো হইয়া আছে, প্রস্রাব, বাহ্যে এবং মুখের লালা ও চোখের জলে মাটী ভিজিয়া গিয়াছে, গায়ের ঘাম আর নাই, শুকাইয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় একজন সৈনিক কতকগুলি আলপিন লইয়া হতভাগ্যের নিকটে আসিয়া এক একটি আলপিন তাহার পেটে, পিঠে, ও অন্যত্রও আমূল বিঁধিয়া দিতে লাগিল। এক একটি আলপিন বেঁধে, আর অসহায় অপরাধী চিৎকার করিয়া নড়িয়া চড়িয়া উঠে, অনাহারে, প্রচণ্ড রৌদ্রে দাঁড়াইয়া শিশু ও নারী দর্শকেরা এই পৈশাচিক বিচার ব্যবস্থা দেখিতে বাধ্য হয়। এই শাস্তির নাম বিচার, ইহা শাস্তি বলিয়া ওদেশী ভাষায় অভিহিত হয় না। এইরূপে আরও একঘণ্টা চলার পর বেলা একটার সময় যখন জুলফিকার মরিয়া গেল তখন ইহার উপর সেই দশজন সৈনিক একত্রে বন্দুক লইয়া গুলি করিল। সেইদিন অপরাহ্নে ঐ হতভাগ্যকে ঐ মাঠেই কবর দেওয়া হয়। জাপানী অধিকারে এই জুলফিকার খানই এইরূপে প্রথম নিহত হয়। নেতাজী ক্লাব গ্রাউণ্ডে এক সন্ধ্যায় জুলফিকারের কবর আমরা দেখিয়াছি। তাহার ভ্রাতা এই কবরটি আমাদের দেখাইয়াছিল। জুলফিকারের পিতা আকবর আলি তদবধি বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ এখনও জীবিত আছেন। আমরা তাহাকে দেখিয়াছি, তবে তাঁহার সহিত কোন বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করি নাই, শুনিলাম তিনিও কাহারও সহিত কোন কথাই বড় একটা বলেন না। (ক্রমশঃ)

অগ্নিস্নান

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দুঃখীরা সব ধৈর্য্যে দাঁড়াও শৌর্য্যে আজি শির তোলো,
আত্মতেজের দীপ্তিতে ভাই জগন্নাথের দ্বার খোলো।
বহুৎ তোদের পাপ হয়েছে অগ্নিতে চল্ করি স্নান,
ধৈর্য্যেরি এই সিদ্ধিতে আজ করতে হবে সর্ব্বদান।
মরবিনা কেউ পাপ পুড়ে যাক দগ্ধ হয়ে হও খাঁটি,
নিষ্পাপ হলে তার তেজেতে ফাটবে ওরে এই মাটী।
হাজার হাজার বর্ষেরি পাপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর্,
জাতির পাপের অগ্নিস্নানে পূর্ণাহুতির মন্ত্রপড়্।
শুদ্ধ হয়ে শুদ্ধোদন আজ উদ্বোধনের গান গাহ,
সর্ব্বনাশের অগ্নিনাশে বইতে হবে সব দাহ।
বাস্তনাশ আর মৃত্যুবরণ আজকে তোদের পুরস্কার,
ভয় কি নারী, দুর্য্যোধন আজ দেখায় যদি উরস্ তার।
যাজ্ঞসেনীর তেজ দিয়ে তুই ফাটিয়ে পাপের রাজ সভা,
নিঃশ্বাসে তোর ফুটিয়ে আজি তোল্ দেখি মা লালজবা।
সেই জবারি পাঁপড়ী ফেটে উঠবে হঠাৎ হুম্‌কারি,
শক্তিমায়ের মুক্তিতনয় ঐ নিকটে দিন তা'রি।
নির্দ্দোষী আর নিষ্পাপীরা ধৈর্য্য ধরে' আজ দাঁড়া,
জাতির পাপের অগ্নিদাহে বীরের মতন রও খাড়া।
দুর্গতদের হিসাবনিকাশ আসছে করাল রক্তচোখ।
রুদ্রধাতার বজ্রাঘাত এ আশীর্ব্বাদের পদ্ম হোক্।
আত্মতেজে শৌর্য্যে দাঁড়া সর্ব্বনাশের বন্দনাতে,
রুদ্র আঘাত জীবন তোদের বাজাক্ নবীন ঝঞ্ঝনাতে।
সর্ব্বনাশের মুকুট পরি' বর্ব্বরতায় চরণদানি'
চল্ দাঁড়াবি বজ্রপায়ে লক্ষকোটি বজ্রপানি।
অগ্নিহুলুক প্রলয় শিখায় জগন্নাথের গাওরে গান,
ভগ্নীভাই আজ মগ্ন ধ্যানে শুদ্ধিতে কর্ অগ্নিস্নান।

—চৌদ্দ—

দারোগা তারণ তল্পাপাত্র সগৌরবে আহীর পাড়ায় গিয়ে পৌছুলেন।

বেশ সমারোহ করেই এসেছেন। বিশ্বাস নেই লোকগুলোকে। ফাঁকা আকাশের রৌদ্র আছে ওদের রক্তের মধ্যে, কেন্দ্রিত হয়েছে অতসী কাচের আলোর মতো তীব্র-তীক্ষ্ণতায়। আছে তালগাছ বিদীর্ণ করা বজ্রের গর্জন—মূল শুদ্ধ গাছ উপড়ে নেওয়া ঘূর্ণির অমানুষী উল্লাস। বিশ্বাস নেই—বিশ্বাস নেই!

রিভলভার নিয়েছেন, সঙ্গে ত্রিশ রাউণ্ড্ গুলি। এ-এস্-আই বদরুদ্দিনের সঙ্গে বন্দুক। তা ছাড়া বন্দুকধারী দু'জন কনেস্টবল, জন আষ্টেক চৌকীদারও।

কনেস্টবল আর চৌকিদারদের আগেই রওনা করে দিয়েছিলেন, তারা যখন গ্রামের কাছাকাছি এসেছে, তখন সাইকেল নিয়ে তিনি আর বদরুদ্দিন এসে ধরেছেন তাদের। তারপর সন্ত্রস্তভাবে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে এসে ঢুকেছেন আহীর পাড়ায়।

নিমগাছের ছায়ার নিচে বড় একখানা আটচালা ঘর। আট দশটা মহিষ চরছে আশে পাশে। বরেন্দ্রভূমির মাঠের মহিষ। নিরীহ দুর্বল জীব নয়; বন্য-মহিষের মতো বিশাল বপু—মাথার ওপর খরশৃঙ্গে আতঙ্কজনক সম্ভাবনা।

দারোগা বললেন, ওগুলো কী?

বদরুদ্দিন বললেন, মোষ স্যার।

তারণ চটে উঠলেন।

—মোষ যে তা আমিও জানি। আমি কি গোরু যে আমায় মোষ চেনাতে এসেছেন? সে কথা বলছিনা। মানে, ওগুলো গুঁতোয় কিনা?

বদরুদ্দিন সন্দিগ্ধ চোখে অতিকায় প্রাণীগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন—কী করে বলব স্যার, আমার সঙ্গে তো ওদের আলাপ নেই।

তারণ একবার কট্‌মট্ করে তাকালেন বদরুদ্দিনের দিকে।

বললেন, আলাপ থাকলে কি আর থানার এ-এস্-আই হতেন? ওইখানেই বাঁধা থাকতেন।

—কী বলছেন স্যার?—বদরুদ্দিনের চোখে বিদ্রোহ দেখা দিলে।

—না, কিছুনা।—তারণ সাম্‌লে নিলেন। লীগের মন্ত্রীত্ব—কাউকে চটানো ঠিক নয়। সব ভাই-বেরাদারের দল। কখন পেছন থেকে চুকলি খেয়ে দেবে—তারপরেই ভবিষ্যতের পথটি একেবারে বন্ধ। আর কিছু না হোক, ট্রান্সফার তো নির্ঘাৎ। দুর্ঘটনা হিসেবে সেটাও কম মর্মান্তিক নয়। এটা জেলার একটা বিখ্যাত ক্রিমিন্যাল্ থানা—একদল অত্যাচারী জোতদারও আছে। সুতরাং প্রাপ্তিযোগের ব্যাপারে থানাটা অনেকের কাছেই লোভনীয়। পট্ করে যদি সদরের কাছাকাছি কোথাও বদ্‌লি করে দেয়, তা হলে বসে বসে বেলপাতা শুঁকতে হবে।

সুতরাং তারণ মৃদু হাসলেন, একটু রসিকতা করছিলাম আপনার সঙ্গে।

—ওসব রসিকতা আমার সঙ্গে করবেন না স্যার, আমার ভালো লাগেনা।—হাঁড়ির মতো মুখ করে জবাব দিলেন বদরুদ্দিন।

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছেন দু'জনে। একটু পেছনে পেছনে আসছে চৌকিদার আর কনেস্টবলেরা। দিন দুইয়েক আগে কী করে একটা খাসি বাগিয়েছিলেন দারোগা, সেই সম্পর্কে সরস আলোচনা চলছে তাদের মধ্যে। সুতরাং একটু দূরে থাকাই নিরাপদ।

একজন চৌকিদার বলছিল, তুমি বুঝি ভাগ পাও নাই চৌবেজী?

চৌবে ঘৃণাভরে জবাব দিলে, হামি গোস্-উস্ খাইনা—ব্রাহ্মণ আছি।

—সব ব্রাহ্মণকেই চিনা আছে হে—দ্বিতীয় চৌকিদার মিটি মিটি হাসল।

চৌবে কানে আঙুল দিলে, ছিঃ ছিঃ—উ সব মত্ বোলো।

দ্বিতীয় কনেস্টবল বামাচরণ বাঙালি। ক্লাশ এইট্ পর্যন্ত বিদ্যা। একটা সুপিরিয়রিটি কম্প্লেক্স আছে তার—। থানায় যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে এল-সি—লোকে তাকে সম্মান করে মুহুরীবাবু বলে—চৌবের মতো পাহারাওলা সাহেব বলেনা। কিন্তু এই সমস্ত জরুরি ব্যাপারে তার পদমর্যাদা ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়—পট্টি পাগড়ী এঁটে তাকেও বেরিয়ে পড়তে হয় বন্দুক কাঁধে করে। নিতান্ত অতৃপ্ত বিরক্তির সঙ্গে বেরোয় বামাচরণ—পোষাকে না হোক, অন্তত মুখের চেহারায় টেনে রাখতে চেষ্টা করে একটা গাম্ভীর্যের মুখোস। বিছিয়ে রাখতে চায় আভিজাত্যের আবরণ।

সুতরাং বামাচরণ কিছু বলল না, শুনে যেতে লাগল।

তৃতীয় চৌকিদার বললে, মিছাই খালি দারোগার দোষ দেছেন। উ জমাদারটাই কি কম ঘুঘু হে! হামার দুই দুইটা রাওয়া মোর্‌গা বেমালুম প্যাটত্ সান্ধাই দিলে!

—এই চুপ চুপ। শুনিবা পাবে। থামি গেইছে।

সত্যিই থেমে গেছেন তারণ। মোষগুলোর কাছাকাছি এসে পড়েছেন।

—বদরুদ্দিন মিঞা?

—বলুন স্যার।

—সামনে মোষ।

বদরুদ্দিন বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছি স্যার। আমার চোখ আছে, একজোড়া চশমাও আছে।

—হুঁ!—দারোগা গম্ভীর হলেন: গুঁতোবে নাকি?

—কিছুই বলা যায়না স্যার!—বদরুদ্দিন পরম তৃপ্তিতে হাই তুললেন একটা।

ভ্রূকুঞ্চিত করে লক্ষ্য করতে লাগলেন তারণ। এই শৃঙ্গী প্রাণীগুলো সম্পর্কে তিনি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত—এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত দারোগা হয়েও এদের সম্পর্কে তাঁর একটা ভয়াবহ বিভীষিকা। কারণ আছে। ছেলেবেলায় একবার একটা এঁড়ে গোরু তাঁকে গুঁতিয়ে নর্দামায় ফেলে দিয়েছিল—সেই থেকে তিনি জীবগুলোকে আদৌ পছন্দ করেন না।

—তা হলে দাঁড়ান, পেছনের ওদের আসতে দিন—দারোগা বললেন।

—ওরা কা ভাববে স্যার? মোষের ভয়ে এগোতে পারছেন না আপনি?—একটা চিমটি কাটলেন বদরুদ্দিন।

—তা বটে।—দারোগা উত্তেজনা বোধ করলেন। কাপুরুষতার এই রকম অপবাদ সহ্য করা অসম্ভব। কোমর থেকে খুলে নিলেন রিভলভার।

—ওকি স্যার, রিভলভার আবার কেন?

—তেড়ে এলে গুলি করব।

—আপনি যে হিন্দু স্যার—বদরুদ্দিন আবার হাসলেন: ধর্মে বাধবে যে।

—না, বাধবে না। গোরু মারলে পাপ হয়, কিন্তু মোষ মারলে কা হয়, তা শাস্ত্রে লেখা নেই—সন্তর্পণে অগ্রসর হলেন তারণ।

কিন্তু মোষগুলো লক্ষ্যই করলনা তাঁদের। যেন লক্ষ্য করবার যোগ্য বলেই মনে করলনা। প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে মাটি থেকে কী একরাশ চিবিয়ে চলল তারা।

—যাক—বিপদের সীমানা পার হয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন দারোগা: একটা সমস্যা মিটল। কিন্তু যা বলছিলাম। সামনের ওই আটচালাটি কার বলুন তো?

বদরুদ্দিন জবাব দিলেন, যমুনা আহীরের।

—যমুনা আহীর!—দারোগা কপাল কোঁচকালেন: যেন চেনা-চেনা ঠেকছে নামটা।

—হাঁ স্যার। দাগীর খাতে নাম আছে।

—হুঁ, বুঝেছি। কিন্তু ক জাতের?

—ডেঞ্জারাস্। পাঁচ সাতটা হাঙ্গামায় জড়িয়েছে এ পর্যন্ত। একবার একটা খুনের দায়েও পড়েছিল—কিন্তু জালে পড়েনি, ছিটকে বেরিয়ে গেছে।

—এবার আর বেরোবেনা, গলা টিপে ধরব—ভয়াবহ একটা মুখ করলেন তারণ তলাপাত্র: জটাধর মার্ডারের ব্যাপারে ওর হাত থাকতে পারে, কী বলেন?

—কিছুই অসম্ভব নয় স্যার। চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

তারণ আবার থামলেন। চিন্তিত মুখে বললেন, জোয়ান বুঝি খুব?

—বিরাট।—এতক্ষণে বদরুদ্দিনের মুখেও চিন্তার

ছাপ পড়েছে : আকারে প্রকারে ওই মোষগুলোর মতোই হবে। আর মেজাজও প্রায় ওই রকম।

—তা হলে দাঁড়ান। ওদের আসতে দিন। যে রকম লোক বললেন, হঠাৎ যদি ঝাঁপিয়ে টাঁপিয়ে পড়ে, গোলমাল হতে পারে একটা। কী বলেন ?

—নিশ্চয়—এবার বদরুদ্দিনও সমর্থন জানালেন। বাগানের মোষ সম্পর্কে তারণের মতো তাঁর অহেতুক স্নায়বিক দুর্বলতা নেই বটে, কিন্তু যমুনা সম্পর্কে কোনো বিশ্বাস নেই তাঁরও। বিশেষ করে কিছুদিন থেকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগছেন—একটু শান্তিপূর্ণ ভাবেই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলাই পছন্দ করেন তিনি। বন্দুক একটা সঙ্গে এনেছেন বটে, কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে না হলেই আন্তরিক সুখী হবেন।

তারণ একটা সিগারেট ধরালেন।

—বুঝলেন বদরুদ্দিন মিঞা, এরিয়াটা এমনিতে মন্দ নয়। কিন্তু এইসব লোকের জন্যেই যা কিছু গোলমাল।

বদরুদ্দিন 'সাদী'র একটা বয়েৎ আওড়ালেন।

—সে তো ঠিক কথা স্যার। কিন্তু ব্যাপার কী, জানেন ? গোটা কয়েক কাঁটা না থাকলে কি আর গোলাপ তোলা যায় ?

গোলাপ না হোক, গোলগাল পাকা ফল তো বটেই। কিন্তু কাঁটা বড্ড বেশি। মাঝে মাঝে তারণ তলাপাত্রেরও জিতেন্দ্রিয় হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। আজ পনেরো বছর দারোগাগিরি করে অনেক পোড় খেয়েছেন—কিন্তু বুকের ধুক্‌পুকুনি থামেনি।

চৌকিদার আর কনেস্টবলের দলটা এসে পড়ল।

তারণ এদিক ওদিক তাকালেন।

—লোকজন কাউকে তো দেখছি না। সব গেল কোথায় ?

—কাজে-কর্ম্মে গেছে হয়তো। মোষ চরাতেও যেতে পারে।

—হুঁ ! ডাকো তো দেখি কেউ –

চৌকিদারেরা মুখিয়েই ছিল। তিন চারজন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল : যমুনা—যমুনা হে—

যমুনা এলনা—দোর গোড়ায় দেখা দিলে একটি মেয়ে। ঝুম্‌রি। রূপের সঙ্গে কঠিন একটা নিষ্ঠুরতা মেশানো। রূপোর কাঁকন-পরা শক্ত বাহু। জ্বালাধরা চোখ। নাগিনা।

দোরগোড়ায় পুলিস দেখে একটা ভয়ের চমক খেলে গেল তার মুখের ওপর দিয়ে।

দারোগা মেয়েটার দিকে তাকালেন—কিন্তু চোখের ওপর চোখ রেখেই নামিয়ে নিলেন মাটিতে। দৃষ্টিটা যেন সহ্য করা যাচ্ছে না। অতসী কাচ। প্রতিফলিত—কেন্দ্রিত সূর্যের আলো।

—কে মেয়েটা ?—মুখ ঘুরিয়ে বদরুদ্দিনকে প্রশ্ন করলেন তারণ।

জবাব দিলে বামাচরণ। অভিজ্ঞ গম্ভীর গলায় বললে, ওর মেয়ে—ঝুম্‌রি। বছর খানেক আগে একটা মারা-মারির ব্যাপারে একেও থানায় আনতে হয়েছিল স্যার। রেকর্ড আছে।

—হুঁ। বাঘের বাচ্চা বাঘ—নিজের অজ্ঞাতেই যেন স্বীকারোক্তি করলেন দারোগা।

নির্ণিমেষ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটা—কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। দারোগার হয়ে বদরুদ্দিনই প্রশ্ন করলেন—তোর বাপ কোথায় রে ?

—শো গেয়া !

—শো গেয়া ! বামাচরণ ঝাঁকিয়ে উঠল : আমরা এতগুলো লোক এই ঠাটা-পড়া রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ঠায় পুড়ছি আর তিনি শো গেয়া। ডাক, ডাক—

—ব্যাটা য্যান্ লাটসায়েব হছে !—একজন চৌকিদার ফোড়ন কাটল। এই মহল্লায় রাতে তার চৌকি দিতে হয় না—তা ছাড়া সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীও আছে। সেই ভরসায় আরো জোরের সঙ্গে সে তার বক্তব্য পেশ করল : ডাকি উঠাও জল্‌দি !

মেয়েটা ঘরের ভেতর চলে গেল।

প্রখর ধারালো চেহারা। রূপের সঙ্গে নিষ্ঠুর কঠিনতা একটা। চোখ দুটো অদ্ভুত জ্বলন্ত। দারোগা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন মুহূর্তের জন্যে। ইস্পাত। নাগিনী।

শশব্যস্তে যমুনা আহার প্রবেশ করল।

—দারোগাবাবু, জমাদারবাবু! গোড় লাগি। তা রোদে কাঁহে দাঁড়াইয়ে আছেন ? আইয়ে বৈঠিয়ে—

বারান্দায় রাখা খাটিয়া আর চৌপাইগুলোর দিকে

দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে আহ্বান জানাল দলটাকে। সাইকেল নামিয়ে রেখে দারোগা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। তাঁদের দেহের ভারে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে একটা আর্তনাদ জাগল খাটিয়ায়।

কিন্তু উদ্দেশ্য আতিথ্য নয়, কর্তব্য। যমুনার বিশাল দেহটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে একবার রিভলভারের বাঁটটা স্পর্শ করলেন দারোগা—যেন আত্ম-বিশ্বাস সঞ্চয় করে নিলেন। তারপর বার করলেন পকেট থেকে তাঁর নোটবই আর কপিয়িং পেন্‌সিলটা।

—তোমার নাম ?

—যমুনা আহীর হুজুর।

—পেশা ?

—হামরা আহীর হুজুর। দহি, ক্ষীর, ঘী তৈয়ার করি, বেচি।

—আর কিছু করো ?—দারোগা নোট বই থেকে মুখ তুললেন। সন্তর্পণে এগোতে হবে এইবার, আস্তে আস্তে ঢুকতে হবে কাজের কথায়। টোকা দিয়ে দেখা দরকার।

—আর কী করব হুজুর ? মহিষ-টহিষ চরাই—সরল উত্তর দিলে যমুনা আহীর।

—কিছু করো না—না ?—রিভলভারের বাঁটের ওপর আলগোছে বাঁ হাতটা ফেলে রেখে দারোগা বললেন, এই মারামারি, খুন জখম ?

আধহাত জিভ কেটে যমুনা বললে, না।

—না ? থানার খাতা কিন্তু অন্য রকম বলে।—দারোগা আর একটা সিগারেট ধরালেন : তা ছাড়া চেহারাও তো তেমন সুবিধে নয় বাবু। ভালোমানুষ বলে তো মনে হয় না।

—দেখছেন না, ব্যাটার চোখ কী রকম লাল ? বদরুদ্দিন দারোগাকে আর একটু আলোকদানের প্রয়াস করলেন।

—চোখের আর দোষ কী হুজুর ?—যমুনা আপ্যায়নের হাসি হাসল : হামি থোড়া থোড়া গাঁজা পী।

—গাঁজা পী ?—দারোগা ভ্রুকুটি করলেন : সে গুণটাও আছে তা হলে। আর দারু ?

—মিল্‌নেসে থোড়া থোড়া পী।

—কোনোটাই বাকী নেই স্যার। একেবারে সর্ব-গুণান্বিত—বদরুদ্দিন আবার সংশোধনী জুড়ে দিলেন। দারোগা অত্যন্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন যমুনাকে। না—সন্দেহ নেই। এ লোকটা জটাধরকে খুন যদি নাও করে থাকে, খুন করার যোগ্যতা রাখে নিশ্চয়ই।

—জটাধর সিংকে চিনতে তুমি ?

একটা চকিত সতর্কতার আভা খেলে গেল যমুনার মুখের ওপর। আস্তে ঢোঁক গিলল একবার।

—কে জটাধর সিং ?

বদরুদ্দিন খিঁচিয়ে উঠলেন : ন্যাকামি হচ্ছে—না ? জটাধরকে চেনো না ? কুমার ভৈরবনারায়ণের বরকন্দাজ ?

—কুমার সাহেবের বরকন্দাজ তো ঢের আছে হুজুর। কে জটাধর সিং ?

—আহা, ভাজা মাছটা উল্‌টে খেতে জানো না ?—তারণ ভেংচি কাটলেন : একেবারে কেষ্টর জীব! যে লোকটা বিলের মধ্যে খুন হয়েছে, জানো তাকে ?

—না।

—এখন তো জানবেই না।—দারোগা ক্রূর হাসি হাসলেন, আর একবার ছুঁয়ে নিলেন রিভলভারটা, ভালো করে দেখে নিলেন নিজের দলটাকে : আমিও তারণ তলাপাত্র, জানিয়ে ছাড়ব। যাক—তোমার ঘর খানাতল্লাস করব।

—করুন হুজুর।

—ঢুকুন বদরুদ্দিন সাহেব—ভালো করে খোঁজ খাঁজ করুন।

বদরুদ্দিন বিব্রত বোধ করলেন। এ দারোগার অন্যায়। নিজে স্বার্থপরের মতো নিরাপদে বসে থেকে তাঁকে ঠেলে দিচ্ছেন বাঘের গর্তের ভেতর! বিশ্বাস নেই —এ লোকগুলোকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। হাতের নাগালে পেলে যে কোনো সময় ঘাড়ের ওপর একখানা দা বসিয়ে দিতে পারে।

—আপনিও চলুন না স্যার—

—আপনি গেলেই যথেষ্ট হবে—সিগারেটটায় টান দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে বললেন দারোগা।

বদরুদ্দিন বিপন্ন মুখে তাকালেন এদিক ওদিক।

—বামাচরণ এসো, চৌবে, তুম্ ভি আও।

কিন্তু সার্চ করে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। মিলল শুধু লোহার তার দিয়ে গাঁটে গাঁটে জড়ানো দুখানা অতিকায় লাঠি।

দারোগা বললেন, লাঠি দুটো নিয়ে চলুন! রক্ত টক্ত ধুয়ে ফেলেছে হয়তো। কিন্তু কেমিক্যাল্ অ্যানালিসিস্ করলে কিছু না কিছু ট্রেস্ পাওয়া যাবেই।

—আর লোকটা? ছেড়ে যাবেন?

—পাগল!—দারোগা এবার খাপ থেকে রিভলভারটা বের করলেন, যমুনা, তোমাকে গ্রেপ্তার করা গেল।

—গ্রেপ্তার!—যমুনা কিন্তু ভয় পেল না। অল্প একটু হাসল: কেন হুজুর?

—জটাধর সিংয়ের খুনের দায়ে। চৌবে, পাকড়ো ইসকো।

একটা সন্ত্রস্ত প্রস্তুতি পড়ে গেল। কিছু যেন আসন্ন হয়ে আসছে। কোনো দুর্ঘটনা, কোনো দুর্যোগ। এক্ষুনি ভয়ংকর কিছু একটা হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই হল না। যমুনা আবার হাসল। নিরুত্তরে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে চৌবের দিকে।

হাতকড়া পরালেন বদরুদ্দিন। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। মনে হল, যেন বুকের ওপর থেকে একতাল পাথর নেমে গেছে—কেটে গেছে একটা ভয়ানক ফাঁড়া। এত সহজে এমন প্রকাণ্ড মানুষটাকে গ্রেপ্তার করা যাবে—এ যেন কল্পনাও ছিল না।

দারোগা বললেন, চলুন বদরুদ্দিন মিঞা। এবার আর দু চারটাকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। এ রকম সাসপেক্টেড্ আর কে কে আছে বলুন তো?

প্রজ্ঞাবানের গম্ভীর গলায় বামাচরণ বললে, দুখীরাম আহীর, চুণ্ডি আহীর, গণ্শা আহীর—

—চলুন, দেখা যাক একে একে।

দারোগা উঠে দাঁড়ালেন। যমুনাকে নিয়ে নেমে এলেন দাওয়ার বাইরে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো ঝুমরি। রূপের সঙ্গে নিষ্ঠুরতা। চন্দ্রবোড়া সাপের মতো সৌন্দর্যের সঙ্গে বিষাক্ততা; শানানো ইস্পাতের মতো দীপ্তির সঙ্গে ঘাতকের ইঙ্গিত।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে যমুনা একটু হাসল।

—হাজতে চললাম বেটি। কবে আসব ঠিক নেই। ভৈঁসাগুলোকে দেখিস।

ঝুমরি কথা বলল না। শুধু অতসী কাচের মতো চোখের অগ্নিদৃষ্টি ছড়িয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর—

তারপর দারোগা যেই কয়েক পা এগিয়েছেন, অমনি তীব্র তীক্ষ্ণ প্রচণ্ড গলায় একটা শিসের আওয়াজ করল সে। রোদে পোড়া মাঠের ওপর দিয়ে সেটা সাইরেনের মতো দূর দূরান্তে ভেসে গেল।

আর সভয়ে দারোগা দেখলেন এক মুহূর্তে মাথা তুলেছে শান্ত নিরীহ মহিষের পাল। তাদের চোখগুলোতে আদিম অরণ্যের অমার্জিত বন্য হিংসা। লেজ আকাশে তুলে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সাত আটটা ছুটে আসছে তাঁদের দিকে।

গুলি করবার সুযোগ পেলেন না কেউ—হয়তো সাহসও হল না। দুই লাফে বদরুদ্দিন নিমগাছটায় উঠে পড়লেন—তাঁর তৎপরতা দেখলে বানরও লজ্জা পেত। চৌকিদারদের একজন সিংয়ের গুঁতোয় ছিটকে পড়ল—বাকী সব যে যেদিকে পারে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। তারণও হাতের সাইকেলটা ছুঁড়ে ফেলে গোটা কয়েক লাফ মারলেন, তারপর আবিষ্কার করলেন, একটা পাঁকে ভরা দুর্গন্ধ ডোবার মাঝখানে গলা পর্যন্ত তলিয়ে আছেন তিনি।

আর সেই অবস্থায়, বিস্ফারিত চোখ মেলে তারণ দেখতে পেলেন—বহু দূরে বিন্নাঘাসের বন ভেঙে তীব্রগামী তীরের মতো একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে। দেখতে দেখতে দৃষ্টির বাইরে সে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

সে যমুনা আহীর!

কিন্তু ভোঁস্ ভোঁস্ করে চলন্ত পাহাড়ের মতো ওটা কি এগিয়ে আসছে এদিকে? মোষ? চক্ষের পলকে পচা ডোবার ভেতরে ডুব মারলেন তারণ তলাপাত্র।

(ক্রমশঃ)

পশ্চিম বাংলায় আখের চাষ

শ্রীঅমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এস্‌-সি, ডিপ-এগ্রি (ক্যাণ্টাব)

পশ্চিম বাংলায় আখ চাষ হয় প্রায় ২ লক্ষ বিঘা জমিতে অর্থাৎ মোট চাষের জমির শতকরা মাত্র ০'৫৮ ভাগে ও যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তাহাতে বছরের ৪ মাসও চলে না। এই তুলনায় বিহারে ইহার চাষ প্রায় ১২ লক্ষ বিঘা ও উত্তর প্রদেশে ৫৫ লক্ষ বিঘা এবং ইহা তাহাদের মোট চাষের জমির শতকরা যথাক্রমে ২'১৮ ভাগ ও ৪'৮৬ ভাগ। পাঞ্জাবের অবস্থা মোটামুটি বিহারের মত।

আমাদের আখ-চাষ কম হওয়ার দরুণ অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, পশ্চিম বাংলার আবহাওয়া আখ চাষের উপযুক্ত নয়। বস্তুতঃ এখানকার আবহাওয়া আখ চাষের পক্ষে বিহার ও উত্তর প্রদেশের তুলনায় অনেক ভাল। এখানে বৃষ্টি হয় বেশী ও সেইজন্য জলসেচ ছাড়াও আখ-চাষ করা সম্ভবপর হয়। এখানে আখের জমির শতকরা ১০ ভাগেও জল-সেচের ব্যবস্থা নাই। এই তুলনায় জল সেচের সুবিধাযুক্ত আখের জমির পরিমাণ উত্তর প্রদেশে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ, বিহারে ৩০-৪০ ভাগ, পাঞ্জাবে প্রায় ৮০ ভাগ, মাদ্রাজে ৯০-৯৫ ভাগ এবং মহীশূর, বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদে প্রায় ৯০-১০০ ভাগ। দ্বিতীয়তঃ, পাঞ্জাব বা উত্তর প্রদেশের কোন কোন জায়গায় তুষারপাত ও অতিরিক্ত শীতে আখের যেরূপ ক্ষতি হয়, পশ্চিম বাংলায় সে আশঙ্কা নাই। এইসব কারণে এখানকার আখের বিঘাপ্রতি ফলন যেখানে ১৫০-২০০ মণ, সেখানে পূর্ব-পাঞ্জাবের গড় ফলন মোটামুটি ১০০ মণ এবং বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ১০০-১৫০ মণ। এখানকার আবহাওয়ায় আখের মধ্যে চিনির অনুপাতও বেশী হয়। বিহার ও উত্তর প্রদেশে চিনির কলে সাধারণতঃ আখের ওজনের শতকরা ১০ ভাগের কম চিনি পাওয়া যায়; সেই তুলনায় পশ্চিম বাংলায় ১০'৮ ভাগ পাওয়া যায়। কাজেই পশ্চিম বাংলায় আখের ফলন ও গুণ দুই-ই ভাল হয়, অথচ এখানে বিহার বা উত্তর প্রদেশের মত আখ চাষের উন্নতির চেষ্টা ততটা হয় নাই।

পশ্চিম বাংলায় আখের চাষ

কাটিং বাছাই

এককালে বাংলাদেশে যথেষ্ট আখ-চাষ ছিল। অনেকের মতে বাংলার পুরাতন নাম গৌড় শব্দটি 'গুড়' ও তাহার রাজধানী পৌণ্ড্র-বর্ধন শব্দটি এখানকার 'পুরি' আখের নাম হইতে উদ্ভূত। চিনি-শিল্প সংরক্ষিত হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষ যখন চিনির জন্য যবদ্বীপের উপর নির্ভর করিত, তখনও এখান হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানী হইত। ইহার পর সংরক্ষণের সুবিধায় যখন এদেশে চিনির কল স্থাপিত হইতে লাগিল তখন হইতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বিহার বা যুক্তপ্রদেশে রেলপথের খুব সুবিধা থাকায় ও সেখানে আখ একটি বিশেষ লাভজনক-অর্থকরী ফসল হওয়ায় সেখানে চিনির কল স্থাপনের যতটা সুবিধা হইয়াছে বাংলাদেশে ততটা সুবিধা হয় নাই। বাংলায় পাটের মত

একটি পণ্য শস্যের ব্যাপক চাষের সুবিধা থাকায় এখানকার চাষীরা আখ চাষের প্রতি অনেকটা উদাসীন ছিল। ফলে উত্তর প্রদেশে চিনির কলের সংখ্যা যেখানে ৭০ টিরও বেশী ও বিহারে ৩০টির বেশী' সেখানে পশ্চিম বাংলায় মাত্র ২টি ও তাহার মধ্যে আবার একটি অনেক দিন হইতেই বন্ধ।

এই অবস্থায় এখানকার আবহাওয়া আখ চাষের খুব অনুকূল থাকা সত্ত্বেও এখানে চিনি ও গুড়ের ঘাটতি রহিয়া গিয়াছে। বর্তমানে প্রধান প্রধান খাদ্য-শস্য, পাট ইত্যাদির অভাব থাকায়, আখের চাষ বাড়ানোর উপায় নাই। বস্তুতঃ এই সব কারণে গত কয়েক বছরে আখ-চাষ প্রায় ১০ হাজার বিঘা কমিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় অন্ততঃ আখ-চাষ প্রণালীর উন্নতি বিধান করিয়া বিঘাপ্রতি ফলন বাড়ানোর চেষ্টা করা যাইতে পারে। এখানে অনুকূল আবহাওয়ার দরুণ যদিও গড় ফলন বিহার বা উত্তর প্রদেশের তুলনায় ক্রমাগতঃ হইতেছে। এই সব উন্নত জাতের ফলন বেশী, রসে চিনির অনুপাত বেশী, রোগপ্রবণতা কম ও শক্ত হওয়ার দরুণ শিয়াল প্রভৃতি বন্য জন্তুর উপদ্রবে ও ঝড়-বাতাসে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। ১৯৪০ সালে দেখা যায় যে, তাহার ১০ বৎসর পূর্বের তুলনায় এদেশে গড় ফলন শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। উন্নত জাতের ব্যবহারই ইহার সর্বপ্রধান কারণ। এইজন্য দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর যে সব জাত উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার চাষ বাড়ানর প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার। বর্তমানে কোয়েম্বাটোর ৪২১, ৫২৭, ৪১৯, ৩১৩ প্রভৃতি জাতগুলি পশ্চিমবাংলার পক্ষে উপযোগী।

সার প্রয়োগে আখের ফলন অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়, আখের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রয়োজন বেশী। প্রতি পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগে'- সার অনুযায়ী বিঘা প্রতি ১মণ হইতে ৩মণ পর্যন্ত আখের ফলন বাড়ে। বিঘা

কোর্টিং লাগানো

সার প্রয়োগ

কিঞ্চিৎ বেশী, পৃথিবীর প্রধান প্রধান আখ-উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় অনেক কম। যবদ্বীপ বা হাওয়াই দ্বীপে আখের বিঘাপ্রতি গড় ফলন প্রায় ৫০০ মণ। পেরু, পোটা, রিকো ও অন্যান্য প্রায় দেশেই আখের ফলন আমাদের তুলনায় বেশী। ভারতবর্ষের মধ্যেও বোম্বাই, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক স্থানেই বিঘাপ্রতি ৪০০-৪৫০ মণ আখ পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলার সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রে সাধারণতঃ. বিঘাপ্রতি ৩০০-৩৫০ মণ আখ ফলে যেখানে আমাদের গড় ফলন মাত্র ১৫০-২০০ মণ। চেষ্টা করিলে যে ফলন বাড়ান যায়, ইহাই তাহার নিদর্শন। ফলন বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিব।

ফলন বৃদ্ধির জন্য ভাল-জাতের বীজ ব্যবহার করা প্রয়োজন। গবেষণার ফলে অসংখ্য উন্নত জাতের আখ উদ্ভাবিত হইয়াছে ও প্রতি মোটামুটি ৪০ পাঃ নাইট্রোজেন দিলে ফসল বেশ ভাল হয়। এই জন্য বিঘা প্রতি ৪০-৫০ মণ গোবর বা কম্পোষ্ট, ২মণ খইল ও ১মণ এ্যামোনিয়ম সালফেট দরকার। গোবর না দিয়া সবুজ সার দেওয়াই ভাল। ইহা ব্যবহারেই বিঘা প্রতি প্রায় ৫০মণ আখ বেশী ফলে।

মাটিতে ফস্‌ফেটের অভাব হইলে, বিঘা প্রতি ১মণ হাড়ের গুঁড়া দিতে হয়। লাল মাটিতে প্রতি বিঘায় ১মণ চুণ দেওয়া দরকার। পটাশ সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না; কারণ মাটিতে সাধারণতঃ যাহা থাকে তাহাই যথেষ্ট।

সার প্রয়োগের সময়েরও বিশেষ গুরুত্ব আছে। গবেষণার ফলে জানা যায়, ডগা বসাইবার ২মাস আগে গোবর, কমপোষ্ট ও হাড়ের গুঁড়া, ডগা বসাইবার সময়ে এবং বিয়াম (tillers) বাহির হইবার

কালে এ্যামোনিয়াম সালফেট ও খইল প্রয়োগ করিলে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়।

সেচ

ফলন বৃদ্ধির জন্য সেচের ব্যবস্থা বিশেষ দরকার। উপযুক্ত সেচ ছাড়া সার প্রয়োগে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। বর্ষার আগে জলের অভাবে আখের চারার বাড় ব্যাহত হইলে ফলনও কম হয়।

চাষ পদ্ধতি

চাষ-পদ্ধতির ত্রুটির জন্য ফলন কম হয়। ডগা বসাইবার সময় ও প্রণালী, ডগার গুণাগুণ, ফসলের অন্যান্য পরিচর্যা প্রভৃতির উপর ফলন খুবই নির্ভর করে।

যে মাটিতে শীতকালে বেশ রস থাকে বা যেখানে জল-সেচের সুবিধা আছে সেখানে মাঘ ফাল্গুনে ডগা বসান উচিত। পরীক্ষায় জানা যায়, ফাল্গুনের পরে ডগা বসাইতে যত দেরী হয়, ফলনও তত কম হয়। চৈত্রের শেষের দিকে প্রতিদিনের বিলম্বে প্রায় ১০মণ হারে ফলন কমিতে থাকে।

ডগার 'চোখ' সতেজ না হইলে প্রথম হইতেই চারা দুর্বল হইয়া পড়ে ও অন্যান্য অবস্থা অনুকূল থাকা সত্বেও ফলন যথেষ্ট কম হয়।

পরীক্ষায় দেখা যায় যে, অগভীর নালীতে আখ লাগাইলে বা আখের সারি ঘন হইলে বিয়ান কম হয় ও ইহার জন্য ফলনও যথেষ্ট কমিয়া যায়।

গাঁইট হওয়া আরম্ভ করিলেই চারার গোড়ায় মাটি দেওয়া দরকার। তাহাতে বিয়ান ছাড়িবার সুবিধা হয়। পরীক্ষায় জানা যায় যে, এই সময় সার দিলে বিয়ান খুব শীঘ্র বাহির হয়। বিয়ান অনেক দিন ধরিয়া বাহির হইতে থাকিলে গুচ্ছের এক একটি আখ এক এক সময়ে পরিণত (matured) হয়।

আখের পাতা ছাড়াইয়া পরিষ্কার রাখা ও গাছ বড় হইলে তাহার ছোট ছোট বিয়ান কাটিয়া ফেলা দরকার। গাছ যাহাতে মাটিতে পড়িয়া না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ গাছ মাটিতে পড়িয়া শাখা প্রশাখা বাহির হইলে রসের মিষ্টতা কমিয়া যায়।

আখ সময়মত কাটার উপরে গুড় বা চিনির ফলন ও গুণ দুইই নির্ভর করে। অপরিণত বা অধিক পরিণত আখে চিনির ভাগ কম থাকে।

মুড়ি আখের (Ratoon) চাষ করিতে হইলে ভালরূপে সার দেওয়া ও অন্যান্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহাতে ইহার ফলন পূর্ব-ফসলের তুলনায় কম হয় না। তবে ১ বৎসরের বেশী মুড়ি আখ না রাখিয়া শস্য-পর্যায় (Rotation) করা ভাল।

রোগ ও কীট-শত্রু

রোগ ও কীট শত্রুর আক্রমণে সচরাচর শতকরা অন্তত ১০ ভাগ ফলন কমিয়া যায়। ধসা রোগেই (Red-rot) সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি করে। ইহাতে আখের ভিতর লাল হইয়া যায়। ইহা দমনের জন্য উন্নত জাতের ব্যবহার, বাছাই-ডগা লাগান, ক্ষেতের জল নিকাশের ব্যবস্থা, ক্ষেত পরিষ্কার রাখা ও শস্য পর্যায় করা আবশ্যক।

মাজরা পোকার (Stem-borer) আক্রমণেও ভয়ানক ক্ষতি হয়। এই পোকার শত্রু আর এক পোকা আছে। অনেক জায়গায় তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইহা দমনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা দমনের জন্য

আখ কাটা

উন্নত জাতের ব্যবহার, আক্রমণের প্রারম্ভেই পোকা ধ্বংস করা ও ক্ষেত পরিষ্কার রাখা দরকার।

ডগা ছিদ্রকারীও এক রকম পোকা আছে। তবে তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ বেশী নয়। প্রথম হইতেই ব্যবস্থা করিলে, ইহার বিস্তার হইতে পারে না।

উঁই পোকার উপদ্রব কমাইবার জন্য নালীর মধ্যে অধিক পরিমাণে নিম বা রেড়ির খইল দেওয়া, ২৪ ঘণ্টা কাল ডগা ফিনাইল জলে (২ %) ভিজাইয়া রাখা, ডগার কাটা প্রান্তে সাবধানে আলকাতরা বা কেরোসিন লাগান, সেচের জলে আলকাতরা মিশান ইত্যাদি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রতি বিঘায় ১২—১৩ সের হারে গ্যামেক্সিন ডগা বসাইবার আগে নালীর মধ্যে ছিটাইয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়।

ভারতীয় শিল্পসমূহে গবেষণার স্থান

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস এম-এস-সি

মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র একদিন কৃষিপ্রধান, অনুন্নত জাতিসমূহের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ক্রমশঃ শিল্পোন্নয়নে মন দিয়ে, বিশেষ করে সমগ্র দেশের শিল্পক্ষেত্রে গবেষণার আবহাওয়া সৃষ্টি করে এই মহাজাতি স্বল্পকালের মধ্যেই শিল্পজগতে বিরাট প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারল এবং তার জাতীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধি বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। ১৮৮০ সালের পূর্বে মার্কিণে শিল্পসম্বন্ধীয় ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার বলে কিছুই ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যুত্ প্রভৃতি শিল্পে নূতন নূতন গবেষণা দ্বারা প্রভূত উন্নতি দেখা গেল। বেল, এডিসন, টমসন প্রভৃতি মনীষিগণ স্ব স্ব প্রতিভাবলে দেশীয় শিল্পসমূহে যুগান্তর আনয়ন করলেন এবং ঐ সকল আবিষ্কারের দ্বারা সমগ্র শিল্পজগত বেশ লাভবান হল।

বিগত প্রথম মহাসমরের সময় জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধির পরিচয় পেয়ে সমগ্র পৃথিবী বুঝতে পারল শিল্পগবেষণার অভাব এবং তখন বিবিধ শিল্পের কারখানাসমূহের মধ্যে সুসজ্জিত গবেষণাগার নির্ম্মাণের পরিকল্পনাসমূহ সর্ব্বত্র গৃহীত হল। তখন উৎসাহ পড়ে গেল, জার্ম্মান শিল্পসমূহের পেটেন্ট সংগ্রহ করে আমেরিকার রসায়ন প্রভৃতি বিবিধ শিল্পের উন্নতি সাধনে মন দেওয়ার। বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিসমূহের গবেষণাগার এত সুসজ্জিত ও বৃহৎ যে শিল্পোন্নয়নের জন্য গবেষণার প্রয়োজন সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। সেখানে প্রায় ৪,৭০০ বিজ্ঞানী গবেষণা ও পরীক্ষা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত আছে। আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল যখন প্রথম টেলিফোনের আবিষ্কার করেন তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত ঐ সকল গবেষণাগার দ্বারা কত মূল্যবান আবিষ্কারসমূহ সম্ভব হয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর।

আমেরিকার আদর্শ ভারতীয় শিল্পপতিগণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার কোন সন্দেহ নেই। তবে একথা বলা অন্যায় হবে না—যে পরিমাণ অর্থ ও উৎসাহ মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র শিল্পোন্নয়নে প্রয়োগ করেছে তার একাংশও এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ পায় নি। গ্রেট-বৃটেনও মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পবিস্তার গবেষণার উপযোগিতার বিষয় সম্যক উপলব্ধি করেছে এবং প্রথম মহাসমরের পর বৃটিশ শিল্পসমূহ প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মত জাপানের শিল্প-বিস্তার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুইটি পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের মাঝখানে জাপান যে পরিমাণ শিল্পোন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল তা সত্যই বিস্ময়কর। ১৯১৭ সালে জাপ সম্রাটের সৌজন্যে জাপানিজ ইনষ্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এণ্ড কেমিক্যাল রিসার্চ স্থাপিত হয়। ১৯৩৪ সালে ঐ ইনষ্টিটিউটে ৪০০ বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। এখান হতে প্রায় ৫০০ পেটেন্ট স্বত্ব গৃহীত হয়, যার প্রত্যেকটিই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তার চাষ একটি বিশিষ্ট শিল্প (Stimulated pearl Industry)। মিঃ মিকিমোটো এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কিকিচি মিৎসিকুরি প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিল্পের প্রথম পেটেন্ট স্বত্ব গৃহীত হয় ১৮৯৬ সালে। তখন মুক্তার আকৃতি অর্দ্ধবর্ত্তুল অবস্থায় ছিল। সুদীর্ঘ ৪৮ বৎসরব্যাপী গবেষণা দ্বারা পূর্ণবর্ত্তুল আকারের মুক্তাসমূহ তৈরী করা সম্ভব হল। এই বিরাট শিল্প সমুদ্রজলে নির্মিত ৯টি বৃহৎ কারখানায় বিস্তৃত আছে এবং প্রায় ৪০,০০০ একর পরিমিত স্থান এই সকল কারখানা নির্ম্মাণ করতে প্রয়োজন হয়েছে। গবেষণা দ্বারা শিল্প কি পরিমাণ বিস্তৃতি লাভ করতে পারে ইহা তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

ভারতীয় শিল্পসমূহের মধ্যে গবেষণার আবহাওয়া অত্যন্ত বিরল। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের রিসার্চ ল্যাবরেটরি-সমূহ মাত্র কাঁচামাল ও তৈরীমালের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করেই খালাস। অনেকে এমন কি অতি পুরাতন শিল্প-প্রক্রিয়াগুলিকে দেশবিদেশের গবেষণালব্ধ নূতন প্রক্রিয়া-সমূহের দ্বারা কিছুমাত্র উন্নত করতেও অনিচ্ছুক। হয়ত

একথা ঠিক যে সামান্য সংস্কার করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন মালের গুণ ও দাম বহুলাংশে বেড়ে যাবে। বাজারে একটি ঔষধ বা পণ্যদ্রব্য বেশ কাটতি দেখা যায় এবং দেশী কারখানায় প্রস্তুত বলে জনসাধারণের কাছে বেশ আদর পেয়েছে। ক্রমে ভাল ভাল বিলাতী মালের আমদানী বেড়ে গেল এবং দামও সস্তা হল। তখন পূর্বোক্ত ঔষধ বা পণ্যের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক। আধুনিক গবেষণা দ্বারা ঐ ঔষধ বা পণ্যের গুণ বাড়ান দরকার হবে, অবশ্য দামের দিকে নজর দিয়ে। জনসাধারণ যদি দেখে আগের থেকে কিছুভাল জিনিস পাওয়া যাচ্ছে তখন বিলাতী-প্রীতি কিছু কমতে বাধ্য। কেবল স্বদেশীয়ানার দোহাই দিলেই চলবে না, দেখতে হবে সময়োপযোগী সংস্কারসমূহ মেনে নেওয়া হচ্ছে কিনা। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে গবেষণার মনোভাব বেড়ে যাচ্ছে এবং ভারতবর্ষও তার সঙ্গে তাল রেখে চলবে।

ভারতীয় শিল্পসমূহের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে মিঃ মোরারজি দেশাইএর উক্তিটি উদ্ধৃত করা হল:—

"We in this country have not yet taken to research and experimentation to the required extent. We are only getting here in plant and machinery, what we see elsewhere, and after importing these we only learn to run them. But if we are to develop our industry, production of machinery has to go hand in hand with industrial research. Only then we will be able to work our industries successfully."

অর্থাৎ—"আমাদের দেশে এখনও পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা ও পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হয়নি। মাত্র বিদেশের অনুকরণে শিল্পের আয়তন-বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানী করতে সক্ষম হয়েছি এবং ঐসকল যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষায় আমরা বিশেষ মনোযোগী হয়েছি। কিন্তু যদি শিল্পের যথার্থ উন্নতি সাধন করতে হয় ত শিল্পসম্বন্ধীয় গবেষণার সঙ্গে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি নির্মাণেও মন দিতে হবে। কেবলমাত্র তখনই আমরা সাফল্যের সহিত শিল্পোন্নয়ন করতে সক্ষম হব।"

আমেরিকার ইতিহাসে দেখা যায় ঔপনিবেশিক অবস্থাকালে গ্রেট বৃটেন যখন শিল্প বিস্তারের জন্য আমেরিকাকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং ইংলণ্ডের আবিষ্কার সমূহ তার নিকট হতে গোপন করতে সুরু করে তখনই আমেরিকা বুঝতে পারে যে প্রকৃত শিল্পোন্নয়ন করতে হলে—গবেষণা ও যন্ত্র নির্মাণ উভয় কার্য্যেই স্বাবলম্বী হতে হবে—পরমুখাপেক্ষী হলে চলবে না। তখন থেকে নিজ আবিষ্কার বাড়াবার চেষ্টা হল এবং তাহার শিল্পক্ষেত্রে ক্রমশঃ প্রচুর উন্নতি দেখা দিতে আরম্ভ করল।

যে কোন দেশের শিল্পগবেষণার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাবে তার গৃহীত পেটেন্ট সমূহের সংখ্যা গণনা করে। ১৯৩০ হতে ১৯৩৭ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে প্রতিবৎসর গড়ে যে সংখ্যায় পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয়েছিল, নিয়ে তার তালিকা দেওয়া হল:—

দেশ	বাৎসরিক গৃহীত পেটেন্টের সংখ্যা।
আমেরিকা	৪৮,৬৯৭
জার্মানি	২০,৬২১
ফ্রান্স	২০,০২৫
গ্রেট বৃটেন (১৯৩০-৩৫)	১৮,৪১৭
ইটালি	১০,৬৩৪
বেলজিয়াম	৭,৩১৫
সুইজারল্যাণ্ড (১৯৩০-৩৬)	৭,৩০৭
জাপান	৪,৮৪৫
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩,৬১৩
ভারতবর্ষ	৮৯৮

উক্ত পেটেন্ট তালিকায় দেখা যায় যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে কেবল যে আমেরিকা জার্মানি প্রভৃতি উন্নত রাষ্ট্রসমূহের অপেক্ষা নিম্নে স্থান পেয়েছে তা নয়—বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ অপেক্ষাও অনেক কম সংখ্যক পেটেন্ট গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগণ যে পরিমাণ শ্রীবৃদ্ধি করেছে ভারতবর্ষ বর্তমানে তাহা আশা করতে পারে না। যখন দেখা যায় যে প্রত্যেক রাষ্ট্রই পেটেন্ট-প্রথাকে বেশ আদরের চক্ষেই দেখছে, তখন ভারতবর্ষ তাহা অবহেলা করতে পারে না। সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই শিল্পোন্নয়নের একই পথ এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষকেও ঐ পথই অনুসরণ করতে

হবে। আবার দেখা যায় যে ভারতবর্ষে গৃহীত পেটেন্ট-সমূহের মধ্যে বিদেশী শিল্পপতিগণেরই কৃতিত্ব বেশী। সুতরাং শিল্প জাতীয়করণ করবার সময় স্মরণ রাখতে হবে, যেন স্বদেশের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিগণ সর্বাগ্রে নিজ দেশের পেটেন্টসমূহ সংগ্রহ করতে পারে। পেটেন্ট প্রথা সম্বন্ধে দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের আস্থার অভাব দেখা যায়, অথচ আবার অনেককে বিদেশে পেটেন্ট সংগ্রহের জন্য আবেদন করতে দেখা যায়। ইহা কেবল যে আত্ম-প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়, তাহা বলা বাহুল্য। ইহা জনসাধারণের উপরও খানিকটা নির্ভর করে। যেমন একই যন্ত্র যদি কোন বিলাতী কোম্পানী পেটেন্ট সংগ্রহ করে তৈরী করে ত তাহা স্বদেশে প্রস্তুত অপেক্ষা বেশী সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই। দেশের জনসাধারণকে তাই স্বদেশের আবিষ্কারসমূহকে সর্বাগ্রে পৃথিবীর সমক্ষে বড় করে তুলতে হবে এবং ইহাতে যদি নিজ নিজ বিলাসিতা ও রুচির খানিকটা ত্যাগ করতেও হয় ত তাহা বাঞ্ছনীয়। পেটেন্ট সম্বন্ধে দেশের বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাগ্রে বদলাতে হবে। ভারতবর্ষের পেটেন্ট প্রথা সম্বন্ধে দেওয়ান বাহাদুর কে, রামাপাই যে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বেশ সময়োপযোগী। "The role of the Patent system in India may be compared to the role of a hundred horse-power engine turning out one horse-power work, ninety percent of which is for the benefit of aliens."

অর্থাৎ—"ভারতীয় পেটেন্ট-প্রথার কার্য্যকারিতার সহিত একটি শতঅশ্বশক্তিবিশিষ্ট এঞ্জিনের তুলনা করা চলে—যে এঞ্জিন মাত্র এক অশ্বশক্তির কাজ করে এবং তার মধ্যেও আবার শত করা নব্বই অংশ বিদেশীর হিতার্থে ব্যয়িত হয়।"

ইহা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে কলঙ্কের কথা। বর্তমানে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ পেটেন্ট প্রথার উপর মনোযোগ দিয়েছে এবং ভারতীয় শিল্পপতি, বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞগণ সমবেত-ভাবে চেষ্টা করলে ভারতীয় শিল্পে ভারতীয় পেটেন্টসমূহের স্থান ক্রমেই উন্নত হবে।

সরকার-নিয়ন্ত্রিত এবং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহে গবেষণার আবহাওয়া ইদানীং অনেকটা বদলে গেছে। বর্তমানে অনেক কারখানায় স্বতন্ত্র গবেষণা বিভাগ খুলতে দেখা দিয়াছে। অনেকক্ষেত্রে এই সকল গবেষণা-প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে দেখা যায়। তবে একথা স্বীকার্য্য যে কেন্দ্রীয় গবেষণা সমিতিতে যে মুষ্টিমেয় বৈজ্ঞানিক বা বিশেষজ্ঞ উপস্থিত আছেন, তাঁদের পক্ষে সর্বভারতীয় সরকারী এবং বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের এবং সর্ববিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব বলে মনে হয়। শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে কৃষি কার্য্যের জন্য উপযুক্ত জমি সংস্কার, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, গবাদি পশুর লালনপালন, বন বিভাগ, খনিজ, ভেষজ প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি সাধন, বিজলী-শিল্পের সরঞ্জাম সমূহ, জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা প্রভৃতি পরিগণিত হয়। কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষে সকল বিষয় দেখা শক্ত, সুতরাং প্রত্যেকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এবং গবেষণাগারে গবেষণা বিষয়ের স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। তবে একই বিষয় সকল প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করা অবাঞ্ছনীয় এবং এই জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির সাহায্য দরকার। আর একটি কথা—শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আমাদের দেশে আদৌ কোন যোগাযোগ নেই। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহে গবেষণারত বৈজ্ঞানিক বা বিশেষজ্ঞগণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহের সমপর্য্যায়ভুক্ত বিশেষজ্ঞগণকেও অনেক সময় ঘৃণার চক্ষে দেখে। কেবল যে—গবেষণা বিষয়ে সহযোগিতার অভাব তা নয়—অনেক সময় অতি উচ্চশ্রেণীর গবেষণা কার্য্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান হতে সম্পন্ন বলে চাপা দেবার চেষ্টা হয়। অবশ্য বর্তমানে এরূপ আবহাওয়ার অনেক উন্নতি দেখা যায়।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণাগারে উৎপন্ন দ্রব্যের মান নির্দ্ধারণ, বিভিন্ন শিল্পপ্রক্রিয়ার শিল্পজাত দ্রব্যের উন্নতি সাধন প্রভৃতি বিষয়ে আশু মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। এই সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কিছু সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও গৃহীত হতে পারে এবং পৃথিবীর কোন একটি নূতন সমস্যার সমাধান কার্য্যে এখানকার বিজ্ঞানীরাও ব্রতী হতে পারেন। এরূপ দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যের শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহে বিরল নয়। এই সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বহুলাংশে সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হয় এবং

জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনার মধ্যে শিল্প সমূহের বিস্তার-সাধন যখন একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত করা হয়, তখন স্বভাবতঃই আশা করা যেতে পারে যে জাতীয় সরকার বিনা দ্বিধায় এই সকল গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন করবেন। এই সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীগণের যাতে সমাবেশ হয় এবং দুই একজন আন্তর্জাতিক মর্য্যাদাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ আমদানী করে বা দেশের মধ্য হতে দুই একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে গবেষণার জন্য উচ্চ বেতনে নিযুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সরকার এই সকল বিষয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারেন। অবশ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ-গণকে সরকারী চাকুরীভুক্ত বিজ্ঞানীদের সমপর্য্যায়ভুক্ত করে উপযুক্ত বেতন, সম্মান ও সুযোগসুবিধা দিতে হবে, কারণ বিজ্ঞান-সাধনায় তাঁরাও জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। তাঁদের মানুষের মত বাঁচতে শিখে বুঝতে হবে। গবেষণায় পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই এবং শিল্পসম্বন্ধীয় গবেষণায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা জনহিতকর কাজই যে করছেন তাতে সন্দেহ নেই। স্বর্গীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বক্তৃতা থেকে নিম্নোক্ত মূল্যবান উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

"In dealing with research workers there should be no jealousy, no distinction of caste or creed, no differential treatment on the part of those who have the privileged position of recommending sanction of money for research."

অর্থাৎ—"গবেষণার জন্য অর্থ মঞ্জুর করবার বিশেষ ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁদের দেখতে হবে যেন গবেষণারত বিজ্ঞানীদের সহিত ব্যবহার করবার সময় কোনরূপ বিদ্বেষভাব, জাতিধর্ম্ম বিচার কিংবা বৈষম্যমূলক আচরণ-এর প্রশ্রয় না দেওয়া হয়।

ভারতসরকারের শিল্পগবেষণা বিভাগ বিভিন্ন পরিকল্পনা-সমূহ গ্রহণ করেছে সুখের বিষয়, কিন্তু সরকারী ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং সেখানকার বিজ্ঞানীদের এই সব পরিকল্পনায় যোগ্য অংশ গ্রহণ করবার সুবিধা দেওয়াও সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

এইভাবে যে অনুভূতিকে বা সত্তাকে মানুষ ভাষার নাগালের মধ্যে পায় না, তাকে প্রকাশের জন্যে সাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার বহুকাল ধরেই চলে আসছে। এই উদ্দেশ্যে রূপকের ব্যবহারও যে চলে আসছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু রূপকের দ্বারা বস্তুর ধর্ম্ম ও গুণ ইত্যাদিই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, বস্তুর স্বরূপ যেন নাগালের বাইরে থেকে যায়। প্রতীকের দ্বারা কিন্তু বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ নয়, তার সত্তারই স্পর্শ যেন আমরা উপলব্ধি করি। রূপক সাহিত্যে এক রকমের বক্রোক্তি, প্রতীক সাহিত্যে এক ধরণের স্বভাবোক্তি। কবি বলেছেন—

"শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

রূপক আমাদের কাছে নিয়ে আসে অলৌকিকের "বাণী," তার নানা গুণ ও ধর্ম্মের খবর ; প্রতীক আমাদের প্রাণে অলৌকিকের "পরশ" এনে দেয়। এই জন্যে প্রতীক মানুষের প্রাণে যে সাড়া আনতে পারে, রূপক তা পারে না। প্রতীকের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপের পরিচয় দিলে, আমাদের মনে যে রকম স্পন্দন উৎপন্ন হয়, রূপকের সাহায্যে পরিচয় দিলে সে রকম স্পন্দন হয় না।

কিন্তু মানুষের জীবনে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে প্রতীকের প্রভাব ও ব্যবহার ক্রমশঃ কমে আসছে বলেই মনে হয়।

মানুষ ক্রমে ক্রমে হ'য়ে উঠেছে বুদ্ধিজীব। বুদ্ধির বিশ্লেষণী ক্ষমতাই বেড়ে উঠছে। বস্তু থেকে গুণকে বিশ্লেষণ করতে মানুষ এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সত্য এখন তার কাছে স্থূল নয়, সূক্ষ্ম; দ্রব্য নয়—দ্রব্যগুণের সমুচ্চয়। যা অলৌকিক বা অপ্রত্যক্ষ তাকে কোন প্রতীক দিয়ে সে বুঝতে চায় না; সে চায় অপ্রত্যক্ষের সত্তার বুদ্ধিগ্রাহ্য একটা বিশ্লেষণ। সুতরাং সে প্রতীকে সন্তুষ্ট নয়, সে চায় রূপক। যা' অপ্রত্যক্ষ, তার সম্বন্ধে আমাদের অনুভবের বা সংস্কারের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত কোন স্থূল বস্তু যখন আমাদের ভাবাবেগে তার প্রতিনিধি হ'য়ে ওঠে, তখন তাকে আমরা বলি প্রতীক। এই ভাবাবেগের ফলে নাম-ই ভগবানের প্রতিনিধি হ'য়ে ওঠে, "জপিতে জপিতে নাম" হৃদয় ভাবাবেগে "অবশ" হয়ে পড়ে, সাক্ষাৎ উপলব্ধির অনুরূপ লক্ষণাদি—যেমন রোমাঞ্চ, পুলক, সমাধি ইত্যাদির আবেশ হয়। কিন্তু মানুষের বিশ্লেষণী মনোবৃত্তি এ পথে এখন আর যেতে চায় না। ভাবাবেগ নয়, বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের দিকে তার রুচি। বৈজ্ঞানিকের প্রত্যয় মানে নানা গুণ, ধর্ম্ম ও লক্ষণের সমুচ্চয়; তাই দিয়ে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি-জগৎ রচিত। সুতরাং আধুনিক মন অপ্রত্যক্ষের পরিচয় দেয় রূপকের সাহায্যে, কারণ রূপকের ভিত্তি হ'ল সাদৃশ্যে, আর সাদৃশ্যনির্ণয় মানেই হ'ল গুণের বিশ্লেষণ। এই জন্যে সাহিত্যে প্রাচীন যুগের পর ক্রমশঃ প্রতীকের প্রভাব কমে এসেছে, লেখকদের রচনায় রূপকের ব্যবহারই বেড়ে উঠেছে। বাক্যালঙ্কার হিসেবে রূপকের ব্যবহার ত যথেষ্টই, তা ছাড়া নূতন শব্দ রচনাতেও রূপকের প্রভূত প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। অপ্রত্যক্ষ ও অলৌকিক পদার্থের কথা বলতে গিয়ে লেখকেরা যদি শুষ্ক গাণিতিক ও দার্শনিক পরিভাষা ত্যাগ করে সরস ও প্রাণবন্ত সাহিত্য রচনা করতে যান, তবে তাঁরা রূপকেরই ব্যবহার প্রায়শঃ করে থাকেন।

তা ছাড়া এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে প্রতীকের ব্যবহার জীবনে যতটা চলে, ভাষা ও সাহিত্যে ততটা চলে না। কারণ হচ্ছে যে সাহিত্য জিনিষটাই হ'ল বাস্তবের একটা অনুকরণ, ঠিক বাস্তব নয়। সাহিত্যে জীবনের ছায়াই থাকে, তাই রূপকের ব্যবহার সেখানে বেশী। কিন্তু জীবনটা কবি-কল্পনা নয়, সাদৃশ্যের ছায়া নিয়ে জীবন চলে না, সেখানে বাস্তবের দাবী বস্তু দিয়েই মেটাতে হয়, সুতরাং কোন প্রতীক বস্তু দিয়ে অপ্রত্যক্ষের ফাঁকটা বুজিয়ে দিতে হয়।

যাই হোক, অনেক কাল থেকেই সাহিত্যে প্রতীক স্থান পেয়েছে। ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ
সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা-
ত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

ব'লে পরম পুরুষের যে বর্ণনা আছে, তাকে আমরা প্রতীক কাব্য বলেই বিবেচনা কর্ব্ব; কারণ এখানে একটা অপ্রত্যক্ষ জগতের উপর একটা প্রত্যক্ষ জগতের আরোপ করা হয় নাই, সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি ক'রে প্রত্যক্ষের ধর্ম্ম দিয়ে অপ্রত্যক্ষের প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হয় নাই। অথচ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগতের কয়েকটি বস্তুর সঙ্গে বিজড়িত ভাবধারার সাহায্যে একটা অপ্রত্যক্ষ বিরাট ধারণার উদ্বোধন করা হয়েছে। যে কল্পনা এখানে আমাদের মনে জেগে উঠছে তাকে আমরা পরম সত্তার একটা উপমান বলে মনে করিনা, তাকে সেই সত্তার প্রকাশ বলেই মনে করি। সুতরাং এখানে আমরা প্রতীকই পাচ্ছি, রূপক নয়।

ইহুদীদের শাস্ত্র Old Testamentএও আমরা প্রতীক রচনা পাই। Book of Ecclesiastesএ যেখানে বলা হয়েছে "Cast thy bread upon the waters: for thou shalt find it after many days" (Chap. VI) কিংবা যেখানে যৌবনের গৌরবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—While the sun or the light or the moon, or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain" (Chap. XII) সেখানে আমরা প্রতীকের ব্যবহার দেখতে পাই। Book of Isaiahতে যেখানে বলা হয়েছে—Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low" (Chap. XI) কিংবা Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree" (Chap. LV), সে সব জায়গাতেও প্রতীকের ব্যবহার করা

হয়েছে। খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ Revelationএ প্রতীকের অজস্র ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে (Chap. IV) ভগবানের সিংহাসনের যে রকম বর্ণনা আছে—And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God"—তাতে আমরা প্রচুর প্রতীকের ব্যবহার দেখতে পাই। লক্ষ্য কর্ত্তে হবে seven lampsর সঙ্গে seven spiritsর উপমা দেওয়া হয় নাই, seven lampsকেই seven spiritর সঙ্গে একাঙ্গীভূত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা রূপক নয়, প্রতীক। আবার যেখানে (Chap. XXII) A new heaven and a new earth ও The holy city, new Jerusalemর বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে, সেখানে অলৌকিক ও অপ্রত্যক্ষের পরিচয় দেওয়া হয়েছে নানা প্রতীকেরই সাহায্যে, উপমা বা রূপকের দ্বারা নয়।

বোধ হয় Bibleএর প্রভাবের জন্যেই মধ্যযুগে ইউরোপে প্রতীক সাহিত্য যথেষ্ট রচিত হয়েছিল। কবিকুল-চূড়ামণি Danteর মহাকাব্য—The Divine Comedy প্রতীক কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নানা প্রতীকের ভিতর দিয়েই Danteর লোক-লোকান্তরব্যাপী দৃষ্টি ও অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছিল, এবং Danteর পরিকল্পিত দেবর্ষি-সঙ্গীত-মুখর অমৃত-নিস্যন্দী বিয়াট্রীচি-হাস্যোদ্ভাসিত Paradiso বা স্বর্গ প্রতীক দিয়েই তৈরি। তারই প্রভাব নানা দেশে নানা ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেমন পড়েছিল D. G. Rossettiর রচনায়।

> We two will lie, the shadow of
> That living mystic Tree
> Within whose secret growth the Dove
> Is sometimes felt to be,
> While every leaf that His plumes touch
> Saith his name audibly.

মধ্যযুগের অবসানের পর সমগ্র ইউরোপে যখন Renaissance বা নবজীবন আন্দোলনের বন্যা ছড়িয়ে পড়ল, তখন পারত্রিক ছেড়ে ঐহিকের দিকে, প্রতীক ছেড়ে প্রত্যক্ষের দিকেই মানবের মন আকৃষ্ট হ'ল, সাহিত্য বাস্তব জীবন ও ইন্দ্রিয়ের জগৎ নিয়ে ব্যাপৃত হ'ল। সুতরাং প্রতীক সাহিত্যের রচনা প্রায় উঠেই গেল। তবে মাঝে মাঝে দু'একজন গূঢ়বাদী লেখকের রচনায় প্রতীকের ব্যবহার দেখা যেত। ইংল্যাণ্ডের প্রতীকপন্থীদের মধ্যে প্রধান হ'চ্ছেন Blake. নানা জটিল প্রতীক তাঁর কাব্যের অঙ্গে অঙ্গে খচিত, তাদের তাৎপর্য্য অনুধাবন কর্ত্তে না পারলে Blakeর কাব্যের মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দুটো একটা মাত্র অপেক্ষাকৃত সরল উদাহরণ এখানে দেওয়া চলতে পারে।

> Does the Eaegle know what is in the pit;
> Or wilt thou go ask the Mole?
> Can wisdom be put in a silver rod,
> Or Love in a golden bowl?
>
> (Motto to the Book of Thel)

এখানে silver rod ও golden bowl রূপক অলঙ্কার নয়, প্রতীক।

> The eternal gates' terrific porter lifted the northern bar!
> Thel enter'd in and saw the secrets of the land unknown.
> She saw the couches of the dead, and where the fibrous roots
> Of every heart on earth infixes deep its restless twists:
> A land of sorrows and of tears where never smile was seen.
>
> (From the Book of Thel)

এ কোন দেশের কথা? এখানে রূপকের কোন আভাস নেই। প্রত্যক্ষের উপর অপ্রত্যক্ষের আরোপের কোনই প্রশ্ন উঠে না। "দুর্দর্শং গূঢ়ং অনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং" লোকের কথা; প্রতীক দিয়েই তার বর্ণনা করা হ'য়েছে। (আধুনিক কালেও ইংল্যাণ্ডে Francis Thompson প্রতীক-কাব্য লিখেছেন; তাঁর The Hound of Heaven প্রথমটা রূপক বলে মনে হলেও আসলে যে প্রতীক-কাব্য তা' একটু প্রণিধান ক'রে দেখলেই বোঝা যায়। যেখানে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন, সেখানে দেখা যায় যে, জিনিষটা রূপক নয়, প্রতীকের সাহায্যে একটা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

জাতীয় সঙ্গীত

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বন্ধুবর বিজয়রত্ন মজুমদার দ্বিজেন্দ্রলালকে বাংলাদেশে উপেক্ষিত কবি ব'লে আক্ষেপ করেছেন একাধিক পত্রিকায়। কথাটা ভাববার। তর্ক উঠতে পারে—যুগে যুগে রুচি মানুষের বদলায় ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন: "Lesser reputations may fluctuate, but finally whatever has real value in its own kind settles itself and finds its just place in the durable judgment of the world… finally the world returns to its established verdict." একথায় আমিও বিশ্বাস করি। তাই সমসাময়িক রুচিগত মতামতের তাপমান যন্ত্রের ওঠা পড়াতে বিচলিত হওয়া অসঙ্গত মনে করি, যদিও মনে দুঃখ হয়ই যে সম্প্রতি কাগজপত্রে এ নিতান্ত অবিসংবাদিত সত্যটিও স্বীকৃত হয় নি যে জাতীয় সঙ্গীতের (national song) রচয়িতা হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান বাংলাদেশে কারুর চেয়েই কম নয়। তবে এও জানি—পুনরুক্তি মার্জনীয়—যে কালের পরম সভায় তিনি ভারতের শুধু একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নন, একজন শ্রেষ্ঠ কবি সুরকার ও গীতিকার ব'লেও অঙ্গীকৃত হবেন। আমার সুরবিহার প্রথম খণ্ডে আমি তাঁর বঙ্গ আমার জননী আমার ও আমার জন্মভূমি গান দুইটি সংস্কৃত অনুবাদ ও স্বরলিপি প্রকাশ করেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে তাঁর ভারত আমার ও যেদিন সুনীল জলধি হইতে গান দুইটির সংস্কৃত অনুবাদ ও স্বরলিপি। এখানে এই দুটি গান প্রকাশিত হ'ল ভারতবর্ষে—যার প্রতিষ্ঠা তিনিই করেছিলেন প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে। আমার মনে হয় কালের দরবারে এই দুটি গান অতি আদরণীয় হ'য়ে থাকবে। সংস্কৃতে এ গানগুলি তাঁর অপূর্ব ওজস্বী সুরে যে কী অপরূপ শোনায় তা এ গানগুলি যাঁরাই সংস্কৃতে শুনেছেন তাঁরাই সানন্দে স্বীকার করবেন। ইচ্ছা আছে গ্রামোফোন ও রেডিয়োয় এ গান দুটিও গাইব এবং আশা করি রেডিও কর্তৃপক্ষ এ-গান দুটির (তথা ধন্য ধান্য ও বঙ্গ আমার গান দুটির) সংস্কৃত অনুবাদ যাতে যথোচিত প্রচারিত হয় সে-শুভব্রতে ব্রতী হবেন—আরো এই জন্যে যে সংস্কৃতে এ-শ্রেণীর জাতীয় সঙ্গীতে শুধু যে এক নব উদ্দীপনা জাগে তা-ই নয়, সংস্কৃতে গীত হ'লে সব প্রদেশের অধিবাসীরাই গাইতে পারবেন—যেজন্যে মনে হয় যে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সংস্কৃতেই গীত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কোনো প্রাদেশিক ভাষায় নয়। যাঁরা সংস্কৃতকে মৃত ভাষা মনে করেন তাঁদের মতামত সহজেই খণ্ডন করা যায়। কিন্তু সেটা এ-ভূমিকার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত

"ভারত আমার, ভারত আমার" ……এবং ঐ সংস্কৃত অনুবাদ

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননী, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম্ম-ভক্তি ধর্ম্ম-শিক্ষা।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।
ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে;
ভগবৎপ্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।

ভারতভূমে! ভারতভূমে! যত্রোন্মীলন্ মানবনেত্রম্
উৎসস্বমেব মহামহিম্নাং বসুন্ধরায়াং তীর্থক্ষেত্রম্॥
অবনীজননি! ত্বয়ৈব নীতা শিল্প বেদদর্শনেষু দীক্ষা।
ত্বয়ৈব কীর্ণা ভুবনে প্রজ্ঞাভক্তিতপস্তাক্ষমাতিতিক্ষা॥
ভারতভূমে! ভারতভূমে! কৃপার্থিনী ত্বং নৈব ধরণ্যাম্।
জ্ঞানকর্মধীধ্যানধর্মদাং প্রণমেম ত্বাং চিরমবিষণ্ণাম্॥
একদা যত্রাগায়দ্ গীতাং স্বয়ং হি ভগবান্ ত্রিদিবশরণ্যঃ।
যদীয় ধূলিপরিধূসরাঙ্গো ননর্ত প্রেম্ণা শ্রীচৈতন্যঃ॥

সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম ;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম ।
ভারত আমার, ভারত আমার···ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥
আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারত ভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র !
তাদের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে, চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,—
যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ ।
ভারত আমার, ভারত আমার · ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥
ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হোক খর্ব্ব ;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব ।
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব বংশ ।
যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনও হবে না ধ্বংস !
ভারত আমার, ভারত আমার···ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে আছে বিধাতার করুণাদৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপর করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি !
ভারত আমার, ভারত আমার···ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥

সর্বত্যাগী রাজসুতো বিততান নিরন্তং করুণাতন্ত্রম্ ।
তরুণ যতির্যত্র প্রচচার মহান্তং গহনং সোঽহং-মন্ত্রম্ ॥
ভারতভূমে ! ভারতভূমে······চিরমবিষন্নাম্ ।
যত্রাশ্রূয়ত মুনর্ষিগীতমনাদি গভীরং সামস্তোত্রম্ ।
ন কিং ত্বমসি সা ভূর্ন বয়ং কিং নেহ পুরা জুহুবিম তে হোত্রম্ ॥
তৎস্মৃতিবর্মাবৃতা চিরং বিচরেমোত্তুঙ্গললাটা ধন্যাঃ ।
প্রদীপ্তমিথমতীতং যেষাং ক্লীবা ন তে কদাপি নগণ্যাঃ ॥
ভারতভূমে ! ভারতভূমে !······চিরমবিষন্নাম্ ॥
ভারতভূমে ! যদি মহিমাসৌ সনাতন স্তব ম্লান ইদানীম্ ॥
দুঃখং কুতো নু মাতৃগৌরবাজ্জয়েম বয়ং হি মায়াম্লানিম্ ॥
ভবেদ্বিনষ্টা যদি বসুধেয়ং লুপ্যেদ্ যদ্যপি মনুষ্যবংশঃ ।
পুরাণমেবং চরিতং যেষাং তেষাং নাস্তি কদাপি ধ্বংসঃ ॥
ভারতভূমে ! ভারতভূমে !······চিরমবিষন্নাম্ ॥
নয়নানামস্মাকং পুরতোঽলক্ষ্যাদর্শো দীব্যতু নিত্যম্ ।
পুনঃ স্বজামো নবভাবোজ্জ্বলরাজ্যং সান্দ্রং প্রেমস্নিগ্ধম্ ॥
তবেহ দেবভুবো বহতি প্রতিতৃণং বিধাতুঃ করুণাদৃষ্টিম্ ।
তব পুত্রাণাং শিরঃসু দেবগণাঃ কুর্বন্তি প্রসূনবৃষ্টিম্ ॥
ভারতভূমে ! ভারতভূমে !······চিরমবিষন্নাম্ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে"······এবং ঐ সংস্কৃত অনুবাদ

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী, ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"
সদ্যঃ স্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত !
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র ;
মন্ত্র মুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার······জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"
শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট, সাগর-উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা ।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে ।

ভারতমাত র্ভুবনশরণ্যে ! যদা সমুদিতা সুনীলসিন্ধোঃ ।
কলধ্বনিঃ কোঽশ্রূয়ত সান্দ্রো ভক্তিকম্পিতঃ পুলকোঽনিন্দ্যঃ ॥
তব কৃপয়া নবরবিকরনিকরৈঃ রূপান্তরিতা গহনা রাত্রী ।
প্রণতাঃ সর্বেঽগায়ন্ ঃ "জয়তু জগজ্জননী চিরজীবনধাত্রী ॥
ধন্যাভবত্তদা বসুধা তে চরণসরোজং বৃস্বাঽক্লিষ্টা ।
বিশ্বরমা জয়তু বিশ্বধাত্রী ভারতভূমিঃ স্বর্গগরিষ্ঠা ॥
সদ্যঃস্নানাদ্ভিষিক্তবসনে ! চিকুরস্তে নিধিশীকরলিপ্তঃ ।
নির্মলহাস্যৈঃ কমলাননং প্রদীপ্তং ভালো গরিমসমৃদ্ধঃ ॥
পর্যাবর্তন্তে নৃত্যন্তে ব্যোম তবারুণতারাচন্দ্রাঃ ।
মন্ত্রবিমুগ্ধো নিম্নে ফেনিলজলধিঃ স্তনতীব মেঘমন্দ্রাঃ ॥
ধন্যাভবত্তদা·········স্বর্গগরিষ্ঠা ॥
মৌলৌ শুভ্রং তুষারমুকুটং ভান্তি জঙ্ঘয়োঃ পারাবারাঃ ।
গঙ্গাশতদ্রুযমুনা বক্ষসি লসন্তীব তে মুক্তাহারাঃ ॥
ক্বাসি ক্রুদ্ধা তপ্তসৈকতা ঝঞ্ঝাবাতৈরুগ্রা লোলা ।
স্মিতাধরা বা ক্বাসি পুনস্ত্বং শ্যামলবরদা কলহিল্লোলা ॥

ধন্য হইল ধরণী তোমার······জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"
উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক কলরবে, চুম্বি' তোমার চরণ—প্রান্ত,
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র; করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—
চরণে তোমার কুঞ্জ কানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি!
ধন্য হইল ধরণী তোমার······জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!
জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি;
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ;
জগৎ পালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!
ধন্য হইল ধরণী তোমার······জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

ধন্যাভবত্তদা·········স্বর্গগরিষ্ঠা ॥
উর্ধ্বে শূন্যে পবনঃ প্রবলস্বনিতো বিগর্জ্য ভৃশমক্লান্তম্।
পিকঝঙ্কারৈশ্চুম্বত্যন্তে পুণ্যং তে শ্রীচরণপ্রান্তম্ ॥
কৃতান্তকুলিশো জলদঃ প্রবর্ষ্য ঘোরাঃ প্রলয়ভয়ঙ্করধারাঃ।
পাদান্তে তব রচয়তি কাননমালা গন্ধপ্রসূনহারাঃ ॥
ধন্যাভবত্তদা·········স্বর্গগরিষ্ঠা ॥
হৃদয়ে মাতস্তব সুখশান্তী কণ্ঠে বহসি বরাভয়তন্ত্রম্।
বিতরসি পাণিভ্যামন্নং চরণাভ্যাময়ি মধুমুক্তের্মন্ত্রম্।
অক্ষোঃ পুত্রস্নেহানন্দো ব্যথা চ তে ক্ষরতো মহনীয়ে!
ধরণীপালিনি! ধরণীমোহিনি! ধরণীজননি! শুভে! বরণীয়ে!
ধন্যাভবত্তদা·········স্বর্গগরিষ্ঠা ॥

মূল বাংলা ও সুর···দ্বিজেন্দ্রলাল

সংস্কৃত অনুবাদ···দিলীপকুমার

ত্রিতাল

\+   ৩   ০   ১
সা -া ধ্‌া ধ্‌া | সা রা সরা গা I গা -া গা গা | গা -া গা -া I
ভা - র ত ভূ - মে - ভা - র ত ভূ - মে -
ভা - র ত মা - ত স্ তু ব ন শ র - ণ্যে -

রগা -া রগা ক্ষা | ক্ষা -া ক্ষা পা I গক্ষা পা পা পা | পা -া পা পা I
য - ত্রো ন্ মী - ল ন্ মা - ন ব নে - ত্র ম্
য দা - ত্ব মু দি তা - সু নী - ল সি ন্ ধো ঃ

পা -া ক্ষপা ধা | ধা ধা -া ধা I ধা পধা না ধা | পা -া গা রা I
উ ৎ স স্ ত্ব মে - ব ম হা - ম হি ম্ না ং

না না -া না | না -া না র্সা I ধনা র্রা র্সা -া | র্সা -া র্সা -া I
ব সু ন ধ রা - য়া ং তী র্ থ - ক্ষে - ত্র ম্

পা ধা পা -া | র্সা র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা -া I
অ ব নী - জ ন নি - ত্ব য়ৈ - ব নী - তা -

র্সা র্রা র্রা র্রা | -া র্রা র্রা র্গা I র্সর্রা র্সর্রা র্গা র্গা | র্গা -া র্গা -া I
শি ল্ প বে - দ দ র্ শ নে - ষু দী - ক্ষা -া

র্গা র্গা র্পা র্গা | র্রা -া র্রা -া I র্সা র্সা র্সা -া | ধা -া ধা পা I
ত্ব য়ৈ - ব কী র্ ণা - ভু ব নে - প্র - জ্ঞা -

পা ধা না না | না -া না র্সা I ধা না র্রা র্সা | র্সা -া র্সা -া I
ভ ক্ তি প প - স্যা - ক্ষ মা - তি প্তি - ক্ষা -

র্সা -া র্সা র্সা | র্সা -া র্সা না I না -া না না | ধা -া ধা পা I
ভা র ত ভূ - মে - ভা - র ত ভূ - মে -

পা পা ক্ষা পা | না -া ধা -া I পা ক্ষা পা ধা | গা -া গা -া I
ক্ব পা স্থ্ থি নী - ত্ব ং নৈ - ব ধ র - ণ্যা ম্

র্গা -া র্গা র্রা | -া র্রা র্রা -া I র্সা -া ধা র্রা | -া র্সা র্সা -া I
জ্ঞা - ন ক র্ ম ধী - ধ্যা - ন ধ র্ ম দা ং

গা গা রা -া | গা -া পমা -া I গা গা মগা রা | সরা -া সা -া I
প্র ণ মে - ম - ত্বা ং চি র ম বি ষ ণ্ ণা ম্

প্রতি স্তবক একই সুরে গেয়

গ্যেটের জীবনের এক অধ্যায়

আশা দেবী

জোহান উলফ্‌গ্যাং গ্যেটেকে বাদ দিয়ে জার্ম্মাণ জাতির কোন পরিচয় নেই। তিরাশী বছরের দীর্ঘ জীবন-চর্চ্চার মধ্য দিয়ে গ্যেটে অকুণ্ঠভাবে সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। তাঁর পরিচয়ের ক্ষেত্র শুধু জার্ম্মাণ সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমস্ত পৃথিবী তাঁকে কবি বলে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছে—তাঁর ফাউস্ট জগতের অন্যতম মহাকাব্য। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে "He lived in poems" এবং তাঁর কবিতা হলো a great confession—জীবন সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি। গ্যেটের মহাকাব্য তাই মহাজীবনের বাণী।

ব্যক্তি মানুষ হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বজনের বহু নিন্দা ও প্রশংসা গ্যেটেকে কুড়োতে হয়েছে। উন্নাসিক ও রুচিবাগীশ সমালোচকেরা তাঁকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন, ইতর জনের জিহ্বা কুৎসায় হয়েছে মুখর। গ্যেটের বহু বিচিত্র প্রেম কীর্ত্তিই এর কারণ। বহু নায়িকার হাসি-অশ্রুর মেঘ-রৌদ্রে গ্যেটের জীবন রসায়িত।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিশিল্পীর সাধনার মূলে রয়েছে তাঁদের মানসীপ্রিয়ার দান। কখনো এই মানসী একটি মাত্র নারীতে রূপ পেয়েছে—মর্ত্তের মানবীকে রূপায়িত করেছে কল্পনার স্বর্গদূতিকায়—তার প্রমাণ দান্তের চিরঅধরা বিয়াত্রিচে, তার প্রমাণ পেত্রার্কার লরা। এই অনন্যা নারীতেই তাঁরা পেয়েছেন—তাঁদের কাব্যলক্ষ্মীকে, তাঁদের স্বপ্ন সঙ্গিনাকে।

কিন্তু এমন একদল শিল্পী আছেন—যাঁরা চিরঅতৃপ্ত; কস্তুরী মৃগের মতো, তাঁরা নিজের অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ান। সুধাপাত্র হাতে যে এগিয়ে আসে, ক্ষণিকের জন্য হয়তো তাকে ভাল লাগতে পারে কিন্তু পরক্ষণে ক্লান্তিতে ভরে ওঠে মন। বার বার প্রশ্ন করে "এই কি চেয়েছিলাম আমি"? তার মন বলে "এখানে নয়, এখানে নয়—তুমি যাকে চাও সে অনেকদূরে।" রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার অন্তর আকুলি-বিকুলি করে জানায়—

"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না"…

মহাকবি গ্যেটেও এই এদেরই একজন। সমস্ত জীবন ধরে এই খোঁজার পালাই চলেছে তাঁর। একজনের পর আর একজন এসেছে—অসীম আগ্রহে গ্যেটে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, ছুটে গেছেন তার দিকে ; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে ধরা দিয়েছে সেই মুহূর্ত্তেই গ্যেটের মনে হয়েছে সে সাধারণ, বড় বেশী সাধারণ। তার সব রহস্য জানা হয়ে গেছে। যে ছিল কল্পনার বর্ণলেখা, বাস্তবে সে সীমায়িত হয়ে গেছে একটি মাত্র নারীর দেহাধারে। সেই মুহূর্ত্তেই আবার তিনি শুরু করেছেন নূতনের অভিযান—পুরোনো প্রেম পথে জড়িয়ে-ধরা ধুলোর মতো আবার সেই পথেই হারিয়ে গেছে।

কৈশোরের প্রথম পর্ব্বে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর জীবনে সর্ব্বপ্রথম প্রেমের আবির্ভাব ঘটেছিল। তখন তিনি তাঁর জন্মভূমি ফ্রাঙ্কফোর্টের নানা হোটেলে এবং দরিদ্র অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানুষের সম্পর্কে জানবার জন্যে। এইখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় গ্রেট্চেনের (Gretchen)—যাঁর নাম তিনি তাঁর ফাউস্ট্ কাব্যে অমর করে রেখেছেন। সেই প্রথম প্রেমে গ্যেটে গ্রেটচেনের কাছ থেকে প্রেমের পরিবর্ত্তে পেয়েছিলেন স্নেহ—পুজোর পরিবর্ত্তে অনুকম্পা। সে অপমান তিনি ভুলতে পারেন নি। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর বহুচারণার পেছনে এর কোনো অদৃশ্য প্রভাব লুকিয়ে ছিল কিনা কে জানে।

তারপর লাইপজীগে তাঁর ছাত্র জীবনে এল দ্বিতীয় নায়িকা ক্যেট্চেন (Ketchen)। তরুণ প্রাণের সমস্ত মাদকতা সেদিন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল এই মেয়েটিকে ঘিরে। কিন্তু সেও জোয়ারের জল—মাত্র কয়টিদিন তার কালবৃত্ত। যে প্রচণ্ডতা নিয়ে তা এসেছিল, চলে গেলোও তেমনি প্রচণ্ডবেগেই ; শুধু যাবার বেলায় কবি স্মৃতির মণি-মঞ্জুষায় রেখে গেল তার বিদায়-অর্ঘ।

এর পরে একে একে এলো অনেকেই। লুসিন্দা, ফ্রেডরিকা, লোটি বুফ, লিলি, শারলোট ফন্স্টাইন। কবির জীবন পাত্র উচ্ছলিত করে মাধুরী দান করলো এরা—সুধায় ভরে দিলে। একটি মালঞ্চ থেকে আর একটি নূতন মালঞ্চে, একটি প্রেম থেকে আর একটি প্রেমে পরিক্রমা চললো কবির জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত।

এদের মধ্যে শার্লট বুফ্ বা লোটির স্থান একটু স্বতন্ত্র। গ্যেটের জীবনে তিনি মহিমাময়ীরূপে প্রতিষ্ঠিতা—তাঁর প্রেমের রাজ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী'। নানা নারী তাঁকে নানা ভাবে প্রার্থনা জানিয়েছে। কেউ তাঁকে পুজো করেছে, কেউ আবার তাঁকে গ্রাস করতে চেয়েছে কামনার অগ্নিজ্বালায়। মিথ্যা সন্দেহে অন্ধ হয়ে তাই অন্যতমা প্রণয়িনী লুসিন্দা গ্যেটেকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন : 'আমার পরে যে তোমাকে চুম্বন করবে চিরকাল তাকে দুঃখের দাবানলে পুড়তে হবে' এই অভিশাপই বুঝি গ্যেটের সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু এদের সকলের মাঝে লোটি বুফ দাঁড়িয়ে আছেন মহিমান্বিতা হয়ে—একটা উত্তাল সমুদ্রে দীপস্তম্ভের মতো।

পূর্ব্ববর্ত্তিনী নায়িকা ফ্রেডরিকার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরে তখন গ্যেটে গভীর মানসিক বেদনায় জর্জ্জরিত হচ্ছেন—দুর্য্যোগের রাতে ছন্নছাড়ার মত। Wanderer's storm song গাইতে গাইতে পথ চলেছেন। এমন সময় তাঁর হৃদয় আকাশে লোটি বুফের আবির্ভাব।

তরুণ কবি তখন ওয়েৎশ্লারে এসেছেন আইন-ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ শেখবার জন্যে। Holy Roman Empireএর উচ্চ আদালত তখন এখানেই অবস্থিত ছিল। এখানে প্রায় কিছুদিন নিঃসঙ্গ কাটাবার পরে স্থানীয় একটি সাহিত্য-রসিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলো। তারও পরে এক গ্রাম্য নাচের মজলিসে তিনি দেখলেন শার্লোট বুফকে, সংক্ষেপে যার নাম লোটি বুফ। এঁর সম্বন্ধে গ্যেটে বলেছেন "ইনি সেই জাতের নারী—যিনি পুরুষের প্রাণে কামনার শিখা জালান না—তার দৃষ্টিকে তৃপ্তির মাধুর্য্য দিয়ে ভরে দেন।"

লোটি ছিলেন গ্যেটের স্থানীয় বন্ধু কেস্ত্নারের বাগদত্তা পত্নী। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের শান্ত দীপশিখার মত মেয়ে তিনি। মাতৃহীন সংসারের দশ বারোটি ভাই বোনের সেবাযত্নেই তাঁর দিন কাটতো। শিশুপ্রিয় গ্যেটে এই শিশুদের আশ্রয় করেই লোটির মনের দরজায় এসে পৌছুলেন। কিন্তু লোটিকে তিনি চিনতে পারেন নি।

গ্যেটে আর লোটির ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগলো দিনের পর দিন। ওয়েৎশ্লারের উপকণ্ঠে বিস্তৃত প্রান্তরে তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন। বিকেলের শান্ত আলোয়, পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার উল্লাসে তাঁদের সেই আনন্দ-বিহার মধুময় হয়ে

উঠতো। প্রতিদিন তাঁরা পরস্পরের কাছে এত অনুরক্ত হয়ে উঠছিলেন যে মনে হতো একজনকে ছাড়া বুঝি আর একজনের আর চলবে না।

কেসত্‌নার ছিলেন কাজের মানুষ। চাকরী করতেন। চরিত্রের দিক থেকে ছিলেন অসামাজিক। তাঁর বাগদত্তা প্রিয়ার সঙ্গে গ্যেটের মেলা মেশাতে তিনি কোন দিনও বিন্দুমাত্র লক্ষ্য দেননি। বরং সময় সুযোগ পেলে এদের সঙ্গে যোগও দিতেন কখনও কখনও।

লোটির চরিত্র মাধুর্য্য, তাঁর দৈনন্দিন সান্নিধ্য, আর গ্যেটের ভাবপ্রবণ মন—যথা নিয়মে এই ত্রিধারা মিশল এক সঙ্গে। তারপর গ্যেটে একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর স্মৃতির পাণ্ডুলিপি থেকে কবে মুছে গেছে ফ্রেডারিকার নাম। সেখানে আবার নূতনের পদ সঞ্চার হয়েছে—সে লোটিবুফ্‌।

সহরের লোকে কানা-ঘুষাসুরু করলে। আলোচনা আরম্ভ হলো লোকের মুখে মুখে। কিন্তু কেসত্‌নারের আচারে ব্যবহারে বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন দেখা দিল না বা কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না কোথাও। ধীর প্রশান্ত মুখে তিনি শুনে যেতে লাগলেন সমস্ত কুৎসা-কাহিনী, নানা লোকের মুখে কুশ্রী অপপ্রচার।

আর একজন তেমনি নীরব হয়ে রইলেন। তিনি লোটিবুফ্‌। গ্যেটের সমস্ত প্রাণ তখন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বহু নিঃসঙ্গ নিরালা মুহূর্ত্তে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন, লোটিকে জানাতে চেয়েছেন অন্তরের আকুলতা। কিন্তু পারেন নি—কোথায় যেন বেধেছে তার। কোথা থেকে কি এসে যেন কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে তাঁর।

হয়তো কোনো একদিন যখন দিগন্ত-প্রসারি মাঠের ওপরে সূর্য্য তার রক্তিম আভা বিকীর্ণ করে অস্ত যাচ্ছে; যখন কমলালেবুর বনে রাঙা ফলগুলো আরো রাঙা হয়ে উঠেছে সেই দিনান্তিক আলোয়; আর অলিভের ঘনশ্যামল পত্রমর্ম্মরে ধ্বনিত হয়েছে কোনো দীর্ঘশ্বাস, সেই সময়ে লোটির পদপ্রান্তে বসে গ্যেটে তাঁর মনের কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কী আশ্চর্য্য—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠে তখন ভাষা যোগায় নি। তাকিয়ে দেখেছেন লোটির দুটি চোখে যেন ফুটে উঠেছে সন্ধ্যার নক্ষত্রের মতো স্নিগ্ধ দীপ্তি। তার প্রভায় মনের সমস্ত উদ্দামতা শান্ত হয়ে আসে—কামনা হঠাৎ নতশির ভুজঙ্গের মতো নিবে যায়।

আসলে গ্যেটে লোটিকে যে চোখে দেখেছিলেন, লোটি সে দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখেন নি। গ্যেটের আকাঙ্ক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করে তিনি মহাকবিকে ছোট করতে চাননি। তিনি চেয়েছেন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে—তাঁকে প্রেরণা দিতে। তিনি গ্যেটের প্রেম-প্রার্থিনী ছিলেন না—ছিলেন তাঁর "Inspiration of better creation"

তা ছাড়া মনের দিক থেকে লোটি ছিলেন প্রধানত 'মা' জাতের মেয়ে—প্রিয়া জাতের নয়। নাবালক ভাই-বোনেদের মানুষ করতে গিয়ে একটা মাতৃ সুলভ স্নেহ স্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। গ্যেটেকে তিনি সেই উদার স্নেহের মধ্যেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁদের সান্নিধ্য যতই ঘনিষ্ঠ হোক—পবিত্রতার এই অদৃশ্য শাসন প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করতেন গ্যেটে; এই অদৃশ্য প্রহরী আছে বলেই হাজার লোকাপবাদ সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন কেস্‌ত্‌নার।

আত্মপ্রকাশের জন্য গ্যেটের মন যতই আকুলি বিকুলি করুক—কেস্‌ত্‌নারের প্রতি লোটির প্রেম বিন্দু মাত্রও কেন্দ্রচ্যুত হয়নি। তাঁদের অন্তরের সম্পর্ক রইল অব্যাহত—তাঁদের বিয়ের দিন একটু একটু করে এগিয়ে আসতে লাগলো।

গ্যেটের ধৈর্য্য যখন চরমসীমায় পৌচেছে, তখন একদিন তিনি জানলেন এই নিষ্ঠুর সত্যকে। তিনি জানলেন, শার্লট সাধারণ মেয়ের মতো ভাবের স্রোতে ভেসে বেড়ায় না—ক্ষণিকের উন্মাদনায় ভ্রষ্ট হয় না নিজের কর্ত্তব্যবোধ থেকে। তিনি আরো জানলেন: শিল্পী হিসেবে তাঁর প্রতি লোটির সীমাহীন শ্রদ্ধা থাকলেও প্রেমের জগতে কেস্‌ত্‌নারের পাশে তাঁর বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। প্রেমের অমরাবতীতে কেস্‌ত্‌নার যেখানে সম্রাট—সেখানে নিজের সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত লোকরঞ্জনী-শক্তি তাঁর ব্যর্থ চেষ্টাতেই পরিণত হবে।

নারী হৃদয়কে যিনি এতকাল সহজলভ্য বলে জেনে এসেছেন—সেই গ্যেটে এবার যেন এক দেবতার দেবায়তনে এসে দাঁড়ালেন। চোখের সামনে দেখলেন

এমন একটি জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহকে—যাকে স্পর্শ করবার কোনো অধিকার নেই তাঁর ; সমস্ত পৌরুষের অভিমান তাঁর আর্ত্তনাদ করে উঠলো, অন্তর যেন দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে গেল।

পরাজিত গ্যেটের কাছে ওয়েৎস্লার যেন শ্মশান হয়ে উঠলো। কমলালেবুর রক্তিম সৌন্দর্য্যেভরা অলিভপত্র-মর্ম্মরিত দিক্-প্রান্তর মনে হলো যেন মরুভূমি। তিনি অনুভব করলেন হতভাগিনী লুসিন্দার সেই মর্ম্মস্পর্শী অভিশাপ যেন তাঁকে তাড়া করে আসছে।

ওয়েৎস্লারে তিনি আর থাকতে পারলেন না। তারপর একদিন তিনি কেস্ত্নারকে একটুকরো চিঠি লিখে সকলের অজ্ঞাতে ওয়েৎস্লার থেকে বিদায় নিলেন। জানিয়ে গেলেন : "আর মুহূর্ত্তমাত্র এখানে থাকলে তিনি আর আত্মগোপন করতে পারতেন না। তাই বিদায়—অনিবার্য্য বিদায়—এরই কিছুদিন পরে তাঁর বেরুল অন্যতম বিখ্যাত রচনা "Werthus Leiden"—(Sorrows of weather) এই বইটি আর কিছুই নয়—লোটির প্রতি তাঁর যে মনোভাব ও মর্ম্ম যন্ত্রণা এই গ্রন্থে তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন গ্যেটে। এর নায়ক "ওয়ারষ্টার", কিন্তু নায়িকা বিবাহিতা শার্লোট। ওয়ারষ্টার তাকে ভালবেসেছে—কিন্তু সে ভালবাসা বাসনা কামনা বর্জ্জিত। যেমন নিষ্কলঙ্ক তেমনি পবিত্র।

লোটির পরেও জীবনে আরো নারী আবির্ভূতা হয়েছে গ্যেটের! এসেছে লিলি, এসেছে ফনস্টাইন। কিন্তু তাঁরা প্রেমই পেয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির কাছ থেকে পূজা মাত্র একজনই আদায় করতে পেরেছেন—মাত্র একটি নারীই স্বমহিমায় নিজেকে অনন্যা করে রেখেছেন। লোটিবুফ্ তাই পৃথিবীর শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের বস্তু—নারীত্বের একটী উজ্জ্বল প্রকাশরূপে আমাদের সমাদরের সামগ্রী।

লোটি গ্যেটের জীবনে যে নূতন অনুভূতির দ্বার মুক্ত করে দিয়েছিলেন মহাকাব্যে, তাঁর সাহিত্যে তা স্থায়ী করে রেখেছেন তিনি। নারী প্রেমের মহত্ত্বরূপ সম্পর্কে গ্যেটের উক্তি আমরা বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কাব্য-সমালোচকের অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করছি ;

"বৃথা গর্জ্জন করে প্রবৃত্তির বন্যা
কঠিনা অজিত উপকূলের সামনে
বেলাভূমে ছড়ায় তা কবিত্বের মুক্তা
লাভ হয় জীবনের কাঙ্ক্ষিত ধন"

লোটির "অজিত বেলাভূমিতে গ্যেটের প্রবৃত্তির বন্যা সত্যি সত্যিই কবিত্বের অমর মুক্তা ছড়িয়ে গেছে।"

শিল্প-প্রদর্শনী

শ্রীসত্যচরণ দাস

শিল্পীরাই দেশের ও জাতির সংস্কৃতির উত্তরসাধক। এ কথার সত্যতা প্রত্যেক সভ্যদেশের নাগরিকরাই স্বীকার করে আসছেন। সুতরাং দেশের ভবিষ্যত গঠনে শিল্পীর দানও নগণ্য নয়। এ বিষয়ে ক'লকাতার ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের যে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হ'ল তা দেখে শিল্পানুরাগী মাত্রেই আশান্বিত হবেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ বিষয়ে প্রথমেই বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষকের কথাই মনে স্থান পায়। বিভাগীয় শিক্ষক শ্রীকাশীনাথ দাসের শিক্ষাধীনে যে কয়জন তরুণ শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী দেখলাম তাতে মনে হয়, শিক্ষাগুরুর সাধনা ও প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় নি। এজন্য আমরা শিক্ষক মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ভারতের অদ্বিতীয় শিল্পী শ্রীঅতুল বসু। এটা ছাত্রদের সতুনত্ব ও সৎসাহসের পরিচায়ক।

প্রদর্শনীতে বলিষ্ঠ অঙ্কনের উদাহরণ, বিশেষ করে Nature study আকৃষ্ট করে। "Nature is the Master of all Arts" এই বাণী

গঙ্গার তীর

যে এখানকার প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে—তা প্রতিফলিত হয় তাদের অঙ্কিত প্রতি চিত্রেই। তৈল চিত্র, জলরং, কালি কলম, পেন্সিল প্রভৃতি নানা মাধ্যমে আঁকা প্রায় ৩০০ ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির কার্য্যের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দাশরথি পালের নাম। তাঁর আঁকা ছবিতে যে নূতনত্বের ও সৎসাহসের ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি, তাতে অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে বাংলার শিল্পীসমাজের মুখ উজ্জ্বল করবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর বলিষ্ঠ তুলি আমাদের মনে দাগ কেটেছে। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে "মালাকর রমনী" (২২) "বারান্দার মধ্যে দিয়ে (২) "অধ্যয়ন (৮২)" ও "আমার

বারান্দার মধ্য দিয়ে

বোন" (৭১) উল্লেখযোগ্য। সুনীল বৈশ্যর কয়েকখানি চিত্রও সবদিক প্রশংসনীয়। তাঁর আঁকা "আমার গ্রাম (৫০) চিত্রে শিল্পীর তৈল চিত্র অঙ্কনের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। জলরং এ "উঁচুভূমি" (৯৯) তে শিল্পীর নিপুণতা প্রকাশ পেলেও রসসৃষ্টির দিক দিয়ে ছবিটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। সত্য মুখার্জির কাজে বিষয় নির্ব্বাচনের বাহুল্য আছে। তাঁর কয়েকখানি কাজে নিখুঁত সৌন্দর্য্যের পরিচয় আছে। তৈলচিত্রে "পুরানো বটগাছ" (৩৫) ও "বৃক্ষতলে" (৫৪) তাঁর সৃষ্টির নিপুণতা প্রশংসনীয়। "লালবাড়ী" (১০৮) line and washএ ও "গ্রাম্য ঘাট" (১) জলরং এ বলিষ্ঠতার পরিচায়ক। কিন্তু তাঁর নির্ব্বাচনের বাহুল্য বিধায় "বাঁশের সাঁকো" (৪৮) শিল্প সৃষ্টির বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

সুধীর মৈত্রের কয়েকখানি চিত্রে শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া যায়। তাঁর অঙ্কন-পদ্ধতিতে বলিষ্ঠতার নিদর্শন আছে। Landscape ও Portrait এ দুয়েতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেখা যায়। এর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে প্রথমেই "পঞ্চবটির" (৬১) কথা মনে হয়। ছবির শান্ত পরিবেশ ভগবান রামকৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু এত আলো-ছায়ার খেলা মনোমুগ্ধকর হোলেও কিঞ্চিৎ

মা ও ছেলে

অতিরিক্ততার আভাষ আছে—। তাঁর অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে "ইরা" (৬৯), "এসপ্লানেডের মোড়" (১০৬), "প্রদর্শনীতে" (১০০) ও "ছায়াবনতল" (১৪৫) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর "লাইফ ড্রইং" গুলি (২৬৮) প্রদর্শনীর সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ করেছে।
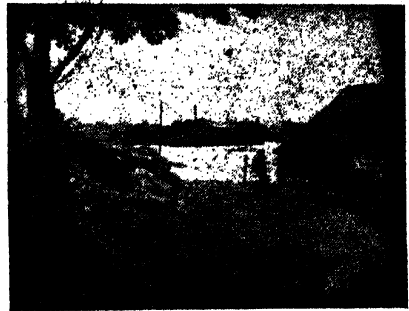
আলো-ছায়া

শিক্ষক শ্রীকাশীনাথ দাশের কাজের মধ্যে "আলো ও ছায়া" (৪১) ও "চিড়িয়াখানার দৃশ্য" (৩৬) ছবি দুটি উচ্চাঙ্গের অঙ্কন পদ্ধতির নিদর্শন। কিন্তু "By the shore" (৩৯) ছবিখানিতে তাঁর দক্ষতার

পূর্ণ প্রকাশ নেই। তাঁর অঙ্কন পদ্ধতি অনেক ছাত্রই গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়। সুশীল দাসের কাজগুলিও মনোমুগ্ধকর। তাঁর কাঠগোলা (১৯) নির্ম্মাণ (৫) ও অন্নপূর্ণা ঘাট (৫২) উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন। তাঁর কমার্সিয়াল কাজগুলি অতুলনীয়। এছাড়াও পাশ্চাত্যভঙ্গিতে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে গৌতম মজুমদারের "তিনটি গাছ" (১৪৮), সরিৎ নন্দীর "বিদ্যালয়ের একাংশ" (১৫৯), অমরেশ গাঙ্গুলীর দম্পতি (১২২), তুষার সেনের "মধ্যাহ্নের নীরবতা" (৭৮), ও দেবদাস ভট্টাচার্য্যের খোয়াঘাট (১১১) যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। গণেশ নায়কের "কুলি

প্রাচীরপত্রের নক্সা

ক্যান্টিন" (৩৩) শিল্পীর দরদী মনের পরিচায়ক। সুধীর রায়, নির্ম্মল দত্ত, অরুণ ঘোষ ও দীনেশ সাহার উত্তম প্রশংসনীয়। তারাপদ বোসের মা ও ছেলে প্রভৃতি কাজগুলিতে নতুনত্বের আভাষ আছে। কিন্তু ড্রইং ও composition সম্বন্ধে আরও সচেতন হওয়া দরকার।

প্রাচ্য অঙ্কন পদ্ধতিতে ভারতীয় কলার তেমন আশান্বিত উৎকর্ষতা প্রদর্শনীতে লাভ করেনি—।এর মধ্যে গৌতমমজুমদারের "জলকে চল"(১৬) সত্য মুখার্জির "কালো মেয়ে" (১৫) সরিৎ নন্দির "স্নানের পর" (১৩) ও অমরেশ গাঙ্গুলীর "ভারতীয় সৌন্দর্য্য" (২৫) ছন্দের দোলায় সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত।

দেওয়ালপঞ্জী চিত্রণ একটীও ভাল লাগেনি। "টেক্সটাইল ডিজাইনে" দীপ্তিমেধা বিশ্বাসের নামই উল্লেখযোগ্য। পরেশ চৌধুরীর শ্লেট খোদাই এক অপরূপ শিল্প সৃষ্টি করেছে—এর পূর্ব্বে এ ধরণের কাজ কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। প্রাচীর পত্রে মনোহর দে, সুনীল বৈদ্য, সুধীর মৈত্র ও সুশীল দাশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কমার্সিয়াল ডিজাইনে—সুশীল দাস, সুনীল বৈদ্য, শৈলেন দে, কমল সরকার ও গৌতম মজুমদার উল্লেখযোগ্য।

জলকে চল

এই প্রদর্শনী দেখে আমরা ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রদের যে উদ্দীপনার পরিচয় পেয়েছি তা আমাদের মনে বহু দিন জাগরূক থাকবে। আগামীবারে আরও উন্নততর শিল্প নিদর্শন দেখবার আশা রাখি। তবে সরকার যদি এই বিদ্যায়তনের দিকে কিঞ্চিৎ মনযোগী হন তবে এই তরুণ উদীয়মান শিল্পীরা ভবিষ্যতে ভারতের সংস্কৃতির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

ন্যায়রত্ন কোন কথা বলিলেন না অরুণাকে। নীরবে দেবকী সেনের সঙ্গে জয়তারার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। অরুণাই কয়েকটি কথা বলিল। বলিল—কাশী আমি যেতে পারি নি দাদু। মোগলসরাইয়ে নেমে আমি—।

অরুণা দেবকী সেন স্বর্ণ ও গৌরের দিকে চাহিয়াই বোধ হয় চুপ করিয়া গেল। নীরবে খানিকটা পথ হাঁটিয়া আবার বলিল—এক বেলা মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক'রে শেষ ফিরে গেলাম কলকাতা।

ন্যায়রত্নের শীর্ণ মুখে ক্ষীণ একটুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রসন্নও নয়, বিষণ্ণও নয়, সে হাসি বিচিত্র; কি যে সে হাসির অর্থ, সে শুধু তিনিই জানেন।

গৌর বলিল—সে কথা আমি লিখেছিলাম দেবুদাকে।

কথাবার্ত্তা হইতেছিল একটি অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে। সন্ধ্যার মুখে পথ চলিতে চলিতে টুকরা টুকরা কথা যেন কোন বায়ুপ্রবাহে হিম শীতের রাত্রে শিশির বিন্দু ঝরিয়া পড়ার মত জমিয়া জমিয়া শিশির কণা বিন্দুতে পরিণত হইয়া আপনার ভারে যেন আপনি ঝরিয়া পড়িতেছিল। একটা সংকোচ যেন সমস্ত মানুষ-গুলির মন প্রাণকে নিস্তরঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। স্বর্ণ একটি কথাও বলে নাই। অন্ধকারে দেখিবার উপায় ছিল না—তাহার উপর সে মাটির দিকে মুখ নামাইয়া পথ চলিতেছিল, তাহার ভুরু দুটি কুচকাইয়া উঠিয়াছে, যৌবন-মসৃণ ললাটেও গোটা দুয়েক রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা চলিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর তীরভূমির উপর দিয়া একটা নির্জ্জন পথ ধরিয়া। বালির উপর এতগুলি লোকের পা-ফেলার শব্দ উঠিতেছে শুধু।

আবার অরুণাই বলিল—ভেবেছি আপনাকে চিঠি লিখি, কিন্তু—।

কিন্তু বলিয়াই থামিয়া গেল, বাকী কথাটুকু আপনি বাহির হইয়া আসার মত ভাব যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। একটি শিশির বিন্দুর খানিকটা খসিয়া পড়িল—বাকীটা যেন পাতার প্রান্তে লাগিয়া রহিয়াছে—দুলিতেছে।

হঠাৎ স্বর্ণ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া গেল। ডাকিল—অরুণা দি।

—এ্যাঁ।

—আপনি কি ?—আপনি কি ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে জয়তারা আশ্রমে যাবেন ?

এতক্ষণে অরুণার—শুধু অরুণাই নয় দেবকী সেন ন্যায়রত্ন এমন কি গৌরেরও খেয়াল হইল—তাহারা শিক্ষয়িত্রীদের বাসার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। জয়তারা আশ্রমের পথিক এবং বাসার লোকের পথ এইখান হইতেই ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পথ ভাঙিতে হইবে। অরুণা বলিল—ন্যায়রত্নকেই বলিল—আমি যাই।

এতক্ষণে ন্যায়রত্ন বলিলেন—এস। তারপর ডাকিলেন—সেন।

দেবকী আগাইয়া আসিয়া বলিল—চলুন।

সন্ধ্যার প্রারম্ভ, কিন্তু অন্ধকার ঘন গাঢ় হয় নাই। পশ্চিমের আকাশে খানিকটা মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ছোট বড় টুকরা হইয়া ছড়াইয়াছিল—সেগুলিতে অস্তগত সূর্য্যের ছটার রেশ তখনও জাগিয়া রহিয়াছে, ধ্বনির শেষে প্রতিধ্বনির মত—আলো খানিকটা ধরিয়া রাখিয়াছে। দুটি মানুষ পূর্ব্বমুখে চলিয়াছে;—অরুণা দাঁড়াইয়াই রহিল। অকস্মাৎ মেঘের আলো মুছিয়া গেল, অন্ধকারটা সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় হইয়া উঠিল;—মানুষ দুটিকে আর দেখা গেল না।

গৌর বলিল—চলুন এইবার।

স্বর্ণ খানিকটা আগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মধ্যে

একটা অধীরতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অরুণা গৌরের ডাকে সচেতন হইয়া বলিল—চল। স্বর্ণ কই ?

—এই যে।

—ও।

—আপনি ওঁর সঙ্গে গেলেই বোধ হয় ভাল করতেন।

—ওঁর সঙ্গে ? আশ্রমে ?

—হ্যাঁ। এখানে আপনার অনেক অসুবিধে হবে।

—অসুবিধে হবে ? বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না অরুণার। এ কি বলিতেছে স্বর্ণ ? দীর্ঘ তিন বৎসরের উপর সে এখানে চাকরী করিতেছে, এই বাসাই তাহার ঘর হইয়া উঠিয়াছে—এখানে তাহার হঠাৎ আজ অসুবিধা হইবে কেন ? তাই 'অসুবিধে হবে' কথাটা সবিস্ময়ে সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার প্রশ্ন করিল—অসুবিধে হবে কেন ? আমার বাসায় কি কেউ রয়েছে ?

অর্থাৎ দলের কোন কর্ম্মী কি রহিয়াছে সেখানে ?

স্বর্ণ বলিল—না। এখানকার যারা, তারাই রামসেবকের ওখানে। ঘর আপনার কেউ নাড়েনি।—তবে—।

—তবে কি ?—

—দেখবেন। ঘরের তালায় হাত দিয়া স্বর্ণ বলিল—হেঁয়ালীর মতই বলিল—দেখবেন।

* * *

চাপা কথাটা চাপিয়া রাখার জন্যই বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেটা অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িতেই তাহার ঝাঁঝের তীব্রতায় অরুণা যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—অন্তরে অন্তরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সেটা ঘটিল এইভাবে। বাড়ীতে আসিয়া সহজ সুরেই অরুণা বলিল—দাঁড়াও ভাই, আগে গা হাত মুখ ধুয়ে ফেলি। বাবা—ট্রেণে যা কয়লার গুঁড়ো খেয়েছি !

সুটকেস খুলিয়া কাপড় গামছা সাবান লইয়া কুয়াতলার পাশে স্নান ঘরের দিকে যাইতে যাইতেই অরুণা বলিল—ষ্টোভটা ধরিয়ে একটু চা কর ভাই স্বর্ণ।

—আপনি চা-খাবেন ? ষ্টোভ ধরাব ?

—এলাম বলে আমি। দেরী হবে না আমার। তুমি তৈরী কর।

—কিন্তু এই সব বাসনে—আমার হাতে আপনি খাবেন তো ?

—কি বলছ তুমি স্বর্ণ ? অরুণা প্রচণ্ড বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া উচ্চ কণ্ঠেই প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

—আপনি যে কেঁচে গণ্ডুষ করে বসেছেন অরুণা দি। ঠাকুর মশায়ের বিধবা নাত-বউ সেজেছেন নতুন ক'রে। থান কাপড় পরেছেন, হাত খালি করেছেন, একাদশী করেছেন—এর পরও আপনি—

অরুণার কাছে এমনি অকল্পিত, এমনি অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নগুলি—এবং এই প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটি এমনই তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র ও জ্বালাকর কোন রসায়ন-মাখান যে অরুণা মুহূর্ত্তে যেন হতচেতন হইয়া গেল। অন্তরে অন্তরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল সে, কিন্তু মুখে একটি শব্দও বাহির হইল না।

স্বর্ণ বলিল—মাথার চুলগুলি কেটে ফেললেই আর অঙ্গহীন থাকত না—ষোল আনা পুরো হয়ে যেত। তাহার মুখে তীব্র হাসি খেলিয়া গেল—সে বলিল—আসলে আপনারা ব্রাহ্মণ—বৈদ্য ব্রাহ্মণ এরা হলেন ধর্ম্মজগতের অভিজাত—মাথার মণি, আপনাদের পক্ষে এগুলো ছাড়া শক্ত। কিন্তু ছি—ছি—অরুণা দি—আপনি শেষে এমনি উল্টোবাজী খাবেন এ কেউ ভাবে নি। আমি তো ভাবতেও পারি নি।

অরুণা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—আমি আসছি স্বর্ণ। স্নান ক'রে আসছি। গৌর ততক্ষণে তুই ষ্টোভটা ধরিয়ে জল চড়িয়ে রাখ না ভাই।

ইহার আগে দরবারী শেখ কথাটা কদর্য্য অশ্লীলতার সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিল। অরুণা দরবারীকে জানে—এবং ইংরাজের পুলিশ বিভাগের এ দিক দিয়া শিক্ষার কথাও তাহার কাছে অবিদিত নয়—তাই ও কথাটা সে ধরে নাই। ইহার জন্য মনের সকল ক্ষোভটুকু ইংরাজের উপর ও ইংরাজের পুলিশের উপর পড়িয়াছে। বাহির হইয়া আসিয়া সে ন্যায়রত্নকে দেখিয়া তাঁহার কাছেই আগাইয়া গিয়াছিল—সুরপতির মুচকি হাসি, রণদাবাবুর মুচকি হাসি ; দেবকী সেনের বিস্ময়, স্বর্ণের বিচিত্র বহু-প্রশ্নরেখাঙ্কিত মুখ ও দৃষ্টি কোন দিকেই লক্ষ্য করে নাই। এমন কি আসিবার পথে সকলেই যে নীরব হইয়া পথ চলিতেছিল, তাও সে খেয়াল করে নাই।

এতক্ষণে স্বর্ণ কথাটা অতি তীব্রভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। স্নান সারিয়া অরুণা আসিয়া বসিয়াই বলিল—চা করিস নি গৌর? স্বর্ণ বারণ করেছে বুঝি?

—করেছি।

অরুণা চায়ের জল নামাইয়া—তাহাতে চা ফেলিয়া দিল। তারপর বলিল—চায়ের চেয়ে জলই বোধ হয় বেশী ভাল লাগবে। একগ্লাস জল ঢালিয়া লইয়া সে জলটুকু নিঃশেষে পান করিয়া বলিল—আঃ।

স্বর্ণ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া বসিয়া আছে—সে বলিল—এ সব কি আমাকে দেখিয়ে করছেন অরুণা-দি?

—তুমি এমন রুক্ষ—তপ্ত আগুন হয়ে উঠলে কেন বল তো স্বর্ণ? বলিয়াই বলিল—ও। তোমার রাগের কারণ হ'ল আমি থান কাপড় পরেছি, হাতের চুড়ি খুলেছি—একাদশী করেছি—

স্বর্ণ মাঝপথেই বাধা দিয়া বলিল—সে আপনি দুনিয়াকে দেখিয়ে করেছেন। লোকে তার জন্যে মুচকে মুচকে হেসেছে। দরবারী শেখের কথাও আমার কানে এসেছে। সে নিয়ে এরই মধ্যে লোকে কথা বলছে। সে নিয়ে জিজ্ঞাসা তো আপনাকে আগেই করেছি আমি। যা নিয়ে জীবন স্বরু করলেন, যার জন্যে শপথ নিলেন, যার জন্যে বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে আপনি বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করলেন, সে সব আপনি হঠাৎ ভাসিয়ে দিয়ে—এ কি করলেন? তারপর আবার একাদশী করেও আমাকে দেখিয়ে জল খেলেন—চা খাবেন; এ কি?

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল অরুণা। তারপর ধীর শান্ত কণ্ঠে বলিল—আমি একটা খুব বড় আঘাত পেয়েছি স্বর্ণ।

—জানি—

—না—জান না।

—জানি না? স্বর্ণ হাসিল।—আঘাত যে খেলেন অরুণা দি বিশ্বশুদ্ধ লোকের সামনে। ন্যায়রত্নমশায়কে আঘাত করতে গিয়ে—নিজে আছাড় খেয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে।

—না স্বর্ণ। সে নয়। সমর ঘোষ আজ বছরখানেক ধ'রে আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে। তার দাবীর কাছে আমি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু—

—কিন্তু কি আছে এর মধ্যে অরুণা দি? বক্র হাসিয়া স্বর্ণ বলিল—কিন্তু তো—সেই আপনি বৈষ্ণ ব্রাহ্মণের মেয়ে—ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত পুণ্যবান ব্রাহ্মণের পৌত্রবধূ আপনি, বিধবা হয়ে আপনি কি ক'রে সমর ঘোষকে বিয়ে করবেন?

অরুণা স্থির দৃষ্টিতে স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আমাকে বারবার আঘাত করতে চাচ্ছ স্বর্ণ।

স্বর্ণ বলিল—সত্য কঠোরই হয় অরুণা-দি, আর কঠোর যা—তার সঙ্গে সংঘর্ষ হলেই আঘাত পেতে হয় অনিবার্য্যভাবে। আঘাত তো আমি আপনাকে দিই নি অরুণা-দি, সমর ঘোষের ভালবাসাকে এইভাবে অন্ধ-সংস্কারের বশে অপমান করছেন—তাতে আপনি নিজেই নিজেকে আঘাত করছেন—অপমান করছেন। আমি না।

—সমর আমাকে ভালবাসে, কিন্তু আমি যে তাকে ভালবাসি না স্বর্ণ। তার দাবী আমি মানব কি ক'রে?

—কি বলছেন আপনি? স্বর্ণ সোজা হইয়া বসিল।—শেষে আপনি মিথ্যে বলতে আরম্ভ করলেন অরুণা-দি?

—স্বর্ণ! অরুণার কণ্ঠস্বরে এবার তিরস্কার বাজিয়া উঠিল।

—ধমক দিয়ে তো আমার মুখ বন্ধ করতে পারবেন না অরুণা-দি! হাসিয়া বলিল—কারই বা পারবেন! এ কথা কে বিশ্বাস করবে বলুন?

—বিশ্বাস আমি কাউকে করতে বলব না স্বর্ণ। আমার বিশ্বাস—আমার অন্তরের সত্যকে আমি এতদিনে আবিষ্কার করেছি। আমি তাকে ভালবাসি না।

—আবিষ্কারটা অভিনব অরুণা-দি। আজ দু বৎসর মাসে চারখানা করে অন্তত ছিয়ানব্বইখানা পত্র আপনি তাকে লিখেছেন—সেও আপনাকে লিখেছে; তার কতক আমি দেখেছি—আপনিই দেখিয়েছেন। এরপর—এ আবিষ্কার অভিনব।

—অভিনব বল—আপত্তি করব না, কিন্তু এ আবিষ্কার সত্য। একটু শান্ত হয়ে যদি আমার কথা শোন স্বর্ণ, তবে হয় তো বুঝতে পারবে। যে খাদ্য খেতে সারা দেহটা পাক দিয়ে ওঠে স্বর্ণ, উপবাসে থেকে মানুষ সেই খাদ্যের জন্য লালায়িত হয়ে তারই দিকে হাত বাড়ায়—তবে সেটা হ'ল

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ক্ষুধার তাড়নার পরিচয়। সেটা তার রুচির পরিচয় নয়।

—তার মানে ?

—আরও ভেঙে বলতে হবে স্বর্ণ ? আমার বয়স তো তোমার চেয়ে বেশী নয় ভাই। আমার দেহের ক্ষুধা আছে, এ কথা বলতে লজ্জা আমার নাই। দেহের ক্ষুধায় মন আমার দুর্ব্বল হয়ে পড়ছিল—আমি সমরের চিঠির উত্তরে চিঠি লিখে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তাঁকেও ভুলতে পারছিলাম না। নইলে অনেক দিন আগেই সমরের হাতে নিজেকে তুলে দিতাম। তুমি জান না স্বর্ণ—তুমি জান না, মনের মধ্যে সে কি যুদ্ধ ! সমরকে চিঠির উত্তর লিখেছি সম্মতি দিয়ে—চিঠি লিখে উঠে মনে হয়েছে—সমস্ত বুকের ভেতরটা—আমার চরম সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে—এমনি দুঃখে ভরে উঠেছে। অকারণে কেঁদেছি। কেঁদে তৃপ্তি পাই নি। রাত্রে তাকে স্বপ্ন দেখেছি। সকালে উঠে সমরকে চিঠি লিখেছি—না। চিঠি লিখে উঠে মনে হয়েছে এ দুনিয়ার সব তেতো—সব বিস্বাদ, ইচ্ছে হয়েছে সমস্ত কিছুতে আগুন ধরিয়ে দি। ইস্কুলে মেয়েদের অকারণে বকেছি, মেরেছি। তোমার সঙ্গে—দেবুবাবুর সঙ্গেও কথান্তর হয়ে গেছে। এ সবের ভেতরের কথা জানতে না—কিন্তু আমার এই অবস্থার কথা তো তোমার জানা। কতদিন বলেছ—আপনার ঘাড়ে একটা ভূত চাপে অরুণা দি—সেটা কখনও কাঁদায়, কখনও রাগায়। স্বর্ণ ভূত ওটা বটে—কিন্তু তাকে কি কোনদিন হাসাতে দেখেছ আমাকে ?

স্বর্ণ স্থিরদৃষ্টিতে অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে বিস্ময় ক্ষোভ হয়তো বা ক্রোধও ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, কিন্তু অরুণার কথার প্রতিবাদ করিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। অরুণা যাহা বলিয়াছে—তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আজ দুই বৎসর অরুণা এখানে আসিয়াছে, দুই বৎসরের মধ্যে অরুণা কোন উল্লাসে হাসিয়া উঠে নাই। কখনও ছড়াইয়াছে আগুন—যে কোন উপলক্ষ লইয়া হোক না কেন—সে যখন প্রতিবাদ করিয়াছে তখন তাহার কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় অগ্নিশিখার প্রান্তস্পর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভাষায় জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে, তাহার মুখের কপালের রক্তে আগুনের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, শ্বাস-প্রশ্বাসে উত্তাপ ছড়াইয়া দিয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপর ঘৃণা ও বিরক্তিতে পৃথিবীর কাছেই সে অসহনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। তাহাকে ভয় করিয়াছে। কখনও বা অরুণা এমন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে যে, অরুণা না কাঁদিলেও তাহাকে দেখিয়া স্বর্ণের কাঁদিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু এমন ঘটনা একটিও স্বর্ণ স্মরণ করিতে পারিল না যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া অরুণা উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি যে সমরের কথা স্বর্ণ বলিল—সেই সমরের উপস্থিতি উপলক্ষেও নয়। সমর এখানে কয়েকবারই আসিয়াছে। দলের কাজ লইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাই মুখ্য—না—অরুণার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যটাই মুখ্য—সেটা কেউই হলপ করিয়া বলিতে পারে না। অরুণা সমরের সঙ্গে নদীর ধারে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কাটাইয়া আসিয়াছে, ঘরে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনীতির চর্চ্চা করিতে গিয়া তর্ক করিয়াছে, কতদিন রাত্রে স্বর্ণের পাশের বিছানায় শুইয়া জাগিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছে। সমর আসিলে সমর এবং দেবু একটা বাসায় শুইত, স্বর্ণ ও অরুণা থাকিত একটা বাসায়। গভীর রাত্রে স্বর্ণের ঘুম ভাঙিয়া কোনদিন দেখিয়াছে অরুণা আলো জ্বালিয়া বই লইয়া বসিয়া আছে অথবা কিছু লিখিতেছে, কোনদিন অন্ধকারে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিয়াছে, নিদ্রাহীনতার অধীরতায় অশান্তভাবে পাশ ফিরিয়া শুইতে দেখিয়াছে। একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। স্বর্ণ সেদিন প্রশ্ন করিয়াছিল, ঘুম আসছে না অরুণা-দি ?

—নাঃ। পাশ ফিরিয়া শুইয়া হঠাৎ আবার পাশ ফিরিয়া অরুণা বলিয়াছিল—আমি আর পারছি না স্বর্ণ !

এই কিছুদিন আগেও—মাস চারেক আগে সমরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার সময় স্বর্ণ অরুণাকে বলিতে শুনিয়াছিল—মন আমি স্থির করেছি। তুমি শুধু চাকরী দেখ—তোমার আমার দুজনের চাকরী কলকাতাতে।

তখন গভীর রাত্রি। কর্ম্মীরা সাধারণত যাওয়া আসা করে রাত্রের ট্রেণে। এখান হইতে যে ব্রাঞ্চলাইনটা মাইল পঞ্চাশেক আগে চলিয়া গিয়া আবার মেন লাইনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে সেই ব্রাঞ্চলাইন হইয়া খানিকটা ঘুরিয়া যাতায়াত করে। তাহাতে নজর খানিকটা কম পড়ে। সেদিন দেবু ও গৌর দুজনে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া সমরের

ন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল—সমর ও অরুণা—অরুণার বাসার রজার মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল। স্বর্ণ এবং রুণার বাসার মাঝখানের পাঁচীলের এপাশে দাঁড়াইয়াছিল র্ণ, কথাগুলা সে স্পষ্ট শুনিয়াছিল। সমর বাড়ী হইতে াহির হইবার মুখে অরুণা তাহাকে আবার ডাকিয়াছিল—শান।

সমর ফিরিতেই আবার বলিয়াছিল—কিন্তু জানুয়ারীর মাগে না।

—কেন? আবার জানুয়ারীর খোঁচা উঠল কেন?

—কারণ আছে বই কি! ডিসেম্বরে স্কুলের পরীক্ষা, জানুয়ারীতে নতুন সেসন। এ সময়ে চাকরী ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

—বেশ ত' ছাড়বে না। ততদিন থাকবে।

—হ্যাঁ। এখানে থাকতে আমি—

—কি?

—ততদিন অপেক্ষা কর সমর। করতেই হবে।

স্বর্ণ এ পাশে দাঁড়াইয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল; এই কথার পরই সে দরজা বন্ধ করিবার শব্দ শুনিয়াছিল। পরদিন সকালে স্বর্ণ হাসিমুখে রসিকতা করিবার ইচ্ছা লইয়া মনে মনে অনেক কথা তৈয়ারী করিয়া লইয়া অরুণার বাসায় গিয়া অরুণাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। ঘরের মেঝের উপর অরুণা শুইয়াছিল, শুইয়াছিল নয়—পড়িয়াছিল। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিল—কি হল অরুণাদি?

—মাথা ধরেছে।

—এ্যাসপ্রো খান নি কেন? পরশু তো আনিয়েছেন। ওই তো টেবিলের উপর রয়েছে—

—না।

—না—নয়, উঠে খেয়ে ফেলুন। মেঝেতে শুয়েই বা কেন?

—ঠাণ্ডা ভাল লাগছে।

—জ্বর হয় নি তো?

—না। আমায় একটু ঘুমুতে দাও স্বর্ণ, ঘুম হলেই সব সেরে যাবে। সে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। যাহার সুস্পষ্ট অর্থ—তুমি যাও স্বর্ণ—তুমি যাও।

সেদিন দশটায় সে ইস্কুলও যায় নাই। বুড়া পণ্ডিতকে লইয়া স্বর্ণই ইস্কুল চালাইতেছিল, হঠাৎ বেলা সাড়ে বারোটা একটার সময় অরুণা গিয়া হাজির হইয়াছিল। বাকী দিনটা সামান্য ছুতায় নাতায় বকিয়া-ঝকিয়া আগুন ছড়াইয়া গোটা ইস্কুলটাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একটা ছোট মেয়ে বুড়া পণ্ডিতের চটের থলি হইতে ওল চুরি করিয়া তাহাতে কামড় মারিয়া এক কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছিল, সে এক কাণ্ড, সকলে হাসিয়া সারা; প্রবালের মত রঙের এমন একটি নরম সরস সামগ্রী যে আস্বাদনে এমন মারাত্মক হইতে পারে সে কথা বেচারা ভাবিতেও পারে নাই। তাহার ফলে—কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটির ঠোঁট জিভ ফুলিয়া সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যাপারটা অর্থাৎ ওল চুরির সত্য ও তত্ত্বটা প্রকাশিত হইতেই পড়িয়াছিল হাসির পালা। মেয়েটাকে তেঁতুল চুষিতে দিয়া স্বর্ণ হাসিতে হাসিতে অপিসে অরুণাকে সংবাদটা দিতে গিয়াছিল। অরুণা কিন্তু হাসে নাই। কঠিন দৃষ্টিতে অন্যদিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়াছিল—পণ্ডিতমশাইকে মুখে বলে সাবধান করা গেল না। ওঁকে আমি written warning দিতে চাই স্বর্ণ। কোনদিন থলির ভিতর তামাক নিয়ে আসবেন। কোনদিন মেয়েদের বলবেন—বাড়ী থেকে শাক আনতে—কোনদিন কিছু; এ আমি সহ্য করব না।

স্বর্ণ বলিয়াছিল—না—না—না। বুড়োর ওপর রাগ করবেন না। ভারী ভাল লোক।

—হয়তো ভাল লোক। কিন্তু কি ব্যাপারটা হল বলতো?

—কি হল? হাসির ব্যাপার। 'ওল খেয়ো না ধরবে গলা'—মেয়েরা পড়েছিল—চোখে দেখলে।

অরুণা চুপ করিয়া ভাবিতে সুরু করিয়াছিল।

স্বর্ণ বলিয়াছিল—আপনি একটু হাসুন অরুণাদি।

অরুণা স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়াছিল স্থিরদৃষ্টিতে। বিচিত্র স্থির দৃষ্টি, মনে হয় যেন অর্থহীন, অথবা এত গভীরে সে অর্থ নিহিত যে—সে অর্থ অন্যের বোধের অগম্য।

কথাগুলা আজ মনে পড়িয়া গেল স্বর্ণের। অরুণা মিথ্যা কথা বলিতেছে না। সে কখনও হাসে নাই। কান্নার কথাও সত্য। অন্যে না জানুক স্বর্ণ জানে।

গভীর রাত্রে সে দেওয়ালের এ পাশে থাকিয়া কান্নার শব্দ শুনিয়াছে, সকালে উঠিয়া অরুণার চোখের কোলে কালী দেখিয়াছে—স্ফীতি দেখিয়াছে; মুখ ধুইলেও ও দুইটা চিহ্ন ধুইয়া যাইত না।

অরুণা বলিল—যেদিন দাদু এলেন—সেদিন কঠিন আক্রোশে—তাঁর অপমান করতে গেলাম। সংকল্প ক'রে রেখেছিলাম আগে থেকেই। তোমায় বা দেবুবাবুকেও বলিনি। যখন তাঁর সঙ্গে এখানে প্রথম এসেছিলাম বন্যাপীড়িতদের সেবা করতে—এখানকার অবস্থা দেখতে—তখন দাদু যে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন—তাঁর নাতির গলায় পৈতে না দেখে, আমার হাত ধরে সস্নেহে সপ্রেমে টানতে দেখে—তারই ফলে তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে চলে গেলেন কাশী। আমার মনে হয়েছিল—এত বড় অপমান আমাকে আর কেউ করে নি। উনিও কম বেদনা কম দুঃখ পান নি—সেও আমি ষোল আনা টেনে নিয়েছিলাম। একবারও বিবেচনা করি নি—ওঁরাও দুজনে—একজন পিতামহ অন্যজন পৌত্র। থাকগে। মানুষের অহংকারটা তো আর কিছু নয়—নিজের অহংকেই সর্ব্বস্ব ক'রে দেখা। তাই দেখেছিলাম আর কি।

একটু চুপ করিয়া বলিল—গৌর, তুই ভাই দুটো মিষ্টি কিনে আনবি। আর কিছু ফল। ফল মানে কলা—আর ঠাণ্ডা যদি কিছু পাস, শাঁখআলু—যাকে তোরা সরবতি বলিস—পাবিনে?

গৌর চলিয়া গেলে অরুণা আবার বলিল—প্লাটফর্মে আমার সঙ্গে সম্পর্কের কথা আর কেমন ক'রে সে সম্পর্ক হয়েছিল—মানে মুসলমান হয়ে বিয়ে করেছিলাম আমরা—কথাটা যখন বলতে গেলাম স্বর্ণ, তখন হঠাৎ আমার মনে হ'ল কি জান? মনে হল—তিনি যেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর দাদুর পাশে, চোখে তাঁর আগুনের মত দৃষ্টি। আমার ভ্রম হয়েছিল ভাই—দাদুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন—তিনি—না, দাঁড়িয়েছিল অজয়! স্বর্ণ প্রথম যখন ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলেন তিনি, ক্লাসে—পাশাপাশি বসতেন আমার দাদার সঙ্গে। দুজনের বন্ধুত্ব হল—দাদা নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে আমাদের বাড়ী। তখন আমি ছোট—খুব ছোট, সাত আট বছর। তবু তাঁর সে চেহারা আমার মনে আছে। অজয়কে দেখলাম—অবিকল সেই তিনি। আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। মনের সত্য দেহের ক্ষুধাকে উপেক্ষা করে—নিজেকে জানিয়ে দিলে। বলে দিলে—মা যদি হতে পার—ওই অজয়ের, তবে তোমার মনের সত্য সার্থক হবে—ওতেই মিটে যাবে দেহের ক্ষুধা, শোণিত হবে অমৃত—

স্বর্ণ বাধা দিল এইবার—থাক অরুণাদি। আমায় এত সব কথা বলে লাভ কি বলুন।

—লাভ আর কি? এতদিন মনের কথা মনে চেপে রেখে তৃপ্তি পাই নি—শান্তি পাই নি, বলবার মত প্রবৃত্তিও ছিল না—হয়তো সাহসও ছিল না স্বর্ণ। কিন্তু আজ—

—আজ আপনার সাহস হয়েছে, প্রবৃত্তি হয়েছে, বলে আপনি তৃপ্তি পাচ্ছেন—শান্তিও পাবেন। আরও অনেক কিছু পাবেন অরুণা-দি। কিন্তু তবুও—বলব—ছি—ছি—ছি! আপনি হেরে গেছেন। শুধু হেরে গেছেনই নয় অরুণা-দি—আপনি—কি বলছেন তা পর্য্যন্ত আপনি বুঝতে পারছেন না। অরুণা-দি আপনি বললেন—অজয়ের মা হ'লে আপনার মনের সত্য সার্থক হবে—তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেহের ক্ষুধা মিটবে, শোণিত হবে অমৃত, আরও হয়তো অনেক কিছু হবে—সে বলবার আগেই আমি বাধা দিয়েছি। অরুণা-দি সন্তান নিজে প্রসব না করলে—শোণিত অমৃত হয় না; হলেও কিছুদিন পরেই আবার সে অমৃত—সেই শোণিতেই পরিণত হয়। আবার ক্ষুধা জাগে। আপনার মনের সত্য আপনার মন-গড়া; মন-গড়া সত্যকে সার্থক করতে আপনি জীবন-সত্যকে মিথ্যে করে দিয়েছেন। বলিয়াই সে আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

অরুণা ডাকিল—স্বর্ণ। স্বর্ণ! তাহার অধরে ক্লান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বাহির হইতে—স্বর্ণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কে? কে এখানে দাঁড়িয়ে? কে? নেলো?

নেলোর মৃদুস্বর শোনা গেল—হ্যাঁ।

—কি? কি দরকার?—অ—পুতুল! পুতুল দিতে এসেছিস?

—না। ও একজনার বয়াতি জিনিষ। বড়দিদি-

মণিকে একটা কথা বলতে এসেছি। স্যান মশাই বলে দিলেন।

—কে ?

—স্যান মশাই। দেবকী স্যান! কাল সকালে—নদীর ঘাটে ঠাকুর মশাই চানে আসবেন—দিদিমণিকে বলে দিলেন—পারেন যদি তো ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে যেন দেখা করেন।

স্বর্ণ হাসিল। হাসির শব্দ অরুণা স্পষ্ট শুনিল। ইহার পর দরজা বন্ধ করার শব্দ হইল। স্বর্ণ নিজের বাড়ীতে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল। নেলো ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইল। অরুণা বলিল—আমি সব শুনেছি নলিন।

নলিন—নারবে পুতুলটি নামাইয়া দিয়া—সর্ব্বাঙ্গে একটা অস্বস্তিকর ভঙ্গি ফুটাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতেও দাঁড়াইল। সে বোধহয় আরও কিছু বলিবে।

অরুণা বলিল—আর কিছু বলছ ?

নলিন বলিল—আপনার—

—কি বল ?

—আপনি স্বর্ণদিদির কথা শুনবেন না। ও এত রেগেছে কেন জানেন ? ও নিজে—

বাধা দিয়া অরুণা বলিল—নলিন! ছি!

নলিন যাহা বলিতে চায় তাহা সে বুঝিয়াছে। স্বর্ণ নিজে বিধবা হইয়া বিবাহ করিয়াছে বলিয়া এমন ধারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে!

—তুমি যাও নলিন!

নলিন চলিয়া গেল।

অরুণা আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

হয়তো খানিকটা সত্য নলিনের কথার মধ্যে আছে। কিন্তু অরুণা তো জানে—যে সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্বর্ণ এমন জোর করিয়া কথাগুলি বলিয়া গেল—সে সত্যকে বিশ্বাসের ভিত্তি কত দৃঢ়! দেবু বলিলেও স্বর্ণ শুনিবে না।

(ক্রমশঃ)

শরতের অভিশাপ

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

এখনও পাষাণ গলে শরতের সোনালী আভায়,
পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি আনন্দের মাধুর্য্য শোভায়
পরম প্রশান্তি আনে প্রাণে। মনে হয় মিথ্যা সব
দ্বিধা দ্বন্দ্ব কোলাহল জগতের নিত্য কলরব।
এই লঘু মেঘখণ্ড স্বচ্ছ দুটি ক্ষুদ্র ডানা মেলি'
স্বচ্ছন্দে চলিল উড়ি, সেথা লক্ষ্মী পরি' স্বর্ণচেলি
বদান্য প্রসন্ন নিত্য, শাশ্বত সে ঔদার্য্যের মাঝে—
সর্ব্ব গ্লানি ডুবে যায়, পরিপূর্ণ মাধুর্য্য বিরাজে।
সেই পরিত্যক্ত দেশ, জলভরা সুগভীর স্নেহ
শ্বেত-রক্ত-শতদলে আমোদিত বিলপ্রান্ত গেহ,
স্মৃতি পথে ওঠে জাগি। অয়ি মোর মুগ্ধ মাতৃভূমি,
অচ্ছেদ্য এ যোগসূত্র সে কথা কি ভুলিয়াছ তুমি?
ধমনীতে ধমনীতে মোর প্রতি শিরায় শিরায়
প্রচ্ছন্ন প্রগাঢ় উষ্ণ তব রক্তধারা বয়ে যায়।
আমি যত দূরে দূরে রহি, অদৃশ্য বন্ধনডোর—
দূরান্ত প্রবাসী পান্থে তত কাছে টানিতেছে তোর!
সেই ফল্গু আকর্ষণ শরতের উদার আকাশে,
মেঘ-শুভ্র লঘু মেঘে অনন্তের সীমান্তে আভাসে।
মুক্ত করি' সর্ব্ব তুচ্ছ অব্যক্ত অন্তর ব্যথাখানি
অসহ্য হিরণ্য-গর্ভ-নিহিত দলিত মর্ম্মবাণী—
দাবদাহে সর্ব্বদেহে অন্তরের গূঢ়তম দেশ
জ্বালায়ে উন্মত্ত করি দহিতেছে করি ভস্মশেষ।
জল বিল নদীখাল অকস্মাৎ সঘন বর্ষণ,
ফুল পাখী লতাপাতা নিত্য কেন করে আকর্ষণ?
যূথভ্রষ্ট আশাহত আছে সেথা কটি নরনারী,
তবু তার এত মায়া, তবু তারে ভুলিতে না পারি!
বর্ষে শুধু একবার আমি তব স্নেহাঞ্চলতলে
দু'দণ্ড বিশ্রাম লভি, আমারে কি সেই স্নেহবলে,
না ফুরাতে শ্রাবণের কদম্ব কানন শিহরণ
না ভরিতে ফুলে ফুলে শ্যামায়িত শেফালিকাবন
পাঠাইলে লিপিখানি কাশশুভ্র লঘু মেঘভারে,
তোমার অবোধ শিশু সে লিপিকা পড়ি' বারে বারে
শ্রাবণ-বর্ষণ সাথে মিশাইছে আঁখিবারি তার
রাজেন্দ্রাণী ভিখারিণী তবু তুই জননী আমার!
দুলে দুলে ওঠে বুক, ফুলে ফুলে কাঁদি অভিমানে;
আমারে স্বপনে হেরি দশমী-রজনী অবসানে
আবার নূতন করি আশায় বাঁধিয়া বুকখানি
হেমন্তে, দুরন্ত শীতে, ফাল্গুনে ও-বক্ষে কর হানি'
পাগলিনী যুগে যুগে জাগিও শরৎ পানে চেয়ে
তোমার হারানো ছেলে হয়ত' ফিরিবে তরী বেয়ে।

বানরের অনিষ্টকর ক্ষমতা অশেষ। উহাদের উৎপাতে প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে বানরের দ্বারা প্রতি বৎসর যথাক্রমে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ও ১০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিনষ্ট হইয়াছে।

ভারতে প্রায় ৫ কোটি বানর আছে। অর্দ্ধেকসংখ্যক বানর বনে বাস করে ধরিয়া লইলেও বাকী আড়াই কোটি বানর প্রতি বৎসর সহর ও নগরীর অধিবাসীদের কোটি কোটি টাকার খাদ্য খাইয়া ফেলে অথবা বিনষ্ট করে। প্রতিটি বানর দৈনিক গড়ে ২ আউন্স পরিমাণ খাদ্যশস্য গ্রহণ করে। এই হিসাবে তাহারা প্রতি বৎসর মোট ৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য অর্থাৎ বর্ত্তমান বরাদ্দ ব্যবস্থা অনুযায়ী এলাহাবাদ, কানপুর, ও দিল্লীর অধিবাসীদের সম্বৎসরের খোরাকের সম-পরিমাণ খাদ্যশস্যের অপচয় করে। এদিক হইতে দেখিতে গেলে বানরদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনকালে কোনও নীতিবোধ, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও জীবে দয়ার প্রশ্ন খাটে না। —গণরাজ

* * *

গত ২১শে ও ২২শে জুলাই ইতালীর মিলান সহরে ইতালীয় থিওসফিক্যাল সোসাইটির বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ ভারতীয় দার্শনিক শ্রীঅশোককুমার দত্ত যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহাতে সমস্ত ইউরোপের দার্শনিক মহলে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইতালীর দৈনিকপত্রিকাসমূহ শ্রীযুক্ত দত্তকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের পর আবার এই তরুণ দার্শনিকের নিকট হইতে বিশ্ববাসী শাশ্বত ভারতের বাণী শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। —বিশ্ববার্ত্তা

* * *

নদীয়াবাসীকে আজ স্মরণ রাখিতে হইবে যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত-রাষ্ট্রকে শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইলে নদীয়া সীমান্তের সর্ব্বপ্রকার দেশদ্রোহিতামূলক কার্য্যকলাপ পর্য্যুদস্ত করা চাই। নদীয়া সীমান্তের বিপদ সীমান্তের অপর পার হইতে আসিতে পারে ইহা যাঁহারা মনে করেন তাহারা ভ্রান্ত। নদীয়া সীমান্তের বিপদ নদীয়া জেলার সীমান্তেই বর্ত্তমান, উহা হইতেছে চোরাকারবার, পরস্বাপহরণ, আইন ও শৃঙ্খলা লঙ্ঘন এবং ভারত রাষ্ট্রের সহিত প্রতারণা। ভারত রাষ্ট্রের যাঁহারা প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ও নাগরিক তাঁহাদিগকে আজ অবস্থার প্রতিকারের জন্য ব্রতী হইতে হইবে। আজ নিঃসহায়ভাবে বসিয়া বসিয়া ঘটনার তরঙ্গমালা লক্ষ্য করিবার সময় নাই। সীমান্তবাসীর কঠোর চরিত্রকে আয়ত্ত করিয়া আজ সুবিধাবাদিদের চক্রান্ত ও সর্ব্বপ্রকার কলুষ হইতে সীমান্তকে বিমুক্ত করার সময় আসিয়াছে। আজ শাপমুক্তির যে আহ্বান আসিয়াছে তাহা মনুষ্যত্বের আহ্বান, গণতন্ত্রের আহ্বান, স্বাধীন রাষ্ট্রের আহ্বান, ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। —সীমান্ত

* * *

বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্নপত্র কঠিন করিতেছেন। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ছেলেরা নাকি বড়ই অমনোযোগী হইতেছে। অমনোযোগী হওয়া আশ্চর্য্য কিছু নহে, এতো সিনেমা, এতো তারকার উদয় হইলে ছেলে কেন, ছেলের বাপ পিতামহ চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত অমনোযোগী হইয়া পড়িবে। যাই হউক, ছেলেদের মস্তিষ্ক ক্ষীণ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। দুধ ঘির কথা দূরে থাকুক, দুইবেলা পেট ভরিয়া মাছ ভাত যে দেশের ছেলেরা খাইতে পায় না, তাহাদের এখনও যে কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে ইহাই আশ্চর্য্য। ছাত্রদের উপর দোষারোপ না করিয়া তাহাদের পুষ্টিকর আহার, স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ, উন্নততর চিন্তার ব্যবস্থা করিলেই আবার আশুতোষ হরিনাথের আবির্ভাব হইবে। —আর্য্য

* * *

সম্প্রতি চলচ্চিত্র-প্রদর্শকদের নিয়ে একটা বৈঠকী-সম্মেলন হ'য়ে গেলো। সেই সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে পশ্চিম বাংলার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছেন, চলচ্চিত্র শিক্ষা-বিস্তারের অন্যতম মাধ্যম। আজকের দিনে জনমত-স্রষ্টা সংবাদপত্রের চাইতেও চলচ্চিত্রের প্রভাব জনসাধারণের ওপর বেশী। সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব অমোঘ। সমাজের পুনর্গঠনে এর আবশ্যকতা রয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে সেন্সরের পক্ষপাতি আমি নই।

কিন্তু তিনি একটা কথা বলেন নি, কি ক'রে বাংলা-ছবিকে সর্বত্র চালু করা যায়। দেশ-বিভাগের ফলে আজ অনেক জায়গাতেই বাংলা ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়েছে। বাংলা ছবি তৈরী করার মূলে যেসব বাধা, সেইসব বাধা অতিক্রম ক'রে ছবির মালিক বাংলা ছবি তুলতে চাইবেন না। ফলে বাংলা ছবির এই ক্রম-বিলুপ্তি অনিবার্য।

আমরা আশা করেছিলাম, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেইসব সমস্যা সমাধানের উপায় ব'লে দিয়ে, বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্দেশ দেবেন! —সৈনিক

* * *

অবস্থার গতিকে আজ কৃষিশ্রমিক প্রকারান্তরে অভুক্ত থাকিয়া দিন কাটাইতেছে। শ্রম করিয়া তাহার যে শক্তি ক্ষয় হয় তাহা পূরণের যোগ্য পুষ্টিটুকুও সে পায় কি না সন্দেহ। দেশের সর্বত্র স্থানে স্থানে তাহাদের বর্তমান অবস্থা দাসত্বের সমান। জমিহীন কৃষিমজুর তাহার জমিদারের কাছে হয়ত পঞ্চাশ বা একশত টাকা কর্জ লইয়াছে। ফলে ঐ টাকা শোধ না দেওয়া পর্যন্ত সে জমিদারের কাছে বাঁধা পড়িয়া আছে অর্থাৎ এই ঋণের দায়ে তাহাকে দাসত্বের শৃঙ্খল

চিরজীবন বহিতে হইতে পারে। হয়ত দিনে একবারমাত্র তাহাকে ফেনভাত দেওয়া হইবে, আর দীপালির (৺পূজার) সময় তাহাকে কিছু দেওয়া হইবে। তাহার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের তাহার মনিব বা অপর মনিবের কাছে অনুরূপ ভাবে খাটিয়া ভাত কাপড় যোগাড় করিতে হইবে। যে খাদ্য তাহারা পায় তাহাতে পুষ্টি না থাকারই মত। তাই রোগে যুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের শরীরে থাকে না, আর তাহাদের ছেলেমেয়েরা কঙ্কালসার হইয়া বড় হয়। এমন কৃষি মজুরেরা খাটিয়া খুটিয়া সমগ্র জাতির জন্য যথেষ্ট খাদ্য উৎপন্ন করিতে পারিবে কি? এই সকল মজুরের অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা কেহ করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের ভয়, মজুরেরা তাহাদের মৌলিক প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হইলে সরকারের খাদ্য সংগ্রহের প্ল্যান ব্যাহত হইবে। সরকারের খাদ্যসংগ্রহের প্ল্যানটি তবে কি উৎপাদককে বঞ্চিত করিয়া স্বচ্ছল ব্যক্তিদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা মাত্র? এইরূপ কর্মক্রম অদূরদর্শিতা-দোষদুষ্ট। ইহাতে শেষাবধি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইবে না।

—হরিজন পত্রিকা

* * *

গত ১৯৪৭-৪৮, ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ সনে ভারতে যথাক্রমে মোট ৪৯ হাজার ৯৭৩ একর, ৬৪ হাজার ৫৪০ একর ও ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৯ একর পতিত জমিতে চাষাবাদ করা হইয়াছে। উহা ছাড়া ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে যথাক্রমে আরও ৩৫ হাজার ৬৯৫ একর, ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৬৫ একর এবং ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৩০ একর পতিত জমি চাষ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংস্থা কর্তৃক যে ৩৪ হাজার একর জমিতে চাষাবাদ করা হইয়াছে তাহা উক্ত হিসাবে ধরা হয় নাই। ঐ সকল জমিতে আলোচ্য বৎসরে প্রায় ১২ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ সনে ভারতের সকল রাজ্যেই অধিক পরিমাণ পতিত জমিতে চাষাবাদ হইয়াছে। উহাদের মধ্যে আবার উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, বিহার, হায়দারাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনেই সর্ব্বাধিক পরিমাণ পতিত জমিতে চাষাবাদের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, আইনের সাহায্যে আরও ৩ লক্ষ ১২ হাজার একর পতিত জমিতে কৃষিকার্য্য সুরু হইয়াছে। —পদাতিক

* * *

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মাত্র ৬ মাস পূর্ব্বে উক্ত প্রদেশের রাজপথসমূহে পরিচালিত বাস সার্ভিসের পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই এই কাজে উহারা ৪ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছেন। উহার ফলে বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত বাসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১৯১ এবং বর্ত্তমানে এইসব বাসে প্রত্যহ ১ লক্ষ ৫৬ হাজার করিয়া যাত্রী চলাচল করিতেছে। বর্ত্তমানে প্রদেশের মোটমাট ১২৮৪৭ মাইল রাস্তায় সরকারী বাসসমূহ চলাচল করিতেছে। এই কাজে তদারক করিবার জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বোম্বে ষ্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন নামক যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন তাঁহারা শীঘ্রই রাস্তাঘাটের সংস্কারের জন্য এক কোটি টাকা ব্যয় করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেণ্টও এই প্রদেশে বাস পরিচালনার কাজে হাত দিয়াছেন এবং উহারা বোম্বাইয়ের অনেক পূর্ব্বে এই কাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু মাত্র ৬ মাসে বোম্বাইয়ে এই কাজ যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য নগণ্য। . .

—আর্থিক জগৎ

* * *

আমরা ২৪ পরগণার শিক্ষকগণের একটি প্রধান অসুবিধার কথা শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া ইহার প্রতিকারের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। ২৪ পরগণার জেলা পরিদর্শক মহাশয়ের অফিস আলীপুরে বোর্ডের অফিস হইতে বহুদূরে অবস্থিত—তাঁহাকে অধিকাংশ সময়ে ঐ অফিসেই থাকিতে হয়। ফলে, প্রাথমিক শিক্ষকগণ নানাপ্রকার অভাব অভিযোগের কথা জানাইতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান। দরিদ্র শিক্ষকগণ বহুদূর হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া এবং অনেক আশা লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখা না পাইলে বড়ই হতাশ হন। পরিদর্শক মহাশয়ের অফিসটি আলীপুরেই কোন স্থানে অবস্থিত হইলে শিক্ষকমহাশয়গণেরও এ অসুবিধা হয় না, পরিদর্শক মহাশয়ও অনর্থক দুই অফিসে ছুটাছুটি করার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া কাজে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে পারেন। এণ্ডারসন হাউসে স্থান সংকুলান না হইলে আলীপুরের অন্যত্র বাড়ীভাড়া লইয়া অফিসটি অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা একান্ত প্রয়োজন।

—শিক্ষক

* * *

বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রকর্ত্তাগণ বৃক্ষরোপণের জন্য একটা অনুষ্ঠান করিলেন। ভারতের সভ্যতা—তপোবন-নিষ্ঠ। বেদ ও উপনিষদের নাম—আরণ্যক। ব্রহ্মের কথা বলিতে গিয়া প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ বলিয়াছেন—এষ অশ্বত্থ সনাতনঃ। আরও বলিয়াছেন—ইনি বৃক্ষের মত স্তব্ধ হইয়া আকাশে অবস্থান করিতেছেন—বৃক্ষ ইব দিবি তিষ্ঠত্যেক। পঞ্চবটী রচনা করা এই দেশের ধর্ম্ম। অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করা—এদেশের পুণ্য কর্ম্ম। তুলসী বৃক্ষ যে স্থানে থাকেনা, তাহা শ্মশান তুল্য। চৈত্য-বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করা নিত্য কর্ত্তব্য, অতএব উঠানে আঙিনায় বিল্ব, নারিকেল, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করা প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য ছিল। জল শীতল হইবে বলিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে তালগাছ রোপিত হইত। ইংরেজ আসিল। তাহাদের সভ্যতাও আসিল। তুলসী উপড়াইয়া দিলাম, বিল্ব বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলাম, অশ্বত্থকে পুড়াইয়া, এমন কি মল্লিকা যুঁই, টগর শেফালি চম্পক নির্ম্মূল করিয়া য়ুরোপের লিলি, অর্কিড ক্রিসেনথিমাম্, সিজিনফ্লাওয়ার দিয়া উঠান, অলিন্দ, বাগান সাজাইলাম। আজ আবার বনস্পতির প্রতি আকর্ষণ আসিয়াছে। কিন্তু গাছ হইতে অরণ্য হয়। অরণ্যে থাকে হিংস্র শ্বাপদ। বন রচনায় সহিত আরণ্যক জীবনকে অঙ্গীকার না করিলে সমাজ সংসার অরণ্য সদৃশ হইয়া

উঠিবে। তাই বলিতেছি :—বৃক্ষ রোপণের সহিত বেদ মন্ত্র পাঠ কর—যা বনস্পতিষু তস্মৈ দেবীর নমো নমঃ। —'শ্রী'

* * *

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুজাতি আত্মসংস্কৃতি-রক্ষায় অসমর্থ, ইহার কারণ—হিন্দু সংস্কৃতি হিন্দু-জাতির প্রাণের সহিত আর সংযুক্ত নহে। হিন্দু-সংস্কৃতি-রক্ষায় প্রাণ অমূল্যত বলিয়াই আমরা আতঙ্কিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অপসৃত হইতেছি। ইহাই আমাদের অবস্থা। যে কারণে জগতের অন্যান্য ইসলাম রাজ্য হইতে হিন্দুজাতির চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই একই কারণে ভারতের পশ্চিম পাকিস্তান হইতে হিন্দু নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানেও তাহার অন্যথা হইবে না। জাতি-বিদ্বেষ বশতঃ এই কথা আমরা বলিতেছি না, কেন না পূর্ব্বপাকিস্তানে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের দুই প্রধান কেন্দ্র সংস্থাপিত। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কোথাও প্রাণভয়ে কেন্দ্র ত্যাগ করে নাই। যখন ভারতের রাষ্ট্রপুরুষেরা ইসলাম সংস্কৃতির স্থান পশ্চিম ও পূর্ব্বপাকিস্থান নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, তখন ইসলাম ধর্ম্মই এই দুই স্থানে প্রবল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, ইহা অতিশয় ন্যায়সঙ্গত কথা। হিন্দু জাতি আত্মসংস্কৃতি লইয়া এই স্থানে থাকিতে চাহিলে, ইসলাম-রাজ্যে প্রজার অধিকারটুকু লইয়াই তাহাকে আত্মসংস্কৃতি রক্ষা করিতে হইবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে স্থানত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাই হইতেছে। নিরাপদ জীবনযাত্রার জন্যই পাকিস্তান হিন্দুশূন্য হইতে বাধ্য। তারপর হিন্দু-সংস্কৃতি-রক্ষার ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্র ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ। শুধু হিন্দু-সংস্কৃতি রক্ষার সুযোগই যে এখানে পাওয়া যাইবে, তাহাই নহে। পরন্তু ইসলাম-ধর্ম্মীদের শিক্ষা সভ্যতা ও কৃষ্টিরক্ষার সুযোগ ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রে থাকিবে। হিন্দু, ভারত ধর্ম্মহীন যদি হয়, ভারত ইসলামের ক্ষেত্র হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে মুসলমানদের দলে দলে ভারতে প্রত্যাগমন এই সঙ্কেতই প্রদান করে। পাকিস্তান ইসলামের। ভারত সর্ব্বধর্ম্মীর। অতএব যে ধর্ম্ম প্রবল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, সেই ধর্ম্মের আধিপত্য এই ক্ষেত্রে অসম্ভব হইবে না।

—নব সংঘ

* * *

"বনস্পতিতে হাজারে একভাগ রেড-অক্সাইড মিশ্রিত করিলে উহা আর ঘৃতে ভেজাল দেওয়া চলিবে না। এই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বনস্পতিতে ভেজালের কথা আমিও শুনিয়াছি। সস্তা প্যারাফিন তৈল উহাতে ভেজাল দেওয়া সম্ভব। নারিকেল তৈলে এবং অপর তৈলের সহিত ইহা ভেজাল দেওয়া হয়। উচ্চ বা নিম্নতাপে গলিবে এরূপ বনস্পতি ইচ্ছামত তৈয়ারী করা যায়। উচ্চ তাপে গলে এইরূপ বনস্পতি তৈয়ারী করিয়া উহা গলাইয়া উহাতে হোয়াইট অয়েল ভেজাল দেওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য। বনস্পতিতে রাসায়নিক গন্ধ দিয়া উহাকে সুগন্ধ করায় আপনি আপত্তি করিয়া ঠিক করিয়াছেন। উহার ফলে ঘৃত উৎপাদন বিনষ্ট হইবে। "বনস্পতির পক্ষে জোর প্রচার চলিতেছে। 'ঘৃতের চেয়ে বনস্পতি সস্তা, তাই উহার রদ করা ঠিক নয়'—এইরূপ মন্তব্যলিখিত কাগজে এজেণ্টরা লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছে। একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, বনস্পতি রদ হইলে ঘিয়ের দাম তিনগুণ হইয়া যাইবে। এইরূপ মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার খাদ্য-মন্ত্রীর দপ্তর কেমন করিয়া সহ্য করেন বুঝি না। —হরিজন পত্রিকা

* * *

কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসন ভার আসিবার পর অনেকেই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে পুলিশের কর্ম্ম-ক্ষমতা ও মর‍্যাল অনেক খারাপ হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ লইয়া অনেকেই অনেক প্রকার গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা পুলিশ জর্ণাল এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কম খাইয়া ও খারাপ খাইয়া পুলিশের স্বাস্থ্য ও মর‍্যাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুলিশের রেশনের "চাউল ও আটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর" না হয় হইতে পারে, কিন্তু "ঘী এবং তেল স্বভাবতঃই ভেজাল" হয় কিরূপে? বাঘের ঘরে যদি ঘোগের বাসা হয় তাহা হইলে সাধারণের অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া আর কি হইবে?

—যুগবাণী

* * *

জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারত সরকার বিদেশে ১৫॥ কোটী গজ মোটা ও মাঝারি ধরণের কাপড় রপ্তানী করিতে দিবেন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার যুক্তিযুক্ততা বুঝা যাইতেছে না। ভারতের কলসমূহে গত ১৯৪৮ সালে ৪৬২ কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৩৯০ কোটী ৪২ লক্ষ গজে পরিণত হয়। চলতি বৎসরের এপ্রিল পর্য্যন্ত ৪ মাসে কলগুলিতে ১২০ কোটী গজের কিছু বেশী কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। এই হিসাবে কাপড় উৎপন্ন হইলে চলতি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত দেশে ৩৬০ গজের বেশী কাপড় উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয় না। উহার মধ্যে মিহি ও অতি-মিহি ধরণের কাপড়ের পরিমাণ হইবে ১৬০ কোটী গজ এবং উহা সাধারণতঃ সহরসমূহের চাহিদা মিটাইতেই নিয়োজিত হইবে বলিয়া পল্লী অঞ্চলে এই ধরণের কাপড় হইতে কিছুই সরবরাহ হইবে না। বাকী ২০০ কোটী গজ কাপড় মোটা ও মাঝারি ধরণের। উহা হইতে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই ১০০ কোটী গজের মত কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইতে দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুনরায় উহারা আরও ১২॥ কোটী গজ কাপড় রপ্তানীর অনুমতি দিলেন। উহার ফলে ভারতে জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী কাপড়ের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের একটা চোরাবাজার নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য মিলস্থিত কাপড় আটক করিয়া এবং কাপড় বিক্রয়ের বিবিধ বিধিনিষেধবলে এই সমস্যার একটা প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কাপড় সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত সমস্ত প্রকার কর্ম্মপন্থা ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানেও যে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইবে তাহার ভরসা কম। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নূতন করিয়া বিদেশে মোটা ও মাঝারি

ধরণের কাপড় রপ্তানী করিতে দেওয়া সমীচীন হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি।

—আর্থিক জগৎ

* * *

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, অনাহার, অনশন প্রভৃতি ছাড়াও প্রতি বছর (অখণ্ড) ভারতবর্ষে অসুখে ভুগিয়া মারা যায় প্রায় ৭২ লক্ষ লোক। তার মধ্যে জ্বরে ভুগিয়া মরে ৩৬ লক্ষ, যক্ষ্মায় ৫ লক্ষ, পেটের অসুখে ৩ লক্ষ, বসন্ত রোগে ৭৫ হাজার, কলেরায় ৫০ হাজার, প্লেগে ২০ হাজার। এ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর হার প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ। ভারতের অধিবাসীর প্রায় শতকরা ৯০ জন থাকে গ্রামাঞ্চলে, অথচ সেইখানেই চিকিৎসার দারুণ অব্যবস্থা। শতকরা ১০ জন ডাক্তার মাত্র থাকে গ্রামে। এই ভয়াবহ মৃত্যু-সংখ্যার প্রতি গবর্ণমেণ্টের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।—প্রবর্তক

* * *

গত ৩রা আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল সাধারণ্যে বাহির হইয়াছে। ৭৮৩৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এই বৎসর পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে ১২৯৩৮ জন মাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৪·৩ জন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্যর আশুতোষের যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও গত বৎসরও এই পরীক্ষায় শতকরা ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ৫০ জনের স্থানে হঠাৎ একেবারে ১৪ জন হওয়ায় শুধু ছাত্রসমাজ নহে—শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, স্কুল ও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ—এমন কি বিদ্যোৎসাহী সাধারণ লোকের মধ্যেও একটা বিষম চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই চাঞ্চল্যের পরিণতি দেশের শিক্ষা বিস্তারের পরিপন্থী—কি সহায়ক হইবে তাহা এখনই বলা যতই শক্ত হউক না কেন, ইহাতে যে একটা ভীষণ মন-ভাঙ্গা নৈরাশ্যের ভাব এক সম্প্রদায় লোকের (এবং তাহাদিগের সংখ্যাই খুব বেশী) আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, উদ্যম একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে তাহা একেবারে ধ্রুব সত্য এবং ইহার প্রতিক্রিয়াও যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র দেশ ও সমাজের উপরে পরিব্যাপ্ত হইবে সে বিষয়ও কোন সন্দেহ নাই।

—বিশ্ববার্ত্তা

মুর্শিদাবাদের খাদ্যপরিস্থিতি

শ্রীশোভেন্দ্রমোহন সেন

গত ৫ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান সহর বহরমপুরে প্রায় পাঁচ হাজার বুভুক্ষু নর-নারীর এক ভুখা মিছিলের সমাবেশ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কুটীর সম্মুখে সমবেত হয় ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট খাদ্যের দাবী জানাইতে গিয়া কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠির দ্বারা পুলিশ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হয়। বহরমপুরে বুভুক্ষু নর-নারীর প্রতি পুলিশের এই দুর্ব্যবহার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে এবং কলিকাতায় ইহার প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সহিত দেশের লোকে অবগত হইয়াছে যে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় ভীষণ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় খাদ্যসঙ্কট কেন দেখা দিয়াছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথম বলিতে হয় যে, জেলায় খাদ্যশস্য বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভুল তথ্য বা পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছেন বলিয়াই এই সঙ্কট দেখা দিয়াছে। রাজ্য সরকার প্রথমেই এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলা খাদ্যশস্য বিষয়ে উদ্বৃত্ত অঞ্চল। পশ্চিম বঙ্গের পরিষদ সদস্য ও মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য বহরমপুর হইতে প্রকাশিত জেলা কংগ্রেস কমিটীর মুখপত্র সাপ্তাহিক 'গণরাজ' পত্রিকায় মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া যে বিবৃতি গত ১৫ই শ্রাবণ তারিখের পত্রিকায় দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ত্তমান খাদ্য-পরিস্থিতি ও খাদ্য সঙ্কটের বিষয়ে সকল ঘটনা জানিতে পারা যাইবে। তিনি বলিতেছেন—"বঙ্গ বিভাগের পর হইতেই খাদ্য বিভাগের অধস্তন কর্মচারীদের রিপোর্ট অনুযায়ী উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষ একটি ভ্রমাত্মক ধারণা করিলেন যে মুর্শিদাবাদ জেলা বাড়তি অঞ্চল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিলেন যে অন্ততঃ ৩।৪ লক্ষ মণ ধান ও চাল অনায়াসেই মুর্শিদাবাদ হইতে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য। তাঁহারা সব সময়েই এই কথাটা প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই সামান্য কথাটা তলাইয়া দেখেন না যে মুর্শিদাবাদ জেলার ৪টি মহকুমার মধ্যে ৩টি মহকুমাই ঘাটতি অঞ্চল। একমাত্র কান্দী মহকুমাতেই খাদ্য চাউল উদ্বৃত্ত থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় অর্দ্ধাংশ, যাহা বাড়তি অঞ্চল বলিয়া খ্যাত তাহাতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে রবিশস্য, পাট, নানা প্রকার শাক-সব্জী এবং সামান্য পরিমাণ ভাদুই ধান্য হয়। যে পরিমাণ ভাদুই বা আউষ ধান্য উৎপন্ন হয় তাহা তাহাদের প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, মাত্র তিন মাসের খোরাক জোগায়, বাকী নয় মাস তাহারা রাঢ় অঞ্চলের ধান চাউলের উপর নির্ভর করে। ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে মুর্শিদাবাদের লোক সংখ্যা ১৬,৪০,৫৩০ জন, তন্মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলের লোক সংখ্যা ৮,২৭,৭৯১ হইবে। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে জঙ্গীপুর মহকুমার সাগরদিঘী থানা এবং লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম থানা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত থানাই ঘাটতি অঞ্চল অর্থাৎ আবশ্যক মত ধান বা চাউল জন্মে না। সদর মহকুমার প্রায় সমস্ত অংশই ঘাটতি। যদিও এই অঞ্চলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয় না, তথাপি রবিশস্য পাট ও অন্যান্য ফসলে তাহারা যে আয় করে তাহা উপরোক্ত বাড়তি অঞ্চলের তুলনায় অধিক। স্বাভাবিক অবস্থায় পূর্ব-অঞ্চল পশ্চিম অংশের উপর তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জন্য নির্ভরশীল এবং পশ্চিম

অংশ তাহার উৎপন্ন ধান্য চাউলের বিনিময়ে পূর্বাংশ হইতে আবশ্যকীয় ডাল, তরীতরকারী প্রভৃতি পাইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের অর্থনৈতিক কাঠামো এইভাবে বঙ্গ বিভাগের পূর্ব পর্য্যন্ত ছিল, অধিকন্তু কয়েকটি সীমান্তবর্ত্তী থানা, যথা সমসেরগঞ্জ, সুতী, লালগোলা, ভগবানগোলা, জলঙ্গী প্রভৃতি রাজসাহী জেলার বরিন্দা অঞ্চল এবং বীরভূম জেলার নলহাটী, মুরারই প্রভৃতি থানার নিকট হইতে ধান ও চাউল ক্রয় করিত। কিন্তু বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর এবং বর্ত্তমান কনট্রোলপ্রথা চালু থাকায় উক্ত অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে এবং সঙ্কট দেখা দিয়াছে। খাদ্যশস্য অভাবের প্রধান কারণ, এই সমস্ত অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য আনয়ন বন্ধ এবং ঘাটতি অঞ্চলকে বাড়তি অঞ্চল বলিয়া প্রচার করিয়া তাহা হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়া জেলার বাহিরে পাঠান। মুর্শিদাবাদ জেলার মোট জমির পরিমাণ ১৩০৭০০০ একর এবং এক্ষণে ৯৪৬৮০২ একর আবাদী বা আবাদযোগ্য। ইহার মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৩০৯০০০ দোফসলি এবং ১২৬০০০ একর আবাদযোগ্য পতিত বলা যাইতে পারে। আমন ধান্য মোট ৪১৯৯৪৯ একর জমিতে হয় এবং আউস ২০৫০০০ একর। Floud Commission এর মতে একর প্রতি গড়পড়তা আমন ১৭ মণ এবং আউস ১৫ মণ হইয়া থাকে। এইরূপে ভাগি ধান সমেত মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৮৮৭০০০ মণ ধান্য উৎপন্ন হয়। ১৯৪১ সালের আদমসুমারীর গণনা ধরিলে লোকসংখ্যা ১৬৪০০০০, বর্ত্তমানে প্রাকৃতিক নিয়মে বৃদ্ধি হইয়া আরও ১৬০০০০ হইবে। বঙ্গ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু কম বেশী প্রায় ৫০০০০ লোক আসিয়াছে এবং গত ফেব্রুয়ারির হাঙ্গামার পর হইতে আরও ৫০০০০ লোক আসিয়াছে। এই সমস্ত কারণে ১৯ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান এই জেলা হইতে করা সম্ভব কিনা প্রথমতঃ তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে, পরে উদ্বৃত্তের কথা। সরকার তরফ হইতে এমন প্রচার করা হয় যে গড়পড়তা ৭/০ মণ ধান বৎসরে একজন লোকের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু Floud Commission এর report এ অনেক গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে প্রত্যেক ব্যক্তির বৎসরে ৯/০ মণ ধানের কম চলে না। এক্ষণে ১৯০০০০ লক্ষ লোকের জন্য ৯/০ মণ হিসাবে ধরিলে ১৭১০০০০ মণ ধান্যের প্রয়োজন। যদি আমরা ৭/০ মণ হিসাবেও ধরি তাহা হইলেও ১৩৬০০০০ মণ ধান্যের প্রয়োজন। উপরোক্ত হিসাব হইতেই দেখা যাইবে যে আমাদের এখনও ৫২১৩০০ অথবা ৪৭১৩০০ মণ ধান কমপক্ষে প্রয়োজন এবং উহা বাহির হইতে আনা প্রয়োজন।" শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই মুর্শিদাবাদের খাদ্যপরিস্থিতির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাইবে। আমি ইচ্ছা করিয়াই এই বিবৃতি উদ্ধৃত করিলাম এই কারণে—যে সরকার এই বিবৃতিতে উল্লিখিত বিষয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহা কোনো রাজনৈতিক নেতার প্রোপাগ্যাণ্ডা নহে—ইহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কংগ্রেসী দলের একজন প্রভাবশালী পরিষদ-সদস্যের সুচিন্তিত অভিমত। ইহা ছাড়াও উত্তর বঙ্গে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিয়া গেল তাহার জন্য দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটি অনিশ্চিততার ভাব দেখা দিয়াছিল তাহারই ফলে মুর্শিদাবাদের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাসমূহে চাষের কার্য্য এবারে আদৌ হয় নাই বলা যায়। তদুপরি ভারত সরকারের উৎসাহে জেলায় এবারে পাটের চাষ বেশি হইয়াছে। এই সকল কারণ ছাড়াও জেলার বহুস্থানে অতিরিক্ত বর্ষার ফলে বহু জমি ফসল সমেত জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। ফলে জেলার স্বাভাবিক অবস্থায় যে পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয় তাহা হইতে পায় নাই।

অথচ জেলায় খাদ্যসংগ্রহ অভিযান (Procurement drive) পুরাদমেই চলিয়াছে। খাদ্যসংগ্রহ ব্যাপারে জেলার অধিবাসীরা সরকারের সহিত প্রথম হইতেই একমত নহেন। সরকার হইতে বলা হয় যে খাদ্যসংগ্রহ করা হয় এই কারণে যে জেলার প্রয়োজনের সময় সংগৃহীত ধান্য বা চাউল বাজারে ছাড়া হইবে। কিন্তু এবারে দেখা গেল যে জেলায় যখন খাদ্যাভাব চরমে উঠিয়াছে, চাউলের দর যখন স্থানে স্থানে ৫০৲।৬০৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তখন সরকারের গুদামে আদৌ ধান্য বা চাউল নাই। ভুল পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া সরকার যে খাদ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন বর্ত্তমানের খাদ্যশঙ্কট তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল।

বিগত দুই মাসকাল হইতে মুর্শিদাবাদের খাদ্য পরিস্থিতি এক ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। অধিকাংশ লোকেই চাউলের বর্ত্তমান বাজার দরে চাউল ক্রয় করিতে পারিতেছে না। কিছুদিন হইতে রেশনের মাধ্যমে কিছু চাউল লোকে পাইতেছিল, কিন্তু তাহার পরিমাণও প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। সম্প্রতি রাজ্য-সরকারের খাদ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে মুর্শিদাবাদে বর্ত্তমানে ১৮৭০০০ লোক আংশিক রেশনভুক্ত হইয়াছে। ১৯ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ১৮৭০০০ লোকের রেশন লাভ খুবই অকিঞ্চিৎকর। জেলার সর্বত্রই আজ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেখা যাইতেছে। অনাহারজনিত মৃত্যুর সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। সরকার অবশ্য এই সকল মৃত্যু স্বীকার করিবেন না।

বর্ত্তমানে বহরমপুরের বাজারে চাউল যাহা বিক্রয় হইতেছে তাহার দর ৪০৲ টাকার উপরে। সদর মহকুমার অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলে চাউলের দর আরও বেশি। অধিকাংশ লোকই চাউল ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া ছোলা, মটর ইত্যাদি অথবা শাকসব্জী খাইয়া জীবনীশক্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। গত ৫ই আগষ্ট বহরমপুর সহরে যে ভুখা মিছিল বাহির হইয়াছিল তাহা স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবেই হইয়াছিল। দীর্ঘদিন ধরিয়া অর্দ্ধাহারে থাকিয়া জনচিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র জেলার নরনারী খাদ্যাভাবের জন্য যে অবর্ণনীয় দুর্দশাভোগ করিতেছে ও তাহার জন্য যে বেদনা তাহাদের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে—৫ই আগষ্ট তারিখের ভুখা মিছিল তাহারই প্রকাশ মাত্র। ইহাকে রাজনৈতিক প্রোপাগ্যাণ্ডা বলিয়া ইহার গুরুত্ব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিলে মূল খাদ্যসমস্যার সমাধান তাহাতে আদৌ হইবে না।

ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ করিতেছে। ইহার আশু প্রতিবিধানের ব্যবস্থা প্রয়োজন। রাজ্য সরকার প্রেসনোট বাহির করিয়া যাহা প্রচার করেন তাহাতে জান

যায় যে তাঁহারা মুর্শিদাবাদের খাদ্যাভাব সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হইয়াছেন। রাজ্যের অপরাপর স্থান হইতে ধান্য, চাউল, গম ও আটা মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিয়া খাদ্যাভাব মিটাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইহাতে অবশ্য অভাব কিয়ৎ পরিমাণে মিটিবে। ইহা ছাড়া সরকার হইতে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। জনসাধারণ মনে করে যে মুর্শিদাবাদে হঠাৎ যে চাউলের অভাব দেখা দিল তাহার পশ্চাতে চাউল ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট হাত রহিয়াছে। সরকার হইতে যদি তাহাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে আমরা মনে করি এখনও বেশ কিছু পরিমাণ চাউল জেলার বড় বড় চাউল-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া, জেলার অনেক বড় বড় জমিদার বা জোতদার আছেন যাঁহাদের মজুত ধান্য ও চাউল যে কোনো কারণেই হউক, সরকারী খাদ্য সংগ্রহ বিভাগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের নিকট হইতে যে চাউল ও ধান্য পাওয়া যাইবে তাহাও পরিমাণে কম হইবে না। ইহা হইল স্বল্প-মেয়াদী ব্যবস্থা। মুর্শিদাবাদের খাদ্য সমস্যার সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হইল একমাত্র এই যে, এই জেলাকে ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া সরকারকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে ও ভবিষ্যতে তদনুযায়ী নীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। জেলায় যে ধান্য বা চাউল সংগৃহীত হইবে, তাহা যেন কোনো কারণেই জেলার বাহিরে চালান না যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবাদযোগ্য যে সকল জমি পতিত রহিয়াছে তাহাতে চাষের ব্যবস্থাও অবিলম্বে করিতে হইবে। ইহা যদি কার্য্যকরী হয়, তাহা হইলে মুর্শিদাবাদের খাদ্য পরিস্থিতি স্থায়ীভাবে উন্নতির পথে যাইবে নতুবা চিরকাল এই ভাবে দুর্ভিক্ষের আবহাওয়া বিরাজ করিবে এবং জেলার নর-নারীবৃন্দকে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইয়া অপরের করুণার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

তীর্থ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

তীর্থ জাতির ধর্ম্মকেন্দ্র—
প্রাণকেন্দ্রই বটে,
সেই এনে দেয় সুধার উৎস
অধর সন্নিকটে।
দেহে মনে দেয় শক্তি অলৌকিক,
করে তেজোময় নিষ্পাপ নির্ভীক,
ধূলি রত্ন হয়, একই জন্মে
নূতন জন্ম ঘটে।

২

করে সে অসাড় লুপ্ত স্বপ্নে
বিদ্যুৎ সঞ্চার,
দেয় লাঞ্ছিত সর্ব্বহারারে
অমৃতের অধিকার।
তীর্থ করায় স্বর্গের সাথে যোগ,
এক পংক্তিতে করুণামৃত ভোগ,
জুড়ায় অঙ্গ আনি তরঙ্গ
হতে প্রেম পারাবার।

৩

দুষ্ট অরাতি প্রথমেই করে,
তীর্থ কলঙ্কিত,
সবল সরল জাতিরে করিতে
ভীত ও জীবন্মৃত।
রোধিতে জীবনী শক্তি প্রস্রবণ,
হরণ করিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন,
তীর্থ হারালে জানে জাতি হবে
সত্য সর্ব্বহৃত।

৪

রাষ্ট্রের কাজ সর্ব্বপ্রথমে
তীর্থ রক্ষা করা।
দেশ রক্ষার প্রথম সোপান
নষ্ট-তীর্থ গড়া।
সেনা, রণতরী, বিমান, অস্ত্রাগার,
সব চেয়ে জয়ে বেশী প্রয়োজন তার,
সেই কোষাগার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—
পরমার্থেতে ভরা।

৫

তীর্থ জাতির পরমাশ্রয়
মহালক্ষ্মীর দান,
সকল প্রেরণা, সকল সাধনা,
সব সিদ্ধির স্থান।
তেজের খনি, সে স্পর্শমণির ভূমি,
সতী অঙ্গেতে গঠিত তা জানো তুমি,
সকল পতন দুর্গতি হতে—
সে করে পরিত্রাণ।

৬

মন্বন্তরে দুখে বিপ্লবে
জেনো জাতি জীয়ে রবে,
তীর্থ ধ্বংসে শক্তিহারা সে
নিতি অধোগতি লভে।
হারায় মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা
ইতিহাস হতে মুছে যায় তার কথা
অপাংক্তেয় সে জীবন এবং
জগতের উৎসবে।

কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বন্ধনহীন গ্রন্থি

উত্তরাস্থ নগরদ্বার অতিক্রম করিয়া রট্টা দলবলসহ বাহিরে আসিলেন। এখান হইতে রাজপথ মৃগয়া-কানন বেষ্টন করিয়া ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দে আঁকিয়া বাঁকিয়া, কখনও উচ্চে উঠিয়া কখনও নিম্নে নামিয়া যেন নিরুদ্দেশের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। প্রভাতের নবীন সূর্যালোকে এই দৃশ্য চিত্রাঙ্কিতবৎ মনোরম দেখাইতেছে।

এই নৈসর্গিক দৃশ্যের উপর ক্ষণেক দৃষ্টি বুলাইয়া রট্টা অশ্ব স্থগিত করিলেন; সেনানীকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন —নকুল, তুমি রক্ষীদের লইয়া আগে যাও; আমরা মন্থর গমনে তোমাদের পশ্চাতে যাইব।'

নকুল ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—'কিন্তু—' রট্টা বলিলেন—'সঙ্গে আর্য চিত্রকবর্মা থাকিবেন, আমার অন্য রক্ষীর প্রয়োজন নাই। তোমরা যাও, দ্রুত অশ্ব চালাইলে দ্বিপ্রহরের মধ্যে পান্থশালায় পৌছিতে পারিবে। সেখানে মধ্যাহ্ণ-ভোজন করিয়া চণ্টনদুর্গের পথে যাত্রা করিও।'

এখানে নকুল আবার বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রট্টা বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া চলিলেন—'রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে চণ্টনদুর্গে পৌছিবে। মহারাজকে বলিও আমি কাল আসিব। মহারাজ অসুস্থ, আমি আসিতেছি জানিলে সুখী হইবেন।'

ইহার পরও নকুল আপত্তি করিতে যাইতেছিল কিন্তু রট্টা তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন মধুর হাস্য করিলেন যে নকুলের জ্ঞান বুদ্ধি স্তম্ভিত হইল। সে সম্মোহিতের ন্যায় 'দেবদুহিতার যেরূপ আজ্ঞা, বলিয়া সঙ্গিদের লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া দিল। মন্ত্রী চতুর ভট্টের আদেশ যদি বা উপেক্ষা করা যায়, রাজনন্দিনীর সহাস্য নির্বন্ধের প্রতিবাদ অসম্ভব।

রক্ষীর দল ও তাহাদের অশ্বক্ষুরধ্বনি ক্রমশ দূর হইতে আরও দূরে মিলাইয়া গেল। রট্টাও আয়াসহীন মন্দগতিতে অশ্ব চালনা করিলেন। চিত্রক তাঁহার পাশে রহিল।

রট্টার মুখ উৎফুল্ল, চক্ষু চঞ্চল। তিনি কখনও উজ্জ্বল নিষ্কলুষ আকাশের পানে চক্ষু উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন, কখনও মৃগয়া-কাননের অভ্যন্তরে কৌতূহলী দৃষ্টি প্রেরণ করিতে-ছেন; অশ্বের কণ্ঠ-কিঙ্কিণী পদক্ষেপের তালে তালে শিঞ্জন-ধ্বনি করিয়া তাঁহার কর্ণে অমৃত-বৃষ্টি করিতেছে।

চিত্রকের মুখ কিন্তু গম্ভীর, ভ্রূ কুঞ্চিত। সে তাহার অশ্বের নিভৃতোর্ধ্ব কর্ণের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ভাবিতেছে, নিয়তি বারবার তাহাকে প্রতি-হিংসার সুযোগ দিতেছে। অদৃষ্টের এ কোন্ ইঙ্গিত? প্রতিশোধের সুযোগ হাতে পাইয়া সে ছাড়িয়া দিবে? হিংসার উত্তরে প্রতিহিংসা লওয়া ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। তবে কেন সে লইবে না?

চারিদিক নির্জন; কোথাও জনমানব নাই। কদাচিৎ দুই একটা শশক পথপার্শ্ব হইতে সন্তর্পণে উঠিয়া আসিতেছে, আবার অশ্ব ক্ষুর শব্দে ভীত হইয়া প্লুত গতিতে পলায়ন করিতেছে। পথের উপর দীর্ঘ প্রলম্বিত তরুছায়া ক্রমে হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে।

দুইটি অশ্ব পাশাপাশি চলিয়াছে। সুগোপার জলসত্র পিছনে পড়িয়া রহিল। সুগোপা আজ আসে নাই। প্রপা শূন্য।

রট্টা এতক্ষণ চিত্রকের পানে পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেন নাই; মনের মধ্যে ঈষৎ সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিলেন। চিত্রক নিজেই বাক্যালাপ আরম্ভ করিবে। কিন্তু চিত্রক যখন কথা কহিল না তখন তিনি সযত্নে মনকে সম্বত করিয়া চিত্রকের পানে স্মিতমুখ ফিরাইলেন। বলিলেন—'আর্য চিত্রক, আপনি নীরব কেন? সুন্দরী প্রকৃতির এই নবীন শোভা কি আপনাকে আনন্দ দিতে পারিতেছে না?'

চিত্রক রট্টার পানে চক্ষু ফিরাইল। ক্ষণেকের জন্য তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। কী অপূর্ব রূপবতী এই রাজকন্যা! একটি দেহের মধ্যে কাঠিন্য ও কোমলতা, দৃঢ়তা ও সরসতার কি অপরূপ সমাবেশ! চিত্রক পূর্বেও একবার রাজকন্যাকে পুরুষবেশে দেখিয়াছে; কিন্তু আজিকার পুরুষবেশ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেশভূষার পৌরুষ দেহের অনবদ্য নারীত্বকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, আবৃত করিতে পারে নাই। পুষ্পবৃন্তের ন্যায় কটিদেশ উর্ধ্বে ক্রমশ পরিসর হইয়া যেন কেশর কুসুমের শোভায় বিকশিত হইয়াছে; আপীন-বক্ষের উপর দৃঢ়পিনদ্ধ স্বর্ণ জালিক যৌবনের উন্মাদনাকে স্বর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সর্বোপরি তীক্ষ্ণ-মধুর মুখখানি! এ মুখ কেবল রক্ত মাংসের সমাবেশে সুন্দর নয়, শুধুই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু সমর্পণ নয়; মনে হয় মুখের অন্তরালে মানুষটিও বড় সুন্দর, তাই তাহার সৌন্দর্যের নিরুদ্ধ ছটা মুখেও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

চিত্রকের অশান্ত মন কিন্তু শান্ত হইল না; বরং আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কেন এই রাজকন্যা তাহার সহিত এত মিষ্ট এত সদয় ব্যবহার করিতেছে? ইহা অপেক্ষা যদি নিজ পদগৌরবে গর্বিত হইয়া তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিত সেও ভাল হইত। রাজকন্যা তাহার সত্য পরিচয় জানে না বলিয়াই এমন স্নিগ্ধ ব্যবহার করিতেছে। যদি জানিত তাহা হইলে কী করিত?

চিত্রক যখন কথা কহিল তখন তাহার কণ্ঠে এই প্রশ্নেরই প্রচ্ছন্ন প্রতিধ্বনি হইল; সে রট্টার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া ধাবমান অশ্বের নিষ্কম্প চামর শিখার উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল—'রক্ষীদের আগে যাইতে দিয়া আপনি ভাল করেন নাই।'

ভ্রূ বঙ্কিম করিয়া রট্টা বলিলেন—'তাহাতে কী দোষ হইয়াছে?'

চিত্রক বলিয়া উঠিল—'আপনি আমার কতটুকু জানেন? আমি যদি তস্কর দুর্বৃত্ত হই, আপনার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করি, কে আপনাকে রক্ষা করিবে? জানি, দেবদুহিতা বীর্যবতী, আত্মরক্ষায় সমর্থা; তবু তিনি নারী। অজ্ঞাতকুলশীলকে অধিক বিশ্বাস করিতে নাই।'

অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া রট্টা সম্মুখ দিকে চাহিলেন; তাঁহার মুকুলিত মুখের হাসিটি ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিল না। ক্ষণেক পরে চিত্রকের পানে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই তিনি মৃদু-কণ্ঠে বলিলেন—'আপনি কি অজ্ঞাতকুলশীল?'

চিত্রক চকিতে তাঁহার পানে চাহিল।

রট্টা বলিয়া চলিলেন—'আসমুদ্র আর্যভূমির একচ্ছত্র অধীশ্বর স্কন্দগুপ্তের দূতকে অজ্ঞাতকুলশীল বলিলে কি স্কন্দ-গুপ্তের অবমাননা করা হয় না? কিন্তু এ সকল বৃথা তর্ক। আপনি যদি তস্কর দুর্বৃত্ত হইতেন তাহা হইলে এখনি যে কথা বলিলেন তাহা বলিতে পারিতেন কি? তস্কর কি নিজের বিরুদ্ধে অন্যকে সাবধান করিয়া দেয়?'

বলিয়া রট্টা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। চিত্রকের ইচ্ছা হইল, সে রট্টাকে নিজের পূর্ণ পরিচয় জানাইয়া দিয়া তাহার মুখভাব নিরীক্ষণ করে। ঐ হাসিটি তখন কি অগ্নিদগ্ধ ফুলের মতই শুকাইয়া যাইবে না? অকুণ্ঠ বিশ্বাস-ভরা চোখে ত্রাস ফুটিয়া উঠিবে না?

কিন্তু চিত্রকের মনের ইচ্ছা বাক্যে পরিণত হইল না। তৎপরিবর্তে অধর প্রান্তে একটি ক্ষীণ নিপীড়িত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া রট্টা বলিলেন—'ও কথা থাক।—আর্য চিত্রক, আপনি নিশ্চয় অনেক দেশ দেখিয়াছেন? অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন?'

চিত্রক সতর্কভাবে বলিল—'হাঁ। দূতীয়ালি আমার জীবনে এই প্রথম।'

রট্টা বলিলেন—'আপনি গল্প বলুন, আমার বড় শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে।'

'কী গল্প বলিব?'

'আপনার যাহা ইচ্ছা। যুদ্ধের গল্প, দেশবিদেশের গল্প। পাটলিপুত্র কি খুব সুন্দর নগর?'

'অতি সুন্দর নগর। এমন নগর আর্যাবর্তে নাই।'

'কপোতকূট অপেক্ষাও সুন্দর?'

চিত্রক হাসিল; রট্টার এই বালিকা-সুলভ সরলতা তাহার বড় মিষ্ট লাগিল। সে একটু ঘুরাইয়া বলিল—'কপোতকূটও সুন্দর নগর। কিন্তু কপোতকূট আকারে ক্ষুদ্র, পাটলিপুত্র বৃহৎ; ময়ূরের সঙ্গে কি পারাবতের তুলনা হয়?'

'আর স্কন্দগুপ্ত? তিনি কিরূপ মানুষ?'

'আমি সামান্য দূত, স্কন্দগুপ্তের নিকটে কখনও যাই

নাই। দূর হইতে দেখিয়াছি, অতি সুন্দর পুরুষ। আর শুনিয়াছি, তিনি ভাবুক—অদৃষ্টবাদী—'

রট্টা রমণীসুলভ প্রশ্ন করিলেন—'তাঁহার কয়টি মহিষী?'

চিত্রক বলিল—'স্কন্দ কুমারব্রতধারী, বিবাহ করেন নাই।'

রট্টা বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন—'আশ্চর্য।'

চিত্রক নিজের কথা ভাবিতে ভাবিতে বলিল—'আশ্চর্য বটে! কিন্তু এরূপ আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটিয়া থাকে। আমার যোদ্ধৃজীবনে আমি অনেক দেখিয়াছি।'

'তবে সেই সব কাহিনা বলুন। আমি শুনিব।'

রট্টার আগ্রহ দেখিয়া চিত্রক একটু হাসিল। অজানিত ভাবে তাহার মনের তিক্ততা দূর হইতেছিল। মনের মধ্যে অনেক বিরুদ্ধ ভাবনা জমা হইলে মানুষ হৃদয়-ভার লাঘব করিতে চাহে, আত্মকথা বলিবার সুযোগ পাইলে সুখী হয়। চিত্রক ধীরে ধীরে নিজ জীবনের অনেক কাহিনী বলিতে লাগিল। কেবল আত্ম-পরিচয়টি গোপন করিয়া আর সব সত্য কথা বলিল। যুদ্ধের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নানা দেশের নানা মানুষের অদ্ভুত আচার ব্যবহার, তাহাদের বেশবাস কথাবার্তা—

এদিকে ঘোড়া দুইটি চলিয়াছে; পথেরও বিরাম নাই। উপত্যকায় ছায়াশীতল হইয়া, অধিত্যকায় রবিতপ্ত হইয়া কদাচিৎ গিরি নির্ঝরিণীর জলে অঙ্গ ডুবাইয়া পথ চলিয়াছে। কিন্তু পথের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। রট্টা তন্ময় হইয়া গল্প শুনিতেছেন।

যে গল্প বলে এবং যে গল্প শোনে তাহাদের মধ্যে ক্রমশ মনোগত ঐক্য স্থাপিত হয়, দুইটি মন এক সুরে বাঁধা হইয়া যায়। চিত্রক গল্প বলিতে বলিতে কদাচিৎ সচেতন হইয়া ভাবিতেছিল—কী আশ্চর্য, মনে হইতেছে আমি একান্ত আপনার জনকে আমার জীবন কথা শুনাইতেছি! আর রট্টা—তিনি বোধহয় কিছুই ভাবিতেছিলেন না, শুধু এই জল্পকের সত্তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল নানা কাহিনী বলিবার পর চিত্রক যেন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল; অপ্রতিভ ভাবে বলিল—'আর না, নিজের কথা অনেক বলিয়াছি।'

রট্টা বলিলেন—'আরও বলুন।'

চিত্রক হাসিল; একটু পরিহাস করিয়া বলিল—'রাজকন্যাদের কি ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই নাই? ওদিকে বেলা কত হইয়াছে তাহার সংবাদ রাখেন কি?'

রট্টা চকিতে উর্ধ্বে চাহিলেন। সূর্য মধ্য গগনে। কখন কোন দিক দিয়া সময় কাটিয়া গিয়াছে তিনি জানিতে পারেন নাই।

রট্টা বলিলেন—'ছি ছি, এত গল্প বলিয়া নিশ্চয় আপনার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে।'

চিত্রক বলিল—'তা হইয়াছে। আপনার?'

রট্টা সলজ্জে হাসিলেন—'আমারও। এতক্ষণ জানিতে পারি নাই। কিন্তু উপায় কি? সঙ্গে তো খাদ্যদ্রব্য নাই।'

'উপায় আছে। ঐ দেখুন—' বলিয়া চিত্রক পার্শ্বের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইল।

পাশাপাশি দুই শ্রেণী পাহাড়ের মাঝখানে অপরিসর উপত্যকা, পথটি তাহার উপর দিয়া গিয়াছে। বাম পার্শ্বের পাহাড়ে কিছু উচ্চে পাষাণগাত্রে সারি সারি কয়েকটি চতুষ্কোণ রন্ধ্র দেখা যায়; পাথর কাটিয়া মানুষের বাসস্থান রচিত হইয়াছে। চিত্রকের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করিয়া রট্টা দেখিলেন—একটি দেবায়তন; সম্ভবতঃ বুদ্ধের সংঘ। এখানে যে মনুষ্য বাস করে তাহার প্রমাণ, একটি গবাক্ষ হইতে পীতবর্ণ বস্ত্র লম্বিত হইয়া অলস বাতাসে দুলিতেছে।

চিত্রক বলিল—'যখন বস্ত্র আছে তখন মানুষ অবশ্য আছে; মানুষ থাকিলেই খাদ্য থাকিবে। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া ঐ দিকে যাওয়াই কর্তব্য।'

রট্টা হাসিয়া সম্মতি দিলেন। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে ওখানে ওঠা যাইবে না। ঘোড়া দুটিকে একটি শষ্পাকীর্ণ স্থানে ছাড়িয়া দিয়া উভয়ে পাহাড়ের চড়াই ধরিলেন।

স্থানটি উচ্চ হইলেও দুরধিগম্য নয়; উপরন্তু মনুষ্যপদ-চিহ্নিত একটি ক্ষীণ পথরেখা আছে। শিলাবন্ধুর অসমতল পর্বতগাত্র বাহিয়া চিত্রক অগ্রে চলিল; রট্টা তাহার পশ্চাতে রহিলেন।

অর্ধদণ্ড পরে উপরে উঠিয়া রট্টা দেখিলেন, সংঘই বটে; পাষাণে উৎকীর্ণ কয়েকটি কক্ষ, সম্মুখে সমতল চত্বর। চত্বরের মধ্যস্থলে তথাগতের শিলামূর্তি। উপত্যকা হইতে যে গবাক্ষগুলি দেখা গিয়াছিল তাহা সংঘের পশ্চাৎভাগ।

রট্টা প্রথমে বুদ্ধের ধ্যানাসীন মূর্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। চিত্রকও পাশে দাঁড়াইল।

রট্টা যোড়হস্তে ভক্তিনম্র কণ্ঠে বলিলেন—'নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মো সম্বুদ্ধস্‌স।' যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া রট্টা চিত্রককে বলিলেন—'আপনিও ভগবানকে প্রণাম করুন। বলুন, নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মো সম্বুদ্ধস্‌স—।'

রট্টার অনুসরণ করিয়া চিত্রক ভগবান তথাগতকে প্রণতি জানাইল; তারপর ঈষৎ বিস্ময়ে রট্টার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—'আপনি এ মন্ত্র কোথায় শিখিলেন?'

রট্টা বলিলেন—'আমার পিতার কাছে।'

প্রাঙ্গণে এতক্ষণ অন্য কেহ ছিল না; এখন প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে একটি পীতবেশধারী শ্রমণ বাহির হইয়া আসিলেন। মুণ্ডিত মস্তক, শীর্ণ কলেবর, মুখে প্রসন্ন বৈরাগ্য। সহাস্যে দুই হস্ত তুলিয়া বলিলেন—'আরোগ্য।'

রট্টা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—'আর্য, আমরা দুইজন ক্ষুধার্ত পান্থ; বুদ্ধের প্রসাদ ভিক্ষা করি।'

ভিক্ষু বলিলেন—'রট্টা যশোধরা, বুদ্ধ তোমার প্রতি প্রসন্ন। এস, তোমরা ভিতরে এস।'

ভিক্ষু তাহাকে চিনিয়াছেন দেখিয়া রট্টার মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'আর্য আমাকে চিনিলেন কি করিয়া? পূর্বে কি দেখিয়াছেন?'

ভিক্ষু বলিলেন—'দেখি নাই, তোমার বেশভূষা হইতে অনুমান করিয়াছি। মহারাজ ধর্মাদিত্যের কাছে যাইতেছ?'

'আজ্ঞা। ইনি আমার সহচর, মগধের রাজদূত।'

ভিক্ষু একবার চিত্রকের প্রতি স্মিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিছু বলিলেন না।

অতঃপর সংঘচ্ছায়ায় প্রবেশ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন পূর্বক পথিক দুইজন একটি প্রকোষ্ঠে বসিলেন। ভিক্ষু তাহাদের জন্য খাদ্য আনিয়া দিলেন; কিছু দ্বিদল সিদ্ধ, কিছু সিক্ত চিপিটক, কয়েকটি শুষ্ক দ্রাক্ষাফল ও খর্জুর। ক্ষুধার সময়; উভয়ে পরম তৃপ্তির সহিত তাহাই অমৃতজ্ঞানে আহার করিতে লাগিলেন।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কথোপকথন হইতে লাগিল।

রট্টা জিজ্ঞাসা করিলেন—'দেব, এখানে আপনারা কয়জন আছেন? আর কাহাকেও দেখিতেছি না।'

ভিক্ষু বলিলেন—'আমরা চারিজন আছি। দুইজন রন্ধ্রে জল ভরিতে গিয়াছেন। একজন পীড়িত।'

রট্টা মুখ তুলিলেন—'পীড়িত? কী পীড়া?'

ভিক্ষু ঈষৎ হাসিলেন—'সংসার—পীড়া। সংঘে থাকিলেও মারের হস্ত হইতে নিস্তার নাই।'

চিত্রক প্রশ্ন করিল—'আপনারা এখানে নিঃসঙ্গ থাকেন? দিবারাত্র কি করেন?'

ভিক্ষু বলিলেন—'সংসার ভুলিবার চেষ্টা করি।'

আগারান্তে আচমন করিয়া রট্টা আবার আসিয়া বসিলেন, বলিলেন—'আর্য, কিছু উপদেশ দিন।'

ভিক্ষু হাসিলেন—'আমি আর কী উপদেশ দিব?' সহস্র বৎসর পূর্বে শাক্যমুনির শ্রীমুখ হইতে যে বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল তাহাই শুন।—'মন হইতে প্রবৃত্তির উৎপত্তি; মন যদি প্রসন্ন নিষ্কলুষ থাকে, সুখ ছায়ার মতো তোমার পিছনে থাকিবে।' *

রট্টা প্রণাম করিয়া বলিলেন—'আমি ধন্য।'—ভিক্ষুর পদপ্রান্তে একটি স্বর্ণ দীনার রাখিয়া বলিলেন—'সংঘের অর্ঘ্য।'

ভিক্ষু বলিলেন—'স্বর্ণে প্রয়োজন নাই। কল্যাণি, যদি সংঘকে দান করিতে ইচ্ছা কর, এক আঢ়ক গোধূম দিও। দীর্ঘকাল আমরা গোধূম দেখি নাই। যে শ্রমণটি অসুস্থ তিনি গোধূমের জন্য কিছু কাতর হইয়াছেন।' বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

'সত্বর পাঠাইব'—বলিয়া রট্টা গাত্রোত্থান করিলেন।

চিত্রক দণ্ডায়মান ছিল; সে শুষ্কস্বরে বলিল—'মহাশয় আমাকেও কিছু উপদেশ করুন।'

ভিক্ষু প্রশান্ত চক্ষু তাহার পানে তুলিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—'শাক্যমুনির উপদেশ শ্রবণ কর: "সে আমাকে গালি দিয়াছে, আমাকে প্রহার করিয়াছে, নিঃস্ব করিয়াছে"—এই কথা যে চিন্তা করে তাহার ক্রোধ কখনও শান্ত হয় না। বৈরভাব কেবল অবৈরভাব দ্বারা শান্ত হয়, ইহাই চিরন্তন ধর্ম।' *

* * * *

* ধম্মপদ—যমকবগ্‌গ

দুই অশ্বারোহী আবার চলিয়াছেন। সূর্য তাঁহাদের বামে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তীর্যক অংশু তেমন তীক্ষ্ণ নয়।

উভয়ে নিজ নিজ অন্তরে নিমগ্ন; বাক্যালাপ অধিক হইতেছে না। চিত্রক গল্প বলিবার কালে রট্টার প্রতি যে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা অনুভব করিয়াছিল, তাহা আবার সংশয়ের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভিক্ষু যে-কথা বলিলেন তাহার অর্থ কি? বৈরভাবের পরিবর্তে অবৈরভাব পোষণ করাই স্বাভাবিক, অবৈরভাব কি করিয়া পোষণ করা যায়? ইহা ভিক্ষুর ধর্ম হইতে পারে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কদাচ নয়। প্রতিহিংসা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। শুধু তাহাই নয়, ইহা চিত্রকের প্রকৃতিগত স্বধর্ম। ইহা তাহার ধাতু।

অথচ—এত সুযোগ পাইয়াও সে রট্টার উপর প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারিতেছে না কেন? রট্টা সুন্দরী যৌবনবতী নারী—এই জন্য? সুন্দরী নারীর মোহে সে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বিস্মৃত হইবে? পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবে না?

সহসা মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় একটি চিন্তা চিত্রকের মনে খেলিয়া গেল। সে উচ্চকিত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে আকাশের চানে চাহিল। কোন্ মূঢ়তার জালে তাহার মন এতক্ষণ জড়াইয়া ছিল? এ কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই কেন?

সে মনে মনে বলিল—আমি ক্ষত্রিয়, বৈরতা আমার স্বধর্ম; কিন্তু রট্টার সহিত বৈরতা করিব কেন? সে আমার অনিষ্ট করে নাই। তাহার পিতার অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম নয়! যদি প্রতিশোধ লইতে হয় তাহার পিতার উপর লইব।

দারুণ সমস্যার সমাধান হইলে হৃদয় লঘু হয়। মুহূর্তে চিত্রকের অন্তরের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়া আনন্দের দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে উৎফুল্ল নেত্রে রট্টার পানে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

চকিতে স্মিত নেত্র তুলিয়া রট্টা বলিলেন—'কি হইল?'

চিত্রক বলিল—'ভিক্ষু বলিয়াছিলেন, সুখ ছায়ার মতো আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। ঐ দেখুন সেই ছায়া!'

রট্টা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, সঞ্চরমান অশ্বারূঢ় ছায়া নাচিতে নাচিতে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছে।

উভয়ে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

চারিদিকে বিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত উপত্যকা। পাহাড় দূরে সরিয়া গিয়াছে। দূর হইতে তাঁহাদের হাসির গদ্‌গদ প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল। যেন মিলন মুহূর্তের সলজ্জ চুপিচুপি হাসি। কানে কানে হাসি। (ক্রমশঃ)

বিষ্ণুপুরে শিক্ষক সম্মেলন

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

আয়োজন চলতে লাগল—কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর থেকে কলকাতা। ১৯৪৭ সালে বর্ধমান সম্মেলনের পর দেশবিভাগ ও নিখিল বংগ শিক্ষক সমিতিকে বিভক্ত করার আয়োজনের জন্যে গত দু'বছর সাধারণ সম্মেলন হতে পারে নি। দীর্ঘ ২।০ বছর পরে বহু-আকাঙ্ক্ষিত এই সম্মেলনের জন্যে সমগ্র শিক্ষক-সমাজ যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবেন, তা ত স্বাভাবিক। সেজন্যেই এবারকার আয়োজন অধিকতর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগে শুরু হল। স্থানীয় আহ্বায়কমণ্ডলীর সংগে নিখিল বংগ শিক্ষক সমিতির কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বারের তুলনায় ঘনিষ্ঠতর হলেন।

সূত্রপাত হয় ২৩শে এপ্রিল, যেদিন আমরা বাঁকুড়ায় যাই সমিতির তরফ থেকে আঞ্চলিক সভা করতে। সভা শেষে জেলা শিক্ষক সমিতির (নি. ব. শিক্ষক সমিতির জেলা শাখা) সভাপতি মহাশয় ও আমরা আগামী সম্মেলনের কথা উপস্থিত সকলকে জানাই। বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে যে তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি আঞ্চলিক সভায় এসেছিলেন, তাঁদের অনুরোধ করা হয় ফিরে গিয়ে প্রধান শিক্ষক মশায়কে জানাতে। কিছুদিন পরেই প্রধান শিক্ষক শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ জানালেন, রাজী। প্রথমে একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম—এত সহজেই এমন একটা বিরাট সম্মেলনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হলেন কী করে? সংগে অবশ্য এ কথাও লিখেছেন, আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা পেলে তিনি কৃতকার্য হবেন বলে আশা করেন। সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি জানালাম। তবু সংশয় রইল—মফঃস্বল সহর, প্রতিনিধির সংখ্যা পাঁচ শ'ও হতে পারে, হাজারও হতে পারে, এতজন লোকের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত, এতজন লোকের

সংকুলান হতে পারে এমন একটি সম্মেলন-মণ্ডপ বা সম্মেলনের স্থান চাই ত ?

সংশয় রইল না, ২রা জুন আমি ও সমিতির ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীবিনয়ভূষণ সেন গেলাম বিষ্ণুপুর পরিদর্শনে সম্মেলনের প্রাথমিক আয়োজনের জন্যে। সকালে গোকুলবাবু আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখালেন সম্মেলনের স্থান। চমৎকার কাব্যিক পরিবেশ—শহরের একান্তে প্রশস্ত সিনেমা হল্, বালিকা বিদ্যালয়, মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, কে. জি. ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, তারপর উচ্চ বিদ্যালয়ের বোর্ডিং ও উচ্চ বিদ্যালয়—বোর্ডিং ও বিদ্যালয়ের মাঝে উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের রাখী-বন্ধন ; আরও এগিয়ে চলুন—বিশাল কাকচক্ষু লালবাঁধ, তীরে রামানন্দ কলেজ, এ পাশে কলেজ হোষ্টেল। লালবাঁধের ওপারে শাল-পিয়াল-মহুয়ার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা, লাল কাঁকর আর পাথরের সমতল ও উঁচু-নীচু ঢিবি। খুশি হলাম, উৎফুল্ল হলাম। ছ' সাত শ' প্রতিনিধির থাকবার মত জায়গা যথেষ্ট হবে। তা ছাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের হল্-ঘরে ক্লাশের পার্টিশানগুলো সরিয়ে ছ' সাত শ লোকের সভাও চলবে। রূপকথা সিনেমায় অন্তত বারো শ' লোকের স্থান হতে পারবে—সুতরাং প্রকাশ্য উদ্বোধন অধিবেশন সেখানেই হবে স্থির হল, কারণ প্রতিনিধি ছাড়া শহরের অধিবাসীরাও ত এই অধিবেশনে যোগদান করবেন। ফিরবার পথে খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীরামনলিনী চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে আমরা গেলাম। আলাপ-পরিচয়ে এবং সম্মেলন সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝলাম, গোকুলবাবু একটি চীনের প্রাচীরকেই পাকড়াও করেছেন।…বিকেলে উচ্চ বিদ্যালয় গৃহে শহরবাসীদের সভায় স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি ও বিভিন্ন উপসমিতি গঠিত হল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন রামানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়।

কলকাতায় সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সম্মেলন উপসমিতির ঘন ঘন সভা, সমিতির কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ ও কর্মতৎপরতা, বিষ্ণুপুরের সংগে কলকাতার আত্মিক সংযোগ ও উপর্যুপরি পত্রাঘাত, গার্ডেনরিচ বি. এন. আর অফিসে বগি রিজার্ভ করার জন্যে ছোটাছুটি, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দের বাড়িতে যাতায়াত চলতে লাগল ! প্রসাদপ্রাপ্ত (!) ঋত্বিক দু'জনেরই সম্মতি আমরা পেলাম—সবল দীর্ঘকায় সাগ্নিক শ্যামাপ্রসাদ উদ্বোধন করবেন, আর ক্ষুদ্রকায় কিন্তু রসিকতা ও পাণ্ডিত্যের অর্ণব দেবপ্রসাদ করবেন সভাপতিত্ব।

১৫ই জুলাই শনিবার ও ১৬ই জুলাই রবিবার সম্মেলন। ১৩ই রাত্রে চার মণ পটল নিয়ে রওনা হলাম। ভারটি যখন গোকুলবাবু আমার ওপর চাপান তখন তাঁকে বলেছিলাম, 'পটল না তুলিয়ে আর ছাড়বেন না দেখছি!' হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'তুলি ত দু'জনেই এক সংগে এখানে তুলব !' ১৪ই সকালে গিয়েই বিদ্যালয় গৃহের পূর্বপ্রান্তে পার্টিশান দেওয়া দুটি ঘর দখল করে বসলাম। কার্যত এই দুটি ঘর নিখিল বংগ শিক্ষক সমিতির কার্যালয় হয়ে দাঁড়াল। যার যা কিছু দরকার, এই ঘরে এলেই পাবেন বা জানতে পারবেন ! সারাদিন ধরে শিক্ষক ও ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের সংগে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধিদের বাসস্থানের জন্যে পৃথক পৃথক ঘর ঠিক করা, প্রত্যেকটি প্রতিনিধি শিবিরে' সম্মেলন সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নির্দেশক প্রাচীরপত্র লাগানো, প্রতিনিধিদের প্রবেশ-পত্র ও ব্যাজ প্রভৃতির বন্দোবস্ত দেখলাম। পরে আর সময় হবে না ভেবে বিকেলে এক ফাঁকে শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে নিলাম। একটি হিন্দু ও একটি মুসলমান কিশোর ছাত্র হ'ল আমাদের গাইড্। দেখলাম দলমাদল, মদনমোহন মদনগোপালের ও ৺মৃন্ময়ী দেবীর মন্দির, শনি ঠাকুর প্রভৃতি। এই সত্যপীর ও শনি ঠাকুরের কাছে আজও হিন্দু-মুসলমানে পুজো দেয় ! আর দেখলাম, দুটি হিন্দু-মুসলমান কিশোর হাত ধরাধরি করে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে ! প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস-মুখর বিষ্ণুপুরকে দেখলাম।…সন্ধ্যায় ফিরে দেখলাম, প্রতিনিধিরা আসতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের ধারণা ছিল, শনিবারের আগে প্রতিনিধিরা বড় একটা আসবেন না। যাই হোক, শনিবারের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিনিধিই এসে গেলেন। অবশ্য রবিবারও কয়েকজন এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় শতেরও উপর এবং তার মধ্যে ছিলেন পূর্ববংগের প্রতিনিধি পঞ্চান্ন জন ও মহিলা প্রতিনিধি পঁয়ত্রিশ জন।

১৫ই শনিবার সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বিভিন্ন কাউণ্টারে প্রতিনিধিদের পরিচয়পত্র ও সম্মেলনের চাঁদা গ্রহণ করে প্রবেশপত্র, ব্যাজ, মুদ্রিত ভাষণাবলি, সম্পাদকীয় কার্যবিবরণী প্রভৃতি বিতরণ করা হল। জলযোগের পর সকাল ৮টায় কে. জি. ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে হল শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন। প্রশস্ত হলঘরের মধ্যে প্রবেশপথের দিকটা ছাড়া তিন দিকে পঁচিশ-ত্রিশটি ষ্টল বসেছে। কলিকাতা থেকে সরকারি কর্মচারীরাও এসেছেন প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনা করতে। বিষ্ণুপুরের নিজস্ব শিল্প—কুটীরজাত রেশম, তসর, গরদ, শাঁখারীর শাঁখ, পিতল-কাঁসার বাসন, মালাকারের শোলার কাজ, পট ও পুতুল, প্রাচীন পুথি, অম্বরী তামাক, মতিচুর প্রভৃতি সব কিছুরই এমন একটি চমৎকার সমন্বয় হয়েছে যে, কল্পনা-প্রবণ মন যেন থেকে থেকে 'কালিদাসের কালে' ফিরে যেতে চাইছিল। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা, ভারতের জাতীয় শিল্প তথা কুটীর শিল্প, ভারতীয় শিল্পকলার সংগে ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ প্রভৃতি বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

…অতিথি অভ্যাগত, প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, দাস-দাসী, পাচক-পাচিকা সমেত প্রায় এক হাজার জনকে দু'দিনে চারবার জলযোগ চারবার আহারের জন্যে আটখানা করে কুপন পূর্বেই বিতরণ করা হয়েছিল। কুপন দেখিয়ে মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপ্ত করলাম। বেলা তিনটেয় শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি শাখার অধিবেশন আরম্ভ হল। বিদ্যালয়-গৃহে তিলধারণের স্থান নেই। উত্তর তোরণের অনেকখানি

পথ লতা-পাতা দিয়ে আচ্ছাদিত করে এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে। উপরে প্রকাণ্ড লাল শালুতে ঝলমল করছে, 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন।' দক্ষিণায়নেও তাই। উপরন্তু সেখানে বিজয়গর্বে শূন্যে উড়ছে বিষ্ণুপুরী রেশমের জাতীয় পতাকা। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন দেবপ্রসাদ। প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, বক্তৃতা, হাস্য-কৌতুক প্রভৃতি চলল। একজন শিক্ষক 'My Familiar' কবিতার অনুবাদ ও আর একজন 'B. T.র মুদ্গর' নামে একটি সংস্কৃত-বাংলা খিচুড়ী কবিতা পাঠ করলেন। দুটিই স্বরচিত, অনাবিল হাস্যরসের মধ্যে শিক্ষক-জীবনের ব্যথা লুকায়িত। তবু তাঁরা পরিচয় দিলেন, এখনো হাসতে জানেন শিক্ষক-সমাজ, এখনো সাহিত্য-সংস্কৃতির পালিশ আছে তাঁদের মধ্যে। পরিশেষে সভাপতি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে সংস্কৃতির সংকট সম্বন্ধে ভাষণ দিয়ে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্যে দেশমাতৃকাকে যে ভাব ও ভাষায় আহ্বান করলেন, তা বহুকাল মনে থাকিবে।

অপরাহ্নে জলযোগ সারা হল। সন্ধ্যা সাতটায় সংগীত ও বিচিত্রানুষ্ঠান। বিষ্ণুপুরী সংগীতের ঐতিহ্য আছে। ধারাটি প্রাচীনপন্থী হলেও তার মধ্যে বনেদীয়ানা ও ঘরোয়ানার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বাতেপংগু সংগীতাচার্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হল। মঞ্চের ওপর জলতরঙ্গ, তবলা, পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, এস্রাজ, সেতার, তানপুরা প্রভৃতির সমাবেশ। অশক্ত গোপেশ্বরবাবু চেয়ারে বসেই ধ্রুপদ আরম্ভ করলেন, এখনো সুললিত গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, আওয়াজটি উদাত্ত, সুর চিড়্ খায় নি, রাগশুদ্ধ সংগীতের মূর্চ্ছনায় সমস্ত হলঘরটি গমগম্ করতে লাগল, বিশেষ করে তাঁর হাম্বীর রাগের বন্দেজটি ভালো লাগল। বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে বেহাগ, ভীমপলশ্রী, আড়ানা, মালকোষ, কাফি-সিন্ধু প্রভৃতি সময়োপযোগী রাগের পরিবেশন মধুর হয়েছিল শিল্পীদের মধ্যে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

...১৬ই রবিবার সকাল ৮টায় মূল সম্মেলনের উদ্বোধন। শ্যামাপ্রসাদবাবুর আগের দিনের কার্যসূচী ছিল বাঁকুড়া শহরে। সুতরাং আমাদের উদ্বোধন রবিবারেই করতে হয়। রূপকথা চিত্রগৃহ লোকে লোকারণ্য। সমস্ত প্রতীক্ষা সমস্ত উৎকণ্ঠার নিরসন করে এলেন শ্যামাপ্রসাদ—সংগে সাংবাদিক মাখনলাল সেন, মেজর পি, বর্ধন ও অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। সিনেমা-মঞ্চ বিশিষ্ট অতিথিদের পদার্পণে ধন্য হল। উদ্বোধন সংগীতের পর দেবপ্রসাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। তারপর বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ উঠলেন উদ্বোধনী বক্তৃতা করতে। উদাত্ত কণ্ঠে তেজোদৃপ্ত ভাষায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বক্তৃতা দিলেন শ্যামাপ্রসাদ। বাংলা ও বাঙালীর দুর্দিন, দেশের শিক্ষা-সমস্যা, বাস্তুহারা শিক্ষক ও ছাত্রের সমস্যা তথা অর্থসংকট এবং সব কিছুর সংগেই ওতপ্রোত রাজনীতিক গলদ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্ভীক দ্ব্যর্থহীন মতবাদ প্রকাশ করলেন। সবশেষে তিনি বললেন, শিক্ষা ও শিক্ষকের এই দুর্যোগের দিনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধতার। কিন্তু তিনি জানেন, শিক্ষক-সমাজের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের মধ্যেও ফাটল দেখা দিয়েছে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে তিনি তাঁর যথাসাধ্য সাহায্য ও মধ্যস্থতা করতে রাজী আছেন। বিপুল উল্লাসধ্বনি ও করতালি হ'ল। সকলের মন থেকেই যেন একটা বোঝা নেমে গেল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতির সারগর্ভ অভিভাষণ এবং সম্পাদকীয় কার্যবিবরণী পাঠের পর অধিবেশন শেষ হ'ল।

আহারের পর ভিন্নমতবাদী নেতৃবর্গ রামনলিনীবাবুর বাড়িতে সমবেত হলেন। শ্যামাপ্রসাদ ও দেবপ্রসাদ আমাদের মনের যত ক্লেদ যত গ্লানি দূর করে দিলেন। ফিরে এলাম হৃষ্ট চিত্তে। চারদিকে যেন আনন্দের বান বইতে লাগল। সে এক মহামিলনের পবিত্র ক্ষণ! তিনটের সময় বিষয়-নির্বাচনী সভা আরম্ভ হল। চেৎলার প্রধান শিক্ষক শৈলেনবাবু প্রস্তাব উত্থাপন করতে লাগলেন, আর হরিদাস গোস্বামী, মনোরঞ্জনবাবু, ধীরেনবাবু প্রভৃতি সমর্থন করতে লাগলেন। সমস্ত প্রস্তাব নির্বিঘ্নে পাশ হয়ে গেল। তার মধ্যে সমিতির কার্যক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ করা, বাস্তুহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্বাচন ও কলোনী, আগামী রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে শিক্ষক-সমাজের অংশগ্রহণ উল্লেখ-যোগ্য। সন্ধ্যার পর কার্যনির্বাহক সভাপতি ও তিনজন সহ-সভাপতি নির্বাচনের পর সম্মেলন-পর্ব শেষ হ'ল। নিখিল বংগ শিক্ষক সমিতির ইতিহাসে এমন একটি সুশৃংখল সুব্যবস্থাপূর্ণ সম্মেলন স্মরণীয় হয়ে রইল। দেখলাম মূল সভাপতির সুযোগ্য পরিচালনা, দেখলাম স্থানীয় কর্মকর্তা এবং শিক্ষক-ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যম ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা। কিন্তু মনের কোণে বেদনা রয়ে গেল একটু। এই ধরণের বিরাট সম্মেলনে যা হয়, দূরকে ও পরকে নিকট বন্ধু করে নেবার সুযোগ মিলল না, প্রত্যেকের সংগে ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয়ের সামাজিক দিকটা অপূর্ণই হয়ে গেল।

পরদিন সকালে বিষ্ণুপুরের মাটি ও মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ফিরবার পথের একটু বিবরণ না দিলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রত্যেক কামরায় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সমাবেশ, এ যেন শিক্ষকের ট্রেণ! খড়্গপুরে চা খেতে নেমেছি, এমন সময় একটি কামরায় ধরে নিয়ে গেল। অন্য কামরা থেকে আরও দু'চারজনকে সংগ্রহ করে আনা হ'ল। গিয়ে দেখি, পাঁচজন শিক্ষয়িত্রী ও ৮।১০ জন শিক্ষক আগে থেকেই সেখানে আসর জমিয়েছেন। হেমবাবু ও বীরেনবাবুর মত ভারিক্কি প্রধান শিক্ষকও শিশুর মত সরল ও আনন্দ-চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কবি-গান হাস্য-কৌতুক আবৃত্তি, সংগীত চলতে লাগল, কোন কুণ্ঠা, কোন জড়তা নেই। উপস্থিত প্রত্যেককে কিছু-না-কিছু অংশ গ্রহণ করতে হবেই। মনোরঞ্জনবাবু পরবর্তী ষ্টেশনে নেমে অন্য কামরায় চলে গেলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঢাকার দু'টি অবিবাহিতা তরুণী শিক্ষয়িত্রীর 'কনে দেখা' হাস্যরস পরিবেশন। একজন কনে'র অংশ, আর একজন বরপক্ষের অংশ গ্রহণ করলেন। কনে'র অংশটিই প্রধান। বিশেষ অভ্যস্ত না হলে এমন অনাবিল উচ্চাংগের হাস্যরস বিতরণ করা সম্ভব নয়। বহুকালের মধ্যে এত হাসি আর হাসি নি।

বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

আওরঙ্গজেবের পত্র

পত্র পরিচয় :—

১৬৬৪ সাল ; আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে। দারার ছিন্নমুণ্ড মাতা তাজবিবির সমাধি পার্শ্বে প্রোথিত করা হয়েছে। মুরাদকে গোয়ালিয়র দুর্গে মিথ্যা হত্যার অপরাধে হত্যা করা হয়েছে। সুজা আরাকানের জংগলে নিরুদ্দেশ অথবা মৃত। ভ্রাতুষ্পুত্রদের "পপীর" (আফিঙএর) বিষপান করান হয়েছে—কেহ বা মৃত, কেহ বা উন্মাদ—অর্দ্ধপঙ্গু পিতা আগ্রার দুর্গে বন্দী। দিল্লীর সিংহাসন নিষ্কণ্টক। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম রাজ্য থেকে স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য রাজদূত এসেছেন। দিল্লীর উৎসব শেষ হয়ে গেছে। ইরাণের রাজদূত কাবুলের পথে ইস্পাহান প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। সেই সময় আওরঙ্গজেবের শৈশব-শিক্ষক মোল্লা সালেহ্‌র সঙ্গে ইরাণ রাজদূতের সাক্ষাৎ হল।

মোল্লা সালেহ্‌কে শাহজাহান পুরস্কার স্বরূপ কাবুলের প্রান্তদেশে কিছু জায়গীর দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ মোল্লা সুদূর পথ অতিক্রম ক'রে দিল্লীতে উপস্থিত ; তাঁর ছাত্র রাজসিংহাসনে—মোল্লার উদ্দেশ্য রাজদরবারে ওমরাহপদ লাভ। আওরঙ্গজেব তাঁর পুরাতন ওস্তাদকে জানতেন। তিনমাস পর্য্যন্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব মোল্লা সালেহ্‌কে সাক্ষাতের অনুমতি দেন নি। তিনি দরবারের বহু ওমরাহকে দিয়ে সংবাদ দিলেন—মোল্লা সালেহ্‌ সম্রাটের শৈশবের শিক্ষক, সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী। প্রিয় সম্রাট-ভগ্নী রোশন্‌-আরার নিকট ব্যক্ত করলেন নিজের উদ্দেশ্য। আওরঙ্গজেব বিরক্ত। আওরঙ্গজেব তখন মোল্লার নিকট লিখলেন এই অপরূপ পত্র।

এই পত্র ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ার তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

পত্রানুবাদ :—

মৌলানা সালেহ্‌,

আপনি আমার দরবারে ওমরাহের পদ আকাঙ্ক্ষা করেছেন ; আপনি কি সুস্থ মনে এই কথা বিশ্বাস কর্ত্তে পারেন যে আপনাকে আমি এই ওমরাহের পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে পুরস্কৃত কর্ত্তে পারি ? আপনি আমার জন্যে কি করেছেন ? আমাকে কি শিক্ষা দিয়েছেন ? আপনি যদি আমাকে রাজপুত্রের উপযোগী শিক্ষা দিতেন, তবে—আপনাকে ওমরাহের পদে বরণ করে আমি কৃতার্থ হতাম। আমি বিশ্বাস করি যে শিশু যদি তার শিক্ষক দ্বারা শৈশবে সুশিক্ষিত হয় তবে ভবিষ্যতে তার পিতা আর শিক্ষকের মধ্যে সে কোন পার্থক্য বিচার করে না।

চিন্তা ক'রে দেখুন ত' আপনি আমাকে কি শিক্ষা দিয়েছেন ? আপনি বলেছেন যে ফিরিঙ্গীস্তান (ইউরোপ) অত্যন্ত হীনস্তরের দেশ। সেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা পর্ত্তুগলের সেই ক্ষুদ্র দ্বীপাধিপ, তারপর ওলন্দাজরাজ—তাঁদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেছেন ? ফরাসী ও স্পেনের রাজার সম্বন্ধে বলেছেন—তারা হিন্দুস্তানের এক একটা সামন্ত রাজার মতন। আর বলেছেন যে হিন্দুস্তানের সম্রাট বিশ্ববিজয়ী, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোত্তম নরপতি, সর্ব্বশেষে বলেছেন যে হিন্দুস্তানের সম্রাটের নামে ইরাণ, উজবেগ, কাসগর, তুরাণ, পেগু (ব্রহ্মদেশ), চীন, মহাচীন রাজ্য আতঙ্কিত হয়ে উঠে। আপনার ভূগোলের সঙ্গে পরিচয় ছিল কি ? আমাকে এই রাজ্যগুলির সম্বন্ধে নির্ভুল সংবাদ দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য ছিল—তাদের সামরিক শক্তি, যুদ্ধ বিদ্যা, তাদের ধর্ম্ম, নীতি, সংস্কার, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা জানলে আপনার ছাত্রের অনেক উপকার হত। এই রাজ্যগুলির নির্ভুল ইতিহাস, উত্থান-পতনের কাহিনী আপনার রাজকুমার ছাত্রের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কোন সাম্রাজ্য কেন, কবে, কি ভুল করেছিল, কি

বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে, কি বিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছিল তা' যে রাজপুত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য।

আমার বিশ্ববিশ্রুত ,পূর্ব্বপুরুষগণ এই বিরাট হিন্দুস্তান জয় করেছিলেন, আপনি কি তাঁদের জীবন কাহিনী, তাঁদের রাজ্যজয়ের নীতি আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন ?

আপনার শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে আরবী অক্ষর, ভাষা, পঠন, লিখন ব্যাপারে নিপুণ করবেন। বাস্তবিক যে ভাষা আয়ত্ত কর্ত্তে প্রায় দশ বৎসর প্রয়োজন হয়, তার জন্য আমার জীবনের কত মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন। আপনার ধারণা ছিল যে মুসলিম শাহ্‌জাদার পক্ষে আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করা বা মুসলিম আইন পাঠ করাই জীবনের চরম চরিতার্থতা ; অথচ সেই রাজপুত্রের পক্ষে তাঁর প্রতিবেশীর ভাষা শিক্ষার পরম প্রয়োজন আপনার ধারণার বহির্ভূত ছিল, এই সুদীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে আপনার ছাত্র কত মূল্যবান গ্রন্থ অধ্যয়ন কর্ত্তে পারতো—তা জানেন ? একটি দানবের প্ররোচনায় এই শুষ্ক, নীরস, সময়-সাপেক্ষ বিরক্তিকর কাজে আমাকে নিয়োজিত করেছিলেন।

আপনি শিশু মনের সঙ্গে পরিচিত নন। যৌবনে, বার্দ্ধক্যে মানুষ শৈশবের সুখ স্মৃতি বহন ক'রে কৃতার্থ হয়। শৈশবে যে উপদেশ ও শিক্ষার বীজ শিশুর মনে বপন করা হয়, তা পরবর্ত্তীকালে তার মনকে বৃহৎ কাজের উপযুক্ত করে দেয়।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, সমাজ-বিজ্ঞান কি আমাদের মাতৃভাষায় শেখা সম্ভব নয় (১)? আরবী ভাষার মধ্য দিয়েই যে শিখতে হবে তার কি সার্থকতা আছে ? মৌলানা সালেহ্‌, আপনি আমার পিতা সম্রাট শাহ্‌-জাহানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আপনি আমাকে দর্শন শিক্ষা দিবেন। আমার বেশ মনে পড়ে আপনি বহু বৎসর আমার সঙ্গে অন্তঃসারহীন তথ্য আলোচনা করেছেন —সে সব তথ্য মানব সমাজের কোন প্রয়োজন সাধন করে না, মানবচিত্তের তৃপ্তি সাধন করে না ; সেগুলি শুধু কল্পনা, চিন্তার বিলাস। সেই তথ্যগুলির মধ্যে একটা বস্তুর সন্ধান পেয়েছি—দর্শনের শব্দগুলি অতিশয় কষ্টবোধ্য কিন্তু অতি সহজেই বিস্মরণীয়। আপনার আলোচনার বেশ এখনো আমার মনে পড়ে এবং আমি মনে মনে আপনাকে করুণা করি। তবে সেই গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যে আমার মনে আছে কতকগুলি ভীষণ-শ্রবণ শব্দ—সেইগুলি মানুষকে বিভ্রান্ত করে, সন্দিগ্ধ করে, মানুষের চিন্তাকে পরিভ্রান্ত করে ; কিন্তু আপনার মত পাণ্ডিত্যাভিমানীদের অহঙ্কারকে প্রসন্ন করে। এই বিকট ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দাড়ম্বরের অন্তরালে বিশ্বের সমস্ত রহস্য আবৃত রয়েছে ভেবে আপনারা আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন এবং আপনারা সেই শব্দগুলির অর্থ-সম্পদের অধিকারী ব'লে মানুষের নিকট প্রশংসার দাবী করেন।

আলেকজাণ্ডার যেমন তাঁর শিক্ষক এরিষ্টটলের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন তেমনি আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকতাম যদি আপনি আমাকে যথার্থ দর্শনের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্ত্তেন, যদি আপনার দর্শন আমার মনকে যুক্তিবাদী করে তুলত ; যদি সংস্কারবিহীন যুক্তি আমার চিত্তকে বিভ্রান্ত না করত, তবে সে শিক্ষা আমার চিত্তকে ভাগ্য বিপর্য্যয়ে বিক্ষুব্ধ করত না ; সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় আমার মনের সমতা রক্ষা করত, সুখে আমাকে বিগতস্পৃহ করত, দুঃখে আমাকে অনুদ্বিগ্নমনা করত। আপনি আমাকে আমার আত্মদর্শনের শিক্ষা দিতে পারতেন, বস্তুর মূল সত্তার সন্ধান বলে দিতে পারতেন ; এই বিরাট বিশ্বের অসীমতা এবং তার মধ্যে যে নিয়ম শৃঙ্খলা ও অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে তা'ও বলেন নি। এই শিক্ষা যদি আমাকে দিতেন তবে আজ আপনার কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকত না।

স্তব-স্তুতি ও খোসামোদ না করে যদি আপনার রাজকুমার ছাত্রকে আপনি প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন! আপনি কি কখনো ধারণা করেন নি যে একদিন আমাকে আমার প্রাণ-রক্ষার জন্য এবং সিংহাসনের জন্য ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা কর্ত্তে হবে ? আপনি কি আমাকে কখনো কোন দুর্গ অবরোধ কর্ত্তে, অথবা সৈন্যব্যূহ রচনা কর্ত্তে শিক্ষা দিয়েছেন ? এই সকল শিক্ষার জন্য আমি অন্যের নিকট কৃতজ্ঞ—আপনার নিকট নয়। আমার বাদশাহী লাভের জন্য আমি আপনার নিকট ঋণী নই। আপনি বাদ্‌শাহের নিকট কিছু আকাঙ্ক্ষা করবেন না।

আপনি আপনার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। আপনি

কে এবং আপনার পরিণাম জানবার জন্য পৃথিবীর কোন মানবের প্রয়োজন নাই।

*　　*　　*　　*

পত্র পরিণাম :—

এই পত্রখানির মধ্যে আওরঙ্গজেবের মনের একটা নূতন পরিচয় পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের মনে দুই বিপরীত চিন্তাধারা বয়ে যেত—একটি মুসলিম আওরঙ্গজেব, অন্যটি সম্রাট আওরঙ্গজেব। মুসলমানমাত্রই আরবী ভাষায় নমাজ পড়ে, পৃথিবীতে বহু মুসলমান আছে যাদের ভাষা আরবী নয় এবং যারা আরবী বুঝে না। সহজ-বোধ্য মাতৃভাষায় নমাজ পড়ার বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা ও সুবী ওমর খৈয়াম ইঙ্গিত করেছিলেন। আওরঙ্গজেবও তাই করেছেন। কিন্তু মোল্লাদের বিরোধিতার ভয়ে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নি।

দর্শন সম্বন্ধে আওরঙ্গজেবের তীব্র কটাক্ষ বেশ উপভোগ্য। এটা স্বাভাবিক, কারণ তাঁর রাজ্যে সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো, সুতরাং দিল্লীর বহু সঙ্গীত-বিলাসী সঙ্গীতের মৃত্যু ঘোষণা করল। সঙ্গীতের কল্পিত মৃতদেহকে বহন করে আওরঙ্গজেবের মসজিদের পথ অতিক্রম করে চলল, আওরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করলেন—"আমার সাম্রাজ্যে কে এই বিরাট পুরুষ যার শব যাত্রায় অত লোক সমাগম?" উত্তর পেলেন—"জাঁহাপনা—আপনি সাম্রাজ্যে সঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছেন, তাই দেশের লোক সঙ্গীতের মৃত্যু ঘোষণা করে সঙ্গীতকে কবর দিতে চলেছে"। আওরঙ্গজেব গম্ভীরভাবে বললেন—"বলে দেও যে কবর যেন খুব গভীর ভাবে খনন করা হয়।"

আওরঙ্গজেব মানুষের মূল্য বুঝতেন, প্রয়োজন মত সে মূল্য দিতে কার্পণ্য করতেন না। অন্য দিকে প্রয়োজন হলে নির্ম্মমহস্তে মানুষের কণ্ঠরোধ করতে পারতেন এবং করেছেন। আওরঙ্গজেবের শিক্ষার দোষ সম্বন্ধে তিনি অচেতন ছিলেন না। মোল্লা সালেহ্‌এর পত্র তার অন্যতম প্রমাণ।

কলিঙ্গ-কুমারী

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১

আজ হইতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতিরা রাজ্য শাসন করিতেছেন। তাঁহারা শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। যে রাজবংশ শৈব তাঁহাদিগের কীর্ত্তি যখন ভুবনেশ্বরে দ্বিতীয় কাশী রচনার চেষ্টায় আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল, তখনও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মমত লুপ্ত হয় নাই এবং কণার্ককেন্দ্রে সূর্য্যমন্দিরে তাহার প্রভাব-পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। কেশরী রাজবংশকে পরাভূত করিয়া গঙ্গাবংশ উড়িষ্যায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় শতবর্ষ পরে সূর্য্যবংশীয় কপিলেন্দ্রদেব গঙ্গাবংশীয়-দিগকে পরাভূত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তখন রাজধানী সমুদ্রতীরবর্তী পুরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং স্থানটি জগন্নাথের মন্দিরের জন্য শ্রীক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

কপিলেন্দ্রদেবের পুত্র পুরুষোত্তমদেব পিতার রাজ্য পাইয়া তাহার বিস্তার-সাধনে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি বীর—যোদ্ধা।

তিনি নিকটবর্তী কয়টি রাজ্য অধিকার করিয়া তখন আর কোন্ রাজ্য অধিকার করিবেন, তাহাই বিবেচনা করিতে-ছিলেন। সেদিন তিনি সেই বিষয়ে পরামর্শের জন্য বৃদ্ধ মন্ত্রী, তরুণ সেনাপতি প্রভৃতিকে সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজা মন্দিরে দেব-প্রণাম করিয়া আসিলে সভারম্ভ হইল। সভার প্রথানুসারে ঘোষণান্তে রাজা আসিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে বৈতালিক স্তুতি পাঠ করিল—তাহাতে রাজ্যের বর্ণনা ও রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রজাবৃন্দের অবস্থা কীর্ত্তিত হইল। রাজা মনোযোগ সহকারে সে বর্ণনা শুনিলেন—কোথায় কি করা প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন।

রাজ্যের কার্য শেষ করিয়া রাজা বলিলেন, এখন সুশাসিত রাজ্যে তিনি প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধনে মনোযোগী হইবেন।

সেনাপতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—রাজা প্রথমে যে সকল রাজ্য জয় করিবেন মনে করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে কলিঙ্গ বিজয় করা হয় নাই; তিনি কি কলিঙ্গ-বিজয়ের বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন?

পুরুষোত্তমদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পার্শ্বচরদিগের মধ্য হইতে নীলকান্ত দণ্ডায়মান হইয়া কলিঙ্গের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য বর্ণনা করিয়া উপবিষ্ট হইবার পূর্বে বলিলেন, কলিঙ্গরাজের পুত্র নাই, কন্যা পদ্মাবতীর অসাধারণ দেহ-লাবণ্য-খ্যাতিতে বহু রাজা আকৃষ্ট হইয়াছেন—কিন্তু রাজকন্যার বিমাতা—নিঃসন্তান বিশাখা দেবীর পরামর্শে রাজা কোন সম্বন্ধই তাঁহার বংশমর্যাদার উপযুক্ত মনে করিতেছেন না।

মন্ত্রী শুনিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণের গৌরব যেমন শাস্ত্রজ্ঞানে রাজার গৌরব তেমনই বীরত্বে—যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার জন্য নহে।

রাজা কি ভাবিতেছিলেন।

সভাস্থ একজন বলিলেন, মহারাজা যদি কলিঙ্গ বিজয় করেন, তবে কলিঙ্গরাজের বংশ-মর্যাদাগর্ব কোথায় থাকিবে?

নীলকান্ত বলিলেন, কলিঙ্গরাজ যদি মহারাজা পুরুষোত্তম-দেবকে কন্যাদান করেন, তবে যেমন যোগ্য জামাতা লাভ করেন—তেমনই মহারাজারও বিনারক্তপাতে কলিঙ্গ বিজয় হয়। সেনাপতি ত এখনই মহারাজাকে কলিঙ্গ-বিজয়ের কথা বলিতেছিলেন।

তিনি এ বিষয়ে মন্ত্রীর মত জানিতে চাহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। কন্যা চাহিলে কলিঙ্গরাজ যদি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তবে যুদ্ধ অনিবার্য হইবে; কারণ সে প্রত্যাখ্যান অপমানই হইবে। সুতরাং যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তবে সে প্রস্তাব করা সঙ্গত।

সেনাপতি নিবেদন করিলেন, প্রস্তাব করা হউক বা না হউক—উড়িষ্যার সেনাবল সর্বদাই কলিঙ্গ বিজয় করিতে সমর্থ।

সেনাপতি রাজার দিকে চাহিলেন—রাজা তখনও কি ভাবিতেছিলেন।

সভার কার্য শেষ হইলে সভাভঙ্গের পূর্বে দশাবতার-বন্দনা গান রীতি। গায়িকারা ও বাদকরা পার্শ্ববর্তী কক্ষে প্রস্তুত ছিল; আহূত হইয়া সভাগৃহে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া জয়দেবকৃত মধুর গান গাহিল—

"প্রলয়পয়ধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্;
কেশব ধৃত মীনশরীর
জয় জগদীশ হরে॥"··· ইত্যাদি

সঙ্গীতান্তে সভাভঙ্গ হইল।

২

কলিঙ্গের রাজ-সভায় সংবাদবাহী সংবাদ দিল, উৎকল হইতে রাজদূত আসিয়াছেন। তিনি পূর্বদিন সন্ধ্যায় উপনীত হইলে রাজ্যের প্রথানুসারে তাঁহাকে সসম্মানে অতিথিশালায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; তিনি এখন সাক্ষাৎপ্রার্থী।

কলিঙ্গরাজ তাঁহাকে আনিতে বলিলে নীলকান্ত সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া রাজাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিলেন, তিনি যে কার্যের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ্য রাজসভায় প্রকাশ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

রাজা তাঁহাকে উপবিষ্ট হইতে বলিয়া রাজ্যের কার্য শেষ করিয়া সভাভঙ্গ ঘোষণা করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিয়া উৎকল-রাজের দূতকে তথায় আহ্বান করিলেন। মন্ত্রী ও তাঁহার সহকারী পূর্বেই তথায় আহূত হইয়াছিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া নীলকান্ত বলিলেন, অঙ্গে, বঙ্গে, কলিঙ্গে, সৌরাষ্ট্রে, মগধে উৎকল-রাজ পুরুষোত্তমদেবের নাম অবগত নহেন, এমন কেহই নাই। তাঁহার কীর্তিকিরণে উৎকল উদয়াস্ত-ভাস্কর-করসমুজ্জল গিরিশৃঙ্গের মত আলোকিত। তাঁহার রাজত্ব তালীবনশ্যাম উড়িষ্যার সমুদ্রকূল হইতে দিকে দিকে প্রসারিত। তাঁহার বাহুবলে বহু রাজা তাঁহার চক্রবর্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ না করিয়া রাজার সহিত সম্প্রীতিকামী—উৎকল রাজ্যের সহিত কলিঙ্গ রাজ্যের প্রীতিবন্ধন যাহাতে

কখন ছিন্ন না হয়, সেই জন্য তিনি কলিঙ্গরাজ-কন্যার পাণি সাদরে গ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন।

কলিঙ্গরাজ কোন উত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই মন্ত্রী বলিলেন, "সাধু! নীলাচলবাসী মহারাজা পুরুষোত্তমদেব তাঁহার রাজ্যে 'চলন্তীবিষ্ণু' বলিয়া সম্পূজিত। তিনি তাঁহার পিতার রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তিকথা কলিঙ্গে অবিদিত নাই। তাঁহার প্রেরিত প্রস্তাব যে শ্রদ্ধাসহকারে বিবেচ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিঙ্গরাজ যে তাহাই করিবেন, দূতকে তাহা বলা বাহুল্য।"

তিনি তাঁহার প্রভুর আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ রীতিবিরুদ্ধ। সেই জন্য তিনি কথা শেষ করিয়া রাজার দিকে চাহিলেন।

রাজা তখন দোলাচলচিত্ত। তিনি মন্ত্রীর উক্তির যাথার্থ্য বর্ণে বর্ণে অনুভব করিতেছিলেন—কিন্তু মন্ত্রীর মতে মত প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না।

প্রভুকে নির্ব্বাক দেখিয়া মন্ত্রীর মন অপ্রসন্ন হইল।

নিস্তব্ধ গৃহের স্তব্ধতা যেন পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতেছিল। এই সময় কলিঙ্গরাজ বলিলেন, "মন্ত্রী যথার্থ-ই বলিয়াছেন, এই প্রস্তাব শ্রদ্ধাসহকারে বিবেচ্য। উৎকল-রাজদূত রাজ্যের সম্মানিত অতিথিরূপে আজ আতিথ্য স্বীকার করুন—কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে নানা বিষয় বিচার করিতে হয়; আগামী কল্য আমি তাঁহার প্রস্তাবের উত্তর দিব।"

কলিঙ্গরাজ কক্ষের পশ্চাতের দ্বারের আবরণবস্ত্র সরাইয়া চলিয়া যাইলেন। এদিকে মন্ত্রীর আহ্বানে উপনীত এক জন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া উৎকলরাজদূতকে সসম্মানে লইয়া যাইলেন।

মন্ত্রীর অপ্রসন্নভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহকারী তাঁহাকে বলিলেন, তিনি রাজা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই যে প্রস্তাব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়াছেন।

মন্ত্রী বলিলেন, "তাহাতেও কোন সুবিধা হইল না; আমার মত জানিয়াও রাজা সম্মতি দিতে পারিলেন না।"

"আপনি এ কথা কেন বলিতেছেন?"

"যে পট্টমহারাণী রাজ্যের লক্ষ্মী ছিলেন—তিনি ঐ কন্যাকে রাখিয়া প্রজাদিগকেও মাতৃহীন করিয়া গিয়াছেন। তদবধি আমি কেবল অমঙ্গলের আশঙ্কাই করিতেছি। বর্ত্তমান মহারাণী রাজার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমে সব ক্ষমতা হস্তগত করিতেই ব্যস্ত। পাছে রাজকন্যার বিবাহ সুপাত্রের সঙ্গে হইলে জামাতা ক্ষমতা লাভ করে, সেই ভয়ে তিনি সকল বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাইতেছেন। আর বৃদ্ধ পুরোহিতের পুত্র তাঁহার হস্তে খেলিবার পুতুল মাত্র হইয়াছেন।"

"মহারাণীর অভিপ্রায় কি?"

"তিনি বুদ্ধিবিবেচনায় খর্ব্ব কাহারও সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিয়া আপনি প্রভুত্ব করিতে চাহেন। কিন্তু মাতৃহীনা পদ্মাবতীকে আমরা কত স্নেহেই পালন করিয়া আসিয়াছি!"

মন্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সহকারী বলিলেন, "তবে কি সেই জন্যই মহারাণী তাঁহার অমানুষ ভ্রাতুষ্পুত্রকে—"

"যে কথা মনে আছে, তাহা মুখে প্রকাশ করিও না; জানিও—হস্তের তীর আর মুখের কথা বাহির হইলে আর ফিরান যায় না; মহারাণীর বুদ্ধি অসাধারণ—তাঁহার চর সর্ব্বত্র আছে—কোন্ কথা কিরূপে কখন হয়ত বা অতিরঞ্জিত হইয়া তাঁহার কর্ণগোচর হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না।"

৩

কলিঙ্গের মহারাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিশ্রাম-কক্ষে উপনীত হইতে না হইতে পট্টমহারাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তাঁহার কুশল প্রশ্ন করিলেন।

রাজা বলিলেন, "মহারাণী, আজ সুসংবাদ আনিয়াছি।"

মহারাণী হাস্যপ্রফুল্ল ভাবে বলিলেন, "আপনি কবে সুসংবাদ ব্যতীত অন্য কিছু আনিয়া থাকেন? আপনার শাসনে রাজ্যের প্রজারা যে কত সুখে আছে, তাহা আমি প্রতিদিন লোকমুখে সুসংবাদ পাইয়া অবগত হই। আজ কি নূতন সুসংবাদ, রাজন্?"

"উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব সংবাদ পাঠাইয়াছেন; তিনি পদ্মাবতীর পাণি প্রার্থনা করেন।"

মহারাণীর মুখ গম্ভীর হইল—যেন অকাল-জলদে মধ্যাহ্ন-রবিকরোজ্জ্বল আকাশ অন্ধকার হইল। তিনি যেন এ

সংবাদ পূর্ব্বে শুনেন নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "এই সুসংবাদ! পুরীরাজের কুলশীল-পরিচয় বিবেচনা করিতে হইবে; কারণ, কন্যাকে যেমন অপাত্রে অর্পণ করা যায় না—কুলগৌরব তেমনই ক্ষুণ্ণ করা যায় না। আমি কলিঙ্গের মহারাজার পত্নী—দেবতা আমাকে সন্তান দেন নাই, কিন্তু আমি পদ্মাবতীকে অপত্যবোধেই পালন করিতেছি, তাহাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিয়া নিকটে রাখিতে আমার বাসনা যেমন স্বাভাবিক, যাহাতে তাহার বিবাহে কলিঙ্গরাজ-বংশের কুলগৌরব কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা আমার তেমনই কর্ত্তব্য।"

"পুরীরাজের বীরত্ব-খ্যাতি অসাধারণ। তিনি বহু রাজ্য জয় করিয়াছেন, বলিয়া পাঠাইয়াছেন—কলিঙ্গ আক্রমণ না করিয়া কলিঙ্গের সহিত সম্প্রীতি রক্ষা করিতে চাহেন—কলিঙ্গ রাজকন্যার পাণি প্রার্থনা করেন।"

মহারাণী যেন সহসা—ঘৃতাহুতিপুষ্ট অগ্নির মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তাঁহার প্রস্তাব চতুরের প্রস্তাব—তিনি বলে কলিঙ্গ আক্রমণ না করিয়া—কৌশলে কলিঙ্গ-রাজ্য অধিকার করিতে চাহিতেছেন—বিবাহ-প্রস্তাব ছল ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

মহারাজা মৌন বিস্ময়ে মহারাণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন—তিনি যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতেছিলেন।

মহারাণী বলিলেন, "পুরীরাজ কলিঙ্গের বল অবগত আছেন; কলিঙ্গ-বিজয় সাধ্যাতীত বুঝিয়া কলিঙ্গরাজ্য লাভ করিবার জন্য এই কৌশল করিতেছেন। তিনি যদি যুদ্ধ চাহেন—আমাদিগকে যুদ্ধই দিতে হইবে—তাঁহার প্রস্তাবের মীমাংসা যুদ্ধক্ষেত্রেই হইবে।"

যেন অগ্নিশিখা ঘৃতাভাবে নত হইয়া কেবল আলোক ও তাপ বিকীর্ণ করিতে লাগিল এমনই ভাবে মহারাণী বলিলেন, "পুরীরাজকে কন্যাদান কুলগৌরবসম্মত কি না, সে বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে কুলপুরোহিতের মত গ্রহণ প্রয়োজন।"

মহারাজা বলিলেন, "পুরোহিত মহাশয় বৃদ্ধ ও অসুস্থ—চলচ্ছক্তিরহিত; তাঁহার নিকট উপযুক্ত লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।"

তিনি গমনের উদ্যোগ করিলে মহারাণী বলিলেন, "রাজকার্য্যে আপনি শ্রান্ত—বিশ্রাম ও সেবাগ্রহণ করুন; আগামীকল্য সে ব্যবস্থা হইবে।"

"আগামীকল্যই উৎকল দূতকে উত্তর দিব প্রতিশ্রুতি দিয়াছি।"

"তবে আমি পুরোহিত মহাশয়ের পুত্রকে সংবাদ দিতেছি। তিনি বিদ্বান, বিচক্ষণ এবং পিতার শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী। তিনি বোধ হয় প্রাসাদেই আছেন—পদ্মাবতীকে প্রফুল্লতাহীন দেখিয়া আপনি সে দিন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি তাহার শুভ-কামনায় শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছি—সেই উপলক্ষে পুরোহিত-পুত্র আজ তাহা করিতে আসিয়াছেন। পদ্মাবতীই আমাদিগের স্নেহের একমাত্র অবলম্বন।"

রাজার মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল।

রাজার মতের অপেক্ষা না রাখিয়াই মহারাণী দাসীকে পুরোহিত-পুত্রকে মহারাজের নিকট আসিবার জন্য আহ্বান জানাইতে বলিলেন এবং দাসীর হস্ত হইতে ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন লইয়া স্বয়ং মহারাজকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

কলিঙ্গরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পদ্মাবতী কোথায়?"

মহারাণী বলিলেন, "আজ তাহার কল্যাণকামনায় শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছি; সেই জন্য তাহাকে দেবতার গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি।"

"তাহা হইলে পুরোহিত-পুত্র এখন কিরূপে আসিবেন?"

মহারাণী বিব্রত হইলেন, কিন্তু তখনই বলিলেন, "তিনি স্বয়ং কার্য করিতেছেন না—পাছে কোন ত্রুটি হয়, সেইজন্য তাঁহাকে তথায় থাকিতে বলিয়া আসিয়াছি।"

অল্পক্ষণ পরেই দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, পুরোহিতপুত্র আসিতেছেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন তরুণ ব্রাহ্মণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া মহারাজার জয়োচ্চারণ করিলেন।

মহারাজা তাঁহাকে প্রণাম জানাইলেন এবং তিনি আশীর্বচন জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে মহারাণী ব্যজন রাখিয়া আগন্তুকের জন্য আসন পাতিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইয়া মহারাজা কেন তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে মহারাজা বলিলেন, "পুরীর রাজা পুরুষোত্তমদেব পদ্মাবতীর পাণি প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছেন। সেই বিষয়ে আমরা আপনার মত জানিতে ইচ্ছা করি—পুরীরাজকে কন্যাদান আমার বংশের কুলপ্রথা-সম্মত কি না?"

মহারাণী মহারাজাকে ব্যজন করিতে ভুলিয়া যাইয়া কেবল পুরোহিতের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে যেন বজ্রদ্যোতক দাহিকাশক্তিপূর্ণ বিদ্যুতের দীপ্তি।

পুরোহিত-পুত্র যেন চিন্তামগ্ন হইলেন; তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন, "রাজন, আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ —কিন্তু শিক্ষারফলে তাহা যতদূর অধিগত করিতে পারিয়াছি তাহাকে বলিতে পারি, এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কবির উক্তি 'স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি', কিন্তু কলিঙ্গরাজবংশ কুলমর্যাদা সম্বন্ধে এতই সতর্ক যে, একাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যারাজ পরিবারের কোন কন্যা কলিঙ্গ রাজ-প্রাসাদে স্থান লাভ করেন নাই। সেই জন্যই লোকপরম্পরায় কথিত আছে, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবুও কলিঙ্গরাজবংশে কোন দোষ নাই। গঙ্গাবংশীয়গণ দীর্ঘকাল উড়িষ্যা শাসন করিয়াছেন; তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিলেন—রাঢ়দেশ তাঁহাদিগের পিতৃভূমি; তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ নদীমাতৃক দেশের অধিবাসী ছিলেন; তাঁহাদিগের নৌসাধনতৎপরতা অসাধারণ ছিল এবং তাঁহারা সাগরপারবর্ত্তী স্থানে যেমন উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনই হিমগিরির পরপারেও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা মৎস্যভোজী ছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সেই এক গুণরাশিনাশী দোষে তাঁহাদিগের সহিত কলিঙ্গরাজ পরিবারের কোনরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্ভব হয় নাই। কিন্তু উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয়গণের সহিত বঙ্গাগত সেই গঙ্গাবংশের রক্তের সম্মিলন হইয়াছে—তখনও সূর্য্যবংশীয় রাজগণ সিংহাসন অধিকার করেন নাই। এই অবস্থায় কলিঙ্গের রাজপরিবারের সহিত উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজার বৈবাহিক সম্বন্ধ কলিঙ্গকুলগৌরবহানিকর হইবে।"

পুরোহিত উক্তি শেষ করিয়া রাজার দিকে চাহিলেন। রাজার মুখে নৈরাশ্য ব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজার পশ্চাতে দণ্ডায়মানা মহারাণীর দৃষ্টিতে আনন্দদীপ্তি—উৎকণ্ঠার পরিচয়ের স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি পুরোহিত-পুত্রের দিকে চাহিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিলেন এবং আবার রাজাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

৪

পুরীরাজ রাজসভায় আসিলেন। গায়কদল বন্দনা গান করিল—

"রাজন, তব যশ-কৌমুদী ব্যাপ্ত জনসমাজে,
প্রখর-প্রভাকর-কিরণ গৌরব তব লাজে।
সিন্ধু তোমার বন্দনা গাহে;
সসাগরাধরা শাসন চাহে;
গগনে গগনে পবনে তোমার জয়-দুন্দুভি বাজে।
পতাকা তোমার উড়ে গিরিশিরে;
জয়ের স্তম্ভ সাগরের তীরে;
দুষ্ট দমনে শিষ্ট পালনে অনুরাগ তব রাজে।
প্রণতি তোমার দেবতা-চরণে
রত তুমি সদা তাঁহার স্মরণে
লক্ষ্মী তোমায় আশীষ করেন—চিরসুন্দর সাজে।"

গান শেষ হইলে প্রবীণ মন্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন, কলিঙ্গ হইতে রাজদূত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

রাজা হইতে দৌবারিক পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার আনীত সংবাদের জন্য উদগ্রীব। কিন্তু মন্ত্রীর মুখ চিন্তায় অন্ধকার।

নীলকান্ত আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিবামাত্র মন্ত্রী বলিলেন তাঁহার নিবেদন—দৌত্যকার্য্যের সংবাদ রাজাজ্ঞা ব্যতীত প্রচার করা নিষিদ্ধ; সে সংবাদ প্রথমে মহারাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতি শুনিয়া পরে সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

সেনাপতি বলিলেন, "সাধু।"

মন্ত্রী যে সেনাপতিরও প্রথমে সংবাদ শুনিবার কথা বলিলেন, তাহাতে এ উঁহার মুখে চাহিলেন।

মহারাজা পার্শ্ববর্ত্তী মন্ত্রণাকক্ষে গমন করিলেন এবং মন্ত্রী ও সেনাপতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রাজসভায় সকলে উদগ্রীব আগ্রহে তাঁহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—অপেক্ষার সময় যেন অতি দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল।

মন্ত্রণাকক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া পুরুষোত্তমদেব যখন সভাগৃহে প্রবেশ করিবেন, তখন তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ

ক্রোধে রক্তাভ, তাঁহার অনুসরণকারী মন্ত্রীর মুখ অন্ধকার, সেনাপতির মুখ হর্ষপ্রদীপ্ত। রাজা যখন সিংহাসনের পীঠে আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহাকে অরুণকিরণোজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গের মত দেখাইতে লাগিল। তিনি আসনে উপবিষ্ট না হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় ঘোষণা করিলেন—কলিঙ্গরাজ পুরীরাজকে অপমানিত করিয়াছেন; তাঁহার সেই উদ্ধত অবিমৃশ্যকারিতার ফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে; উৎকল কলিঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল—উৎকল বাহিনী কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিবে—সমগ্র রাজ্যে ঘোষণা করা হইবে।

তাহার পরে তিনি ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আমি জগবন্ধুর রত্নবেদী স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে যাইতেছি—"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, ক্রোধ চণ্ডাল—তাহার বশবর্ত্তী হইয়া দেবতাকে সাক্ষী রাখিয়া কোন প্রতিজ্ঞা করিতে নাই। তাহাতে—"

কিন্তু রাজা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার উক্তি শেষ করিলেন—"কলিঙ্গরাজ্য জয় করিয়া তাহা উৎকল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিব এবং কলিঙ্গ-রাজকন্যাকে বন্দী করিতে পারিলে—তাঁহার পিতার কুলমর্য্যাদাজনিতঔদ্ধত্যের প্রতিশোধে তাঁহাকে চণ্ডালে অর্পণ করিব।"

স্তম্ভিত সভার বিস্ময় অপনীত হইবার পূর্ব্বেই রাজা অভ্যস্ত স্থৈর্য্য ত্যাগ করিয়া সিংহাসনপীঠ হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মন্ত্রীর মুখে বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত বাদ্যমঞ্চ হইতে দামামার বাদ্যে যুদ্ধঘোষণার সংবাদ ঘোষিত হইল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

কোরিয়া-প্রসঙ্গ

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-এ

কোরিয়া আয়তনে প্রায় ব্রিটেনেরই মতো। সেখানে তিরিশ মিলিয়ন লোকের বসবাস। কোরিয়া উপদ্বীপটি মাঞ্চুরিয়া ও জাপানের মধ্যে অবস্থিত এবং সামরিক দিক থেকে বিচার করলে এর গুরুত্বও আছে যথেষ্ট। ভারতবর্ষের মতো কোরিয়াও কৃষিপ্রধান দেশ—শতকরা ৯০ জন লোকই কৃষক। এদের জীবনধারণের মানদণ্ড ভারতেরই দুর্দ্দশাগ্রস্ত কৃষিজীবীর মতো। শস্য ও খনিজ সম্পদের জন্য উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে নির্ভরশীল। এদের কতগুলো সামাজিক আচার-ব্যবহারের সঙ্গে ভারতবর্ষের যথেষ্ট ঐক্য আছে। বিয়ের ব্যাপারে ভারতবর্ষের অনুরূপই মা বাপের ইচ্ছানুযায়ী পাত্র-পাত্রীর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বিয়ের পূর্ব্বে স্বামী-দর্শন তাদের সৌভাগ্যে ঘটে না। মেয়েদের বিয়ের পর একা একা পথ চলার স্বাধীনতা প্রায়ই থাকে না। আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হ'য়েই তাদের পথ চলতে হয়। কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন—তারও শতবর্ষ পূর্ব্বে কোরিয়ায় ছাপাখানার প্রচলন ছিল। কোরিয়ার জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ আকাশে তারার গতিবিধি সম্বন্ধে অবিদিত ছিলেন—তাও যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ব্বে। বৌদ্ধ ও চৈনিক সংস্কৃতি দ্বারা কোরিয়ার সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রভাবান্বিত। বর্ত্তমানে অধিকাংশ কোরিয়াবাসী খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেছে।

১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া দখল করে। ফলে জাপানের শোষণ নীতির অত্যাচার থেকে কোরিয়াও অব্যাহতি পায় নি। বিগত যুদ্ধের সময় নির্ব্বাসিত কোরিয়ানরা চীনে একটি 'প্রভিসনাল গভর্ণমেন্ট' স্থাপিত করে। ১৯৪৩ সালে কায়রো কনফারেন্সে—ব্রিটেন, চীন এবং আমেরিকা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে জাপান পরাজিত হ'লে—কোরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হ'বে। ১৯৪৫ সালে মস্কো কন্‌ফারেন্সে ঠিক করা হয় যে কোরিয়া চতুর্শক্তির তত্ত্বাবধানে থাকবে। কিন্তু জাপান পরাজিত হ'লে, রাশিয়া উত্তর কোরিয়ার ভার গ্রহণ করে এবং আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়ার ভার গ্রহণ করে। ৩৮ প্যারালালের উত্তরাংশ রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে চলে যায়। যদিও এ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল—কিন্তু রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে একটু বিদ্বেষের ভাব পরিস্ফুট হওয়ায়—এ সাময়িক ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে আরও সুদৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌লো। ৩৮ প্যারালাল সম্পূর্ণ কোরিয়া উপদ্বীপটিকে বিভক্ত করে—দু'টি দলে পরিণত করে কোরিয়ানদের মধ্যে একটি বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করে তুলতেন। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির জন্য রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার করতলগত দক্ষিণ কোরিয়ার সংযোগ ও ঐক্য স্থাপনায় বিঘ্ন ঘটে।

ইউ, এন্ কমিশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৭ সালের মে মাসে দক্ষিণ

কোরিয়ায় নির্ব্বাচনের কাজ শেষ হয়। এ নির্ব্বাচনের কিছুদিন পূর্ব্বে Pyongyongএ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রচেষ্টায় 'অল কোরিয়া জয়েণ্ট পলিটিক্যাল কন্‌ফারেন্স' আহূত হয়। এখানে সিদ্ধান্ত করা হয় যে কোনো ক্রমেই দক্ষিণ কোরিয়ার এ নির্ব্বাচন সমগ্র কোরিয়ার জনগণ মেনে নিতে রাজী নয়। পৃথক ভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার এ নির্ব্বাচনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে হ'বে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচারিত সংবাদে জানা যায় যে এ কনফারেন্সে মোট ৫৪৫ জন কোরিয়ান উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে উপস্থিত ছিলেন। চীনে প্রতিষ্ঠিত কোরিয়ান প্রভিসনাল গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার ডাঃ কিম কুও এ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৯ সালে জুন মাসে ডাঃ কিম কু Seoulএ জনৈক লেফটেনাণ্ট দ্বারা নিহত হ'ন।

নানা গোলযোগের মধ্যেও নির্ব্বাচন বন্ধ রইল না। দু'জন দক্ষিণপন্থী নায়ক ডাঃ সীমান রী ও কিম বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন এবং "ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব কোরিয়া" নামে রাষ্ট্র গঠন করেন। ১৫ই আগষ্ট কোরিয়া সাধারণতন্ত্র রাজ্য বলে ঘোষিত হয় এবং কোরিয়ায় মার্কিন সামরিক শাসনের অবসান ঘটে।

দক্ষিণ কোরিয়ার নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে "কোরিয়ান পিপলস্ কমিটি" (the interim Communist-controlled Govt. in the Soviet Zone) ইতিমধ্যে সমগ্র কোরিয়ার জন্য একটি সাধারণ শাসন-তন্ত্র গ্রহণের দাবী জানায়। ১১ই সেপ্টেম্বর Pyongyongএ "ডেমোক্রাটিক পিপলস্ রিপাবলিক অব কোরিয়া" ঘোষিত হয়। এ নোতুন গভর্ণমেণ্টও কোরিয়া থেকে আমেরিকান ও সোভিয়েট সৈন্য-বাহিনীর অপসারণ দাবী করে।

সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৪৮ সালের শেষাংশে তাঁদের সৈন্য অপসারণ করেন। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে কোরিয়া থেকে আমেরিকা তাঁদের সৈন্য হটিয়ে দেন বটে, কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ান সৈন্যবাহিনীকে উপদেশ দেবার জন্য কেবল মাত্র ৫০০ শত ইউ, এস্ সামরিক অফিসার রেখে যান।

সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকা তাদের সৈন্য অপসারণের পালা শেষ করে দেওয়া সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ঐক্যের কোনোই আভাস পাওয়া গেল না। বরং বিভক্ত কোরিয়ার মধ্যে ব্যবধানই গড়ে উঠতে লাগলো: দিন দিনই গৃহযুদ্ধের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে। উত্তর কোরিয়া মিঃ কিম ইর্ সেনএর নেতৃত্বে রাশিয়া দ্বারা পরিপুষ্ট হ'য়ে এবং দক্ষিণ কোরিয়া ডাঃ সীমান রীর নেতৃত্বে আমেরিকান দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে, সংঘর্ষের সূচনায় সজীব হয়ে উঠলো। মিঃ কিম ইর্ সেন ৩৬ বছর বয়সে নোতুন প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে উত্তর কোরিয়াকে এগিয়ে নিয়ে চলছেন। মিঃ কিম গরিলা যুদ্ধে সিদ্ধহস্ত এবং দেশের জনগণের কাছে যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছেন। এমন কি দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণও তাঁর শক্তির ও বীরত্বের প্রশংসা করে থাকে। সহসা মূর্ত্তাকৃতি পরিবর্ত্তনের কৌশলে তিনি সুপটু। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ সীমান রী ৭৮ বছরের বৃদ্ধ। এ বার্দ্ধক্যের মধ্যেও তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন।

১৯৪৫ সালে জাপানের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে কোরিয়ার অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে "ডেইলি ওয়ার্কার" কাগজে মিঃ কিম স্বয়ং যা' মন্তব্য করেছেন তা নিম্নলিখিত কথাগুলো থেকে সংক্ষেপে বোঝা যাবে।

কোরিয়াকে জাপানী কবল থেকে মুক্ত করার পর ৩৮ প্যারালাল ব্যাপী কোরিয়া দু'ভাগে বিভক্ত হয়। উত্তর কোরিয়ার অধিবাসীরা নিজের দেশকে শক্তিশালী কোরে গড়ে তোলায় মনোযোগী হ'লেন। প্রজাতন্ত্র শাসনের সুব্যবস্থায় তাঁরা শিক্ষা, কৃষি ও ভূ-সংস্কারের দিকে দৃষ্টি দিলেন। কারণ জাপানের অধীনে তাঁদের স্বীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য সবই লোপ পেয়েছিল। তা' ছাড়া দেশ শাসনের জন্য উপযুক্ত কোরে তোল-বার অভিপ্রায়ে বড় বড় নেতাদের ভালো কোরে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা হ'লো। যাতে কোরে কোরিয়ার জন সাধারণের দুর্দ্দশা না থেকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে উত্তর কোরিয়া দেশ গঠনে মনোযোগী হলেন। এমন কি যুদ্ধের পরে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও যথেষ্ট উন্নত হ'য়ে দাঁড়ালো। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের দিক থেকে উত্তর কোরিয়াকে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখা-পেক্ষী হ'য়েই থাকতে হ'তো—সেদিক দিয়েও উত্তর কোরিয়া অনেকটা নির্ভরশীল হ'য়ে উঠেছে। মিঃ কিম বলেন "আমরা গভর্ণমেণ্ট ও কৃষকদের সহযোগিতায় উত্তর কোরিয়ার খাদ্য-সমস্যা সমাধান করতে পেরেছি।" উত্তর কোরিয়া যে শ্রম শিল্পে, স্কুল, ক্লাব, রিডিং রুমে—সবদিক দিয়েই পূর্ব্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে এগিয়ে গেছে—সে কথা মিঃ কিম মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। দক্ষিণ কোরিয়া সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন: "Of course the artificial division of the country hampers the development of the economy of Korea, South Korea is steadily falling into decay as a result of being enslaved and plundered by American Capital."

যাই হোক উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হ'বার পরি-কল্পনা ব্যর্থ হ'য়ে দাঁড়ালো। গৃহ যুদ্ধের সূচনা হ'লো উত্তর কোরিয়ায় মধ্যে। রাষ্ট্র-সঙ্ঘ এ বিবাদ মেটাবার জন্য তৎপর হ'লেন বটে, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ইউ, এন্ কমিশনের সঙ্গে কোনো প্রীতিকর সম্পর্ক রাখতে নারাজ হ'লেন। ৩৮ প্যারালাল ব্যাপী উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সংঘর্ষ আরম্ভ হ'লো। ইতিমধ্যে রাশিয়ার সাহায্যে উত্তর কোরিয়া সামরিক শিক্ষায় দ্রুত এগিয়ে গেল। তার ফলে, উত্তর-কোরিয়া দক্ষিণ-কোরিয়াকে আক্রমণ করবার ভয় দেখাতে লাগলো। এদিকে আমেরিকা দক্ষিণ-কোরিয়াকে প্রজাতান্ত্রিক শাসন, আর্থিক উন্নতি ও স্বাবলম্বী হ'বার ব্যাপারে শিক্ষা দানে ব্যাপৃত ছিলেন। দক্ষিণ-কোরিয়াকে রাষ্ট্রনীতি ও সামরিক শিক্ষায় সুদৃঢ় কোরে গড়ে তোলবার দিকে আমেরিকার বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। শুধু ১০০,০০০ কোরিয়ানকে সমর বিদ্যায় পারদর্শী কোরে তোলার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল মাত্র। কিন্তু যুদ্ধ করার মত সম্বল বা সামর্থ্য তাদের ছিল না। আকাশ বাহিনী বা কোনো প্রকার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তাদের আদৌ ছিল না। গৃহ যুদ্ধ যখন প্রকৃত যুদ্ধে

পরিণত হ'লো আমেরিকা তখন দক্ষিণ কোরিয়াকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য শক্তি দিয়ে সাহায্যে করতে তৎপর হ'লেন। ২৫-এ-জুন উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করলো—কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ সংগ্রামে পরিণতি লাভ করলো।

উত্তর কোরিয়ার সামরিক শক্তি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে অনেক উন্নত। উত্তর কোরিয়ায় বহু যুদ্ধ পারদর্শী সৈন্যের সমাবেশ হয়েছে। রাশিয়ান ট্যাঙ্ক, নৌবহর, বম্বার ও আকাশ বাহিনীর সাহায্যে উত্তর কোরিয়ানরা আরও শক্তিশালী হ'য়ে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ উত্তর কোরিয়াকে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। রাষ্ট্র সঙ্ঘের এ অভিযোগ সত্ত্বেও উত্তর কোরিয়ার মনোবৃত্তির পরিবর্তন হয়নি। উত্তর কোরিয়া তার অভিযান সমানভাবেই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। মার্কিনী পদাতিক সৈন্য ও আকাশ বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে অগ্রণী হ'য়েছে। ব্রিটেনের নৌবহরও দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে তৎপর হ'য়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য এবং মার্কিনী সৈন্য বাহিনী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত রয়েছে। উত্তর কোরিয়ার সৈন্য সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে এবং রণকৌশলে বিশেষ পারদর্শী। যুদ্ধ বিগ্রহে তারা কি ক'রে এতটা দক্ষতা অর্জ্জন করেছে—তা' একটু বিস্ময়ের কারণ হ'য়েই দাঁড়িয়েছে। মার্কিণী সৈন্যবাহিনীর মতো সম্মুখ সমরে উত্তর কোরিয়ার সাহায্যে রাশিয়াকে এখনো পর্য্যন্ত দেখা যায় নি বটে, কিন্তু উত্তর কোরিয়ার পশ্চাতে শক্তি যোগাবার ব্যবস্থায় যে রাশিয়া লিপ্ত তা' কারো অজ্ঞাত নয়।

কোরিয়ায় রাষ্ট্র সঙ্ঘের মর্য্যাদা হাস্যাস্পদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গত এপ্রিল মাসে রাষ্ট্র সঙ্ঘ স্থির করেছিলেন যে ৮জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত একটি দলকে কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পাঠানো হ'বে। ভারতবর্ষ, চীন এবং অষ্ট্রেলিয়াকে নিয়ে একটি সাব কমিটিও গঠিত হ'য়েছিল—যা'তে ক'রে বিভক্ত কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু এ দ্বারা কোনো সমস্যাই সমাধান হ'লো না। এ কমিটি উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়াকে একত্রিত করবার প্রস্তাব নিয়ে উত্তর কোরিয়াকে অনুরোধ জানাবে—এ সিদ্ধান্তই করা হ'য়েছিল। কিন্তু এ প্রস্তাবে দক্ষিণ কোরিয়া কোনো ক্রমেই রাজী হ'লো না—তারা এর বিপক্ষে দাঁড়ালো। কারণ রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোরিয়ায় দক্ষিণ কোরিয়াকেই একমাত্র অনুমোদিত গভর্ণমেণ্ট বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এখন উত্তর কোরিয়াকে ঐক্যের বাণী শোনাতে গেলে—তাদের মর্য্যাদাই দেওয়া হ'বে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও ২৮টি রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে নিয়েছে। ২১টি রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য দানের প্রস্তাব সমর্থন করেছে। ভারতবর্ষ খণ্ডিত কোরিয়ার পক্ষপাতী নয়, তাই দক্ষিণ কোরিয়ার গভর্ণমেণ্টকে একমাত্র কোরিয়ার গভর্ণমেণ্ট বলে স্বীকার করে নিতে পারে নি। অবশ্য সামরিক পারদর্শী নিয়োগের পক্ষে ভারতবর্ষ ভোট দিয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ তার লোক দেওয়া ন্যায়সঙ্গত মনে করেনি। কারণ, এতে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক কটু হ'য়েই উঠ্‌বে—বিশেষ ক'রে যখন ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে কোনো—সংগ্রামে লিপ্ত হ'তে চায় না। অবশ্য পরে ভারতবর্ষ কোরিয়া সম্বন্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সমর্থন করেছে। কোরিয়ায় যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় সে বিষয়ে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষের এ প্রচেষ্টা কতটা সার্থক হ'বে বলা কঠিন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ আজ দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে তৎপর হ'য়েছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অভিমত পাওয়ার পূর্ব্বেই—আমেরিকা স্বেচ্ছায় দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিনী সৈন্যের সমাবেশ ক'রে যুদ্ধ পরিচালনায় অগ্রবর্ত্তী হ'য়েছে। আমেরিকার এ সাহায্য ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করাটা হয়তো রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে গর্হিত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নীরব।

সাম্যবাদী ও ধনতান্ত্রিকদের চাপে প'ড়ে কোরিয়ায় যে সূচনা হ'লো—তার পরিসমাপ্তি কোথায় কে জানে। যদি উত্তর কোরিয়া এ যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে দাঁড়ায় তবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের গুরুত্ব কোনো ক্রমেই থাকবে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘ অসহায় হ'য়ে দাঁড়াবে আর তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা ক'রে দেবে। ব্রিটিশ দার্শনিক Bertrand Russel বলেছেন: রাশিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হ'বে আর এ তৃতীয় মহাযুদ্ধ ১০ বছর ব্যাপী চলবে। কিন্তু ব্রিটিশ সমরমন্ত্রী Ms. S. Trachey প্রকাশ করেছেন, "The knowledge that the western world will not sit by while the Communists attack Korea will greatly help to prevent the outbreak of a third world war." চার্চিল বলেছেন: "If the Communists won in Korea a third world war would be hurled upon the world." কোরিয়ার সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করে "নিউ ইয়র্ক টাইমস্" পত্রিকা বলেছেন—যদি উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ায় জয়লাভ করে তবে আমেরিকার ভবিষ্যৎ ও আমেরিকার সম্মান দু'টোই বিপদাপন্ন হ'য়ে দাঁড়াবে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া যে পৃথিবীর বুকে ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে তারও আভাস যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। এদিকে, রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিষ্টরা—Western imperialistsরাই সংগ্রামের আয়োজনে ব্যস্ত। শ্রীযুক্ত এম, এন, রায় বলেছেন, "Communism has been gaining popularity. It is not an enemy which can be combatted with arms, particularly when it can also be armed. The loss of Korea will threaten Japan and the entire line of U. S. Pacific Defence. Therefore the battle of Korea is pregnant with the most ominous possibilities. It would be a grim tragedy if the dreaded third world war broke out on the issue of what appears to be the popular case."

আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশের দৃষ্টি কোরিয়ার সঙ্গে আবদ্ধ। ঐ উপদ্বীপটি ঘিরে যে আগুন জ্বলে উঠেছে—তা পৃথিবীর সাম্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক দু'টি দলের মধ্যে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের আরও পথ নির্দ্দেশ করে দিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘ উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে আজ বদ্ধপরিকর। উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার ভেতরে বহুদূর প্রবেশ করেছে। জেনারেল ডগলাস্ ম্যাক আর্থার আমেরিকান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেই ক্ষান্ত রইলেন না। ম্যাক আর্থারকে কোরিয়ার যুদ্ধ পরিচালনা করবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে জয়েণ্ট কমাণ্ডারের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এ ব্যবস্থায় রাশিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তারা এ ব্যবস্থাকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করেছে। আমেরিকান ও দক্ষিণ কোরীয় সৈন্যরা আজ পদে পদে পরাজয় ও গ্লানির ভার বহন ক'রে চলেছে। উত্তর কোরিয়া প্রবল প্রতাপে সমস্ত বাঁধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হ'য়ে দক্ষিণ কোরিয়া গ্রাস করতে অগ্রসর হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাহায্য আজ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'তে চলেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার পতনের ইঙ্গিত ক্রমশই যেন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: If the Communists succeed in Korea, the whole of the Asian continent will come under the Red grip which will extend by stages all over the world till Russia comes face to face with America. দক্ষিণ কোরিয়ার পতনের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব যে আরও বিস্তৃত হ'য়ে পড়বে তা' নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

দেশে খাদ্যাভাব—

বর্ত্তমানে দেশে যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে, তাহাকে সরকার পক্ষ যাহাই বলুন না কেন, আমরা দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারি না। তাহার কারণ অধিক পরিমাণেই দৈবদুর্বিপাক। গত কয় মাস ধরিয়া নানাস্থানে অতিবৃষ্টি হইয়াছে। দার্জ্জিলিং জেলা বিপন্ন হইয়াছে, ফলে জলপাইগুড়ী জেলাও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও বীরভূম জেলার স্থানে স্থানে বন্যা হওয়ার ফলে বহু খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে গত কয় মাস ধরিয়া কয়েকটি জেলায় দারুণ অন্নাভাব দেখা দিয়াছে। বিহার প্রদেশে ও বাংলার সন্নিহিত কয়েকটি জেলায় গত বৎসর ভাল খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় নাই—ফলে কয়েকটি জেলায় গত ৩।৪ মাস যাবৎ অন্নাভাব চলিতেছে ও সে সকল জেলা হইতে বহুলোক পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিয়াছে। তাহার পর সম্প্রতি বন্যার ফলে উত্তর বিহারে কয়টি জেলার শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উত্তর প্রদেশেও ভীষণ বন্যায় কয়েকটি জেলার শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বোপরি আসামে ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে প্রায় সমগ্র আসাম আজ বিপন্ন—১৫ই আগষ্ট ভূমিকম্প আরম্ভ হইলেও ২৮শে আগষ্ট সংবাদ পাওয়া যায় যে হিমালয় পর্ব্বত ধ্বসিয়া ক্রমে সমগ্র সমতল প্রদেশ গ্রাস করিতেছে। ঐ ১৪ দিন প্রত্যহই কয়েকবার করিয়া ভূকম্পন হইয়াছে ও বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সহর, গ্রাম, চা-বাগান, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথায় দারুণ খাদ্যাভাব উপস্থিত—সমগ্র রেলপথ নষ্ট হওয়ায়, নদী সরিয়া যাওয়ায় এবং পথ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার উপায় নাই। কোন কোন স্থানে হয়ত খাদ্যশস্য মজুত আছে, কিন্তু সেই মজুত খাদ্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ প্রায় অসম্ভব। বিমান যোগে খাদ্যহীন স্থানে খাদ্য প্রেরণ করা হইতেছে—কিন্তু সে ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক হইতে পারে না। আমরা পশ্চিম বাংলার সমস্যা লইয়া এত বিব্রত যে সে কথা চিন্তাই করিতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেশন অঞ্চলে চাউলের বরাদ্দের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছেন—হয়ত চাউল আরও কমাইয়া দিবেন। চাউলের পরিবর্ত্তে গম দেওয়া হইতেছে—অষ্ট্রেলিয়া হইতে সে জন্য প্রচুর গম আনয়ন করা হইয়াছে। রেশন এলাকার বাহিরে সর্ব্বত্র ৪০।৫০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে—এত অধিক দাম দিয়া চাউল ক্রয় করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই লোক অখাদ্য খাইয়া মরিতে বসিয়াছে। অখাদ্য খাইয়া লোক উদরাময়ে প্রাণত্যাগ করিলে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তাহা দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু বলিয়া স্বীকার করেন না—অথচ—ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, সে মৃত্যুর কারণ অন্নাভাব ছাড়া আর কিছুই নহে। পশ্চিমবাংলা ছাড়াও আজ ভারতে বহু প্রদেশে অন্নাভাব, কাজেই বাহির হইতে চাউল আমদানী হইলেও পশ্চিমবঙ্গ তাহার মাত্র সামান্য অংশ পাইতে পারে। এ অবস্থায় সরকারের পক্ষেও চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। যে সকল স্থানে গম পাওয়া যাইবে, সে সকল স্থানের লোক দুই বেলা আটা খাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিবে—কিন্তু যেখানে গমও মিলিবে না, সেখানে লোক গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই পাইবে না। গত বৎসর আলুও ভাল হয় নাই—এ বৎসর আউস ধানের ফসলও আশাপ্রদ নহে। চাষীর অভাবে তরিতরকারীও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না—আশ্বিন, কার্ত্তিক—দুই মাসে খাদ্যের অভাবে অখাদ্য খাইয়া বহুলোক মারা যাইবে। এখন আর তাহাদের বাঁচাইবার কোন উপায় করা সম্ভব নহে। পশ্চিমবাংলার প্রতি জেলাতেই লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের অবস্থা শোচনীয়। কলিকাতা সহরের অবস্থা বর্ণনাতীত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত প্রত্যহ কয়েক হাজার করিয়া হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় আগমন

করিতেছে। ২৪ পরগণার কারখানা-বহুল অঞ্চলসমূহে অধিবাসীর সংখ্যা সর্ব্বত্র দ্বিগুণ হইয়াছে। অন্যান্য স্থানেও বহু আশ্রয়প্রার্থী শিবির বা নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠার ফলে সর্ব্বত্র ভীষণ খাদ্যাভাব। নদীয়ায় পাকিস্তানীদের আগমনে তথায় চালের মণ ৫০ টাকা—তাহাও সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না—মুর্শিদাবাদের বিবরণ আমরা বিস্তৃত ভাবে অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি। এ অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা ভাবিয়া পাই না। পশ্চিমবাংলার খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই—তাহা তিনি বহুবার স্বীকার করিয়াছেন। দেশের লোক এত অধিক দুর্নীতি-পরায়ণ যে সামান্য মাত্র সুযোগ লাভ করিলেই তাহারা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর দুঃখ বাড়াইয়া দিয়া থাকেন। এ বিষয়ে সরকারী চেষ্টা এখনও অধিক ব্যাপক হয় নাই। দুর্নীতি-নিবারণ বিভাগও হয়ত দুর্নীতিপরায়ণ—সুতরাং কে আমাদের এই দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিবে?

স্বাধীনতা দিবস—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাহা তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গত ১৫ই আগষ্ট রাষ্ট্র পরিচালকগণ দেশের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবস উৎসব পালন করিয়াছেন। কিন্তু এই উৎসবের সহিত দেশের জনগণের কোন সম্পর্ক ছিল না। আমরা তিন বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীন হইলেও বর্ত্তমান রাষ্ট্র পরিচালকগণ নানা কারণে আমাদের কোন সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, বরং আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা তাঁহাদের অব্যবস্থার ফলে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। যে মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহারা জাতির জনক বলিয়া স্বীকার করেন, যাঁহার চিত্র রাষ্ট্রপরিচালকদের প্রতি গৃহে রক্ষিত হইয়াছে, তাঁহার আদর্শ কোথাও রক্ষিত হয় না। তিনি দেশকে যে ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের আদর্শশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সে আদর্শ আজ কি কেন্দ্রে, কি প্রদেশে কোথাও সম্মানিত হয় না। শাসন ব্যবস্থার ব্যয় দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে ও তাহার পরিবর্ত্তে দেশবাসী জনগণের কষ্টও সমানে বাড়িয়া চলিয়াছে। জনগণ আজ পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—পরিবার কাপড় পায় না। খাদ্য ও বস্ত্রের দাম এত অধিক যে জনগণের পক্ষে তাহা ক্রয় করা অসম্ভব। গান্ধীজি সে সাম্যবাদের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোথাও নাই। এখনও বৃটীশ রাজত্বের সময়ের মত ধনিক সম্প্রদায়কে তুষ্ট করিবার জন্য শ্রমিকের উপর নির্য্যাতন সমভাবেই চলিতেছে। ধনিকের অর্থ দরিদ্রের কল্যাণের জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলে তবেই দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব—তাহার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। এই অবস্থায় দেশের জনগণ স্বাধীনতা দিবস উৎসবে যোগদান করে নাই। কলিকাতা সহরের লোক পর্য্যন্ত সে দিন উৎসবে যোগদান করে নাই—সহরতলী বা গ্রামের কথা ত বলাই বাহুল্য মাত্র। বারাকপুরে গান্ধী ঘাটে সে দিন যে উৎসব হইয়াছিল তাহাতে গভর্ণর ডাঃ কাটজু, প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, মন্ত্রী নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি ও মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর যোগদান করিলেও তথায় অধিক লোক সমাগম হয় নাই। অন্যান্য বহু স্থানে সরকারী ব্যয়ে খাবাপিনা হইয়াছিল—কিন্তু দরিদ্র জনগণের তাহাতে কোন লাভ হয় নাই। যতদিন না দেশের জনগণের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হয়, যতদিন না তাহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা হয়, যতদিন না লক্ষ লক্ষ গৃহহীন বেকার লোকের গৃহ ও কর্ম্মসংস্থান হয়, ততদিন দরিদ্র জনগণ স্বাধীনতার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে না—কোন উৎসব করা ত তাহাদের নিকট বাতুলতা মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ জন্মোৎসব—

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসবের দিনে ভারতের সর্ব্বত্র ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের ৭৯তম জন্মদিবস উৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ গত প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া তাঁহার পণ্ডিচারীস্থ আশ্রমে থাকিয়া যে সাধনা করিতেছেন, তাহা মানবকল্যাণ সাধন করিবে বলিয়া লোক বিশ্বাস করে। সেজন্য ঐ দিন লোক শ্রদ্ধার সহিত শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া তাঁহার জন্মদিবস পালন করিয়াছে। কলিকাতা নিখিল ভারত শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব মহোৎসব কমিটীর পক্ষ হইতে ঐ দিন ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও সকালে কলিকাতা ৯২ ল্যান্সডাউন রোডে শ্রীঅরবিন্দ সংস্কৃতি-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বিকালে ২৩৭ লোয়ার সার্কুলার রোডে 'রজনী' গৃহে শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দিরের উদ্যোগেও

সত্তা হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা এই দুর্গত দেশকে রক্ষা করুক ও দেশবাসীর মনকে কলুষ মুক্ত করুক, সেদিন সকলেই এই প্রার্থনা করিয়া উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

ডাক্তার নীলরতন সরকার—

ডাক্তার নীলরতন সরকার কলিকাতায় শুধু একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন না, তিনি দেশপ্রেমিক নেতা ও খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাহার স্বোপার্জ্জিত বহু অর্থ নানাভাবে দেশের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্বাধীন বাংলা সরকার কলিকাতা ক্যাম্বেল কলেজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ' নামকরণ করিয়াছেন। নীলরতন ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন ও তাহার উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কাজেই তাঁহার নামের সহিত ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত করায় উপযুক্ত কাজই করা হইয়াছে। ঐ ভাবে বাংলার বহু মনীষীর কথা আমরা স্মরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। নীলরতনের দান দেশবাসীর পক্ষে বিস্মৃত হইবার কথা নহে। আমরা সরকারের এই কার্য্যে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

উড়িষ্যায় ভীষণ বন্যা—

আমরা মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামে দৈবদুর্বিপাকের ফলে অন্নাভাবের কথা অন্যত্র প্রকাশ করিলাম। গত আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে উড়িষ্যার মহানদী, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, ভার্গবী, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীর বন্যার ফলে বালেশ্বর, কটক ও পুরী জেলার বহু স্থানে ধান একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বালেশ্বর জেলার যে সকল স্থানে খুব বেশী পরিমাণ ধান হইত, সে সকল স্থান ভাসিয়া গিয়াছে। উড়িষ্যার মন্ত্রী শ্রীরাজকৃষ্ণ বসু ঐ সকল অঞ্চল দেখিয়া আসিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মর্ম্মন্তুদ। এ বিষয়ে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গে টালীগঞ্জ, গড়িয়াহাট, যাদবপুর, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোড, কৃষ্ণনগর, হাওড়া হোম ও কার্সিয়াংয়ে বৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্রে মোট ২০২৮ জন শিক্ষার্থীকে কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিল্পোন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধান এই শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কারণ। মোট ২৫ হাজার প্রার্থীর মধ্যে ৭টি কেন্দ্রে ২০২৮ জন শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হয়। প্রার্থী নির্ব্বাচনের জন্য একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যুক্ত চেষ্টায় এই ব্যবস্থা প্রশংসনীয়—ইহা দ্বারা প্রার্থীরা মোটর-মেকানিক, ড্রাফট্‌সম্যান, সার্ভেয়ার, জেনারেল মেকানিক, কার্পেণ্টারী প্রভৃতি কাজ শিক্ষা করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি—

১৯৫০ সালের জানুয়ারী হইতে জুন এই ৬ মাসে ভারতে কয়লা, ইস্পাত, লবণ, সিমেণ্ট, কাগজ, ডিজেল এঞ্জিন, বাইসাইকেল, বিদ্যুৎচালিত মোটর, ইলেক্‌ট্রিক ট্রান্সফরমার প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ২৫টি শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ঐ সময়ে বৈদ্যুতিক পাখা, হারিকেন লণ্ঠন, সালফিউরিক এসিড, কষ্টিক সোডা, সোডা এ্যাস, ব্লিচিং পাউডার, সিগারেট, প্লাইউড, লিকুইড ক্লোরিণ প্রভৃতির উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। হিসাবে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির সংবাদ থাকিলেও দেশে লবণ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির সংবাদ প্রকাশিত হইলেও, বস্ত্রের মূল্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। বোম্বায়ে বস্ত্র শিল্প শ্রমিক ধর্ম্মঘটে হয়ত বস্ত্র আরও দুষ্প্রাপ্য হইবে। দেশলাই, সাবান, পশমজাত দ্রব্য, এনামেলওয়ার প্রভৃতির উৎপাদন হ্রাস দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না।

দামোদর পরিকল্পনা—

দামোদর পরিকল্পনা সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীফুলন-প্রসাদ বর্ম্মা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে গত মে মাসে পর্য্যন্ত ঐ পরিকল্পনায় মোট ৯ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। পরিকল্পনায় নিযুক্ত কর্ম্মীদের প্রাদেশিকতা অনুযায়ী নিয়োগ করা হয় বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাও ঠিক নহে। তথায় ৮১৭ বাঙ্গালী, ৬১৭ বিহারী ও ১৯৮ অন্য দেশের কর্ম্মচারী কাজ করিতেছে। পরিকল্পনায় অর্থব্যয়ের তুলনায় দেশবাসী কিরূপ উপকৃত হইতেছে বা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইলে দেশবাসী আশ্বস্ত হইতে পারে।

মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ দিবস—
মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাটীর
সম্মুখে খাদ্য দাবীর সভায় সমবেত
বুভুক্ষু জনতার এক অংশ

মুর্শিদাবাদ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ দিবসের
অপর এক মর্মন্তুদ দৃশ্য—
বুভুক্ষু জনতার নেতা দিলীপ
সিংহকে এবং আরো অনেককে
পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ—

কলিকাতাস্থ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ গত ৩৪ বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের জন্য আন্দোলন চালাইয়া কার্য্য করিতেছেন। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশন পরিষদকে কলিকাতা শ্যামবাজার ১৬৮।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে ৫ কাঠা জমী দান করিলে তথায় গৃহ-নির্ম্মাণের আয়োজন হয়। সে সময় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গৃহ-নির্ম্মাণের অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাহার পর মহাযুদ্ধের ফলে সে কাজ অগ্রসর হয় নাই। সম্প্রতি আবার সে কাজ আরম্ভ হইয়াছে—গৃহ সম্পূর্ণ করিতে ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। আমরা দেশবাসী সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে এই কার্য্যে সাহায্য দান করিতে অনুরোধ করি। ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদকে পুষ্ট করা

প্রয়োজন। কলিকাতা—৭, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীটে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট সাহায্য পাঠাইতে হইবে—তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক।

উত্তর প্রদেশে ভীষণ বন্যা—

উত্তর প্রদেশে গঙ্গা, সরযূ প্রভৃতি ৮টি নদীতে বন্যার ফলে প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে ২৩ শত গ্রাম জলপ্লাবিত হইয়াছে। বন্যায় প্রায় ৫ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বহু খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়াছে। বিপদ কখনও একা আসে না—আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তাই একই রকম দুরবস্থা দেখা যাইতেছে।

আসাম গভর্ণরের আবেদন—

আসামে ভূমিকম্প ও তজ্জনিত বন্যা প্রভৃতির ফলে লক্ষ লক্ষ লোক দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও স্থির করা সম্ভব নহে—১৫ই আগষ্ট হইতে ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে, এখনও বন্ধ হয় নাই। বহু উচ্চস্থান নিম্ন হইয়া জলপ্লাবিত হইয়াছে, বহু নদীগর্ভ উচ্চ হইয়া ডাঙ্গা জমীতে পরিণত হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চ চূড়া ধ্বসিয়া সমতল ভূমিতে পতিত হওয়ায় সহর ও গ্রাম চাপা পড়িয়াছে। ভূনিম্ন হইতে খনিজ ধাতু নির্গত হইয়া বহু স্থান ধ্বংস করিয়াছে। এ অবস্থায় আসামের গভর্ণর শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম এক আবেদন প্রচার করিয়া সাহায্য তহবিল খুলিয়াছেন এবং সকল সমর্থ ব্যক্তিকে ঐ তহবিলে দান করিয়া দুর্গতদের সাহায্য করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এ আবেদনে সকলেই সাড়া দিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

প্রেসিডেন্সী জেলে উৎসব—

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ১৯০৮-৯ সালে এক বৎসরকাল কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলের যে ঘরে বিচারাধীন আসামীরূপে বাস করিয়াছিলেন, গত ২২শে আগষ্ট সেই ঘরের সম্মুখে একটি মার্ব্বেল প্রস্তরে ঐ ঘটনার কথা লিখিয়া রাখা হইয়াছে। সে দিন উৎসবে গভর্ণর শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু ও মন্ত্রী শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার উদ্যোগী ছিলেন এবং ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রস্তরের আবরণ উন্মোচন করেন। এইভাবে জেলের ঐ ঘরটি পবিত্র করা হইয়াছে এবং উহা বর্ত্তমানে এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। জেলের কয়েদীদের কাছেও উহা সুফলদায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণী—

গত ১৫ই আগষ্ট পণ্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ৭৯তম জন্ম দিবসে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন যে—বর্ত্তমানে জগতের অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়া ও পরে ভারতবর্ষ কম্যুনিষ্টদের অধীন হইবে। ক্রমে সমগ্র জগৎ কম্যুনিষ্টদের হস্তগত হইবে। শ্রীঅরবিন্দের এই ভবিষ্যদ্বাণী সকলকে চিন্তান্বিত করিবে সন্দেহ নাই।

বোম্বায়ে বিপুল ধর্ম্মঘট—

বোম্বায়ে ৬২টি কাপড়ের কলের মধ্যে প্রায় সকল গুলিতেই শ্রমিক ধর্ম্মঘট চলিতেছে। মোট শ্রমিক সংখ্যা ১ লক্ষ ১৫ হাজার—কয়েক হাজার ছাড়া সকলেই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। ৬২টি কলে প্রত্যহ ৪২ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইত—সমাজতন্ত্রী দল এই ধর্ম্মঘট চালাইতেছে। ১৪ই আগষ্ট হইতে উহা চলিতেছে। বোম্বাই সরকার ঐ ধর্ম্মঘটকে উদ্দেশ্যবিহীন ও অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ইহার ফল যে কিরূপ সাংঘাতিক, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আদালত হইতে ২ মাসের বেতন বোনাস দিতে বলা হইয়াছিল—শ্রমিকগণ ৩ মাসের বেতন বোনাস দাবী করার ফলেই এই ধর্ম্মঘট হইয়াছে।

ধুবুলিয়া বাস্তুহারা কেন্দ্র—

কলিকাতা হইতে ৭০ মাইল দূরে নদীয়া জেলার ধুবুলিয়ায় সরকারী চেষ্টায় ৫৩ হাজার বাস্তুহারার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার অধিবাসী ছিল। তন্মধ্যে ২১ হাজার স্ত্রীলোক ও ১০ হাজার শিশু। তথায় ৩৩৮টি কৃষক পরিবার, ১৬৬৫টি ছোট-ব্যবসায়ী পরিবার, ৮৫০টি বারুজীবী পরিবার, ৮২৩টি মৎস্যজীবী পরিবার ও ৫৩৬টি চাকরীজীবী পরিবার স্থান পাইয়াছে। ৮৫টি পুরোহিত পরিবার, ১ শত প্রাথমিক-স্কুল-শিক্ষক পরিবার, ১৩টি মধ্য ইংরাজি স্কুল-শিক্ষক পরিবার, ৩টি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়-শিক্ষক পরিবার ও ১৯টি দলিল-লেখক পরিবার ও তথায় আছেন। ১৫৫ জন ছুতার, ১৩০ জন কুম্ভকার, ২৩৫ জন তাঁতী, ৫৩ জন গোয়ালা, ৪৪ জন দরজী, ৭ জন মুচি, ১১ জন মোটর চালক, ৪ জন

ধোপা, ৭৭ জন নাপিত, ২০ জন মোদক, ১৬ জন শাঁখারী, ১০ জন মেকানিক ও ২৫ জন বিড়িওয়ালাও আছেন। ঐ স্থান হইতে মালদহে ২১৩ পরিবার, আন্দামানে ৩৮ পরিবার, মেদিনীপুর পিয়ারাডোবায় ৪৩ পরিবার, নদীয়া করিমপুরে ৩২৭ পরিবার, নদীয়া তেহট্টে ১৪৪ পরিবার, কুচবিহারে ১৩, মুর্শিদাবাদ নেহালিপাড়ায় ৬টি পরিবার, প্রেরিত হইয়াছে। সেদিন প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও বলিয়াছেন মহীশূর রাজ্যে ৪০ হাজার বাস্তহারা ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ৫০ হাজার বাস্তহারা প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিহার ও উড়িষ্যায় ইতিমধ্যে ৩৬ হাজার বাস্তহারা প্রেরণ করা করা হইয়াছে। এইভাবে বাস্তহারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হইলেও সমস্যা এত বিরাট যে ইহার সমাধান এখনও পর্য্যন্ত সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

পশ্চিমবঙ্গে কুটীর শিল্প ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কুটীর শিল্প ও ছোটখাট শিল্প সম্পর্কে যে নীতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—(১) উৎপাদনের উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ দ্বারা নির্ম্মাণ কৌশলের উন্নতি বিধান (২) বিভিন্ন ছোটখাট শিল্পে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য শিল্প ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন (৩) আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা (৪) কুটির শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে আনয়ন ও প্রচার সম্পর্কে সুবিধার ব্যবস্থা (৫) উৎপাদন কেন্দ্রে সুলভ মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ (৬) বৃহৎ যান্ত্রিক শিল্পের তুলনায় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা (৭) ভারত সরকারের নীতি ও কার্য্য সূচী অনুযায়ী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে কুটীর ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে উৎপাদনের ক্ষেত্র নির্দ্ধারণের চেষ্টা। এ বিষয়ে কয়েকটি উপদেষ্টা কমিটীও গঠিত হইয়াছে—যথা—(১) পশ্চিমবঙ্গ কুটীর শিল্প বোর্ড (২) পশ্চিমবঙ্গ হস্তচালিত তাঁত শিল্প বোর্ড (৩) পশ্চিমবঙ্গ খাদি বোর্ড ও (৪) পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্প বোর্ড। শিল্প বিভাগের অধীন ৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ও তাঁহারা ৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। সরকারী শিল্প বিভাগের প্রচার-কার্য্য ভাল ভাবে সম্পাদিত হইলে লোক ঐ সকল শিল্পে সাহায্য লাভ করিয়া উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ করিতে পারে।

খাদ্যাবস্থার উন্নতির পরিকল্পনা—

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু দিল্লীতে সকল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীকে এক সম্মিলনে মিলিত করিয়া দেশের খাদ্যাবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। গত ২০শে আগষ্ট ঐ বৈঠক শেষ হইয়াছে। সর্ব্বত্র যাহাতে একইরূপ খাদ্যনীতি গৃহীত হয়, তজ্জন্য বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রধানত যুদ্ধকালীন খাদ্যোৎপাদন ও খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশে একরূপ খাদ্যনীতি অনুসরণ, তৎপরতার সহিত আত্মনির্ভরশীল হইবার পরিকল্পনা অনুসরণ, ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত অঞ্চল নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন প্রদেশে ও রাজ্যে নিয়ন্ত্রণাধীন সর্ব্ববিধ শস্য ব্যাপকভাবে সংগ্রহ, বিভিন্ন রাজ্যে মজুতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন, খাদ্য সম্পর্কিত নীতি যথাযথভাবে কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্যশস্যের মূল্যের সমন্বয় সাধন ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে চিনির কলগুলিতে ইক্ষু সরবরাহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই বৈঠকের ফলে যদি ভারতবাসী উপযুক্ত পরিমাণে ভাল খাদ্য পায়, তবেই বৈঠক সার্থক হইয়াছে মনে করা হইবে।

পার্লামেণ্টে খাদ্য সম্পর্কে বিল—

গত ১৪ই আগষ্ট দিল্লীতে ভারতীয় পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান অধিবেশন শেষ হইবার পূর্ব্বে খাদ্যসচিব শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সীর খাদ্য বস্ত্র সম্পর্কিত বিল পাশ হইয়াছে। ঐ বিলে খাদ্যশস্য মজুতকারী ও খাদ্য বিক্রয়ে মুনাফাখোরদের এবং বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। কেহ খাদ্য বা অনুরূপ প্রয়োজনীয় জিনিষ অন্যায় ভাবে মজুত করিলে তাহার মজুত মালের মূল্যের ২০ গুণ অর্থদণ্ড করা হইবে। আইন যদি কার্য্যে পরিণত করিয়া দেশের দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়, তবে লোক অনাচার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের প্রতিষ্ঠা উৎসব—

গত ৮ই ভাদ্র শুক্রবার কলিকাতা লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়াছিল। গভর্ণর ডাক্তার

কাটজু সভাপতিত্ব করেন। বর্ত্তমানে ঐ কলেজের ছাত্রী সংখ্যা ৫৪০ জন। ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী কলেজের প্রিন্সিপাল। কলেজের আই-এস্‌সি বিভাগ সম্প্রসারণ ও বি-এস্‌সি বিভাগের উদ্বোধন অবিলম্বে প্রয়োজন। কলেজের ছাত্রাবাসটি বড় করিলে আরও বহু ছাত্রীর স্থান হইতে পারে। গভর্ণর তাঁহার বক্তৃতায় ছাত্রীদিগকে সীতার আদর্শ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বন্যায় হুগলী জেলার ক্ষতি—

দামোদর, দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী নদীতে বন্যার ফলে হুগলী জেলার শতাধিক বর্গমাইল পরিমিত স্থানের ধান ও পাট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু বাসগৃহ ও গবাদি পশু নষ্ট হইয়াছে। আরামবাগ মহকুমাতেও ৩০ হাজার বিঘা জমী প্লাবিত হওয়ায় আমন ধান ও পাট নষ্ট হইয়াছে। এ বৎসর দেশের সর্ব্বত্র দৈবদুর্ব্বিপাক—কে দেশবাসীকে রক্ষা করিবে?

পশ্চিমবাংলার খাদ্যাবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গত ৩০শে আগষ্ট বেতারে এক বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—এই বৎসরের (১৯৫০) কয়েক মাস ও আগামী বৎসরের পুরা ১২ মাস পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা দারুণ সঙ্কটজনক থাকিবে। তবে সে জন্য কেহ যেন খাদ্য মজুত না করে। ব্যবসায়ী ও কৃষকদের সাবধানতার সহিত কাজ করিতে হইবে। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ৮ মাসে ৩০ লক্ষ বাস্তহারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। তাহার উপর দৈবদুর্ব্বিপাকে বাংলার বহু খাদ্য নষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পাটের চাষ বাড়াইবার জন্য বহু জমিতে আউস ধানের চাষ হয় নাই। এ অবস্থায় দেশবাসীকে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সকল দিক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। অযথা খাদ্যের জন্য আন্দোলন করিলে তাহা কুফল ছাড়া সুফল উৎপাদন করিবে না।

লেক হাসপাতাল ও কলেজ বন্ধ—

সরকার পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে আগামী ১৯৫২ সালের জুলাই মাস হইতে কলিকাতা লেক মেডিকেল কলেজ ও তাহার হাসপাতাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। উহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বার্ষিক সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা ও কেন্দ্রীয় সরকার বার্ষিক সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিতেন। লেক হাসপাতালে ৩০৭টি বেড আছে। কলেজ ও হাসপাতাল দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসীদের বহু উপকার সাধন করিয়া থাকে। বাংলা দেশে চিকিৎসা-ব্যবস্থা এখনও প্রয়োজনানুরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। কাজেই একটি চলতি হাসপাতাল বন্ধ করার সার্থকতা আমরা বুঝি না। কলিকাতায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে আরও বহু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া দেশবাসীর কল্যাণ সাধন করিবেন।

কলিকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা—

গত ৩১শে আগষ্ট এক সাংবাদিক সম্মিলনে কলিকাতায় টেলিফোনের অব্যবস্থার কারণের বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। জানা গিয়াছে—সহরে নূতন ৩টি একস্‌চেঞ্জ শীঘ্রই খোলা হইবে—তাহাতে নূতন ৮ হাজার লাইনে কাজ হইবে—'জোড়াসাঁকো'তে ৩৩১০ লাইন, 'ব্যাঙ্কে' ৪ হাজার লাইন ও রসায় এক হাজার নূতন লাইন হইবে। 'পানিহাটী' ও 'চন্দননগরে' ২টি নূতন একস্‌চেঞ্জ খোলা হইবে ও 'বজবজ' একস্‌চেঞ্জ স্থানান্তরিত করিয়া এখানে অধিক কাজের ব্যবস্থা হইবে। হাওড়া, বড়বাজার, সাউথ ও পার্ক একস্‌চেঞ্জের কাজও যাহাতে ভাল হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। বর্ত্তমানে টেলিফোনে কথা-বলা এক ঝকমারির কাজ হইয়াছে—টাকা দিয়া ঐরূপ দুর্গতি ভোগ করা সত্যই নক্কারজনক। সত্বর ব্যবস্থার উন্নতি হইলে লোক উপকৃত হইবে।

নূতন সঙ্গীত শিক্ষালয়—

গত ১৯শে আগষ্ট কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে 'শ্রীকলা সঙ্গীত ভারতী' নামে একটি উচ্চ সঙ্গীত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য উহার উদ্বোধন করেন। কাশীর মহারাজা ঐ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের জন্য দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। সঙ্গীত-মার্ত্তণ্ড পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর নূতন শিক্ষালয়ের প্রিন্সিপালের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের এই ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ করা হইল।

মধ্যবিত্ত সমাজে বেকার সমস্যা—

ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিতেছে। শিল্পপ্রধান সহর অঞ্চলে প্রায় দুই লক্ষ বেকার তালিকাভুক্ত আছে। তাহা ছাড়া তালিকাবহির্ভূত বেকারের সংখ্যা উহার প্রায় ৪ গুণ হইবে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যেই বেকারের সংখ্যা অধিক। ১৮ হইতে ২২ বৎসরের কলিকাতাবাসী ৩০ হাজার যুবক বেকার হইয়া আছে। এই সমস্যা সমাধানের কোন উপায় দেখা যায় না। মানুষকে কৃষিমুখী করিয়া গ্রামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে ইহাদের মধ্যে একদল বেকারের কর্ম্ম সংস্থান হইতে পারে। ৬ শত ভদ্র যুবক দামোদর পরিকল্পনায় মাটী কাটার কাজ গ্রহণ করিয়াছে। এই বেকার সমস্যার সমাধান না হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবন কখনই উন্নত হইবে না।

যক্ষ্মা রোগ ও তাহার প্রতিকার—

ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মারোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ও যাদবপুরে যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি এক বিবরণে জানাইয়াছেন—যক্ষ্মারোগে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ লোক মারা যায়। জনাকীর্ণ সহরে আলো-বাতাসহীন ঘরে বসবাস স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। ভারতে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ, কিন্তু মাত্র ৭।৮ হাজার রোগীকে হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার রায় প্রস্তাব করিয়াছেন—সহর ও সহরতলীতে স্কুলগৃহগুলি রাত্রিতে খালি পড়িয়া থাকে—জনবহুল বাড়ী হইতে লোকজনকে ঐ সকল স্কুলে লইয়া রাত্রিতে বাস করিতে দেওয়া উচিত। আমরা এ বিষয়ে জনসাধারণের ও বিশেষ করিয়া সমাজ-সেবী কর্ম্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বৃটেনকে এসিয়া ত্যাগের অনুরোধ—

খ্যাতনামা ইংরাজ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ শেষ করিয়া ২৫শে আগষ্ট সিঙ্গাপুর গমন করেন। তথায় তিনি বলিয়াছেন—বৃটেন যেমন ভারত ত্যাগ করিয়াছে, তেমনই সমগ্র এসিয়া ত্যাগ করিয়া তাহার চলিয়া আসা উচিত। যুদ্ধ হইলে তাহারা বিতাড়িত হইবে—ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের অপেক্ষা করা উচিত নহে। বৃটেন এসিয়া ত্যাগ করিয়া আসিলে তাহার শুভেচ্ছা অর্জন করা সম্ভব হইবে ও পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে এসিয়া-রাষ্ট্র-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিবে।—রাসেলের এই উক্তি সকলের অনুধাবন করা প্রয়োজন। এসিয়ায় যদি নেহরুর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে হয়ত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা হইবে।

পশ্চিম বাংলার দাবী—

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গত ২০শে আগষ্ট দিল্লীতে যাইয়া বলিয়াছেন—আউস ফসলের জমি পাট চাষে নিয়োগ করায় পশ্চিমবঙ্গের ধান্য ফসলের যে পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, তাহা পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে ৬১ হাজার টন চাউল পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করিতে হইবে। ঐ দিন পশ্চিমবঙ্গের সেচ সচিব শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় দিল্লীতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন—১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে সীমান্তবর্ত্তী জেলা সমূহে যে সমস্ত রাস্তা বা পথ নষ্ট হইয়াছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সে সকল স্থলে নূতন পথ নির্ম্মাণের জন্য ৫ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন। উহার কতক সাহায্য হিসাবে ও কতক ঋণ হিসাবে দিতে হইবে। নানা কারণে সীমান্তের পথগুলি এখনই নির্ম্মিত হওয়া প্রয়োজন। খাদ্য সম্বন্ধে আজ কোন কথা না বলাই ভাল। পশ্চিমবঙ্গ উপযুক্ত চাউল না পাইলে এ দেশে বহু লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে।

ভারতের ডেপুটী হাই কমিশনার—

ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটী হাই কমিশনার শ্রীসন্তোষকুমার বসুর কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় আসামের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব এবং পরে সরবরাহ ও উন্নয়ন সচিব শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সেই স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯০০ সালে নদীয়া জেলায় বৈদ্যনাথবাবুর জন্ম হয়। ১৯২৪ সালে আসামের রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তদবধি তিনি আসামে বাস করিতেছেন।

কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার—

গত ২৬শে আগষ্ট কলিকাতা যাদবপুরে কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগারের দ্বার উদ্ঘাটন উৎসব হইয়াছে। গভর্ণর ডক্টর কাটজু উৎসবে সভাপতিত্ব করেন ও প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উদ্বোধন করেন। বাঙ্গলাই কাচ ও মৃৎশিল্পের প্রধান কেন্দ্র—কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার

বাংলায় এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। ভারতে আর কোথাও এই ধরণের গবেষণাগার নাই—কাজেই ইহা দেশের প্রকৃত উপকার সাধনে সমর্থ হইবে বলিয়া সকলে মনে করেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব্ব চিফ সেক্রেটারী শ্রীযুত সুকুমার সেন সর্ব্বভারতীয় নির্ব্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হইয়া কাজ করিতেছেন ও সত্বর যাহাতে নির্ব্বাচন হয় সে জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। পশ্চিমবাংলা হইতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে ২৩৮ জন ও কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে ৩৪ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রাদেশিক পরিষদের আসন আরও ৫টি বৃদ্ধি করার কথা চলিতেছে। এদিকে ভোটদাতার তালিকা এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এখন যে ভাবে কাজ চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় ১৯৫১ সালের বর্ষার পর অক্টোবর মাসে নির্ব্বাচন হইবে। যে ভাবে কাজ চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় বর্ত্তমান শাসকবর্গ তাড়াতাড়ি নির্ব্বাচন করার পক্ষপাতী নহেন। যে কয়দিন নির্ব্বাচন না হয়, সেই কয়দিনই তাঁহারা কাজ করার সুবিধা পাইবেন। এ বিষয়ে সর্ব্বত্র আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন।

স্বাধীন ভারতের আসাম রাজ্যের সর্ব প্রথম প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ চির নিদ্রায় মগ্ন—সরকারী ট্রাকে অন্ত্যেষ্টি শোকযাত্রার দৃশ্য

ফটো—শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

কাশ্মীর সমস্যা—

কাশ্মীরে ভারতরাষ্ট্রের সহিত পাকিস্তানের বিবাদ মিটাইবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে যে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তিনি আপোষের কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, এ কথা কেহ মনে করেন না। কাজেই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীরাই শঙ্কিত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও শঙ্কা প্রকাশই করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই যুদ্ধ ঘোষণা করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অথচ পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের জিদের ফলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইল না। ইহার কুফল ভোগ করা ছাড়া পাকিস্তানের অন্য পথ নাই।

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন—

প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচন কবে হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন—

গত কয়েক বৎসর কাল কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন বন্ধ আছে এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা কর্পোরেশনের কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কর্পোরেশন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে কথা আছে। কিন্তু যে ভাবে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের কাজ চলিতেছে, তাহাতে পূজার ছুটীর

সময়ে কাজ চালাইলেও আগামী ডিসেম্বর মাসে নির্ব্বাচন করা সম্ভব হইবে না। কাজেই নির্ব্বাচন মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পিছাইয়া যাইবে ও কর্পোরেশন আরও ৩ মাস সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন হইবে। এইভাবে নির্ব্বাচন ক্রমেই পিছাইয়া যাইতেছে। যখন আগামী ৩১সে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কর্পোরেশন সরকরী নিয়ন্ত্রণে রাখা স্থির হয়, তখনই কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, যেন ডিসেম্বরের মধ্যে নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ হয়। যে সকল বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী বর্ত্তমানে কর্পোরেশনের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, ইহাই কি তাঁহাদের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয়?

কংগ্রেসের নূতন সভাপতি—

যুক্তপ্রদেশের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন সম্প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া নাসিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মোট তিনজন প্রার্থী নিম্নলিখিতরূপ ভোট পাইয়াছেন—

শ্রীট্যাণ্ডন—১৩০৬ ভোট
আচার্য্য কৃপালনী—১০৯২ ভোট
শ্রীশঙ্কররাও দেও—২০২ ভোট

শ্রীযুত ট্যাণ্ডন বাস্তহারাদের দরদী বন্ধু—তাঁহার নির্ব্বাচনে বাস্তহারা সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের কার্য্য পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের আশা করা যায়। পণ্ডিত নেহরু আচার্য্য কৃপালনীকে সমর্থন করিয়াছিলেন—তাঁহার পরাজয়ে পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রিসভার কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। নাসিক কংগ্রেসের পর শ্রীযুত ট্যাণ্ডন কংগ্রেস তথা দেশ পরিচালনের নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। বিদায়ী সভাপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার কার্য্যকালে দেশবাসী কংগ্রেস সভাপতির কোনরূপ প্রভাবের বিষয় বুঝিতে পারে নাই। শ্রীট্যাণ্ডন শক্তিমান লোক—আমাদের বিশ্বাস তাঁহার কার্য্যকালে কংগ্রেস নূতন ধারায় কার্য্যারম্ভ করিতে সমর্থ হইবে।

ভারতের নূতন লর্ড বিশপ—

রেভারেণ্ড অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায় গত ২রা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় সেণ্টপল গির্জ্জায় ভারত, পাকিস্তান, সিংহল ও ব্রহ্মের নূতন মেট্রোপলিটান বা লাট পাদরী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে [illegible] বৎসর, তিনি উক্ত ৪টি দেশবাসী ৪ লক্ষ খৃষ্টানের ধর্ম্ম[illegible] হইলেন। তিনি কলিকাতার চতুর্দ্দশ লর্ড বিশপ—তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় এই উচ্চপদ লাভ করেন নাই। শনিবার তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের অনুষ্ঠানের পর তিনি বলিয়াছেন—নূতন ধর্ম্মগুরু যদি সেবার দ্বারা জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তবেই তাহার নির্ব্বাচন সার্থক হইবে। তিনি সকল ধর্ম্মগুরুকে সেই আদর্শে কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আবার রেল দুর্ঘটনা—

জসিদির নিকট ই-আই-রেলে যে ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পাকিস্তানী গুপ্তচরদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ আমরা অন্যত্র প্রদান করিয়াছি। গত ৩রা সেপ্টেম্বর পূর্ব্বপাঞ্জাব রেলপথে দীননগর ও গুরুদাসপুর রেল ষ্টেশনের মধ্যে কাশ্মীর মেল লাইনচ্যুত হওয়ায় একটি পুলের উপর হইতে তিনখানা কামরা নীচে এক নালায় পতিত হয়—ফলে ২০ জন নিহত ও ৪৫ জন আহত হইয়াছে। ১৯৪৯—৫০ সালে এক বৎসরে ভারতে ১৬টি রেল দুর্ঘটনা হইয়াছে। রেলদুর্ঘটনার সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। রেল পরিচালনের ব্যয় বৃদ্ধির সহিত উহার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। বরং দিন দিন রেলের পরিচালনার ত্রুটিই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থার কথা শুনা যায় না। দেশ যে ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে সকল সন্দেহ দূর হইতেছে।

পশ্চিম জাপানে ঝড় ও বন্যা—

পশ্চিম জাপানে ভীষণ টাইফুন অর্থাৎ ঝড় ও বন্যার ফলে ২৫০ জন লোক নিহত এবং আড়াই লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। গত ১৬ বৎসরের মধ্যে জাপানে এরূপ প্রভূত ক্ষতি আর হয় নাই। ১ লক্ষ ৭০ হাজার গৃহ জলে ভাসিয়া গিয়াছে—৭ শত জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ওসাকা, কোবে ও কিয়োটোর জনবহুল স্থানগুলিই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধ্বংসলীলা আরম্ভ হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

শ্রীআনন্দমোহন সহায়—

খ্যাতনামা দেশ সেবক শ্রীআনন্দমোহন সহায় বৃটীশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারত গভর্ণমেণ্টের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ভাগলপুরের অধিবাসী, ১৯০৫ সালের বিপ্লববাদ আন্দোলনে কাজ করিয়া পলাতক হিসাবে তিনি ৩০ বৎসর জাপানে বাস করিয়াছিলেন। নেতাজী

সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকারেরও তিনি অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার নিয়োগে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গ সমস্যা—

গত ৩রা সেপ্টেম্বর পশ্চিম বাংলায় বাস্তহারা দিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে এক বিরাট জনসভায় ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলিয়াছেন—"কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের সঙ্গে শত্রুতা ও পূর্ব্ববাংলা সম্পর্কে বন্ধুত্বের নীতি যদি পণ্ডিত নেহরু অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি ভারতবর্ষকে ধ্বংসের দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবেন। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু বিতাড়ন নীতি গ্রহণ করিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। কাশ্মীরে তাহারা আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থ নীতিক প্রতিরোধই হউক কিম্বা সামরিক ব্যবস্থাই হউক, কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গ উভয়ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবহারে একই কুটনীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া পণ্ডিত নেহরুর কর্ত্তব্য।" ডক্টরশ্যামাপ্রসাদের এই উক্তির উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গ সমস্যা আমাদের ক্রমে হতাশ করিতেছে।

বাঙ্গালার অবস্থা আলোচনা—

গত ৭ই আগষ্ট দিল্লীতে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সভায় ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৭৫ মিনিট কাল বক্তৃতা করিয়া যে ভাবে বাঙ্গালার প্রকৃত অবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার বক্তৃতায় যে ভাবে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে পাষাণও গলিয়া যায়।' কিন্তু প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের এই বক্তৃতার পরও মনোভাব পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। অধিকন্তু এমনভাবে শ্যামাপ্রসাদবাবুর বক্তৃতার সমালোচনা করিয়াছেন যে তাহাতে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। একটি প্রদেশে যে সময়ে বহু লক্ষ লোক নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়িয়া ঘৃণ্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে, সে সময়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে এইরূপ উক্তি শুধু অশোভন নহে, বাঙ্গালীজাতির পক্ষে অসম্মানজনক বলিয়া আমরা মনে করি। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আজ পশ্চিম বাংলায় ৫০ লক্ষেরও অধিক অধিবাসী চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের অভিযোগের অন্ত নাই। পণ্ডিতজী সামান্য মাত্র সাহায্যের ব্যবস্থা ব্যতীত তাহাদের কোন দুঃখেরই লাঘব করিতে সমর্থ হন নাই। তথাপি তিনি এই সমস্যার স্থায়ী প্রতীকার সম্বন্ধে কিছু করিবেন না। অপর পক্ষ যখন তাঁহার সহিত চুক্তি করিয়া সেই চুক্তির সর্ত্ত নানারূপে ভঙ্গ করিতেছে, তখনও পণ্ডিতজী সেই চুক্তি কার্য্যকরী করার কথা চিন্তা করেন। তিনি পার্লামেণ্টে যখন বলিয়াছেন—"লোক বিনিময়, সীমান্তের রদবদল বা দেশ বিভাগ রদ করার আলোচনা স্বপ্নবিলাসিতা ও অবান্তর"—তখন তাহা শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ভারত সরকার বর্ত্তমান অবস্থায় কি করিবেন, তাহা পণ্ডিতজী বলেন না, সম্ভবতঃ কোন সুনিশ্চিত পথও স্থির হয় নাই। পাকিস্তানীদের চুক্তি মান্য করিতে তিনি বাধ্য করিবার কোন উপায় চিন্তা করেন না। তাঁহার উক্তরূপ উক্তির পর এবং মনোভাব দেখিয়া বাঙ্গালী নিরাশ হইয়াছে। এই নৈরাশ্য ও মনোবেদনা হইতে কে বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবে জানি না।

দেবী-পূজা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

১

জ্যোৎস্না-উতল নীলাম্বরের শুভ্র-স্বপ্নময়
আকুল-জীবন-দুকূল-ভাসানো আলোর প্লাবন নয়।
ঊর্মি-নিথর-কিরণ-সাগরে করেছি অতীতে স্নান
শরৎ-প্রভাতে সোণার আলোর গেয়েছি অনেক গান।
দেবী, ফুটেছে মানস-হ্রদে
শ্বেত-শতদল, দিয়াছি আনিয়া পুষ্পাঞ্জলি পদে।

২

আজি চারিদিকে কল-কল্লোল, প্রলয়-বন্যা জাগে,
কাঁপে থর থর ভূমি অরণ্য, ভূধরে কাঁপন লাগে।
যা-কিছু অচল হ'ল চঞ্চল, আকাশ, জীবন, জড়,
শুনি রুদ্রের রথ-চক্রের উদ্দাম ঘর্ঘর।
দেবী, পৃথিবী উঠিছে দুলি,
হৃদয় ছিন্ন করিয়া এনেছি রক্ত-কমল তুলি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৫০৩

ইংলণ্ড ঃ ৩৪৪ ও ১০৩

ওভালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ ইনিংস এবং ৫৬ রাণে ইংলণ্ডকে হারিয়ে এ বছরের ইংলণ্ড সফরে টেষ্ট সিরিজের বেশী টেষ্ট ম্যাচে জয়লাভের দরুণ 'রাবার' লাভ করেছে। ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল এই প্রথম 'রাবার' পেল। ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হয় ১৯২৮ সালে লর্ডসে। এ পর্য্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে মোট ৭টি টেষ্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। ইংলণ্ড ৩বার (১৯২৮, ১৯৩৩, ১৯৩৯) 'রাবার' পেয়েছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজও পেয়েছে ৩ বার, ১৯৩৪-৩৫, ১৯৪৮ ও ১৯৫০। মাত্র একবার ১৯২৯-৩০ সালের টেষ্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে যায়। ঐ বছর ১ম ও ৪র্থ টেষ্ট ড্র যায়। ২য় টেষ্টে ইংলণ্ড এবং ৩য় টেষ্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জয়ী হয়। এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে ৭টি টেষ্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। একমাত্র ১৯৪৮ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে অনুষ্ঠিত ৪টি টেষ্ট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড একটি টেষ্ট খেলাতেও জয়লাভ করতে পারে নি। বাকি টেষ্ট সিরিজের কোন না কোন খেলায় ইংলণ্ড জয়ী হয়েছে।

আলোচ্য বছরের টেষ্ট সিরিজে (১৯৫০ সাল) ইংলণ্ড ১ম টেষ্ট খেলায় জয়লাভ করে। বাকি ৩টি টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল পর্য্যায়ক্রমে জয়লাভ ক'রে 'রাবার' পেয়েছে। ইংলণ্ডের আজ বড় দুর্দিন! আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ সিংহের দুর্দান্ত প্রতাপ লোপ পেয়েছে, বিরাট সাম্রাজ্য হাত ছাড়া হয়েছে, পৃথিবীর বিরাট অঞ্চল জুড়ে বৃটিশ জাতির ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে সুদূর বেড়াজাল বিস্তারিত ছিল তা আজ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের দরুণ খেলা-ধূলাতেও বৃটিশ জাতি তার পূর্ব্ব প্রভুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ক্রিকেট ইংলণ্ডের জাতীয় খেলা। এই ক্রিকেটের টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কাছে ইংলণ্ডের শোচনীয় পরাজয় কেবল ইংলণ্ডে নয় সমগ্র ক্রিকেট খেলার জগতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১২ই আগষ্ট ওভালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গডার্ড টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নিলেন। প্রথম দিনের খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ১ম ইনিংসের ৩ উইকেটে ২৯৫ রাণ উঠে। এ রে ১০৯ এবং ওরেল ১১০ রাণ করে নট আউট থাকেন।

টেষ্ট খেলার দ্বিতীয় দিন ১৪ই আগষ্ট ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ১ম ইনিংস ৫০৩ রাণে শেষ হয়। উল্লেখযোগ্য রাণ ওরেল ১৩৮, রে ১০৯, গোমেজ ৭৪ এবং গডার্ড ৫৮ রাণ। ইংলণ্ডের রাইট ১৪১ রাণে ৫টা উইকেট পান। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে ২৯ রাণ উঠে।

১৫ই আগষ্ট, তৃতীয় দিনে ইংলণ্ডের ৩ উইকেটে ২৩৮ রাণ উঠে। ইংলণ্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান হাটন ১৩৭ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। বৃষ্টির জন্যে খেলায় বাধা পড়ে।

১৬ই আগষ্ট, চতুর্থ দিনে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ৩৪৪ রাণে শেষ হয়। ওপনিং ব্যাটসম্যান এল হাটন ২০২ রাণ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থেকে যান। ইংলণ্ডের মাটিতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৩৯ সালে এল হাটন ১৯৬ রাণ

ক'রে ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রাণের রেকর্ড স্থাপন করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে এস হাটনের ২০২ রাণ আজ ইংলণ্ডের মাটিতে ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রাণ হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ডেনিস কম্পটন ৪৪ রাণে রাণ আউট হন। গডার্ড এবং ভ্যালেনটাইন যথাক্রমে ৪টে ক'রে উইকেট পান। ইংলণ্ডের শেষ ৬টা উইকেট ৭২ রাণে পড়ে যায়। গডার্ড ২৫ রাণে ৪টে উইকেট পান। ফলো-অন ক'রে ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১০৩ রাণ তুলেছিলো। ভ্যালেনটাইন ৬টা উইকেট পান ; রামাধীন পান ৩টে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ ইনিংস এবং ৫৬ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে।

ইংলণ্ড ঃ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

	টেষ্ট সিরিজ	ইংলণ্ড জয়ী	ওয়েষ্ট ইঃ জয়ী	ড্র
ইংলণ্ডে	৪	৩	১	০
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে	৩	০	২	[illegible]
মোট	৭	৩	[illegible]	১

	টেষ্ট ম্যাচ	ইংলণ্ড জয়ী	ওয়েষ্ট ইঃ জয়ী	ড্র
ইংলণ্ডে	১৩	৭	৩	৩
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে	১২	২	[illegible]	[illegible]
মোট	২৫	৯	৮	৮

এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রাণ : ইংলণ্ড—৮৪৯ (১ম ইনিংস, ৪র্থ টেষ্ট ; কিংসটোন, ১৯২৯-৩০)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—৫৫৮ (১ম ইনিংস, ৩য় টেষ্ট ; ট্রেণ্ট ব্রীজ, ১৯৫০)

ইংলণ্ডে ১ ইংনিসে সর্ব্বোচ্চ রাণ (উভয় দলের মধ্যে) : ৫৫৮ (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ; ৩য় টেষ্ট, ১৯৫০)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ১ ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রাণ : ৮৪৯ (ইংলণ্ড, ৪র্থ টেষ্ট, ১৯২৯-৩০)

ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রাণ (ইংলণ্ড) : ৩২৫ (এ স্তাণ্ডহাম ; ৪র্থ টেষ্ট, ১৯২৯-৩০)

ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রাণ (ওঃ ইঃ) : ২৭০ (জর্জ হেড্‌লে ; ৪র্থ টেষ্ট ১৯৩৪-৩৫)

সর্ব্ব নিম্ন রাণ (ইংলণ্ড) : ১০৩ (২য় ইনিংস ; ৪র্থ টেষ্ট, ১৯৩৪-৩৫)

সর্ব্বনিম্ন রাণ (ওঃ ইণ্ডিজ) : ৯৭ (প্রথম ইনিংস ; ১ম টেষ্ট ১৯৩৩)

একশত 'সেঞ্চুরী' :

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এ পর্য্যন্ত ১২ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় একশত সংখ্যক 'সেঞ্চুরী' করার সম্মানলাভ করেছেন। ১৯৪৮ সালে স্যর ডন্ ব্র্যাডম্যানের একশত সংখ্যক 'সেঞ্চুরী' করার পর ১৯৫০ সালের ৫ই আগষ্ট ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব উইকেট কিপার লেসলী এম্‌স প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় একশত 'সেঞ্চুরী' করেন। যাঁরা এই সম্মান লাভ ক'রেছেন তাঁদের নাম যথাক্রমে : (১) জ্যাক্ হব্‌স্ (২) প্যাটসী হেণ্ড্রেন, (৩) ওয়ালী হামণ্ড (৪) ফিলিপ মীড (৫) হার্বাট সাট্‌ক্লিফ (৬) ফ্র্যাঙ্ক উলী (৭) ডব্লু জি গ্রেস (৮) এ্যাণ্ডি স্যাণ্ডহাম (৯) টম হেওয়ার্ড (১০) আর্ণেষ্ট টিণ্ডস্‌লি (১১) স্যর ডন ব্র্যাডম্যান (১২) লেসলী এম্‌স।

রঞ্জি ষ্টেডিয়াম ঃ

বিখ্যাত ইডেন উদ্যানে 'ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবে'র উদ্যোগে গত ১৫ই আগষ্ট ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসে 'রঞ্জি ষ্টেডিয়ামের' ভিত্তি স্থাপন করেছেন মুখ্য মন্ত্রী মাননীয় [illegible] বিধানচন্দ্র রায়। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ বিগত ১২৫ বছর এই জমিটির মালিকানা স্বত্ব উপভোগ ক'রে ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের কাছে প্যাভিলন্‌সহ জমিটি বিক্রী করায় খেলোয়াড় সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের সংবাদে ক'লকাতার ফুটবল মাঠের দর্শকদের মনে সেই কথাই মনে পড়ছে 'তৃষ্ণায় কাতর হয়ে চাহিলাম জল, এনে দিল আধখানা পাকা বেল।' ক'লকাতায় ক্রিকেট খেলার থেকে ফুটবল খেলা অনেক বেশী জনপ্রিয় এবং খেলার মাঠে স্থানাভাব সমস্যা আজ ক'লকাতা সহরের অন্যতম জাতীয় সমস্যার অন্তর্গত বলা ভুল হবে না। দর্শকেরা যে অপরিসীম কষ্ট সহিষ্ণুতার মধ্যে ফুটবল খেলার মাঠে নির্দ্দোষ আনন্দ উপভোগ করতে যায় তা জাতীয় উদ্যম অপচয়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম করতে দর্শকদের বাধ্য করলে খেলার মাঠে আজ যে স্থানাভাব নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছে তা কেবল পুলিশ দিয়ে রোধ করা সহজ হবে না। খেলায়

মাঠের সমাজ-বিরোধী কাজ স্বভাবতই সমাজদেহের অন্যান্য অংশে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তারলাভ করবে। ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণই হ'ল খেলার মাঠে সমাজ-বিরোধী কাজের অন্যতম প্রতিরোধক ব্যবস্থা।

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি ঃ

আমাদের এই নদীমাতৃক বাংলা দেশে নৌকাডুবি অথবা জলাশয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়ে বহুলোক অসহায় প্রাণত্যাগ করে। জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল থেকে উদ্ধার করা এক পরম পুণ্য কাজ। দেখা গেছে, জলমগ্ন ব্যক্তির অসহায় অবস্থা এবং আকুল আবেদন মানুষকে উদ্ধার কার্য্যে আকর্ষণ না ক'রে পারে না। ফলে বেশীর ভাগ লোকই জীবন উদ্ধারের প্রেরণায় নিজ জীবনের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে প্রস্তুত না হয়েই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ ধরণের উদ্ধার কার্য্যে উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট বিপদ আছে। জলমগ্ন ব্যক্তির নিজ জীবন রক্ষার চেষ্টা ছাড়া অপর কোন দিকে জ্ঞান থাকে না। ফলে দেখা গেছে অনেকক্ষেত্রে জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধার কর্ত্তাকেই হাতের নাগালে পেয়ে জড়িয়ে ধরে এক সঙ্গে জলে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করেছে। অপরের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গের মধ্যে যথেষ্ট বীরত্ব এবং মহত্ব আছে সত্য। কিন্তু যেখানে কিছুটা প্রস্তুত হয়ে গেলে নিজের জীবনকে বিপন্ন না ক'রে অপরের জীবন রক্ষা সহজ হয় সেখানে অপ্রস্তুত হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়াটা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয়।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল থেকে সহজে উদ্ধারের কতকগুলি কৌশল আছে। এ কৌশল জানা থাকলে কখনও জলাশয়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে অসহায় দর্শক হিসাবে জলমগ্ন ব্যক্তির অসহায় মৃত্যু দেখতে হয় না। এই কৌশলগুলি কঠিন নয়, সহজই। কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসের প্রয়োজন। আমাদের সকলেরই যেমন কিছু কিছু সাঁতার জেনে রাখা দরকার তেমনি সেই সঙ্গে জলমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধারের কৌশলগুলি জানা থাকলে আমরা এই আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে বহু জীবন রক্ষা করতে পারি। সাঁতার শিক্ষার প্রয়োজন কেবল দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষার জন্যই নয়, সুস্থ এবং সুঠাম দেহ গঠনের পক্ষে সাঁতার বিশেষ কার্য্যকরী ব্যায়াম।

এইদিক থেকে দক্ষিণ ক'লকাতা অঞ্চলের ঢাকুরিয়া লেকে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি' যথেষ্ট গঠনমূলক কাজের পরিচয় দিয়েছেন। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হওয়া উচিত। ক'লকাতার লোক-সংখ্যার এক বিরাট অংশ প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করে। এবং প্রতি বছরই গঙ্গায় নৌকাডুবি এবং জলমগ্নের বহু দুর্ঘটনা সংবাদপত্রে আমরা দেখতে পাই। এ থেকেই 'লাইফ সেভিং' শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর সভাপতিত্বে 'ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির' ২৮তম বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা-দিবস সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক'লকাতার বহু শিক্ষিত বিশিষ্ট নাগরিকের যোগাযোগ আছে। এই প্রতিষ্ঠানের একটি বৃহৎ গঠনমূলক পরিকল্পনার কথা আমরা শুনেছি। এর জন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন।

জনসাধারণ এবং সরকারের সহযোগিতার উপর এই পরিকল্পনার সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমরা আশা করি আমাদের জাতীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানের জমি সংগ্রহ ব্যাপারে সহযোগিতা ক'রে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সার্থক করবেন।

সন্তোষ ট্রফি ঃ

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার এ বছরের ফাইনালে গত বছরের ফাইনাল বিজয়ী বাঙ্গলা প্রদেশ ১-০ গোলে গতবারের বিজিত হায়দ্রাবাদদলকে পুনরায় হারিয়ে উপর্য্যুপরি দু'বার 'সন্তোষ ট্রফি' বিজয়ী হয়েছে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় 'সন্তোষ ট্রফি' বিজয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গলা দেশের এ জয়-লাভে গৌরববোধ এবং খেলায় আনন্দলাভ করেছেন এমন দর্শক অথবা ক্রীড়ামোদীর সংখ্যা খুবই কম পাওয়া যাবে এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না। খেলাধুলায় একমাত্র জয়লাভই যাঁদের কাছে বড় কথা অর্থাৎ জয়লাভ যে কোন ভাবেই হোক—ফাঁক তালে গোল ক'রে অথবা জাতীয় স্বার্থ বলি দিয়ে বাইরের খেলোয়াড় দিয়ে খেলিয়ে, তাঁরা অবিশ্যি এ ধরণের জয়লাভে গর্ব্ববোধ এবং আনন্দ উপভোগ দুই করতে

পারেন ; মনের এ পরিচয় নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, জাতীয় অভ্যুদয়ের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। বাঙ্গলা প্রদেশের ফুটবল দল গঠন ব্যাপারে খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটি বরং জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করেছেন, তবু প্রাদেশিকতার পরিচয় দেন নি। জাতীয় স্বার্থ বলি দিয়েও তাঁরা কিন্তু সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পান নি। এই উদার মনোভাবের ফাঁক তালে বাঙ্গলা প্রদেশের যে ফুটবল খেলায় নিজ নাম সুপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন প্রদেশে এ অভিযোগ উঠা খুব স্বাভাবিক। প্রতিযোগিতার বিভিন্নস্তরে বাঙ্গলা দলে এমন কয়েকজন বহিরাগত বাছাই ফুটবল খেলোয়াড় যোগদান ক'রেছিলেন যাঁরা একমাত্র ফুটবল খেলার উদ্দেশ্যে ফুটবল মরসুমে ক'লকাতায় বিভিন্ন ক্লাবের পক্ষে যোগদান করেন এবং মরসুম শেষে স্বদেশে ফিরে যান বা যেতেন। অন্যান্য প্রদেশের বাছাই করা খেলোয়াড়-দের সহযোগিতা ভিন্ন বাঙ্গলা প্রদেশ জাতীয় ফুটবল প্রতি-যোগিতায় কতখানি সাফল্য লাভ করতে পারতো তার অগ্নি পরীক্ষা হয় নি। 'সন্তোষ ট্রফি' প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী কোন কোন প্রাদেশিক দলে দু' চার জন বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা গেছে কিন্তু এই নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে আমরা অপর কোন দলকে কটাক্ষ-পাত করতে পারি না। কারণ ঐ সব বাঙ্গালী খেলোয়াড় স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবেই প্রাদেশিক দলে মনোনীত হয়ে-ছিলেন, বাঙ্গলা দেশ থেকে ফুটবল খেলানোর উদ্দেশ্যে তাঁদের নিয়ে গিয়ে দলভুক্ত করা হয় নি। আমাদের সঙ্গে বড় প্রভেদ এইখানেই। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা দেশ আজ যে সাফল্যলাভ করেছে তার মূলে বিভিন্ন প্রদেশের বাছাই করা ফুটবল খেলোয়াড়দের সহযোগিতা রয়েছে—যে সহযোগিতা লাভ ক'রে বাঙ্গলা দেশ ঐ সব বাইরের খেলোয়াড়দের নিজ নিজ প্রাদেশিক দলে যোগদান করা থেকে বঞ্চিত করেছে।

নিজ প্রদেশের ফুটবল দলকে জাতীয় ফুটবল প্রতি-যোগিতায় সহযোগিতা করা খেলোয়াড়দের পক্ষে কতখানি গর্ব্ব এবং মহত্বের পরিচয় এ কথা লিখে বলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ক'লকাতায় বিভিন্ন ক্লাবে যোগদান করার ফলে অলিম্পিক প্রত্যাগতসহ অনেক নামকরা বাইরের খেলোয়াড় নিজ নিজ প্রদেশকে তাঁদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করেছেন। ফলে ভারতীয় ফুটবল মহলে বাঙ্গলা আজ তার নাম প্রতিষ্ঠা করতে যে যথেষ্ট সুবিধা পেয়েছে একথা দুষ্ট লোকের নয়। বাইরের খেলোয়াড়দের মধ্যে এই যে নৈতিক অবনতি এবং আদর্শ চ্যুতি দেখা দিয়েছে এর জন্ম বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলার নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন করা অসঙ্গত হবে না ; কারণ বাঙ্গলা দেশ নিজ আত্ম-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে এঁদের অনেকের সহযোগিতা গ্রহণ করেছে এবং বাইরের অনেক নামকরা খেলোয়াড়দের নিজ নিজ প্রাদেশিক দলের খেলায় যোগদান থেকে বঞ্চিত করেছে। বাইরের খেলোয়াড়রা কিসের আকর্ষণে স্বদেশ, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ ক'রতে এবং নিজ প্রাদেশিক ফুটবল দলে সহযোগিতা না করতে উৎসাহবোধ করেন এ প্রশ্নের উত্তর লিখে বলার প্রয়োজন হয় না, খেলার মাঠে এ বহুকাল 'Open Secrete-এ' দাঁড়িয়েছে।

বাঙ্গালীর বহু অতীত গৌরব-গাথা আছে। বর্ত্তমানের ভ্রান্ত নীতির ফলে শীঘ্রই বাঙ্গালীর জাতীয় যাদুঘরে আর একটি গৌরব স্তম্ভের স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা হতে চলেছে। মহা সমারোহে স্তম্ভের গায়ে গৌরব গাথার ফলকটি উৎকীর্ণ ক'রে কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হবে। নিকট ভবিষ্যতে আমাদের বংশধরেরা তার তলায় অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখবে—বাঙ্গালী এককালে ফুটবল খেলার পথপ্রদর্শক ছিল। এবং ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব একদিন প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু এ সমস্তই হবে তখন তাদের কাছে অতীতের নিদর্শন। বাস্তবজীবনে এর কোন নিদর্শনই খুঁজে পাবে না। ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থবুদ্ধি এবং অবিমৃষ্যকারীতার ফলে বাঙ্গালা দেশের ফুটবল খেলা যে সঙ্কটজনক অবস্থার দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে সেই কঠোর বাস্তব ঘটনা ঘটতে বেশী দেরী নেই যদি শুভবুদ্ধি এখনও জাগ্রত না হয়। ইহা আমাদের পক্ষে আজ গৌরব এবং আত্মপ্রসাদের কথা নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূজার ভারতবর্ষ—শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা "ভারতবর্ষ" আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপন-দাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই কার্ত্তিকের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইবেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি না পাইলে বিজ্ঞাপন ছাপা না হইবার সম্ভাবনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

পাকিস্তানস্থ গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

আমাদের পাকিস্তানস্থ গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা আমাদের কার্য্যালয়ে "ভারতবর্ষ"-এর চাঁদা পাঠাইতে বা জমা দিতে অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতঃপর ইচ্ছা করিলে ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর উল্লেখপূর্ব্বক The Asutosh Library, 78-6, Lyall Street, Dacca, East Pakistan—নিকট চাঁদা পাঠাইতে বা জমা দিতে পারেন। নূতন গ্রাহকগণ টাকা জমা দিবার সময় "নূতন গ্রাহক" কথাটি উল্লেখ করিবেন। ইতি— বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কার্ত্তিক—১৩৫৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

যুগান্তর

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

আজ ধীরভাবে বাহিরের বা অন্তরের জগতে দৃষ্টিপাত করলে যুগান্তরের অনুভূতি অস্বীকার করবার উপায় নাই। এ নতুন যুগ প্রবর্ত্তনের জন্মতিথি নির্দ্ধারণ অসম্ভব। কারণ মানব-সমাজের বহুদিনের পুঞ্জীভূত পাপ বা সাধু প্রবৃত্তির কোনো নির্দ্দিষ্ট অশুভ বা শুভ মুহূর্ত্তে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে না। যা ধীরে ধীরে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞাতসারে গড়ে ওঠে, তার আংশিক ভাঙন মুহূর্ত্তে ঘটতে পারে। সে ভগ্নস্তূপের আমূল অপসরণ সময়-সাপেক্ষ। পুরাতন ভিত্তিতে নতুন সৌধ গড়ে উঠতে পারে না—বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতিরেকে। ভাঙনের কারণ লুকানো থাকে সঞ্চিত ভাবধারায় এবং নূতন যুগ-সৌধও গঠিত হয় বহুদিনের রাশীকৃত কল্পনা এবং আদর্শের মাল-মশলায়।

নটরাজের বাঁধন-ছেঁড়া ও বাঁধন-পরা নাচের ছন্দ চিরদিন অনুভূত হয় অন্তর ও বহির্জগতে। নৃত্যের তালে তালে পাহাড় খসে, নদী শুকায়, রাজ্যেশ্বর ভিখারী হয়, অজ্ঞাত-কুল-শীল কোটি কোটি নরনারীর দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা হয়। নর-সমাজে ভাবের অভিব্যক্তি ও বিপ্লব ঐতিহাসিক সত্য, মানবের চির-অশান্ত প্রকৃতির বিকাশ; স্বেচ্ছাচারিতা ও বিচার-শক্তির অনিবার্য্য পরিণাম।

চিত্ত সহজে স্বীকার করতে চায় না যে মনন ও বিচার অতিমাত্রায় অন্যের চিন্তা-ফল ও প্রেরণার পরিণাম পরিগ্রহ মাত্র। আদিম যুগ হতে স্বাধীন সিদ্ধান্তের গর্ব-মুখর নবীন যুগ মহা-মানব বা প্রবল অধিনায়কের ভাব-ধারায় শাসিত। আদিম যুগেই কোনো মহাপুরুষ বুঝেছিলেন বন্য-জীব বা উন্মাদ প্রকৃতির ধ্বংস-লীলার অভিযান হ'তে আত্ম-রক্ষার একমাত্র উপায় দল-বাঁধা। সমাজের বাঁধন ও সঙ্ঘ-রক্ষার নূতন নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে মানুষ বিধিনিয়ম প্রবর্তন করেছে চিরদিন। কিন্তু সে সব বিধি অতীতকে

একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি। দেহান্তরিত পথ-প্রদর্শকদের প্রদর্শিত পথ হতে পাথেয় সংগ্রহ ক'রে তবে অজানা পথে শুভ যাত্রা আরম্ভ করেছে প্রত্যেক নবীন যুগের প্রবর্তক।

তাই নিজের মনে মৌলিকতার গর্ব অনুভব করলেও যুগ-যুগান্তর মানুষ অধিনায়কের সহযোগী বা আজ্ঞানুবর্ত্তী। রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম-সঙ্ঘে, বাণিজ্য জগতে, শিল্পে ও সাহিত্যে এই সত্যের ক্রিয়া প্রতীয়মান। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভাগবত-ধর্মের সারাংশ বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় বলেছেন—তাঁর উপদেশ ছন্দে শ্রুত এবং বহু ঋষি গীত। যাকে নায়ক ব'লে মানি, আমরা তার আবিষ্কৃত মার্গে অন্ধ হয়ে ছুটি। যাকে লোক-নায়ক শত্রু ব'লে নির্দেশ করে, উন্মাদ হ'য়ে তার জীবন-পথ কণ্টকাকীর্ণ করি। অথচ নায়কের পরিণত সিদ্ধান্তের হেতু বোঝবার প্রয়াস করি না। মানুষ সর্পযজ্ঞ করে, অথচ নরেরই সর্প-কুটিল দংশনে মানব-জাতি জর্জরিত। ধর্ম-দ্বেষীর নিন্দায় ভূ-ভারত মুখরিত। কিন্তু সে নিন্দনীয় আচরণের অল্প-বিস্তর বিকাশ অনুভূত হয় প্রায় প্রত্যেক সামাজিক নরের জীবনে। শান্তির আদর্শ নিয়ে মানুষ যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য সমর-সজ্জা করে, প্রতিদ্বন্দ্বীর ভণ্ডামীর মুখোস ছেঁড়বার জন্য নিজেই ভুয়ো পবিত্রতার মুখোস পরে।

প্রকাণ্ড মানব-বিশ্বের প্রচণ্ড-ভাব ও কর্ম-প্রবাহের প্লাবন আজ সকল জাতি-সঙ্ঘকে বিব্রত করেছে। রাজ-নীতি ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন-মুখ স্রোতের সংঘাতের পরিণামে জগত-ব্যাপী অশান্তি। মূল-স্রোতকে আশ্রয় ক'রে বহু ছোটো বড় ঘূর্ণীচক্রে সাধারণ মানুষ নিঃসহায় ভাবে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক নর-সঙ্ঘ সম্বর সম্বর ব'লে আর্তনাদ করছে, অথচ নিজের ক্ষুদ্র বা প্রবল শক্তি সেই ভাঙন-শক্তির একটি বা অপরটির সাথে মিলিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশে একদল অন্য-দলকে ইঙ্গ-মার্কিনী শক্তির ক্রীতদাস ব'লে ধিক্কার দেয়, অথচ সে দল নিছক অন্ধ উপাসক সোভিয়েট শক্তির। কেউ বুঝছে না, এই উন্মাদ তরঙ্গের মুখে বুক দিয়ে দাঁড়ালে, তার নিজেরই উচ্ছেদ অনিবার্য।

মানুষের অন্তর্দৃষ্টির সীমা বিশাল। কারণ কল্পনা মানব চিত্তের বিশেষ সম্পদ। কল্পনা-কাননের বুনিয়াদ অবশ্য অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিমূলক। বাদ-বিসম্বাদ ও অপবাদে ভ্রমের উৎপত্তি। সাধারণ ব্যক্তি-অভিরুচি ও আশা কল্পনার প্রচ্ছদ পট। সুতরাং কল্পনা-প্রসূত যে সিদ্ধান্তকে আমরা যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভাবি, তার মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, প্রেম ও আশা বহুল পরিমাণে অযুক্তি মিশিয়ে দেয়। আমাদের ভাবের কাননে সুবৃক্ষের বীজের সাথে মিশিয়ে থাকে আগাছা ও বিষ-বৃক্ষের বীজ। তার ফল অনিবার্য। আশা-কানন নিরাশার জঙ্গলে পরিণত হয়। কর্মের অবকাশে আশেপাশে তাকিয়ে দেখি অপকর্মের ফসল, ঝোঁপে ঝোঁপে কাল কীট ও অজগর! হতাশ হয়ে বলি—

আমি নিশার স্বপন করেছি বপন বাতাসে
তাই আকাশ কুসুম করেছি চয়ন হতাশে।

ব্যক্তি-জীবনের এই নীতিসঙ্ঘ জীবনে সত্য। ব্যষ্টি-জীবনের বিফলতা মুখ্যরূপে মাত্র একটি জীবন ব্যর্থ করে। কিন্তু সঙ্ঘ-জীবনের ব্যর্থতার পরিণাম মাত্র সম-যুগের সমাজ জীবনকে বিষাক্ত করে না। সে বিফলতা ভাবীকালকেও দূষিত করে। তাই সঙ্ঘপতি, রাষ্ট্র-নিয়ন্তা ও সমাজ-গুরুর দায়িত্ব অসামান্য। অথচ নেতৃত্বের লোভ সাধারণ। মিথ্যা ভণ্ডামী ও আপাতঃমধুর বচনের বেড়াজালে জনগণের চিত্ত আহরণ ক'রে বহু লোক সংসারে অহিতের বীজ বপন করেছে, আজিও করছে। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস পুনঃ পুনঃ একথা প্রমাণ করেছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ কি এতই দুর্বল যে আজ জগতের এই বিপ্লবী দুষ্ট স্রোত এড়িয়ে সে আত্ম-রক্ষা করতে পারে না? ধীর, শান্ত অধিনায়ক সুষ্ঠু ভাবে নিশ্চয়ই সে স্রোতের বাহিরে রাখতে পারে নিজের সমাজকে। দেশের লোকের পরিতৃপ্তি এবং ধ্বংস স্রোতের অপরিহার্য্য পরিণাম হ'তে পরিত্রাণের উপায়ের নিশ্চয়ই সন্ধান পাওয়া যায় সুশান্ত ধীরতায়। সে অহিংসার নীতি হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তি। মাত্র আবশ্যক—কাল-স্রোতের হিংসার খাদের মধ্যে ঝাঁপ না দেওয়া। যুগান্তর স্বীকার্য, কিন্তু কোন্ যুগকে বরণ করবে, তার নির্বাচন-শক্তিকে শিথিল করা না করার দায়িত্ব প্রত্যেক মানব-সঙ্ঘের।

আজ সারা বিশ্বের অশুভ তরঙ্গের আঘাতে আমাদের জীবন-স্রোত উন্মার্গগামী, অশোভন বা বিমল, এ আশ্বাস দুর্বলের আত্ম-প্রবঞ্চনা। পল্লীর বহু লোক পাপী, সুতরাং

আমার পক্ষে নিষ্পাপ থাকা অসম্ভব, এ ধারণা মারাত্মক। হিংসার উন্মাদনায় বিশ্ব আলোড়নের দোহাই দিয়ে হিংস্রক বৃত্তিকে অবলম্বন করা সমাজের পক্ষে তেমনি দুর্বলতা। মনুষ্যত্বের বিচারের মান আত্ম-বোধের বিশিষ্টতা সংরক্ষণে। ন্যায়ের পথে, জ্ঞানের রাজ্যে বা জনহিতকর শুভ কর্মের ক্ষেত্রে, অনুকরণ শুভ। কিন্তু বিবেক বা অন্তরাত্মা যে পথকে কুমার্গ ব'লে নির্দেশ করে, যে কর্মকে আত্মঘাতী কুকর্ম ভাবে, সে পথ ও সে কর্ম পরিবর্জনীয়। যুগ-সন্ধি এই প্রতিরোধ শক্তিকে যে জাতির প্রাণে উদ্বুদ্ধ করে, সেই জাতি বিশ্ব-বিজয়ের অধিকারী।

আজ বিজ্ঞান শ্রম-শিল্পে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ভূ-খণ্ডকে সঙ্কুচিত করেছে। পৃথিবীর কোনো অংশ অন্য ভূভাগ হ'তে দূর নয়। প্রাচীন জগতে সভ্য মানবের সঙ্ঘের মধ্যে পণ্য ও ভাবের কথঞ্চিত আদান প্রদান ছিল। ভারত, মিশর, গ্রীস, পারস্য ও চীনের মধ্যে ভাবের বিনিময় হ'য়েছিল। গ্রীক-যবন রোমকে ও য়ুরোপকে সুষ্ঠু ভাব বিতরণ করেছিল, ভারতবর্ষ বৃহত্তর ভারতে বৌদ্ধ নীতি-সুধা পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু সে বিনিময়ের মাত্রা ছিল স্বল্প। সে কর্ম সম্পাদিত হ'ত দীর্ঘকালে। আজ চক্ষুর পলকে মার্কিণের সমাচার পৌঁছয় বাঙ্‌লার পল্লীগ্রামে। সুতরাং সুযুক্তির রাংতায় মোড়া কুযুক্তির কুফল প্রতিরোধ করা শক্ত। আমার নিবেদন এই যে, যদি নিউ-ইয়র্কের বা ক্রেমলীনের বাণী আপনাকে বিশ্ব-বাণীর আসনে উন্নীত করতে সক্ষম হয়, দিল্লী বা কলিকাতার কথা আপনাকে যুগান্তরের উপদেশের পর্য্যায়ে তুলতে পারবে না কেন ? আমার দেশের অহিংসার বাণী শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এদেশ মানুষকে ঈশ্বর বলেছে, জীবকে বলেছে শিব—যিনি শান্ত ও সুন্দর।

প্রাচীন যুগে শিক্ষা সর্বজনীন ছিল না। আজ সভ্য জগতে সকল শ্রেণীর অধিবাসীর ভূ-মণ্ডলের বিভিন্ন ভূ-খণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরাকালে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ছিল সীমাবদ্ধ। একজন অধিনায়ক বিশ্ব-বিজয়ের উচ্চাশায় দলবল নিয়ে অন্য দেশে অভিযান করত। সে অভিযানে দস্যুতার বিভীষিকা আতঙ্কের সৃষ্টি করত। এ যুগের আন্তর্জাতিক যুদ্ধের প্রণালী বিজিতের পক্ষে নৃশংস, নিষ্ঠুর এবং অতি পাশবিক। দুর্দ্দশার চরম যুদ্ধের অবসানে নয়। বৈরিতা ও হিংসা বিজয়ী ও পরাজিতের সর্বাঙ্গে হলাহল সঞ্চার করে—রণাবশেষ মাত্র নূতন সমরের জন্য নূতন আয়োজনের অবকাশ। যদি এ পরিণাম ভারত-বাসীকে শান্তিপ্রিয় হ'তে শিক্ষা না দেয়, তাহ'লে বুদ্ধ ভগবান হ'তে মহাত্মা গান্ধী অবধি সবার শিক্ষা বিফল ও নিরর্থক প্রতিপন্ন হবে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ শিশুরাষ্ট্র। তাই তার অধিবাসী প্রজাতন্ত্রের সকল নীতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। ভারতবাসীর কিন্তু একটা সুবিধা আছে। সে সুযোগে আত্মোন্নতি না করলে যুগান্তরের স্রোতে ধ্বংসের গহ্বরে তার সমাধি সুনিশ্চিত। সে বড় বংশের লোক, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নীতির উত্তরাধিকারী। গত কয়েক শতক সে ঠেকে শিখেছে। সুতরাং আজ এই যুগান্তরের দিনে সে অন্ততঃ নিজের দেশে সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা না করলে, মানব-জাতির ইতিহাস ভীষণ কলঙ্কিত হবে।

প্রথম শিক্ষা একতা। আজ প্রত্যেক ভারতবাসী অন্য হ'তে পৃথক। রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কার ও ব্যক্তি-জীবন পরিচালনায় প্রত্যেকের গর্ব যে তার আদর্শ চরম ও পরম। কিন্তু এ কথা অবহেলা করবার অবকাশ নাই যে, একতা ভিন্ন কোন মানব-সঙ্ঘ ক্ষণকাল তিষ্ঠতে পারে না। আজ যাদের হাতে শাসন-শক্তি হয়তো তারা অদক্ষ। কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে ইংরাজ রাজ-কর্মচারীর ঔদ্ধত্য, হীন-স্পর্দ্ধা বা অভদ্রতার উত্তরাধিকারী। অথচ তাদের দক্ষতা-বর্জিত। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে তারা আমাদের স্বদেশবাসী এবং প্রজা-শক্তি প্রবল হ'লে তাদের কর্ত্তব্য-বিমুখতা লোপ পাবে। আজ দুর্নীতি, উৎকোচ-গ্রহণ, গোপনে সাধারণের ক্ষতি ক'রে উচ্চপদস্থ বহু শক্তিমানের অর্থ সঞ্চয়ের কথা শুনি এবং প্রমাণ পাই। কিন্তু তাদের উপর অভিমান করে রাষ্ট্রের বিধি নিয়ম উপেক্ষা ও লঙ্ঘনে অনৈক্য বাড়ে। সমাজ-বিরোধী ক্রিয়া-কলাপ শত্রু-জাতির হিংসানলে ইন্ধন আহুতি। সকল ক্ষেত্রে একতার প্রয়োজন। সাধু-প্রকৃতি উচ্চ আদর্শের লোক একত্র হ'লে রাজ্য ভার অতি অল্পদিনে অন্য হস্তে সমর্পণ করা যেতে পারে। উৎকোচ গ্রহণ যে করে আর যে উৎকোচ দান করে, উভয়েই এক দেশের লোক।

কালোবাজারীর খরিদ্দার তো আমরা। সুতরাং সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে যদি সবাই এক মন হই, সঙ্ঘবদ্ধ হই, দেশের দশা উন্নত হবে। কিন্তু গঠনের মন্ত্র উপেক্ষা করে বিচ্ছিন্নতা, ভাঙ্গন এবং হিংসা মন্ত্রের সাধনায় এ যুগসন্ধিতে আমাদের যাত্রা-পথ কোন দিকে হ'বে, তা কল্পনা করা সহজ। যদি বেঁচেও থাকি—দাসত্ব অনিবার্য্য।

আমরা আজ এ-দেশের মূল-মন্ত্র ভুলেছি, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। সর্বভূতে-সমজ্ঞান, সর্বভূতে-নির্বৈর, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, আজ এ-সব সত্য জীবনের কোনো কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে, একথা মনে হয় না। যে সব অমূল্য গ্রন্থে জীবন-রহস্য সমাধানের শাশ্বত নীতি বর্ণিত, আজ তাদের উপর আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি। নবীন সভ্যতার ভিত্তি—প্রত্যেকের মান, সম্পত্তি এবং দেহ সংরক্ষণের অধিকার আজ আমরা নাগরিকের দৃষ্টি ভঙ্গিতেও দেখি না। জগত আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির বাসস্থান এ-কথা আমরা বিস্মৃত। তাই নর-হত্যা, নারী-নিগ্রহ, তস্করতা এবং পরের অপমান সমাজকে কলুসিত করেছে। ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে পাপ বন্ধ করবার জন্য আমরা যে পাপ অনুষ্ঠান করেছি এবং যে কু-কর্মে আজও ব্যাপৃত, ধীর-ভাবে হিসাব করলে প্রাণ শিউরে ওঠে।

সঙ্ঘের দিক্ হ'তে এ-সব কু-কর্ম যেমন ব্যক্তিকে দুর্বল করে তেমনি সঙ্ঘকে নষ্ট করে। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হ'লে মানুষের সমষ্টি তিষ্ঠতে পারে না। এক মন্ত্রের সাধনা, প্রত্যেকের সাধারণ ইষ্টকে আপনার ইষ্ট ভাবা, দেশ-মাতৃকাকে জননী ভেবে দেশের নর-নারীকে ভাই-বোন ভাবা—সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। স্বার্থ-পর নর নিজেরও হিত সাধন করতে পারে না—পরের হিত-সাধন না করলে। যাকে জড়-প্রকৃতি বলি তার প্রাণ-শক্তির ঐ নিয়ম। বসন্তের হিল্লোলে শুক্‌নো পাতা ঝরে, তবে তরু পল্লবিত হয়।

আমি মনে করি আজ এই কালের যুগসন্ধিতে আমরা যে উচ্ছেদের পথকে গন্তব্য-পথ ভাবছি, এ-ক্ষণিক বিকারের ভ্রম। কেটে যাবে মেঘ, নবীন অরুণ দেখিয়ে দেবে সত্যযুগের পথ। আমাদের জাতীয় যজ্ঞ-শালায় আজ দুঃখের রক্ত-শিখা প্রজ্বলিত। প্রাণে আশা রাখতে হবে—বৃথা আশা নয়, নিরাশার বিফলতায় বিকল মনের জল্পনা নয়। জাগ্রত ভগবানকে আন্তরিক দুঃখ জানিয়ে, পরিত্রাণ যাচিঞা করতে হ'বে।

আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন-ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ-ভার হান অশনি-পাতে
ছায়া-ভয়-চকিত-মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে।

একতা নষ্ট হয় এমন কোনো সমাজদ্রোহী আত্মঘাতী কু-কর্মে নবীনযুগ আমাদের সত্য-যুগে পৌঁছে দেবে না। অতি-প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রের সাধনায় শক্তি উদ্ধার করতে হবে।

সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম—
তোমরা সম্মিলিত হও; এক কথা বল, একমত হও।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
মন্ত্র সমান, সমিতি সমান, চিত্ত ও মন সমান।
সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি!

তোমাদের সঙ্কল্প সমান হক, হৃদয় সমান হক, মন সমান হক, যাতে তোমাদের সুন্দর সাহিত্য (মিল) হ'তে পারে।

(পূর্বানুবৃত্তি)
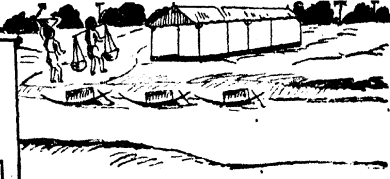
মানুষের জীবনে এক এক সময় অকস্মাৎ একটা আবেগ আসে—ভূমিকম্পের মত পাহাড়ীয়া নদীতে ধ্বসিয়া-পড়া তুষার-স্তূপ-বিগলিত জলোচ্ছ্বাসের মত; সব ভাঙিয়া চুরিয়া জীবনকে একটা নূতন রূপ দিয়া যায়। তেমন আবেগ যখন আসে তখন সে যেমন উন্মত্ত অধীর—কোন কিছুর বাধা মানে না—কিছুতে লজ্জা থাকে না, ঘৃণা থাকে না, তেমনি আবার বিপরীত শান্ত স্থির প্রসন্ন মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করে রূপান্তরিত নবজীবনে। সে তাহার জন্য কাহাকেও দোষী করে না—নিজেকেও দোষ দেয় না। অরুণার অবস্থা সেই রূপান্তরিত অবস্থা। জীবনে তাহার প্রচণ্ড কম্পন বহিয়া গেছে। সে কম্পন কেমন করিয়া আসিল সে কথা সে জানে, কিন্তু কোথায় ছিল এত আবেগ তাহা সে কল্পনা করিতে পারে না।

স্বর্ণ বলিয়াছে, অরুণাও অস্বীকার করে না—বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাহার জন্য বেদনা বহন করিয়াও বাহিরে সে কোন দিন এ বেদনার [illegible]কে বড় হইতে দেয় নাই। বৈধব্যকে জীবনের আচরণে ব্যবহারে ফুটাইয়া তুলিতে চায় নাই—দেয়ও নাই। সে বৈধব্যের প্রচলিত বিধিকে অন্যায় অহেতুক বলিয়া মনে করিয়াছে। ভাবিয়াছিল—সে নিজেও ভাবিয়াছিল, তাহার অন্তরঙ্গ জনেরাও ভাবিয়াছিল—সময়ের ব্যবধানে মন স্বাভাবিকভাবে বিশ্বনাথকে বিস্মৃতির আবরণে আবরিত করিয়া বিলুপ্ত করিয়া দিবে। নিঃশেষিত পুষ্পফল রিক্ত গাছের জীবনে বৎসরান্তে আবার আসে যেমন নব বসন্ত—তেমনি তাহার জীবনেও আসিবে নূতন বসন্ত। তাহার জীবনে সেই নিয়মের গতিরও কোন ব্যতিক্রম ছিল না। ধীরে ধীরে আর একজনের সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতাও গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। কয়েক মাস আগেও সে তাহাকে বলিয়াছিল—"আর না, এর শেষ করে ফেলব এইবার। তুমি ব্যবস্থা কর।" সবই স্থির ছিল। কল্পনাও সে অনেক করিয়াছিল। এই সামান্য শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, মহানগরীর প্রাসাদ-শিখরের এক কোণে খানিকটা স্থান অধিকার করিয়া নীড় বাঁধিবে—জীবনব্রতের বিপুল বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন আবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। শুধু সে বুঝিতে পারে নাই বিশ্বনাথকে সে কতখানি ভালবাসিত, সে তাহার জীবন কতখানি জুড়িয়া আছে।

সে দিন প্লাটফর্ম্মের উপর প্রচণ্ড একটা আক্রোশ লইয়া ন্যায়রত্নের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার হাত ধরিয়া থাকিতে দেখিয়া যে দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বনাথের দিকে তাকাইয়াছিলেন—সে দৃষ্টি তাহার বুকে বিষাক্ত শলাকার মত বিঁধিয়াছিল। তাহার জ্বালা সে কোন দিন ভুলিতে পারে নাই। মানুষ ভুলিতে পারে না, সচেতন ভাবে পুষিয়া না রাখিলেও তাহার অজ্ঞাতসারে মূলজ উদ্ভিদের মত অন্তরে অন্তরে বাঁচিয়া থাকে; সুযোগ মিলিলে সে-দিন সে পাথর ফাটাইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ন্যায়রত্নের সঙ্গে প্লাটফর্মের উপর সাক্ষাতের ক্ষণটি ছিল সেই ক্ষণ। কিন্তু কি করিতে গিয়া কি করিয়া বসিল সে! কথা বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি পড়িল অজয়ের মুখের উপর। সে কি হইয়া গেল! যোল সতের বৎসর বয়সের কিশোর অজয়! সে কি অজয়! বহুদিন পূর্ব্বে অরুণার দাদা সেবার ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে—অরুণার বয়স তখন দশ কি এগার, একদিন অরুণার দাদা এমনি—অবিকল এমনি এক কিশোরকে তাহাদের বাসায় লইয়া আসিয়াছিল। সে-দিনটি তাহার জীবনে অক্ষয় হইয়া আছে। তাহার দাদা তাহাকে বলিয়াছিল—বিশুকে তুই গান শুনিয়ে দে।

সে বলিয়াছিল—না। দাদার উপর বিরক্ত হইয়াছিল—তাহার বন্ধু হইলেই আর কি তাহাকে গান শুনাইতে হইবে।

দাদা বলিয়াছিল—বিশুও শোনাবে তা হ'লে।

—উনি গান গাইতে পারেন ?

—গান না, সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করে শোনাবে। সে তোর গানের চেয়ে অনেক ভাল।

সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করিবে—এইটুকু ছেলে! তাহার দাদা ফার্ষ্ট ক্লাস অবধি সংস্কৃত লইয়া হিমসিম খাইয়াছে, অনুস্বার বিসর্গযুক্ত ভাষাটাকে একখানা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মত শক্ত মনে হইত, দাদা ক্রমাগত মুখস্ত করিত—কস্মিশ্চিত কস্মিশ্চিত কস্মিশ্চিত বনোদ্দেশে বনোদ্দেশে এ্যাঁ—এ্যাঁ কস্মিশ্চিত কস্মিশ্চিত। সেই ভাষায় কাব্য আবৃত্তি করিবে এবং সেই আবৃত্তি তাহার গানের চেয়েও ভাল লাগিবে। হঠাৎ মনে হইয়াছিল, তাহার দাদা নিশ্চয়ই এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটিকে দিয়া হাস্যকর কিছু শুনাইবার জন্য এমন ভণিতা করিতেছে। দাদার গম্ভীরভাবে রসিকতা করার স্বভাব তো তাহার চেয়ে কেহ বেশী জানে না। ছোট্ট পকেট আয়না কিনিয়া আনিয়া দাদা বলে—এই অরুণা—আজ একটা বাঁদর পেয়েছি রে।

—বাঁদর! কই? কোথায়?

—আছে। আছে।

—মিথ্যে কথা!

—তোর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি সত্যি কথা!

—কোত্থেকে কিনলে? টাকা কোথায় পেলে?

—কিনতে হয় নি, ভগবান দিয়েছেন।

—কই? দেখাও।

—চোখ বোজ। আমি নিয়ে আসি।

অরুণা চোখ বন্ধ করিবার পরই দাদা বলিত—দেখ এইবার।

চোখ খুলিয়া অরুণা দেখিত—তাহার মুখের সামনে ছোট আয়নাখানি। দাদা বলিত, বাঁদর নয় বাঁদরী। আয়নার মধ্যে দেখ। দেখ দেখ কেমন দাঁত বের করেছে।

অরুণার সর্দ্দি হইলে দাদা হঠাৎ বলিত—দুটো নাম বের করেছি অরুণা। তোর একটা আমার একটা। বুঝলি। এ নাম পালটে ফেলব ঠিক করেছি।

—নাম? কি নাম?

—একটা হ'ল 'খাস্ কি?' আর একটা হ'ল 'সিক্‌নি'।

—যাঃ। ওই নাম কি হবে?

—হবে। তোকে যখন—সকলকে না জানিয়ে ডাকব—তুই যখন আমাকে কাউকে না জানিয়ে ডাকবি—তখন কি মজা হবে বল তো। কেউ বুঝবে না—অথচ আমরা বুঝব!

—সে ভাল হবে।

—তা হ'লে কোন্ নামটা তুই নিবি বল? 'সিকনি'?

—ও। আমার সর্দ্দি হয়েছে বলে ঠাট্টা হচ্ছে!

—বেশ তো—তা হ'লে—আমার নামই 'সিকনি'।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। সিকনি—সিক-নি তুমি সিক-নি।

—তা হ'লে অভ্যেস করে নে। আগে আমি ডাকি। তারপর তুই সাড়া দিবি। আমি তোর নাম ধ'রে ডাকব, তুই আমার নাম ধরে সাড়া দিবি। আচ্ছা—এই খাস কি?

—সিকনি! না বুঝিয়াই উত্তর দিত অরুণা।

—খাস কি?

—সিকনি!

—কি বল্লি? কি খাস?

অরুণা এবার বুঝিয়া হাউমাউ করিয়া উঠিত।

সেই দাদা তো! অরুণা উৎসাহিত হইয়া গান গাহিয়া শুনাইয়া বলিয়াছিল—কই এইবার ওঁকে বল—সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করতে! হাসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল সে—মনে মনে পুরোহিত মহাশয়ের—বিড় বিড় বজবজ মন্ত্রোচ্চারণ করার স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছিল। মুখ গুঁজিয়া হাসিবার জন্য উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে অবাক হইয়া গেল।

বিশু বলিল—রঘুবংশ থেকে আবৃত্তি করছি।

রঘুবংশ? মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ। এইটুকু ছেলে—। তাহার সবিস্ময় চিন্তা শুম্ভিত হইয়া গেল পরের মুহূর্ত্তে। এইটুকু ছেলেটি বলিল—রঘুপতি ভগবান রামচন্দ্র জনকতনয়া সীতাকে—লঙ্কার যুদ্ধ শেষে উদ্ধার ক'রে নিয়ে পুষ্পক-রথে আরোহণ করে ফিরছেন। বনবাসের কালও উত্তীর্ণ হয়েছে। ফিরছেন অযোধ্যাভিমুখে। রথ—পুষ্পক-রথ আকাশমার্গে উঠেছে সশব্দে। নীচে দেখা যাচ্ছে সসাগরা ধরিত্রী। এখন দেখা যাচ্ছে শুধু সমুদ্র। রামচন্দ্র সেই শোভা দেখে নিজে মুগ্ধ হয়েছেন—সেই

বিমুগ্ধতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি প্রিয়তমা জানকীকে ডেকে বললেন—বৈদেহি! দেখ—

বলিয়া কথার শেষে ছেদ টানিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করিল গানের মত সুর করিয়া—প্রায় গান গাহিয়া আবৃত্তি—

"বৈদেহি! পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম।
ছায়া পথে নৈব শরৎ প্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতাম।"

বিশ্বনাথ গান শিখিতে চেষ্টা করে নাই, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ছিল বড় মধুর। যেমন গম্ভীর তেমনি মধুর ঝঙ্কারময়। আর এই পিতামহটির শিক্ষায় হয়তো—বংশ-রক্তের স্বভাব গুণেও বটে—সংস্কৃত কবিতা এমন অপরূপ আবৃত্তি করিত যে—শ্রোতার মনেই শুধু নয়—তানপুরার গম্ভীর সঙ্গীত ধ্বনির মত সমগ্র স্থানটিতে একটা মোহের সঞ্চার হইত। শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া গেল। একটানা দীর্ঘায়িত সুরধ্বনি যেন বাজিয়া বাজিয়া চলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে থামিয়া সহজ সুরে, কিন্তু ওই সঙ্গীতের সঙ্গে ভাষায় ভঙ্গিতে ভাবে আশ্চর্য্যভাবে সমতা এবং সঙ্গতি রাখিয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছিল। অরুণার মুখের দিকে চাহিয়াই সে বলিতেছিল—"ঐ দেখ—সমুদ্রের বালুবেলাতে বিশালকায় অজগরেরা পড়ে আছে দেখ।"

"বেলা নিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গা মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জ্জথু নির্বিশেষাঃ।
সূর্য্যাংশু-সম্পর্ক-সমৃদ্ধ রাগৈর্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফনস্থৈঃ॥

অবাক হইয়া গিয়াছিল অরুণা সেদিন। হয় তো বা মুগ্ধ হইয়া তাকে সেইদিনই প্রথম ভালবাসিয়াছিল। নহিলে সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি তাহার মনে এমন—'সূর্য্যাংশু-সম্পর্ক-সমৃদ্ধ' সাপের মাথার মণির মত এমন উজ্জ্বল ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে কেন? সে তো আজ বহুদিনের কথা, দূরত্ব মাপিতে গেলে পুষ্পকরথারূঢ় রাম সীতা আর অধোলোকের সমুদ্র বালুবেলার দূরত্বের চেয়েও বেশী। বিশ্বনাথের সঙ্গে তাহার পরিচয়ের স্মৃতি অন্তরঙ্গতার স্মৃতি ওই বিচিত্রবর্ণ অজগর দেহের মত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে—দূর হইতে ওই মণি-দীপ্তির মত ওই প্রথম পরিচয়টুকু না থাকিলে—সে পরিচয়ের আদিঅন্ত খুঁজিয়াই পাওয়া যাইত না। সে দিনের স্মৃতির সঙ্গে সে দিনের বিশ্বনাথের কিশোর রূপও মণিময় বিগ্রহের মত অন্তরলোকে অক্ষয় দীপ্তিতে দীপ্তিমান হইয়া রহিয়াছে!

সে দিন প্লাটফর্ম্মের উপর সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেই মণিময় বিগ্রহ যেন তাহার অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ছুটিয়া দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যাইতে চাহিতেছে! বলিতেছে—না—না—না! ঠাকুর না!

প্লাটফর্মের উপর হইতে লাইনের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ভূমিকম্প হইয়া গেল। প্রবল—প্রচণ্ড—সর্ব্বধ্বংসী। বর্ত্তমানে সকল কিছুকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফাটাইয়া—পাহাড় মিলাইয়া গেল—সেখানে জাগিয়া উঠিল বিশাল সমুদ্র, সমুদ্রের জলে আকাশস্পর্শী জলোচ্ছ্বাস উঠিল—প্লাবিত করিয়াছিল পৃথিবী, সমুদ্রে জাগিয়া উঠিল মহাদেশ—সমতলে জাগিয়া উঠিল গিরিশৃঙ্গ; ধ্বংস করিয়া নূতন রচনা করিয়া এক অভিনয়ের আবির্ভাবের সূচনা করিয়া দিল।

তাহার অন্তরাত্মা চীৎকার করিয়া উঠিল—সব মিথ্যা—সব ভ্রম। সে জীবনে আর কাহাকেও কখনও চাহে নাই, চায় না, চাহিতে পারে না। শুধু এই ইহাকেই চাহিয়াছিল সে। ইহাকেই সে চায়।

তাই সকল মর্য্যাদা সকল শিক্ষার উদ্ধত অহঙ্কার, এক মুহূর্ত্তে প্রবল মাদকের আচ্ছন্নতার মত মিলাইয়া গিয়া জাগিয়া উঠিল নিদারুণ তৃষ্ণা। মনে হইল জীবন মিথ্যা—জন্ম মিথ্যা—যদি সে অজয়কে না পায়। বিশ্বনাথকে সে কত ভালবাসিত—সে সেইদিন সেই পরম মুহূর্ত্তটিতে অনুভব করিল। ওই ছেলেটিকে সে চায়—তাহাকে তাহার—পাইতেই হইবে। অন্যথায় ব্রত মিথ্যা—বুদ্ধি মিথ্যা—বিদ্যা মিথ্যা—এই পৃথিবীটাই মিথ্যা। সে অনুভব করিল—জীবনে এমন ভালবাসা আছে—যে ভালবাসাকে কাল ক্ষয় করিতে পারে না, দেহের ক্ষুধায় তাহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না, বুদ্ধি জগতের সকল বিচার, সকল সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ করিয়া দেয়—সে ভ্রান্তি নয়—সে সত্য।

এত কথা সে সেদিন বিচার করে নাই। সেদিন সে-শুধু উন্মত্তের মত—অন্তরে অন্তরে দুই হাত বাড়াইয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল অন্তরের সেই মণিময় বিগ্রহকে; যে মণিময় বিগ্রহ এতদিন ধূলার আবরণে আবৃত হইয়া

পড়িয়াছিল—আজিকার বিপর্য্যয়ে-কম্পনে-ঝড়ে—সে যেন সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গে—সর্ব্বমালিন্য মুক্ত হইয়া—দীপ্তিমান হইয়া হাসিতেছে।

ন্যায়রত্নকে সে নিজেই বলিয়াছিল—সে কাশী যাইবে। অজয় কাশীর ট্রেণে উঠিয়া চড়িয়াছে, গৌর সঙ্গে গিয়াছে, সেও যাইবে। সে তাহাকে ধরিয়া আনিবে—একান্ত আপনার করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে।

ন্যায়রত্ন আপত্তি করেন নাই। তিনি কোন কিছুতেই আপত্তি করেন না। প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। কথনও কথনও বলেন—মৃত যা—অতীত যা—তা শুধু সাক্ষ্যই দেয় নীরবে, আপত্তি তো সে করে না। আমি তাই।

মোগলসরাইয়ের কাছাকাছি আসিয়া অরুণা অধীর অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার হাত-পা ঘামিতে লাগিল। প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিল!

কি বলিবে সে?—

বলিবে—অকপটে বলিবে—সব কথা। বলিবে—অজয় আমি তোমার মা! কোন ধর্ম্মে কোন নীতিতে তুমি 'না' বলতে পার বল?

হঠাৎ তাহার মনে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। অজয়ের প্রশ্ন—সে নিজেই আবিষ্কার করিল।—গর্ভে ধরার অধিকার তো তোমার নাই। তবে বল, কোন দাবী তোমার?

—তিনি যে আমাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনিই যে আমার সব—! তাঁর অভাবে সব যে আমার শূন্য হয়ে গেছে। তুমি তাঁর পুত্র—আমার সকল শূন্যতাকে পূর্ণ করার দায়িত্ব যে তোমার।

—সে পরিচয় তো তুমি বহন করছ না! পৃথিবী তোমার শূন্য কেমন করে বিশ্বাস করব আমি? তোমার এই বেশ—ভূষা—তোমার—এই—।

আর সে ভাবিতে পারে নাই, পাগলের মত—চলন্ত ট্রেণের মধ্যেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। না—সে অজয়ের সামনে গিয়া এই মূর্ত্তিতে দাঁড়াইতে পারিবে না! দরজা খুলিবারও চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। ট্রেণের দরজায় চাবী দেওয়া ছিল। সে নিজেই দিয়াছিল। সে মুহূর্ত্তে চাবীটার কথা মনে পড়ে নাই। নহিলে হয়তো—সাময়িক উন্মত্ততার মধ্যে—সেদিন সে জীবনান্তই করিয়া বসিত।

মোগলসরাইয়ে নামিয়া—সে একটাবেলা নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া—শেষে কলিকাতার টিকিট করিয়া—কলিকাতার বাসায় গিয়া উঠিয়াছিল।

অরুণার দিদিমা তাহার মুখ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন—এ কি?

অরুণা বলিয়াছিল—আমাকে তোমার একখানা থান কাপড় দাও দেখি আগে। (ক্রমশঃ)

ভগবান্ মহাবীরের পারণ

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

১

সে-কাল ও সে-সময়ের কথা।

সেই অতি পুরাতন কালে—আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে উত্তর ভারতে কৌশাম্বী নাম্নী এক মহানগরী ছিল।

মহানগরী কৌশাম্বীর রাজমার্গ দিয়া এক উন্নতবপু, গৌরবর্ণ, বিশালবক্ষ, নগ্ন সন্ন্যাসী ধীর-পদ-বিক্ষেপে আহার্য ভিক্ষার জন্য পথ-পার্শ্বস্থিত প্রত্যেক গৃহে গমন করিতেছেন এবং ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া রিক্তহস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তাঁহার বদন মণ্ডল হইতে অসীম শান্তি ও অপরিসীম করুণার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, তপঃক্লিষ্ট শরীর হইতে তপস্তেজ উদ্ভাসিত হইতেছে। ভিক্ষা না পাওয়ায় সামান্য মাত্রও চিত্ত-চাঞ্চল্য তাঁহার গতি অগতিতে পরিলক্ষিত হইতেছে না।

দিনের পর দিন এই মহান্ তপস্বী কৌশাম্বীর পথে পথে ভিক্ষার্থ পরিভ্রমণ করেন ও কোথাও ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া নগরীর বহির্ভাগে স্থিত উপবনে গমন করিয়া শান্তচিত্তে ধ্যান করিতে থাকেন।

কে এই মহান্ তপস্বী? কেনই বা তিনি প্রতিদিন ভিক্ষার্থ আগমন করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন?

ইনি শ্রমণ মহাবীর। তথনও মহাবীরের সাধক জীবন অতিবাহিত হয় নাই—কেবল জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন নাই। আত্মার পূর্ণ বিকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ঘোর তপস্যার দ্বারা কর্মক্ষয় করিতে তিনি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে পর্যটন করিতেছেন।

এই তেজঃপুঞ্জ তপস্বীর কথা ক্রমে কৌশাম্বীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত

হইল। নগরীর সমস্ত অধিবাসী আতঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়া উঠিল। মহারাজ শতানীকের পট্টমহিষী, অনুপম রূপবতী পদ্মগন্ধা মৃগাবতীও এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ত্রস্ত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি নগরীতে ঘোষণা করাইলেন যে প্রত্যেক গৃহে যেন নানাপ্রকার আহার্য প্রস্তুত করিয়া গৃহকর্ত্রী তপস্বীকে ভিক্ষা প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকে, এবং তিনি স্বয়ং রাজোপযোগী বহু প্রকার চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আহার্য প্রস্তুত করাইয়া তপস্বীকে স্বহস্তে পারণ করাইতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। তপস্বী কোথাও আহার্য গ্রহণ না করিয়াই দিনের পর দিন প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিলেন।

২

অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা মহানগরী অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী। এই নগরীর সুপ্রশস্ত রাজপথসমূহ নানা প্রকার নয়ন-লোভন পণ্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ বিপনীশ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত হইয়া দূর-দূরান্তর হইতে ক্রেতাগণকে আকর্ষণ করিতেছে। দেশ বিদেশ হইতে আগত সার্থবাহগণের কলরবে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। এখানকার সামুদ্র-বণিক্‌গণ নানা প্রকার পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যতরী লইয়া গঙ্গা মহানদীর মধ্য দিয়া সমুদ্রের অপর পারে স্থিত নানা দেশে বাণিজ্য করিতে যাতায়াত করিতেছে। মহারাজ দধিবাহনের সুশাসনে প্রজাগণ সুখে ও নিরুদ্বেগে স্ব স্ব কার্যে রত থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেছে।

হঠাৎ চম্পা নগরীতে সংবাদ আসিল যে কৌশাম্বীর অধিপতি মহারাজ শতানীক অগণিত সৈন্য লইয়া চম্পা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। নগরীর প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করা হইল। মহারাজ দধিবাহন যত সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা লইয়া এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করিতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। শতানীকের আদেশে চম্পার রাজান্তঃপুর লুণ্ঠিত হইল। মহারাজ্ঞী ধারিণী ও রাজকন্যা বসুমতীকে কৌশাম্বীর এক সৈনিক ধরিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে ধারিণী আত্মহত্যা করিয়া অপমান হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সৈনিক বসুমতীকে ধরিয়া কৌশাম্বীতে আনয়ন করিল।

৩

সৈনিক কৌশাম্বীর চতুষ্পথে বসুমতীকে বিক্রয় করিলে ধনাবহ শ্রেষ্ঠী তাহাকে ক্রয় করিয়া দাসীরূপে গৃহে আনয়ন করিল। কিন্তু বসুমতীর বিনয়-নম্র ব্যবহার ও রূপ মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠী তাহাকে কন্যারূপে পালন করিতে লাগিল ও চন্দনা নামে অভিহিত করিল। চন্দনার রূপ লাবণ্য ও শ্রেষ্ঠীর স্নেহ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী ইহাতে ঈর্ষায় দগ্ধ হইয়া চন্দনাকে বিনাশ করিবার সংকল্প করিল।

একদা কোন কার্যোপলক্ষে শ্রেষ্ঠী তিন দিনের জন্য অন্য স্থানে গমন করিলে শ্রেষ্ঠীপত্নী এই সুযোগে চন্দনার মস্তক মুণ্ডন ও পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গৃহের সর্বনিম্নতলে পথপার্শ্বস্থিত একটী অন্ধকার ছোট কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া স্বয়ং পিত্রালয়ে গমন করিল।

শ্রেষ্ঠী চতুর্থ দিবসে গৃহে আগমন করিয়া স্ত্রী ও চন্দনা উভয়কে দেখিতে না পাইয়া দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রীর পিত্রালয়ে গমন সংবাদ জানিতে পারিল, কিন্তু চন্দনার সংবাদ দিতে কোন দাসীর সাহস হইল না। বহু অনুসন্ধান করিতে করিতে এক বৃদ্ধা দাসীর নিকট অবগত হইল যে চন্দনা সর্বনিম্নতলের অন্ধকার কুঠরীতে আবদ্ধ। শ্রেষ্ঠী চন্দনার দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তিন দিনের অনাহার-ক্লিষ্টা চন্দনাকে আহার্য দিবার ইচ্ছায় অনুসন্ধান করিয়া কেবলমাত্র দাসীগণের জন্য প্রস্তুত মাষকলাই সিদ্ধ প্রাপ্ত হইল এবং তাহাই এক সূর্পে করিয়া চন্দনাকে আহার করিতে প্রদান করিয়া তাহার শৃঙ্খল উন্মোচন করাইতে লোহকারকে আনিতে গমন করিল।

৪

ভগবান্ মহাবীর আহার্য ভিক্ষা করিবার জন্য সেই দিন সেই পথ দিয়াই যাইতেছিলেন। পথপার্শ্বস্থ কুঠরী হইতে চন্দনা তাহা দেখিতে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে পারণ করাইয়া স্বয়ং আহার করিবে মনে করিয়া তাঁহাকে মাষকলাই সিদ্ধ গ্রহণ করিতে অনুনয় করিল। মহাবীর তাহাকে দেখিয়া আহার্য গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারিত করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার হস্ত সংকুচিত করিয়া প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তপস্বী আহার্য গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া চন্দনা বিচলিত হইয়া উঠিল। এতদিনের নির্যাতন, অপমান, দুঃখ, কষ্ট আজ তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। সে চিৎকার করিয়া উঠিল—হে প্রভু, তুমিও কি এই অভাগীর প্রতি বিমুখ। দরবিগলিত ধারায় তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তাহার চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান মহাবীর তাহার প্রতি আবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ধীর পদ-বিক্ষেপে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার হস্ত হইতে মাষকলাই সিদ্ধ গ্রহণ করিয়া দীর্ঘদিনের উপবাসের পারণ করিলেন। (১) আকাশে দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইল ও দেবগণ কর্তৃক রত্ন বর্ষিত হইল।

চকিতে এই সংবাদ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মহারাণী মৃগাবতী এই ভাগ্যবতী দাসীকে দর্শন করিবার জন্য শ্রেষ্ঠীর গৃহে আগমন করিলেন ও চন্দনার প্রকৃত পরিচয় জানিয়া তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

এই ঘটনার কিছু পরে ভগবান মহাবীর কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে চন্দনা তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও সাধ্বী সংঘের অধিনায়িকা পদে অধিষ্ঠিত হন। কয়েক বৎসর শুদ্ধ সংযম পালন করিয়া সাধ্বী-শ্রেষ্ঠা মুক্তি প্রাপ্ত হন।

১। মহাবীর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে—কোন রাজপুত্রী তিন দিনের অনাহারে থাকিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ও রোরুদ্যমান অবস্থায় সূর্পের কোণে রক্ষিত মাষকলাই সিদ্ধ যতদিন পর্যন্ত প্রদান না করিবে ততদিন তিনি পারণ করিবেন না। চন্দনা প্রথমে কাঁদিতেছিল না বলিয়া তিনি আহার্য গ্রহণে উদ্যত হইয়াও প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু পরে তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেন। এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে জৈন পরিভাষায় 'অভিগ্রহ' বলে।

কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকরের জন্মস্থান

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

শাসন কাজের সুবিধার জন্য এক একটা প্রদেশকে যেমন আজকাল জেলা, মহকুমা প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত দেখা যায়, আগে মুসলমান রাজত্বের আমলে এক একটা প্রদেশ বা সুবাও তেমনি সরকার, পরগণা প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল। তখনকার দিনে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরস্থট নামে একটি সমৃদ্ধিশালী পরগণা ছিল। ভূরি ভূরি শ্রেষ্ঠী অর্থাৎ বহু ব্যবসায়ীর এই অঞ্চলে বাস ছিল বলেই নাকি জায়গাটার নাম হয়েছিল ভূরিশ্রেষ্ঠী। এই ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরস্থট পরগণার অধিকাংশটাই এখন হাওড়া জেলার আমতা থানার উত্তরাংশের অন্তর্ভুক্ত, বাকি অংশটা আমতা থানার সংলগ্ন হুগলী জেলার অন্তর্গত।

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রায় চার শ বছর ধ'রে এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ এই ভুরস্থটে প্রবল প্রতাপের সহিত রাজত্ব করেছিলেন। মোগল সম্রাট আকবরের সময় এই বংশের একজন রাণী —রাণী ভবশঙ্করী উড়িষ্যার পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাঢ় দেশ রক্ষা করেন। এইজন্য সম্রাট আকবর রাণী ভবশঙ্করীকে "রায় বাঘিনী" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ভুরস্থটের এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর নাম—চতুরানন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তিনি এই রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল দামোদর নদের তীরে ভবানীপুর গ্রামে। রাজা চতুরাননের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তাঁর নামে মাত্র এক কন্যা ছিল। রাজা চতুরানন ফুলিয়া নিবাসী সদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (কবি কৃত্তিবাসের বংশের) সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন। চতুরাননের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সদানন্দের দুই পুত্র জন্মায়। তাঁদের নাম—কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীমন্ত। সদানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ হয়েছিল। তার ফলে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ভবানীপুরেই থাকে, আর কনিষ্ঠ শ্রীমন্ত ভবানীপুরের ৩ মাইল দূরে দামোদরের অপর পারে "পার রাধানগর" বা পেঁড়ো গ্রামে এসে রাজধানী স্থাপন করেন।

বাইরের শত্রুদের হাত থেকে রাজধানীকে রক্ষা করবার জন্য ভবানীপুর ও পেঁড়ো উভয় রাজধানীর চারিদিকেই গড় বা খাল কাটা হয়েছিল। ভবানীপুর ও পেঁড়ো গ্রামের সেই গড় অনেকটা মজা অবস্থায় আজও বর্তমান রয়েছে। এমন কি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবনারায়ণ রাজা হয়ে ভবানীপুরে যে মণিনাথ মন্দির স্থাপন করেছিলেন, সেই মন্দির এবং মন্দিরের উপরিভাগে রাজা দেবনারায়ণের নাম ও মন্দির নির্মাণের তারিখ ১৩০৬ শকাব্দ (১৩৮৪ খৃঃ) ২১শে শ্রাবণ এখনও লেখা রয়েছে। পেঁড়ো গ্রামেও এই রাজাদের স্থাপিত কীর্তিকলাপ এখনও কিছু কিছু রয়েছে। ভবানীপুরে রাজাদের স্থাপিত একটি বিরাট মন্দিরও ধ্বংসাবস্থায় আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইসব মন্দিরের শক্ত গাঁথুনি ও নিখুঁত কারুকার্য দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। এ ছাড়া ভবানীপুরের রাজধানীর সিংহদ্বার, রাজাদের আমোদ উৎসবের জন্য যে সব নর্তকী ছিল তাদের আস্তানা—"নর্তকীখানা", রাজারা নদীতে যেখানে স্নান করতেন সেই "রাজার ঘাট", এঁদের প্রতিষ্ঠিত পুকুর "ফুলপুকুর" ও "জলহরি"—এ সবেরও অস্তিত্ব আজও ভবানীপুর গ্রামে কিছু কিছু রয়েছে। ভবানীপুর ও পেঁড়ো ছাড়া এই ব্রাহ্মণ রাজারা রাজ্যের অন্যান্য স্থানে যে সব নগর, গ্রাম, দুর্গ, দেবমন্দির প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন, সেগুলো প্রায় সমস্তই কালের স্রোতে নিশ্চিহ্ন না হয়ে, আজও বর্তমান থেকে তাঁদের কীর্তিকাহিনী ঘোষণা করছে।

ভুরস্থটের এই ব্রাহ্মণ রাজাদের সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক, বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় একস্থানে লিখেছেন—"এই রাজবংশ প্রায় চারিশত বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে দক্ষিণ-রাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অনেক কীর্তিকলাপও রাখিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশ ধ্বংস হইয়া যায় ও এই বংশের একজন বাঙ্গালার প্রধান কবি হইয়া উঠেন। ইনিই আমাদের রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়।"

রাজা শ্রীমন্তের বংশে অর্থাৎ পেঁড়োর রাজবংশে কবি ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। আনুমানিক ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র এই পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান এই পেঁড়ো আজও বর্তমান রয়েছে এবং তাঁর জ্ঞাতি বংশধরেরা রাজ্য ও জমিদারী হারালেও তাঁদের পূর্ব বংশ-মর্যাদা অনেকাংশে রক্ষা ক'রে আজও এই গ্রামে বাস করছেন। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায় বর্তমানে এই বংশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ভুরস্থটের ব্রাহ্মণ রাজাদের একটা শাখা পেঁড়ো গ্রামে আজও বাস করলেও, মূল রাজধানী ভবানীপুরে কিন্তু আজ এঁদের কেউই নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের আমলে ভবানীপুরের রাজ্য এঁদের হস্তচ্যুত হ'লে, এঁরা ভবানীপুর ত্যাগ ক'রে পেঁড়োর ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত বসন্তপুর গ্রামে চলে আসেন। এই বসন্তপুরে এঁদের বংশধরেরা আজও বাস করছেন।

কলকাতা থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে হাওড়া জেলার আমতা থানার মধ্যে কবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান পেঁড়ো গ্রামটি অবস্থিত। হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের মুন্সিরহাট স্টেশনে নেমে মাত্র চার মাইল পশ্চিমে গেলেই এই গ্রাম। যে কোনও সাহিত্যানুরাগী, বিশেষ ক'রে যাঁরা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখতে যান, তাঁরা ঘণ্টাকয়েক

সময় ও যাতায়াতে সামান্য মাত্র ১।৮০ আনা রেলভাড়া খরচ করলেই কবির এই জন্মস্থানটি দেখে আসতে পারেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা এমন কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও এই পরিশ্রমটুকু করতে নারাজ। অথচ তাঁরা ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভুল সংবাদ দিনের পর দিন পরিবেশন করছেন। এমন কি এঁরাও আবার এক এক জনে এক এক রকম কথা বলছেন। কেউ বলছেন—হুগলী জেলার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন। কেউ বলছেন—বর্ধমান জেলার পেঁড়ো গ্রামে। আবার কেউ বলছেন—"দক্ষিণ রাঢ়ে ভুরসিট পরগণায় পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে।" নিম্নে এ সবের কিছু কিছু উদ্ধৃত করা গেল। প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক্। কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাবই সব চেয়ে বেশী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বাঙ্গলা পাঠ্যপুস্তকে প্রতি বছরই ভারতচন্দ্রের কবিতা সংকলিত হয়। সেই উদ্ধৃত কবিতার মাথায় সংক্ষেপে কবির পরিচয় আছে। সেখানে লেখা আছে—"রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় হুগলী জেলার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।"

পেঁড়ো বসন্তপুর নামে কোনও গ্রাম যে হুগলী জেলার মধ্যে নাই এবং এই পেঁড়ো বসন্তপুর যে হাওড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তা জানেন না। ফলে না জেনে একটা ভুল সংবাদ তাঁরা ছাত্রদের শিখিয়ে যাচ্ছেন। এখানে আর একটা কথা এই যে, পেঁড়ো বসন্তপুর একটা গ্রাম নয়। পেঁড়োর ঠিক পূর্ব দিকে অবস্থিত বসন্তপুর নামক অন্য একটি গ্রাম পেঁড়োর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সাধারণত একই জেলায় বা কাছা-কাছি এক নামের একাধিক গ্রাম থাকলে, যাতে বুঝতে কষ্ট না হয়, সেজন্য বক্তব্য গ্রামটাকে বোঝাতে গিয়ে অনেক সময় সেই গ্রামের সঙ্গে আশপাশের আর একটা গ্রামের নামও যোগ করা হয়ে থাকে। পেঁড়ো নামে কোথাও যখন আর গ্রাম নেই, তখন বসন্তপুরের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বরং পেঁড়োর সঙ্গে বসন্তপুর যোগ করায় ছাত্ররা ভাবতে পারে যে "পেঁড়ো বসন্তপুর" একটিই গ্রাম।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মশায় তাঁর "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন—"ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর অনুমান ১৭১২ খৃঃ অব্দে ভুরসুট পরগণায় হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।"

পরগণা হচ্ছে জেলার অংশ। যেমন জেলার অংশ মহকুমা। অতএব ভুরসুট পরগণায় হুগলী বা হুগলী জেলা সঙ্গতিহীন। এখানে দীনেশবাবুর প্রসঙ্গে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার মাজু গ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৮শ অধিবেশনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাজু সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, হাওড়ার শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের স্মৃতি জাগরিত করা। এই সম্মিলনের মূল সভাপতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনিবার্য কারণবশত শেষ পর্যন্ত সম্মিলনে যোগদিতে না পারায় দীনেশবাবু সভাপতিত্ব করেছিলেন।

মাজুর এই সাহিত্যিক সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মাজুগ্রাম নিবাসী ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, দক্তের-এস্-লেত্তর (প্যারি) বেদান্ততীর্থ, শাস্ত্রী। তিনি তাঁর লিখিত অভিভাষণের প্রথমেই বলেছিলেন—"সর্ব প্রথমেই হাওড়া জেলার গৌরবরবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের নাম মনে আসে। এই মণ্ডপের পশ্চিমের বিশাল প্রান্তর দূর দিগন্তে যেখানে অস্পষ্ট নারিকেল তালীবনের নীল রেখায় মিলাইয়া গিয়াছে ঐখানে পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র রায়ের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রাসাদ ও গড় ছিল। কবির শৈশবকাল ঐখানেই কাটিয়াছিল।" (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ১৮শ অধিবেশন, কার্য্যবিবরণী : পৃঃ ৩)

সেদিন দীনেশবাবুও সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে সর্ব প্রথমেই বলেছিলেন—"মাজু হইতে বঙ্গের কবি-সম্রাট ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মভূমি বেশী দূরবর্তী নহে। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বতঃই তাঁহার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত হইতেছে।" (বঃ সাঃ সঃ ১৮শ অধিবেশন, কার্য্যবিবরণী পৃঃ ২৯)। এই কথার পর আরও প্রায় ৫০টি বাক্যে দীনেশবাবু সেদিন সভায় ভারতচন্দ্রের প্রশস্তি করেছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় অসুস্থতাবশতঃ সম্মিলনে উপস্থিত হতে না পারায় সম্মিলনের সাফল্যকামনা করে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন—"বাঙ্গলার একজন লেখকের স্মৃতি জাগরিত করিবার জন্য বাঙ্গলার সুদূর পল্লীগ্রামে আপনারা সম্মিলিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার যত নামী লেখক আছেন, সকলেই এখানে আসিয়াছেন···আপনাদের আগমন সার্থক হউক।" (বঃ সাঃ সঃ ১৮শ অধিবেশন, কার্য্যবিবরণী, পরিশিষ্ট পৃঃ ৫)

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মশায়ও শারীরিক অসুস্থতা-বশত সম্মিলনে যোগ দিতে পারেন নি। তাই তিনি এক পত্রে জানিয়েছিলেন—"রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্মভূমির নিকট নিভৃত পল্লীগ্রামে আপনারা সম্মিলনের যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গভাষানুরাগী সাহিত্যিক মাত্রেরই যোগদান বাঞ্ছনীয়।······আমার নিতান্ত ইচ্ছা থাকিলেও এই ১৮শ সম্মিলনে যোগদান করিতে না পারিয়া এই পত্র দ্বারা আমার শুভেচ্ছা, সম্মিলনের সাফল্য ও পল্লীবাসী কর্তৃক এই সদনুষ্ঠানের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।" (কার্য্যবিবরণী, পরিশিষ্ট পৃঃ ৭)

এ ছাড়া মাজু সম্মিলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে নাট্যাচার্য রসরাজ অমৃতলাল বসু, কবিশেখর কালিদাস রায়, কবি প্যারিমোহন সেনগুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ প্রভৃতি তাঁদের স্ব স্ব রচিত "ভারতচন্দ্র" সম্বন্ধীয় কবিতাও পাঠ করেছিলেন।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের সকালে ২৪ জন সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী মাজু থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত পেঁড়ো গ্রামে কবির

জন্মস্থান দেখতে যান। এঁরা গেলে কবির বংশধররা এঁদের যথাযোগ্য সমাদর ক'রে জলযোগে পরিতৃপ্ত করেন।

সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনে বিষয়-নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল—"যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হউক।" এজন্য ঐদিন সঙ্গে সঙ্গে একটি সমিতিও গঠিত হয়েছিল এবং তার সম্পাদক-সংঘে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি থাকেন।

বিষয়-নির্বাচন সমিতির অধিবেশনে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধীয় এই গৃহীত প্রস্তাব পঠিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে এই কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দেন। স্বয়ং দীনেশবাবু সেদিন সভায় ১০০৲ টাকা দেবেন ব'লে ঘোষণা করেন। এ ছাড়া দীনেশবাবু সেদিন মাজু সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের আরও বলেছিলেন—আপনারা ভারতচন্দ্রের জন্মস্থানে একটি স্মৃতি-মন্দির তৈরী করবার চেষ্টা করুন, আমি সেজন্য আরও ৫০০৲ টাকা দোব।

অবশ্য দীনেশবাবু সব সময়েই তাঁর এই প্রতিশ্রুত টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত চেষ্টার অভাবে ভারতচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী, তাঁর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ ও স্মৃতি-মন্দির কোনটাই হয়ে উঠেনি।

এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, দীনেশবাবু সমস্ত জেনে এবং দেখেই এসেছিলেন যে, হাওড়া জেলার আমতা থানার মধ্যে এই "পেঁড়ো" গ্রামটি অবস্থিত। অথচ তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা বিভাগের সর্বময় কর্তা হয়েও প্রবেশিকা বাঙ্গলা পুস্তকের উল্লিখিত ভুল সংশোধন করলেন না। তা ছাড়া মাজু সম্মেলনের পর তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" পরবর্তী সংস্করণগুলিতেও ঐ ভুল সংশোধন করলেন না। যা ছিল তাই রেখে দিলেন।

দীনেশবাবুর পর আর একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও লেখকের কথা ধরা যাক। তিনি ডাঃ সুকুমার সেন। সুকুমারবাবু "বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস" নামে যে বইখানি লিখেছেন, তাতে ভারতচন্দ্রের জন্মস্থানের কথা লিখিতে গিয়ে তিনি আর কোন জেলারই উল্লেখ করেন নি। তিনি লিখেছেন—"কবির পৈতৃক নিবাস ছিল দক্ষিণরাঢ়ে ভুরশিট পরগণায় পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে।"

আজকের দিনে জেলার কথা না ব'লে শুধু পরগণার উল্লেখ দুর্বোধ্য। বর্তমানে পরগণার প্রচলন না থাকায়, কেবল পরগণার কথা বললে কেউই বুঝতে পারবে না যে জায়গাটি কোথায়। অতএব বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ কবির কথা লিখতে গিয়ে তাঁর জন্মস্থান সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ সমীচীন হয়েছে বলে মনে হয় না।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ থেকে একখানি ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় ভারতচন্দ্রের জীবনীতে আবার পেঁড়ো গ্রামকে দেখা যাচ্ছে,—বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার মধ্যে। অবশ্য এই ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সম্পাদকগণ তাঁদের ভূমিকায় ভারতচন্দ্রের এই জীবনী উদ্ধৃত করেছেন, সংবাদ-প্রভাকর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা "কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত" নামক গ্রন্থ থেকে।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের লেখা এই বইটি প্রথম পুস্তকাকারে বেরিয়েছিল ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১লা আষাঢ় (১৮৫৫ খ্রীঃ) তারিখে। অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় একশ বছর পরে (মৃত্যু ১৭৬০ খ্রীঃ)। সেই সময়েই ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে নাকি ঈশ্বর গুপ্তকে দশটি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর "কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত" গ্রন্থে লিখেছেন—

"৺নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি "ভুরশুট" পরগণার মধ্যস্থিত "পেঁড়ো" নামক স্থানে বাস করিতেন।...ইহার বাটীর চতুর্দ্দিকে গড়বন্দি ছিল, এ কারণ সেই স্থান "পেঁড়োর গড়" নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ চতুর্ভুজ রায়, মধ্যম অর্জ্জুন রায়, তৃতীয় দয়ারাম রায়, সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভারতচন্দ্র রায়।......

এমত জনরব যে, অধিকারভুক্ত ভূমি সংক্রান্ত সীমা সম্বন্ধীয় কোন এক বিবাদ সূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন......মহারাণী সেই দুর্বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কোপান্বিতা হইয়া "আলমচন্দ্র" ও "ক্ষেমচন্দ্র" নামক আপনার দুইজন রাজপুত সেনাপতিকে কহিলেন—ভুরশুট অধিকার করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর, ইহা না হইলে আমি কোন মতেই জলগ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব।' এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত উক্ত সেনাপতিদ্বয় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেই রজনীতেই "ভবানীপুরের গড়" এবং "পেঁড়োর গড়" বল দ্বারা অধিকার করিয়া লইল।......

এতদ্ঘটনায় নরেন্দ্র রায় এককালেই নিঃস্ব হইলেন, সর্ব্বস্বই গেল, কোনরূপে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এই সময় ভারতচন্দ্র পলায়ন করত মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুরের সান্নিধ্য "নওয়াপাড়া" গ্রামে আপনার মাতুলালয়ে বাস করত তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার এবং অভিধান পাঠ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের সান্নিধ্য সারদা নামক গ্রামের কেশরকুলি আচার্য্যদিগের একটি কন্যাকে বিবাহ করিলেন,..."

ঈশ্বর গুপ্তের লেখা থেকে এই উদ্ধৃত অংশে যে সকল গ্রামের নাম আছে—পেঁড়ো, ভবানীপুর, গাজীপুর, নওয়াপাড়া, তাজপুর, সারদা—সব কটি গ্রামই আজও বর্তমান এবং এগুলি সবই হাওড়া জেলায় অবস্থিত। এমন কি একই থানা—আমতা থানার মধ্যে গ্রামগুলি বর্তমান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—পেঁড়ো গ্রাম হাওড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত হওয়া সত্বেও এই সব সাহিত্যিকরা বর্ধমান ও হুগলী জেলার নাম করছেন

কেন? এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতচন্দ্রের জন্মের সময় এই পেঁড়ো গ্রাম বর্ধমানেরই অন্তর্গত ছিল। তখন হাওড়া নামে কোন জেলা ছিল না। পরে পেঁড়ো আবার বর্ধমান থেকে পৃথক হয়ে হুগলী জেলার অন্তর্গত হয়। তারপর শেষে হাওড়া জেলার মধ্যে আসে। এই প্রসঙ্গে প্রথম হাওড়া জেলা কিভাবে গঠিত হয় "Bengal District Gazatteers, Howrah" নামক গ্রন্থ থেকে নিয়ে সে সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।—

"After the decennial Settlement in 1793, Hooghly, with the greater part of Howrah, was detached from Burdwan, and created a separate Magisterial charge; but no change was made in the collectorate. At that time thanas Bagnan and Amta were placed in the Hooghly jurisdiction, but Howrah city formed a part of Calcutta, its criminal cases being tried by the Magistrate and Judge of the 24 Parganas, who used to come over once a week. In 1814 thana Rajapur (now Domjur), and in 1819 thanas Kotra (now Shyampur) and Uluberia were transferred from the 24 Parganas to Hooghly. On the 1st May 1822 the Hooghly and Howrah Collectorate was entirely separated from Burdwan. In the meantime the city of Howrah had been growing steadily, and its increasing importance led to another change, the Magisterial Jurisdiction of Howrah being separated from that of Hooghly in 1843, when Mr. William Tayler was appointed Magistrate of Howrah with Jurisdiction over Howrah, Salkia, Amta, Rajapur, Uluberia, Kotra and Bagnan."

উপরের উদ্ধৃত অংশ থেকে বেশ বোঝা গেল যে, আমতা থানার মধ্যস্থিত পেঁড়ো গ্রাম হাওড়া জেলার অন্তর্গত হওয়ার পূর্বে যথাক্রমে বর্ধমান ও হুগলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এখন আমাদের কথা হচ্ছে এই যে, হাওড়া পৃথক জেলা হওয়ায় এবং পেঁড়ো হাওড়ার মধ্যে আসা সত্ত্বেও কেউ যদি এখনও পেঁড়ো গ্রাম বর্ধমান বা হুগলীর অন্তর্গত বলেন তা হ'লে আজকে তা একেবারে অর্থহীন হবে। বর্তমানের উল্লেখ না করে শুধু পুরাতনের উল্লেখ করায় একটা মস্ত বড় ভুলের সৃষ্টি হবে। পেঁড়ো গ্রামকে বর্তমানে হাওড়া জেলায় না ব'লে যদি শুধু হুগলী বা বর্ধমানের মধ্যে বলা হয়, তা হ'লে অনুসন্ধিৎসুরা কবির জন্মস্থান খুঁজতে গিয়ে প্রাণান্ত করলেও উক্ত দুই জেলার কোথাও এই গ্রামের সন্ধান পাবেন না।

তাছাড়া পূর্বে কি ছিল বর্তমানে তার প্রয়োজনই বা কি? বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত জেলাই ত নানা সীমাপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের আজকেকার রূপগুলো লাভ করেছে। আজ যদি শুধু আগের দিনের কথাই ধরা যায় তাহলে ত বাঙ্গলার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিরই জন্মস্থান নিয়ে একটা জটিলতার সৃষ্টি হবে। এখানে একটা উদাহরণ দিলেই আশা করি ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। যেমন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ম'শায়ের জন্মের সময় তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম ছিল হুগলী জেলার মধ্যে। তখন ঘাটাল মহকুমাটাই ছিল হুগলীর অন্তর্গত। তাই বলে কি আমরা আজও লিখব যে, হুগলী জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর ম'শায় জন্মেছিলেন। এরূপ লেখার অর্থ ত ভুলের সৃষ্টি করা। কেননা হুগলী জেলায় আজ আর বীরসিংহ গ্রাম নেই। তাই বিদ্যাসাগরের সময় আমরা সকলেই যেমন লিখি মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর ম'শায় জন্মেছিলেন, তেমনি ভারতচন্দ্রের সময়ও লেখা উচিত—হাওড়া জেলায় পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন।

ভারতচন্দ্র যে বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মহাকালের বিচারে তা নির্ধারিত হয়ে গেছে। ভারতচন্দ্র তাঁর অসাধারণ কাব্য প্রতিভার গুণে বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আজও তাঁর আসন অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙ্গলা কাব্য সাহিত্যের এক চরম দুর্দিনে তিনি আবির্ভূত হয়ে বাঙ্গলা কাব্যকে নানা আবিলতার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হতে প্রকাশিত ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদকগণ তাই লিখেছেন—

"১৬৭৪ শকে (খৃষ্টাব্দ ১৭৫২) ভারতচন্দ্র তাঁহার—"অন্নদা মঙ্গল" কাব্য রচনা করেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের তখন অতিশয় দুর্দিন চলিতেছে। মহাজন-পদাবলী ও নানাবিধ মঙ্গল-কাব্যের অতিশয় ব্যর্থ অনুকৃতিতে এবং অন্য নানাবিধ বিকৃতিতে বঙ্গ-ভারতীর তলাকার পাঁক ঘুলাইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্র সরস বুলি এবং নিখুঁত ছন্দের সাহায্যে এই বিকারের প্রতিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট সাহিত্যের উপর নাগরিক সভ্যতার প্রলেপ বুলাইয়াছিলেন। এই কারণে অনেকে তাঁহাকে পুরাতন যুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলিয়া থাকেন।" নিখুঁত এবং বিপুল শব্দজ্ঞানের সাহায্যে ভারতচন্দ্র বাংলা কাব্যকে অপূর্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিলেন; রূপহীন কাদার তাল পাকাইয়া তিনি মনোহর মূর্তি গড়িয়াছিলেন।……আসলে ভারতচন্দ্র শুধু "ভাষার তাজমহল"ই গড়েন নাই, যুগের উপযোগী কাব্য সৃষ্টিও করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠে মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য্য।"

বাঙ্গলা সাহিত্যের এহেন একজন শ্রেষ্ঠ কবির জন্মস্থানের সঠিক পরিচয় আজও না জানা আমাদের জাতীয় জীবনে একটা লজ্জার কথা। আশা করি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকরা এবং অন্যান্য যাঁরা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখতে চান, তাঁরা এখন থেকে বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মস্থানের যথাযথ বিবরণ দেবেন।

কলিঙ্গ-কুমারী

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কলিঙ্গ রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী তীর্থ-ভ্রমণে যাইবেন। তাঁহার যাত্রার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। ওঙ্কারনাথ বর্ত্তমান মহারাজার পিতার সময় হইতে মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন। তিনি বিশেষ সম্মানিত। তিনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহকারীকে সুশিক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তীর্থ-যাত্রার পূর্ব্বদিন মহারাজা স্বয়ং তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন—কতদিনে তিনি ফিরিবেন, জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছেন। রাজধানীর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নে তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে বলিলেন, তিনি যে সহকারীকে উৎকল রাজের যুদ্ধ-যাত্রার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহার কারণ কি? মন্ত্রী বলিলেন, "আমি সংবাদ পাইয়াছি, পুরীরাজ কলিঙ্গ আক্রমণ করিবেন।"

"রাজকুমারীর পাণি-প্রার্থনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কি তাহার কারণ?"

"তাহাই।"

"যুদ্ধের ফল কি হইবে?"

"কলিঙ্গরাজের পরাজয়।"

"সে কথা কি মহারাজাকে বলা হইয়াছে?"

"আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি করিয়াছি। কিন্তু মোহাবিষ্ট মহারাজার বিপরীত বুদ্ধি প্রবল হইয়াছে—আর উপায় নাই।"

"কেন?"

"সে কথার আভাস তোমাকে দিয়াছি। মহারাণী ক্ষমতাপ্রিয়তাহেতু উপযুক্ত পাত্রে রাজকুমারীকে অর্পণ করিতে চাহেন না। আমার বিশ্বাস, যদি তাঁহার সন্তান থাকিত, তবে তিনি রাজকুমারীকে বিষ প্রয়োগ করিলেও আমি বিস্মিত হইতাম না। রাজা তাঁহার দ্বারা মোহাবিষ্ট।"

"পুরীরাজকে কন্যাদানে কি তবে সত্য সত্যই কলিঙ্গ রাজবংশের মর্য্যাদাহানি হইত না?"

"ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা ধর্ম্মাচরণে; রাজার বংশ-মর্য্যাদা বীর্য্য-পরিচয়ে। মহারাণীর যুদ্ধের অস্ত্র—পুরোহিতপুত্র বলিয়াছেন যে, "গঙ্গাবংশীয়দিগের সহিত উৎকলের সূর্য্যবংশীয়দিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাঁহারা বঙ্গ হইতে আসিয়াছিলেন এবং বঙ্গের অধিবাসীরা মৎস্যভোজী। কিন্তু আজ কোন্ আর্য্য বলিতে পারেন, বহু শতাব্দীর সম্মিলনফলে তাঁহার দেহে অনার্য্য রক্ত প্রবেশ করে নাই?"

"রাজ্যের আসন্ন বিপদের সময় কি এতদিন মন্ত্রিত্ব করিবার পর রাজ্যত্যাগ সঙ্গত হইবে?"

"যে রাজ্য গঠনে না হইলেও রক্ষায় দীর্ঘকাল আত্মনিয়োগ করিয়াছি, সেই রাজ্যের ও যে রাজপরিবারের সেবা এতদিন করিয়াছি সেই রাজপরিবারের পতন যখন নিবারণ করিতে পারিলাম না, তখন তাহা দেখিবার বেদনা ভোগ করিতে চাহি না।"

"কতদিনে রাজ্য আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা?"

"উৎকলবাহিনীর যাত্রার আর বিলম্ব নাই।"

"কলিঙ্গবাহিনী কি শক্তিশালী নহে?

"কলিঙ্গবাহিনী যে একদিন রাজ্যজয় করিয়াছিল, তাহার কারণ, রাজা হইতে সৈনিক সকলের সমবেত ও সম্মিলিত কার্য্য—রাজ্যের গৌরব রক্ষায় ত্যাগের আগ্রহ। সে ভাব আর নাই। আজ মহারাণীর জন্য পুরোহিতপুত্রও সেনাপতির কার্য্যে ত্রুটির উল্লেখ করিতে সাহস করে। সেনাপতির কর্ত্তব্যতৎপরতা কি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না?"

"এই অবস্থার প্রতীকার করা কি সম্ভব হয় নাই?"

"সম্ভব হইলে আমি তাহা করিতাম, এ বিশ্বাস কি—এতদিন স্বামীকে জানিয়াও—তোমার নাই?"

মন্ত্রীর পত্নী স্বামীকে জানিতেন। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না।

পরিজনগণকে সঙ্গে লইয়া কলিঙ্গরাজমন্ত্রী সেই দিন তীর্থ যাত্রায় রাজধানী ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন।

৬

উৎকলবাহিনী প্রবল ঝটিকার মত কলিঙ্গে প্রবেশ করিল। সে বাহিনী কালিদাসের বর্ণিত রঘুর দিগ্বিজয়-কালীন বাহিনীর মতই অগ্রসর হইল—

প্রথমে প্রতাপ তা'র, শব্দ তা'র পরে—
তা'র পরে ধূলিজাল ছাইল অম্বরে—
তা'র পরে চতুরঙ্গ সেনাদল চলে
গর্ব্বিত বিজয় গর্ব্বে দীপ্ত নিজ বলে।

কলিঙ্গসেনা রাজ্যসীমায় সমাবিষ্ট হইয়াছিল—উৎকল-বলকে বাধা দিল। সেই সময় সেনাপতি সংবাদ পাইলেন, রাজা ধন-রত্নসহ পরিজনগণকে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে মীণাক্ষী-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ জন্য মাদুরার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সংবাদ সেনাদলে ব্যাপ্ত হইল—তাহাদিগের উৎসাহ-বহ্নিতে যেন জল নিক্ষিপ্ত হইল। কলিঙ্গবাহিনী পরাভূত হইয়া পশ্চাতে আসিয়া বাধা দিবার আয়োজন করিল। প্রথম জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল উৎকল-সেনার আক্রমণ তাহারা সহ্য করিতে পারিল না—ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া উৎকলবাহিনী কলিঙ্গের রাজ-ধানীর উপকণ্ঠে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল। তখন দিগন্ত-তপন মেঘের উপরে রক্তপ্রলেপ দিয়া অন্ধকার-রাজ্যে প্রবেশোন্মুখ। রাজধানী সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা আছে মনে করিয়া সেনাপতি সে রাত্রিতে আর রাজধানীতে প্রবেশ-চেষ্টা করিলেন না।

রাত্রিকালেই তাঁহার চর সংবাদ আনিল, রাজধানী বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—রাজা সপরিবারে পলায়িত—প্রাসাদ শূন্য। তথাপি সেনাপতি রাজপ্রাসাদে গমনকালে আবশ্যক সতর্কতাবলম্বনে ত্রুটি করিলেন না—তিনি সশস্ত্র অশ্বারোহীদলের পুরোভাগে—রাজধানীর জন-শূন্যপ্রায় পথে অগ্রসর হইলেন—যে সকল অধিবাসী নগর ত্যাগ করে নাই তাহারা সেনাদলের আগমন সময় দ্বার রুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা দরিদ্র—দরিদ্রের ভয় কোথায়? অশ্বারোহীদিগের বর্শার ফলকে ও উন্মুক্ত তরবারের ফলকে রবিকর জ্বলিতে লাগিল। সেনাদল যখন প্রাসাদের পূর্ব্বসিংহদ্বারে উপনীত হইল, তখন দ্বার মুক্ত—প্রাঙ্গণ-মধ্যবর্ত্তী পথ অতিক্রম করিয়া এক অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী—একজনমাত্র বৃদ্ধা পরিচারিকাসহ অগ্রসর হইয়া আসিয়া মুক্ত দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রভাত-রবির আলোক যেন তাঁহাকে সৌন্দর্য্যস্নাত করিল—তাঁহার বস্ত্রের ও অলঙ্কারের হীরকে আলোক-সূচির উদ্ভব করিতে লাগিল।

সেনাপতি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তরুণীর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "আপনি কি কলিঙ্গরাজ-লক্ষ্মী? আমি বিষম সমরবিজয়ী পুরীরাজের আদেশে কলিঙ্গ বিজয়ে আসিয়াছি।"

তরুণী নতদৃষ্টি। তিনি বলিলেন, "না। আমি কলিঙ্গ-রাজের কন্যা।"

"আপনি কি মহারাজার সহিত পুরত্যাগ করেন নাই?"

"না। পুরীরাজের কলিঙ্গ আক্রমণ আমারই জন্য। প্রজার দুঃখ—অশ্বক্ষুরে ও সেনাপদে শস্যক্ষেত্রনাশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা—ধরণীর রক্তে রঞ্জন—এ সকল হইতে কলিঙ্গরাজ্যকে অব্যাহতি দিবার জন্য আমি পিতার অশ্রু উপেক্ষা ও পুরবাসীদিগের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া—পিতার সহিত পলায়নের অগৌরব-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বিজয়ীর নিকট বন্দী হইবার জন্য একাকী প্রাসাদে অপেক্ষা করিতেছি। আমাকে বন্দী করুন।"

সেনাপতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন—কয় মুহূর্ত্ত তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার পরে তিনি সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আপনি কলিঙ্গরাজ কন্যা। আমি আমার প্রভুর আদেশে আপনাকে বন্দী করিতেছি—ভৃত্যের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

পদ্মাবতী তাঁহার দুই কর সেনাপতির দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন।

সেনাপতি সসম্ভ্রমে নিবেদন করিলেন, "কলিঙ্গ-কুমারী, আপনার অঙ্গ স্পর্শ করি এমন ধৃষ্টতা আমাদিগের নাই—আপনাকে বন্ধন করা ত পরের কথা। আপনি প্রাসাদেই অবস্থান করুন। আমি যানবাহন সংগ্রহ করিয়া আপনাকে ও আপনার নির্দ্দেশানুসারে পরিচারিকাদিগকে সসম্ভ্রমে নীলাচলে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিব। আমাকে প্রাসাদ ও পুররক্ষার সকল ব্যবস্থাও করিয়া যাইতে হইবে। কারণ, প্রাসাদ শূন্য—পুর পরিত্যক্ত।"

"আপনার শিষ্টাচারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ"—বলিয়া কলিঙ্গকুমারী প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন।

সেনাদল মুগ্ধভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। সেনাপতি সহকারীকে বলিলেন—পুরীর রাজা পুরুষসিংহ; কলিঙ্গ-কুমারী সেই সিংহের উপযুক্ত সিংহী।

৭

পুরীর প্রাসাদে রাজসভায় পুরুষোত্তমদেব সিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনি অন্যমনস্ক—যেন কিছু প্রতীক্ষা করিতেছেন। কলিঙ্গজয়ের সংবাদমাত্র অগ্রদূতমুখে আসিয়াছে—সেনাপতি তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সভার কায শেষ হইল—সভাভঙ্গের পূর্ব্বে নর্ত্তকীরা গান করিতেছিল—

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
মধুকরনিকর করম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে॥"

সহসা দূরে মহারাজার জয়ধ্বনি ধ্বনিত হইল এবং সেনাদলের বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল।

গান বন্ধ হইল। সকলেই দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মন্ত্রী স্থান ত্যাগ করিয়া সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যে দিক হইতে সেনাদল আসিতেছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেনাপতি সভায় আসিয়া রাজার জয়োচ্চারণ করিলেন।

রাজা ব্যস্ত হইয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, সেনাপতি বলিলেন, কলিঙ্গবিজয় সম্পূর্ণ হইয়াছে—কলিঙ্গরাজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন; রাজার নির্দ্দেশানুসারে তিনি পরাভূত ও পলায়িত শত্রুর অনুসরণ করেন নাই।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কলিঙ্গ-কুমারী?

সেনাপতি নিবেদন করিলেন, "তিনি একাকিনী প্রাসাদে আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।"

রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

তিনি বলিলেন, এ যুদ্ধ তাঁহারই জন্য—শস্য-নাশ, রক্তপাত, প্রজার ক্রন্দন এ সকল হইতে রাজ্যকে নিষ্কৃতিদান জন্য তিনি বন্দী হইতে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সভায় প্রশংসাগুঞ্জন শ্রুত হইল। রাজা যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য নারী।"—তাহার পরেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিঙ্গ-কুমারী কোথায়?"

সেনাপতি বলিলেন, "তাঁহাকে সসম্মানে আনা হইয়াছে। মন্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে শিবিকা হইতে নামাইয়া মন্ত্রণাকক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন।"

এই সময় মন্ত্রণাকক্ষের দ্বারাবরণ সরাইয়া মন্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন—পশ্চাতে কলিঙ্গ-কুমারী দৃঢ়পদে আসিলেন—দৃষ্টি নত। তিনি রাজাকে যুক্তকরে প্রণাম করিলেই মন্ত্রী বলিলেন, "রাজন, কলিঙ্গ-কুমারী মানসিক উদ্বেগে ও দীর্ঘপথাতিবাহনে শ্রান্ত, অনুমতি হইলে আমি তাঁহাকে আমার গৃহে পাঠাইয়া দিতে চাহি।"

রাজার দৃষ্টি তরুণীর মুখে নিবদ্ধ হইল। তিনি অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "তথাস্তু।"

কলিঙ্গ-কুমারী নত দৃষ্টি তুলিয়া রাজার দিকে চাহিলেন—চারি চক্ষুর দৃষ্টি মিলিত হইল। মন্ত্রী তাহা লক্ষ্য করিলেন, নীলকান্তকে নির্দ্দেশ দিলেন, যান প্রস্তুত আছে, কলিঙ্গ-কুমারীকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাওয়া হউক; তিনি সভাভঙ্গ হইলে যাইবেন। মহারাজা পরে যেরূপ নির্দ্দেশ দিবেন, তদনুসারে কায হইবে। পদ্মাবতী সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।

রাজা বলিলেন, "মন্ত্রী, কলিঙ্গ-কুমারীর সম্বন্ধে নির্দ্দেশ ত আমি যুদ্ধ-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছি; তদনুসারেই কায হইবে—চণ্ডালে অর্পণ—"

রাজার উক্তি শেষ না হইতেই মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, যে শতদল দেবচরণে বা রাজকরে শোভা পায়, তাহাকে চণ্ডালের করে অর্পণ করা কি অভিপ্রেত? রাজ্যের—উৎকল ও কলিঙ্গ দুই রাজ্যের প্রজারা কি এই ব্যবহারে ব্যথিত হইবে না?"

"কিন্তু জগবন্ধুর রত্নবেদী স্পর্শ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা ভঙ্গ করা যে মহাপাপ।"

রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মন্ত্রী আর কিছু বলিলেন না।

সভা ভঙ্গ হইল।

৮

পুরীর রাজ-মন্ত্রীর গৃহে একটি কক্ষে মন্ত্রীর কন্যা বিমলা ও কলিঙ্গ-কুমারী পদ্মাবতী উপবিষ্টা ছিলেন। উভয়ে প্রায় সমবয়সী—উভয়ে কয় মাসে সখীর ভাব ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। বিশেষ মন্ত্রী কলিঙ্গ-কুমারীকে কন্যার মতই স্নেহদানে পালন করিতেছিলেন এবং সে পরিবারে—কেবল সে পরিবারে কেন, সকলেই—তাঁহার জন্য দুঃখিত ছিলেন।

বিমলা সেতার লইয়া গান করিতেছিলেন—

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিতললিতবনমাল। জয় জয় দেব হরে॥
দিনমণিমণ্ডমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস। জয় জয় দেব হরে॥
কালীয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিন-দিনেশ। জয় জয় দেব হরে॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান। জয় জয় দেব হরে॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিধান। জয় জয় দেব হরে॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ
সমরসমিত দশকণ্ঠ। জয় জয় দেব হরে॥
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর। জয় জয় দেব হরে॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরুকুশলং প্রণতেষু। জয় জয় দেব হরে॥

সেতার রাখিয়া বিমলা উদ্দেশে হরিকে প্রণাম করিলেন। পদ্মাবতীও দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

বিমলা পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগিনী, একটি কথা জানিবার জন্য আমার কৌতূহলের অন্ত নাই, কিন্তু পাছে তাহা জানাইতে তোমার কোন আপত্তি থাকে বা প্রকাশ করিতে তুমি ব্যথা পাও, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি না। জিজ্ঞাসা করিব কি?"

পদ্মাবতী বলিলেন, "ভগিনী, তুমি জানিতে পার না, এমন কোন গোপন কথা এই অভাগিনীর কি থাকিতে পারে? তোমাদিগের স্নেহের কথা কি আমি কখন ভুলিতে পারি? যে দিন আমি বন্দিনী অবস্থায় এই নগরে নীত হই, সেই দিন হইতে তোমার পিতা আমাকে কন্যার মত স্নেহেই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তোমার মাতা—আমি যে মাতৃস্নেহে বাল্যকালাবধি বঞ্চিত আমাকে তাহাই দিয়া ধন্য করিয়াছেন। আর তুমি—আমি কি জানি না, তুমি কেবল আমারই জন্য এই কয়মাস কাল পতিগৃহ হইতে আসিয়া পিতৃ-গৃহেই রহিয়াছ? তুমি কি জিজ্ঞাসা করিবে?"

"আমার কেবলই জানিতে কৌতূহল হয়, কেন তুমি পিতার সহিত কলিঙ্গ হইতে পলায়ন কর নাই?"

"আমার জীবনের কথা যাহা জান, তাহাতেই বুঝিয়াছ, বিমাতার শাসিত সংসারে আমার সুখ ছিল না—মনের শান্তি-নাশেরও সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল; কারণ, তিনি কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য আমার ক্ষতি করিতে কেবল প্রস্তুতই ছিলেন না—উদ্যতও হইয়াছিলেন। আর"—একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বলিলেন, "আর আমি পুরীরাজের প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত ছিলাম না।"

পদ্মাবতীর চক্ষু হইতে অশ্রু—কমলদলের উপরস্থিত জল-বিন্দু যেমন বাতাসে কমল আন্দোলিত হইলে পতিত হয়—তেমনই পতিত হইল।

বিমলা সস্নেহে নিজ অঞ্চলে পদ্মাবতীর অশ্রু মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পুরীরাজকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলে?"

পদ্মাবতী নতদৃষ্টি হইয়া বলিলেন, "হাঁ।"

"কোথায়?"

"গত বৎসর আমি বিমাতার সহিত গোপনে রথযাত্রার সময় পুরীতে আসিয়াছিলাম—তখন।"

"তবে কি তুমি তাঁহাকে—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না দিয়া পদ্মাবতী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "বসন্তের বাতাসে যেমন লতার ফুল আত্মপ্রকাশ করে—তোমার স্নেহসিক্ত জিজ্ঞাসায় তেমনই যে গোপনভাব প্রকাশ পাইয়াছে—তাহার বিষয় আর জিজ্ঞাসা করিও না—হায় নারী জন্ম!"

বিমলা বলিলেন, "বাবা ইহা জানিলে নিশ্চয়ই—"

বাধা দিয়া পদ্মাবতী বলিলেন, "একান্ত অনুরোধ, কাহাকেও ইহা জানাইও না। অপমানের উপর লজ্জা—ক্ষতে ক্ষারক্ষেপ। আমরা হিন্দু নারী, যাহারা মৃত্যুকে বরণ করিতে ভয় করে না—স্বেচ্ছায় অনলে আত্মাহুতি দেয়।"

৯

রথযাত্রা। মন্দির হইতে আসিয়া জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে দর্শন দিবেন; সকলে জগন্নাথের রথের রজ্জু আকর্ষণ করিবার সৌভাগ্য-লাভ করিবে। রথে জগন্নাথকে দর্শন করিলে আর জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় না—এই বিশ্বাসে সমগ্র হিন্দুস্থানের সকল দেশ হইতে নর-নারী এই সময় শ্রীক্ষেত্রে সমবেত হইয়া থাকেন। সমগ্র নগর জনপূর্ণ।

রথযাত্রার দিন প্রভাতে বিমলা পদ্মাবতীকে বলিলেন—

তাঁহার পিতা-মাতার সহিত তিনিও রথে জগন্নাথকে দর্শন করিতে যাইবেন—পদ্মাবতীকেও যাইতে হইবে। প্রস্তাব শুনিয়া পদ্মাবতী বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন, তিনি রণজিতা—বন্দী ; তাঁহার মুখ দেবতাকে বা মানবকে দেখাইতেও লজ্জা। কিন্তু বিমলা যখন বলিলেন, তাঁহার পিতার বিশেষ অনুরোধ—পদ্মাবতী তাঁহার সহিত গমন করেন, তখন পদ্মাবতী বলিলেন—মন্ত্রীর অনুরোধ তাঁহার পক্ষে কন্যার নিকট পিতার আদেশ—তাঁহার যত কষ্টই কেন হউক না, তিনি সে আদেশ পালন করিবেন।

যথা সময়ে মন্দির হইতে ছড়িদার আসিয়া সংবাদ দিলে মন্ত্রীর পত্নী বিমলাকে, পদ্মাবতীকে ও আত্মীয়া প্রভৃতিকে লইয়া রথযাত্রার পথিপার্শ্বস্থ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। মন্ত্রী প্রথানুসারে পূর্ব্বেই রথযাত্রার ব্যবস্থার জন্য মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন।

দেববিগ্রহগুলি তখন রথত্রয়ে স্থাপিত হইয়াছে—রথ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। রথের রজ্জুতে দুইটি সুসজ্জিত হস্তী বদ্ধ হইয়াছে—ভক্তদল রজ্জু আকর্ষণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তূর্য্যধ্বনি হইলে হস্তী অশ্ব পদাতিকসহ শোভাযাত্রা করিয়া পুরীর রাজা আসিবেন—দেবতার নিকট মানব, দেববলের নিকট বাহুবল তুচ্ছ ইহাই দেখাইবার জন্য প্রথা—পুরীর রাজা মূল্যবান সম্মার্জ্জনী লইয়া রথের মার্জ্জন করিবেন। তাহার পরে রথযাত্রা আরম্ভ হইবে।

তিনবার তূর্য্যধ্বনি হইল। শোভাযাত্রা আসিল। রাজা সুসজ্জিত হস্তী হইতে অনায়াসে অবতরণ করিলেন। ভৃত্য সম্মার্জ্জনী আনিয়া দিল। রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া রথের গমন-পথ মার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মন্ত্রী ত্রস্ত গতিতে তাঁহার পরিজনগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া কলিঙ্গ-কুমারীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া—তাঁহাকে লইয়া পথের উপর উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন, "রাজনির্দ্দেশে আমি আপনাকে এই কন্যা প্রদান করিতেছি।"

জনতা হইতে উত্থিত হর্ষ-কোলাহল গগন পবন পূর্ণ করিল।

রাজা বলিলেন, "মন্ত্রি, কাহাকে কি বলিতেছেন ?"

মন্ত্রী কম্বুকণ্ঠে বলিলেন, "আমার প্রভু বিষমসমর-বিজয়ী পুরীরাজ—সূর্য্যবংশদীপ পুরুষোত্তমদেব জগবন্ধুর রত্নবেদী স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন—কলিঙ্গ-রাজের অসঙ্গত ও উদ্ধত ব্যবহারের প্রতিশোধে তিনি কলিঙ্গ বিজয় ও কলিঙ্গ-রাজকন্যাকে চণ্ডালে অর্পণ করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞার একার্দ্ধ পূর্ণ হইয়াছে—কলিঙ্গ-বিজয় হইয়াছে ; দ্বিতীয়ার্দ্ধ পূর্ণ করিবার ভার প্রভু আমাকে দিয়াছিলেন—আজ আমি তাহা পূর্ণ করিয়া রাজাদেশ পালন করিতেছি। আমার প্রভুর আদেশ ছিল—কলিঙ্গ-কুমারীকে চণ্ডালে অর্পণ করিতে হইবে। আজ আপনি চণ্ডাল—যাঁহার রত্নবেদী স্পর্শ করিয়া রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহারই সম্মুখে আমি আপনাকে এই কন্যা সমর্পণ করিতেছি—রাজাদেশ আপনাকে পালন করিতেই হইবে।"

রাজাকে নির্ব্বাক দেখিয়া মন্ত্রী বলিলেন, "রাজন, আমি এই রাজবংশে মন্ত্রিত্ব করিয়া মানব-চরিত্র-জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি। আমি আপনার যেমন কলিঙ্গ-কুমারীরও তেমনই মনোভাব নখদর্পণে দেখিতেছি। যে প্রতিজ্ঞা আপনাদিগের মিলনে বাধা ছিল, তাহা আজ দূর হইয়াছে। কলিঙ্গ-কুমারী আপনার উপযুক্ত পত্নী—আপনি ইঁহার উপযুক্ত পতি।"

মন্ত্রী রাজার হস্ত লইয়া তাহার উপর পদ্মাবতীর হস্ত অর্পণ করিলেন। জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

মন্ত্রী বলিলেন, "রাজন্ ও রাজ্ঞী, জনতার—প্রজার এই হর্ষধ্বনি আজ শুভদিনে আপনাদিগের মিলনের মঙ্গলশঙ্খ-নিনাদ—আপনাদিগের সৌভাগ্য ঘোষণা করিতেছে।"

তিনি যুক্তকরে রথারূঢ় জগন্নাথকে প্রণাম করিলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ!"

সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

Blakeর কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতীকের প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। প্রতীকের সংজ্ঞা আগেই দেওয়া হয়েছে; যে প্রত্যক্ষ বস্তু অপ্রত্যক্ষের সঙ্গে বিজড়িত, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের জন্য তারই অংশ কিংবা মূর্ত্ত প্রকাশ বা প্রতিনিধি বলে উপলব্ধ হয়, তাকেই বলা যায় প্রতীক। প্রতীক নির্দ্দেশ্য পদার্থের একটা সাক্ষাৎ প্রতীতি এনে দেয়, সেই পদার্থের স্থানে প্রতীককে বসালেই কাজ চলে যায়। প্রতীক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বল্‌তে গেলে, "এক দিকে ঘরের, আর একদিকে অন্তরের; তাহাকে একদিকে স্পর্শ করিতেছি, সে আর একদিকে সমস্ত আয়ত্তের অতীত।" প্রতীকের এই সাধারণ লক্ষণ হ'লেও প্রতীক নানা প্রকারের হ'তে পারে। কতকগুলো সাধারণ বস্তুকে, যেমন ধূপ, দীপ, সাদা, লাল, সবুজ প্রভৃতি রঙকে অনেক সময় প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই সব বস্তুর সঙ্গে যে ভাবধারা জড়িত আছে, তা সর্ব্বলোক-বিদিত। কিন্তু অনেক সময় এই সব প্রতীকে কুলিয়ে ওঠে না। ইচ্ছামত বিশেষ বিশেষ বস্তুকে বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতীক ভাবে ধরে নেওয়া হয়। প্রত্যেক ধর্ম্মে তাই করা হয়েছে। খৃষ্টান ধর্ম্মে কতকগুলি প্রতীক গ্রহণ করা হয়েছে। সেই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লেখক-গোষ্ঠীর আবার বিশিষ্ট প্রতীক আছে। এই জন্যে প্রতীক রচনার মর্ম্ম উপযুক্ত টীকা টিপ্পনীর সাহায্য ছাড়া অনেক সময় বোঝা যায় না। Blakeএর কাব্য এ জন্যে অনেক সময়েই দুষ্প্রবেশ্য। এ ছাড়া আবার লেখক কখনও কখনও নিজের রুচিমত প্রতীকের সৃষ্টি করেন। তখন পাঠকের পক্ষে রচনা একেবারেই দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে, যদি না সেই প্রতীক রচনার পরিভাষা তাঁর জানা থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী দেশে একদল লেখক (symbolists) এই রকম ভাবে নব-কল্পিত প্রতীকের সাহায্যে কাব্য-লেখার চেষ্টা করেন। প্রাচীন প্রতীক তাঁরা গ্রহণ কর্ত্তে পারেন নি, কারণ তাঁদের মনে প্রাচীনদের বিশ্বাস, সংস্কার বা অনুভূতি কিছুই ছিল না। অথচ প্রতীকের আবশ্যকতা তাঁরা বোধ করেছিলেন। শিল্পে স্বভাববাদের বাস্তবতা ও সুস্পষ্টতার বিপক্ষে এঁরা বিদ্রোহ করেন। বাস্তবের ছবি আঁকা, ভাবের উচ্ছ্বাস, কল্পনার বিলাস তাঁদের লক্ষ্য ছিলনা। এঁরা চেয়েছিলেন মনের সূক্ষ্ম গূঢ় অনুভূতি ও প্রেরণাকে প্রকাশ কর্ত্তে। পার্থিব ব্যবহারের ভাষা দিয়ে এই সূক্ষ্ম উপলব্ধির প্রকাশ করা যায় না। তাঁরা অলঙ্কারের কৃত্রিমতার জন্যে তাও বর্জ্জন করেছিলেন। সুতরাং ইঙ্গিতই তাঁদের ভাব প্রকাশের একমাত্র উপায় দেখে নূতন প্রতীকের সৃষ্টি করেন; বিশিষ্ট অর্থে বিশেষ বিশেষ বস্তু, শব্দ ও ধ্বনি প্রয়োগ কর্ত্তে আরম্ভ করেন। কিন্তু তার ফলে তাঁদের রচনা সব সময়ে সকল-সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী হয়েছিল কিনা, অর্থাৎ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ কর্ত্তে পেরেছিল কিনা, সেটা সন্দেহের বিষয়। তবে অবশ্য গুণী লেখক তাঁর নিজস্ব প্রতীকের তাৎপর্য্য সহৃদয় পাঠকের কাছে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন। তাঁদের প্রভাব অন্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। Yeatsর কাব্যে প্রতীকের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সে সব প্রতীক প্রাচীন Irelandর কাহিনী ও সংস্কারের সহিত জড়িত। সাম্প্রতিক ইংরেজি কাব্যের অন্যতম নায়ক T. S. Eliotর The Hollow Men, The Waste Land প্রভৃতি কবিতাতে নিজস্ব, অভিনব প্রতীকের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর প্রতীক আধুনিক সুশিক্ষিত মনের সংস্কারের সহিত বিজড়িত এবং আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচ্য সাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। পারস্যদেশে রুমী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতির কাব্যে প্রতীকের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। দ্রাক্ষা, সুরা, বাগিচা, গোলাপ, সাকী, বুলবুল, সরাই, পেয়ালা, অবগুণ্ঠন প্রভৃতি প্রতীক বিশিষ্ট গূঢ় অর্থে তাঁদের কাব্যে ব্যবহৃত হ'য়েছে। ওমর খৈয়ামের আধুনিকীকৃত অনুবাদেও এই প্রতীক পন্থার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

> I tell Thee this—when starting from the Goal,
> Over the shoulders of the flaming Foal
> Of Heaven Parwin and Mushtore they flung,
> In my predestin'd plot of Dust and Soul.

এ কথা স্বীকার কর্ত্তেই হ'বে যে সংস্কৃত সাহিত্যে উপমা, রূপক ইত্যাদির ছড়াছড়ি থাকলেও তাতে প্রতীকের ব্যবহার খুব কম। স্পষ্টবাদী ক্লাসিক্যাল মন কোন দেশেই প্রতীকের প্রতি অনুকূল নয়। কিন্তু মধ্যযুগে ভারতবর্ষে যে সমস্ত গুহ্য অধ্যাত্মজ্ঞানের চর্চ্চা চলেছিল, তারই আনুষঙ্গিক রূপে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতীকের ব্যবহার খুবই চলেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রতীক সাহিত্যও গড়ে উঠেছিল। বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্য্যাপদের অনেকগুলি পদ যে প্রতীক কাব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

> দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
> রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই।
> আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী,
> কানেট চোরে নিল অধরাতী।

সুস্বরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥

এই জাতীয় পদকে রূপক বলা চলে না, এ সব প্রতীক কাব্য।

চর্য্যাপদের পরে বাঙ্‌লায় সহজিয়া প্রভৃতি নানা গুহ্য ধর্ম্মাচারের (cult) আনুষঙ্গিক ভাবে অনেক প্রতীক কবিতা রচিত হ'য়েছিল। বাউল, ভাটিয়ালী গান, কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের গান ও এবংবিধ অন্যান্য কাব্যে প্রতীকের ব্যবহার ছিল। কিন্তু বৈষ্ণবকাব্যে প্রতীকের ব্যবহার কম। বৈষ্ণবকাব্যে ভাবসম্পদ্ প্রচুর, অনুভূতি প্রগাঢ়। কিন্তু সে কাব্য "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা" করে, আমাদের কুটীর প্রাঙ্গণকেই বৈকুণ্ঠ করে তোলে। বৈষ্ণব কবিতা মানবিকতায় পরিপূর্ণ, সুতরাং তা'তে যে প্রতীকের আবশ্যকতা কম শুধু তাই নয়, প্রতীক অনেক পরিমাণে বৈষ্ণব কাব্যের উদ্দিষ্ট রসের বিরোধী। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদের বিখ্যাত পদগুলিতে—মানবিক উপাদান ও স্বাভাবিক পদ্ধতি-ই আমরা দেখতে পাই। বোধ করি এই জন্যই ঐ পদগুলি এত মনোহর ও তার আবেদন এত উদার। তবে এমন সব বৈষ্ণবপদ-ও আছে, যা'তে প্রতীকের ব্যবহার আছে, যেখানে এক একটি কথা সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও ভাবের প্রতিভূ এবং সেই সব কথা দিয়েই একটা লোকদুর্লভ রসলোকের সৃষ্টি করা হ'য়েছে। রাধাকৃষ্ণের মিলন, ঝুলন ইত্যাদি এই সব পদের বিষয় এবং মানবদুর্লভ উপলব্ধি তাহার প্রতিপাদ্য।

এই প্রসঙ্গে কাব্যে প্রতীকের ব্যবহার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। কাব্য সকল-সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী না হ'লে কাব্য-রচনাই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সুতরাং সহৃদয়কে যে মাধ্যমে আবেদন করা যায়, সেই রকম মাধ্যমই কাব্যের পক্ষে প্রশস্ত। সুতরাং প্রতীক যদি একেবারে সান্ধ্যভাষার অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত পরিভাষার বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে কাব্যরস সৃষ্টির পক্ষে তা' বিঘ্ন-স্বরূপ হ'তে পারে। Poetry should be simple, sensuous and passionate' (Milton) এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

তয়া কবিতয়া কিং বা
তয়া বনিতয়া বা কিং।
পদ-বিন্যাস-মাত্রেণ
যয়া নাপহৃতং মনঃ॥

এ কথাও সত্য। তবে এ কথাও বলতে হবে যে সহৃদয়ের কাণ্ডজ্ঞান, ভাষাজ্ঞান, রসবোধের ক্ষমতা ইত্যাদি গুণ আছে, তা যেমন কবি ধরে নিতে পারেন, তেমনি তার পক্ষে কতকগুলি প্রতীকের ইঙ্গিত বোঝা সম্ভব হবে, এটাও কবি আশা কর্ত্তে পারেন। সমস্যাটা হচ্ছে প্রতীকের প্রচলিতি নিয়ে। Danteর পক্ষে প্রতীকের ব্যবহারে তাঁর কাব্যের ক্ষতি হয় নি, Blakeর হয়ত হয়েছে, কারণ Blakeএর ব্যবহৃত প্রতীকগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত। স্বকপোলকল্পিত প্রতীক চালাতে গেলে মুস্কিল আরও বেশী হয়। তবে গুণী লেখক কি ভাবে আধুনিক কালেও পাঠকসাধারণের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সংস্কার, ঐতিহ্য, অবচেতনার সুযোগ নিয়ে প্রতীক সাহিত্য রচনায় সিদ্ধকাম হতে পারেন, তার প্রমাণ হচ্ছে Eliot ও রবীন্দ্রনাথের রচনা।

(৩)

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার বেশী নয়। ধর্ম্মে ও ব্যবহারে তিনি সহজ হবার চেষ্টাই কর্ত্তেন—"রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে" বসে গুহ্য পদ্ধতির "ভজন পূজন সাধন আরাধনার" যেমন কোন মূল্য তাঁর কাছে নেই, তেমনি কৃত্রিম পারিভাষিক তাৎপর্য্যে পরিপূর্ণ প্রতীক ব্যবহারও তাঁর কাছে অসাহিত্যিক রীতি বলে পরিগণিত হত। সাহিত্যকে তিনি সকলের সহিত মনে প্রাণে মিলনের উপায় বলেই জান্‌তেন, সকলের কাছে শব্দের যে অর্থ অজ্ঞাত ও অপরিস্ফুট সে অর্থ তিনি গ্রহণ কর্ত্তেন না। কাজেই কোন রকমের সান্ধ্যভাষা তিনি ব্যবহার করেন নি। তিনি কাব্যরীতিতেও পৌত্তলিকতা বা প্রতীক-পূজার বিরোধী ছিলেন। তাঁর কাব্যে মানবিক রস ও স্বভাবোক্তিবাদই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর কাব্যের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানবসুলভ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ মননশীলতা। সুতরাং প্রতীকপন্থী রচনা তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। কিন্তু মননশীলতার আতিশয্যের জন্য, বিশ্লেষণী বুদ্ধির প্রাবল্যের জন্য তাঁর রচনায় রূপকের প্রাচুর্য্য স্বভাবতঃই ঘটেছিল। তাঁর গদ্যে পদ্যে উপমা ও রূপক অলঙ্কারের ছড়াছড়ি ত আছেই; তা' ছাড়া যখনই তিনি অনির্ব্বচনীয়ের কথা প্রকাশ কর্ত্তে গেছেন, তখনই তাঁর রচনা রূপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সুপরিকল্পিত সাঙ্গরূপক তিনি রচনার প্রয়াস করেন নাই, বোধ হয় যে কারণে তিনি মহাকাব্য রচনারও প্রয়াস করেন নাই। 'ক্ষণিকের অতিথি'দের নিয়েই তিনি ব্যস্ত।

তবে কিছু কিছু প্রতীক যে তাঁর রচনায় স্থান পায় নাই এমন নয়। তাঁর প্রতীক অবশ্য মধ্যযুগের হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক পরিভাষা থেকে গৃহীত হয় নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটা মূল দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুটিকতক প্রতীক তিনি গ্রহণ করেছেন এবং কালিদাসাদি কবির কাব্য থেকে ব্যঞ্জনাসম্পন্ন কয়েকটি বস্তু প্রতীক হিসাবে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণব কাব্য ও বাউল কাব্য থেকেও কিছু কিছু প্রতীক তিনি নিয়েছেন। এই সব প্রতীকের মধ্যে বীণা, বাঁশী, শঙ্খ, দীপ, মালা, বঁধু, তরী, রুদ্র, নটরাজ, ছন্দ, নৃত্য প্রভৃতি প্রতীক প্রত্যয় উল্লেখযোগ্য। তবে এ সমস্ত প্রতীকের ব্যবহার তাঁর রচনায় বিক্ষিপ্ত ভাবেই বেশীর ভাগ করা হয়েছে, সামগ্রিক ভাবে প্রতীক রচনা কম-ই দেখা যায়। তার কারণ তাঁর এই স্বকল্পিত প্রতীকগুলি দিয়ে কোন পরিভাষা তিনি রচনা কর্ত্তে পারেন নি, যেহেতু কোন বাঁধা আচার, অনুষ্ঠান, পদ্ধতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তাঁর মানসিক ও আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে এ সব প্রতীক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নয়। এজন্য নিত্য নূতন সাময়িক রূপক-সৃষ্টি-ই তিনি করে গেছেন। তা ছাড়া প্রেমের ন্যায় কাব্যেও তিনি সহজ পথের পথিক। তাঁরই কথা একটু ঘুরিয়ে নিলে দাঁড়ায়—

শুনেছিনু কাব্যকুঞ্জে অনেক বাঁকা গলিঘুঁজি।
আমার কিন্তু কাব্য লেখা নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

পাঠক-ও রবীন্দ্রকাব্য পড়ে বল্‌তে পারেন—

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি।

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' পর্ব্বে প্রতীক কাব্য রচনার সূত্রপাত। 'সোনার তরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় তিনি নিজস্ব প্রতীক দিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ পথে তিনি তখন আর অগ্রসর হন নি। অনেক পরে গীতাঞ্জলি-বলাকার যুগে আবার তাঁর রচনার মধ্যে প্রতীক কবিতা কিছু কিছু পাই। 'গীতাঞ্জলি'র 'তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি,' 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর', 'গীতিমাল্যে'র 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে', 'গীতালি'র 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার', 'বলাকা'র 'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে, কেমন করে সইব', 'জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রিদিনে শুনতে তুমি পাও' প্রভৃতি অনেকগুলি রচনাকে প্রতীক কবিতা বলা যায়। তাঁর গীতিকাব্য 'নটরাজ' সার্থক প্রতীক রচনা। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানও প্রতীক সাহিত্যের অন্তর্গত বলা যায়, যেমন 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে' 'আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়-গহন-দ্বারে' ইত্যাদি।

তবুও মোটামুটি ভাবে বল্‌তে গেলে স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে রবীন্দ্র-কাব্য প্রতীক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই সিদ্ধান্তে হয়ত কেহ কেহ হতাশ হবেন। তবু কথাটা সত্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অলৌকিক রহস্যের অনুভূতি যথেষ্টই আছে, কিন্তু সে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে বেশিটা রূপকের মধ্যে, প্রতীকের মধ্যে নয়। তা' ছাড়া তাঁর প্রিয় কতকগুলি প্রতীকের বহুল ব্যবহার তিনি করেছেন, সে সব ব্যঞ্জনা-সম্পদে গরীয়ান্; কিন্তু সে সমস্ত প্রতীক তাঁর রূপক কবিতা ও অন্যান্য কাব্যের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবেই আছে, বিষয়ীভূত হয় নাই। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে অলৌকিক সম্বন্ধে রহস্যঘন অনুভূতি নানা প্রকারেই প্রকাশ করা সম্ভব, তার জন্য প্রতীকের ব্যবহার অপরিহার্য্য নয়। তা' ছাড়া সমাসোক্তি (Personification) বা ভাবিকের (Vision) প্রয়োগ, কিংবা অভিনবপুরাণ-রচনা (mythmaking) প্রতীক-সৃষ্টি নয়। যে কাব্যে more is meant than meets the ear তাকেই প্রতীক কাব্য বলা যায় না। যদি প্রতীক-ই মুখ্য উপকরণ না হয়, তবে কোন রচনাকে প্রতীক রচনা বলা সঙ্গত নয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বমূলক নাটকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। সে গুলি প্রতীক-নাট্য কিনা সে বিষয়ে তর্ক উঠ্‌তে পারে। আলোচনার পূর্ব্বে একবার রূপক নাট্য ও প্রতীক নাট্যের সংজ্ঞা ভাল করে বুঝে নেওয়া উচিত। রূপক নাট্যে থাকবে অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব-জগতের উপরে প্রত্যক্ষ একটা বস্তু-জগতের আরোপ; দু'টো বিভিন্ন জগৎ, তা'দের মধ্যে একটা সমান্তরালতা রূপক নাট্যে ধরে নিতে হ'বে। তবে প্রত্যক্ষ জগৎটা রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ জগৎটা নানা ইঙ্গিত দিয়ে অনুমেয়। এই অপ্রত্যক্ষের দীপ্তি রঙ্গমঞ্চের ঊর্দ্ধে লুক্কায়িত দীপমালার আলোকের ন্যায় বিচ্ছুরিত হয় ও পাত্র পাত্রীর দেহ, মন ও দৃশ্যপট উদ্ভাসিত ও অলৌকিক তাৎপর্য্যে পূর্ণ ক'রে তোলে। ফলে প্রত্যক্ষ চরিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা অপ্রত্যক্ষ তত্ত্বের প্রতিভাস বলে' সহজেই প্রতীত হয় এবং এই প্রতীতি ব্যতিরেকে রূপক-নাট্য আমাদের কাছে সার্থক হয় না। প্রতীক নাট্যে কিন্তু দু'টো জগতের পাশাপাশি অস্তিত্ব কল্পনা করা হয় না। জগৎ একটাই; কিন্তু সে জগতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব কিছুই প্রতীক, অর্থাৎ কোন একটা ভাবের সঙ্গে বিজড়িত সঙ্কেত। এই সব প্রতীক দিয়ে একটা নূতন জগৎ আমাদের সামনে দেখানো হয়, সে জগৎ আমাদের চেনা সংসার বা বস্তু-জগৎ নয়, সেটা একটা তত্ত্বাপ্লুত অভিনব সৃষ্টি। এখানে কোন সাদৃশ্যের পরিকল্পনা নেই, জানা অজানা দু'টো জগতের মধ্যে কোন সমান্তরালতা আরোপ করা হয় নি। প্রতীক নাট্যের যথার্থ উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নাটক, যবদ্বীপের নৃত্য-নাটক ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। অবশ্য এ সব নাটকে কথার চেয়ে মুদ্রা, ভঙ্গী, গতি ইত্যাদি প্রধান। সাহিত্যিক প্রতীক নাট্যে তার উপাদানগুলি নৃত্যের মুদ্রার ন্যায় হওয়া উচিত; অর্থাৎ সেগুলি হ'বে সঙ্কেত, উপমা নয়। গানের উপকরণ সুর, সুরের সঙ্গতি সৃষ্টি করে অলৌকিক ভাব প্রকাশ করা যায়, কিন্তু প্রত্যেকটি সুরকে যেমন কোন ভাবের রূপক বা সুরসঙ্গতিকে যেমন জাগতিক ব্যাপারের রূপক বলা যায় না, প্রতীক নাট্যেও তেম্‌নি অলৌকিক ভাব ওতপ্রোত হলেও তাকে রূপকের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না।

এইভাবে নিকষণ কর্লে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের কোন নাটকই ঠিক প্রতীক নাটক নয়। তাঁর তাত্ত্বিক নাটকগুলি মোটামুটি দু'রকমের। কতকগুলো হ'চ্ছে রূপক, আর কতকগুলো হ'চ্ছে ব্যঞ্জনা-সম্পন্ন মানবিক নাটক। অবশ্য এই দুয়ের মিশ্রণ-ও অনেক জায়গায় হয়েছে। তা' ছাড়া রূপক নাট্যকে দর্শক সাধারণের পক্ষে রুচিকর ও লঘুপাক কর্ব্বার জন্যে অনেক সময় বাড়তি লঘুরসের মিশাল দেওয়া হ'য়েছে। এই খাদ-টুকু না দিলে শুধু খাঁটি রূপক দিয়ে হয়ত মনোগ্রাহী ও অভিনয়োপযোগী মঞ্চ-সফল নাটক লেখা মুস্কিল। তবে রূপক নাট্যের শুদ্ধ রীতি যে তিনি কখনও অনুসরণ করেন নি, এমন নয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক নাটক 'ডাকঘরে'র কথা বলা যেতে পারে। এর প্রত্যেক চরিত্র, প্রত্যেকটি ঘটনা, এমন কি অনেক কথাবার্ত্তা পরিষ্কারভাবেই একটা তত্ত্বজগতের সমান্তরাল প্রতিচ্ছায়া। অমল, মাধবদত্ত, বৈদ্য, ডাক-হরকরা, মণ্ডল, ঠাকুরদাদা, রাজবৈদ্য, রাজা, সুধা প্রভৃতি চরিত্র; অমলের ব্যাধি, তার উদাস ভাব, দূরের ঘণ্টাধ্বনি, ডাকঘর, সুধার উপহৃত পুষ্পগুচ্ছ, সব কিছুই স্পষ্টভাবে তত্ত্ব-জগতের রূপক। তবে এই নাটকের প্রধান মাধুর্য্য হ'চ্ছে, শুধু তত্ত্বকথার জন্যে নয়, যে সব চরিত্র ও যে স্বল্প-পরিসর জগতের এখানে সৃষ্টি হয়েছে তারই নিজস্ব সৌন্দর্য্যের জন্য। চরিত্র-গুলি মানবিক রসে পরিপূর্ণ ও জীবন্ত, সংলাপ ও ঘটনা-বিন্যাস স্বাভাবিক এবং ভাব-সমাবেশ সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী। তত্ত্বের জন্যে নয়, জীবন-সত্যের

জন্যেই এই নাটকের মনোহারিত্ব। একেই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর রূপক বলা যেতে পারে; সমান্তরাল তত্ত্বের কথা একেবারে ছেড়ে দিলেও এরকম রচনায় রসনিষ্পত্তির অসুবিধা হয় না।

অপরপক্ষে 'অরূপরতন' বা 'রাজা' নাটককে নীরস রূপক নাটক বলা যেতে পারে। এটা যে তত্ত্বকথার প্রতিচ্ছায়া সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই নাটকের যে ভূমিকা লিখেছেন, তা' থেকেই এর রূপকত্ব বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এই নাটকের রাজা, সুবর্ণ, সুদর্শনা, সুরঙ্গমা এবং রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক নাটকে অপরিহার্য্য সর্ব্ব-ঘট-বিহারী সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরদাদা, সকলেই এক একটি তাত্ত্বিক প্রত্যয়ের মূর্ত্তি : নামকরণ থেকেই চরিত্রগুলির তাত্ত্বিক স্বরূপ বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারা যায়। নাটকের ঘটনা পারম্পর্য্য—সুদর্শনার আগ্রহ ও মোহ, অগ্নিদাহ, সুদর্শনার ভ্রান্তিনাশ ও দয়িতের সহিত মিলন—মানবাত্মার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অতি স্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া। এর তত্ত্বকথা জ্যামিতির প্রতিপাদ্যের মতই বুদ্ধি-গ্রাহ্য এবং ক-খ-গ ত্রিভুজকে চ-ছ-জ ত্রিভুজের উপর যেভাবে আরোপ করা হ'য়েছে তা'তে রস-নিষ্পত্তি কিছুই নেই। রূপক বাদ দিলে ইহার চরিত্রগুলির মধ্যে প্রাণবত্তা বা ঘটনা-পারম্পর্য্যের মধ্যে কোন জীবন-সত্য পাওয়া যায় না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলে চমৎকার গান ও রসাল সংলাপ দিয়ে তত্ত্বের বটিকায় শর্করার প্রলেপ দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই নাটকটি জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা ছাড়া আর কিছু হয় নি।

'অচলায়তন'ও রূপক। তবে এখানে নাটকের পাত্রদের চরিত্র অপেক্ষাকৃত প্রাণবন্ত। 'মহাপঞ্চকে'র চরিত্রের মধ্যে বেশ সত্য আছে বলা যায়। তবে 'পঞ্চক' কবিত্বময় একটা ছায়া-মূর্ত্তি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনা-পারম্পর্য্যের মধ্যে নাটকীয় গুণ কিছু কিছু আছে, কিন্তু তার মধ্যে যে সত্য আছে তা' মানবজীবনের নয়, ধর্ম্মতত্ত্বের। এর অন্তর্নিহিত রূপককে ভারতের সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে কিংবা শুদ্ধ আধ্যাত্মিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

'রক্ত-করবী' নাটকটি রূপক নাটক নয়, একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। কিন্তু যে ভাবে তিনি নিজেই এর তাৎপর্য্য নানা সময়ে বিবৃত করেছেন, তাতে এর রূপকত্ব তিনি নিজেই সপ্রমাণ করেছেন। তবে 'ডাকঘরে'র পর্য্যায়ে উঠ্‌তে না পারলেও এখানে চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যক্তিত্ব আছে, এবং ঘটনা-পারম্পর্য্যের মধ্যে অনেকটা সম্ভাব্যতা আছে। অনেকটা বল্‌ছি এই জন্যে যে, পাত্র-পাত্রীদের কথাবার্ত্তা বেশ জীবন্ত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যময় হ'লেও মানব-চরিত্রের মানদণ্ডে যেন কতকটা অপ্রাকৃতিক বলে মনে হয়, ঘটনাচক্রেও বহুল পরিমাণে মানব জীবনের সত্য ও আধুনিক জগতের তথ্যের অনুসরণ করা হ'য়ে থাকলেও তাকে কতকটা দুনিয়া-ছাড়া বা অসম্ভাব্য বল্‌তে হয়। অবশ্য তাতে খুব আসে যায় না, কারণ 'রক্তকরবী' বস্তুতঃ রূপক, একটা তত্ত্বের প্রতিচ্ছায়া হিসেবে এই নাটক রচিত হয়েছে, মানবজীবনের প্রতিফলন হিসেবে নয়। এই নাটকে রক্তকরবী, জালের জানালা প্রভৃতি প্রতীকের ব্যবহার থাকলেও একে প্রতীক নাট্য বলা চলে না। এখানে মুখ্য চরিত্রগুলি প্রতীক নয়, ঘটনাধারাতেও অলৌকিক সত্য কিছু প্রতিপন্ন হয় নাই, বরং নীতি-কথাই ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে। 'মুক্তধারাও এই রকমের নাটক।

'শারদোৎসব' নাটককে রূপক বলে ধরার কোন আবশ্যকতা নেই। উপানন্দ, লক্ষেশ্বর, সন্ন্যাসী, ঠাকুরদাদা, বিজয়াদিত্য প্রভৃতি চরিত্রকে আমরা নানা প্রকৃতির মানুষ বলেই ধর্ত্তে পারি। এর আখ্যায়িকাকে একটা সরল কাহিনী বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। চরিত্র বা ঘটনা কোনটাকেই একটা তত্ত্বের প্রতিবিম্ব বলে নেওয়ার দরকার নেই। সমগ্র নাটকের ভেতর দিয়ে একটা আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রচার করা হ'য়েছে এই মাত্র। এ রকম নাটক রূপক নয়, কথামৃত।

'ফাল্গুনী'-ও তাত্ত্বিক নাটক। প্রস্তাবনায় এই তত্ত্ব এক রকম স্পষ্ট ক'রেই ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে; নাটকের কয়েকটি অঙ্কের প্রথমে সূত্রপাত, সন্ধান, সন্দেহ, প্রকাশ এই চারিটি পরিচায়ক দিয়ে—এর তত্ত্বটার বিভিন্ন অংশের ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু একে পুরোপুরি রূপক বা সাঙ্গ-রূপক বলা কঠিন। আখ্যায়িকা বল্‌তে তেমন কিছু এখানে নেই, কবি-মনের আবেগই যেন একটা গীতমুখর কাকলীর নানা পর্দায় ও মূর্চ্ছনায় বেজে উঠেছে। চরিত্র অঙ্কনের কোন চেষ্টা করা হয়নি। কেন্দ্রীয় অনুভূতির আঙ্গিক এক একটা ভাব যেন এক একটা নামকে অবলম্বন করে সংলাপের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ সংলাপে মানবজীবনের দ্বন্দ্ব বা মানবচরিত্রের সংঘাত দেখান হয় নি, উপলব্ধির বিভিন্ন দিক্ আবেগোচ্ছ্বাস দিয়ে প্রকট করা হয়েছে। 'ফাল্গুনী' সর্ব্বথাই গীতিনাট্য। ঠিক রূপক না হ'লেও রচনা হিসেবে এটা যে শিল্পসিদ্ধ হয়েছে তার কারণ এই যে, এখানে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের প্রতিরূপ হিসেবে গীত ও গীতধর্ম্মী উচ্ছ্বাস দেওয়ার ফলে কবির উচ্ছ্বাসময় অনুভূতি ও তার প্রকাশ বেশ চমৎকার ভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

সুতরাং বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক নাটকগুলির মধ্যে কতকগুলির পরিষ্কার রূপক, কতকগুলি রূপক লক্ষণাক্রান্ত হ'লেও পুরোপুরি রূপক নয়। এই শেষোক্ত ধরণের রচনাকে কেউ কেউ প্রতীক নাটক বল্‌তে চান। কিন্তু সে অভিধা সঙ্গত হ'বে না। অসম্পূর্ণ রূপক-কে প্রতীক বলা চলে না। তবে এ সব নাটককে কি বলা হবে? রূপক হিসেবে অসম্পূর্ণ হ'লেও রচনা হিসেবে এ-সব নাটককে ত অক্ষম বা অচল বলা চলে না। তবে কি বলা হবে?

এই সমস্ত নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে Materlinck প্রভৃতির রচনার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। Materlinckর The sightless অবশ্য রূপক, চমৎকার রসময় রূপক। কিন্তু Materlinckর The blue bird কি রকম নাটক? রূপকের অনেক লক্ষণ থাকলেও একে রূপক-নাট্য বলা চলে না, কারণ এখানে কোন তত্ত্বকে ঘটনার রূপ দেওয়া হয় নি। কবিচিত্তের একটা অলৌকিক অভিজ্ঞতার কাহিনী কতকটা রূপক, কতকটা প্রতীক, কতকটা স্বভাবোক্তি, কতকটা উৎকল্পনার সহযোগে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ধরণের নাটককে সমালোচনার আল্‌গা ভাষায় symbolic বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এও কি যথার্থ প্রতীক-নাট্য? তা-ও ত নয়।

সুতরাং এই সমস্ত তাত্ত্বিক নাটককে যদি আমরা সাঙ্কেতিক বলি তা হ'লেই বোধ হয় ভাল হয়। সাঙ্কেতিক শব্দটা রূপক বা প্রতীকের চেয়ে আরও ব্যাপক-পরিসর। যে রচনায় সঙ্কেত আছে, যা' আমাদের মনকে প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষের দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলা যাবে সাঙ্কেতিক। রূপক ও প্রতীক—দু'টোই বিশিষ্ট সঙ্কেত। কিন্তু তা' ছাড়া আরও কত রকমের সঙ্কেত ত হ'তে পারে। সুতরাং Materlinck ও রবীন্দ্রনাথের এই সব নাটক—যাঁ'দের রূপক-নাট্য বা প্রতীক-নাট্য কোনটাই বলা যায় না—তা'দের মোটামুটি সাঙ্কেতিক বলেই ছেড়ে দেওয়া যায়। তা' হ'লে সাঙ্কেতিক নাট্যের মধ্যে Eugene O' Neill, Hauptmann ইত্যাদির কিছু কিছু রচনাও পড়ে যাবে। Yeats, Syngeর কোন কোন লেখাও পড়বে।

কিন্তু সাঙ্কেতিক ব'লে এ সব নাটকের পরিচয় দিলেও বাস্তবিক আমাদের কাজ শেষ হ'ল না। নানা রকমের নূতন নূতন রীতির নাটকের যথার্থ পরিচয় দেবার জন্যে আরও সুনির্দ্দিষ্ট অভিধা খুঁজে বের কর্ত্তে হ'বে। মানুষের মন প্রগতিশীল; তার ধর্ম্ম, সমাজবিধান ইত্যাদির ন্যায় তার সাহিত্য-রীতিও প্রগতিশীল। পুরাণো কয়েকটা বাঁধা খাতেই সাহিত্য রসের স্রোত যে চিরকাল চল্‌বে সে কথা বলা যায় না। কবিচিত্তের ন্যায় সাহিত্যও—

"যুগে যুগে এসেছে চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হ'তে রূপে"।

বর্ত্তমান যুগে রূপক-নাট্যের মান থেকে স্খলনের মধ্যে সেই রূপান্তরের ইতিহাসই পাওয়া যাচ্ছে।

সমাধান

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

(নাটিকা)

ডাক্তারখানা। রাত্রি প্রায় এগারটা। শুধু কম্পাউণ্ডার বসে কি লিখছে; এমন সময় উসকোখুসকো চুল, এলোমেলো পোষাক, ৩৫।৩৬ বছরের এক ভদ্রলোক প্রবেশ করল।

ভদ্রলোক। হাঁ দেখুন, আপনি কি ডাক্তার?

কম্পাউণ্ডার। না আমি কম্পাউণ্ডার, আপনার কি চাই?

ভদ্রলোক। হাঁ চাই একটা জিনিস, ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত গোপনীয়। আপনার এখানে এখন কেউ এসে পড়বে না তো?

কম্পা। না, অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন আর কেউ আসবে না।

ভদ্রলোক। কিন্তু দেখুন, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং একটু ভয়েরও। এই দরজাটা কি বন্ধ করলে হয় না।

কম্পা। দরজাটা?

ভদ্রলোক। হাঁ, দরজাটা বন্ধই করে দিই, কি বলেন?

এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে

দেখুন, মনের অবস্থা আমার অত্যন্ত খারাপ; সময় সময় মনে হয়, আমার বুঝি মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

কম্পা। আপনি বসুন।

ভদ্রলোক। বসছি। (বসল না) হাঁ দেখুন, আমার ব্যাপারটা শুনতে আপনার একটু সময় লাগবে। অবশ্য তার কোন চিকিৎসা নেই, সেইজন্যেই আমি এমন একটা জিনিস চাইছি যাতে সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যায়, এ জ্বালা আমি আর সহ্য করতে পারি না। সময় সময় মনে হয়, একটা দুর্দান্ত কাণ্ড করি। কিন্তু কি জানেন, সামাজিক লজ্জা—অবশ্য বলতে পারেন, সেটা মনের নিছক দুর্বলতা—কিন্তু আপনি কি বলতে পারেন, সামাজিক লজ্জাকে গ্রাহ্য করে না, এমন লোক খুব বেশী আছে? বলুন?

কম্পা। কিন্তু ব্যাপারটা কি না জানলে—

ভদ্রলোক। হাঁ সেই কথাতেই তো আমি আসছি। কি জানেন, আর চিন্তা করতে পারি না আমি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি চিন্তা করতে করতে, সে চিন্তা সর্বদা এড়াতে চাইছি।

নিজের মাথার চুলের ভিতর আঙ্গুল চালাতে চালাতে সামান্য পায়চারি করতে লাগল।

কম্পা। একটু জল খাবেন?

ভদ্রলোক। জল? (যেন সামান্য চিন্তা করে) দেন একটু।

কম্পাউণ্ডার জল এনে দিলে

(এক চুমুক জল খেয়ে) বুকে কিন্তু আমার আগুন জ্বলছে। আমার চুলগুলো সাদা হয়ে আসছে দেখেছেন এত অল্প বয়েসে? কতই আর আমার বয়েস হবে—পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ। কিন্তু আমাকে কি বুড়োটে দেখাচ্ছে না? অবিশ্রাম যুদ্ধ করতে করতে এই অবস্থা হয়েছে আমার।

কম্পা। (ইতস্তত করে) আপনার কি অ্যাবরসনের কেস?

ভদ্রলোক। কি বললেন? অ্যাবরসন? গর্ভপাত? ভয়ানকভাবে অ্যাবরসন হলে অবশ্য মৃত্যু সহজেই আসে, না? (যেন নিজের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে) ভীষণ রক্তস্রাব! হেমারেজেই শেষ হয়ে যাবে সব। কিন্তু পুলিশ? তাছাড়া আরও কত হাঙ্গাম। (হঠাৎ যেন প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বাভাবিকভাবে) কিন্তু আমি এ কি বলছি আপনাকে! না না, ও কেস আমার নয়। মনে কিছু করবেন না, আমি আজ সত্যিই অত্যন্ত বিচলিত, আমার মাথার ঠিক নেই, কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলছি।

কম্পা। তাহলে আপনার কি—

ভদ্রলোক। হাঁ সেই কথাই তো আপনাকে বলতে যাচ্ছি আমি। এমন একটা ভয়ানক অবস্থায় পড়েছি আমি, যে কিছুতেই আর নিজেকে সামলে চলতে পারছি না। কঠিন মানসিক আঘাতে নিয়ত ক্ষতবিক্ষত হতে হতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছি আমি।

কম্পা। আপনার নিজের কি কোন দুরারোগ্য অসুখ।

ভদ্রলোক। দুরারোগ্য অসুখ? (যেন চিন্তা করতে করতে) দুরারোগ্য অসুখ? না ঠিক তা নয়, আমি যদি নিজে শক্ত হতুম, যদি মনের জোর নিয়ে দাঁড়াতুম, তাহলে হয়তো এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় এসে হাজির হতুম না। কিন্তু বরাবরই মনের দিক থেকে আমি একান্ত দুর্বল, যাকে বলে মানসিক পঙ্গু, তাই—

কম্পা। তাহলে কি আপনি আত্মহত্যা করতে চান?

ভদ্র। আত্মহত্যা? সুইসাইড?

নিজের মাথার চুল টানতে টানতে আবার পায়চারি করতে লাগল

(যেন নিজের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে) তাহলে সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যায়। কিন্তু তার কি কারণ থাকতে পারে? তাছাড়া আত্মহত্যা মহাপাপ। ওদের সকলকে টেনে নিয়ে যাবে। কোর্ট আর পুলিশ। হয়তো সব হাসবে; বলবে, মানুষটা মানসিক দুর্বলতার একটা চরম দৃষ্টান্ত। কিন্তু সত্যি, একটু ওষুধে সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যায়। (আবার জোর গলায়) হাঁ দেখুন, দেবেন আমাকে —হাঁ ওই যে কি বলে—?

কম্পা। আত্মহত্যার ওষুধ?

ভদ্রলোক। (যেন আবার নিজেকে সামলে নিয়ে) কি বললেন, আত্মহত্যার ওষুধ? না না, আত্মহত্যার ওষুধ আমি নেব কেন! আমি তো এমন কিছু করিনি, তাছাড়া ভয়ানক কিছু রোগও আমার নেই। আত্মহত্যার ওষুধ আমার চাই না। তবে কি জানেন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। গেল এক বছর ধরে এই ব্যাপারটা নিয়ে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি চিন্তা করতে করতে প্রায় পাগল হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছি। মানুষ এ ব্যাপার সহ্য করতে পারে না। কি জানেন, হয়তো আমি মানুষের দল ছাড়া, না হলে মুখ বুজে আমি এ অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করি কেন! জানেন, মনের দিক থেকে আমি অত্যন্ত ভগ্ন।

কম্পা। তাহলে কি আপনি কাউকে হত্যা করতে চান বিষ দিয়ে?

ভদ্রলোক। (অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে) কি বললেন? আমি কি ঠিক শুনলুম? আর একবার বলুন।

কম্পা। আপনি কি কাউকে বিষ খাইয়ে মারতে চান?

ভদ্রলোক। (যেন নিজের সঙ্গে) কি সহজ ব্যাপার! স্বাভাবিক মৃত্যু। খাবার জলের গেলাসে একটু ঢেলে দেওয়া—সকালবেলা আর বিছানা ত্যাগ করতে হল না। অত্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু। গুরুতর পরিশ্রমের ফলে শরীর ও হার্ট অত্যন্ত দুর্বল ছিল, কাল একটু বেশী রাত্তিরে ফিরেছিল—মনে হয়, কিছু পরিমাণ মাদক দ্রব্যও খেয়েছিল। মেয়েমানুষের শরীরে কি আর এতটা সহ্য হয়! হার্ট অত্যন্ত দুর্বল, হঠাৎ হার্ট ফেল করেছে। পাড়ার ছেলেরা অত্যন্ত ভাল—

কম্পা। আপনি কি আপনার স্ত্রীকে—?

ভদ্রলোক। (সহজভাবে) কি বললেন ? আমার স্ত্রী ? হাঁ জানেন, আমার স্ত্রী অত্যন্ত গুণী এবং একজন শিল্পী। সকলেই তাঁকে চেনে, এক বছরের ভেতর ফিল্মে অত্যন্ত নাম করেছেন।

কম্পা। এমন স্ত্রীকে আপনি--

ভদ্রলোক। (যেন প্রশ্নের মানে বুঝতে না পেরে) আমি—কি ?

কম্পা। আপনি—(ইতস্তত করে) বিষ খাওয়াতে—

ভদ্রলোক। (অত্যন্ত প্রকৃতিস্থভাবে) আমি তাঁকে বিষ খাওয়াব ! ক্ষেপেছেন আপনি ? সেটা কি সম্ভব ? মাত্র আমাদের বছর পাঁচ হল বিয়ে হয়েছে, একটি মেয়েও আছে আমাদের—আমি আমার স্ত্রীকে কখনও বিষ খাওয়াতে পারি ! তবে কি জানেন, ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে বড় কষ্ট হয় আমার। আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার মেয়ে যখন ওঁর জন্যে অপেক্ষা করে করে রোজ ঘুমিয়ে পড়ি, তখন গভীর রাত্রিতে, প্রায় দেড়টা দুটোয়, কোন কোনদিন তিনটে চারটেয়, তিনি বাড়ী ফেরেন—(কথাটা যেন না বললেই হত এই ভাবে) একলা নয়—

আবার নিজের চুল টানতে টানতে দু তিনবার পায়চারি করল

হাঁ দেখুন, এই ভাবে রোজ বেশী রাত্তিরে দরজা খুলে দিতে হবে বলে উৎকণ্ঠায়—দেখতে পাচ্ছেন, মনের দিক থেকে আমি অত্যন্ত দুর্বল, অত্যন্ত নার্ভাস—রোজই আমার ভাল ঘুম হত না, গত পাঁচ মাস যাবত আমি আর এক পলকের জন্যেও ঘুমোতে পারছি না। আমার শরীর কি হয়েছে দেখেছেন ? চুলে পাক ধরে গেছে, চোখ মুখ বসে গেছে, যেন বুড়ো হয়ে গেছি, না ? হাঁ দেখুন, আমার আসল দরকার কি জানেন, একটু ঘুমের ওষুধ, এমন একটা ওষুধ, যা রাত্রে খাবার পর খেয়ে শুলে অনেক গোলমাল হলেও ঘুম না ভাঙ্গে, একেবারে ভোরবেলা নিশ্চিন্তে উঠতে পারি। ঘুমের একটা ভাল ওষুধ দরকার আমার, কম্পাউণ্ডারবাবু।

কম্পা। বেশ।

ভদ্রলোক। যে দাম আপনি চাইবেন তাই আমি দেব। টাট্‌কা এবং ভাল ওষুধ। উঃ, কত দিন আমি ঘুমোতে পারিনি। ঘুমটা আমার বিশেষ দরকার।—একটু বসব ?

কম্পা। বসুন।

ভদ্রলোক। (চেয়ারে বসে) জানেন, অন্য কিছু নয়, আপনার কাছে আমি ঘুমের ওষুধের জন্যেই এসেছিলুম, ঘুমটা আমার বিশেষ দরকার।

টেবিলের ওপর দুহাত আড়াআড়ি ভাবে রেখে তার উপর মাথা রাখল

যবনিকা

কুমড়া ফুল

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

পূজার প্রাঙ্গণে মোর নাহি স্থান, স্মরিবে না কেহ
যবে এই ক্ষীণ বৃন্ত স্বর্ণকান্তি দেহ
উত্তপ্ত কটাহে তৈলে ভারতের রসনা পূজায়
বার্ত্তাকু আলুর সাথে ভোজ্যপাত্রে এক হ'য়ে যায়।
আমি কুমড়ার ফুল, পুষ্পপাত্রে চন্দনশোভায়
দিতে যদি মোরে ঠাঁই জবা কিম্বা গাঁদার সভায়
হ'তাম কি হতমান ? শেফালীকমলে
যে লাবণ্য যে বর্ণালী সাহিত্যের আভিজাত্য বলে
দিয়েছ, তাহার চেয়ে মোর স্থান সুবর্ণ সজ্জায়
কম কিসে ? কমনীয় কামিনীর উন্মেষ-লজ্জায় ?
আমি মধ্যবিত্ত ফুল, মোর দেহে জাগে
নম্র আভা, রক্তে শোভে সিক্ত অনুরাগে
অন্তরের সোনার সম্পদ্ ; উর্দ্ধশির উদ্ধত গৌরবে।
তোরণ পার্শ্বেতে কভু হুঙ্কারি না সংঘবদ্ধ রবে,
ছাই না প্রান্তর ভূমি তৃণাঙ্কুর সাথে
সীমাহীন বনফুলে শরতে বর্ষাতে ;
তাই তোমাদের কবি গোলাপে ও রজনী-গন্ধারে
প্রশস্তি করিয়া গেছে, নিত্য স্মরে কাশ গুচ্ছ হারে।
ছাপোষা বাঙ্গালী ফুল ; এ বিশ্বের পূজার প্রাঙ্গণে
নাহি আজ স্থান মান, রক্তধ্বজ কিংশুকে রঙ্গণে
হায় তোমাদের নত, সুরভিত পশ্চিম বাতাস
সুখী কমলের গন্ধে ; তার পার্শ্বে ফেলি' দীর্ঘশ্বাস
বিষাব না শরতের পূজারতিকালে,
আঙিনায় মৌন রবো নম্র নত ভালে ;
জাগিবে না শঙ্খ রবে উল্লাসে বিপুল
শুদ্ধ ক্ষুণ্ণ কুমড়ার ফুল।

সোপেনহর

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইয়োরোপে বহুসংখ্যক নিরাশাবাদীর আবির্ভাব হইয়াছিল। কবিদিগের মধ্যে ইংলণ্ডে বায়রণ, ফ্রান্সে দে মুসে, জার্মানীতে হে-ইন, ইতালীতে লিওপার্দি, রুসিয়ায় পুসকিন্ এবং লারমনটফ্; সঙ্গীত রচয়িতাদিগের মধ্যে সুবার্ট, সুম্যান, চোপিন্ এবং বিটোভেন এবং সর্ব্বোপরি দুঃখবাদের মহাগ্রন্থ The World as will and Ideaর রচয়িতা দার্শনিক সোপেনহর এই যুগেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে এতগুলি নিরাশাবাদীর আবির্ভাবের কারণ কি?

সোপেনহরের জন্ম হয় ১৭৮৮ সালে। ইহার পরবৎসরই ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়। এই বিপ্লবকে ইয়োরোপের বহু মনীষী সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী ইয়োরোপের দলিত জনগণের মনে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল। এই বিপ্লবের সংবাদ যখন প্রথম ইংলণ্ডে উপনীত হয়, তখন ফক্স্ আনন্দে আত্মহারা হইয়া ইহাকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোত্তম ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্ট অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন "প্রভু, তোমার ভৃত্যকে এখন জীবলোক হইতে প্রস্থানের অনুমতি দেও। আমার চক্ষু তোমার পরিত্রাণ-কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে।" মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র বিশ্বাস ও আশা জাগরিত হইয়াছিল। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই, সে বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় রাজন্যবর্গ Holy Alliance গঠন করিয়াছিলেন। সোপেনহরের যখন ২৭ বৎসর বয়স্ তখন ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ান পরাজিত হইয়া সেণ্টহেলেনার নির্জ্জনস্থানে বন্দীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যে বিরাট ইচ্ছা এই ক্ষুদ্র-বপু কর্সিকানের অন্তরে রক্তরঞ্জিতরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাই সোপেনহরের গ্রন্থে আংশিকভাবে প্রতিফলিত হইয়া দেবত্বে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু সে ইচ্ছা পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। রাজ্যচ্যুত বুর্বন বংশধর ফ্রান্সের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নির্বাসিত অভিজাতগণ দেশে ফিরিয়া আসিতেছিল। রুস সম্রাট শান্তিকামী আদর্শবাদী আলেকজান্দারের চেষ্টায় রাজন্যবর্গের নূতন সংঘের প্রতিষ্ঠা দ্বারা সর্ব্বত্র প্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। সুদূর সেণ্ট হেলেনা হইতে নেপোলিয়নের দুঃখ ও লাঞ্ছনার করুণ কাহিনী ভাসিয়া আসিয়া ইয়োরোপের জনগণের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। বহু জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। চাষ করিবার যথেষ্ট লোক ছিল না। প্রত্যেক দেশের উদ্বৃত্ত অর্থ যুদ্ধে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। দারিদ্র্যের নগ্নমূর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইতেছিল। ১৮০৪ সালে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া ভ্রমণকালে সোপেনহর পল্লীগ্রামের বিশৃঙ্খল ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, কৃষকদিগের দারিদ্র্যকষ্ট এবং নগরের মধ্যে দুঃখ ও অশান্তির প্রাবল্য দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে কৃষক ও শ্রমিক সকলেই দুর্গতির শেষসীমায় উপনীত হইয়াছিল। রুসিয়ায় মস্কো ভস্মে পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক দেশেই গৃহপ্রত্যাগত সৈন্যগণ কর্ম্মাভাবে অর্থকষ্ট ভোগ করিতেছিল।

যে বিপ্লবের সহিত ইয়োরোপের জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল, যাহা হইতে পৃথিবীতে স্বর্গের আবির্ভাব হইবে আশা করিয়া সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতে আশা করিবারও কিছু ছিল না। বিধ্বস্ত ফ্রান্সের সিংহাসনে বুর্বনবংশীয় যাহাকে স্থাপিত করা হইয়াছিল, সে যেমন বিপ্লব হইতে কিছুই শিক্ষালাভ করে নাই, তেমনি কিছুই ভুলিয়াও যায় নাই। হতাশ হইয়া গেটে বলিয়াছিলেন—"জগতের এই শেষ অবস্থায় আমি যে যুবক নহি, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

এই অবস্থায় অনেকেই ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮১৮ সালে ইয়োরোপের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া পৃথিবীর যে একজন জ্ঞানবান মঙ্গলচিকীর্ষু বিধাতা আছেন, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে অমঙ্গলের সমস্যা এমনভাবে কখনও দর্শন ও ধর্ম্মের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। সকলের মনেই জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছিল—কেন এত দুঃখকষ্ট এ জগতে? কতদিন এ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইবে? ইহা কি পাপের শাস্তি? এই দুঃখকষ্ট কি মানুষের ধর্ম্মে অবিশ্বাসের শাস্তি? এই শাস্তি দ্বারা ঈশ্বর কি মানুষকে আবার প্রাচীন বিশ্বাস, আশা ও সহৃদয়তায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিতেছেন? স্লেগেল, নোভালিস্, সেটোব্রিয়া, দে মুসে, সাদি ও ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ ইহাই মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা আগ্রহে প্রাচীন ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বিপরীত প্রতিক্রিয়ারও অভাব ছিল না। অনেকের মনে হইয়াছিল ইয়োরোপের তৎকালিক বিশৃঙ্খলায় বিশ্বের অন্তর্বর্ত্তী বিশৃঙ্খলাই প্রতিফলিত। প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক ব্যবস্থা বলিয়া কিছু নাই, ঈশ্বর নামে যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি অন্ধ; পৃথিবীতে অমঙ্গলেরই রাজত্ব। বায়রণ, হেইন্, লিওপার্দি এবং সোপেনহর এই মতাবলম্বী।

সোপেনহর লিখিয়াছেন—"চরিত্র অথবা ইচ্ছা লোকে প্রাপ্ত হয় পিতার নিকট হইতে, বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাতার নিকট।" আরথার সোপেনহরের পিতা ড্যানজিগ নগরের একজন সম্ভ্রান্ত বণিক ছিলেন। তাহার স্বীয় ব্যবসায়ে বিশেষ দক্ষতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল। মেজাজ ছিল রুক্ষ। আরথারের পঞ্চম বর্ষ বয়সে তিনি ড্যানজিগ ত্যাগ করিয়া

হামবার্গে বসতি স্থাপন করেন। পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করেন। আরথার কিছুদিন এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাহা ত্যাগ করেন। ১৮০৫ সালে পিতা আত্মহত্যা করেন। ইহার পূর্ব্বে পিতামহী উন্মাদ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সোপেনহরের মাতা বুদ্ধিমতী ছিলেন, তাঁহার রচিত কয়েকখানা উপন্যাস বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মেজাজও রুক্ষ ছিল। দাম্পত্য জীবন তাঁহার সুখময় ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি বন্ধনহীন প্রেমলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং হামবার্গ ত্যাগ করিয়া উইমারে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সোপেনহর বিষম রুষ্ট হইলেন। তাঁহার গ্রন্থে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তিনি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন বহু পরিমাণে তাহা তাঁহার মাতার সহিত কলহের ফল। সোপেনহরের নিকট এক পত্রে মাতা লিখিয়াছিলেন—"তোমার সঙ্গ আমার অসহ্য, তোমার সহিত একত্র বাস করা খুব কঠিন। তোমার সমস্ত সদ্‌গুণ তোমার আত্মাভিমান দ্বারা অভিভূত। অন্যের ত্রুটিদর্শনের যে সাধারণ প্রবণতা তোমার আছে, তাহা দমন করিবার অক্ষমতার জন্য তোমার সদ্‌গুণ পৃথিবীর কোনও কাজে লাগিল না।" মাতাপুত্রে পৃথক বাস করিবার ব্যবস্থা হইল। স্থির হইল মাতা যখন বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন, তখন নিমন্ত্রিত অতিথির মত পুত্রও উপস্থিত হইবেন। অন্য সময়ে তাঁহার মাতার নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ হইল। গেটের সহিত মাতার বন্ধুত্ব ছিল। একদিন তিনি মাতাকে বলিয়াছিলেন "তোমার পুত্রের খ্যাতি একদিন চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইবে।" ইহাতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। মাতা নিজের খ্যাতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। পুত্র তাঁহার যশের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। একদিন কলহের সময়ে মাতা ঠেলা দিয়া পুত্রকে সিঁড়ির নিম্নে ফেলিয়া দেন। রুষ্ট হইয়া পুত্র তখন বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে কেবল-মাত্র তাঁহার মাতা বলিয়াই তিনি পরিচিত হইবেন। ইহার পরে মাতা আরও ২৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। কিন্তু সোপেনহর আর তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই। মাতার সহিত সোপেনহরের যে সম্বন্ধ ছিল তাহাও তাঁহার দুঃখবাদের একটা কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। মাতৃস্নেহের আস্বাদ যে কখনও পায় নাই, পরন্তু মাতার ঘৃণার পরিচয় পাইয়াছে, সংসারে ভালোবাসা আছে, তাহা মনে করিবার তাহার কোনও কারণ নাই। বায়রণের সহিত তাঁহার মাতার সম্বন্ধও এইরূপই ছিল।

মাতার সহিত কলহের ফলে সোপেনহরের চরিত্রে গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি গম্ভীর ও সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। সকলকেই শত্রু বলিয়া গণ্য করিতেন। নাপিত দ্বারা ক্ষৌর কার্য্য করাইতেন না, পাছে সে তাঁহার গলা কাটিয়া ফেলে, এই ভয়ে। ধূমপানের পাইপ তালাবন্ধ করিয়া রাখিতেন। পিস্তলে গুলি ভরিয়া শয্যার পাশে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। গোলমাল সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "যাহার মানসিক শক্তি যত বেশী, সে তত কম গোলমাল সহ্য করিতে পারে। সুতরাং কে কত গোলমাল সহ্য করিতে পারে, তাহা দ্বারা তাহার মানসিক শক্তির পরিমাপ করিতে পারা যায়।" নিজের মূল্য সম্বন্ধে সোপেনহরের এত অত্যুচ্চ ধারণা ছিল, যে তাহাকে একরকম মানসিক ব্যাধি (paranoia) বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

১৮০৯ সালে সোপেনহর গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, সেখান হইতে বার্লিনে গমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফিক্‌টে, শেলিং এবং স্লায়ার ম্যাকারের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। নিজের নির্ব্বান্ধব অবস্থায় তাঁহার তীব্র অনুভূতি ছিল। পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান—তাঁহার কেহই ছিল না। তিনি নিতান্তই একাকী ছিলেন, একজন বন্ধুও তাঁহার ছিল না। "একজন বন্ধু থাকা আর একজনও না থাকা, ইহার মধ্যে ব্যবধান অনন্ত।" তাঁহার সময়ে যে জাতীয়তা-বোধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহার স্পন্দন অনুভব করেন নাই। ১৮১৩ সালে ফিক্‌টে কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগঠিত সৈন্যদলে যোগ দিবার কল্পনা তিনি করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অস্ত্রাদিও ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল নেপোলিয়ন অপেক্ষা দুর্ব্বলতর চরিত্রের লোকেও যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং বৃহত্তর জীবনের জন্য প্রেরণা অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ করে না, নেপোলিয়নে তাহাই ঘনীভূত এবং বন্ধনহীন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।" যুদ্ধযাত্রার কল্পনা বর্জন করিয়া তিনি দার্শনিক প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাঁহার প্রথম গ্রন্থ
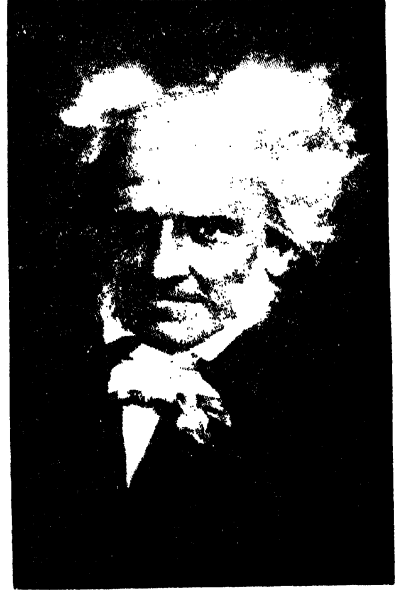
সোপেনহর

Four fold Root of the Principle of Sufficient Reason গ্রন্থ লিখিয়া ১৮১৩ সালে তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী প্রাপ্ত হইলেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তর্ক বিজ্ঞান, তত্ত্ব বিজ্ঞান এবং চরিত্র বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বাবলীর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

সোপেনহরের প্রধান গ্রন্থ The World as Will and Idea ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের নিকট পাঠাইয়া সোপেনহর লিখিয়াছিলেন—এই গ্রন্থে পুরাতন কথার পুনরুক্তি নাই। ইহাতে আছে মৌলিক চিন্তার শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাবেশ, সহজবোধ্য ওজস্বী ও সুষমামণ্ডিত চিন্তা। ইহার পরে ইহা হইতে একশত অন্য পুস্তকের উদ্ভব হইবে। দাম্ভিক হইলেও এই উক্তি সত্য। এই গ্রন্থে দর্শনের প্রধান সমস্যাসমূহের সম্পূর্ণ সমাধান করিয়াছেন বলিয়া সোপেনহরের এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গ্রন্থ-প্রকাশের বহু বৎসর পরে তিনি স্বকীয়শীল অঙ্গুরীর (Signet ring) উপর গহ্বরে লম্ফ প্রদানোদ্যত স্ফিন্‌কসের (Sphinx) মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। *

স্বীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে সোপেনহরের এত উচ্চ ধারণা থাকিলেও, তাহার আদর হয় নাই। ১৬ বৎসর অবিক্রীত থাকিবার পর অধিকাংশ গ্রন্থ প্রকাশক কর্ত্তৃক অব্যবহার্য্য কাগজের মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে সোপেনহরের ধারণার পরিবর্ত্তন হয় নাই। যশঃ লাভে হতাশ হইয়া তিনি যশঃ-শীর্ষক প্রবন্ধে লিকটেন বর্গের দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ করিয়াছিলেন। উক্তি দুইটি এই—"এই প্রকার রচনা দর্পণ সদৃশ। গর্দ্দভে ইহার দিকে চাহিলে, তাহার মধ্যে দেবদূতের প্রতিরূপ আশা করিতে পারে না।" দ্বিতীয়টি—"কোনও গ্রন্থের সহিত কোনও মস্তকের সংঘর্ষ হইতে যদি শূন্যগর্ভ শব্দ নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহা যে গ্রন্থ হইতেই নির্গত, তাহা কেহ বলিতে পারে না।" তিনি আরও লিখিয়াছেন "যতই কেহ ভবিষ্যৎ-বংশীয় দিগের সমানধর্ম্মা হয়, ততই সে সমসাময়িকদিগের বুদ্ধির বাহিরে গিয়া পড়ে। যদি কোনও গায়ক জানিতে পারে যে তাহার শ্রোতাদিগের অধিকাংশ বধির এবং যে সামান্য কয়েক জনের শ্রুতিশক্তি আছে, তাহারা উৎকোচের বশীভূত, তাহা হইলে উচ্চকরতালি-ধ্বনিতে তাহার তুষ্ট হইবার কারণ কোথায় ?"

কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে সোপেনহর তাঁহার দর্শনের ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ সন্ধান করিতেছিলেন। ১৮১২ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে Private docent নিযুক্ত হইলে এই সুযোগ উপস্থিত হইল। হেগেল তখন বার্লিনে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। তিনি যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতেন, সোপেনহর ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার বক্তৃতার জন্য সেই সময়ই নির্দ্দিষ্ট করিলেন, আশা করিয়াছিলেন হেগেলের বক্তৃতা না শুনিয়া ছাত্রগণ দলে দলে তাঁহার অধ্যাপনা-কক্ষে উপস্থিত হইবে। আশা ফলবতী হইল না। কেহই তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিল না। মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি পদত্যাগ করিলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য হেগেলকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলেন।

১৮৩৬ সালে সোপেনহরের "On the Will in Nature" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৪১ সালে The two Ground Problems এবং ১৮৫২ সালে Parerga et Parlia-pomena দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত নামের অর্থ "উপজাত ও উচ্ছিষ্ট"।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী প্রাপ্ত হইবার পরে বেদান্ত-দর্শনের প্রতি সোপেনহরের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি গভীর আগ্রহের সহিত পারসীক ভাষায় অনূদিত উপনিষৎ পাঠ করিয়াছিলেন। উপনিষৎ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "সমগ্র পৃথিবীতে সংস্কৃত মূল উপনিষৎ ভিন্ন ঔপনেখতের (উপনিষদের পারস্য ভাষায় অনুবাদ) মত হিতকর ও আত্মোন্নতিকর অন্য কিছুই নাই। জীবনে আমি ইহা হইতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছি, মৃত্যুতেও ইহাই আমার সান্ত্বনা হইবে।" তিনি তাঁহার একমাত্র সঙ্গী প্রিয় কুকুরের নাম রাখিয়াছিলেন "আত্মা"। এই কুকুরকে সাধারণে তাঁহার পুত্র (Young Schopenhauer) বলিত।

১৮৩১ সালে বার্লিনে কলেরার ভীষণ প্রকোপ হয়। হেগেল ও সোপেনহর উভয়েই বার্লিন হইতে পলায়ন করেন। কলেরার প্রকোপ প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়া হেগেল কলেরায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সোপেনহর আর বার্লিনে ফিরিয়া আসেন নাই। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তথায় দুইটি ঘর ভাড়া লইয়া তিনি ত্রিশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। এক ইংরেজি হোটেলে তিনি আহার করিতেন। নৈশভোজ আরম্ভ করিবার সময় প্রতিদিন তিনি পকেট হইতে একটি মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিতেন ; খাদ্য-পরিবেশক ভৃত্য আশা করিত, সে মুদ্রা তাহারই জন্য, কিন্তু ভোজন-শেষে প্রত্যহই সোপেনহর সেই মুদ্রা তুলিয়া লইয়া পকেটে রাখিয়া দিতেন। মনঃক্ষুণ্ণ ভৃত্য একদিন এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সোপনহর বলিয়াছিলেন "ওটা বাজির মুদ্রা। যেদিন অদূরে ভোজনরত ইংরাজ অফিসারদিগকে ঘোড়দৌড়, ঘোড়া, কুকুর ও স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ের আলোচনা করিতে শুনিব, সেদিন ঐ মুদ্রা Poor Box এর মধ্যে ফেলিয়া দিব।"

সোপনহর আশা করিয়াছিলেন একদিন তাঁহার প্রতিভা স্বীকৃত হইবে। কিন্তু কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁহার অথবা তাঁহার গ্রন্থের

* গ্রীক পুরাণে স্ত্রীলোকের মস্তক এবং সিংহের দেহ বিশিষ্ট Sphinx নামক এক দৈত্যের বর্ণনা আছে। এই দৈত্য Thebes নগরের অধিবাসীদিগের নিকট এক হেঁয়ালী বলিয়া সর্ত্ত করিয়াছিল যাহারা হেঁয়ালীর সমাধান করিতে অক্ষম হইবে তাহাদিগকে সে হত্যা করিবে। যদি কেহ ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে যে পর্ব্বতশীর্ষে সে উপবিষ্ট ছিল তাহা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া নিম্নে পতিত হইবে। Œdipus হেঁয়ালীর প্রকৃত উত্তর দিয়াছিল এবং sphinx লম্ফ প্রদান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

আদর হইল না। জার্মান অধ্যাপকগণ শিক্ষাব্যবসায়ের বহিঃস্থ কোনও ব্যক্তির তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ অনধিকার-প্রবেশ বলিয়া গণ্য করিতেন। অধ্যয়ন-প্রিয় সাধারণ লোকে যাহাতে সোপেনহর অথবা তাঁহার গ্রন্থের নাম শুনিতে না পায়, তাহার জন্য তাঁহারা চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। সোপেনহর দীর্ঘকাল কালের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার আশা ফলবতী হইল। ১৮৫৩ সালে ইংলণ্ডের West Minister Gazette-এ এক প্রবন্ধে সোপেনহরের গ্রন্থের সুখ্যাতি বাহির হইল। জার্মানগণ জানিতে পারিল তাহাদের মধ্যে এমন একজন দার্শনিক আছেন, যাহাকে সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারে। সমগ্র ইয়োরোপে তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িল। দর্শনশাস্ত্রের সহিত যাহাদের পরিচয় ছিল না, তাহার দুর্বোধ্য ভাষা যাহারা বুঝিতে পারিত না, তাহারা দেখিল সোপেনহরের দর্শন বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাঁহার যশঃ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। সাময়িক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধ সোপেনহর আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। ১৮৫৮ সালে তাঁহার সপ্ততিতম জন্মদিবসে চতুর্দিক হইতে সকলে তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিল। দুই বৎসর পরে ১৮৬০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে হঠাৎ তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যেন মৃত্যুতেই তাঁহার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়।

রজনী সেনের গান

শ্রীজয়দেব রায় এম-এ, বি-কম্

কবি রজনীকান্ত সেনের গান আজ আর কেহ গাহে না! রজনী সেন নামে একজন কবি ছিলেন সে কথাও দেশবাসী বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছেন, পাঠ্যপুস্তকে স্থানপ্রাপ্ত দুই একটি গান ব্যতীত তাঁহার কোন দানই কেহ মনে রাখে নাই!

বাংলা গানের যে ধারা আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে সুমার্জিত (Refined) সুর বাঁধিয়াছেন পাঁচজন গীতিকবি—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত এবং নজরুল। রবীন্দ্রনাথের সুরমোহে মুগ্ধ বঙ্গবাসী আজ অন্য সবারই গান অবহেলা করিতেছে। রজনী সেনের গান তাহার সুন্দর সুললিত বাণী, মধুর সুরধ্বনি, উচ্চাঙ্গের রাগ-রাগিণী, অন্তর্নিহিত গভীর ভাব সত্ত্বেও আজ বিস্মৃতপ্রায়! ইহার জন্য একমাত্রদায়ী, মনে হয়, তাঁহার শেষ জীবনের দারিদ্র্য। রজনী সেন ধনীর পুত্র ছিলেন না, ব্যারিষ্টারও ছিলেন না, বিলাত যাইবার সৌভাগ্যও তাঁহার হয় নাই; সুতরাং গায়কেরা তাঁহার গানকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার গানেরও অবসান হইয়াছে তাঁহার সঙ্গে! শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় কবির বংশধর, তিনি স্বয়ং প্রসিদ্ধ গায়ক হইয়াও কেন যে রজনী সেনের গানের প্রচারে বিরত, তাহা জানি না! আমরা এতই অলস যে, আমাদের জোর করিয়া কিছু না দিলে, আমরা গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করি! রজনী সেনের গান যদি রেকর্ডে, মজলিসে, বিশেষতঃ রেডিওতে মধ্যে মধ্যে প্রচার করিবার ব্যবস্থা হয়, বাঙ্গালী তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই দুর্ভাগা কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে!

রজনীকান্ত অতুলপ্রসাদের মতই গান ছাড়া আর কিছুই লেখেন নাই! কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় রজনীকান্তের শেষ জীবনে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি তাঁহার কাব্যগ্রন্থে পঞ্চমুখে এই বদান্য ভদ্রলোকের প্রশংসা করিয়াছেন! শেষ জীবন তিনি দারিদ্র্য এবং অস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন।

'অভয়া' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন—"আমি সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, রোগশয্যাতে প্রুফ দেখিয়া দিবার সামর্থ্য আমার নাই, সুতরাং এই গ্রন্থে......"

"আনন্দময়ী" কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার প্রগাঢ় ভগবৎ ভক্তি পরিস্ফুট হইতেছে—"জগজ্জননীর পিতৃগৃহে আবির্ভাব 'আগমনী' এবং কৈলাসাভিমুখে তিরোধান, 'বিজয়া' নামে অভিহিত। এই ক্ষুদ্র সঙ্গীত-পুস্তকের আদ্যংশ 'আগমনী' ও শেষাংশ 'বিজয়া'। পাঠকগণ পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং—যাঁহারা যে ভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করি। সুতরাং সম্যক্ ও যথাবিধ একাগ্র সাধনায় যে ভগবানকে সন্তানরূপে পাওয়া যায় না, তাই বা কেমন করিয়া বলি? তিনি তো ভক্তের ঠাকুর, যে তাঁহাকে যে ভাবে পাইয়া তুষ্ট হয়, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দেন; এ কথা সত্য না হইলে যে তাঁহার করুণাময়ত্বে, তাঁহার ভক্তবৎসলতায় কলঙ্ক হয়। ধর্মজীবন ভারতবর্ষ চিরদিন এই ধারণায় কর্ম্মক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ও অকুতোভয়। উৎকট-রোগ-শয্যায়, দুর্ব্বল হস্তে এই সঙ্গীতগুলি লিখিয়াছি। আর কোনও আকর্ষণ না থাকিলেও ইহাতে জগদম্বার নাম আছে মনে করিয়া পাঠক অনাদর করিবেন না, এই বিনীত প্রার্থনা।"

রজনীকান্ত সেন কেবল 'সাধনসঙ্গীত'ই রচনা করেন নাই, কৌতুক সঙ্গীত বা হাসির গানেও তাঁহার বিশেষ নাম ছিল। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক সঙ্গীতে বিন্দুমাত্রও হাসি নাই, সেইগুলি Light songs মাত্র! হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালই সর্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহার হাসির গানের অভিনয়-

ভঙ্গী বা (Dramatic Style) সুন্দর ! রজনী সেনের হাসির গান দ্বিজেন্দ্রলালের সমশ্রেণীর।

যে লোকটি চিরজীবন দুঃখভোগ করিয়া গেলেন, তিনি যে কেমন করিয়া এমন কৌতুক বিতরণ করিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। রজনী সেন লাঞ্ছিত কবি, তাহাই তাঁহার হাসির গানে Pony বা শ্লেষের ভাগই বেশি ! দ্বিজেন্দ্রলালের বিশুদ্ধ Fun তাঁহার গানে অল্প !

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রজনী সেনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। রজনী সেনের গানের পরিচয়ে তিনি বলিয়াছেন—

"কাহারও বাণী গন্থে, কাহারও পদ্যে, কাহারও বা সংগীতে আভব্যক্ত ! রজনীকান্তের কান্তপদাবলী কেবল সংগীত। এই কথা বলিবার জন্যই এই সংক্ষিপ্ত নীরস গদ্যের অবতারণা।"

অপর একজন সমালোচক (সারদাচরণ মিত্র) সুন্দর ভাষায় কবির গানের পরিচয় দিয়াছেন—"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রজনীকান্ত মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও হৃদয়াকাশে অনন্ত বিশ্বের প্রতিমা গড়িয়া কবিতা লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন ! রোগের যাতনা, অর্থাভাবের ক্লেশ, পুত্র-কলত্র নিরাশ্রয়ে ফেলিয়া ইহসংসার ত্যাগের চিন্তা কিছুতেই তাঁহার কোমল হৃদয়কে ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার হৃদয় পাষাণের মত নহে, কিন্তু কাব্যরসে এরূপ নিমজ্জিত যে চতুর্দ্দিকে সেই রস ভিন্ন আর কিছুই নাই। রামপ্রসাদ ভাবুক ছিলেন, স্বভাব কবি ছিলেন ! মহাশক্তি তাঁহাকে শক্তিমান্ করিয়াছিলেন, বাগ্‌দেবীও সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তির পার্শ্বে ছিলেন। কবির 'আনন্দময়ী' কাব্য পাঠ করিতে করিতে রামপ্রসাদকে মনে পড়ে। তবে সেকালের ভাষার ও একালের ভাষায় পার্থক্য আছে ; কিন্তু দার্শনিক ভাবের পার্থক্য নাই, করুণ রসের পার্থক্য নাই।"

রবীন্দ্রনাথ ও কান্তকবির ভগবৎ-অনুভূতির আন্তরিকতার প্রশংসা করিতেন—"সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর, যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে তেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে।"

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পাবনা জেলার 'ভাঙ্গাবাড়ী' গ্রামে কবির জন্ম হয়। রাজশাহী জেলা কোর্টে আইন ব্যবসা তাঁহার জীবনের উপজীবিকা ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১২নং কটেজে ক্যান্সার রোগে কবির মৃত্যু হয়।

বাংলার অধিকাংশ কবির জীবনের ন্যায় রজনী সেনের জীবন ও বৈচিত্র্যহীন ! রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বভ্রমণ এবং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনধারাকে নানা বিচিত্র অংশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সুখের ললিত ক্রোড়ে সারাদিন বাঁশী বাজাইয়া তিনি ভুবনকে উপভোগ করিয়াছিলেন।

রজনীকান্ত সুকণ্ঠের অধিকারী এবং সুগায়ক ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সকল গানের সুর তাঁহারই দেওয়া কিনা সন্দেহের বিষয় ! "কল্যাণী" গীতিসংগ্রহে তাঁহার নিজস্ব ভূমিকাই এই সন্দেহের মূল।

"বাণী'তে রাগিণী ও তাল সন্নিবিষ্ট ছিল না, এজন্য কোনও কোনও সমালোচকের তীব্র লেখনী অনেক শ্লেষ উদ্গীরণ করিয়াছে। এবার সঙ্গীতপ্রিয় জনসমাজের সে অনুযোগের স্থল রাখি নাই। সঙ্গীতে আমার অধিকার নাই। সুতরাং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপদেশে ও সাহায্যে তাল ও রাগিণী প্রদত্ত হইল। তথাপি তদ্বিষয়ে সঙ্গীত-বিশারদদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে ; তাঁহারা নিজ নিজ রুচি অনুসারে সুর-সংযোগ করিতে পারেন।"

রবীন্দ্রনাথের যুগের অন্যান্য কবি-সুরকারের রচনার ন্যায় রজনী সেনের কাব্য এবং সুরে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর প্রভাব রহিয়াছে। এমন কি তাঁহার বহু গান রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই-প্রকার একটি গানের উল্লেখ করিতেছি—

মিশ্র কানেড়া—একতালা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ॥
চির-আদরের বিনিময়ে সখা, চির অবহেলা পেয়েছ।
(আমি) দূরে ছু'টে যেতে, দু'হাত পসারি, ধরে টেনে কোলে নিয়েছ॥
'ওপথে যে'ওনা ফিরে এস', বলে কানে কানে কত ক'য়েছ।
(আমি) তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ॥
(এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসি-মুখে তুমি ব'য়েছ।
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে, বুকে ক'রে নিয়ে রয়েছ !

উপরের গানটি রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে ! তাঁহার গান এইভাবেই আমাদের হৃদয় হরণ করিয়াছে। রজনীকান্তের গানের সহজ সুরটি আন্তরিকতায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহাই তাহার প্রকাশ ভঙ্গীটি সুর কৌশল বর্জিত, যেমন ভৈরবীতে—

তব চরণ নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা ;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত মণি-রঞ্জিত নভো নীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল দরশা !

প্রায় আবৃত্তিরই রূপভেদ।

রজনীকান্তের অতি প্রসিদ্ধ 'জাতীয় সংকল্প সঙ্গীত'—
"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই ;
দীন-দুখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।"

(মুলতান, গড়খেমটা)

এক সময়ে পথে পথে গাওয়া হইত !

কবির ভগবৎ-গীতিগুলির মধ্যে 'কেন বঞ্চিত হব চরণে ?' তাহার সুললিত গীতিভঙ্গীর জন্য সুন্দর—

মিশ্র খাম্বাজ ; জলদ একতালা

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি কত আশা ক'রে বসে আছি, পাব জীবনে, না হয় মরণে !
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকি-তারণ-তরীতে, তাপিত আতুরে তু'লে না লবে গো ;—
হ'য়ে, পথের ধূলায় অন্ধ, এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে, পারে ব'সে, "পার কর" ব'লে, পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে ?
আমি শুনেছি, হে তৃষা-হারি !
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত তৃষিত যে চাহে বারি ;
তুমি, আপনা হইতে হও আপনার
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার ;
এ কি, সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে, প্রভু, মরমে !

রজনীকান্তের এই গানটির একদা প্রসিদ্ধি ইহার প্যারডি রচনার প্রয়াস হইতেই জানা যায় ! 'প্যারডি' কবিতার ব্যঙ্গ নয়, তাহার একপ্রকারের appreciation !

কেন বঞ্চিত হ'ব ভোজনে ?
মোরা কত আশা করে' নিজবাসা ছেড়ে
খেতে এসেছি এখানে ক'জনে।
ওগো তাই যদি নাহি হবে গো,
এত কি গরজ তোমার বাড়ীতে ছুটিয়া এসেছি কবে গো ?
হ'য়ে ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ,
এসে, দেখিব কি খাওয়া বন্ধ ?
তবে, তাড়াতাড়ি 'পাত কর' বলে' ডাক তব আত্মীয় স্বজনে।
মোরা শুনেছি তোমার বাড়ী,
চাহে যদি কেউ একহাতা কিছু এনে দেয় হাঁড়ী হাঁড়ী।
তুমি, পাবনা হইতে দধি ভারে ভার
মালদহ হতে এনেছ আচার,
একি, সবি মিছে কথা ? দিগুনাক ব্যথা
মোরা, খাবনাত বেশী ওজনে।
(রসকদম্ব পৃষ্ঠা ৮)

কবি সমসাময়িক সঙ্গীতের একজন অনুরাগী ভক্ত এবং রসিক শ্রোতা ছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদের গানের সুরের আনুকূল্যে তিনি অনেক গান রচনা করেন ! 'কেন বঞ্চিত হব চরণে ?' গানটির সুর অবলম্বনে তিনি পরে নিজেই অপর একটি গান রচনা করেন—এইটি কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে গাওয়া হয়—

তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া ?
পুত্রকন্যা প্রিয় শিশুদলে চেড়েছ আজি কি বলিয়া ?
মোরা—ভাসি যে অশ্রু নীরে
তোমার শুভ্র স্মৃতিটুকু লয়ে যাব কি হে গৃহে ফিরে।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীত—

"তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।"

ইমন ভূপালী, একতালায় রচিত সুরে রজনী সেনের গান—

—"আমি, সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাইনে ;
আমি, চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন,
তব সঙ্গসুখ চাইনে।"

"তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে"র সুরে রচিত রজনী সেনের গান—
(ইমন কাওয়ালী)

"ভীতি-সঙ্কুল এ ভবে, সদা তব
সাথে থাকি যেন, সাথে গো"

রবীন্দ্রনাথের—

"দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে॥"

বেহাগ ; তেওরায় রচিত সুরে রজনীকান্তের গান—

—"শুনাও তোমার অমৃতবাণী,
অধমে ডাকি' চরণে আনি'।"

অতুলপ্রসাদ সেনের জাতীয় সঙ্গীত—

"ওঠ গো ভারত লক্ষ্মী, উঠ আদি জগত জন পূজ্যা"র

'মিশ্র' সুরে রচিত রজনী সেনের গান—

—আকুল কাতর কণ্ঠে, প্রভু, বিশ্ব, চরণ অভিবন্দে।
পাপ-তাপ সব নাশি, কর প্লাবিত চির-মকরন্দে॥
বাঞ্ছিত সাধন মুক্তি, দেহ ভক্তি, ওহে অচল শরণ, সুখসিন্ধু !
দেবতা গো, হের শুভ চক্ষে, শান্তি নিবাস লহ তুলি বক্ষে,
মাগিছে কোটি তপন শশী, মজ্জন চির-সুখ-নীরে গো॥

* * * *

বন্ধন মোচন কর হে, প্রভু, বার' এ চির পথ শ্রান্তি ;
কাতরে কহে গ্রহতারা "প্রভু, দেহ চরণ তলে শান্তি ;
শঙ্কিত শতচিত শূন্যে, হতপুণ্যে, প্রভু, দিবে না কি যাচিত মোক্ষ ?
দেবতা গো............
সম্বর দুঃসহ শকতি, প্রভু, রোধ এ ঘূর্ণিত চক্র ;
কর হে নির্দ্দেশ শূন্য, যত, সঙ্কট পথ ঋজু বক্র ;
শুম্ভিত কর হে মুহূর্ত্তে, তলে, ঊর্দ্ধে,
(যত) অগণিত শশী, রবি, রুদ্রে ;
দেবতা গো.........."

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "আমরা বিলাত ফেরতা ক' ভাই" গানটির সুর বোধ হয় কবির অতি প্রিয় ছিল, তাঁহার ঐ সুরে অনেকগুলি হাসির গান পাইতেছি—

(১) আমরা, মোক্তারি করি ক'জন, (২) আমাদের ব্যব্সা পৌরোহিত্য, (৩) দেখ, আমরা দেওয়ানী হুজুর, (৪) আমরা Dey কি Ray কি Sanyal, (৫)' দেখ আমরা জজের Pleader, মিশ্র ইমন কল্যাণে "দেখ আমরা হচ্ছি পাশ করা ডাক্তার মস্ত"

কীর্ত্তনের নানাপ্রকার ঢঙে রজনীকান্ত গান গাঁথিয়াছিলেন। আঁখর বাহুল্যে তাঁহার কীর্ত্তন মহাজন পদাবলীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়--(১) এই মোহের পিঞ্জর ভেঙ্গে দিয়ে হে (গড় খেমটা) (২) বয়ে যাক্ হরি, প্রেমেরি বন্যা (এই) শুষ্ক হৃদয় মাঝে (জলদ একতালা) (৩) আর ধরিস্ নে, মানা করিস্ নে (৪) আজি জীবন-মরণ সন্ধিরে।

'মনোহর সাঁই' কীর্ত্তনের রীতিনীতিতে রচিত—(১) যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে, (২) আমি পাপনদীকূলে পাপতরুমূলে বাঁধিয়াছি পাপবাসা (জলদ একতালা), (৩) আহা কত অপরাধ ক'রেছি। আমি তোমারি চরণে (৪) তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময় প্রভৃতি—

আঁখর বর্জ্জিত কীর্ত্তনের মধ্যে ভাঙা সুরে উল্লেখযোগ্য ঝাঁপতালে (১) "নাথ, ধর হাত, চল সাথ, (২) আয় গুহ, গণপতি কোলে আয়, (৩) যামিনী হইল ভোর (কাওয়ালি) প্রভৃতি

বাউলের সুরে রজনী সেনের গানগুলির মধ্যে কতকগুলিতে দেহতত্ত্ব এবং বৈরাগ্যের ভাবটি এবং কয়েকটিতে দেশপ্রেম এবং কয়েকটিতে Mystic ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন—

(১) আমায় ডেকে ডেকে, ফিরে গেছে মা (গড় খেমটা), (২) তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান (৩) চাঁদে চাঁদে বদ্‌লে যাবে, সে রাজার এমন আইন নয় (আড় খেমটা), (৪) আজ যদি সে, নারাজ হ'য়ে রয়, (৫) ভাসা রে জীবন-তরণী ভবের সাগরে (কাহার্‌বা), (৬) আঁকড়ে ধরিস্ যা কিছু, তাই ফস্কে যায়, (৭) আছ ত' বেশ মনের সুখে, (৮) যমের বাড়ী নাই কোনও পাঁজি, (৯) তুই লোকটা তো ভারি মস্ত, (১০) তারে ধর্‌বি কেমন করে ?, (১১) এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই।

রামপ্রসাদী ভাব কেবল সুরেই নয়, কান্তকবির বহু গানের বস্তুতেও প্রকাশিত। যেমন (১) ঝিঁঝিট রাগিণীতে—

পার হলি পঞ্চাশের কোটা। আর দুদিন বাদে মন রে আমার,
ফুল ঝ'রে যাবে, থাক্‌বে বোঁটা।
* * * তোর খাওয়া পুরী ঢের হয়েছে, এখন পারের কড়ি জোটা,
কান্ত বলে সব ফেলে দিয়ে, তুলে নে' কম্বল আর লোটা ॥

(২) বাউলের সুরে কবি সাধকজন-সুলভ বৈরাগ্যের ভাবটি ফুটাইয়াছেন—

আর কি ভাবিস্ মাঝি বসে ?
এই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে হাল ধরে থাক কসে।
* * * মরণ-সিন্ধু মাঝে গিয়ে পড়্‌বি রে নিজ কর্মদোষে।

রামপ্রসাদ সেনের সাধক জীবন এবং তাঁহার ভজনের সঙ্গে কবি রজনী সেনের জীবনের এবং সাধনার বেশ মিল আছে! রামপ্রসাদী সুরে তাঁহার গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

(১) মা, আমি যেমন তোর মন্দ ছেলে, (২) আমায় পাগল করবি কবে ?

যশোহরের 'মধুকাইন' বা মধুসূদন কিন্নরের কীর্ত্তনের মৃদু লয় এবং ধীরগতি একটি বিচিত্র সুরভঙ্গী। ইহার নাম ঢপকীর্ত্তন। রজনী সেনের এই ঢঙে রচিত গান—

(১) ধন্য মানি মেনকাকে (ঠেস্ কাওয়ালি) (২) গা তোল গা তোল গিরিরাণি। সংস্কৃত ছন্দের উচ্চারণ ভঙ্গীর হ্রস্ব এবং দীর্ঘ স্বর ভেদে গাহিবার নির্দেশ দেওয়া আছে তাঁহার কয়েকটি কীর্ত্তনে—(১) কনকোজ্জ্বল-জলদ-চুম্বি মণি-মন্দির মাঝে রে এবং (২) প্লাবিত গিরি-রাজ-নগর কি পুলক-মকরন্দে! জয়দেবের গীতগোবিন্দের 'স্মরগরলখণ্ডনং' সুরে রচিত একটি গান আছে—

"আজি, শিথিল সব ইন্দ্রিয়, চরণ-কর নিষ্ক্রিয়,
তিমিরময় প্রাণপ্রিয় গেহ ;
কে, শান্তি-সুখ দূর করি', বজ্র করে কেশ ধরি',
বেগভরে শূন্যে তোলে দেহ !"

রজনী সেনের দেশ-প্রেম উদ্দীপনার গানও আছে, কিন্তু কবির এমন দুর্ভাগ্য যে, সেই গানগুলিও আজ আর কেহ গাহিতে জানেন না! তাঁহার স্বদেশী গানের মধ্যে—

(১) ভারতকাব্যনিকুঞ্জে,—জাগ সুমঙ্গলময়ি মা! (ভৈরবী, কাওয়ালি)

(২) সেথা আমি কি গাহিব গান (গৌরী ; একতালা)

(৩) জয় জয় জনমভূমি, জননি! (মিশ্র পরজ, কাওয়ালি)

(৪) শ্যামল-শস্য-ভরা (ভৈরবী ; কাওয়ালি)

(৫) নমো নমো নমো জননি-বঙ্গ (সুরটমল্লার)

সংকীর্ত্তনের সুরে ছন্দে 'হিন্দু-মুসলমান-'মিলন-গীতিটি আজ এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিনে স্মরণীয়।

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু মুসলমান!
ঐ দেখ্ ঝ'র্‌ছে মায়ের দু'নয়ান।
আজ, এক ক'রে দে সন্ধ্যা নামাজ
মিশিয়ে দে আজ, বেদ কোরাণ।
(জাতি ধর্ম ভুলে গিয়ে রে, হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রে)।

১৩১২ সালে রজনী সেন তাঁহার জন্মভূমি 'ভাঙ্গাবাড়ী'র (পাবনা) নিকট এক গ্রামে শাক্ত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র রেষারেষি এবং মনোমালিন্য লক্ষ্য করেন ; কবি একটি কীর্ত্তন গান রচনা করিয়া সেইখানে গাহিয়াছিলেন—

ভেদ বুদ্ধি ছাড় 'দুর্গা', হরি, দুই তো নয়,
এ কি রে দুই পরিচয়।
শাক্ত, দে ভাই 'হরিধ্বনি',
বৈষ্ণব, বল, কালীর' জয়।
যেমন, জলকে বলে কেউ বা 'পানি',
কেউ বা 'বারি', কেউ বা 'পয়';

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ রাগরাগিণী অবলম্বনে রচিত রজনী সেনের গানগুলি হইতে তাঁহার সুরদক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়! তাঁহার বিশুদ্ধ রাগপ্রধান গানগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি—

(১) বেহাগ; কাওয়ালি—কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে। (২) পুরবী; একতালা—তোমার, নয়নের আড়াল হতে চাই আমি, তোমারি ভবনে করি' বাস। (৩) বারোয়াঁ-একতালা—তব, শান্তি-অরুণ শান্ত করুণ কনক কিরণ পরশে। (৪) ঘট্; একতালা—নিরুপায়, সব যে যায়, আর কে ফিরায় তোমা ভিন্ন। (৫) হাম্বীর; কাওয়ালি—(আমি) দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত (৬) রাজবিজয়, তেওরা—জয় বিশ্বধারিকে! তাপবারিকে! (৭) কেদারা-মধ্যমান—জাগাও পথিকে, ও সে ঘুমে অচেতন। বেলা যায়, বহু দূরে পান্থ-নিকেতন। (৮) গৌরী-চৌতাল—আমার হ'ল না রে সাধন এত আলো বিশ্ব-মাঝে, মুক্ত করে দিলে ঢালি।

রজনী সেনের অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের সুরের গানের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ (১) পরম প্রেম সুন্দর জ্ঞান নয়ন নন্দন—সুরট্মল্লার, সুরফাঁক্তা (সম্পূর্ণ শ্রেণীর গান, বাদী রে, সম্বাদী ধা)। (২) কার কোলে ধরা লভে পরিণতি (গৌরী, একতালা)—বাদী পা, সম্বাদী গা, সম্পূর্ণ শ্রেণী, ব্যবহার—হ্মা মা হ্মা দা। (৩) আমি দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত (হাম্বীর কাওয়ালী) সম্পূর্ণ জাতি, বিকৃত ঠাট, ধা বাদী; ব্যবহার মা, হ্মা। নীলকান্ত রায় মহাশয়ের স্বরলিপি অনুসারে এই গানটির সুররূপ—

০ ১´ + ৩´
II না ধা না ধা | পহ্মা পা গা মা | না ধা না নর্রা | র্সা -া -া -া I
দে খে ছি জী ব০ ন ভ রে চা হি য়া ক০ ত ০ ০ ০

০ ১´ + ৩
র্সা র্রা সা র্সা | ধা না পা ধা | হ্মা পা গা রা | সা -া -া -া II
আ মা রে যা দা ও সব ই তো মা রি ম ত ০ ০ ০

০ ১´ + ৩
পা ধা পা ধনর্সা | র্সা র্সা র্সা র্সনধা | ধা না ধনা র্সর্রা | র্সা নর্সা ধনা পা I
আ কু ল হ০০ হ' য়ে মি ছে০৯ যে য়ে ম০ রি০ ক ত০ কি০ যে

০ ১´ + ৩´
সা সা রা রা | গা গা হ্মা হ্মা | না না নধপা ধনা | ধনা র্সা -া -া I
প দ ত লে নি ষ্ ফ ল যা স না০০ না০ ত০ ০ ০ ০

রজনী সেনের সাধন-সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার স্বাভাবিকতা! খৃষ্টীয় চার্চের আদর্শে গঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে সৃষ্ট ব্রহ্ম সঙ্গীতের ধারায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশ হইতে তাঁহার সাধন সঙ্গীত মুক্ত; তাঁহার ভজনগান হৃদয়ানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ, ব্রহ্ম সঙ্গীতের ন্যায় ফরমাইশি প্রার্থনা-সঙ্গীত নয়! রামপ্রসাদের পর বহুদিন পরে রজনী সেনের গানে বঙ্গবাসীর হৃদয়াকুতি সহজভাবে প্রকাশ করিয়াছে!

এইবার রজনী সেনের হাসির গান সম্বন্ধে দুই একটি আলোচনা করিব! রজনী সেন এই ধারায় দ্বিজেন্দ্রলালের অনুগামী! তাঁহার কৌতুকগীতিতে কোথাও অশ্লীলতার মাত্রা ছাড়ায় নাই! এইগুলি বিশুদ্ধ কৌতুকের নিদর্শন, তবে উচ্ছ্বাস বিশেষ প্রকাশ পায় নাই! তাঁহার কৌতুক গীতির মধ্যে এইগুলি রসোত্তীর্ণ—

(১) যদি, কুমড়োর মত চালে ধরে রত পান্তোয়া শত শত
আর, স'রষের মত হত মিহিদানা, বুঁদিয়া বুটের মত!
(মনোহর সাঁই কীর্ত্তন)

(২) রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী (পুরাতত্ত্ববিৎ)

(৩) তিনকড়ি শর্মা—আমি যাহা কিছু বলি—সবি বক্তৃতা।

(৪) হয় নি কি ধারণা, বুঝিতে পার না (বসন্ত বাহার)

(৫) আঃ, যা কর, বাবা, আস্তে ধীরে (কীর্ত্তন)

(৫) আমি পার হতে চাই, ওরা আমায় দেয় না পারের কড়ি
(মিশ্র বিভাস)

(৭) ভারি সুনাম করেছে নিধিরাম (খাম্বাজ)

(৮) হরি বল রে মন আমার (মিশ্র খাম্বাজ)

তবে তাঁহার বহু হাসির গানেই গ্রাম্যতা দোষ আছে।

রজনী সেন, গীতাঞ্জলির পরবর্ত্তী যুগের কবি, রবীন্দ্রনাথের mystic সাধনার ধারা সঙ্গীতে তিনিও গ্রহণ করিয়াছিলেন! অনেকের ধারণা তাঁহার এই শ্রেণীর গানে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা অধিকতর আন্তরিকতা পরিস্ফুট! তাঁহার শ্রেষ্ঠ গান দুইটির মধ্যে গীতাঞ্জলির গানের সুর পাওয়া যায়।

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ (আলেয়া মিশ্র, তেওরা)
তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছা'য়ে (ভৈরবী, জলদ—একতালা)

রজনীকান্তের গান কালের প্রবাহে স্থায়ী হইতে পারে নাই, তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথের গানের সর্ব্বগ্রাসী প্রতিষ্ঠা। দেশের লোক রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেই রজনীকান্তের সমস্তটুকুকেই পাইয়াছে।

প্রায় এই বিস্মৃত কবির কবিপ্রতিভার স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনটি উপায় অবলম্বন করা হইলে ভালো হয়—

(১) তাঁহার সমগ্র গানের স্বরলিপি করিয়া তাহার সংরক্ষণ।

(২) তাঁহার অনুরাগী গায়কগণের দ্বারা তাঁহার গানের প্রচার।

(৩) তাঁহার নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার হস্তে তাঁহার গানের সুরভার এবং দায়িত্ব অর্পণ।

তাঁহার প্রিয় গানের দ্বারাই তাঁহাকে প্রণাম জানাই!

সুখের হাট কি ভেঙ্গে নিলে!
মোদের মর্মে মর্মে রইল গাঁথা, (এই) ভাঙ্গা বীণায় কি সুর মিলে।
দুঃখ দৈন্য ভুলে ছিলাম ডুবে আনন্দ-সলিলে;
(ওগো) দুদিন এসে দীনের বাসে, আঁধার করে আজ চলিলে।

কান্তকবির একটি গানের স্বরলিপি দিয়া নিবন্ধের উপসংহার করি—তাঁহার সকল গানের রূপটিই এই শ্রেণীর।

(দিলীপকুমার রায়কৃত স্বরলিপি)

৪ সা ঋা | II + সঋা জ্ঞমা | • মা মা | ২ পমা পমা | • জ্ঞরা জ্ঞা | ৩ রা জ্ঞা |
তু মি নি র্ম ল ক র মং - গ ল

৪ মা জ্ঞরজ্ঞা | + সা ঋা | • সা সঋা | ২ জ্ঞমা মা | ০ ঋজ্ঞা ঋা | ৩॥ সা -া |
ক রে ম লি ন ম র্ ম মু ছা য়ে -

৪ সঋা সণ্‌া | II ৪ সা ঋসা | + পা -া | ০ দা পা | ২ পদা মপা | • পদণা পণদা |
তু মি ত ব পু - ণ্য কি র ণ দি য়ে

৩ পা মা | ৪ মা -া | + পা ণা | • পণা দা | পা মাপ | • মজ্ঞরা জ্ঞা | রজ্ঞা রজ্ঞা |
যা ক মো র মো - হ কা লি মা ঘু চা য়ে -

৪ মজ্ঞা ঋসা | + সা ঋা | সা সঋা | জ্ঞমা জ্ঞমা | রজ্ঞা ঋা | সা -া |
- - ম লি ন ম র্ ম মু ছা য়ে -

আবির্ভাব

শ্রীমতী রঞ্জিতা কুণ্ডু এম-এ

মধুর আবেশ সোনার দেশের স্বপ্নে ভরা,
রঙীণ হ'ল আজ যে আমার বসুন্ধরা।
প্রাণের মাঝে উঠলো জেগে কোন্ সে কবি
রূপে, রসে, রঙে আঁকে কতই ছবি।

যা ছিল সব এতকালের চেনা জানা,
তাদের মাঝে দেখা দিল কোন অজানা।
গোপন আমার হৃদয়পুরে সুর জেগেছে,
মনের পাতে অনুরাগের রঙ্ লেগেছে।

পথ হারিয়ে এলাম এ কোন অচিন দেশে,
নিখিল জগৎ দেখা যে দেয় নূতন বেশে।

কীর্ত্তনপ্রেমী রসময় মিত্র

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

হিন্দুস্কুলের হেডমাষ্টার রূপে রসময় মিত্র যে রকম নাম করেছিলেন, সে রকম নাম অল্পদিনের মধ্যে আর কেউ করতে পারেন নি। হেয়ার স্কুলে ছিলেন, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, হিন্দুস্কুলে রসময় মিত্র। শিক্ষাজগতে দুই দিকপাল।

রসময় নাকি বাল্যকালে গান গেয়ে তাঁর রুষ্ট শিক্ষককে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নিজে শিক্ষক হয়েও তিনি কীর্ত্তন গানের ভক্ত হয়েছিলেন। তাঁর কতকগুলি সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের নিয়ে সাধারণতঃ তিনি বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে কীর্ত্তন করতেন—সাধারণ কীর্ত্তনীয়ারই মতো। আকৃতিতে তিনি ছিলেন বেশ দীর্ঘাকার, পাতলা গঠন, দাড়ি গোঁফ কেশ ছিল অযত্ন-বর্দ্ধিত। বেশবিন্যাসে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল।

তিনি যখন দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন গাহিতেন এবং শ্রোতাদের মুখের কাছে গিয়ে পদাবলীর মধুর ব্যাখ্যা দিতেন, তখন সকলেই মুগ্ধ হতো। এই ছিল তাঁর চরম পুরস্কার। কীর্ত্তন-গানের ভক্ত হওয়ার অপরাধে এই অসাধারণ যোগ্য লোক কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হতে পারেন নি। তিনি সরকারী চাকরী করতেন; দুষ্ট লোকে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কীর্ত্তনগানের জন্য অভিযোগ করতেও ত্রুটি করেনি।

আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলী হয়ে এলাম, (১৯০৬সালে) তখন রসময়বাবু হিন্দু স্কুলের হেড মাষ্টার। তাঁর কীর্ত্তনের খ্যাতি আমি পূর্ব্বেই শুনেছিলাম। গেলাম তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করতে হিন্দু স্কুলে—তার আগে তাঁকে কখনও দেখি নি। জলখাবার ঘরে তিনি উবু হয়ে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। আমি অনুমানে তাঁকেই নমস্কার করলাম এবং আমার পরিচয় দিলাম। তিনি বললেন

'কি চান?'

'আপনি খুব ভাল কীর্ত্তন করেন, শুনে আমি এসেছি। যখন আপনার কোথাও গান হবে, তখন যদি আমায় একটু খবর দেন দয়া করে'—'

'ও, আপনি আমার পাগলামির কথা শুনেছেন। আচ্ছা; আচ্ছা—' বলেই নমস্কার করলেন। কাজেই আমার পক্ষে বিদায় নেওয়া ছাড়া উপায় রইল না।

খবর মিল্‌ল না। আবার গেলাম তাঁর কাছে। এবারও সংক্ষেপে 'আচ্ছা, আমার মনে আছে'—বলে আমাকে বিদায় দিলেন।

এরও সাত আট মাস পরে আমি আবার গেলাম হিন্দুস্কুলে। সেদিনও তিনি জলখাবার ঘরে' বসে' তামাক খাচ্ছিলেন। সেদিনও তিনি আমায় সংক্ষেপে বিদায় করবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু তিনি নমস্কার করবার পূর্ব্বেই আমি সাহস সঞ্চয় করে' বলে' ফেললাম—

'আমায় খবর দিলেন না; কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে থাকলে আপনার গানের কোনও ক্ষতি হতো না—'

'কেন? আপনি কি গান জানেন?'

আমি জোরের সঙ্গে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তখন আমার বয়েস অল্প। গলা আছে। কিন্তু সেজন্যে 'হ্যাঁ' ব'লিনি। একটা অধিকার আমাকে আদায় করতে হবে; কাজেই সেখানে লজ্জা করলে চলে না। তা নইলে ও রকম বাচালতা করা যে অশোভন, সে কথা আমার যে জানা ছিল না তা নয়।

রসময়বাবু তখনই বল্‌লেন—

'বেশ, আগামী রবিবার দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ীতে 'কুঞ্জ ভঙ্গ' গান হবে—খুব ভোরে আসতে পারবেন? আপনি ভোরে ওঠেন ত?'

আমি বললাম 'খুব ভোরে উঠি নে। তবে চেষ্টা করলে উঠতে পারবো নিশ্চয়।'

খুব ভোরেই মদন মিত্র (এখন দীনবন্ধু) লেনে গেলাম, কিন্তু তার পূর্ব্বেই গান আরম্ভ হয়ে গেছে। আমাকে ডেকে নিয়ে রসময় তাঁর পাশেই বসালেন। কিন্তু আমি আমার কথা রাখতে পারলাম না—তাঁর গানে সুর দিতে অপারগ হলাম। তার কারণ, মনোহরসাহী কীর্ত্তনের টেক্‌নিক্ তখন আমার কিছুই জানা ছিল না। তারপর অভ্যাস না থাকলে একজনের সঙ্গে আর একজন কীর্ত্তন গানে দোয়ারকি দিতে পারে না। গান ধরতে না-ই পারি, আনন্দ পেলাম প্রচুর। রসময়বাবুর কণ্ঠ যে খুব মধুর

ছিল, তা বলা যায় না। অন্ততঃ আমি যে সময়ে তাঁর গান শুনেছি, তখন তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর বিশেষ মিষ্ট ছিল না। বাল্যকালে তাঁর কণ্ঠ সম্ভবতঃ মধুর ছিল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, তাঁর রোগ-ভোগের কথা। সেবার কলকাতায় ব্যাপক ভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়—বোধ হয় ১৯১৯ সালে—রসময়বাবু ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। জীবনের আশা ছিল না। শুনেছি আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে দিনের পর দিন সংগ্রাম করতে দেখে ডাঃ ব্রাউন আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে গিয়েছিলেন। চিকিৎসা করছিলেন বোধহয় ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত। ব্রাউন সাহেব বিস্মিত হয়ে তাঁকে বললেন—

'এই ডবল নিউমোনিয়া রোগীর ফুসফুস এতদিন কি করে' টিকে আছে, তাই ভাবছি'—

ডাঃ সেনগুপ্ত বলেছিলেন, 'বোধ হয় কীর্ত্তন করেন বলে' ওঁর ফুসফুস এই চাপ সহ্য করতে পারছে···'

তারপর তিনি ব্রাউন সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন যে, কীর্ত্তন করতে হলে দুতিন ঘণ্টা ধরে উচ্চকণ্ঠে চেঁচাতে হয়।

ব্রাউন সাহেব সব শুনে' বললেন—'That has saved him' এতেই উনি বেঁচে গেলেন।'

যা হোক্, রসময়ের শক্তি ছিল অসাধারণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি গান করে' যেতেন, সময় কোন দিক্ দিয়ে চলে যেতো কেউ তার খোঁজ রাখতো না।

রসময়বাবু মহাজন-পদাবলী গান করতেন। এই সকল পদ অনেক সময়ে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। গায়ক যদি সেগুলি গানের মুখে ব্যাখ্যা করে' না দেন, তা হলে অনেকের পক্ষেই অর্থ গ্রহণ করা কঠিন হয়। রসময় আখরের সাহায্যে পদের ব্যাখ্যা করতেন। এরূপ কবিত্বপূর্ণ ভাবানুগত ব্যাখ্যা আমি আর কারও কাছে শুনিনি। এর কারণ, তাঁর বৈষ্ণব-শাস্ত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা ও অসাধারণ রসজ্ঞতা। তাঁর গান শুনে আমার মনে হয়েছিল যে শুধু গান শিক্ষা করলেই কীর্ত্তন-গায়ক হওয়া যায় না। বিদ্যা থাকলেও হয় না। প্রচুর অধ্যয়ন ও সেই সঙ্গে ভগবৎকৃপা চাই। পূর্ব্বে যাঁরা কীর্ত্তন গান করতেন, তাঁদের মধ্যে এই দুটি গুণের যাঁরা অধিকারী ছিলেন, তাঁরাই যথার্থ অধিকারী বলে' গণ্য হতেন। পণ্ডিত অদ্বৈতদাস বাবাজির কথা মনে পড়ে। তিনি একদিকে অদ্বিতীয় কীর্ত্তন-গায়ক বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, অপরদিকে তিনি টোলে অধ্যাপকতা করতেন। ৺অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়েরও পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বঙ্গদেশের কীর্ত্তন-গায়কদের মধ্যে একদিন তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

রসময় বহুবার আমার বাড়ীতে কীর্ত্তন করেছেন। কক্ষটি প্রশস্ত ছিল—এত ভীড় হতো যে তিলধারণের জায়গা থাকতো না। যোড়াসাঁকোর বিজয় সিংহ, সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ প্রভৃতি গান শুন্‌তে আসতেন। গানের মাঝে যখন রসময় আখরের পর আখর যোজনা করে' রসসৃষ্টি করতেন, তখন এই সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি ভাবে গদগদ হয়ে তাঁর পায়ের ধূলা নিতেন।

একবার এই রকম গান হচ্ছে আমার বাড়ীতে। ঘরে লোক ধরে না, সিঁড়ির উপরে নিজ নিজ উড়ানী বিছিয়ে বহু ভদ্রলোক বসে' গান শুনছেন—সেখান থেকে রসময়বাবুকেও দেখা যায় না, গানের আসরও দৃষ্টিগোচর হয় না। ভক্তেরা নিবিষ্ট মনে গান শুনছেন। এমন সময় আমার বন্ধু যামিনী কবিরাজ সিঁড়ি দিয়ে কোনও মতে উঠে' এসে আমাকে ডাকলেন। তখন আমি রসময়বাবুর পাশে বসে' দোয়ার্কি করছি। বন্ধুর ডাকে আমাকে উঠে' যেতে হলো। যামিনী এত ভীড়ে 'হলে' প্রবেশ করতে রাজি হলেন না; আমি ফিরে এসে আবার গানে যোগদান করছি, এমন সময় রসময় দুহাতে আমার মাথা নিয়ে সজোরে মর্দ্দন করলেন। দর্শকেরা আমার প্রতি এরূপ দণ্ডদান দেখে চমকিত হলেন। আমি বুঝলাম রসভঙ্গ করা আমার উচিত হয় নি—আমার না-উঠাই উচিত ছিল।

রসময়বাবুর সরলতা ও অমায়িক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছিলাম। প্রধানতঃ তাঁরই গানে আকৃষ্ট হয়ে' আমি কীর্ত্তন শিখতে প্রবৃত্ত হই। রসময় গান করতেন মনোহরসাহী কীর্ত্তন—আমি শিখতে চেষ্টা করলাম গরাণহাটী। শেষে যখন শরীরের গতিকে রসময়বাবু গান করতে বিরত হলেন, তখন তিনি প্রায়ই আমার গানে আসতেন এবং আগাগোড়া বসে' শুনতেন।

রসময়বাবু আমাকে ভালবাসতেন, একথা স্মরণ করে'

আমি আজ গৌরব বোধ করি। আমি যে তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পেরেছিলাম, এ আমার জীবনের এক মূল্যবান সম্বল। একটি ঘটনা থেকে তাঁর প্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়েছিলাম। রাণী ভবানী স্কুলের পারি-তোষিক-সভা—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে। আমি ঐ বিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। আমি সভায় যেতেই দেখি, রসময়বাবু বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে' আছেন, আমি তখন দর্জিপাড়া থেকে উঠে এসে বালিগঞ্জে বাস করছি। দেখা সাক্ষাৎ খুব কমই হয়।

আমাকে দেখে' রসময় বললেন, 'আপনি আজ এখানে আসবেন, এ আমি নিশ্চয় জানি। তাই আমি এসেছি।'

আমি তাঁর পায়ের ধুলা নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরীর কেমন আছে?'

তিনি বললেন 'ভালই আছি।'

"তা হলে একদিন আমার বাড়ীতে গান করুন। কি বলেন?"

রসময়বাবু সম্মত হলেন। বললেন, একটু জল পড়ুক, একটু ঠাণ্ডা হোক্—'

সে মাস, সেবার খুব গরম পড়েছিল।

আমরা উভয়ে হলে প্রবেশ করলাম। তারপর তিনি যে কখন চলে গেছেন, আমি তা লক্ষ্য করি নি। বোধ হয় বেশীক্ষণ ছিলেন না। বিকাল পাঁচটায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা—কিন্তু ভোর পাঁচটা না বাজতেই তিনি আর ইহলোকে নেই। রোগ নেই, যন্ত্রণা নেই, পরম শান্তিতে তিনি কাউকে কিছু না বলে' চলে গেছেন অমরলোকে। মনে হলো, সার্থক তাঁর ভজন সাধন, সার্থক তাঁর হরিনাম কীর্ত্তন। পাশের ঘরে তাঁর পুত্র মহীমোহন ছিলেন, তিনি পর্য্যন্ত জানতে পারেন নি কখন রসময় তাঁর প্রিয়তমের জন্যে অভিসারে গমন করেছেন। সেদিন বার বার আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে আমাকে শেষ দেখা দিবার জন্যই তিনি পূর্ব্বদিন সভায় এসেছিলেন।

রসময় তাঁর একখানি আত্মজীবনী লিখেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'কৃপাবৃষ্টি'। ভগবানের কৃপাই তাঁর জীবনের অবলম্বন ছিল, সেই কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিনয়বশতঃ গ্রন্থখানি প্রচার করেন নি। কেবল বন্ধুবান্ধবের হাতে দিয়েই তিনি তৃপ্তিলাভ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি

শ্রীনীলিমা মজুমদার

বিগত ১৪ই এপ্রিল বেদান্ত ধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতীক ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে আমরা একজন জীবন্মুক্ত ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষকে হারাইলাম।

বঙ্গদেশে জনসাধারণের নিকট তিনি বিশেষভাবে পরিচিত না হইলেও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এমন কি সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, হলাণ্ডে শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি সুপরিচিত। গত ১৩৫৪ সনের পৌষ সংখ্যায় ভারতবর্ষ পত্রিকায় লেখিকা কর্ত্তৃক লিখিত তাঁহার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একাধিকবার এই তপোজ্জ্বল কৌপীনধারী অরুণাচলের ঋষির শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল,—তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া নিজের জীবন-মন ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছি। আজ তাঁহার নশ্বর দেহের অবসানে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

এই আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ ১৮৭৯ খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর মাদুরার নিকট এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আইনজীবী ছিলেন। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি বেঙ্কটরমণ নামে পরিচিত ছিলেন। শৈশবে তিনি পিতৃহীন হন। গৌরবর্ণ, সদাহাস্যময় সুঠাম মুখশ্রী এবং উদারতা ও নির্ভীকতার জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। অতি শৈশবকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মপ্রবণতা দেখা যায়। গৃহত্যাগ করার পূর্ব্বে একদিন তিনি অলৌকিক ভাবে নিজস্ব সত্তা উপলব্ধি করেন। সপ্তদশ বৎসর বয়সে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তিনি গৃহত্যাগ করেন। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান তিরুবন্নমালাই সহরের অবস্থিত জ্যোতির্লিঙ্গ অরুণাচলেশ্বর মূর্ত্তির সম্মুখে প্রথমে ধ্যানস্থ হন। লোকালয়ে ধ্যান ধারণার বিঘ্ন ঘটে বলিয়া পরে অরুণাচল পর্ব্বতে চলিয়া যান। তথায় পর্ব্বত গুহায় আত্মগোপন করিয়া দুশ্চর তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হন। মহর্ষির আত্মসাক্ষাৎকারের সন্ধান প্রথমে যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীশিবপ্রকাশম পিল্লে মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি তাঁহার জন্য ভক্তগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অরুণাচল শৈলের পাদমূলে অবস্থিত

আশ্রমে বাস করিতেন। একদিনের জন্তও এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অন্ত কোথাও গমন করেন নাই। এই আশ্রমটী "শ্রীরমণাশ্রম" বলিয়া পরিচিত।

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক হইলেও মহর্ষির মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁহার ধর্মমত সহজ ও সরল। "আমি কে" এই আত্মানুসন্ধান হইতেই আত্মোপলব্ধি হয়—ইহাই এক কথায় মহর্ষির তত্ত্বোপদেশ। যাঁহার যে ধর্ম যে মত তাহাতেই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া আত্মানুসন্ধান করিতে তিনি বলিতেন। কোন গুরু তাঁহার জীবন্মুক্তি লাভে আবশ্যক হয় নাই। স্বতঃই তাঁহার মন তরঙ্গশূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। দীক্ষা বা মৌখিক কোন উপদেশ তিনি কাহাকেও দেন নাই, তবে কাহারও কোন জিজ্ঞাসা
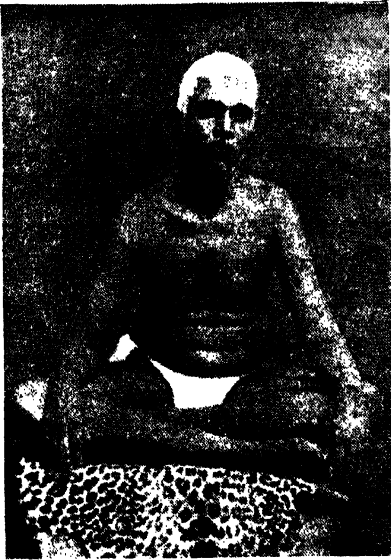
শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি

থাকিলে যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন। তাঁহার কেহ মন্ত্রশিষ্য নাই—সকলেই তাঁহার ভক্ত মাত্র। দেশদেশান্তর হইতে আগত হিন্দু মুসলমান, পার্শী, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান-ইংরেজ, আমেরিকান, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, গুজরাটী, মারাঠী জাতিধর্ম নির্ব্বিশেষে, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিবাদে ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে প্রত্যহ তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিতেন। চতুর্দ্দিকে বিরাজমান গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে কখনও কখনও আত্মসমাহিত অবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া সকলের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিতেন। দেবদুর্লভ মধুর হাসি হাসিয়া মাঝে মাঝে দুএকটী কথাবার্ত্তাও বলিতেন। তাঁহার সকরুণ দৃষ্টিপাতে মধুর হাসিতে প্রাণে অনির্ব্বচনীয় শান্তি আসিত। তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ তাঁহাকে "ভগবান" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মহর্ষি সকল সংস্কারের অতীত ছিলেন। তিনি জাতি বিচার করেন নাই, অস্পৃশ্যতাও স্বীকার করেন নাই। জাতিধর্ম নির্ব্বিবাদে, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত তিনি একত্রে প্রত্যহ আহারে বসিতেন। সকলের আহার শেষ হইলে, সবাই উঠিয়া গেলে আসন পরিত্যাগ করিতেন। নিজস্ব কোন সময় তাঁহার ছিল না। সকল সময়ই ভক্তদের সহিত অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহ খবরের কাগজ পড়িতেন, চিঠিপত্র সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতেন। এই বৃদ্ধ বয়সে দৈনন্দিন নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। অহিংসা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। জীবজন্তুর প্রতি তাঁহার এত মমতা ছিল যে ময়ূর কাঠবেড়ালি খরগোস প্রভৃতিকে নিজের হস্তে খাবার দিতেন। জীবজন্তুরাও মহর্ষির হাত হইতে খাবার গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। কখনও কখনও দেখিয়াছি, তাহারা নির্ভীকচিত্তে মহর্ষির গাত্রে বিচরণ করিত।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণিত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের—"জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥" অবস্থা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, মহর্ষিকে দেখিবার সুযোগ যাহাদের হইয়াছে তাহারা তাহা স্বীকার করিবেন। রাজা-মহারাজা ধনী দরিদ্র মেথর মুচি চণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলকেই মহর্ষি সমভাবে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভক্তগণ—যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বহুবর্ষব্যাপী আশ্রমে বাস করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে সাধন করিতেন,—আর আমরা যাহারা মাঝে মাঝে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছি, তাঁহার নিকট আমরা সবাই সমতুল্য ব্যবহার পাইতাম। তাঁহার আশ্রমের দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য দিবারাত্র উন্মুক্ত। যে কেহ যে কোন সময়ে উপস্থিত হইলে সাদরে গৃহীত হন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পল ব্রাটন, বিখ্যাত জার্ম্মাণ মনঃসমীক্ষক ডাঃ জীমার মিঃ গ্রাণ্টডাফ, মিঃ ফ্রেডারিক ফ্রেচার, মেজর চ্যাডউইক, মিস মারসটন, মিস ম্যালেট তাঁহার বহু পাশ্চাত্য ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম। তাঁহারা সকলেই মহর্ষির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আর আশ্রম ত্যাগ করেন নাই। স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মহর্ষির জীবিত অবস্থায় সত্যই লিখিয়াছিলেন—"ঈশ্বরময় জীবনের এক জীবন্ত বিগ্রহ মনুষ্যসত্তার মুকুরে দিব্যজীবনের একটী পরিপূর্ণ মূর্ত্তি যে আজ আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য।"

এই সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ কিছুকাল যাবত রোগে ভুগিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত সদাহাস্যময় মুখ দেখিয়া বোঝা যাইত না যে তিনি শারীরিক কষ্ট পাইতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তিনি ভক্তদের সহিত অতিবাহিত করিতেন। সর্ব্বশরীর হইতে যেন করুণা ও জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইত। প্রেমের ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন যে আর ধরাধামে থাকিবেন না। বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার সঙ্গে এই মরজগতে আমার শেষ দেখা। পূর্ব্বদিন আমি ও আমার স্বামী তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। হাসিমুখে "ভগবান" আমাদের বিদায় দিলেন। যদিও বুঝিয়াছিলাম যে বেশী দিন তিনি আর আমাদের মধ্যে থাকিবেন না, তবে এত শীঘ্র যে তাঁহাকে হারাইব ইহা কল্পনাও করি নাই।

রাষ্ট্রগঠনে শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শ ও ভারতীয় সংস্কৃতি

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী আমাদের জাতীয় ইতিহাসে পুণ্যতম দিবস, কারণ—

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।

অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ।"

মুখ্য শ্রাবণ ও গৌণ ভাদ্রপদে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে জননী দেবকীর কোল উজ্জ্বল করে শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাষ্টমীতে জননীর অষ্টম গর্ভে জয়ন্তী যোগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অষ্ট শক্তি সহ, মানবের অষ্টপাশ ছেদন যিনি করবেন, তাঁর অষ্টমী তিথিই অভিপ্রেত হওয়া স্বাভাবিক। কৃষ্ণাষ্টমী—যেহেতু কৃষ্ণ বর্ণের সহায়তায় তমোগুণবিশিষ্ট দৈত্যদলের পরাভব সম্ভব। পক্ষের মধ্যভাগে অষ্টমী তিথিতে তাঁর জন্ম—এতে তাঁর সমগ্র জীবনের মধ্যস্থতা দ্যোতিত হয়। যিনি জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির নিহন্তা, তাঁর জয়ন্তীযোগে জন্ম কার্যতঃ সার্থক। শ্রীমদ্ভাগবত যাঁর মুখামৃত, তিনি মুখ্য শ্রাবণে জন্মগ্রহণ করে জগতের অশেষ কল্যাণ বা ভদ্র সাধন করবেন, সন্দেহ কি?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়বাদ প্রচার করেছেন। তাঁর জীবনাদর্শেও এই সত্যই প্রতিবিম্বিত হয়েছে চূড়ান্ত-ভাবে। জগতের ইতিহাসে ঈদৃশ চরিত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল আসুরিক শক্তির পরাভব সাধন করে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এই কঠোর উদ্দেশ্যসাধন অশেষ শ্রমসাপেক্ষ। তজ্জন্যই তিনি যেন বাল্যকাল থেকে শারীরিক শক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করেছিলেন। অঘাসুর, কংসাসুর প্রভৃতির বধই তার প্রমাণ। গোপবালকদের মধ্যে কেহ শারীরিক শক্তিতে তাঁর সমকক্ষ ছিল না। স্বকীয় কর্মশক্তি অর্জন ভিন্ন ব্যাপার। এই উভয়বিধ শক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণ অতুলনীয় ছিলেন।

নিষ্কাম কর্মের উপদেশ তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দিয়ে গেছেন—তাঁর জীবনাদর্শেও তাই প্রতিফলিত হয়েছে। সমুদ্রপ্রমাণ মহাভারতের কোথাও এমন ইঙ্গিত নাই যেখানে তিনি কোনও কর্মফল কামনা করেছেন। সম্পূর্ণ নিষ্কাম, নির্লিপ্ত ভাবেই সুদর্শনচক্রধারী ভারতের ভাগ্যচক্র পরিচালনা করে গেছেন।

মহাভারতের সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব কর্মসাধনোচিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধি সুপ্রকট। জরাসন্ধের অগণিত সৈন্যসামন্তের কাছে তাঁর ক্ষুদ্র-সংখ্যক যোদ্ধৃবৃন্দের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; তাই তিনি মথুরা থেকে দ্বারকায় চলে যান এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজনীতির দিক থেকে দ্বারকায় রাজধানী স্থাপন তাঁর অশেষ বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। রৈবতক পর্বতমালা তাঁর রাজ্যের দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ ছিল এবং স্বকীয় রাজ্য তিনি এত সুরক্ষিত করেছিলেন যে এমন কি, কোনও নারীও যদি এ রাজ্য রক্ষণে তৎপর হতেন, তিনিও অক্লেশে এ রাজ্য রক্ষণে সমর্থা হতেন। জরাসন্ধ বধ ও তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে অন্যতর শ্রেষ্ঠ ঘটনা। কারণ রাজনৈতিক দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এটা সুস্পষ্ট ছিল যে যদি জরাসন্ধের কবল থেকে নিখিল ভারতের ৮৬ সংখ্যক রাজপুত্রকে তিনি মুক্ত করতে পারেন, তা' হ'লে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর মিত্রদলভুক্ত হবেন এবং ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। তাই তিনি জরাসন্ধ নিধনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। মহাযুদ্ধের অবসানে ভীষ্ম মুখে রাজ্যশাসন পদ্ধতির প্রণয়নোদ্যোগ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম নির্লিপ্ততার দ্যোতক এবং চরম বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক। দেশের শাসনভার প্রদান করলেন তিনি যুধিষ্ঠিরের হাতে; ধর্মরাজ্যের আইনপ্রণয়নের ভার দিলেন তিনি কুরুবৃদ্ধ পিতামহ সর্বজনবন্দ্য ভীষ্মের হাতে। ভীষ্মদেব বার বার বলেছেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকতে মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি এ গুরু কার্যভার গ্রহণ করতে স্বীকৃত নন। কিন্তু স্বীয় যৌগিক শক্তিবলে মুমূর্ষু শরশয্যাশায়ী পিতামহকে সঞ্জীবিত করে, স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্নিহিত করে—তিনি এমন দেশশাসন পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যার তুলনা ইহজগতে নাই, কোনও দিন হবেও না। এর বিস্তৃততর আলোচনা আমরা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানবৈভবপ্রসঙ্গে একটু পরেই করছি।

কর্ণের হস্তে বাসবদত্ত অস্ত্র ছিল বলে শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই অর্জুনকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সমরে অবতীর্ণ হতে দেননি; তিনি ঘটোৎকচকেই সাক্ষাৎ সমরে কর্ণের সম্মুখীন করিয়েছিলেন। ঘটোৎকচবধ শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট সুপরিজ্ঞাত ব্যাপারমাত্র ছিল, সন্দেহ নাই। অন্যদিকে ভগিনী সুভদ্রার একমাত্র পুত্র অভিমন্যু নিধন, অর্জুন ভদ্রার পক্ষে যতই শোকাবহ হোক্—ধর্মরাজ্য স্থাপনের পক্ষে এটা অত্যাবশ্যক বোধে তিনি অর্জুনের নিরন্তর অনুরোধ সত্ত্বেও অর্জুনকে যুদ্ধের সময় অভিমন্যুর সহায়তায় অগ্রসর হতে দেননি। অন্যদিকে উত্তরাতনয় বিনষ্ট হলে পাণ্ডব বংশ লোপ পেয়ে যাবে বলে ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের প্রবল প্রকোপ নিরস্ত করেও তিনি ভূমিষ্ঠ পরীক্ষিতের মৃত শরীরে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। মহাভারত পাঠ করলে এটাই নিরন্তর সুস্পষ্ট হয় যে অর্জুন, ভীম, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির বার বার বহুবার বিপথে চল্‌ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের উপদেশামৃত নিঃশেষে পান করে তাঁরা ধন্য হয়েছেন, বিভ্রান্ত হন নি।

দয়াপ্রদর্শন শ্রীকৃষ্ণের কর্মজীবনের মৌলিক নীতি ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি প্রয়োজনবোধে বজ্রবৎ কঠোর হতেন। স্বীয় মাতুল কংসকে তিনিই নিধন করেছিলেন; স্বীয় পিতৃস্বসৃসুত শিশুপালকেও

তিনি বধ করেছিলেন। অন্তিম জীবনে—যতই কঠোর হোক্ স্বীয় যদুবংশ রক্ষা করার চেষ্টা মাত্র তিনি করেন নি. শুধু তাই নয়—তিনি স্বহস্তেই অনেককে নিধন করেছিলেন। ধর্মভ্রষ্ট সুরাপায়ী দুরাচার বান্ধবকে রক্ষা করে ধর্মরাজ্য নষ্ট করার অভিপ্রায় ধর্মরাজ্যসংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই পোষণ করতে পারেন নি। ফলতঃ, তাঁর নিজ বংশই তাঁর অশেষ দুঃখের কারণ ছিল; তাই তিনি এক জায়গায় বলেছেন—

"দাস্যমৈশ্বর্যবাদেন জ্ঞাতীনাঞ্চ করোম্যহম্।
সোঽহং কিতবমাতেব দ্বয়োরপি মহামতে।
একস্য জয়মাশংসেঽন্যস্যাপ্যপরাজয়ম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে যদুবংশ সম্পর্কে তাঁর অবস্থা অনেকক্ষেত্রে জুয়াখেলোয়াড় পুত্রদ্বয়ের মাতার মত। দুই পুত্রই মাতাকে খেলার পূর্বে প্রণাম করে যখন আশীর্বাদ প্রার্থনা করে—মা একজনকে বলেন তোমার বিজয় হোক্, অন্যকেও বলতে বাধ্য হন—তোমার পরাজয় না হোক্—তাঁর অবস্থাও সেই রকম। তাই যিনি বাল্যবয়সে দয়াপরবশ হয়ে ননী মাখন চুরি করে' বানরদের খাওয়াতেন, গোবৎসের আনন্দবর্ধনের জন্য ইন্দ্রযজ্ঞে বাধা প্রদান করেছিলেন—তিনিই স্বীয়বংশের উচ্ছেদ সময়ে কোনও প্রকার কারুণ্য প্রকাশ করেননি—এই ছিল তাঁর অনুপম জীবনের ধর্ম।

ধর্ম ও কর্মবীর যাঁরা, তাঁদের জীবনে অহিংসা ও সত্যের সংঘর্ষ সময়ে সময়ে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপূর্ব সমাধান করেছেন অর্জুনকে উপদেশ দেওয়ার প্রসঙ্গে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি কৌশিক ঋষির উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। অর্জুনকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—

"প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্ মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন॥"

এমন কি, সত্যের বিনিময়েও যিনি "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" প্রচার করেন, তিনিই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যসামন্ত এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি নরশার্দূল দেবোপম চিরপূজ্য বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনপাতের কারণ হয়েছিলেন প্রয়োজনবোধে—ইহাই তাঁর জীবনে আমাদের দিক্ থেকে সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিও শক্তি বলে স্বয়ং অর্জুনও কতদূর পরিচালিত হতেন, তা' একটী ঘটনা থেকেই সহজে বোধগম্য হবে। যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার পরে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই যখন নরধাম পরিত্যাগ করলেন, অর্জুন কৃষ্ণমহিষীদের এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত যদুরমণীবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পথে দস্যুগণ লাঠি নিয়ে তাঁদের আক্রমণ করলে। শ্রীকৃষ্ণবিহীন অর্জুন গাণ্ডীব উত্তোলন করতে পর্যন্ত সমর্থ হলেন না। দস্যুরা শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রোহিণী, সত্যভামা, হৈমবতী, জাম্ববতী ব্যতীত অন্যান্য যদুবংশীয় রমণীদের হরণ করে নিয়ে গেল অর্জুনকে পরাভূত করে। অর্জুন আর এর পরে ধরাধামে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর মহাপ্রস্থানই শ্রেষ্ঠ কল্প মনে করে যুধিষ্ঠিরও ভারতভূপরিক্রমায় প্রবৃত্ত হলেন।

যিনি স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ অমৃতরাশির মূলপ্রস্রবণ—যা' যুগযুগান্তর ধরে কোটী কোটী অক্ষৌহিণী নরনারী সমগ্র বিশ্বে অকাতরে পান করে ধন্য হচ্ছে—তাঁর জ্ঞান বৈভবের সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভবপর নয়। শুধু শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা নয়, মহাভারতের অন্তর্গত যে কামগীতা, অনুগীতা প্রভৃতি আছে, সেগুলিও অসীম অতল জ্ঞানাম্বুধি; যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁর জ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টামাত্রও বাতুলতা।

তাই এক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্বুদ্ধিপ্রচোদিত জ্ঞানবৈভব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনাই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—ভীষ্মদেব প্রোক্ত রাজধর্মাদি তাঁরি ধর্মরাজ্য পরিচালনার নিমিত্ত তাঁর পূর্ব অভিপ্রেত এবং তাঁর প্রদত্ত শক্তিতে প্রোক্ত। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে অতুলনীয় জ্ঞানবৈভব এই রাজধর্ম ও আপদ্ধর্ম পর্বে বা অনুশাসন পর্বে প্রদর্শিত হয়েছে, পরবর্তী যুগে অধম ভারতবাসী, ভাড়াটিয়া ভারতবাসী তার পর্যালোচনা ও শ্রেয়ঃকল্প মনে করলো না। চাণক্যের পরে ভারতবর্ষ থেকে দণ্ডনীতি, রাজনীতি বহিষ্কৃত হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির কর্তৃক রাজ্যপরিচালনার্থ ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশানুসারে যে বিধান দিয়ে গেছেন, তাতে বর্তমান Red Crossর কার্যাবলী, Scorched Earth Policy (রাজধর্মপর্বের ৬৯ অধ্যায় ৩৭-৪১ শ্লোক), Dunkirkর safe retreat policy (উৎপাতাশ্চ নিপাতাশ্চ সুযুদ্ধং সুপলায়িতম্। শাস্ত্রাণাং পালনং জ্ঞানং তথৈব ভরতর্ষভ॥) প্রভৃতিও বাদ যায় নি। ধর্মরাজ্য কীদৃশ হবে, তৎপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ জগদ্বাসীকে জানিয়েছেন—

রাজা-প্রজার সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্ক। পুত্র যেমন পিতৃগৃহে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, ধর্মরাজ্যেও তেমনি প্রজাপুঞ্জ মনের সুখে বিচরণ করবে। ধনদৌলত লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা কারো থাকবে না; প্রজামাত্রেই ন্যায়-অন্যায় বিচারে সমর্থ হবে এবং তদ্দ্বারা রাষ্ট্রের প্রভূত উপকার সাধন করবে—

"পুত্রা ইব পিতুর্গেহে বিষয়ে যস্য মানবাঃ।
নির্ভয়া বিচরিষ্যন্তি স রাজা রাজসত্তম॥
অগূঢ়বিভবা যস্য পৌরা রাষ্ট্রনিবাসিনঃ।
নয়াপনয়বেত্তারঃ স রাজা রাজসত্তম॥"

রাজধর্ম, ৫৭ অধ্যায়, ৩৩-৩৪

রাষ্ট্রবাসী সকলেই ঘরের দরজা জানালা সব খুলে দিয়ে শুয়ে থাকবেন; কোনও দিক থেকে কিছুই ভয়ের কারণ থাকবে না—

"বিবৃত্য হি যথাকামং গৃহদ্বারাণি শেরতে।
মনুষ্যা রক্ষিতা রাজ্ঞা সমন্তাদকুতোভয়াঃ॥"

ঐ, ৬৮ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক

অন্য কথা কি—নারীরাও পুরুষবিহীন অবস্থায় সর্ববিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা হয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করে বেড়াবেন—তবে তো ধর্মরাজ্য—

"স্ত্রিয়শ্চাপুরুষা মার্গং সর্বালঙ্কারভূষিতাঃ।
নির্ভয়াঃ প্রতিপদ্যন্তে যদি রক্ষতি ভূমিপাঃ॥"

ঐ, ঐ, ৩২

ধর্মরাজ্যে চোর বলে কোনও পদার্থ থাক্‌বে না; চুরি হলে রাজাকে যে কোনও রকমে চুরির ধন মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে; যদি রাজপুরুষেরা খুঁজে বের করতে অসমর্থ হন—তা' হ'লে রাজাকে রাজকোষ থেকে তা' দিতে হ'বে—

প্রত্যাহর্তুমশক্যং স্যাদ্ধনং চোরৈর্হৃতং যদি।
তৎ স্বকোশাৎ প্রদেয়ং স্যাদশক্তেনোপজীবতঃ॥

রাজধর্ম, ৭৫ অধ্যায়, ১০ শ্লোক

Orphanage, Old Age Pension, Widow Pension ব্যতীতও দুঃখীর দুঃখমোচনার্থ সর্ববিধ উপায় ধর্মরাজ্যে উদ্ভাবনীয়—

"কৃপণানাথবৃদ্ধানাং বিধবানাঞ্চ যোষিতাম্।
যোগক্ষেমং বৃত্তিঞ্চ নিত্যমেব প্রকল্পয়েৎ॥"

শান্তিপর্ব, ৮৬ অধ্যায়, শ্লোক ২৪

রাজ্যে কৃষক মণ্ডলীর শস্যবীজ যাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য কড়া নজর দেয়ার দরকার এবং প্রত্যেক কৃষককে শতকরা এক টাকা হার সুদে ঋণ করতে হবে—

"কচ্চিন্ন ভক্তং বীজঞ্চ কর্ষকস্যাবসীদতি।
প্রত্যেকঞ্চ শতং বৃদ্ধ্যা দদাস্যৃণমনুগ্রহম্॥

এই ঋণের নামই অনুগ্রহ-ঋণ—বর্তমান জগতের কোনও Co-operative credit systemএর সঙ্গে তুলনীয় নয়। রাষ্ট্র কৃষির জন্য দেবতার প্রদানের উপরে নির্ভর করবে না—জল জমিয়ে রাখ্‌তে হ'বে বড় বড় দীঘিতে—

কচ্চিদ্রাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণানি চ বৃহন্তি চ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষির্দেবমাতৃকা॥

ধর্মরাজ্যে প্রজাপুঞ্জ রাজস্বে প্রপীড়িত হবে না; ভ্রমরেরা যে ভাবে গাছ থেকে মধু দোহন করে, তেমনি আদরে মধুদোহনের মতই রাষ্ট্র থেকে কর উত্তোলিত হবে—(মধুদোহং দুহেদ্রাষ্ট্রং ভ্রমরা ইব পাদপম্—রাজধর্ম, ৮৮, ৪ শ্লোক)।

ধর্মরাজ্যে শূদ্রাশূদ্রনির্বিচারে যেই জনসাধারণের উপকার সাধন করতে পারবে, অকূলে কূল দিতে পারবে সেই বরণীয়, মহনীয় হবে—

"অপারে যো ভবেৎ পারমপ্লবে যঃ প্লবো ভবেৎ।
শূদ্রোঽপি বা যদি বান্যঃ স সম্মানমর্হতি॥"

ধর্মরাজ্যের স্থাপয়িতার লক্ষীভূত মূলনীতি থেকে রাষ্ট্র যখন দূরে সরে গেল, তখন থেকে ধীরে ধীরে দেশ অধঃপাতের শেষ সীমায় উপনীত হলো; তাই আজ প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে অখণ্ড ধর্মরাজ্য চরম দুঃখভোগ করতে বাধ্য হল। অপরমের ভাগবত কৃপায় আবার ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হয়েছে; তাঁর আশীর্বাদে ধর্মরাজ্য পরিচালনাও অতি সুষ্ঠুভাবে নির্বাহিত হউক; ভাগবত করুণা ধারাসারে জগদ্বাসীর শিরোদেশে বর্ষিত হোক্; ভারতজননীর স্মিতহাস্যে সমগ্র জগৎ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠুক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জন্মতিথিতে উপাসকমণ্ডলীকে এই আশীর্বাদ প্রদান করুন।

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিবৈভব

শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শে গীতাপ্রোক্ত ভক্তিবৈভব সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বিত। স্বল্পাবসরে তার পর্যালোচনা সম্ভবপর নয়। বেদ-বেদান্তে পরিদৃষ্ট আত্মারাম, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ ভগবান্ স্বরাট্। তিনিই সমগ্র ভক্তের অধীশ্বর; তিনি কাকেই বা ভক্তি প্রত্যর্পণ করবেন?

উপসংহার

আজকের এই পবিত্রতম শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিতে মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণোদ্দিষ্ট আর একটী বিষয়ের পর্যালোচনা অবশ্য কর্তব্য মনে করি। সমগ্র ভারতে ভাষার ঐক্য স্থাপন নিখিল ভারতের ঐক্য সূত্র সম্রক্ষণের দিক্ থেকে একান্ত কাম্য, সন্দেহ নাই। দেড় সহস্র বৎসর পরে পরিলব্ধ নিখিল ভারতের ঐক্যসূত্র অচিরে ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য—যদি ভাষার ঐক্য এবং তার মাধ্যমিকতার ভাব ও সাধনার ঐক্য সংঘটিত না হয়। ধর্মরাজ্য সংস্থাপক ও পরিচালক শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এ বিষয়ে কি ইঙ্গিত দেন, কি উপদেশ দেন?

এ বিষয়ে একটী প্রশ্নের সমাধান সর্বাগ্রে কর্তব্য। মদ্রদেশের মাদ্রী, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা কুন্তী, বর্তমান কান্দাহারের গান্ধারী—এইরূপে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজকন্যারা হস্তিনাপুরের রাজপরিবারে কোন্ ভাষায় নিজেদের দৈনন্দিন ভাবধারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে প্রকাশ করতেন? দৈনন্দিন জীবনযাপনাবসরে কৃত্রিমতা তো সম্ভবপর নয়। তাঁরা কি উপায়ে মনের আনন্দ, মনের দুঃখ একে অন্যের কাছে প্রকাশ করতেন? কোন্ ভাষার মাধ্যমিকতায়? মহম্মদের জন্মের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যখন ফারসী প্রভৃতি ভাষার প্রবর্তন আমাদের দেশে হয়নি, যখন চীন-হূণ-পারসীকেরা, যখন শ্যাম, সুমাত্রা যবদ্বীপ প্রভৃতির দূর-দূরান্তর স্থিত অঞ্চলনিবাসীরা রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞোপলক্ষে হস্তিনাপুরে সমবেত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা কোন্ ভাষায় নিজেদের ভাবধারা প্রকাশ করেছিলেন? দ্রৌপদী ছিলেন রন্ধনও পরিবেশন বিভাগের Head of the Department—তিনিই বা কোন্ ভাষায় নিখিল ভারতের সকলের মনোরঞ্জন করতেন? শ্রীকৃষ্ণের ভাষা, দৈবী ভাষাই যে এ ভাষা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পরবর্তী যুগে নারীদের শ্রীমুখে প্রাকৃত ভাষণ শুনে যাঁরা দিগ্‌ভ্রান্ত হন, তাঁদের বেদাদি এবং পরবর্তী যুগে ভবভূতির উত্তর রামচরিতের দিকে তাকাতে বলি—যিনি—যে ভবভূতি অকাট্য সত্যপ্রিয় ছিলেন এবং সমগ্র জগতে বেদব্যাসের একমাত্র সমকক্ষ যিনি, এই সুকঠোর প্রশ্নের উত্তর প্রদান বিষয়ে সেই মহর্ষি বাল্মীকির সাক্ষ্যও আমরা নিশ্চয় গ্রহণ করবো। সর্বসম্মতিক্রমে বেদব্যাস ও বাল্মীকি প্রায় সমসাময়িক; তাই বাল্মীকির সাক্ষ্যও এই প্রশ্ন সমাধানে অত্যাবশ্যক। দেখুন, হনুমান যখন অশোককাননে রামচন্দ্রের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে সীতার নিকটে উপস্থিত

হন, তখন তিনি (হনুমান) কি ভাষায় সীতার সঙ্গে কথা বল্‌বেন, এই কথা ভাবছেন। তিনি গভীর চিন্তাবিষ্ট হয়ে পড়লেন এই জন্য, যদি তিনি সংস্কৃতে কথা বলেন, তা' হলে সীতা হঠাৎ সংস্কৃত ভাষায় উক্তি শুনে তাঁকে রাবণ বলে ভুল করে ভয়প্রাপ্তা হবেন—

"যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা সা সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥"

তা' হলে এটা নিশ্চিত হলো যে রাবণ, ভারতবর্ষের অন্যতম প্রান্তে অবস্থিত দ্বীপের অধীশ্বর রাবণ যে সংস্কৃতে সীতার সঙ্গে কথা বল্‌তেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হনুমান যে অনর্গল সংস্কৃতে কথা বলতেন বহুকালব্যাপী এবং কোনও অপভাষণ করতেন না, স্বয়ং রামচন্দ্র তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন ("ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্")। তা হলে উত্তর ভারতের রাজপুত্র রামচন্দ্র—লক্ষ্মণ যখন কিষ্কিন্ধ্যায় গেলেন, সেখানেও সংস্কৃতে কথাবার্তা হচ্ছে; যখন রাজপুত্রী সীতা অশোককাননে লঙ্কাদ্বীপে গেলেন, সেখানেও কথা হচ্ছে সংস্কৃতে। সেই হিসাবে সেই একই যুগে যখন নিখিল ভারতের রাজপুত্রেরা, রাজকন্যারা একত্রে হস্তিনাপুরে একত্র হয়েছিলেন, বা হস্তিনাপুরে নিখিল ভারতের রাজপুত্রীরা একত্রে দৈনন্দিন জীবনযাপন করছিলেন, তাঁরা যে সংস্কৃতেই কথনোপকথন করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

কেও কেও বলবেন—সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যা' সম্ভবপর ছিল, আজ তা' কি করে সম্ভবপর? ধর্মরাজ্য ধর্মরাজ্য; "জগদীদৃক্ ন তু অনীদৃক্"—স্বয়ং কুমারিল ভট্ট বলেছেন। ভাষার ঐক্য ভারতবর্ষে একমাত্র সংস্কৃতের মাধ্যমিকতাতেই সম্ভবপর। এখনও পর্যন্ত লিপি-কাঠিন্য বিবর্জিত হলে নিখিল ভারতের সব ভাষা আমরা যে বুঝতে পারি, তা' কেবল সংস্কৃতের দৌলতে। এ দিবালোকের মত সুপ্রকট সত্য যারা বুঝতে চায় না, তারা নিতান্ত স্বার্থপর, হীন ও নীচ। সংস্কৃত-বাংলা, সংস্কৃত-হিন্দী, সংস্কৃত-মারাঠী, সংস্কৃত-গুজরাতী, সংস্কৃত-তেলেগু, সংস্কৃত-কন্নড়ী, সংস্কৃত-আসামী, সংস্কৃত-উড়িয়া, সংস্কৃত-নেপালী প্রভৃতির বস্তুগত্যা পরিণতি যে একমাত্র সংস্কৃত—সাগরে সম্মেলন—এই প্রকৃষ্ট সত্য যে দেশবাসীর বোধগম্য হচ্ছে না, তার একমাত্র কারণ—শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য এখনও দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি; দীর্ঘকালের জড়তা এখনও দেশকে আচ্ছন্ন করে আছে।

আমাদের বর্তমান ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে একটা ধারণা আছে লোকায়ত্ত শাসন এবং তৎসংক্রান্ত আইনকানুন ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যের দানমাত্র। যে দেশের আদর্শ হচ্ছে—প্রত্যেক বাড়ীতে রান্নার ধোঁয়া না উঠলে শাসনকর্তা নিজে অন্নগ্রহণ করবেন না; যে রাজ্যের আদর্শ হচ্ছে মধ্যরাত্রেও সর্বালঙ্কারভূষিতা সুন্দরী নারী বিনা পুরুষে নগরপথে নির্ভয়ে বিচরণ করে বেড়াতে পারবেন—ফলতঃ, সে রাজ্যের শাসক সর্বতোভাবে প্রজাপুঞ্জের দাস ও সেবক—সে দেশেই যে Kingdom of Heaven on Earth চিরবিরাজমান, বর্তমান ভারতবাসী সে সহজ সত্য ভুলে গেলে চল্‌বে কেন? মহাভারতের শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব প্রভৃতির ২১১ পৃষ্ঠাও যাঁরা পড়ে দেখ্‌বেন, তাঁরাই দেখ্‌তে পাবেন—মহাভারত-অনুশাসিত রাজ্যপালনই প্রকৃত ধর্মমোদিত শাসন—যার তুলনা জগতে নাই, কোনও দিন হয় নি, বর্তমান হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী কল্পনাও যেন ঠিকমত করতে পারে না। পরের কাছে প্রার্থী হওয়ার পূর্বে আমরা যেন আমাদের প্রাচীন অমূল্য নিধিগুলির প্রতি দৃক্‌পাত করি, স্বাধীন ভারতে ইহাই আমাদের অবশ্য কাম্য।

সুন্দরের ধ্যান নেত্র

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

অন্ধকারে বন্দী প্রাণ রুদ্ধ কারাগারে
প্রভাত সূর্য্যের আলো এল বহির্দ্বারে,—
মৃত্তিকার সুখস্পর্শে প্রথম ক্রন্দন,
তৃষার্ত আবেগ বেগে স্ফুরিল জীবন।
চতুর্দিক হ'তে আসে প্রাণবায়ু ল'য়ে
ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির তপোশক্তি ব'য়ে।
মহাশূন্যে অসীমের পথ চিনে চিনে
নক্ষত্রের জ্যোতির্লোকে দারুণ দুর্দিনে,

মাটীর তিমির গর্ভে অন্ধকার গিরির গুহায়,
চলেছে মানব আত্মা মুক্তির স্পৃহায়।
যুগ হতে যুগান্তরে প্রজ্ঞার আলোক,
ফেলেছে সন্ধানী দৃষ্টি যেথা অন্তর্লোক।
যুগে যুগে দেবলোকে অন্তর্লোকে মিলে
তুলেছে তুমুল দ্বন্দ্ব এ মহা নিখিলে।
দেবতা গড়েছে মানুষ, মানুষ দেবতা—
সুন্দরের চক্ষে নামে ধ্যান-বিহ্বলতা।

অসীমের পথে চলে সীমার সন্ধানে
কোথায় সে জ্যোতির্ময় দেবতা না জানে।

কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পান্থশালা

চিত্রক ও রাজকুমারী রট্টা যখন পান্থশালায় উপনীত হইলেন তখন সূর্যাস্ত হইতে আর দণ্ড দুই বাকি আছে।

দুইটি পথের সন্ধিস্থলে পান্থশালাটি অবস্থিত। যে পথ চষ্টন দুর্গের সহিত কপোতকূটের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে, এই স্থানে সেই পথ হইতে একটি শাখা বাহির হইয়া অগ্নি-কোণে আর্যাবর্তের দিকে চলিয়া গিয়াছে, দ্বিধা-ভিন্ন পথের মধ্যস্থলে প্রস্তর প্রাকারবেষ্টিত এই পান্থশালা।

স্থানটি মনোরম। উত্তর ও পূর্বদিকে ঘন পর্বতের শ্রেণী; পশ্চিমদিকে বহুদূর পর্যন্ত উন্মুক্ত উপত্যকা। এই উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি উপল-কুটিলা ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে; মনে হয় পূর্বদিকের পর্বতকন্দর হইতে নির্গত এক রজতবর্ণ নাগ শ্লথগতিতে অস্তাচলের পানে কোন নূতন বিবরের সন্ধানে চলিয়াছে।

পান্থশালাটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও দুর্গের আকারে নির্মিত, উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। জনালয় হইতে দূরে অরক্ষিত পথপার্শ্বে পান্থশালা নির্মাণ করিতে হইলে বেশ দৃঢ় করিয়া নির্মাণ করিতে হয়। একে তো এ অঞ্চলে খণ্ড যুদ্ধাদি লাগিয়াই আছে, তদুপরি উত্তর-পশ্চিমের গিরিসঙ্কট মধ্যে যে সকল বন্য জাতি বাস করে তাহারা বড়ই দুর্দম প্রকৃতি। তাহারা মেষ পালনের অবকাশ-কালে দল বাঁধিয়া দস্যুতা করে। পথে অরক্ষিত যাত্রিদল পাইলে লুটপাট করে; সুযোগ পাইলে পান্থশালাকেও অব্যাহতি দেয় না। তাই দিবাভাগে পান্থশালার লৌহ-কণ্টকযুক্ত দ্বার খোলা থাকিলেও সূর্যাস্তের সঙ্গে উহা বন্ধ হইয়া যায়। তখন আর কাহারও প্রবেশাধিকার থাকে না; চিরাগত যাত্রীরা দ্বারের বাহিরে রাত্রি যাপন করে।

চিত্রক ও রট্টা পান্থশালার তোরণমুখে উপস্থিত হইলে পান্থপাল ছুটিয়া আসিয়া যোড়হস্তে অভ্যর্থনা করিল—'আসুন, কুমার ভট্টারিকা, আপনার পদার্পণে আমার স্থান পবিত্র হইল। —দূত মহাশয়, আপনিও স্বাগত। আমি ভাগ্যবান, তাই আজ—' বলা বাহুল্য, পান্থপাল পূর্বেই নকুল প্রমুখাৎ সংবাদ পাইয়াছিল যে ইঁহারা আসিতেছেন।

চিত্রক ও রট্টা অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। পান্থ-পাল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—'ওরে কে আছিস—কঙ্ক, ভুণ্ডুভ—শীঘ্র কাম্বোজ* দুটিকে মন্দুরায় লইয়া যা, যব—শক্তু, শালি-প্রিয়ঙ্গু দিয়া সেবা কর।'—

দুইজন কিঙ্কর আসিয়া অশ্ব দুটির বল্গা ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। রট্টা জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার রক্ষীরা কি চলিয়া গিয়াছে?'

পান্থপাল বলিল—'আজ্ঞা হাঁ। নকুল মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কুমার ভট্টারিকার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তাঁহারা দ্বিপ্রহরেই চলিয়া গিয়াছেন।

পান্থপাল মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি; স্থূলকায় কিন্তু নিরেট। বচনবিন্যাসে বেশ পটু। চিত্রক তাহাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'এখানে দেবদুহিতা রাত্রিযাপন করিলে ভয়ের কোনও কারণ নাই?'

'ভয়! আমার পান্থশালার দ্বার বন্ধ হইলে মূষিকেরও সাধ্য নাই ভিতরে প্রবেশ করে।' পান্থপাল কণ্ঠস্বর হ্রস্ব করিয়া বলিল -তবে ভিতরে কয়েকটি পান্থ আছে। তাহারা বিদেশী বণিক, পারস্যদেশ হইতে আসিতেছে; মগধে যাইবে—'

'তাহারা কি বিশ্বাসযোগ্য নয়?'

'বিশ্বাসের অযোগ্য বলিতে পারি না। ইহারা বহু বৎসর ধরিয়া এই পথে গতায়াত করিতেছে। মেষরোমের আস্তরণ গাত্রাবরণ প্রভৃতি লইয়া আর্যাবর্তের বিভিন্ন প্রান্তে

* কাম্বোজীয় অশ্ব, শ্রেষ্ঠ অশ্ব

বাণিজ্য করিয়া বেড়ায়। তবে উহারা অগ্নি-উপাসক, ম্লেচ্ছ। সাবধানের নাশ নাই।'

'কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য ?'

পান্থপাল বলিল—'ইনি দেবদুহিতা একথা প্রকাশ না করিলেই চলিবে। ইনি আসিতেছেন তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ জানেনা।

চিত্রক দেখিল পান্থপাল লোকটি চতুর ও প্রত্যুৎপন্নমতি ; সে বলিল—'ভাল।—পান্থপাল, তোমার নাম কি ?'

পান্থপাল সবিনয়ে বলিল—'দেবদ্বিজের কৃপায় এ দাসের নাম জয়কম্বু। কিন্তু আর্যভাষা সকলের মুখে উচ্চারণ হয় না, কেহ কেহ জম্বুক বলিয়া ডাকে।'

চিত্রক হাসিয়া বলিল—'ভাল। জম্বুক, আমাদের ভিতরে লইয়া চল। আমরা শ্রান্ত হইয়াছি।'

জম্বুক বলিল—'আসুন মহাভাগ, আসুন দেবি—। আপনাদের জন্য শ্রেষ্ঠ দুটি কক্ষ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। এদিকে স্নিগ্ধ অন্নসীধু প্রস্তুত আছে, অনুমতি হইলেই—'

চিত্রক ও রট্টা প্রাকারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সূর্য তখনও অস্তাচল স্পর্শ করে নাই, কিন্তু জম্বুকের আদেশে দুইজন দ্বারী দ্বার বন্ধ করিয়া ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিল। কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না।

রট্টা পূর্বে কখনও পান্থশালা দেখেন নাই, তিনি পরম কৌতূহলের সহিত চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন। প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত স্থানটি চতুষ্কোণ ; তিনটি প্রাচীরের গাত্রে সারি সারি প্রকোষ্ঠ ; প্রকোষ্ঠগুলির সম্মুখে একটানা অপ্রশস্ত অলিন্দ। মধ্যস্থলে শিলাপট্টাবৃত সুপরিসর উন্মুক্ত অঙ্গন। অঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে চক্রাকৃতি বৃহৎ জলকুণ্ড।

অঙ্গনের এক কোণে কয়েকটি উষ্ট্র ও গর্দভ রহিয়াছে ; তাহারা পারসিক বণিকদের পণ্যবাহক। পারসিকেরা বর্ণকটেই আস্তরণ বিছাইয়া বসিয়া আছে এবং নিজেদের মধ্যে রহস্যালাপ করিতেছে। তাহাদের মুখমণ্ডল শ্মশ্রুমণ্ডিত ; বর্ণ পক্ক-দাড়িম্বের ন্যায় ; চক্ষু ও কেশ ঘনকৃষ্ণ।

রট্টা যখন চিত্রক ও জম্বুকের সহিত তাহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন তখন তাহারা একবার চক্ষু তুলিয়া দেখিল, তারপর আবার পরস্পর বাক্যালাপ করিতে লাগিল। ইহারা নিতান্তই নিরীহ বণিক, ছদ্মবেশী দস্যু তস্কর নয় ; কিন্তু চিত্রকের মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। নারী লইয়া পথ চলা যে কিরূপ উদ্বেগজনক কাজ এ অভিজ্ঞতা পূর্বে তাহার ছিল না।

চিত্রক নিম্নস্বরে জম্বুককে প্রশ্ন করিল—'ইহারা কয়জন ?'

জম্বুক বলিল,—'পাঁচজন।'

'সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে ?'

'আছে। অস্ত্র না লইয়া এদেশে কেহ পথ চলে না।'

'তোমার ভৃত্য অনুচর কয়জন ?'

'আমরা পুরুষ আট জন আছি।'

'স্ত্রীলোকও আছে নাকি ?'

জম্বুক প্রাঙ্গণের বিপরীত প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'আমাদের চারিজন অন্তঃপুরিকা আছে।'

চিত্রক অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

অঙ্গনের অন্য প্রান্তে চারিজন নারী বসিয়া গৃহকর্ম করিতেছিল। রট্টা সেখানে গিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। চত্বরের কিয়দংশ পরিষ্কৃত করিয়া নারীগণ নৈশ ভোজনের আয়োজন করিতেছে। একজন ঘর্ঘরা ঘুরাইয়া গোধূম চূর্ণ করিতেছে ; নবচূর্ণিত গোধূম হইতে রোটিকা প্রস্তুত হইবে। দ্বিতীয়া শাক বাছিতেছে ; তৃতীয়া প্রস্তর উদূখলে সুগন্ধি বেশার * কুট্টন করিতেছে ; চতুর্থী মেষমাংস ছুরিকা দিয়া কাটিয়া কাটিয়া পৃথক করিয়া রাখিতেছে। তাহারা মাঝে মাঝে সম্ভ্রম কৌতূহলপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া এই পুরুষবেশিনী সুন্দরীকে দেখিল, কিন্তু তাহাদের ক্ষিপ্র নিপুণ হস্তের কার্য শিথিল হইল না।

রট্টা কিছুক্ষণ ইহাদের মসৃণ কর্মদক্ষতা নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া জম্বুকের দিকে ফিরিলেন—'জম্বুক, তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে।'

জম্বুক তৎক্ষণাৎ যুক্তপাণি হইল—'আজ্ঞা করুন।'

'কপোতকূটের পথে পর্বতের উপর একটি বৌদ্ধবিহার আছে জান কি ?'

'আজ্ঞা জানি। চিল্লকূট বিহার।'

'সেখানে ভিক্ষুদের জন্য দুই আঢ়ক উত্তম গোধূম পাঠাইতে হইবে।'

---

* মশলা

'আজ্ঞা পাঠাইব। কল্য প্রাতেই গর্দভপৃষ্ঠে গোধূম পাঠাইয়া দিব। ভিক্ষুরা সূর্যাস্তের পূর্বেই পাইবেন।'

'ভাল। আমি মূল্য দিব।'

* * *

চিত্রক ও রট্টার জন্য যে দুইটি কক্ষ নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা আকার ও আয়তনে অন্যান্য কক্ষের মতই, কিন্তু কক্ষের কুট্টিমে উষ্ট্ররোমের আস্তরণ বিস্তৃত হইয়াছিল, তদুপরি কোমল শয্যা। কোণে পিত্তলের দীপদণ্ডে বর্তি জ্বলিতেছে। রাজকুমারীর পক্ষে ইহা তুচ্ছ আয়োজন; কিন্তু দেখিয়া রট্টা প্রীত হইলেন।

অম্লসীধু সহযোগে কিছু ক্ষীরের মণ্ড ভক্ষণ করিয়া উভয়ে আপাতত ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিলেন। রাত্রির আহার বাকি রহিল।

আহারান্তে চিত্রক গাত্রোত্থান করিয়া রট্টাকে বলিল, —'আপনি এখন কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন।' বলিয়া রট্টার কক্ষের দ্বার ভেজাইয়া দিয়া বাহিরে আসিল।

আকাশে তখন নক্ষত্র ফুটিয়াছে; রাত্রি অন্ধকার, এখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই। পান্থশালার প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে। ওদিকে পারসিকেরা অঙ্গার কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া শূল্য মাংস করিতেছে; দগ্ধ মাংসের বেশার-মিশ্র সুগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে লুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।

চিত্রক বলিল—'হিঙ্গু-পলাণ্ডু-ভোজী ম্লেচ্ছগুলা রাঁধে ভাল। জম্বুক, রাত্রে আমাদের ভোজনের কি ব্যবস্থা?'

জম্বুক ভোজ্য বস্তুর দীর্ঘ তালিকা দিল। প্রথমেই মিষ্টান্ন: মধু পিষ্টক লড্ডুক ও ক্ষীর; তারপর শাক ঘৃত-তণ্ডুল মুদ্গ-সূপ, ময়ূর-ডিম্ব; সর্বশেষে রোটিকা পুরোডাশ ও তিন প্রকার অবদংশ সহ উখ্য মাংস শূল্য মাংস ও দধি।

চিত্রক সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—'উত্তম। দেবদুহিতার কষ্ট না হয়।—আর শুন, শূল্যমাংস আমি রন্ধন করিব।'

জম্বুক চক্ষু বিস্ফারিত করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল—'যেরূপ আপনার অভিরুচি।'

চিত্রক কক্ষের সম্মুখে অঙ্গনের উপর একটা স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল—'এইখানে অঙ্গার চুল্লী রচনা কর।'

জম্বুকের আদেশে ভৃত্য আসিয়া অঙ্গারচুল্লী রচনায় প্রবৃত্ত হইল। এই অবকাশে ইতস্তত পাদচারণ করিতে করিতে চিত্রক লক্ষ্য করিল, কক্ষশ্রেণী যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে একটি বংশনির্মিত নিঃশ্রেণি বক্রভাবে ছাদসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার মন আবার সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। ছাদে উঠিবার সিঁড়ি কেন? উপরে যদি কেহ লুকাইয়া থাকে? চিত্রক জম্বুককে সিঁড়ি দেখাইয়া বলিল—'ছাদে কী আছে?'

জম্বুক বলিল—'শুষ্ক জ্বালানি কাষ্ঠ আছে। আর কিছু নাই।'

চিত্রকের সন্দেহ ঘুচিল না; সে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য নিঃশ্রেণি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া গেল। জম্বুককে বলিল—'তুমিও এস।'

ছাদের উপর সত্যই জ্বালানি কাষ্ঠ ভিন্ন আর কিছু নাই। চিত্রক নক্ষত্রালোকে ত্রিভুজা ছাদের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ছাদের উপর মন্দ মন্দ শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল; চারিদিক শব্দহীন, অন্ধকার; কেবল গিরিনদীর বুকে নক্ষত্র খচিত আকাশের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

চিত্রক নামিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বাহিরের অন্ধকার হইতে এক উৎকট অট্ট-কোলাহল উত্থিত হইয়া চিত্রককে চমকিত করিয়া দিল; একদল শৃগাল নিকটেই কোথাও বসিয়া যাম ঘোষণা করিতেছে।

তাহাদের সম্মিলিত ক্রোশন ক্রমে শান্ত হইলে চিত্রক হাসিয়া উঠিল, বলিল—'এখানে জম্বুকের অভাব নাই দেখিতেছি।

জম্বুক হাসিল, বলিল—পৃথিবীতে জম্বুকের অভাব কোথায়? তবে জয়কম্বু বড় অধিক নাই মহাশয়।

চিত্রক বলিল—'সেকথা সত্য। তুমি উত্তম পান্থপাল।'

এই সময় পশ্চিম দিগন্তের পানে দৃষ্টি পড়িতে চিত্রক দেখিল, বহুদূরে চক্রবাল রেখার নিকট যেন পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে; আগুন দেখা যাইতেছে না, কেবল তাহার উৎসারিত প্রভা দিগন্তকে রঞ্জিত করিয়াছে।

অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চিত্রক জিজ্ঞাসা করিল—'উহা কি? পাহাড়ের জঙ্গলে কি আগুন লাগিয়াছে?'

জম্বুক বলিল—'বোধহয় না। কয়েকদিন ধরিয়া দেখিতেছি, একই স্থানে আছে। পাহাড়ের আগুন হইলে দক্ষিণে বামে ব্যাপ্ত হইত।'

'তবে কী? ওদিকে কি কোনও নগর আছে? কিন্তু নগর থাকিলেও রাত্রে এত আলো জ্বলিবে কেন? ইহা তো দীপোৎসবের সময় নয়।'

'ওদিকে নগর নাই। তবে—'

'তবে?'

জম্বুক বলিল—'পান্থশালায় অনেক লোক আসে যায়, অনেক কথা শুনিতে পাই। শুনিয়াছি, হূণ আবার আসিতেছে। যদি কথা সত্য হয়, আবার দেশ লণ্ডভণ্ড হইবে।' বলিয়া জম্বুক নিশ্বাস ফেলিল।

চিত্রক বলিল—'তোমার কি মনে হয় হূণেরা ঐখানে ছত্রাবাস ফেলিয়াছে?'

জম্বুক বলিল—'না, তাহা মনে হয় না। হূণেরা এত কাছে আসিলে লুটপাট করিত, অত্যাচার করিত। কিন্তু এদিকে হূণ দেখি নাই।'

'তবে কী হইতে পারে?'

'জনশ্রুতি শুনিয়াছি, সম্রাট স্কন্দগুপ্ত সসৈন্যে হূণের গতিরোধ করিতে আসিয়াছেন।'

চিত্রক বিস্মিত হইয়া বলিল—'স্কন্দগুপ্ত স্বয়ং।'

জম্বুক বলিল—'এইরূপ শুনিয়াছি। সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না। কেন, আপনি কিছু জানেন না?'

চিত্রক চকিতে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—'না, আমি কিছু জানি না। যুদ্ধ সম্ভাবনার পূর্বেই আমি পাটলিপুত্র ছাড়িয়াছি।'

চিত্রক ও জম্বুক নীচে নামিয়া আসিল।

ভৃত্য ইতিমধ্যে অঙ্গার প্রস্তুত করিয়া শূল্য মাংসের উপকরণাদি আনিয়া রাখিয়াছে। চিত্রক তাহা দেখিয়া প্রথমে গিয়া রট্টার রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। কাণ পাতিয়া শুনিল কিছু কিন্তু শুনিতে পাইল না। তখন সে দ্বার ঈষৎ ঠেলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। দীপের স্নিগ্ধ আলোকে রট্টা শয্যায় শুইয়া আছেন, একটি বাহু চক্ষুর উপর ন্যস্ত। বোধহয় নিদ্রাবেশ হইয়াছে। এই নিভৃত দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকের মন এক অপূর্ব সম্মোহে পূর্ণ হইয়া উঠিল; মৃগমদ-সৌরভের ন্যায় মাদক-মধুর রসোচ্ছ্বাসে হৃদকুম্ভ কণ্ঠ পর্যন্ত ভরিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মনে মনে বলিল—ঘুমাও, রাজকুমারী, ঘুমাও।

* * *

চাঁদ উঠিয়াছে। কৃষ্ণা চতুর্থীর চন্দ্র পূর্বাচলের মাথায় উঠিয়া ক্লান্ত হাসি হাসিতেছে। পান্থশালার অঙ্গন শূন্য, পারসিকেরা নিজ প্রকোষ্ঠে দ্বার বন্ধ করিয়াছে। অঙ্গন স্তিমিত জ্যোৎস্নায় পাণ্ডুর।

চিত্রক রট্টার দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—দেবি উঠুন উঠুন, আহার প্রস্তুত।'

দ্বার খুলিয়া রট্টা হাসিমুখে সম্মুখে দাঁড়াইলেন, ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—'ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।'—

সম্মুখেই অলিন্দে আহারের আসন হইয়াছিল, দুইটি আসন মুখোমুখি; মধ্যে বহু কটোর এবং স্থালীতে খাদ্য সম্ভার। পাশে দুইটি দীপ জ্বলিতেছে। উভয়ে আহারে বসিলেন; জম্বুক দাঁড়াইয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটি কথা হইতেছে। জম্বুক মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনের জন্য কৌতুকজনক উপাখ্যান বলিতেছে। রাজকন্যা হাসিতেছেন; তাঁহার মুখে তৃপ্তি, চোখে নিরুদ্বেগ প্রশান্তি। চিত্রক নিজ হৃদয় মধ্যে একটি আন্দোলন অনুভব করিতেছে, যেন সাগর-তরঙ্গে তাহার হৃদয় দুলিতেছে ফুলিতেছে, উঠিতেছে নামিতেছে—

রট্টা বলিলেন—'কাল পিতার দর্শন পাইব ভাবিয়া বড় আনন্দ হইতেছে।'

চিত্রকের মনের উপর ছায়া পড়িল। রট্টার পিতা··· তাহার সহিত চিত্রকের একটা বোঝাপড়া আছে···কিন্তু সে চিন্তা এখন নয়···

চিত্রক বলিল—'একটা জনরব শুনিলাম।—পরম-ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত নাকি চতুরঙ্গ সেনা লইয়া এদেশে আসিয়াছেন।'

রট্টা চকিত চক্ষু তুলিলেন—'স্কন্দগুপ্ত!'

চিত্রক নির্লিপ্তস্বরে বলিল—'হাঁ। হূণ আবার আসিতেছে, তাই মহারাজ তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য স্বয়ং আসিয়াছেন।'

রট্টা কিয়ৎকাল নতমুখে রহিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন—'আপনি সম্ভবত প্রভুর সহিত মিলিত হইতে চাহেন?'

চিত্রক বলিল—'সে পরের কথা। আগে আপনাকে চষ্টনদুর্গে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে অন্য কাজ।'

রট্টা তাহার মুখের উপর ছায়া নিবিড় চক্ষুদুটি স্থাপন করিয়া স্নিগ্ধ হাসিলেন।

'আহার সমাপ্ত হইলে রট্টা জম্বুককে বলিলেন—'তোমার সেবায় আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। অন্ন ব্যঞ্জন অতি মুখরোচক হইয়াছে। দেখ, আর্য চিত্রক কিছুই ফেলিয়া রাখেন নাই।'

জম্বুক করতল যুক্ত' করিয়া সবিনয়ে হাস্য করিল। চিত্রক মৃদু হাসিয়া রট্টাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কোন্ ব্যঞ্জন সর্বাপেক্ষা মুখরোচক লাগিল?'

রট্টা বলিলেন—'শূল্য মাংস। এরূপ সুস্বাদু রন্ধন রাজ-পাচকও পারে না।'

চিত্রক মিটিমিটি হাসিতে লাগিল; রট্টা তাহা দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইলেন, বলিলেন—'শূল্য মাংস কে রাঁধিয়াছে?'

জম্বুক তর্জনী দেখাইয়া বলিল—'ইনি!'

অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া রট্টা হাসিয়া উঠিলেন—'আপনার তো অনেক বিদ্যা! এ বিদ্যা কোথায় শিখিলেন?'

চিত্রক বলিল—'আমার সকল বিদ্যা যেখানে শিখিয়াছি সেইখানে।'

'সে কোথায়?'

'যুদ্ধক্ষেত্রে।'

চিত্রকের মন কল্পনায় স্কন্দগুপ্তের স্কন্ধাবারের দিকে উড়িয়া গেল। ঐ যেখানে দিগন্তের কাছে আলোর আভা দেখা গিয়াছিল সেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ বস্ত্র শিবির তালপত্রের ছাউনি পড়িয়াছে; শিবিরের ফাঁকে ফাঁকে সৈনিকেরা আগুন জ্বালিয়াছে; কেহ যবচূর্ণ মাখিয়া দুই হস্তে স্থূল রোটিকা গড়িতেছে; কেহ ভল্লাগ্রে মাংস গ্রথিত করিয়া আগুনে শূল্য পক্ব করিতেছে—চীৎকার গান বাগ্‌যুদ্ধ···নির্ভয় নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা···অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই···আছে কেবল নিরঙ্কুশ বর্তমান।

রট্টা চিত্রকের মুখের উপর চিন্তার ক্রীড়া লক্ষ্য করিতেছিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন?'

চিত্রক ঈষৎ চমকিয়া বলিল—'হাঁ। আপনি কি অন্তর্যামিনী?'

রট্টা রহস্যময় হাসিলেন। * * *

রাত্রি গভীর হইয়াছে। চন্দ্র প্রায় মধ্যাকাশে।

কুমারী রট্টা আপন কক্ষে শয্যাশ্রয়ে ঘুমাইয়া ছিলেন, একটি নিশ্বাস ফেলিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ঘরের কোণে দীপ জ্বলিতেছে; জ্বলিয়া জ্বলিয়া শিখাটি ক্রমে ক্ষুদ্র বর্তুলবৎ আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার বিন্দুপ্রমাণ আলোকে ঘরের বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া রট্টা কিয়ৎকাল ঐ আলোকবিন্দুর পানে চাহিয়া রহিলেন; তারপর উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বারের অর্গল মোচন করিলেন।

দ্বার ঈষৎ বিভক্ত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার কক্ষের সম্মুখে দ্বারের দিকে পিছন করিয়া অলিন্দের একটি স্তম্ভে পৃষ্ঠ রাখিয়া চিত্রক বসিয়া আছে। পদদ্বয় প্রসারিত, জানুর উপর মুক্ত তরবারি। তাহার ঊর্ধ্বোত্থিত মুখের উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে—চক্ষু স্বপ্নাতুর—

দীর্ঘকাল এক দৃষ্টিতে দেখিয়া রট্টা আবার ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন; ফিরিয়া আসিয়া অধোমুখে শয্যায় বক্ষ চাপিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)
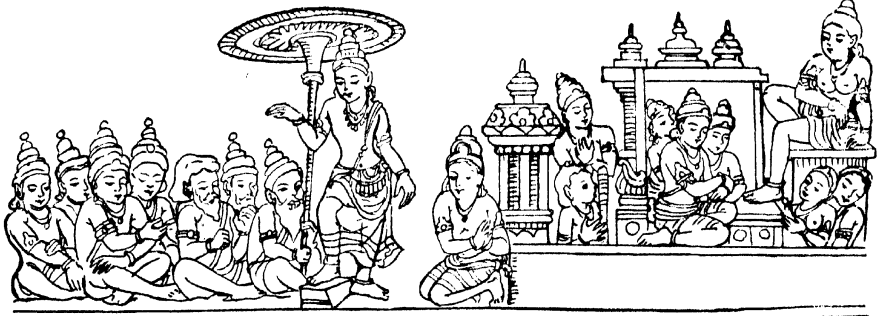
আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আন্দামানে জাপানী-রাজ

গুপ্তচর সন্দেহে জুলফিকার আলির উপর অমানুষিক পীড়ন করিয়া তাহাকে হত্যা করার প্রায় একমাস পরে ইংরাজ আমলের চিফ্ কমিশনারের সেক্রেটারী মিঃ বার্ডের উপর জাপানীদের সন্দেহ হয়। শ্রীপুষ্কর বাগচি নামে আন্দামান Public Works Department-এর ইংরাজ আমোলের একজন কেরাণী জাপানীদের নিকট নিজেকে সুভাষ বোসের আত্মীয় এইরূপ মিথ্যা পরিচয় দিয়া জাপানীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া Chief Naval Intelligence Officer-এর পদে উন্নীত হন এবং তিনিই জাপানীদের মনে এইরূপ বিশ্বাস করাইয়া দেন যে, বার্ড সাহেব গুপ্ত বেতার যন্ত্রের সাহায্যে আন্দামানের সংবাদ ইংরাজদের নিকট পৌছাইয়া দিতেছেন। এই মিথ্যা সংবাদে জাপানীরা বার্ডকে একদিন সকালে সেলুলার জেলের পার্শ্বে সমুদ্রের তীরে বিচার করিতে আরম্ভ করে। বার্ড সাহেব জানিতেন যে, জাপানীদের যাহার উপর সন্দেহ হয় তাহার নিকট হইতে অপরাধের স্বীকারোক্তি পাইবার জন্য অমানুষিক অত্যাচার করে এবং শেষ পর্য্যন্ত হত্যা করে, অতএব তিনি প্রথম হইতেই প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া জাপানীদের দেওয়া সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করিয়া লন, এবং প্রার্থনা করেন যে, তাঁহাকে একেবারেই বন্দুকের গুলিতে বধ করা হউক। জাপানীরা কিন্তু তাহা করে নাই, স্বীকারোক্তি পাইয়া তাহার সহিত পূর্ব্বের মতই ব্যবহার করিতে সুরু করে। সেলুলার জেলের পার্শ্বে সমুদ্রতীরে কয়েকজন জাপানী সৈনিক কেবলমাত্র আণ্ডারওয়ার পরিহিত বার্ডের গলার টুঁটি চাপিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাহার শ্বাসরুদ্ধ করে, তারপর পেটে ও পাঁজরায় ঘুসি এবং লাথি দিয়া তাহাকে জখম করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। বার্ড সাহেব আন্দামানের একজন বিশেষ জনপ্রিয় অফিসার ছিলেন। এখানেও পূর্ব্বের মতই আন্দামানের বহু নারী ও পুরুষ অধিবাসীকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া এই বিচার দেখানো হইতেছিল। বার্ড সাহেব প্রথম আঘাত সহ্য করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় কাঁপিতে কাঁপিতে একটু জল চাহিয়াছিলেন, ইহাতে একজন স্ত্রীলোক ভিড়ের মধ্য হইতে কিরূপে যেন এক গ্লাস জল সংগ্রহ করিয়া বার্ডকে দিবার জন্য অগ্রসর হয়। তখন একজন জাপানী সৈনিক সেই জলের গ্লাসটি স্ত্রীলোকের হাত হইতে লইয়া নিজে বার্ডের নিকট গিয়া গ্লাসটি দেখাইয়া হাতে দিতে যাইবার অভিনয় করিয়া গ্লাসসমেত জল দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। বার্ডের মুখ হইতে একটি মাত্র কথা বাহির হইয়াছিল "Oh Jesus"। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, ইহার পর তাঁহার মুখ দিয়া আর কোন শব্দ বাহির হয় নাই। গায়ে আলপিন ফুটান এবং বেয়নেটের দ্বারা বার্ডের দুইটি চক্ষু উপড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও তিনি কোন শব্দ করেন নাই। শেষে তরবারির দ্বারা তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিয়া সেইখানে সেই সমুদ্রতীরেই তাঁহাকে পুতিয়া ফেলা হয়। ইংরাজের দ্বারা আন্দামান পুনর্দখলের পরে সেখানে একটি কবর নির্ম্মাণ করিয়া ক্রুশচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী একটি স্থানের নামকরণ করা হইয়াছে "বার্ডস্ লাইন"।

ইহার পরেই জাপানীরা এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ লিণ্ডসে ও তাহার পাঠান বাবুর্চ্চির উপর সন্দেহ করে। খোলা মাঠে ইহাদের উপর প্রচণ্ডবেগে আঘাত করা হইতে থাকে, কিন্তু ইহারা বার্ডের ব্যাপার জানিতেন বলিয়া কিছুতেই কোন অপরাধ স্বীকার করেন নাই। শেষে অর্দ্ধমৃত অবস্থাতেও কোনরূপ স্বীকারোক্তি না পাইয়া জাপানীরা ইহাদের ছাড়িয়া দেয়। জাপানীদের জঙ্গী বিভাগের বিচার বোধ হয় এইরূপেই হইয়া থাকে। সন্দেহ হইলেই সর্ব্বসমক্ষে প্রহার সুরু হইবে, স্বীকার করিলেই মৃত্যু, না করিলে প্রহারে অর্দ্ধমৃত করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এই লিণ্ডসে সাহেব আন্দামান পুনর্দখলের পর ইংরাজের চাকুরীতে পুনরায় বহাল হইয়া পরে মাদ্রাজে বদলী হন, এবং এখনও পর্য্যন্ত সেইখানেই আছেন। তাঁহার পাঠান বাবুর্চ্চিটি কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটেই ছিল, পরে দেশে চলিয়া গিয়াছে।

আন্দামানের অধিবাসীদের পক্ষে দারুণ ভয়ে ভয়ে এইরূপে ১৯৪২ সাল কাটিয়া যায়। ইত্যবসরে জাপানীরা আন্দামানের সর্ব্বত্র রাঙা আলু জাতীয় ফসলের চাষ সুরু করে, সম্পূর্ণ অজন্মা পাহাড়েও সার দিয়া ক্ষেত বানাইয়া ফেলে। তাহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা, কর্ম্মশক্তি ও উদ্ভাবনী বুদ্ধিতে এক বছরেই পোর্টব্লেয়ারের বেশ কিছু উন্নতি হয়। এ বিষয়ে এখানকার লোকেরা সকলেই উহাদের সুখ্যাতি করে। তবে এক বিষয়ে উহারা নাকি ভয়ানক ছোটলোক। শুনিলাম. উহাদের উচ্চতম অফিসার অব্যবহিত নিম্নের পদস্থ অফিসারকেও সর্ব্বসমক্ষে চড়, কিল, লাথি মারিতে দ্বিধা করে না, এবং এইরূপ মার খাইয়া সেই পদস্থ অফিসারও বিদ্রোহ করে না, নীরবেই সহ্য করে। ইহাই নাকি উহাদের প্রচলিত রীতি।

১৯৪২-এর শেষভাগ হইতে কে বা কাহারা আন্দামানের সংবাদ বেতারযোগে ইংরাজদের নিকট পাঠাইতে সুরু করে। জাপানীরা ইহা অবগত হয়, কিন্তু কিছুতেই অপরাধীকে ধরিতে পারে না। ১৯৪৩ সালের ২১-এ জানুয়ারী হইতে ৩০-এ মার্চ্চের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিয়া উহারা একদল লোককে বন্দী করে ও ইহাদের মধ্যে সাতজনকে

পূর্ব্ববর্ণিত জুজুৎসু প্রণালীতে বধ। এই সাতজনের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন পুলিদের কর্ম্মচারী এবং দুইজন সাধারণ লোক। আবদুল খালেক নামক একজনকে এই ব্যাপারে বধ করা হয়। খালেকের পিতা মিঃ রৌফ্ এই বিষয়টি আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে জাপানীরা পরাজিত হওয়ার পর ১৯৪৬ সালে সিঙ্গাপুরে যুদ্ধাপরাধীদের যে বিচার হয়, সেই বিচারে মিঃ রৌফ্ একজন সাক্ষী ছিলেন। রৌফের নিকট হইতে আমি এই প্রবন্ধের কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। এই রৌফের পত্নী অর্থাৎ খালেকের মাতা এবং খালেকের দশ বৎসরবয়স্কা কন্যা তাহার পিতার জুজুৎসুতে মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং মনে রাখিয়াছে। আমার নিকট বিবরণ দিতে গিয়া ছোট মেয়েটি পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

১৯৪৩ মার্চ্চ মাসের এই ব্যাপারটিকে প্রথম গুপ্তচর ষড়যন্ত্র (First spy case) নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় গুপ্তচর ষড়যন্ত্রের জন্য ধরপাকড় সুরু হয় ঐ বৎসরের ২৯ এ জুলাই হইতে। এই Second spy case-এর ধরপাকড় ১৯৪৪-এর জানুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। এই প্রসঙ্গে প্রায় পাঁচশত লোক বন্দী হয় এবং পাঁচশত লোককেই অমানুষিকভাবে প্রহার করা হয়। স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য মারপিঠ করিতে করিতে বারোজন হতভাগ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়; স্বীকারোক্তি দেওয়ার ফলে ৪৫ জন লোককে হত্যা করা হয় এবং বাকী লোকেরা রেহাই পায়। এই হত্যাকাণ্ড ১৯৪৪-এর জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই দ্বীপে পদার্পণ করেন। আন্দামানের অধিবাসীদের উপর অনুসন্ধান ও বিচারের নামে জাপানীরা যে ভয়াবহ অত্যাচার চালাইতেছিল, সে সম্বন্ধে জাপানীরা নেতাজীকে বিশেষ কিছুই জানতে দেয় নাই। একজনের নিকট শুনিলাম যে, নেতাজী যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখন সেই ভদ্রলোক দ্বিতীয় গুপ্তচর ষড়যন্ত্রের আসামী হইয়া সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন। তিনি বলিলেন "জেলে আমাদের কোন বিছানা বা কম্বল কিছুই দেওয়া হইত না, একখানি হাফপ্যান্ট পরিয়া খালি গায়ে থাকিতাম, একবারমাত্র কদর্য্য আহার দিত এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একমিনিটের জন্যও ছোট cellটির বাহিরে যাইবার উপায় ছিল না। সেই ছোট cellটির এককোণে মল-মূত্র পড়িয়া থাকিত, জল ছিল না এবং খালি মেঝের খালি মাথায় শুইয়া থাকিতাম। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন দেখি যে সেলগুলি ম্যাথর দিয়া পরিষ্কৃত হইল, বাল্তি করিয়া জল আসিল, সেই সঙ্গে ভালো কম্বল, বিছানার চাদর, জামা ইত্যাদি আসিয়া গেল, ট্রের উপর সাজানো কলাই করা বাটিতে করিয়া ভালো ভালো খাদ্য ইত্যাদি দেওয়া হইল; কারণ না বুঝিয়া আমরা ভীষণ ভীত হইয়া পড়িলাম। পরে আমাদের নিকট জেলরক্ষী বলিয়া গেল যে, যে-কেহই তোমাদের নিকট আসিয়া যাহা কিছুই জিজ্ঞাসা করুক না কেন তোমরা কোন মতেই কর্তৃপক্ষের কোনরূপ নিন্দা করিবে না, করিলে মৃত্যুদণ্ড, আমরা ভয়ে এবং অনাহারে জড়বৎ হইয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। অতঃপর নেতাজী সুভাষ জেল পরিদর্শন করিতে আসিয়া আমাদের আহার্য্য, পরিধেয় এবং শয্যা দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়া চলিয়া গেলেন।" এই সময় নেতাজী জীমখানা গ্রাউণ্ডে বক্তৃতা দেন। অন্যান্য লোকের নিকট শুনিলাম যে, জাপানীরা নেতাজীকে এরূপে আগলাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল যে, দেশবাসী কেহই তাঁহার সহিত প্রাণের কথা বলিবার কোন অবকাশমাত্র পায় নাই। বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে ইংরাজের পক্ষে হইয়া কোন ষড়যন্ত্র বা গুপ্তচর বৃত্তিতে যোগ দেওয়া ভীষণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে; উপরন্তু ভারতবাসীই ভারত জয় করিবে, অতএব কোন ভারতবাসী যেন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ না করে, অর্থাৎ মনে হয় জাপানীরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে আন্দামানের লোকেরা অধিকাংশই ইংরাজের পক্ষে এবং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে আন্দামানের ভারতীয়গণ বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। নেতাজী তিন দিনমাত্র এই দ্বীপে অবস্থান করিয়া এই দ্বীপকে শহীদ দ্বীপ নাম দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। নেতাজী চলিয়া যাইবার পর জেলখানা হইতে সেই সমস্ত বিছানাপত্র এবং কয়েদীদের জামা ইত্যাদি পুনরায় কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল।

নেতাজী চলিয়া যাইবার মাস তিনেক পরে ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কর্ণেল লোকনাথন তিনজন সহকারী লইয়া এই দ্বীপে আসেন এবং এখানকার বেসামরিক শাসনভার গ্রহণ করেন। অতঃপর এখানকার লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার কিছুটা কমে, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি আবার চলিয়া যান। লোকনাথনের এইখানে অবস্থিতিকালেই একদিন একখানি রসদবাহী জাপানী জাহাজ 'রস' দ্বীপের নিকট জলমগ্ন হয়। কিরূপে কে ইহার সংবাদ পাঠাইয়া ইংরাজের টর্পেডোর দ্বারা জাহাজখানিকে জলমগ্ন করায় তাহার কোন সঠিক্ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই ব্যাপারে তিনজন ভারতীয় জড়াইয়া পড়েন। ইহাদের নাম মিঃ ব্যানার্জ্জী, মিঃ বুরহানুদ্দিন ও মিঃ আলি। এই তিনজনেই সমুদ্রের তীরে রক্ষীর কাজ করিতেন। লোকনাথনের উপস্থিতির জন্যই ইহাদের একটা ভদ্র রকমের বিচার অভিনয় হইয়াছিল এবং জুজুৎসু প্রথায় ইহাদের বধ না করিয়া ইহাদের তিনজনকে এক সঙ্গে সেলুলার জেলের ফাঁসীকাঠে ফাঁসী দেওয়া হয়। ইহারাই আজও পর্য্যন্ত সেলুলার জেলের ফাঁসীকাঠের শেষ বলি এবং ইহাদের কথাই ইতঃপূর্ব্বে সেলুলার ফাঁসীমঞ্চের জেলের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। এই তিনজনের বিচার ব্যাপারটি Third spy case বা তৃতীয় গুপ্তচর ষড়যন্ত্র নামে অভিহিত।

ইহার পর চতুর্থ গুপ্তচর ষড়যন্ত্র। ১৯৪৪ সালের ২৯-এ আগষ্ট হইতে ১৯৪৫-এর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ ছয় শত ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে আসামী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই সমস্ত লোকদের উপর পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার চলিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জাপানীদের পতন হওয়ার জন্য এই বিচারের শেষ নিষ্পত্তি আর হয় নাই। সরকারীভাবে শত্রু সন্দেহে জাপানীদের অমানুষিক অত্যাচারপর্ব্বের এইখানেই শেষ; কিন্তু অন্য ব্যাপারে তাহারা যে ভীষণভাবে নির্য্যাতন ও নরহত্যা করিয়াছিল তাহার বিবরণ এখনও দেওয়া হয় নাই। আগামী সংখ্যায় সে সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

বিপর্য্যয়ের মুখে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যপরিস্থিতি সম্প্রতি ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিবেশী প্রদেশ বিহারের সহিত পশ্চিমবঙ্গকে এখন এমন শোচনীয় খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে যে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি হওয়াও বিচিত্র নয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় ইতিমধ্যেই অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং কোথাও কোথাও চাউলের মূল্য উঠিয়াছে মণপ্রতি ৫০৲ টাকা। নদীয়ার অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। পশ্চিম বাংলার সব জেলাতেই অন্নাভাবে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার আশপাশে কোথাও এখন ৩০৲ টাকার কমে এক মণ চাউল মিলিতেছে না। তবু রেশন এলাকার অবস্থা মন্দের ভাল, কিন্তু রেশন এলাকাই প্রদেশের সব নয়। বিশেষ করিয়া রেশন অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা বাস করেন, ক্রমবর্দ্ধমান চাউলের মূল্য রেশনবিহীন গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য অধিবাসীকে গভীর হতাশাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। রেশন এলাকার দায়িত্ব অবশ্য সরকার লইয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত সরকারী এজেন্টদের শস্য সংগ্রহের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই সন্তোষজনক নয়। স্বাভাবিক ভাবে এই বৎসর যেখানে ৮ লক্ষ টনের কিছু বেশী খাদ্যশস্যের দরকার, সেখানে জুলাই মাসের প্রথম দিক পর্য্যন্ত এজেন্টরা ৪ লক্ষ টনও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাড়তি খাদ্যশস্য সংগ্রহের কেন্দ্র পশ্চিম বাংলার অবস্থা সত্যই শোচনীয়। বন্যায় এ বৎসর প্রায় ২ লক্ষ একর জমির ক্ষতি হইয়াছে এবং সরকারী হিসাবেই মুসলমান চাষী চলিয়া যাওয়ায় মোটামুটিভাবে তিন লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে চাষের অসুবিধা হইয়াছে। পাটচাষ বৃদ্ধির জন্যও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্য উৎপাদন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের উপরই এখন সব কিছু নির্ভর করিতেছে। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, কেন্দ্রীয় সরকারও এবার খাদ্যশস্যের ব্যাপারে একটু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ ১৯৫১ সালে ভারতকে খাদ্যের হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার যে পরিকল্পনা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী তাঁহারা এবার বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ গত বৎসরের ৩৯ লক্ষ টনের স্থলে ১৩ লক্ষ টনে নামাইয়া আনিবার সংকল্প করেন। অবস্থা গতিকে তাঁহাদের আশা এখন গভীর নৈরাশ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

খাদ্যশস্যের হিসাবে পশ্চিম বাংলার নিজেরই মারাত্মক অভাব, ইহার উপর প্রচণ্ড আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা অবস্থাকে ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সরকারী হিসাবেই প্রকাশ, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ১২ লক্ষ ৮৯ হাজার আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিলেন, এ বৎসর অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ২৫ লক্ষ ২২ হাজার বাড়িয়া এখন মোট ৩৮ লক্ষের উপরে উঠিয়াছে। আমাদের মনে হয় আশ্রয়প্রার্থীর প্রকৃত সংখ্যা এই সরকারী হিসাব অপেক্ষাও বেশী এবং মোটামুটি ইহা ৬০ লক্ষ হইবে। এই বিপুলসংখ্যক জনতার পোষণভার সরকার গ্রহণ করুন বা নাই করুন, খাদ্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের উপর ইহারা চাপ দিতেছে খুবই বেশী। গত ১৪ই আগষ্ট উপরোক্ত ৬০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৩৪ হাজার জন সরকারী আশ্রয়-শিবিরে ছিল, ইহার ভিতর ১,৫৪,৫৭৬ জন স্থান পাইয়াছে পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন আশ্রয়-শিবিরে এবং বাকী ৮০ হাজারের মধ্যে বিহারে ২২ হাজার, উড়িষ্যায় ১৬ হাজার, আসামে ৫ হাজার, কাছাড়ে ৭ হাজার ও ত্রিপুরায় ৩০ হাজার জন স্থান লাভ করিয়াছে। যাহারা এই আশ্রয়-শিবিরে স্থান লাভ করিয়াছে তাহাদের অন্ন যোগাইবার তবু একটা ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু যে অসংখ্য হতভাগ্য নিজেদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া এখানে সেখানে বা পথে পড়িয়া আছে, তাহাদের খাদ্য আসিবে কোথা হইতে? ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যের জন্য নানাভাবে মোট ৩৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু এই পর্ব্বত-প্রমাণ অর্থব্যয় তো সমস্যার গুরুত্ব এতটুকু কমাইতে পারে নাই। সরকারী টাকায় এপর্য্যন্ত অস্থায়ীভাবে প্রাণরক্ষার মত ব্যবস্থা ছাড়া বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন করা সম্ভব হইয়াছে অল্প ক্ষেত্রেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, এপর্য্যন্ত (২২শে আগষ্ট) মোট ১০ লক্ষ শরণার্থীর পুনর্বাসন সম্ভব হইয়াছে। এই দশ লক্ষ লোক নূতন পরিবেশে কতটা মানাইয়া লইতে পারিবে অথবা স্থায়ীভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবিকার্জ্জনের কতটা সুযোগ পাইবে তাহাও এখনও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কাজেই এ সময় দেশ যখন যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে মানুষের মত বাঁচিবার সুযোগদান কি ভাবে সম্ভব হইবে বিধাতাই জানেন। আশ্রয়প্রার্থী সমস্যাকে আর বাহিরের ঝঞ্ঝাট মনে করিবার উপায় নাই, সব ছাড়িয়া যে ভাইবোনেরা আজ আমাদের মধ্যে আসিয়াছে, আমাদের সুখদুঃখের অংশীদার রূপে তাহাদিগকে যথাসম্ভব বাঁচাইবার দায়িত্ব আমাদেরই। ইহারা পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতের নাগরিক এবং রাষ্ট্রের সম্পদ এই বিপুলসংখ্যক মানুষকে বাঁচাইয়া রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্র ছাড়া আর কে গ্রহণ করিবে! সুতরাং অন্য আর্থিক অবস্থার উন্নতি যেভাবেই হোক, এখন পশ্চিম বাংলার খাদ্যসঙ্কটের সমাধান অবিলম্বেই

করিতে হইবে, অন্যথায় অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা দেখিতে দেখিতে ভয়ানক ভাবে বাড়িয়া যাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। ইতিমধ্যেই পশ্চিম বাংলার পল্লী অঞ্চলে এবং সহরাঞ্চলে শরণার্থী এলাকায় অনাহারে বিশীর্ণ কঙ্কালের ভিড় জমিতেছে। এই সূত্রে একথাও স্মরণীয় যে, এবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এবং তজ্জন্য পাইকারী ভাবে মানুষ মরিতে আরম্ভ করিলে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা নিরাপদ রাখাও হয় তো শেষ পর্য্যন্ত কঠিন হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা সম্পর্কে বিলম্বে হইলেও বর্ত্তমানে অবহিত হইয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কটের অবনতি ঘটতে না দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার সদিচ্ছা দেখাইতেছেন। বর্ত্তমান গুরুতর পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অবহিতি মূল্যবান সন্দেহ নাই। পশ্চিমবাংলার সব সমস্যার মূল বা কেন্দ্র এখন শরণার্থী সমস্যা। কাজেই এই সমস্যার সমাধানে যত সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই পশ্চিমবাঙ্গলার অবস্থা উন্নতি হইবে। সরকার নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে যতটা পারেন ভালই, তাছাড়া এই সময় তাঁহাদিগের বেসরকারী পরিকল্পনা বা পরামর্শও কার্য্যকরী করণের মনোভাব লইয়া সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা উচিত। সম্প্রতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত বঙ্গীয় পুনর্বসতি প্রতিষ্ঠান ও ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে যে পুনর্বসতি বোর্ড গঠন করেন, তাঁহারা মোট ১৩ দফা প্রস্তাব সমন্বিত একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত বলিয়া তো ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা সরকারের কর্ত্তব্য; তাছাড়া আমাদের ধারণা পরিকল্পনাটির মধ্যে শরণার্থী সমস্যা সমাধানের অনুকূল অনেক যুক্তি আছে। সবচেয়ে বড় কথা, পরিকল্পনাটিতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সহিত মানবতার আদর্শের যতটা সম্ভব সমন্বয় সাধনের যে চেষ্টা হইয়াছে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সেই প্রয়াসটুকুর মূল্যও যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর আমন্ত্রণে প্রাক্তন পুনর্বাসন সচিব শ্রীমোহনলাল শাকসেনা ৫০ লক্ষ পূর্ব্ববঙ্গীয় শরণার্থীর পুনর্বসতির যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহির্বাণিজ্য অবিরাম অনুকূলে থাকিবার পর গত কয়েক বৎসর ইহা ভারতের প্রতিকূলে যাইতেছে। অবশ্য এই প্রতিকূল গতি ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দেই অনুমিত হয় এবং এই বৎসর ভারত হইতে রপ্তানী ও ভারতে আমদানী পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৪০৩ কোটি ও ৩৯৮ কোটি ধরিয়া ভারতের উদ্বৃত্ত হয় মাত্র ৫ কোটি টাকা। ইহার পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বহির্বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ ২১৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থাও শোচনীয়, এই বৎসর ভারতের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৩ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে জুন বা প্রথম তিন মাসের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই মাত্র তিন মাসেই ৩৪ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে।

এইভাবে অবিরাম বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি যে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তির হিসাবে মারাত্মক তাহা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণভাবে এই বহির্বাণিজ্যের উন্নতিসাধন ভারতকে অবিলম্বে করিতেই হইবে। এজন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ, শুল্ক সংস্কার প্রভৃতি যে কোন ব্যবস্থার কথাই স্থিরভাবে চিন্তা করা দরকার। মুদ্রামূল্য-হ্রাসের প্রথম দিকে ভারতীয় পণ্যের বিদেশের বাজারে যে কাটতি বাড়িয়াছিল, তাহা ব্যবসাচক্রের সাময়িক আবর্ত্তন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এখন স্থায়ীভাবে অনুকূল বাণিজ্যিক গতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা দরকার। বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের ব্যাপারে ভারতের যে দৈন্য তাহার পূরণের উপরই বহির্বাণিজ্যের গতি অনেকটা নির্ভর করিতেছে। ভোগ্যপণ্য আমদানীর তুলনায় যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর এখন জোর না দিয়া উপায় নাই, শিল্পোন্নয়ন ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের হিসাবে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গত ২।৩ বৎসর যাবৎ ভারত সরকারের শিল্পনীতির আড়ষ্টতার জন্য শিল্পপতিগণ নিরুৎসাহ হওয়ায় ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুবই মন্দাভাব দেখা যাইতেছে। এজন্য পণ্যাভাবগ্রস্ত আমাদের দেশে পণ্য উৎপাদন না হওয়ায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে (পার্লামেন্টের সদস্য শ্রীযুক্ত মাডগেল সম্প্রতি ইউ পির প্রতিনিধির নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি টাকা)। সরকারী শিল্পনীতিও অবিলম্বে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, আন্তর্জ্জাতিকতার নামে পণ্যবণ্টনের যেসব ব্যবস্থা হয় বা হইবে, তাহাতে ভারতের ন্যায় শিল্পে অনুন্নত দেশের লাভবান হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-অক্টোবর মাসে জেনেভায় পৃথিবীর বিভিন্ন ২৩ জাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত পণ্যচুক্তির কথা উল্লেখ করা যায়। এই চুক্তিতে ভারত বিদেশ হইতে মোটরগাড়ী, রাসায়নিক পণ্যাদি, টাইপরাইটার, রেফ্রিজেটার, বেতারযন্ত্র, টিনজাত খাদ্য ইত্যাদিতে বৎসরে আনুমানিক ৩১ কোটি মূল্যের পণ্য আনাইয়া যে সুবিধা পাইবার অধিকারী হয়, তাহার বিনিময়ে তাহাকে পাটজাত দ্রব্য, চা, নানাপ্রকার মশলা, কার্পাসজাত দ্রব্য ইত্যাদিতে ৪৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য বিদেশে সমান সুবিধায় রপ্তানী করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে।

সাধারণতঃ বহির্বাণিজ্য বেসরকারী ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি এই বাণিজ্যের প্রকৃতি নিরূপণে যথেষ্ট দায়ী, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত এই বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি হইলে সরকারকেই মুস্কিলে পড়িতে হয়। বহির্বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে সরকার দেশের অর্থনীতি অনুসারে বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সুবিধা পান। সরকারী স্বার্থের বা সমগ্রভাবে বৃহৎ জাতীয় স্বার্থের হিসাবে অনেকে এই ব্যবস্থাই ভাল বলিয়া মনে করেন। অবশ্য যে দেশে

এ-শ্রেণীর পরিকল্পনা হয় ব্যবসাদার বা শিল্পপতিশ্রেণীর লোক তাহার বিরোধিতা করিয়া থাকেন। ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্রমাবনতিতে উদ্বিগ্ন হইয়া যখন ভারতসরকার এই ধরণের রাষ্ট্রীয় ও বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান গঠনের কল্পনা চিন্তা করিতে সুরু করেন, তখন এদেশেও সেই পরিকল্পনা শিল্পপতিদের সমর্থন পায় নাই। যাহা হউক, বাণিজ্য সচিব শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের আমলে শ্রীচিন্তামণি দেশমুখের নেতৃত্বে এসম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। সম্প্রতি দেশমুখ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টে সরকারের বহির্বাণিজ্যের নীতি সমর্থন করিয়া কমিটি উপস্থিত ২ কোটি (শেষপর্য্যন্ত ১০ কোটি) টাকা মূলধন সমন্বিত একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত বহির্বাণিজ্য পরিচালন বোর্ড গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের ক্ষমতা এখন অবশ্য কতকগুলি পণ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে, তবে ইহার কাজ সাফল্য অনুসারেই বাড়ান চলিবে। এই প্রতিষ্ঠান ভারতসরকারের পক্ষে বিদেশের সরকার বা প্রতিষ্ঠানের সহিত পণ্য আমদানীর অথবা ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর চুক্তি করিতে পারিবে। বিশেষভাবে ভারতীয় কুটিরশিল্পজাত পণ্যের (এই পণ্যের বিদেশে চাহিদা উল্লেখযোগ্য এবং এই চাহিদা সম্প্রসারণ যোগ্য) বিদেশের বাজার সৃষ্টির ও প্রসারণের দায়িত্ব ইহারা গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের অত্যন্ত দুর্গতির দিনে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগঠনের নীতিগত গুরুত্ব সত্যই প্রচুর। ইহাতে অন্ততঃ ব্যবসায়ীদের অসাধুতা বা বোকামীর জন্য ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির হাত হইতে কতকটা রক্ষা পাইবার আশা আছে বলিয়া অনেকেই এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবার সম্ভাবনায় আনন্দিত হইয়াছেন।

ক্রমিলা নগরী

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। কিছুকাল পূর্ব্বে দক্ষিণ বিহারের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ নালন্দাতে তাঁহার একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই শাসন অনুসারে গুপ্তসম্রাট্ জয়ভট্টিস্বামী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দুইটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। গ্রামদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম ছিল পূর্ণনাগ গ্রাম; উহা ক্রমিলা বা ক্রিমিলা নামক বিষয় অর্থাৎ জেলার অন্তর্গত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের নালন্দাশাসন হইতে মনে হয় যে, গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি জেলার নাম ছিল ক্রমিলা বা ক্রিমিলা। কিন্তু উহা ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল, পণ্ডিতেরা তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেকে নালন্দা শাসন খানিকে জাল বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ উহা সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের সময়ের দুই তিন শত বৎসর পরে জাল করা হইয়াছিল। সুতরাং উহা হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ক্রমিলা নামক জেলার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা কঠিন। তবে উহার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ, নালন্দাতে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীনশীল-মোহরে ক্রমিলা বা ক্রিমিলা বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহা দক্ষিণ বিহারেরই অন্তর্গত কোন অঞ্চল-বিশেষের নাম ছিল এবং সম্ভবতঃ পাল আমলের পূর্ব্বেই উহা একটি বিষয় বা জেলা বলিয়া গণ্য হইত।

পালবংশীয় সম্রাট্ দেবপাল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একখানি তাম্রশাসন মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহাতে দেখা যায়, সম্রাট্ দেবপাল ক্রমিলা বা ক্রিমিলা বিষয়ের অন্তর্গত মেষিকা নামক একটি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই শাসনে উক্ত বিষয়টিকে শ্রীনগর নামক ভুক্তি বা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। যেমন নগরার্থক 'পত্তন' শব্দ হইতে আধুনিক পাটনা নগরীর নাম হইয়াছে, তেমনই পাটনা যাহার বর্ত্তমান প্রতিনিধি সেই প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরকে লোকে সাধারণতঃ নগর বা শ্রীনগর বলিত। বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্রের জয়মঙ্গলা টীকায় দেখা যায়, 'নাগরকাঃ' এবং 'নাগরিক্যঃ' যথাক্রমে 'পাটলিপুত্রিকাঃ' ও 'পাটলিপুত্রিক্যঃ' রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং পালসাম্রাজ্যের অন্তর্গত শ্রীনগর ভুক্তি যে পাটলিপুত্র নগরকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশে বিস্তৃত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাল সম্রাট্গণের শাসনাদি হইতে বর্ত্তমান বিহার প্রদেশে অবস্থিত দুইটি ভুক্তির অস্তিত্ব

অবগত হওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে নগরভুক্তি বা শ্রীনগরভুক্তি দক্ষিণ বিহারে এবং তীরভুক্তি (আধুনিক 'তীরহুত') উত্তর বিহারে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই ভুক্তি-দ্বয়ের কোনটিরই প্রকৃত সীমা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। গয়া বিষয়, রাজগৃহ (বর্ত্তমান 'রাজগির') বিষয় এবং নালন্দা বিষয় শ্রীনগরভুক্তির অন্তর্গত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ পাটলিপুত্র বা শ্রীনগর এবং মুদ্গাগিরি (মুঙ্গের) ঐ ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত অপর দুইটি বিষয়ের কেন্দ্র ছিল। কৃমিলা বা ক্রিমিলা বিষয় উল্লিখিত বিষয়গুলির বাহিরে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এতদিন এই বিষয়টির প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের সহায়ক কোন প্রমাণই আবিষ্কৃত হয় নাই। বিষয়টির নাম কৃমিলা বা ক্রিমিলা নামের কোন নগরী হইতে উদ্ভূত কিনা, তাহাও কেহ বলিতে পারেন নাই ; কারণ ঐ নামের কোন নগরীর অস্তিত্ব এতদিন অজ্ঞাত ছিল। সুখের বিষয়, সম্প্রতি আমি প্রাচীন কৃমিলা নগরীর অবস্থান নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার আবিষ্কারের ফলে কৃমিলা বিষয়ের অবস্থানও সহজেই নির্ণীত হইয়াছে।

বিগত জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে আমি দক্ষিণ বিহারের অন্তর্গত মুঙ্গের, পাটনা ও গয়া জিলার কতকগুলি গ্রামে শিলালিপি প্রভৃতির সন্ধান করিতে গিয়াছিলাম। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় আলেগ্জাণ্ডার কানিংহাম সাহেব দক্ষিণ বিহারের গ্রামসমূহে প্রাচীন লিপির সন্ধানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ রিপোর্টসমূহে বর্ণিত আছে। তিনি যে সকল লিপিযুক্ত শিলামূর্ত্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। কারণ উহার অনেক-মূর্ত্তি পরবর্ত্তী কালে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ বিহারের অগণিত প্রাচীন গ্রামে এখনও প্রতি বৎসর ভূমি কর্ষণ বা খননকালে প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে ; উহার অনেক অভগ্ন সুদৃশ্য মূর্ত্তি বাহিরেও চলিয়া যায়। তবু ঐ অঞ্চলে মাঝে মাঝে অনুসন্ধান কার্য্য চালাইলে প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু নবীন উপাদান আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। দক্ষিণ বিহারে সাধারণতঃ যে সকল শিলামূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়, উহা পাল আমলের এবং উহার অধিকাংশই ভগ্ন। বেশীর ভাগ মূর্ত্তিতে কোন লিপি দেখা যায় না ; কিন্তু কতকগুলি মূর্ত্তির পাদপীঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখ উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই লিপিগুলির মধ্যেও আবার অনেকগুলির ঐতিহাসিকমূল্য সামান্য। বৌদ্ধ মূর্ত্তিতে সাধারণতঃ এই সুবিখ্যাত বৌদ্ধ মন্ত্রটি উৎকীর্ণ দেখা যায়—"যে ধর্ম্মা প্রভবাহেতুপ্রভবা হেতুং তথাগতোহবদৎ। তেষাং চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ"। কতকগুলি মূর্ত্তিতে কেবল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতার নাম উৎকীর্ণ থাকে। অতি অল্প-সংখ্যক মূর্ত্তিতে মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাস্থান এবং প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালের উল্লেখে কখনও বা কেবলমাত্র কোনও রাজার রাজত্বকাল, কখনও নির্দ্দিষ্ট কোনও রাজার রাজ্য সংবৎসর এবং কদাচিৎ কোনও সুপরিচিত সালের ব্যবহার দেখা যায়। স্থানকালের উল্লেখ সংবলিত লিপি-গুলিই ঐতিহাসিকগণের নিকট অধিক মূল্যবান্। গত জানুয়ারী মাসে আমি মুঙ্গের জেলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কাজরা, কিউল ও লক্ষ্মীসরাই রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামে এই প্রকারের কতকগুলি মূল্যবান্ লিপি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কাজরা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী উরেন নামক গ্রামে আমি কতিপয় ভৈক্ষুকী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কার করি। এই লিপি পূর্ব্বভারতের মগধ অঞ্চলের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিছু কাল হইল, মালদহ জেলাতেও এক-খানি ভৈক্ষুকী লিপি পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আমি একটি প্রবন্ধে এই ভৈক্ষুকী লিপিগুলির পাঠ আলোচনা করিয়াছি। উহা সরকারী 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' পত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

জানুয়ারী মাসের ৯ তারিখ অপরাহ্নে আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের লক্ষ্মীসরাই ও মনকথা ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী বল্গূদর গ্রামে উপস্থিত হই। বল্গূদর গ্রামটি ক্ষুদ্র ; কিন্তু এখানে তিনটি মূল্যবান্ লিপি পাওয়া গেল। গ্রামের সঙ্গৎ নামক অঞ্চলে একটি কূপের নিকট একটি শিলা মূর্ত্তির পাদপীঠ মাত্র পড়িয়া আছে দেখিলাম। উহাতে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহার তারিখ পালবংশীয় মদন-পালের রাজত্বের অষ্টাদশবর্ষের ১১ই জ্যৈষ্ঠ এবং ১০৮৩ শকাব্দ। এই লিপিখানির ঐতিহাসিক মূল্য ইতিপূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' 'পাল-বংশীয় মদন পাল ও গোবিন্দ পাল' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু লিপিটির সম্পর্কে আর একটি মূল্যবান

তথ্য এই যে, উহাতে মূর্ত্তিটির কুমিলা বা ক্রিমিলা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার বিষয় উল্লেখ আছে। বলগূদর গ্রামে আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার ভাগলপুরবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত দিলীপ-নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের কাছারীতে অযত্ন-রক্ষিত একটি ভগ্ন দেবীমূর্ত্তি। ইহার অঙ্গে যে লিপিটি ক্ষোদিত আছে, তাহাতেও বলা হইয়াছে যে, উক্ত দেবীমূর্ত্তি কুমিলা বা ক্রিমিলা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ গ্রামে আমার তৃতীয় আবিষ্কার বাবু কেশব সিংহের গৃহপ্রাঙ্গণে পতিত একখানি পাদপীঠ। মূর্ত্তিটির কোন সন্ধান পাই নাই; কিন্তু পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা গেল যে, ঐ মূর্ত্তি পালবংশীয় সম্রাট্ সুবিখ্যাত ধর্ম্ম পালের রাজত্বকালে কুমিলা বা ক্রিমিলা নামক অধিষ্ঠান অর্থাৎ নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র-পরিসর বলগূদর গ্রামে এই তিনটি লিপি পরীক্ষা করিয়া আমার সন্দেহ রহিল না যে, এতদিনে কুমিলা বিষয়ের কেন্দ্রীয় নগরীর অবস্থান জানা গেল। এই গ্রাম এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল লইয়া যে প্রাচীন কুমিলা নগরী অবস্থিত ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বলগূদরের পার্শ্বেই রজৌনা নামক অপর একটি গ্রাম আছে। সেখানে সংগৃহীত কতকগুলি মূর্ত্তির মধ্যে একটিতে পালবংশীয় প্রথম শূর পালের পঞ্চম রাজ্যবর্ষের একখানি লিপি আছে। ঐ লিপি হইতে জানা যায় যে, উল্লিখিত মূর্ত্তিটিও কুমিলাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান রজৌনা গ্রামটিও প্রাচীন কুমিলা নগরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। আমার মনে হয়, ঐ মূর্ত্তিটি বলগূদর গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল; পরে উহা রজৌনাতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বলগূদর গ্রামে আবিষ্কৃত লিপিগুলি হইতে নিঃসংশয়ে জানা গেল যে, বর্ত্তমান মুঙ্গের জেলার পশ্চিমাংশে আধুনিক পাটনা ও মুঙ্গেরের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে প্রাচীন কুমিলা বিষয় অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ পূর্ব্বদিকে মুদ্গাগিরি বিষয়, পশ্চিমে শ্রীনগর বিষয়, উত্তরে গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে রাজগৃহ ও নালন্দা বিষয় এই চতুঃসীমার মধ্যে প্রাচীন কুমিলা বিষয়ের অবস্থান অনুমান করা যাইতে পারে।

সমাজ-সচেতন সাহিত্য

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমাদের জীবনে আজ যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সমাজ-সচেতন মানুষ হিসাবে সাহিত্যিকদের মনের উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃত হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ মন হইতে সাহিত্যিক মনের পার্থক্য এই যে, সে মনটি অধিকতর সংবেদনশীল। এই কারণেই জাতির সাহিত্যে কালের ছাপ পড়ে—যুগকে অতিক্রম করিয়া সাহিত্যিকের অনুভবশীলতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পটভূমিতে একালীন সুখ দুঃখ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের সাহিত্যে রূপায়িত হইয়া উঠে। অনুক্রমিক ঘটনা পরম্পরার সংকলনে ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে কিন্তু সাহিত্যে ঘটনা উপলক্ষ মাত্র। সাহিত্যিক দেখেন মানুষকে—যে মানুষ ঘটনার সৃষ্টি করে—আর সাহিত্যিকের সৃষ্টি সেই মানুষ নিজে।

অতএব যে সমস্যা আজ মানুষকে বিচলিত ও বিধ্বস্ত করিতেছে—তাহার সমাধান কল্পে সে নির্বিচারে যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতেছে, মনুষ্যোচিত কর্ম্মের প্রধানতম আশ্রয়ভূমি নৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ হইতে সেইজন্যই আজ মানুষ বার বার বিচ্যুত হইতেছে, এ শোচনীয় ঘটনা সাহিত্যিক মনকে অবশ্যই প্রভাবিত করিবে।

সম্প্রতি এ্যালডুস্ হাক্সলি "Ape and Essence" নামক যে গল্পের বই লিখিয়াছেন তাহা নিছক গল্পেরই বই হইয়া উঠে নাই, কারণ আখ্যান বস্তু অপেক্ষা নৈতিক উদ্দেশ্যের দিকেই তিনি দৃষ্টি দিয়াছেন বেশী। ইহাকে সাময়িক পাপাচার বা গর্হিত কাজের তীব্র প্রতিবাদ ও শ্লেষাত্মক রচনা বলা যাইতে পারে। Point Counter Point—লেখার পর হাক্স্লি বহুদিন কোনও বই লিখেন নাই। তাহার পর তিনি লিখিলেন—Brave New World, After Many a Summer, Time must Have a Stop ইত্যাদি। এই সবগুলি বইতেই আমরা গল্প ভাগ অপেক্ষা নৈতিক উদ্দেশ্যের আলোচনাই দেখতে পাই বেশী।

Ape and Essence এর গল্পটি নিম্নবর্ণিত ছায়াছবির সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপির (Film Script) আকারে লেখা। সেটা যেন ঘটনাক্রমে Dustbin বা ময়লার টিনের মধ্যে পাওয়া গেল। গ্রন্থকারবর্ণিত এই পাণ্ডুলিপির লেখক ট্যালিস্ ইচ্ছা করিয়াছিলেন এখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া তিনি তাঁহার পৌত্রীকে যুদ্ধোত্তর জার্ম্মানির হাত হইতে বাঁচাইবেন—যে জার্ম্মানিতে তখন কয়েকটুকরা চকোলেটের বদলে যুবতী মেয়েরা আত্মবিক্রয় করিতে শুরু করিয়াছে। হলিউডে সেই ছায়াচিত্রের

পাণ্ডুলিপিখানি বিক্রয়ের জন্ম চেষ্টা করিবার আগেই ট্যালিসের মৃত্যু হইল। গল্পটির আখ্যান ভাগটি সংক্ষেপে এই ভাবে চলিয়াছে। লেখক কথিত তৃতীয় মহাযুদ্ধের পর বর্ত্তমান সভ্যতার অস্তিত্ব রহিল শুধু নিউজিল্যাণ্ড হইতে অনেক দূরে একটি স্থানে। এটমবোম্ ও জীবাণু সংশ্লিষ্ট যুদ্ধের ফলে আমেরিকায় এক নূতন মানুষের জাতি জন্মাইতে লাগিল, রক্তে তাহাদের মানসিক পঙ্গুতার বিষ সংক্রামিত। তাহারা "বেলিয়াল" অর্থাৎ অন্যায় ও অশুভের দেবতা শয়তানকে পূজা করে। ইহার পর দেখা যায় বাইবেল ও নৃতত্ব হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া হাক্সলি আর এক নূতন পরা ধর্ম্মের রূপক খাড়া করিলেন, তাহা এই :—নিউজিল্যাণ্ড হইতে একদল বৈজ্ঞানিক কালিফর্ণিয়ার উপকূলে উপস্থিত হইলেন প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাংশ অনুসন্ধান করিতে। এই বৈজ্ঞানিক দলের একজন উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ ছিলেন, তাঁহার নাম ডাঃ পুল—আজীবন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ডাঃ পুলকে কে বা কাহারা যেন হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই গল্পে বর্ণিত প্রাক্-এটম যুগের প্রাচীন রীতি অনুসারে—নরনারী বৎসরে পাঁচ সপ্তাহ ছাড়া ইন্দ্রিয় ভোগ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকিবার কথা। এই পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তাহারা দুই সপ্তাহ অবাধ ও অসংযত যৌন-সম্ভোগে রত থাকিবে এমন রীতিরও প্রবর্ত্তন তাহাতে দেখা যায়। তাহারা সকলে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হইবে। পুরুষ—"না" এই কথাটি লিখিত নারীর গাত্রবাস ছিঁড়িয়া ফেলিবে এবং অকথ্য ও অদম্য যৌন-সম্ভোগে সকলে উন্মত্ত হইয়া পড়িবে। এই নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া শতকরা ১০ হইতে ১৫ জন যাহারা যৌন লালসা চরিতার্থ করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়া যাইবে, এই গল্পে তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে "Hots" অর্থাৎ যৌন-লালসা-দৃপ্ত। তাহাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে অথবা ইচ্ছা করিলে তাহারা খোজা পুরোহিতদের দলেও ভিড়িতে পারে। কখনও কখনও তাহারা এই বিধিনিষেধবর্জ্জিত সুদূর উত্তরে অবস্থিত একটি ছোট উপনিবেশে পলাইয়া যাইতে পারে। গল্পে বর্ণিত ক্যালিফর্ণিয়ায় ধ্বংস-প্রাপ্ত স্থানের খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার ভার থাকে ডাঃ পুলের উপর। তিনি একদিন জনৈক যৌন-লালসা-দৃপ্তের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া—উত্তরে অবস্থিত উপনিবেশে পালাইয়া যাইবার চেষ্টা করেন।

ছায়াচিত্রের এই পাণ্ডুলিপিখানির হাস্যকর গল্পভাগের জন্য হলিউডের পক্ষে মনোনীত হওয়া সম্ভবই হউক আর নাই হউক এবং ইহা যে এটম্-উত্তর যুগের প্রতিক্রিয়ায় বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্ম ও নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ হননের একখানি সম্ভাব্য চিত্র এবং সে যুগে সকল মানুষেই যে বর্বর হইয়া শুধু শয়তানের পূজা করিবে—ইহা তাহারই কল্পনামাত্র—এ তর্ক এখানে অবান্তর। কিন্তু প্রকৃতির অফুরন্ত দানের অপব্যবহার করিয়া মানুষ যে বর্ত্তমান সভ্যতার ধ্বংসসাধনে সচেষ্ট হইয়াছে—ইহার দ্বারা এলডুস্ হাক্সলি সে সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ইঙ্গিত দিয়াছেন।

আধুনিক যুগের মানুষ মনে করে প্রকৃতিকে সে জয় করিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তাহা পারে নাই—"He has merely upset the equilibrium of nature by fouling the rivers, killing off the wild animals, destroying the forests, washing the top soil into the sea, burning up an ocean of petroleum, squandering the minerals it has taken the whole of geographical tone to deposit."

অর্থাৎ নদ নদী কলুষিত করিয়া, বন্য পশুদিগকে হত্যা করিয়া, অরণ্যের ধ্বংস সাধন করিয়া, বিধৌত মৃত্তিকার অগ্রভাগ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া, সাগর প্রমাণ খনিজ তৈল দগ্ধ করিয়া, বহু যুগব্যাপী যে সকল খনিজ সম্পদ পুঞ্জীভূত হইয়াছে দুই হাতে তাহার অপব্যয় করিয়া, মানুষ কেবল প্রকৃতির ভারসাম্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে।

ইহারই নাম সভ্যতা? ইহারই নাম অগ্রগতি? পৃথিবীর জন-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ—নিকৃষ্ট কৃষিকার্য্যের জন্য, মৃত্তিকায় অবিরাম ফসলের জন্য ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস পাইতেছে। একদিকে শিল্পোন্নতির অবিরাম উর্দ্ধগতি, অপর দিকে ভূমির উৎপাদন শক্তির শোচনীয় অধোগতি।

ইহাই ত আমাদিগকে নরাধমের স্তরে নামাইয়া লইয়া যাইতেছে এবং পাপাসক্ত জড়বুদ্ধির ভৈরবীচক্রে আমাদের আত্মসমর্থনের হেতুও ত ইহাই। এ যুগের মানুষের অধঃপতনের মূল কারণ হইল এই যে তাহার স্কন্ধে—অগ্রগতি ও জাতীয়তা নামক ভাবের ভূত চাপিয়া আছে—ইহাই লেখকের অভিমত এবং এ অভিমত তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার গল্পে বর্ণিত পল্লী-যাজকের মুখ দিয়া।

যাঁহারা হাক্সলির বই পড়িয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার বহু বিষয় সম্পর্কিত, উদ্দেশ্যপূর্ণ ইঙ্গিতের সহিত পরিচিত আছেন—এখানেও তিনি প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহার দার্শনিক মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এক একটি অপরিচিত ব্যাখ্যা দ্বারা নিজের বক্তব্যকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এই গল্পের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ধাক্কা খাই—প্রথম পৃষ্ঠাখানি উন্মোচন করিয়া। প্রথমেই তিনি লিখিতেছেন "It was the day of Gandhi's assassination" অর্থাৎ সেদিনটি ছিল গান্ধীহত্যার দিন। কিন্তু দেখা যায় বিশ্ববিখ্যাত এই ঘটনাটির উপর কোনও ছায়াপাত না করিয়া গল্পে-বর্ণিত হলিউডের মানুষটি শুধু নিজের কথাই বলিয়া যাইতেছে। হাক্সলি কোনও কাজের ফলাফল অপেক্ষা তাহার পন্থা সম্বন্ধেই অধিকতর সচেতন, সুতরাং তাঁহার শান্তিবাদী মন যে মহাত্মাজীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইবে ইহাই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গান্তরে গান্ধীজীর পঞ্চায়েৎ শাসন পরিকল্পনাকে তিনি একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজি সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা এ দেশের পাঠক সমাজকে নাড়া দিবে। তিনি বলিতেছেন—

Against the evil doctrine of progress Gandhi was re-actionary who believed only in people. Squalid little individuals governing themselves, village by village and worshipping the Brahman who is also Atman. But the whole story of Gandhi included an inconsistency,

almost a betrayal, for he got himself involved in the subhuman mass-madness of nationalism. He imagined that he could mitigate the madness and convert what was satanic in the state to something like humanity. But the saint can cure our regimented schizo-phrenia, not at the centre but at the periphery."

অর্থাৎ অগ্রগতি সম্বন্ধে এই যে মতবাদ তৎসম্পর্কে গান্ধীর মন ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর বিশ্বাস ছিল একমাত্র জনগণের উপর। সেই সকল কদর্য্য ক্ষুদ্রকার লোকগুলি পল্লীতে পল্লীতে নিজের নিজের গোষ্ঠীকে পরিচালনা করে—পূজা করে ব্রহ্মের এবং এই ব্রহ্ম হইতেছে "আত্মা"। কিন্তু গান্ধীর কার্য্যকলাপের ইতিহাসে যে অসামঞ্জস্য আছে তাহা প্রায় বিশ্বাসঘাতকার সামিল। কারণ তিনি নিজে নিম্নস্তরের জনসাধারণের যে জাতীয়তার উন্মত্ততা তাহারই মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিলেন—। তিনি ভাবিয়াছিলেন সে উন্মত্ততা প্রশমিত করিবার এবং শয়তানকে মানুষের পর্য্যায়ে উন্নীত করিবার শক্তি তাঁহার আছে। কিন্তু যিনি মহাত্মা, তাঁহার পক্ষে কেন্দ্রদেশে সংবদ্ধ এই উশৃঙ্খল উন্মত্ততার আরোধ্য-সাধন করা সম্ভব নহে, কেন্দ্রে নহে পরিধিতে অর্থাৎ ভিতরে নহে বাহিরে সে উন্মত্ততা প্রশমিত করা তাঁহার পক্ষে হয়ত সম্ভব হইতে পারিত।

কাজেই হাকসলির মতে যাহারা বুদ্ধিমান, ভবিষ্যৎদর্শী, যাঁহারা শৃঙ্খলা ও পূর্ণতার প্রতি আস্থাবান, তাহাদের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল গান্ধীর পরাজয় ঘটিয়াছে। কিন্তু ঠিক তাহা নহে। বস্তুতঃ যাহারা অসম্ভব রকমের প্রতিক্রিয়াশীল, যাহাদের কার্য্যকলাপ দুর্ব্বোধ্য ও প্রচ্ছন্ন, এবং যাহারা কোনও একটি বিশেষ ধর্ম্মের নবজাগরণের জন্য সচেষ্ট, তাহাদের হাতে গান্ধীজীর এই আপাতঃ পরাজয় ঘটিয়াছে।

তথাকথিত অগ্রগতি ও জাতীয়তার উপর হাকসলি যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা কিছুটা মানিয়া লইলেও আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সজ্ঞানে শয়তানের পূজা করিয়া আজ মানুষের যে অধোগতি হইয়াছে ইহাই কি তাহার একমাত্র কারণ? আমরা কল্পনার দ্বারা এমন একটি অবস্থাকে আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি; কিন্তু আজ আমাদের সম্মুখে মানব-ইতিহাসের যে অধ্যায়টি রচিত হইতেছে—তাহার গুরুত্ব অনুসারে এই প্রকার কল্পনাকে কখনই আমরা বিস্ময়ের বা প্রশংসার চক্ষে দেখিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস মানুষের এই নিদারুণ দুর্গতি ও তজ্জনিত অধঃপতনের মধ্যেও মানুষ "জ্ঞানই ধর্ম্ম" মহামতি সক্রেটিসের এই উক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিয়া চলিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের হিসাব নিকাশে বর্তমান মানুষের ক্ষতি অপেক্ষা লাভের অঙ্কই আমাদের আগামীকালের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

জীবনের সমস্যাকে যদি আমরা অর্থাৎ লেখকেরা আরও জটিল করিয়া পাঠকের চোখের সম্মুখে উপস্থিত করি তাহা হইলে আমাদের অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে। বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া তাহার মন্দটাই শুধু দেখিব, ভালটা বিবেচনা বুদ্ধির অতীত হইয়া থাকিবে এমন দুর্ভাগ্য যেন কোনও লেখকেরই না হয়। অন্ধকার পথে আলোর শিখাটুকু যদি ধরিতে না পারি তাহা হইলে ভীষণ অন্ধকার বলিয়া ভয় দেখাইবার কাজ আর যাহাদেরই হউক না কেন, সাহিত্যিকদের কখনই নহে।

ইতিহাস পাঠে

শ্রীকালিদাস রায়

কি পেলাম ভারতের ইতিহাস পাঠ করি সারা,
শুধু রাজা বাদশার শোচনীয় পরিণতি ছাড়া।
রাজার মুকুটতলে ভীতি-চিন্তা উদ্বেগের ভার
কুণ্ডলিত সরীসৃপ-সম করে অস্বস্তি সঞ্চার।
চারিদিকে হিংসা-দ্বেষ অসন্তোষ বিপ্লব বিগ্রহ,
কোথাও জ্বলন্ত কোথা ধূমায়িত বিষাক্ত বিদ্রোহ
সহস্র ভোগ্যের মাঝে উপবাসী, ভোগে নাই রুচি,
অজস্র স্বাচ্ছন্দ্য মাঝে নয়নের নিদ্রা যাই ঘুচি।
নিজ শব-চ্ছায়া হেরে নৃপ পানপাত্র হাতে ধরি!
প্রতি গ্রাসে মৃত্যু ত্রাসে উঠে তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরি।
কেহবা শানায় ছুরি কেহ রচে মারণ তোরণ।
সিংহাসন হিংসাসন কিংবা হয় সিংহনথাসন।
তবু এ রাজত্ব লাগি মূঢ়দের অসাধ্য সাধন।
মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জিয়া হিংস্র বন্য পশুত্ব বরণ।
কেহ করে ভ্রাতৃবধ কেহ করে প্রভুরে সংহার।
কেহ পুত্রকল্পদের ক্ষীণ কণ্ঠে হেনেছে কুঠার।
আপন পুত্রের নেত্র করিয়াছে কেহ উৎপাটন,
পিতা পিতৃকল্পদের আলিঙ্গনে হয়েছে জীবন।
সপ্ত-তীর্থ জলে নয় সপ্তজ্ঞাতিজনের রুধিরে,
অভিষেক লভিয়াছে মুণ্ডাসনে বৈতরণী তীরে।
ভারতের ইতিহাস শেষ করি হই অন্যমনা,
প্রজার বেদনা নয় মর্ম্মে বাজে রাজার বেদনা।
কর্ণে বাজে—'আমার এ সুবিস্তৃত জনম ভূমিতে
দীনতম কুটীরের এক কোণে দিবে না বাঁচিতে
ইহাও কি দুই মুঠা—'অসমাপ্ত এই বাক্যখানি
ভারতের ইতিহাসে সর্ব্ব শেষ রাজকীয় বাণী—
জাফরাগঞ্জের এক কারাকক্ষে। বাকিটুকু তার
ডুবায়েছে হতভাগ্য নবাবের রুধির পাথার।
আর সবি ভুলে যাই ভারতের ইতিহাস পড়ি
শুনি রাজা বাদশার আর্ত্তনাদ উঠিছে গুমরি।

ফুলমণির গাঁয়ে

শ্রীবীণা দেবী
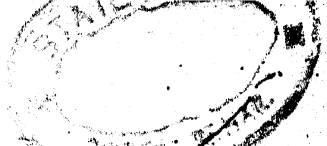
বছরখানেক আগে, ফাগুনের প্রথম—শীতের হাওয়া পুরোপুরি যায়নি। ভাল করে' ভোর না হ'তেই ফুলমণির ভাই বাদল গোরুর গাড়ী নিয়ে হাজির।—"চল্ যেতে হবে আমাদের গাঁয়ে"—

ক'দিন থেকেই ফুলমণি আমাদের ব'ল্‌ছিল—"তোরা আমাদের গাঁয়ে চল্ কেনে—আমাদের কালীপুজো হবে দেখ্‌বি—নেমন্তো দিছি"—তা'র আগ্রহাতিশয্যে আমাদেরও আগ্রহ হ'ল যাবার। আগের দিন গাড়ী করে' ত্রিপল, লোহার চেয়ার ইত্যাদি নিয়ে গেছে। পুজোর দিন মঙ্গলবার—কন্যার স্কুল খোলা। সে যেতে রাজী হ'ল না। কাজেই আমি আর উনি যাত্রা ক'র্‌লাম।

ফুলমণি

উন্মুক্ত আকাশের নীচে—খোলা মাঠে—ভোরের হাওয়ায় গরুর গাড়ীর মন্থরগতি বড়ই ভাল লাগ্‌ছিল—আরও ভাল লাগ্‌ত কন্যাটী সঙ্গে থাক্‌লে।...

শান্তিনিকেতনকে পিছনে রেখে—আমাদের গোযান উত্তর-পূর্বদিকে এগিয়ে চ'ল্‌ল। রেল লাইন পার হ'য়ে সাঁওতালপল্লী 'বনডাঙা'কে পিছনে ফেলে, আদিত্যপুর কঙ্কালীতলার রাস্তা ডাইনে রেখে, বামে রেল লাইন ধরে' সোজা উত্তরদিকে এগিয়ে চ'ল্‌ল গাড়ী। 'কোপাই' নদী যখন পার হ'লুম, ভোর হ'য়ে গেছে—সাঁওতালপল্লী 'মহিষাডাল'-এর মেয়েরা কোপাইনদীতে জল নিতে এসেছে। কী সুন্দর মনোরম প্রভাত। দেহ-মন যেন জুড়িয়ে গেল। ধবধবে পরিষ্কার বালির উপর দিয়ে স্বল্পতোয়া কোপাই ব'য়ে চ'লেছে—অসমান গতিতে ঝিরঝির করে',—আঁকা-বাঁকা বন্ধুর তার পথ, উঁচু নীচু অসমান তার তীর। তীরে কয়েকটা সোজা তালগাছ দাঁড়িয়ে—যেন তীররক্ষী সেপাই শান্ত্রী।
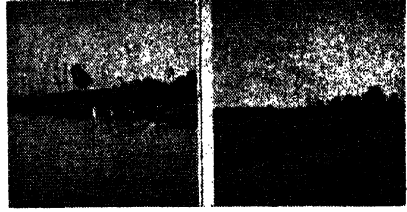
মহিষাডালের মেয়েরা—কোপাই নদীতে জল নিচ্ছে, আর এদিকে ফুলমণির গাঁ—দূর থেকে দেখা যাচ্ছে

নদীর বুকের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা চলে' গেছে সোজা গাঁয়ের মধ্যে। নদীতীরের ঐ গাঁটাই 'মহিষাডাল'। ফাঁকা মাঠের মধ্যে, ঘন-সবুজ গাছের ঝোপই জানিয়ে দেয়—এটী গ্রাম, মানুষের বসতি আছে এখানে। সবুজ গাছের ঝোপের মাঝখান থেকে একটীমাত্র তালগাছ সোজা মাথা

গাঁ ঢুকতেই দুটি অশথ গাছ

উঁচু করে' দাঁড়িয়ে, যেন সারা গ্রামটীকে পাহারা দিচ্ছে—দূরকে নিশানা দিচ্ছে।

নদীর তরঙ্গে জল দেখে, নদীর বুকে নেমে পড়ার লোভ সামলানো দায়—গাড়ী থেকে নেমে পড়ে' নদীর বুকে চলে' ফিরে সারা দেহ-মন

দিয়ে যেন প্রভাতের পরম ক্ষণটী অনুভব করলাম। উনি ফোটো তুললেন।... নদী পার হ'য়ে, পা ধুয়ে, আবার গাড়ীতে চড়ে' বস্‌লাম। গাড়ী চ'ল্‌ল 'মহিষাডাল' গ্রামের মধ্যে দিয়ে।

গ্রামে প্রভাতের জাগরণের সাড়া প'ড়েছে—কেউ ঝাঁট দিচ্ছে, কেউ ঘরের ঝাঁপ খুলছে, কেউ খাটিয়া তুলে কাৎ করে রাখছে। মোরগরা ঘরের চালে—উঁচু গাছের ডালে চড়ে' কোঁকোরো—কোঁ—ওঁ

ফুলমণির মা, বাবা পাঁড়ুমাঝি, আর ছোট ভাই বাদল

করে ভোরের জানান্ দিচ্ছে—ছানাপোনা নিয়ে মুর্গী শূওর সব বেরিয়ে প'ড়ল। মেয়েরা কলসী মাথায় করে' কেউ জল নিয়ে ফির্‌ছে—কেউ জল আন্‌তে চ'ল্‌ল।

যারা জেগেছে বা ঘরের বা'র হ'য়েছে, তারা অধিকাংশই নারী। পুরুষরা সকলেই প্রায় তখন ঘরের মধ্যে। দু'একজন পুরুষ আমাদের গাড়ীর শব্দ পেয়ে কৌতূহলী হ'য়ে—মুড়িহুড়ি দিয়ে বেরিয়ে একটু দেখে

এদিকে সামিয়ানা খাটিয়ে আমাদের বসবার স্থান হ'য়েছে, ওদিকে বাদল দলবল জুটিয়ে আমাদের খাবার আয়োজন করছে

নিল। ছোট ছেলেমেয়েরা দু'একজন গাড়ীর পিছু পিছু কিছুদূর এল। ক্রমে গাড়ী গাঁ ছেড়ে এগিয়ে চ'ল্‌ল।

ধানকাটা হয়ে গেছে—সেই ফাঁকা ধূ ধূ জমীর মধ্যে দিয়ে রাস্তা—রেললাইনকে বরাবর বামে রেখে। দিগন্ত-প্রসারিত মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বাঁয়ে, রেললাইনের ওপারে তালতোড়ের 'কুঠীপাড়া' সাঁওতাল-পল্লীটি যেন ছবির মত। বড় বড় পুরনো গাছগুলি গ্রামটীর প্রাচীনত্বের সাক্ষী দিচ্ছে—সেই সঙ্গে পরিষ্কার লেপামোছা ঘরগুলি, সুন্দর ছাওয়ানো খড়ের চালগুলি, আশেপাশের সব্জী বাগানের সঙ্গে ফুলগাছগুলি গ্রামের অধিবাসীদের সাংসারিক স্বচ্ছলতা, পরিচ্ছন্ন রুচি ও ও সৌন্দর্য্যবোধেরও পরিচয় দিচ্ছে। সহজেই মন আকৃষ্ট হয়। বাদলকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—"হ্যাঁরে এখানে কি কোনও সাহেব কিংবা খ্রীষ্টান সাঁওতাল থাকে?"—কুঠীপাড়া নাম এবং গ্রামটীর গঠন পারিপাঠ্য দেখে, আমার কেমন মনে হ'ল—হয়তো কোনকালে কোন মিশনারী সাহেব এখানে ছিলেন কুঠী বানিয়ে, কোন খ্রীষ্টান মিশনারী

ফুলমণি রান্না করছে

আছেন। যার ফলে গ্রামটীর সংস্থান এত উন্নত ধরণের। সাঁওতালরা সাধারণতঃই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং তাদের গ্রামগুলি ভারী সুন্দর হয়—কিন্তু এটী যেন একটু বিশেষ ধরণের। বাদলা বল্লে—"না মা এক্ষণ তো কেউ সায়েব নাইকো—সে ভউৎ দিন আগে—যক্ষণ এই লাইন তোয়ের হছিল, তক্ষণ এথেনে একজনা লালমুখো গোরাসায়েব কুঠী বানিয়ে থাকতো; সেই তো পেথমে দুদ্‌কো থেকে সাঁওতালদেরকে এনে বসালেক—নাইনে কাজ কর্‌বার লেগে, না, কিসের লেগে।—তা'

গ্রাম পরিভ্রমণের সময় আমাদের পথ পরিদর্শক পাঁড়ুমাঝি ও আরো অনেকে এবং এদিকে খাটিয়ায় বসে দড়ি পাকাচ্ছে পাঁড়ুর প্রতিবেশী

পর সে সায়েব মর্‌য়ে গেল, না চল্যে গেল—কী হ'ল কে জানে—গাঁটো 'তালতোড়' বাবুদের হিস্যে গেল—এক্ষণ বাবুরা খাজনা ল্যায়।"...

এদিকে একটু এগিয়ে ডানদিকে এক গাঁ—যেমন নোংরা—তেম্‌নি হতশ্রী—ঠিক কুঠীপাড়ার বিপরীত। বাদলকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম—"হারে এটা কী গাঁ রে? এত নোংরা কেন? সাঁওতাল গাঁ তো এত

নোংরা দেখিনি।" বাদল বলে' উঠ্‌ল—"উঁই, উটো তো 'মলীপাড়া' বটে—সাঁওতালপাড়া হবে কেনে?—উ গাঁয়ে সব মুসহররা থাকে"—আমি ব'ল্‌লাম—"ও তাই বল।" উনি বল্‌লেন—"মুসোহর সে আবার কী"—

বাদল হেসে বললে—"বাবু তু মুসহর জেনিস্ না?" বলেই,বিজ্ঞের মত মুখ করে' ব'ল্‌লে—"মুসহর বলে তাদের, যাদের জমী-জীরেৎ গাই বলদ নাই, ঘর দুয়োর কপাট চৌকাট নাই, কাঁসা কাপড় থাকে না, দিনে ভিখ্ মেঙে বেড়ায়, রেতে চুরি করে।" উনি বল্‌লেন—"তা' তোরা ডেকে ডুকে কাজে লাগাস্ না কেন? খেটে খেতে পারে না?"

বাদল ব'ল্‌লে—"উঁই, উ মুসহর বটে, উরা কারু কথা শুন্‌বার লোক লয়—তা' ছাড়া উয়াদের নিত্যি রোগ, জ্বর, গায়ে খুঁচ্‌লি ঘা, কে কাজ দেবে? মলীপাড়ায় তো দুটো কুটে মুসহর আছে, একদম হাতের পায়ের আঙ্‌লখসা হঁয়্যে,—ইবে এক্ষণ বাবুরো বলা ক' করাতে কেউ কেউ বাঁশের ঝুড়ি কুলো বুন্‌তে লেগেছে।"—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে মলীপাড়া গ্রামও পেছিয়ে প'ড়ল। ঘরমুখো গরু বেশ জোরে চ'লেছে।......

গ্রামে মেয়েরা বাড়ির উঠোনে ধান মেলছে ওদিকে এক মা ও ছেলে বসে ভাত খাচ্ছে

প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ জনহীন। শুধু আমাদের গোযানখানি চলেছে এগিয়ে—তিনটী মাত্র আরোহী নিয়ে—আমরা দু'জন, আর আমাদের যানবাহনচালক প্রকৃতির শিশু বাদল। শিশুর মতই সরল হাসিভরা মুখ উৎসাহদীপ্ত অকুণ্ঠ চক্‌চকে কালো চোখ—কালো কোঁকড়া চুল—নিটোল স্বাস্থ্য পরিপুষ্ট দেহ, কুচ্‌কুচে কালো বরণ এই তরুণ সাঁওতাল বাদলের মনটী আনন্দের আলোয় পূর্ণ।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বামদিকে খুব অনেকখানি দূরে বেশ বড় একটী গ্রামের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হ'ল। বাদল অম্‌নি সেইদিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে' চেঁচিয়ে উঠল—"হাই, দপ্পনীলে"—

'দর্পণীলা' গ্রামের কথা অনেকদিন থেকেই গল্প শুনেছি। বোধ হয় 'দর্পণীলে' নামটার জন্যই স্মৃতিতে রয়ে গেছে, কিছু কৌতুহলও আছে। বাদল তখন মনের আনন্দে শুনিয়ে চ'ল্‌ল—দর্পণীলার বাবুদের কথা—ঠাকুরদালানের কথা—বাঁধানোঘাট—ভাঙা মন্দির—গোলক ডাক্তার—মদনের দোকান ইত্যাদি। সব কথা শুনে এবং দূর থেকে দেখেও অনুমান করা যায়—এককালে দর্প করার মত বৈভবশালিনী গ্রামই ছিল ওটা। এখনও তা'র বিগত-বৈভবের স্মৃতি 'দর্পণীলা' নামটুকু বহন করে' চ'লেছে—বিরাট আয়তনের মাঝে মজাপুকুর, ভাঙাঘাট, ভগ্ন দেউলের সঙ্গে সঙ্গে।......

বামদিকে রেললাইনের পারে একটী ছোট গ্রাম, দূরে সাম্‌নে কোপাই ষ্টেশন দেখা গেল। গ্রামটী দেখিয়ে বাদল ব'ল্‌লে—"হাই, শেওলপুর গাঁ"—আমি ব'ল্‌লাম—"তা' হ'লে তো এসে গেছি, তোদের গাঁ তো শীতলপুর—আমরা তো ওখানেই যাব"—বাদল ঘাড়নেড়ে—"না তা'

একটি বাড়ির বাইরের দৃশ্য—কতকগুলো শুওর গৃহস্বামীর ডাকে উচ্ছিষ্ট খেতে এসেছে

কেনে যাব—আমরা যাব শেওলপুর মাঝিপাড়া"—ব'লেই গরুর মুখ ফিরিয়ে পুবদিকে গাড়ী চালিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে—"হাই দেখ্ আমাদের গাঁ শেওলপুর বটে"—

দূর থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে ঘন সবুজ গাছ-ভরতি ছোট গ্রামটী যেন ছবি। উনি গাড়ীতে বসেই ফুলমণির গাঁ'র ছবি তুল্‌লেন। আমাদের গাড়ী দেখেই দু' একজন এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। বেশ সকাল হ'য়েছে। ঝিকমিকে রোদ। মেয়েরা আলের উপর দিয়ে

গ্রামের কুয়ো মেয়েরা জল নিচ্ছে—কুয়োটি কংগ্রেস কমিটি থেকে করিয়ে দিয়েছে। একটি স্ত্রীলোক জল নিতে যাচ্ছে ঐ কুয়ো থেকে

লাইন করে' খাট্‌তে চ'লেছে—পরিষ্কার করে' চুল আঁচড়ানো, কোমরে লাল গামছা বাঁধা—কেউ প'রেছে শাদা বাংলা শাড়ী—কা'রও পরণে রঙীণ সাঁওতালী কাপড়। ফুলমণিও রোজ এই ছয় মাইল রাস্তা হেঁটে আমাদের বাড়ী সকালে কাজে যায় সন্ধ্যায় ফিরে আসে।......

গ্রামে ঢুকতেই দুটী অশথ্‌গাছ—যেন গেট তৈরী করে' দাঁড়িয়ে

আছে। গাঁয়ের সাম্‌নে ঢুকবার মুখে ফুলমণিদের বাড়ী। অশথ্‌ গাছের তলা দিয়ে, বাঁশগাছের পাশ দিয়ে ঢুকেই আমড়া গাছ। আমড়া গাছটা ফুলে ভরে গেছে—পাশে ফুল-পাতাহীন রিক্ত কাঠচাঁপার গাছটী আসন্ন ফুলের আশায় আঁকা-বাঁকা ডালপালার হাত মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে আতাতলায় ঠাকুরতলা—পূজার বেদী। লম্বা চৌকো বেদী—সামনে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সিঁড়ির ধাপের মত করা—স্থানটী

গাঁ ঘুরে এসে গাছের ছায়ায় বসলাম—সামনে ছেলেরা খেলতে লাগলো

চমৎকার করে' নিকানো গোবর দিয়ে গোল করে'। তারই সামনে সমান চৌকো চাঁছাছোলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোবর দিয়ে নিকানো জায়গায় সামিয়ানা খাটিয়ে আমাদের জন্য জায়গা হ'য়েছে। খাটিয়া পেতে—তার উপর বাড়ীর বৌএর নিজ হাতে বোনা খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে, আমাদের বস্‌বার আসন করে' রেখেছে। নতুন উনুন পেতেছে—আমাদের জন্য সেইখানেই। বাতাস উঠ্‌ল—খাটিয়া কাৎ

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এক জায়গায় বসে জটলা করতে লাগলো

করে' তার উপর চাটাই আড়াল করে' বাতাস ঠেকিয়ে ফুলমণি আমাদের জন্য রান্না চড়িয়ে দিল। বাদল মহা উৎসাহে মুর্গী ছাড়াতে লেগে গেল—আমাদের খাওয়াবে। ফুলমণির মা বাবার আমাদের পেয়ে আনন্দ আর ধরে না—কী করবে—কী না করবে ভেবে পাচ্ছে না।

প্রথমেই ফুলমণি চা করে' দিল। চা পান করে' আমরা গাঁ ঘুরতে বেরোলাম। ফুলমণির বাবা পাঁড়ু মাঝি আমাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে চ'ল্‌ল—ও'র ব্যাগটা সগর্ব্বে কাঁধে ঝুলিয়ে।

বেশ সুন্দর ছায়া-শীতল গ্রাম এই শীতলপুর। প্রথমেই ফুলমণির বাড়ী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারিদিক—আশে পাশে কুলতলায় ছাগল আর শুওর চ'রছে। বাড়ী ঢুকতে সাম্‌নেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট সতেজ বলিষ্ঠ তিনটী তালগাছ—একজায়গা থেকে উঠে—রসগ্রহণের শিকড়টা একই স্থানে রেখে, যা'র পাতা মেলতে যতটুকু জায়গার দরকার ঠিক ততটুকু ব্যবধান রেখে—তিনটীতে একই আলোর উদ্দেশে আকাশের দিকে মাথা তুলে দিয়েছে! একটী বেশ বুড়ো, একটী মেজ, একটী ওর মধ্যে বেশ ছোট—যেন বাবা মা ও মেয়ে।

তালতলায় বাড়ীর উঠোনে ধানের 'পালুই' বাঁধা আছে, এখনও মাড়ানো হয়নি। ঘরে ঢুকতে আগে ঢাকা বারান্দা, একপাশে উনুন, একপাশে মুর্গীর সংসার, তারপর ঘরে ঢোকবার দরজা। মাটীর ঘর পরিপাটী করে' নিকানো, সুন্দর করে' ছাওয়া। কোন জানালা নেই-একটী মাত্র দোর—ঘরের ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার—ফুলমণি ঘরে ঢুকে

গাঁয়ের সর্দার কাঁধে ক'রে কালী ঠাকুর বয়ে নিয়ে আসছে, তারপর পুজোর জায়গায় বসানো হ'য়েছে মা কালীকে। দু'পাশে সর্দার আর সর্দারণী

দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে রাখা কেরোসিনের ডিপে জ্বেলে দিল। ঘরের ভিতর আধখানা মেজে জুড়ে ধান বাঁধা আছে—খড়ের দড়ী পাকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—তাকে ওরা 'বাখার' বলে।

ফুলমণি নিজেদের ঘর দেখিয়ে রান্না করতে চলে' গেল—আমরা পাশের বাড়ী গেলুম। পাঁড়ুর প্রতিবেশী নিজের উঠোনে খাটিয়ায় বসে' দড়ী পাকাচ্ছে—তাদের চালে প্রকাণ্ড লাউ। আঙিনায় বসে' মা ছেলে ভাত খাচ্ছে। মেয়েরা পায়ে করে' উঠোনে ধান মেলছে। প্রায় সব বাড়ীর উঠোনেই ধান মেলা। প্রত্যেক বাড়ীর উঠোন ঝরঝরে পরিষ্কার করে' নিকানো—আঙিনাতেই সব কাজকর্ম্ম। যা'র বাড়ীর উঠোনেই যাচ্ছি—সকলেই হাসিমুখে আদর আপ্যায়ন করছে—বসতে বলছে। ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে, লড়াই করছে, খেলছে—আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে—প্রতিবাড়ী থেকে দুই একটী ছেলেমেয়ে বৃদ্ধবৃদ্ধা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দলবৃদ্ধি করছে। প্রতি বাড়ীতেই মুর্গী, শুওর, গরু আছে। শুকররা বাড়ীর পিছনে থাকে, চরে' বেড়ায়—"বুবুই আয় আয় আয়"—করে ডাকলেই খেতে এল। কাঠের তৈরী চৌকো নৌকোর মত শুকরদের খাবার পাত্র—গৃহ-সংলগ্ন ছোট একটী ঘর শুকরদের জন্য—প্রায় সব বাড়ীতেই আছে।

গ্রামের একটু বাইরে ফাঁকা জায়গায় একটা পাঠশালা—'শ্রীনিকেতন' পল্লীউন্নয়ন কাজের ফলে এর সৃষ্টি, ছোট ছেলেমেয়েরা তাতে পড়ে। গ্রামের মধ্যে একজন লেখাপড়া জানা লোক আছে—সেই পড়ায়। গ্রামের সকলে তাকে পণ্ডিত বলে' ডাকে। পণ্ডিতের নাম 'ভড়' মাঝি। এই ভড়মাঝিই বোলপুর...শ্রীনিকেতন যাওয়া আসা করে, যোগাযোগ খবরাখবর রাখে। পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল না —সে তখন বোলপুর গেছে।

পণ্ডিতের বাড়ীর সামনে পাকা ইঁদারা—জিজ্ঞাসা করাতে ব'ল্লে— কংগ্রেসের লোক করে' দিয়েছে। ঐ কুয়োর জলই সারা গ্রামের লোকের পানীয়। পণ্ডিতের সব্জী বাগান বেশ বড়—ভাল কলার গাছও আছে। পণ্ডিতের বাড়ীর পিছনেই বড় গাছটার গায়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বিজ্ঞাপন লটকে দিয়ে গেছে—ধর্ম্মঘটের বাণী—"সাত ঘণ্টার বেশী কাজ ক'র না—ধর্ম্মঘট কর, ধান তোমাদের" ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করলুম—"এটা কে টাঙাল?" বললে—"জেনিনে কে কখন ঝুলিয়ে দেয়—বোধহয় রেতে করে"—

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ফেরার চিন্তা

গণেশমাঝি গাঁয়ের কবিরাজ। তার বাড়ী অর্থাৎ কবরেজ বাড়ীর উঠোনে শিবতলা—ত্রিশূলপোতা বেদী—সামনে বলি দেবার হাড়িকাঠ পোতা। প্রতি বাড়ীতেই পুজোর বেদী—ঠাকুরতলা আছে—বলি দেবার জায়গা শুধু কবরেজবাড়ীতেই দেখলাম। গ্রামবাসীর অসুখ বিসুখে সেই জড়ী বড়ী শিকড় পাতা দেয়—চিকিৎসা করে—ঝাড়, ফুঁক, মন্ত্র, তেলপড়া, ধুলোপড়াও দেয়।

গ্রামের সর্দারের নাম 'ভাতম' মাঝি। সর্দারএর অবস্থা বেশ ভাল। সর্দার বেশ লম্বা জোয়ান। সর্দারণীরও বেশ জাঁদরেল চেহারা। তারা লোকজন নিয়ে কালীপ্রতিমা আন্তে গেল—রেললাইনের ওপারে শীতলপুর গাঁয়ে। প্রতিমা এনে বসাবে বলে' উঠোনে ঠাকুরতলায় একটা ছোট কুঁড়ে তৈরী ক'রেছে—কাঁচাবাঁশ, ডালপাতা দিয়ে।

গ্রামে ঢুকেই ফুলমণির বাড়ী—গ্রামের শেষপ্রান্তে কুসুমের বাড়ী। কুসুমের বাড়ীর পরে একেবারে প্রান্তসীমায় একটা বটগাছ—এইটাই গাঁয়ের শেষ। কুসুমের মা দেখলাম ঘরের দাওয়ায় কোপটালো কাঁসার বাটীতে ভাত খাচ্ছে। দাওয়ার নীচু ভিতের উপর একটা কুকুরবাচ্চা বাঁধা একটু লোহার তার এবং দড়ী দিয়ে—লোলুপ দৃষ্টিতে ভাতের দিকে তাকিয়ে কুঁ কুঁ করছে! চালে বেশ বড় বড় লাউ। বাড়ীর পিছনে গাঁয়ের শেষে উত্তর দিকে—ঝোপ ঝোপ ফুলগাছ—সুন্দর মধুর গন্ধবিশিষ্ট শাদা ফুল থোকা থোকা ফুটেছে। দেখতে কতকটা 'ভাণ্ডীরা' ফুলের মত। কন্যার জন্য ফুল তুলে নিলুম—ওঁর কথামত দু'টো ডাল কেটে নিলুম বাড়ীতে গাছ ক'রব বলে'।

ফির্বার পথে রাসমণিদের বাড়ী গেলুম। রাসমণির বাড়ী ঠাকুর-তলায় দুটী পাথর বসানো। পাগলমাঝির বাড়ীটা বেশ বড়—দেখে মনে হয় অবস্থা ভাল। দাসীদের বাড়ীর উঠোনে বেশ পুরনো কাঁঠালগাছ ও অশত্থগাছ। গাঁ ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে গাছের ছায়ায় বস্‌লাম। ছেলেরা সামনে খেল্‌তে লাগল। উনি সামনে ফোটো তুলে চ'লেছেন। আমায় ঘিরে ব'স্‌ল শিশুরা—সকলেই খুব খুসী।

গ্রাম ঘুরে, ফিরে এসে দেখি—ততক্ষণে ফুলমণির আলুচচ্চড়ি, বাঁধাকপির তরকারী রান্না হ'য়ে গেছে, মুর্গী ছাড়িয়ে, কুটে রান্নার জন্য প্রস্তুত! ডেক্‌চীতে গরমজল ব'সেছে। প্রতিটী জিনিষ ফুলমণি রেঁধে

ফুলমণির আর এক ভাই মদন এই সময় বৌএর মাথায় বোঝা চাপিয়ে হাট ক'রে ফিরলো। ভামিনী ছোট ভাইকে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো আমাদের

বাটীতে ঢেলে ঢাকা দিচ্ছে। কাঁসার বাসনগুলি ঝক্ ঝক্ ক'রছে। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

গ্রামে দু'টী কালীপূজা হয়। একটী সর্দার ভাতম মাঝির বাড়ী—আর একটী ফুলমণির বাবা পাড়ু মাঝির বাড়ী। সর্দারের কালী আগে এল। বাড়ীর লোকেরা মাথায় কোমরে লাল গামছা বেঁধে, মাকে কাঁধে করে' নিয়ে এল। সর্দার গৃহিণী হাতে চালচিত্র বহন করে' আন্‌ল। উনি সর্দার সর্দারণীর ছবি তুল্‌লেন মা কালীকে নিয়ে।...

ফুলমণির দাদা মদন এল হাট করে'—বৌ এর মাথায় বোঝা—ঝুড়িতে হাটের জিনিষ, তেলের বোতল ইত্যাদি—মদন মাঝি এল খালিমাথায় খালি হাত পা নেড়ে। আমাদের দেখে খুব খুসী—নিজেদের এই রোদে পাঁচক্রোশ পথ হাঁটার ক্লান্তি ভুলে গেল নিমেষে।

ফুলমণির ঐকান্তিক নিষ্ঠা আন্তরিক যত্নে রান্না হ'ল যেন অমৃত। খাটিয়ায় উঠে ব'সলাম—মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর।...এইবার যেতে হবে—একথাটা যতই ভাবছি মনে হ'চ্ছে—এদের অন্তরভরা সরল-প্রীতি ততই নিবিড় করে' টেনে রাখ্‌ছে।...

বেলা আড়াইটার পর গাঁ থেকে রওনা হ'লুম—আর দেরী ক'র্‌লে আমাদের পৌঁছে দিয়ে—বাদলের ফিরতে অনেক রাত হ'য়ে যাবে। সকলেই সনির্বন্ধ অনুরোধ ক'র্‌লে—"আজকের রাতটো থেকে যা,—পুজো দেখে ঘর যাবি"—কিন্তু বাড়ীতে মেয়ে একা আছে। বাঁধন ছিঁড়ে বেরোতেই হ'ল—গাঁয়ের অর্ধেকের উপর লোক এসে গাড়ীর কাছে জড় হ'ল। সকলেরই মুখে এক কথা—"আবার আসিস্, আবার আসিস্"—তারা বেশী কথা বলে না—প্রকাশের ভাষা জানে না।...

শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল ফুলমণির বোনঝি ভাবিনী ছোটভাইটাকে কোলে নিয়ে—যতক্ষণ দেখা যায়।......

আমাদের বাড়ীর উঠোনে ফুলমণির গাঁয়ের ফুল ফুটেছে—মধুর স্মৃতির সুরভি নিয়ে।—দেখি, ভাবি,—আজও পরশ পাই সেই আন্তরিক প্রীতির—শুনতে পাই সেই গুঞ্জরণ "আবার আসিস্—আবার আসিস্"—

শরৎ-শ্রী

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

শারদ রাতি আজি আলোতে ঝলমল
চাঁদের হাসিখানি রূপালী ছল ছল,
শেফালী সুবাসেতে
বনানী পথে যেতে,
কাহারি স্নেহাশীষে হৃদয় ভরে বল
সোনালী স্রোতে ভাসে তটিনী ঢল ঢল।
সাহানা-গীতিসুর আকাশে ভেসে চলে
দখিন হাওয়া কানে কত কি কথা বলে
শ্যামল অঞ্চল
বাতাসে চঞ্চল
কাহারি দোলে বল ধানের শ্যাম ক্ষেতে
শারদ-শ্রী সে যে কবির মানসেতে
বনানী মুখরিত দোয়েলা-গীতি-তানে,
শ্যামারি মধুশীষে ছন্দো জাগো প্রাণে;
জোনাকি ঝাঁকে ঝাঁকে
জানি না কি যে আঁকে
যেখানে আলো-ছায়া অথবা বায়ু পথে,
শারদ-রাণী আসে আলোক জয়রথে।
আজি এ মধুরাতে শারদ জোছনাতে
কালিমা যত আছে মনের আঙিনাতে,
সকলি মুছে যাক
কেবলি ভরে যাক্‌,
মনের মন্দিরে আলোক শতদল,
চাঁদের হাসি ঝরে রূপালী ছল ছল।

শারদ ইঙ্গিত

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

হেথায় হোথায় নীল আকাশ
ধূসর মেঘের দল?
আজ শরতের দুপুর বেলা
মন করে চঞ্চল।
গুমট ভরা ঘরের কোনে
রইব না সংগোপনে
বাহির হলে পল্লী পথে
নামতে পারে জল!

ভিজায় ভিজাক আকাশ ভরা
ঝর্‌ণা ঝরা জল।
ধূসর মেঘের দল।
মেঘের ফাঁকে প্রখর তর
রবির কিরণ শর!
হানছে দেহে তপন তাপে—
প্রাণ আজি জর্‌জর্‌!

পথের পাশে গাছের ছায়া,
বাতাস বুকে বিলায় মায়া,—
ফুটবে কি আজ শারদ শোভার
শিউলী শতদল!
ঝরণ নামায় স্বপন আমার
নাচায় হিয়ার তল।
ধূসর মেঘের দল।

সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি

আমরা এই সঙ্গে কয়েকজন স্বর্গত প্রখ্যাতনামা সাহিত্য-রথীর হস্তলিপি প্রকাশ করিলাম।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের একখানি ইংরাজি পত্র (১নং ও ২নং) সহজেই পাঠ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র দুখানি (৩নং ও ৪নং) ব্যক্তিগত হইলেও একখানির শেষে তাঁহার স্বভাবসুলভ রসিকতা আছে। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের (৫নং) পত্রখানিও ব্যক্তিগত —প্রিয় ভক্ত ও শিষ্য অবিনাশবাবুকে লিখিত। দ্বিজেন্দ্র-লাল রায় মহাশয়ের পত্রখানি (৬নং ও ৭নং) উল্লেখযোগ্য —তাঁহার জীবনের শেষভাগে লিখিত। শেষ পত্রখানি (৮নং ও ৯নং) কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত। পুস্তক বিক্রয় সম্বন্ধে নির্দ্দেশ আছে। আমরা কয়খানি পত্রই শ্রীযুত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাইয়াছি—মূল পত্রগুলির ফটো লইয়া তাহা হইতে ব্লক করা হইল। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের হস্তলিপি সংগ্রহ করার আগ্রহ অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। এই সকল পত্র-লেখকের লিপি সংগ্রহ আর সম্ভব নহে—সেজন্যই এগুলি সাধারণের কাছে মনোজ্ঞ হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

My dear Sir,
I don't know who the author of this address is; but I fear, its English will subject him Com: some ridicule. It is not altogether chaste or idiomatic. However, you fellows are the best judges of that.
The paper was taken to the Public Library by mistake in

ফটো নং ১

the part of my servant perhaps
Yours &c Sir
[illegible]

ফটো নং ২

ফটো নং ৩

ফটো নং ৬

ফটো নং ৪

ফটো নং ৭

ফটো নং ৫

ফটো নং ৮

ফটো নং ৯

মুলতান—তেতালা

(বাঙ্গলা খ্যাল)

তোমার চরণ সবে নিত্য করিছে ধ্যান
হে মঙ্গলময় দুখ হ'তে কর ত্রাণ।
তব রূপের জ্যোতি দশদিশি আলো করে
মধুর মুরলী স্বরে উঠিছে লহরী তান॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

০   ১   ২   ৩
ন্া সা জ্ঞা দসা | পা পা পা পা | জ্ঞক্ষা পদা পা দনা | জ্ঞা ঋা সা -া
তো মা র্ চ র ণ স বে নি ০ ০ ০ ত্য ক রি ছে ধ্যা ন্

০   ১   ২   ৩
জ্ঞা দনা পনা র্সঋ্া | র্সা না দা পা | পা ক্ষা জ্ঞা দনা | জ্ঞা ঋা সা -া II
হে ০ ম ০ ০ ০ ঙ্গ ল ম য় দু খ হ তে ক র ত্রা ণ

০   ১   ২   ৩
জ্ঞা ক্ষা পা না | না না -া না | র্সা র্সা র্সা র্সা | ঋ্া র্সনা র্সা র্সা
ত ব রূ পে র জ্যো ০ তি দ শ দি শি আ লো ০ ক রে

০   ১   ২   ৩
পা না র্সা জ্ঞ্া | ঋর্সা না দা পা | পা ক্ষা জ্ঞা ক্ষা | জ্ঞা ঋা সা -া II
ম ধু র মু র ০ লী স্ব রে উ ঠি ছে ল হ রী তা ন্

১। তান—

২				৩				০				১			
সনা	-া	সহ্মা	জ্ঞা	পা	পা	দনা	পা	-া	হ্মদা	পপা	-া	হ্মা	জ্ঞা	-া	-া
তো॰	॰	মা॰	॰	॰	র	চ	র	॰	ণ॰॰॰	॰	॰	॰	॰	॰	॰

২				৩				০				১			
সহ্মা	জ্ঞা	পা	-া	জ্ঞহ্ম	পনা	-া	দপা	পা	জ্ঞা	-া	-া	হ্মা	দা	পা	-া
স॰ ॰	বে	॰	নি-	---	-	ত্য-	-	-	-	-	-	ক	রি	ছে	॰

২				৩			
জ্ঞহ্মা	পনা	র্সনা	দপা	হ্মজ্ঞা	ঋসা	নসা	-া I
ধ্যা॰	--	---	--	---	--	॰ন্	॰

	২				৩				০				১			
২।	পহ্মা	জ্ঞহ্মা	পনা	-া	র্সর্জ্ঞা	র্ঋা	র্সা	-া	র্সা	র্ঋা	র্সা	-া	না	দা	পপা	-া
	নি॰	॰॰	॰॰	-	ত্য-	-	-	-	ক	রি	ছে	॰	-	-	--	-

২				৩			
জ্ঞহ্মা	পনা	-া	-া	দপা	হ্মজ্ঞা	ঋসা	-া II
ধ্যা-	--	-.	-	--	--	--	ন্

৩। অন্তরার তান্—'তব রূপের জ্যোতি' গাহিয়া—

	২				৩			
১।	পহ্মা	জ্ঞহ্মা	পা	না	র্সর্জ্ঞা	র্ঋা	র্সা	-া
	জ্যো-	--	-	-	তি-	-	-	-

	২				৩			
২।	নর্সা	র্জ্ঞা	র্ঋর্সা	নদা	পহ্মা	জ্ঞঋা	সনা	-া
	জ্যো-	-	তি-	--	--	--	--	-

গান

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

আজি বিদায় দিনে ভীরু মিনতি খানি
যেন তোমারি দ্বারে কহে ব্যথার বাণী ;
তব নিবিড় সুখে
যদি গোপন বুকে
বাজে আমারি গীতি গেয়ো স্মরণ মানি।

যদি চলিতে পথে কভু মাধবি বনে
ভুলে চমকি চাহ মোর সমাধি ক্ষণে
তবে দাঁড়ায়ে বারে
দিও পরশ তারে
নিও প্রেমের পূজা মোরে স্বপনে আনি।

বাঁধন

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

…সঙ্গীতজ্ঞ দেবকণ্ঠ প্রথমে আপত্তি তোলে, কিন্তু অমিয়ার কথাতে বাধ্য হয়েই মত দিতে হয়! বহুকালের পুরোনো বংশ ওই রায়চৌধুরীদের। এ অঞ্চলের মধ্যে এককালে ওরাই ছিল সব চেয়ে প্রতাপশালী জমিদার,…পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অসীম ধন সবকিছু নিঃশেষ হয়ে এসেছিল তাদের বংশ পরম্পরার উচ্ছৃ‌ঙ্খলতায়…এমন কি কত নিরপরাধ নরনারীর রক্ত ওই পুরোনো ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদের ভিত্তিমূল রঙীণ করে দিয়েছিল তার ইয়ত্তা নাই। আজ তার চারিদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। বাকী খাজনায়—দেনার দায়ে যা কিছু ছিল আদালত হতে নীলাম হয়ে যাচ্ছে! অমিয়া কিনবে ওদের সেকালের দামী দামী আসবাব—অনেক সস্তায় পাওয়া যাবে, কেনই বা কিনবে না!…বাধ্য হয়েই শেষে মত দিতে হয়েছে দেবকণ্ঠকে!

নতুন করে সংসার সাজাতে চায় অমিয়া! দেবকণ্ঠ শিল্পী-গুণী বাইরের জীবনেই তার আকর্ষণ বেশী, ঘরে যেটুকু সময় থাকে নিজের সাধনা নিয়ে মত্ত থাকে!…আপন করে তাকে কাছে পাবার মত একটুও সময় অমিয়া পায় না! না পাক্…তবু তার গৌরব…দেশজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি তার স্বামী! নারীর সমস্ত কামনা বাসনাকে চেপে রেখেও সে আত্মহারা শিল্পীকে সুখী করতে চায়—সেবা দিয়ে—যত্ন দিয়ে। বান্ধবীরা বলে—তুই তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিস অমিয়া!…

হাসে অমিয়া!

নীড় সে বেঁধেছে…নীড়কে সে স্বপ্ন দিয়ে ঘিরে রাখতে চায়!

…তাদের ঘরের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বেড়ে উঠেছে। —পুরোণো মেহগ্নি কাঠের বড় পালঙ্কটা শোবার ঘরেই তুল্য!…বহুকালের কত স্মৃতিজড়িত আছে ওর সঙ্গে কে জানে! কতজনের তৃপ্তি অতৃপ্তির আশা নিরাশা ওর প্রতিটি অন্ধি-সন্ধিতে মাখান কে তার হিসাব রাখে!…আয়না বসানো কাঠের উপর নিপুণ হাতের জাফরি কাটা দেরাজটার দিকে চেয়ে যেন আত্মহারা হয়ে যায় অমিয়া! অনেক সস্তায় পেয়েছে সমস্ত আসবাব!…আজ দেবকণ্ঠকে চমকে দেবে সে! এক রাত্রের মধ্যে সারা বাড়ীটার রূপ যেন বদলে গেছে!…

…বর্ষার রাত্রি! দেবকণ্ঠ বাইরে থেকে ফিরে বাড়ীতে পা দিয়েই একটু বিস্মিত হয়ে যায়!…আকাশে আকাশে শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ…বিজলীর চকিত আলোয় সারা আকাশের কালো বুকে যেন কোন অশরীরীর আনাগোনা! …অমিয়া এগিয়ে আসে…দুচোখে তার আশা—আনন্দের আলো!

…কেমন হয়েছে বাড়ীখানা বলত? মোটে দুহাজার টাকায় সব হয়ে গেছে। পালঙ্ক…ওই চীনা দেরাজ…! ঝাড়—

সমস্ত ঘরগুলো দেখিয়ে নিয়ে বেড়ায় অমিয়া দেবকণ্ঠকে! বহুকালের স্মৃতি-ভারাক্রান্ত আসবাবগুলো… অতীতকালের কোন সামন্ততান্ত্রিক যুগের এক শুব্ধ স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলেছে! দেবকণ্ঠের অতীন্দ্রিয় মনে যেন পরশ বুলায়!

রাত্রি নেমে এসেছে! ঘন ঘোর রাত্রির তমসা গ্রাস করেছে সারা ধরিত্রীকে। আকাশে বর্ষণধারার ক্রুদ্ধ গর্জন!…বিজলীর তীব্র ঝলক…দিক হতে দিগন্ত জুড়ে কোন স্মৃতির দশন হেনে দিয়ে যায় অতীতের ঘনতমিস্রার বুকে!…

দেবকণ্ঠ জেগে ওঠে!…বিছানার উপর উঠে বসে!… অন্ধকারে অনুভব করে ঝাড় লণ্ঠনটা দুলছে…কাঁচের ঘসাঘসিতে আওয়াজ হচ্ছে ঠুং ঠাং!…বাইরে বর্ষণ ধ্বনির মুখর সুররেশ!…ধীরে ধীরে অস্পষ্ট একটু সুর যেন ফুটে উঠছে! …বিস্মিত হয়ে ওঠে দেবকণ্ঠ!…বেহাগের করুণ সুর কে আলাপ করে তার বাড়ীর আশে পাশে!…চারিদিকে বর্ষার বরিষণ…প্রকাণ্ড বাগানঘেরা বাড়ীর মধ্যে কার এ সুর!… ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে সে!…

হল বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলে সামনে…গানের সুরটা তখনও শোনা যায়…! এ মিষ্টি কণ্ঠে কার আলাপ!…

কেমন যেন সারা মনে একটা শিহরণ জাগায়!…এ সুর যেন তার চেনা…চেনা এ কণ্ঠস্বর!…

নীচের সিঁড়িতে কাকে দেখে যেন চমকে ওঠে দেবকণ্ঠ! বিদ্যুতের এক ঝলক আলোয় দেখে এক-জন নারী…এগিয়ে চলেছে…গানটা সেই গাইছে!… এগিয়ে যায় সে সেইদিকে!…

কিন্তু ধরতে পারলেনা, তাকে! নারীমূর্ত্তি সামনের হলঘরটায় ঢুকে গেল!…পিছু পিছু সেও গেল!…কোন অশরীরী আত্মার আকর্ষণ যেন তাকে দুর্বার গতিতে টেনে নিয়ে চলেছে হলের মধ্যে!…অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে ঢুকেই কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে যায় দেবকণ্ঠ! কার শাড়ীর খস খস শব্দ তখনও যেন শুনতে পায় সে! অন্ধকারে দেশলাই জ্বালতেই…দেখতে পায় দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি নারী। অস্পষ্ট আলোকে তার মুখের হাসিটুকু দেখতে পায়, আর দেখতে পায় তার চোখের কোণে সেই হাসিরই রেশ…

এগিয়ে যায় দেবকণ্ঠ…ডাকে কিন্তু কোন সাড়া নেই!… দেশলাই নিভে এসেছে।

আবার জ্বালে একটা…মেয়েটি তখনও সেইখানে! দেবকণ্ঠের সারা শরীরে একটা শিহরণ জাগে। আকাশে বিদ্যুতের ঝলক!…প্রতিটি তন্ত্রাতে যেন উষ্ণ রক্তপ্রবাহ! এগিয়ে যায় আরো সে!…

…চমকে ওঠে…দেবকণ্ঠ!…বুঝতে পারে না কোথায় সে এসেছে!…যেন কোন এক অজানা জগতের পথে চলেছে সে!…হাত বাড়ায়…কিন্তু একি!…কোথায় গেল সেই নারী!…

…মসৃণ শীতল স্পর্শ!…অন্ধকারে অনুভব করে দেবকণ্ঠ, …একটা ছবি!…

ললাটে ফুটে উঠেছে তার স্বেদবিন্দু!…সুরটা মিশিয়ে গেছে!…আকাশে বজ্র নির্ঘোষ!…কুটিল ফণিনীর মত এঁকে বেঁকে দেখা দেয় কালো দিগন্ত চিরে বিজলীর আভা!

…পা দুটো থর থর করে কাঁপছে দেবকণ্ঠের! চোখের সামনে কেমন যেন আঁধারের যবনিকা!…দুহাত দিয়ে একটা কিছু অবলম্বন ধরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়!…

সকাল হয়!…পররাত্রির দুর্যোগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ফুটে উঠেছে দিনের আলো! দেবকণ্ঠ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে কালকের রাত্রির ঘটনাটা!…ঠিক বুঝতে পারে না সে স্বপ্ন দেখছিল কিনা!…তবু মনে যেন কেমন একটা জড়তার ছায়া!…

চা নিয়ে আসে অমিয়া! এই সময়টুকু তাদের জীবনের একটা মধুর ক্ষণ…অমিয়াকে আজ আদর করে না দেবকণ্ঠ!…বিস্মিত হয়ে যায় অমিয়াও! হয়ত বা শরীর খারাপ!…

রোজকার সমস্ত কাজের রীতির একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে আজ অমিয়া! সকালে রেওয়াজ করতে বসত, আজ …আর তা করে না!…ঘরের দরজাটা বন্ধ করে একাই বসে রইল দেবকণ্ঠ!…সারা দিনে গান আর সে গায় না!… কি যেন একটা চিন্তায় মগ্ন সে…দূর হতে দেখে অমিয়া।

…রাত্রি ঘনিয়ে আসে…অন্ধকার গ্রাস করে দিনের আলো!…সারা বাড়ীখানাকে ঘিরে নেমে আসে কি যেন স্বপ্নপুরীর নীরবতা…চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ!…নিশ্চল হয়ে বসে আছে দেবকণ্ঠ!…অমিয়ার অসহ্য হয়ে ওঠে এই স্তব্ধ নির্বাক পরিবেশ!…

এক ফালি চাঁদের আলো স্তিমিত পাণ্ডুর হয়ে সামনের গাছটার ফাঁকে চেয়ে থাকে বাড়ীটার দিকে!…দেবকণ্ঠের মনে হয় কার যেন করুণ কাতর চাহনি। জেগে বসে থাকে সে!…এক প্রহর…দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে যায়—কোনো সাড়া নাই! আজ কি আসবে না সেই নারী…! অমিয়া ঘনঘুমে আচ্ছন্ন? ধীরে ধীরে বার হয়ে আসে দেবকণ্ঠ!…

…আবার শিহর জাগে আকাশের বুকে। গাছের মাথায় রাতের দিকহারা বাতাস আনাগোনা করে যায়…নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যে আজ দেবকণ্ঠ আলাপ করে বেহাগ!…সুরের রেশটা সারা ঘরের অন্ত প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে…হঠাৎ চোখ তুলতে সামনে দেখে সেই নারীমূর্ত্তি! মুখে তার মৃদু হাসি…থেমে যায় দেবকণ্ঠ!

—"কে তুমি?"

কোন কথা নেই, নীরবে চেয়ে থাকে মেয়েটি ব্যাকুল ব্যথা ভরা চাহনি নিয়ে!…চোখে তার ব্যাকুল আশার আলো!…

…ওকে চেনে না দেবকণ্ঠ, কে ও—কেনই বা নিশীথ রাত্রে তার এই অভিসার?

অথচ মনের মধ্যে প্রবল আলোড়ন জাগে, মনে হয় কোন অতীত এক রাত্রে ওকে স্বপ্ন দেখত—ওর মুখের ওই হাসি, চোখের ওই ব্যাকুল চাহনি যেন চেনা!…ও যেন আত্মার আত্মীয়!…সারা মনের অতল প্রদেশে ব্যাকুলভাবে হাতড়াতে থাকে দেবকণ্ঠ!…এগিয়ে যায় তার দিকে!… মেয়েটি ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে…"স্পর্শ করোনা আমায়! শুধু দূর হতে কথা বল…!"

…সবটাই যেন একটা স্বপ্ন! বলে চলেছে মেয়েটি!…

…সে বন্দী হয়ে রয়েছে ওই ছবির মধ্যে!…আর বন্দী করে রেখেছে এই দেবকণ্ঠই! অতীতের যবনিকার অন্তরালে কোন ফেলে-আসা জীবনে দেবকণ্ঠ ছিল শিল্পী!…ছবি তুলির আঁচড়ে আনত জীবনের স্পন্দন…ওছবি তারই আঁকা!…

সারা মনের চিন্তায় ব্যাকুল কামনা ভালোবাসার সঞ্চয় দিয়ে এক ভাস্কর এঁকেছিল তার ছবি…প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল ওই মূর্ত্তির সেই শিল্পীর অন্তরের সাধনায় আজ তাই ব্যাকুল অন্তরের কামনা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ওর আত্মা…ও বন্ধন হতে ওর মুক্তি হয় নাই, বৎসর গেছে—যুগ গেছে—এসেছে জন্মান্তর, তবুও বিদেহী আত্মা ওই কারাগারে বন্দী হয়ে ব্যাকুলভাবে কার পথ চেয়ে রয়েছে!

…বলে ওঠে দেবকণ্ঠ…আমি মুক্তি দেব তোমায়!…

…উত্তর দেয় আশা…এত বৎসর—জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমাকে খুঁজেছি!…সেদিনের না-বলা কথা বলবার সময় পেয়েছি—আজ তুমি আমায় ত্যাগ করে যাবে?…

…ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে দেবকণ্ঠ…না না, তা হতে পারে না! অশরীরী…এজগতের মানুষের সঙ্গে তোমার কোন যোগাযোগ থাকতে পারে না! তুমি…তুমি… আমার কেউ নও! তোমায় আমি চিনিনা!…

…চলে যেতে চায় দেবকণ্ঠ!…এ কি সে বকে চলেছে!…কই তার আশেপাশে কেউ ত নাই!…সারা শরীরে জাগে একটা চাঞ্চল্য! শিরায় শিরায় চঞ্চল রক্ত-স্রোত দ্রুতবেগে বয়ে যায়…সামনে কার যেন ব্যাকুল কাতর চাহনি মাখা দুচোখ…সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে সে!…

…হঠাৎ কি হয়ে যায় টের পায় না!…পাটা সিঁড়ির একটা ধাপ উপরে কেমন যেন ফসকে যায়…সিড়ি হতে গড়িয়ে পড়ে যায় তার অচেতন দেহটা!…চীৎকার শুনে ছুটে আসে অমিয়া—চাকরটা বার হয়ে আসে! কোনরকমে দেবকণ্ঠের অচেতন দেহটা তুলে নিয়ে যায়!

আগ্রায় আশাবাঈএর নাম জানেনা এমন লোক কেউ নাই!…সারা সহরে তার নাম, দেশবিদেশ হতে আসে ধনী সম্ভ্রান্তশালী জনতা তার মুজরো শুনতে!… রূপ এবং সুর দুটোরই সমান আকর্ষণ!

…ভাস্করের সঙ্গে সম্বন্ধ তার বহুদিনের, অসামান্যা রূপ-যৌবনা ওই নারী সামান্যতম একজন শিল্পীকে যে কোন আকর্ষণে ভালোবাসতে পারে, সারা সহরে এও একটা আলোচনার বিষয়।

যমুনার ধারে তাজগঞ্জের পিছনে ছোট একটা বাংলা, চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছে ক্যাকুটানের অযত্ন বর্দ্ধিত বনে: ছোট্ট ছোট্ট বাঁশ বনের ঝোপ…মৃত কঠিন রাস্তার ধারে মাথা তুলেছে! টাঙ্গাটা এগিয়ে আসে!… দূরে দেখা দেয় তাজের মিনার-মধ্যকার বিশাল শ্বেত গম্বুজ…চাঁদের আলোয় স্বপ্নপুরীর পরিবেশ রচনা করেছে।

…ভাস্করকে পৌছে দিতে আসছে আশাবাঈ!

…মনে পড়ে আজ প্রথম যেদিন পরিচয় হয় ভাস্করের সঙ্গে। আশা সেদিন জয়পুরের মহারাজার ওখানে মুজরো করতে গেছে দরবারে। রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, বেহাগ আলাপ করছে আশাবাঈ…স্তব্ধ দরবার…রাজা নিজের হাতে তুলে দেন আশাবাঈকে মুক্তোর একছড়া মালা। এক কোণে উপবিষ্ট মুগ্ধ ভাস্করের সারা মনে কোন এক সুরের মায়াজাল বিস্তার করে!

সে রাত্রে ঘুমুতে পারে না ভাস্কর,…যা সে পেয়েছে ক্ষণিকের পরশনে, তাকে ব্যর্থ হতে দিতে চায় না…তুলির আঁচড়ে…অমর করে তুলবে!

পাহাড়ে ঘেরা জয়পুর…দিগন্ত জোড়া পর্ব্বতের মাঝে রাজকন্যার মত একটুকরো সুন্দর এক নগরী, প্রাসাদের ঝুলবারান্দা দিয়ে চেয়ে থাকে উদাস দৃষ্টিতে আশাবাঈ… কার ডাকে ফিরে চাইল, কে একজন দেখা করতে চায় তার সঙ্গে!

…চেয়ে থাকে তার দিকে আশাবাঈ…সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, চোখের তারায় কোন অনাগত লোকের জ্যোতি,

ছবিখানা এগিয়ে দেয় ভাস্কর,…বেহাগের বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় রূপ…বর্ণ এবং ভাবের অবমিশ্রণে কোন এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে, যা আশাবাঈএর আলাপেও সৃষ্টি হয় না সবসময়! বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আশা তার দিকে!

সেই তাদের প্রথম পরিচয়ের ইতিহাস…ভাস্কর এসেছে আগ্রায়, তাজগঞ্জের নির্জ্জন পরিবেশে…অতীত যুগের স্মৃতিভারাক্রান্ত প্রেমরাজ্য তাজমহলের সীমানার বাইরে গড়ে তুলেছে তার স্বপ্নময় পরিবেশ…শিল্পীর মনোরাজ্য!…

…রাত্রি নামে তাজগঞ্জের আকাশে…দেশবিদেশ হতে আগত দর্শকের ভিড় কমে আসে! দরজা বন্ধ হয়ে যায় সাধারণের জন্য। একান্তে চত্বরের বুকে সেকালের বৃদ্ধ বট অশথের প্রহরা কোন অতীত যুগ হতে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাঁদের আলোর স্বপ্নজাল বুনে… এমনি সময় প্রায় রোজই আসে ভাস্কর,…আসে আশাবাঈ! প্রতিটি মধ্যরাত্রে নির্জন তাজের বুকে মর্মর স্বপ্ন দেখে কোন প্রণয়ীর…অতীতের কোন মধুযামিনীর।

…আশাবাঈএর সারা মনে জাগে কোন অমরাকুসুম সৌরভ, যমুনার জল-কল্লোল তার বেহাগের সুরে সুর মিলায়, সুর মিলায় বৃদ্ধ বনঝাউএর বুকে রাতের দিকহারা বাতাস, যমুনার নীলধারার ওপারে হরিণ যূথের কালো চোখে জাগে স্বপ্নের নেশা।

…ভোর হয়ে আসে…ভাস্কর ফিরে যায় তার শিল্পরাজ্যে…আশাবাঈএর টাঙ্গা…দেওদার শ্রেণীর প্রহরা-ঘেরা মসৃণ রাস্তা দিয়ে রাতের ডুবন্ত চাঁদের সঙ্গে কে হাতছানি দিয়ে নিয়ে যায় কেরলবাগের পানে!…

বাকীরাতটুকু কাটে ভাস্করের আকাশের পানে চেয়ে… ওমনি কোন চাঁদের মায়ায় সে বদ্ধ হয়ে গেছে যেন। সারা মনে একটা আলোড়ন, শিল্পকে সে ত্যাগই করেছে নিজের মনের এবং দেহের আকর্ষণে। মনে পড়ে আগেকার দিনগুলোর কথা, জয়পুরের দরবারের শিল্পী…ভাস্কর… মনের অন্ধিসন্ধিতে জগতের বুকে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যাবার কত না দৃঢ় কল্পনা। তার মৃত্যুর পর সে নিঃশেষ হয়ে যাবে না—পিছনে থাকবে তার শিল্প, তাকে অমর করে তুলবে! কিন্তু কি থাকবে তার পিছনে?…

আলেয়ার মত রোজই রাত্রে আসে এই আকর্ষণ, সে পথ হারিয়ে ফেলে।

আশাবাঈএর উছল যৌবন, অপরূপ কণ্ঠমাধুর্য্য সারা আগ্রার একটা আকর্ষণের বস্তু! দেশ বিদেশ হতে আসে কত অতিথি…কত সামন্ত রাজ্যের রাজকুমার—কত বড় বড় ধনী ব্যবসায়ী…আসে আর চলে যায় সমুদ্র বেলায় সংখ্যাহীন ঢেউএর মত। কেউ কোন দাগই রেখে যায় না! ভাস্করকে দেখেছিল আশা কোন এক ছন্নছাড়া জীবনের সুরে যেন সুরময় একটি মানুষ…সুরের মায়াজাল নিয়ে যার বেসাতি সে মহাসুরের এই সাধককে ভুলতে পারে নি।

এমনি এক দিনে এল আশাবাঈএর জীবনে বরোদার গায়ক পণ্ডিত মণিশঙ্কর,…দীর্ঘ সৌম্য চেহারা, ঋজু বলিষ্ঠ দেহ, তেজদৃপ্ত চাহনি, সারা সুরলোকের সন্ধানে বার হয়েছে মহাযাত্রাপথে! আগ্রায় এসেছেন তিনি আশাবাঈএর গান শুনতে।

…সমাদর করে বসাল তাকে আশাবাঈ প্রশস্ত চত্বরে…এতদিন যাদের নাম শুনে এসেছিল গুণী বলে, আজ তারা অযাচিত ভাবে এসেছেন তারই গান শুনতে, সারা মন যেন তার ভরে ওঠে! মনের কোনে জাগে দর্পের ভাব…

যথারীতি গান সুরু হল বসন্তবাহার! আশাবাঈ জানে তার বসন্তরাগে আসে বসন্তের পরিবেশ, সুরলোকের মায়াজালে সে সৃষ্টি করতে পারে সহস্র পারিজাতের সৌরভ…যারা সঙ্গীত এবং দেহ-পসারিণী বলে দূর হতে সরে যায়—তারা দেখে যাক তার প্রতিভার সত্যিকার কোনো স্থায়িত্ব আছে কিনা?

বৈশাখের তপ্ত বাতাসের আনাগোনা তখনও থামেনি, রুক্ষ গাছের বুকে শীর্ণতার রং…আকাশের বুকে তখনও ধূলি ঝড়ের আভাস মিলিয়ে যায়নি!…গান সুরু করেছে আশাবাঈ…রাগ বসন্তের ঠাট!…মীড়,গমক,মূর্চ্ছনা দিয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছে তার সুরকে, সারেঙ্গীওলা, তবলচী আজ আশ্চর্য হয়ে যায়!…বিস্তার চলেছে…

…মরা গাছের বুক হতে সাড়া দেয় কোকিল!… সেও ভুলেছে বসন্ত চলে গেছে অনেক দূরে, দূরের পরিবেশে বনের পাখা আজ অনুভব করে…এল বসন্ত!…

গর্বিত জয়ের আলোয় রঙীণ হয়ে গান থামালো আশা!···চেয়ে থাকে পণ্ডিত মণিশঙ্করের পানে!···কিন্তু···কই ওর মুখে কোন পরিবর্ত্তনের চিহ্নও নাই!···মৃদু হাসিতে ভরে ওঠে পণ্ডিতের মুখ···বলেন···

···সবই রয়েছে কিন্তু একটা জিনিষ নাই—তাহচ্ছে তোমার মনের—অন্তরের স্পর্শ! পাথর আর কাঠের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে এ প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু পাথরের বুকে গাছ জন্মাতে পারে মানুষের অন্তর!··

···আশাবাঈ এর মনে আঘাতই বাজে, তার গানের এমন কড়া সমালোচনা কেউ করতে সাহস করে না!···তবু অতিথি···কোন রকমে সহ্য করেই গেল। এর পর পণ্ডিতজী আলাপ সুরু করলেন!··

স্তব্ধ হয়ে যায় বসন্তের কোকিল কাকলি—মুখর পরিবেশ কামনার আবেদনময় উচ্ছল পরিবেশ···মুছে গেল ত্যাগের ···মহাঅজানার ঘন তমসাচ্ছন্ন অতলে। গেয়ে চলেছেন পণ্ডিতজী, আশার মনের দর্প··অহঙ্কারের যবনিকা···পড়তে পড়তে দূর হয়ে যায়! সত্য আবিষ্কার করে সে—দর্প নিয়ে অহঙ্কার নিয়ে গাইতে বসেছিল সে, ছিল কামনার লালসাময় দর্পী রিপুর প্রভাব সারা মনে! জগৎকে সে নস্যাৎ করে ফেলেছিল···কিন্তু এ সুর ব্রহ্মের শেষ নাই—সীমা নাই! অতল অন্ধকারের মতই জগতের সমস্ত হিংসা ক্ষোভকে নিঃশেষ করে আপনার নিঃস্বতাকে মনের বেদীমূলে সকীর্তি সার্থকতার দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আশা···হারিয়ে ফেলে নিজেকে!···সারা দখলমের ছাদ হতে টাঙ্গান ঝাড় লণ্ঠনগুলোর আলো···একে একে নিভে আসে! তমিস্রার শান্ত পরিবেশে আবৃত হয়ে যায় সারা হলটা···সুর তখনও ঘুরে বেড়ায়···পথহারা পাখীর মত!···

চমক ভাঙ্গে আশাবাঈর, অন্ধকারে সুরটা তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে পথহারার মত, তানপুরাহাতে ধ্যানমগ্ন পণ্ডিতজী তখনও স্থির হয়ে বসে রয়েছেন।

···এতদিনের শিক্ষা-সাধনা আজ সবই তুচ্ছ বোধ হয় আশাবাঈর!···কি সে জানে! কি তার সম্পদ!···পণ্ডিতজীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে!

···মুখ তুলে চান পণ্ডিতজী···মুখে তার হাসির মধুর আভা। জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী সাধু আজ যেন ওর মনের সমস্ত না বলা কথাই বুঝতে পারেন! আশ্বাস দেন—"নিজেকে ভুলে যেতে হবে তবেই আসবে সাধনায় সিদ্ধি। এ বড় কঠোর পথ!···ভোগের লালসা এখানে মহাপাপ—!"

পর পর কয়েক রাত্রি কেটে গেল, নীরব নির্জন তাজের সাত দরওজা পার হয়ে আসে রোজকার মতই ভাস্কর!···শ্বেত পাথরের জাফরির ফাঁক দিয়ে চত্তরের বুকে আলো ছায়ার মায়াজাল রচনা করে আকাশের বিদায়ী চাঁদ, ওপারের বদরবনসীমায় কাজল-নয়না মৃগী গ্রীবাকণ্ডূয়ন স্থগিত রেখে কান পেতে শোনে কি যেন আকাশে বাতাসে—কিন্তু না—কোন সুররেশ ও নয়! কার বুক দীর্ণ করে বার হয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। যমুনার কালো জলে···পাণ্ডুর চাঁদের ছায়া দোল খায়, তাজের উঁচু চত্বর হতে চেয়ে থাকে দিগন্তের পানে—ভাস্কর! সে আজ একা!···এ বনঝাউ এর বুকে বাতাসের হাহাকার তার বুকে মাতন তোলে! চাঁদের হাসি আজ তার চোখে যেন সর্বহারা করুণ কান্নামাখান···! তাজের বুকে আজ দেখে না সে কোন প্রণয়ীর কালো চোখে অভিসারের ইসারা!···স্তব্ধ জমাট পাষাণের বুক ভেদ করে কানে আসে কার কান্নার সুর!···চিরবিরহী অশ্রু জল শ্বেতশুভ্র পাষাণ স্তরে জমাট বেঁধে রয়েছে কত যুগ যুগান্ত ধরে।

···আশাবাঈ আসেনি কদিনই!···হয়ত ভুলেই গেছে দরিদ্র শিল্পীকে!···তার মনের সাগর কিনারে কত দূর সাগরের ঢেউএর আনাগোনা!···কে জানে তারা ঢেউএর লিখনে কোন মিলন কাব্যের অন্ত স্বর্গ রচনা করে গেছে!

···যাক্—দূরে সবাই···সৃষ্টির নেশায় সবহারাবার দুঃখ সে ভুলে যাবে!···ফিরে আসে শিল্পী নিজের ছোট বাংলোর দিকে! আকাশের চাঁদ ঢলে পড়ে! তাজগঞ্জের সুপ্তপুরীর হয় নবজাগরণ যেন কোন রূপোর কাঠির পরশে! ঘুমভাঙ্গা ভোর আসে আগ্রার আকাশে!

···পণ্ডিতজীকে আটকে ফেলেছে আশাবাঈ! চোখের জল আর মনের অসহায় ক্রন্দন আত্মহারা শিল্পীকে বন্দী করে ফেলেছে কোন অজানা বাঁধনে! আশাবাঈ সাধনা সুরু করেছে আবার। মনের লালসা কামনার সমস্ত দাবীই আজ নিঃশেষ করে দিয়ে নতুন জীবনের সন্ধানে বার হয়েছে সে!···এও যেন একটা নেশা!

জীবনে ভোগের অঙ্কেই জমেছে অনেক কালির আঁচড়

—ত্যাগের অঙ্কের শূন্যঘর আজ সে দেখতে চায় কতখানি পূর্ণ করতে পারে! বিলাসিনীর কাছে এও বোধহয় একটা দুঃখ-বিলাসই। তার আছে রূপ—আছে সম্পদ আছে—স্তাবকের দল…দুঃখ তার বুকে বাজে না বড় কঠিন ভাবে!

দরিদ্র ভাস্কর প্রায়ান্ধকার একটা পাথরের বন্দীশালার মধ্যে অস্পষ্ট আলোয় তুলির আঁচড় মেরে সৃষ্টি করে কোন মহাজীবনের ইঙ্গিত!…এ জীবন-ভার দারিদ্র্য, রোগ, নিঃস্বতায় ভরপুর!…অতল অন্ধকারের মধ্যে তার জ্যোতির্ময় দুটো চোখ—যেন সে কোন পিঞ্জরাবদ্ধ ঈগল পাখী, সূর্য্যের দিকে কপিশ আঁখিতারা মেলে চেয়ে রয়েছে, …ডানা এবং ঠোঁট পিঞ্জরের গায়ে বারবার আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।…

আজ ভাস্কর অনুভব করে সারা শরীরে তার ব্যাধির করাল গ্রাস—যার অনুমান সে অনেক আগে হতেই করে এসেছিল! এতদিন মনের জোর ছিল—মনের জগতে ছিল সৌন্দর্য্যের অনুভূতি!…সারা পৃথিবীকে সে ভালোবেসেছিল, ভালোবেসেছিল তার আলোবাতাসমাখা নদী তীর, শ্যামল বনসীমা…নীল অঞ্জনঘন চাহনি পরিণত হয়েছে আজ বাস্তবের রূঢ় আঘাতে…কোন রুদ্রের তৃতীয় নয়নের বহ্নিজ্বালাময় সর্বধ্বংসী দৃষ্টিপাতে!

…আশাবাঈ নয়—জীবন হতে আশার আলো তার চলে গেছে! দেখলে আর ভাস্করকে চেনা যায় না, চোখের কোনে জমেছে কালো দাগ। অনাহারে, অত্যধিক পরিশ্রমে জীবনী শক্তিটুকু ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে। কালো কালীর বুক হতে কোটরাগত চোখ দুটো জ্বলে জ্বলজ্বল করে কোন অনির্বাণ দীপশিখার মত!…

রাত্রি নামে নীরব যমুনার কূলে, ভরা শ্রাবণের যমুনা… কলকল ধারায় বাঁধনহারা জলরাশি ছুটে চলেছে কোন সুদূরের সন্ধানে—তাজের মর্মর স্বপ্ন ধুয়ে মুছে যায় সংখ্যাহীন তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে, বৃষ্টি-ধৌত বন ঝাউ গাছের বুকে এক ফালি চাঁদের আলোর পরশ বুলিয়ে যায়…ভাস্কর দূর হতে দেখে! ওখানে যাবারও সামর্থ্য সে হারিয়ে ফেলেছে। দূর হতে স্বপ্নরাজ্যের দিকে দূর-প্রসারি দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে!…

সারা শরীরে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বুকের ভিতর হতে যেন কি ঠেলে উপরে আসছে…কাশির বেগে শিরাগুলো ফুলে ওঠে! কি যেন একটা নোনতা আস্বাদ, হাত দিয়ে অনুভব করে…অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখতে পায়… জমাট রক্ত!…

এ যেন কোন এক নতুন স্বপ্নঘেরা দেশ! বসন্তের শ্যামছায়া—ঘন তরুবীথি…, সে জগতের যাত্রী একা আশাবাঈ! ভুলে যেতে চায় সে বাইরের পরিবেশ!…

পণ্ডিতজীর দিব্য দৃষ্টি…কিন্তু সন্ধান পায় ওর মনের অতলের। নতুনকে উপভোগ করবার প্রকৃতি আশাবাঈ-এর আছে, কিন্তু চঞ্চলানারীর উদ্দাম উচ্ছলতাকে সে তার সাধনা দিয়ে জয় করতে পারে নি, সেদিন আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসবে ওই নারীই তার দৈহিক কামনা —লালসার উন্মাদনায় উন্মাদ হয়ে উঠবেই,…আশাবাঈএর হবে সেইটাই চরম পরাজয়, তবু তাই হবে সত্য!…

…'কাজরী'…বর্ষারূপে রসবর্ণময় কোন সুরবিন্যাস! …বিরহিনী নায়িকার ব্যথা জাগে হারাণ প্রিয়ার লাগি… আকাশ সীমা গ্রাস করেছে কাজল মেঘের অন্তরালে কদম্ব-কেশরের পুলকশিহরণ চক্রবাকের বিরহ-ব্যথায় আকুল হয়ে ওঠে!…বিদ্যুতের চকিত চাহনি…ভীরু নায়িকার মনের ব্যথাকোণ উজল করে তোলে!…

আলাপ করে চলেছে আশাবাঈ, রাগিনীর সার্থক-রূপ হবে বিরহিনী বেদনাবোধেই!…প্রতিটি মনের অনু-পরমাণু হয়ে ওঠে! নিজেকে হারিয়ে ফেলে আশা!…এ কি অনুভূতি…সারা মনের সুপ্ত কামনা লালসা আজ পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে! জীবনের চাওয়া পাওয়ার হিসাব ভিড় করে দাঁড়ায় মনের পৃষ্ঠায়!…

তানপুরাটা হাত হতে নামিয়ে দেয়! সুরের রেশ স্তিমিত হয়ে গেছে, অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখতে পায় পণ্ডিতজী ওর চোখের কামনা মদিরময় চাহনি!

উপবাসী মনের সামনে আজ যারা ভিড় করে দাঁড়ায় তাদের অনেককে চেনে—অনেককে চেনে না আশাবাঈ! …মণিশঙ্করের প্রতিভাকে হিংসা করে আশাবাঈ, ওরা আঘাত হেনেই যাবে পৃথিবীর সমস্ত কামনাকে…শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে উঠে যাবে সব কিছু হতে সন্তর্পণে নিজেকে দূরে রেখে! কিন্তু কেন—?

রাত্রির অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে! সারা বাড়ীটা মগ্ন হয়ে যায় অতল অন্ধকারে!…আকাশে টুকরো কালো মেঘের

আড়ালে লুকোচুরি খেলে রাতের শিশু চাঁদ!···আশাবাঈ-এর সারা মনে আজ বিদ্রোহের ছন্নছাড়া সুর!···সারা জীবনকে অঙ্গুলি হেলনে বন্দী করে রাখতে সে চায় না!···তন্ত্রীতে তার উছল রক্তস্রোত···মনের উদ্দাম কামনার গতিবেগে জীবনতরী ভাসাতে চায়—যেখানে কূল পায়!

রাত্রি কত জানে না···মণিশঙ্করজীর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়···কপোলের কাছে কার উষ্ণ নিঃশ্বাস···কার নিবিড় স্পর্শে চমকিত হয়ে ওঠেন পণ্ডিতজী!···সরে দাঁড়াল অন্ধকারের মধ্যে ছায়াময় একটা মূর্তি। মূর্ত্তিটার দুটো আঁখিতারায় কাল-নাগিনীর মত লালসা-মাখা কুটিল চাহনি! ঘৃণায়—লজ্জায় সরে দাঁড়াল আশাবাঈ!

বিস্মিত হয়ে যান পণ্ডিতজী! কল্পনা করেননি তাঁর সত্যদর্শন এত কঠোর···এত বাস্তব হবে! ঘৃণায় শিউরে ওঠেন তিনি!···

ছিঃ ছিঃ···তোমাকে আমি আমার পুণ্য সাধনার যাত্রাপথ দেখাতে এসেছিলাম! আমার গুরুদেবের অপমান করেছো তুমি!···নরকের কীট! সঙ্গীত জগতে···সাধনার পথে থাকবার কোন দাবী তোমার নাই!

রাত্রি ভোর হয়ে আসে! পাষাণ মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আশাবাঈ।···পণ্ডিতজী চলে গেলেন শেষ রাত্রেই, এক মুহূর্ত্তও তিনি থাকবেন না এ পাপপুরীতে!

আজ আশাবাঈএর জীবনে এসেছে সব-হারানর পালা! পণ্ডিতজীকে ভালবেসেছিল কিন্তু সাধন মার্গের জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীকে সে বাঁধতে চেয়েছিল কামনার সূত্র দিয়ে, তাই তিনি চলে গেলেন!···আজ আশাবাঈ আবার আগেকার জীবনকে মেনে নিতে চায়, সে বাঁচবে কি নিয়ে! বার হয়ে পড়ে!

বহুদিন পর আবার সেই অতিপরিচিত পথে চলে আশাবাঈ···মনে তার আশার আলো! ভাস্করের অন্তরের প্রেমকে সার্থক করতে চায় সে!···

···লালমাটির বুকে নুইয়ে পড়া বাংলোটার সামনের গাছগুলো শুকনো হয়ে গেছে, রাত্রি শেষপ্রহর!···ছুটে গিয়ে ঢোকে আশাবাঈ! কেউ কোথাও নাই!···ঘরের মধ্যে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় আশা! এ কোথায় সে এসেছে! ···সারা শরীরে একটা শিহরণ···ঘন তমিস্রামাখা অতল অরণ্যানীর মাঝে দেখতে পায় কোন এক নারীমূর্ত্তি!··· খুব চেনা!

এগিয়ে যায়!

···ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে সারা পাষাণ প্রাচীরের উপর ভাস্করের নিপুণ তুলি রচনা করেছে কোন গহন অরণ্যের মায়াজাল, দিনের আলো সেখানে যুগ যুগান্তরেও প্রবেশ করেনি···ও নারীকে চেনে সে!··· কিন্তু বিস্মিত হয়ে যায়—আজকের আশাবাঈ সে নয়! শিল্পীর সত্য দৃষ্টি আজকে তাকে দেখলে অনুভব করত নারী কত নীচে নামতে পারে···ও ছবি কোন পুণ্য প্রেমের জ্যোতির্ময়ী নারী মূর্ত্তি! শিল্পীর কামনার বহু উর্দ্ধে!···জাগ্রত জীবনের মহাসত্যকে রূপায়িত করেছে তারই ছবির মধ্যে ভাস্কর।

···কিন্তু ভাস্কর নাই! জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সে ওই নারীর অধরের রঙ্গীন আভা ফুটিয়ে রেখে গেছে, নিজের আঁখিতারার অনির্বাণ জ্যোতি দিয়ে জ্যোতির্ময় করে গেছে ওর চোখ!

দুরন্ত ব্যাধির কবলে আত্মদান করেছে ভাস্কর! পড়ে আছে তার চিহ্ন!···আশা যেন এ জগতে নাই! চলে গেছে কোন অজানা জগতে ভাস্করের সন্ধানে!

* * *

···দেবকণ্ঠ বিশ্বাস করতে পারে না ছায়ামূর্ত্তির কথা!··· সারা মনের অতল হাতড়ে যেন অস্পষ্ট আলোক শিখার মত মনে পড়ে ভুলে-যাওয়া জীবনের কাহিনীর সূত্র!

···"কিন্তু তারপর আশাবাঈএর কি হল?" মধুর হাসিতে ভরিয়ে দেয় অশরীরী অন্ধকার কক্ষতল!···

আশাবাঈর জীবনের আলো সব নিভে গেল সেই দিন, যেদিন অনুভব করল সে—গান গাইবার ক্ষমতাও তার একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে! বোধহয় ব্রহ্মচারী পণ্ডিতজীর অভিশাপ তার জীবনে সত্য হয়ে ফুটেই উঠেছিল! চারিদিকে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার আশার জীবনে, শিল্পী আশা সে জীবনের বোঝা টানবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল!

···বর্ষার শেষ···যমুনার ওপারের কাশবনে লেগেছে শুভ্রতার স্পর্শ!···

…তাজের শ্বেতমর্ম্মর বেদীমূল কার বুকের রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠল !…

আশাবাঈ-এর প্রাণহীন দেহটা তাজমহলের চত্বরে আবিষ্কার করে কৌতূহলী জনতা…লাল রক্তের ছাপ পড়েছে জমাট পাষাণ বেদীতে,…আশাবাঈ তার জীবনের শেষ অধ্যায় রক্তের আখরে লিখে রেখে গেছে তাজের মর্মর প্রাঙ্গণে !…

অশরীরীর দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, বলে চলেছে—

কিন্তু মুক্তি আমার হয়নি, তোমার প্রেমের অপমান করেছি…নিজের জীবনের সমস্ত কামনা তোমার স্মৃতিকে ঘিরে মূর্ত্ত হয়ে রয়েছে শূন্য লোকে…মুক্তি আমার হয় নি ! জন্মান্তর হতে তোমার খোঁজ করে এসেছি !…

…চুপ করে অশরীরী ! দিনের আলো ফুটে ওঠে পূর্বদিগন্তে…দেবকণ্ঠ বিছানায় অলসভাবে শুয়ে থাকে !…

…এ বাড়ীর আবহাওয়াটা অমিয়ার কেমন যেন ভালো লাগে না, দেবকণ্ঠের শরীরও ভাল নয়, সে রাত্রে অচেতন হয়ে যাবার পর হতে কি যেন সর্ব্বদাই চিন্তা করে সে ! শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে !…ডাক্তারও পরামর্শ দেন কিছু দিন চেঞ্জে যাবার জন্যে !

…দূরত্বের ব্যবধানে হারিয়ে ফেলে দুজনে দুজনকে ! অমিয়া চলে গেছে চেঞ্জে দেবকণ্ঠকে নিয়ে ! শূন্য বাড়ীটাতে প্রাণহীন আসবাবপত্রের মধ্যে রয়ে গেছে একটি বহু যুগের প্রতীক্ষামানা প্রাণ !…বিচ্ছেদের ব্যথায় প্রতিটি রাত্রের নিশীথ প্রহর কার বেহাগের সুরে করুণতর হয়ে ওঠে ! কার আগমনের পথ চেয়ে থাকে সে !

…দেবকণ্ঠের অবচেতন মন অজানা কোন আকর্ষণে ছন্দহারা হয়ে যায় ! অমিয়া লক্ষ্য করে !…প্রতিটি দিনের প্রতিটি ব্যবহারে অনুভব করে সে—স্বামী তার আরও দূরে সরে গেছে !…তাদের জীবনের তারে আর মিলনের সুর বাজে না !…

…সারা মনে কি অস্বস্তি অনুভব করে দেবকণ্ঠ জানে না…আশাবাঈ—আগ্রার তাজমহল—কল্লোলমুখরা যমুনার বারিধারা এসবের সঙ্গে কি তার কোনদিন কোন জন্মে সম্পর্ক ছিল ! তবে কেন এই অশান্তি !

…আকাশের উর্দ্ধস্তরের অশরীরী কোন আত্মা আজ তৃপ্তি লাভ করে !…জীবিত তার প্রিয়তম তাকে স্মরণ করে—তার জন্যে উদ্বেগব্যাকুল হয়ে ওঠে…এই সামান্যতম প্রতিদানই তৃপ্ত করে বিদেহী আত্মাকে। তার বন্ধন-মুক্তির বারতা আসে আকাশের বহু উর্দ্ধে তার আত্মার বাসস্তরে। আশাবাঈ…অতীতের জ্বালা ভুলতে পেরেছে ! মর্ত্ত্যলোকের মানবের সারা মন তার জন্য ব্যথিত হয়—এই ত তার পরম পাওয়া ! এদের আকর্ষণই তাকে আবার ফিরিয়ে আনবে মানুষের জগতে প্রেম-প্রীতির জন্মভূমিতে…তার আত্মার মুক্তি-সাধনতীর্থে।

…চলেছে আশাবাঈ-এর অশরীরী মুক্ত আত্মা… নীলাভ জ্যোতির্ময়…স্বচ্ছ আলোক স্তর…চারিদিকে শ্যামল সুবাস !…সৃষ্টির ঘূর্ণিবেগ সহসা তার পথরুদ্ধ করে তোলে ! দুর্নিবার গতিবেগ নামিয়ে আনে নীচের দিকে আত্মার পুনর্জ্জন্মের বিবর্ত্তন পথে। পৃথিবীর বুকে কার একটি অন্তরের ভালোবাসা চায় সার্থকতা…সৃষ্টির আনন্দে আজ আত্মার জোতির্ময় রূপ…নবজন্মের দিকে এগিয়ে আসে মহামুক্তির সাধন পথে !

…ফিরে এসেছে দেবকণ্ঠ, সারা মনের ব্যাকুলতা নিয়ে। ফিরে এসেছে অমিয়া—মনে তার আনন্দের আভা ! নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ মহিমায় সে মহিমান্বিতা !…মা হতে চলেছে সে !…তাদের নীড় কোন অজানা দেবশিশুর কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠবে ! তাকে নিয়ে জীবনের সব কিছু পূর্ণ হবে অমিয়ার।

রাত্রি আসে, দেবকণ্ঠ ব্যাকুলভাবে চেয়ে থাকে কার আশাপথ ! কিন্তু সব নীরব। রাত্রির নীরবতা কোনও সুরের রেশে ছিন্ন হয় না…নিজেই বসে আজ আলাপ করতে থাকে…বেহাগ রাগিণী !…তানপুরাটা সাড়া দেয় দীর্ঘ দিন পর !

…কিন্তু কই, কেউ আসে না !…গভীর রাত্রি, নীচে নেমে আসে দেবকণ্ঠ—ছবিখানা তেমনিই রয়েছে। কিন্তু…কেন জানেনা আগেকার সে জ্যোতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে !…অধরের রক্তিমাভা হয়ে এসেছে পাণ্ডুর, আঁখিতারার আভা বিলুপ্ত হয়ে গেছে !…

…সে নাই ! বিদেহী আত্মা আজ মুক্তির সন্ধান পেয়েছে !…

* ও *

দিন যায়,…অমিয়ার সাংসারে এসেছে পূর্ণতার ছায়া! কোন অজানা দেবশক্তির কলহাস্যে মুখর হয়ে ওঠে তাদের শূন্য গৃহাঙ্গন!…

…কিন্তু একি!…বিস্মিত হয়ে ওঠে দেবকণ্ঠ! এ যে তার চেনা! কোন অতীত যুগের আত্মার আত্মীয়!… সেই মুখ—সেই জ্যোতিভরা চোখ—সেই হাসির আভা! —তবে কি সেই পথহারা এসেছে তাদের গৃহাঙ্গনে দীপশিখার ভীরু আলো হাতে করে? অতীতের হারাণ পথের সন্ধানে।

…আশা হারিয়ে গেছে অসীম শূন্য লোকের সৃষ্টি-রহস্যের অন্তরালে—এসেছে আলো!

মানুষ তার অতি আপনজনকে ভালবাসে—স্নেহ করে —ঘিরে রাখে প্রেম প্রীতির বন্ধনে—কিন্তু কেন? এর রহস্য চির তমসাবৃতই রয়ে গেছে!

রাশি ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

কন্যারাশি

কন্যা যদি আপনার জন্মরাশি হয়, অর্থাৎ যে সময়ে চন্দ্র আকাশে কন্যা নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন সেই সময়ে যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই রকম ফল হবে—

প্রকৃতি

কর্মশীলতা এবং সব ব্যাপারের ব্যবহারিক উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য—এই হচ্ছে আপনার প্রকৃতির মূল মন্ত্র। আপনার জীবনের কথা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সব জড়িত থাকবে আপনার কর্মের সঙ্গে। কর্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার ইচ্ছা আপনার মধ্যে খুব বেশী প্রকাশ পাবে।

আপনার মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রবল এবং ইচ্ছাশক্তি বেশ দৃঢ়। বাইরে থেকে আপনার ব্যবহার ও আচরণে সামাজিকতা ও বিনম্র ভাব প্রকাশ পেলে, আপনি একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলবেন, যাতে ক'রে অনেক সময় আপনাকে বুঝে ওঠা শক্ত হবে।

সব বিষয়ে সাধুতা ও সোজাসুজি ব্যবহার আপনি পছন্দ করেন বটে, কিন্তু যেখানে কূটনীতি না হ'লে কার্যসিদ্ধি অসম্ভব হ'য়ে ওঠে, সেখানে কৌশল প্রয়োগ করতেও মোটেই দ্বিধা করেন না।

নিজের সম্বন্ধে আপনার ধারণা বেশ স্পষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার সঙ্কল্পের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা বা দোমনা ভাব নেই। ঠিক স্বার্থপর না হ'লেও আপনি কম-বেশী আত্ম-কেন্দ্রিক হবেন এবং অপরের সহযোগে কাজ করলেও নিজের বৈশিষ্ট্য বা মতবাদ ছাড়তে চাইবেন না।

আপনি বুদ্ধিমান এবং আপনার মধ্যে মানসিকতা প্রবল হওয়াই সম্ভব। অধ্যয়নের ব্যাপারে লঘু সাহিত্যের চেয়ে বিজ্ঞান দর্শনের গভীর তত্ত্ব আপনাকে আকর্ষণ করে বেশী। কিন্তু শিল্পই হোক্, বিজ্ঞানই হোক্ আর ধর্মতত্ত্বই হোক্, যার কোন ব্যবহারিক উপযোগিতা নাই তার মূল্য আপনার কাছে নিতান্ত কম।

আপনার কর্মধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনি গভীর চিন্তা ও বিশেষ বিবেচনা ক'রে গ্রহণ করবেন। কাজেই তার উপর আপনার একটা ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকবে যা সহস্র প্রতিকূল অবস্থাতেও বিচলিত হবে না।

আপনি সহজে ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু কারো উপর একবার বিরাগ জন্মালে, তাও আপনার মন থেকে সহজে দূর হ'তে চাইবে না। তবে যে মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন যে বিরাগের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, সেই মুহূর্তেই সরলভাবে নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ হবেন না। কারো উপর ক্রুদ্ধ হ'লেও হীনভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা বা শত্রুকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা আপনি কখনই করবেন না। আপনার বিরোধিতা ন্যায়পথকে আশ্রয় ক'রেই অভিব্যক্ত হবে।

আপনি সাধারণতঃ সংযম ও শুচিতার পক্ষপাতী হবেন। আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুকে শক্তি অপচয় না ক'রে তাকে দরকারী কাজের জন্য সঞ্চিত ক'রে রাখতে চাইবেন।

আপনার মধ্যে সংসার-বিরাগী, উদাসীন সন্ন্যাসীর মত মনোভাব কম-বেশী প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও জ্ঞান বা ভক্তির চেয়ে কর্মযোগই আপনার আদর্শ হবে।

বাক্যের দ্বারা অপরকে স্বমতে নিয়ে আসার যোগ্যতা আপনার যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু এর অপব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক না থাকলে আপনার বাগ্মিতা নেহাৎ বাক্‌চাতুর্য বা বাচালতায় পরিণত হ'তে পারে।

নিজের জন্যই হোক্ পরের জন্যই হোক্, কোন না কোন কাজে মনকে ব্যাপৃত রাখা আপনার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কর্মহীন অলস

জীবন আপনার পক্ষে একটা অভিশাপ। কর্মহীনতা আপনার মানসিক ও নৈতিক উন্নতির অন্তরায় তো বটেই, তা আপনার দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও হানিকর।

অর্থভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে সাধারণতঃ আপনি হিসাবী ও সাবধানী হ'লেও প্রথম জীবনে অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে কম-বেশী ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে। উপার্জনের জন্য আপনাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। নিজের বুদ্ধি কৌশলেই হোক্, সরকারী কোন বিভাগে উচ্চপদ লাভ ক'রেই হোক্, অথবা দালালী ঠিকাদারী ইত্যাদি কিম্বা জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কাজের দ্বারাই হোক্, জীবনের শেষার্দ্ধে আপনার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারে, কিন্তু তবু এ আশঙ্কা আছে যে, আপনি দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমে যা অর্জন করবেন, নিজের বিবেচনার দোষে তা নষ্ট করে ফেলতে পারেন। উপার্জনের জন্য আপনাকে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করতে হবে, কিম্বা ভ্রমণের সময় উপার্জন বা প্রাপ্তি হ'তে পারে।

উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার কিছু প্রাপ্তি সম্ভব হ'তে পারে কিন্তু তা পেতে বাধাবিঘ্ন বা বিলম্ব হওয়া সম্ভব। তা নিয়ে কোন রকম মামলা মোকর্দমা হওয়াও অসম্ভব নয়।

কর্মজীবন

কর্মজীবনে আপনাকে নিজের গুণপনা ও কর্মশক্তির উপরই নির্ভর করতে হবে বেশী। কদাচিৎ কখনও কোন বিদেশী বা ভিন্নধর্মী মুরুব্বির সাহায্য পেতে পারেন কিন্তু সে সাহায্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে হবে স্বার্থ-প্রণোদিত ও অস্থায়ী। কাজেই তার উপর নির্ভর করলে হতাশ হ'তে হবে।

যাকে বলে অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ, তা আপনার প্রথম জীবনে প্রকট হবে। কিন্তু অনেক আশাভঙ্গ ওঠাপড়া বা কষ্টকর পরিশ্রমের পর শেষ পর্যন্ত আপনি জয়ী হবার আশা করতে পারেন। ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে শেখা আপনার উচিত। এ কথা মনে রাখবেন যে, সফলতার জন্য আপনাকে একমাত্র নিজের উপরই নির্ভর করতে হবে। কার্য-সিদ্ধির জন্য অনেক সময় হয়তো স্বাস্থ্য ও জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্য দিয়েও অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্তু যদি বিপদকে ভয় না করেন এবং কঠোর পরিশ্রম করতে কাতর না হন, তাহ'লে কর্মজীবনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আপনার সেই সব কাজ ভাল লাগবে, যাতে সাধারণকে শিক্ষা অথবা আনন্দ দেওয়া যায়। সুতরাং সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মের দিকে আপনার স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যেতে পারে। সাংবাদিক সাহিত্যিক আইনজ্ঞ চিকিৎসক প্রভৃতি কাজের যোগ্যতা যেমন আপনার আছে, তেমনি অভিনেতা সঙ্গীতজ্ঞ নাট্য-পরিচালক প্রভৃতি কাজের যোগ্যতাও আপনার মধ্যে আছে। যেখানে বহুজনের সংশ্রব আছে এবং বহু ব্যক্তিকে পরিচালনা করা প্রয়োজন হয় সেই সব কাজে আপনার যোগ্যতা প্রকাশ পাবে কিন্তু বহুজনের সংশ্রবে কর্ম করলেও, আপনি সেইখানেই বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন, যেখানে সকলে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবে। চাকরী প্রোফেশান এবং ব্যবসা যাই আপনি করুন, আপনার লক্ষ্য থাকবে প্রাধান্যের দিকে; কিন্তু প্রাধান্য পেতে হ'লে আপনাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে।

মনে রাখবেন বন্ধ্যারাশি কর্মযোগের রাশি। যদি স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না করে শুধু কাজের জন্যেই কাজ করে যেতে পারেন তাহ'লেই আপনি আনন্দ পাবেন বেশী।

পারিবারিক

আত্মীয় স্বজনের দ্বারা উপকারের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই আপনার বেশী, তা সে আত্মীয় দূরেরই হোক, আর নিকটই হোক। ভ্রাতা ভগ্নী বহু হ'তে পারে কিন্তু ভ্রাতা ভগ্নীর জন্য অর্থব্যয় বা পারিবারিক ঝঞ্ঝাটের আশঙ্কা আছে। ভ্রাতা ভগ্নীর কোন গুপ্ত ব্যাপার নিয়ে বিশেষতঃ তাদের মধ্যে কারো দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে কোনরকম কেলেঙ্কারী বা লোকসমাজে অপবাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। মোটকথা ভ্রাতা ভগ্নী বা আত্মীয় স্বজনের দ্বারা আপনার পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের কম-বেশী বিঘ্ন ঘটবে।

গৃহ ভূমি বা বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে কম-বেশী ঝঞ্ঝাট আপনাকে পোহাতে হবে এবং মধ্যে মধ্যে গৃহ-সুখের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করবেন। পারিবারিক সুখের সমস্ত উপকরণ বর্তমান থাকলেও অনেক সময় আপনার পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটবে।

আপনার বহু সন্তান হওয়াই সম্ভব। সন্তানের ব্যাপারে ব্যয়বাহুল্য ঘটবে এবং সন্তানের কর্ম-জীবন বা সাফল্য সম্বন্ধে কম-বেশী চিন্তা উপস্থিত হ'তে পারে। কোন জামাতা বা পুত্রবধূর উচ্চস্থান থেকে পতন, রক্তপাত, জলভয় প্রভৃতি দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া তাদের জন্য কোন রকম আশাভঙ্গ বা মনোকষ্ট হওয়াও সম্ভব।

বিবাহ

বিবাহের ব্যাপারে আপনার কোনরকম আশাভঙ্গ বা অপবাদ হওয়ার আশঙ্কা আছে। আপনি স্ত্রীর (বা স্বামীর) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে উঠতে পারেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকাও অসম্ভব নয়। আপনার দাম্পত্য-ব্যাপার সাধারণের সমালোচনার বিষয় হ'তে পারে এবং পারিবারিক কারণে অথবা কর্মানুরক্তির জন্য আপনার দাম্পত্য সুখের বিঘ্ন ঘটা সম্ভব। যদি এমন কারো সঙ্গে আপনার বিবাহ হয় যাঁর জন্মমাস জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ অথবা মাঘ, জন্মতিথি শুক্লপক্ষের প্রতিপদে অথবা কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, তাহ'লে তার সঙ্গে আপনার সঙ্গে মনের মিল হবে বটে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আবেষ্টনের চাপে অনেক সময় দাম্পত্য সুখে বিঘ্ন ঘটবে।

বন্ধুত্ব

বন্ধুত্বের ব্যাপারে আপনাকে ভাগ্যশালী বলা চলে না। অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু পাবেন খুব কমই।

যদিই ভাগ্যক্রমে কোন বন্ধুলাভ হয়, অবস্থাগতিকে অল্পদিনের মধ্যেই তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে হবে। মোট কথা বন্ধুত্বের ব্যাপারে কম-বেশী আশাভঙ্গের দুঃখ হচ্ছে আপনার অদৃষ্টলিপি। যাঁদের জন্ম-মাস জ্যৈষ্ঠ আশ্বিন বা মাঘ কিম্বা যাঁদের জন্মতিথি শুক্লাপ্রতিপদ কি কৃষ্ণা অষ্টমী তাঁদের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হ'তে পারে—

আপনার অনুচর পরিচরের সংখ্যা অনেক হবে। তারা আপনার অনুগতও হবে এবং আপনার উপর তাদের একটা প্রীতির আকর্ষণও থাকবে। কিন্তু তৎসত্বেও তাদের জন্য আপনাকে কম-বেশী ঝঞ্ঝাট অশান্তি ও মনোকষ্ট ভোগ করতে হবে।

আপনার গুপ্ত শত্রু অনেক থাকবে। বিশেষতঃ ধণিক ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি থাকবে যারা মুখে সৌজন্য দেখালেও ভিতরে ভিতরে আপনার ক্ষতির চেষ্টা করবে। সে রকম লোকের কথার উপর নির্ভর করে কাজ করতে গেলে অনেক সময় আপনাকে বিপন্ন হ'তে হবে।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের দিকে আপনার বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। শৈশবে ও বাল্যে আপনাকে অনেকবার দেহকষ্ট ভোগ করতে হবে। আপনার দেহের মধ্যে পাকস্থলী, যকৃৎ, অন্ত্র এবং পায়ের নিম্নাংশ এই সকল যন্ত্রগুলি দুর্বল, সুতরাং অম্ল অজীর্ণ, আমাশয় অন্ত্রক্ষত, অন্ত্রবৃদ্ধি, পায়ের ধমনী স্ফীতি প্রভৃতি রোগ সম্বন্ধে সতর্কতা আবশ্যক। পথ্যের দিকে আপনার বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। আপনার দেহ চায় পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক খাদ্য। বেশী তীক্ষ্ণ মশলাযুক্ত খাদ্য আপনার বর্জন করাই ভাল। আপনার দেহে ভিটামিনের অভাবজনিত পীড়া এবং দূষিত পদার্থ নিঃসরণ না হওয়ার জন্য ব্যাধির আশঙ্কা আছে—সুতরাং লক্ষ্য রাখবেন যে খাদ্যে যেন যথেষ্ট ভিটামিন থাকে এবং জল যেন কম খাওয়া না হয়। কোন রকম মাদকদ্রব্য এবং তীক্ষ্ণ বিষ ঔষধাদি ব্যবহার না করাই ভাল। মুক্ত হাওয়ায় পদচারণা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। কিছু না কিছু শারীরিক পরিশ্রম এবং আহার বিহারে নিয়মানুবর্তিতা আপনার সুস্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

অন্যান্য ব্যাপার

আপনাকে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করতে হবে। কোন কোন সময় নিজের অনিচ্ছা সত্বেও বাধ্য হ'য়ে দূর দেশে যেতে হবে, হয়ত নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য, হয়তো বা কারো কোনও দায়িত্বপূর্ণ বা গোপনীয় কর্মের ভার নিয়ে। সে যাই হোক্ ভ্রমণ আপনাকে করতে হবেই। বিদেশে বা কোন্ দূর দেশে কোন বিপজ্জনক কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য আপনি খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন।

স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ১২, ২৪, ৩৬, ৪৮ প্রভৃতি বর্ষগুলিতে নিজের বা কোন আত্মীয়ের সংশ্রবে কষ্টকর অভিজ্ঞতা হ'তে পারে। ৩, ৬, ১৫, ১৮, ২৭, ৩০, ৩৯, ৪২, ৫১, ৫৪ প্রভৃতি বর্ষগুলিতে কোন উল্লেখযোগ্য শুভ ঘটনা ঘটা সম্ভব।

বর্ণ

আপনার প্রীতিপদ ও সৌভাগ্যবর্ধক বর্ণ হচ্ছে ধূসর, কমলা রং, মধুপিঙ্গল (Brown) প্রভৃতি। তা ছাড়া পালিশ করা ধাতুর চক্‌চকে রঙের মত সব রকম রঙ বিশেষ করে নিকেল, Platinum রূপা প্রভৃতির রঙ আপনার উপযোগী। দেহমনের অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু বেগুনে রং ব্যবহারে উপকার পাবেন।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন গোমেদ, গোল্ড ষ্টোন (Gold stone) অ্যাম্বার (amber) প্রভৃতি।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এ রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জনকয়েকের নাম—স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড, সম্রাট পঞ্চম জর্জ, ম্যাদাম ব্লভিস্কি, হরনাথ ঠাকুর, প্রসিদ্ধ সিনেমা অভিনেত্রী গ্রেটাগার্বো, প্রসিদ্ধ সিনেমা পরিচালক ডি ডবলিও গ্রিফিট, প্রসিদ্ধ লেখক ও সিনেমা পরিচালক শ্রীপ্রেমেন মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ, প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ হরনাথ দে, প্রসিদ্ধ লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত।

আজি এই মায়ারাতি

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আজি এই মায়ারাতি সকল হৃদয়
তীব্র মাদকের মত উতল উন্মাদ
করিছে আমার! শুধু যেন মনে হয়
রূপের পশরা নিয়ে ধরিয়াছে ফাঁদ
অনন্ত লাবণ্যময়ী এ বিশ্ব প্রকৃতি
ত্রিদিব স্খলিত পরি' জোছনা-অম্বর
নিভৃতে আমারে পেয়ে! কত মধুস্মৃতি,
কত গীতি, কত প্রীতি আজি এ অন্তর
করি' তোলে উথলিত বিধুর ব্যাকুল!
হে প্রকৃতি, হে সুন্দরা, হে প্রেয়সী মোর,
চাঁদিনীর টিপ পরি, এলাইয়া চুল—
আমারে ভুলাতে কেন এ প্রয়াস তোর?
নিশি শেষে যাবে টুটে এ প্রেম-বন্ধন—
তাই ভেবে প্রাণ মোর করিছে ক্রন্দন!

পনেরো

সভাটা বসল কিষাণ সমিতির অফিসের সামনে।

এত লোক হবে আশা করা যায়নি—নগেন ডাক্তারের যোগ্যতা আছে দেখা যাচ্ছে। কখনো সাইকেলে চড়ে আবার কখনো বা সাইকেলটাকে কাঁধে চাপিয়ে চষে বেড়িয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। পালগ্রামের সাঁওতালেরা এসেছে, এসেছে কালা-পুখরীর ওঁরাওঁয়ের দল, আর এসেছে সাধারণ কৃষক। তাদের ভেতরে বড় কৃষাণ আছে, বর্গাদার। জোতদারেরা আসেনি—খবর দিলেও তারা আসত না।

নগেনই প্রস্তাব করল।

—আজকের এই সভায় সভাপতি হবেন কালা পুখ্রীর সনাতন মণ্ডল।

সনাতন হকচকিয়ে গেল। দু হাত জোড় করে বললে, ডাক্তার ভাই, আমি—

রঞ্জন বললে—আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

আশ্রয়ের আশায় দু চারবার এদিক ওদিক তাকালো সনাতন : কিন্তু আমি—

আর কিছু তাকে বলতে দেওয়া হল না। তাকে হাত ধরে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিলে নগেন। আনন্দিত করতালির ধ্বনি উঠল চারদিকে।

—কিষাণ সমিতি কি জয়—

—ইন্ কিলাব জিন্দাবাদ—

এক হাজার মানুষের গলা থেকে প্রতিশ্রুতি ছড়ালো আকাশে। এক হাজার মানুষ। এক হাজার চওড়া বুক —দু হাজার লোহায় গড়া কঠিন পেশী। দু হাজার চোখে উজ্জ্বলন্ত প্রাণের অগ্নি।

নগেন বললে, ভাই সব, অনেক দূর দূর থেকে আপনারা সবাই এসেছেন। তাই আপনাদের সকলকে একটু তাড়াতাড়িই ছেড়ে দিতে হবে—নইলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। দিন কাল খারাপ, মাঠে আজকাল খুব সাপের উৎপাত হচ্ছে। সেই জন্যে আমরা এখনি সভার কাজ আরম্ভ করব। আর আজকের সভার উদ্দেশ্য আপনাদের ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন আমাদের রঞ্জনদা।

রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। নিজেকে কেমন বিব্রত, কেমন অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। বক্তৃতা দেবার অভ্যাস তার আছে, জেল থেকে বেরুবার পর কিছুদিন তাকে এখানে ওখানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেও হয়েছে। কিন্তু সে বক্তৃতা পোষাকী, তার রূপ সাজানো-গোছানো, আলংকারিক। সেখানে যুক্তির সঙ্গে ইমোশনের মিশ্রণ, তত্ত্বের সঙ্গে তির্যক ব্যঙ্গের বিন্যাস, ভাষার অলঙ্করণে ধ্বনির কুহক-বিস্তার। কিন্তু এতো তা নয়। হাজার মানুষের চোখ তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। স্পষ্ট উত্তর চায় তারা—চায় জীবন-মরণ সমস্যার অকুণ্ঠ সমালোচনা। এখানে রাজনীতির ব্যসন নয়, কথার কারু-শিল্প নয়—যুগরুদ্রের ছিন্ন জটা থেকে ক্রোধরূপী পুরুষের আগ্নেয় আবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে : হয় পথ দেখাও, নইলে পথ থেকে সরে যাও। জন-জগন্নাথের রথযাত্রা শুরু হয়ে গেছে—দড়ি যদি টানতে না পারো, গুঁড়িয়ে যেতে হবে রথের তলায়।

অনধিকারী। অনধিকারী বই কি। এদের মন তার নয়—সে মন আয়ত্ত করে নিতে হচ্ছে। কিন্তু সে কি সহজ কাজ? কত সংশয়—কত সংস্কার। মানসিক আভিজাত্য—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অহমিকা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্বত প্রাকারের মতো। শ্রেণীচ্যুতি! এক নিঃশ্বাসে বলবার মতো সহজ কথা, কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রে? বংশক্রমের অলক্ষ্য শৃঙ্খল চিন্তাকে সরীসৃপ গ্রন্থিলতায় জড়িয়ে রাখে, শূন্যনির্ভর সংস্কৃতির অহঙ্কার দ্বিধার পরে দ্বিধা আনে। তবু—

তবু চেষ্টা করতেই হবে। যতটা পারি—যতখানি সম্ভব। চেষ্টায় ফাঁক না থাকে, ফাঁকি না থাকে আন্তরিকতায়। আগামী দিনের ইতিহাসের কাছে আমাদের স্বপক্ষে এই তো দলিল।

রঞ্জন বললে আপনারা সবাই জানেন, নদীর বন্যায়

কালা পুখ্রি অঞ্চলের হাজার হাজার বিঘে ধানী জমি প্রতি বছর কী ভাবে বরবাদ হয়ে যায়। আর জমিদারের কিছু জলকর বাঁচাবার জন্যে নষ্ট হয় হাজার লোকের মুখের গ্রাস। তাই এবার বর্ষা নামবার আগেই বাঁধ দেওয়া হবে কালা পুখরির দাঁড়ায়। কিন্তু তাতে জমিদারের বাধা। এই বাধা সয়ে এমন করে কিছুতেই আপনারা মরতে পারেন না। এবার রুখে দাঁড়াতে হবে আপনাদের—সকলে হাতে হাত মিলিয়ে বাঁধ বাঁধতে হবে। হয়তো জমিদারের লাঠিয়াল আসবে—পুলিসও আসতে পারে। কিন্তু সেই জন্যে আপনারা পিছিয়ে যাবেন কিনা সে বিচারের ভার আপনাদেরই ওপর।

—জান কবুল—উগ্র চীৎকার উঠল একটা।

—হামার অ্যাক্টা কথা বলিবার আছে—একজন দাঁড়িয়ে উঠল।

—বসি যাও হে বসি যাও। তুমি আবার খামাখা ঝামেলা লাগাইলেন ক্যানে হে?—

কয়েকজন তাড়া দিলে।

সভাটার ওপরে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে রঞ্জন।

—না, না, চুপ করুন আপনারা। সকলের কথাই শুনতে হবে আপনাদের। বলুন, কী বলবেন আপনি?

যে দাঁড়িয়েছিল, সে একজন মাঝবয়সী কৃষাণ। এক সময়ে অতিকায় একটা কাঠামো ছিল, হয় তো অমানুষিক শক্তিও ছিল গায়ে। কিন্তু অর্ধাহারে আর ঋণের বোঝায় পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে, চাপা চওড়া কপালের তলায় চোখ দুটো গভীর গর্তের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। একটা শঙ্কিত অনিশ্চয় দৃষ্টি চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে বললে, হামি কহিতেছিনু, কালা-পুখুরিতে ঝামেলা হছে তো হছে। সেইটা লিয়া ওইখানকার মানসিলাই (মানুষগুলোই) লড়িবে। হামরা ক্যানে ঝুটমুট ওইঠে যাই ফ্যাচাঙে পড়িমু।

—ইটা একদম বাজে কথা হছে—একজন প্রতিবাদ করল তীব্র গলায়।

—না, বাজে কথা নয়—রঞ্জন আবার হাত বাড়িয়ে দিলে সভার দিকে: এরকম কথা আপনাদের সকলেরই মনে উঠতে পারে, আর তা ওঠাও উচিত। সত্যিই তো, অন্যের জন্যে কেন আপনারা লড়তে যাবেন? কেন আপনারা পড়তে যাবেন জমিদারের কোপে? বিশেষ করে যে কালা-পুখ্রিতে আপনাদের কোনো স্বার্থই নেই? ঠিক কথা। সোজাসুজি ভাবতে গেলে এমনিই মনে হওয়া উচিত। কিন্তু ভাই সব, আজ দিন বদলে গেছে। আজ দুনিয়ার সব দুঃখী মানুষকে পাশাপাশি দাঁড়াতে হবে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার জন্যে। যতদিন আপনারা ফারাক্ হয়ে ছিলেন, ততদিন আপনাদের ক্ষেতের ফসল লুটে নিয়েছে জমিদার, ঘর বাড়ি গোরু-হাল নীলামে তুলেছে মহাজন। আজ যে যেখানে আছেন যদি এক কাট্টা হয়ে দাঁড়ান তা হলে দেখবেন দুদিনেই সব জুলুমবাজী বন্ধ হয়ে গেছে। রামের স্বার্থ রাখবার জন্যে যদি রহিম দাঁড়ায়, আলিকে বাঁচাবার জন্যে যদি যদু ছুটে যায়—তা হলে সবাই বুঝতে পারবে তামাম পৃথিবীর ভুখা মানুষেরা আজ এক-দলে। কেউ আর তাদের ঘাঁটাতে সাহস করবে না। আজ আপনারা যদি কালা-পুখরিতে বাঁধ দেবার জন্যে এগিয়ে যান, তা হলে কাল জয়গড়ে আপনাদের ফসল বাঁচাবার জন্যে যে কালা পুখরির মানুষগুলোই ছুটে আসবে এ কথা কেন আপনারা বুঝতে পারছেন না?

—আলবৎ! বুঝি হামরা।

— কালা পুখ্রির মান্সিলার সাথ্ হামরা একদল।

—এক কাট্টা হই হামাদের বাঁধ গড়িবা হেবে!

—কিষাণ সমিতি জিন্দাবাদ!

রঞ্জন সভার দিকে তাকালো। হাজার মানুষ নয়—ক্রোধ-সমুদ্র। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে আসছে। ভেঙে দেবে—গুঁড়িয়ে দেবে, ধ্বসিয়ে দেবে বালির বনিয়াদে গড়া শিষ্-মহলের স্বপ্নকে। সেই তরঙ্গের মুখে সে নিজেও টিকে থাকতে পারবে তো? দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে তো তার মানসিক আভিজাত্যের খুঁটিতে? এই তরঙ্গের মুখে সেও কি এগিয়ে যেতে পারবে না, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ক্রোধ-বন্যার এই বিপুল উৎক্ষেপে?

সংশয়-শঙ্কিত মন যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো আচমকা থমকে দাঁড়ালো হৃৎস্পন্দন। রক্ত নাড়ীতে গুর, গুর, করে ঝোড়ো মেঘের ডাক। তারপর—তারপর?

নগেন বললে, এতেই হবে রঞ্জনদা। এবার তুমি বোসো, বাকীটা আমি শেষ করে দিই।

* * * *

জয়গড়ে নগেন ডাক্তারের ঘরে বসেছিল তিনজন।

বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে—শুক্লা রাত। মহুয়া বনের পাতায় পাতায় রূপালি জরির মতো ঝকমক করছে জ্যোৎস্না—দোলা খেয়ে যাচ্ছে হাওয়ায় হাওয়ায়। টাঙ্গন নদীর জলটা যেন শাদা হয়ে আছে একরাশ দুধের মতো। একটা মোড়ার ওপর বসে সেদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ছিল উত্তমা। রঞ্জনের বেশ লাগছিল শ্যামাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির এই তন্ময়তাটুকু। মাটি কোপায়, পোষ্টার লেখে, মেয়েদের জড়ো করে আনে, পুরুষের মতো উঁচু গলায় চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। মন্দাক্রান্তা ছন্দ নয়, ভুজঙ্গ-প্রয়াতের ললিতবিস্তার নয়—অনুষ্টুপের মতো কঠিন ঋজুতা। তবু ছন্দ ছন্দই। তারও রেশ আছে, তারও ব্যঞ্জনা আছে, তারও কথায় কথায় হরিণীপ্লুতার ঝঙ্কার বেজে ওঠে। এই মুহূর্তে আত্মমগ্ন উত্তমাকে দেখে এই কথাই রঞ্জনের মনে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল, ঝলকে উঠছিল বাইরের ঝলক-লাগা মহুয়া পাতার মতো।

কিন্তু গদ্যময় নগেন এক টিপ নস্য টানল।

—মিটিংটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে রঞ্জন দা।

—চমৎকার। এত ভালো হবে আশা করিনি।

—তোমার কী মনে হয়? ওই বাঁধটাকে নিয়েই একটা জোরদার লড়াই আমরা গড়ে তুলতে পারব?—উৎসুক জিজ্ঞাসুভাবে নগেন রঞ্জনের দিকে তাকালো, চোখ দুটো চকচক করে উঠল তার।

—তাই তো মনে হচ্ছে।

আবার এক টিপ নস্য নিয়ে বেশ শব্দ করে টানল নগেন।

—জানো রঞ্জনদা, এই আমাদের প্রথম শক্তিপরীক্ষা। এতদিন ধরে যে সব কথা আমরা ওদের বুঝিয়েছি, যে ভাবে ওদের চালাতে চেয়েছি, তা কতটা সফল হবে, এরই ওপরে তার যাচাই। যদি লড়াই জিততে পারি—জেনে রেখো এ তল্লাটে কাউকে আর দাঁত ফোটাতে হবে না। আর যদি হারি, তাতেও দমবার কিছু নেই। এক পা পিছু হটে গেলে পালটা দশ পা এগিয়ে যাবার জোর আমরা পাব। কী বলিস উত্তমা?

ঘোর লাল চোখ মেলে উত্তমা একবার ফিরে তাকালো। কথা বললে না, শুধু মাথা নেড়ে নিজের সমর্থনটা জানিয়ে দিলে। তার মন এখানে নয়—আরো কিছু সে ভাবছে, আবিষ্ট হয়ে গেছে মহুয়া বন আর টাঙ্গন নদীর দিকে তাকিয়ে। অনুষ্টুপের ক্রত-দীপ্তির ওপর মন্দাক্রান্তার মেঘ নেমেছে কোথাও।

রঞ্জন বললে, কিন্তু একটা খবর শুনেছ তো? পাল-নগরের শাহু কিন্তু মুস্লিম-লীগ গড়বার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। মুসলমানদের সরিয়ে নেবেন তোমাদের আন্দোলন থেকে।

—মুসলিম-লীগ গড়তে চান গড়ুন। মুসলমানের স্বার্থের কথাও তিনি ভাবুন। কিন্তু সকলের স্বার্থ নিয়েই যেখানে লড়াই, সেখানে কতদিন তিনি মুসলমানকে আলাদা করে সরিয়ে রাখতে পারবেন? সাচ্চা ইমান যার আছে, আজ হোক কাল হোক ছুটে সে আসবেই। তার প্রমাণ আলিমুদ্দিন মাস্টার। সেদিন সভায় কী কাণ্ড হয়ে গেছে শোনোনি বুঝি?

—শুনেছি। আলিমুদ্দিন খাঁটি লোক—সত্যিকারের আজাদ পাকিস্তানের কথাই তিনি ভেবেছেন। তাই সেদিনের সভায় তিনি শাহুর মুখোস খুলে ফেলেছেন। তা নিয়ে খুব গণ্ডগোলও চলছে। কিন্তু সেইজন্যে তুমি একথা মনে কোরোনা যে তিনি তোমারই দলে এগিয়ে আসবেন। তিনি সোস্তালিজমে বিশ্বাস করেন—এ আমার কখনো মনে হয় না।

—কী করে জানলে?—তর্ক করার উৎসাহে নগেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল: দেশের মানুষকে যিনি ভালোবাসেন, তাদের মঙ্গল যিনি করতে চান, তিনি একদিন না একদিন আমাদের সঙ্গে এক লক্ষ্যে এসে মিলবেনই। হয়তো সেদিন আমাদের সকলের আগেই তাঁকে আমরা দেখতে পাবো।

—বেশ তো, আশা করতে থাকো—রঞ্জন টিপ্পনি কাটল।

নগেন উত্তেজনার সঙ্গে কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে ভারী গলায় ডাক এল: উত্তমা!—উত্তমা আর নগেন একই সঙ্গে চমকে উঠল। মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল উত্তমা।

—নগেন নেই বাড়িতে?—আবার ডাক শোনা গেল।

—আমার সেই জ্যাঠামশাই—সেই জোতদার!—ফিস্

ফিস্ করে বলেই নগেন সাড়া দিলে : আছি জ্যাঠামশাই, আসুন এ ঘরে।

একটা চটির শব্দ উঠে আসতে লাগল ঘরের দিকে। নগেন আবার চাপা গলায় বললে, সাংঘাতিক লোক। বুঝে-সুঝে কথা কোয়ো রঞ্জনদা।

রঞ্জন হাসল—জবাব দিলে না। বুঝে-সুঝে কথা! আর যাই হোক, ও জিনিসটার জন্যে তার ভাবনা নেই। দিনের পর দিন কুমার ভৈরবনারায়ণকে তার সঙ্গ দান করতে হয়। পড়ে শোনাতে হয় গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ—বিশ্বরূপকে এনে প্রতিষ্ঠা করতে হয় কুমার বাহাদুরের নেশার রং-লাগা চোখের সামনে; মূঢ় রসিকতায় হাসবার চেষ্টা করতে হয়—হাসতেও হয় কখনো কখনো। আর কিছু না হোক, কথা বলবার আর্টটাকে অন্তত তার জানতে হয়েছে।

চটির শব্দ চৌকাঠের গোড়ায় এসে পৌঁছুল। জ্যোৎস্নায় পরিষ্কার দেখা গেল মানুষটিকে। মাথায় চক চকে টাক, গায়ে বেনিয়ান। হাতে একখানা মোটা ছড়ি। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি—আচমকা দেখলে শ্রদ্ধা উদ্রেক করবার মতো প্রৌঢ়ত্ব।

—আসুন জ্যাঠা, আসুন—নগেন ডাকল।

ভদ্রলোক ঘরে পা দিলেন। লণ্ঠনের আলোয় অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জনের দিকে।

নগেন বললে, ইনি আমাদের রঞ্জনদা—রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আর ইনি আমাদের জ্যাঠামশাই মৃত্যুঞ্জয় সরকার। এঁর কথা তো তোমায় আগেই বলেছি।

নমস্কার বিনিময়ের ভদ্রতাটা শেষ হল। উত্তমা দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তার পরিত্যক্ত মোড়াটায় এসে আসন নিলেন মৃত্যুঞ্জয়। বেশ জাঁকিয়েই বসলেন।

কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে একবার মৃত্যুঞ্জয় নগেনের দিকে তাকালেন : এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভালমন্দ তোদের একবার খবর করে যাই। তোর মা কোথায়?

জবাব দিলে উত্তমা : হরিসভায় গেছেন—কীর্তন শুনতে।

—আজ হরিসভায় কীর্তন আছে বুঝি? ওহো, মনেই তো ছিল না।—মৃত্যুঞ্জয় যেন অনুতপ্ত হয়ে উঠলেন : যা দিনকাল পড়েছে—কিছু কি আর মনে থাকে! সংসারের চিন্তাতেই অস্থির—ধর্মকর্ম মাথায় উঠে গেছে। কী বলেন?—শেষ কথাটা তিনি রঞ্জনের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

—তা বটে—রঞ্জন মাথা নেড়ে সায় দিলে।

আপনাকে আমি চিনি। হিজলবনের রাজবাড়িতে আপনি থাকেন—তাই না?—মৃত্যুঞ্জয় একটা ক্রুর দৃষ্টি ফেললেন।

মুহূর্তের জন্যে রঞ্জনের মুখে একটা অস্বস্তির ছায়া দুলে গেল : আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ও। মৃত্যুঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, মনে মনে যেন মিলিয়ে নিতে চাইলেন কিছু একটার যোগফল : ভালো কথা নগেন, আজ বুঝি তোদের কিষাণ সমিতির একটা সভা ছিল, না?

—ছিল যে সে তো আপনি ভালোই জানেন জ্যাঠামশাই—নগেন একটা ধারালো মন্তব্য ছুঁড়ল।

—ওহো, তাও তো বটে। বুড়ো বয়েসে আজকাল সব কিছু ভুল হতে সুরু করেছে। তা কী হল সেই মিটিঙে?

—দেশের লোকের দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনা—নগেন জবাব দিলে।

—সেই কালা-পুখুরির ব্যাপারটা বুঝি?—মৃত্যুঞ্জয় আড়চোখে রঞ্জনকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

হঠাৎ উত্তমা হেসে উঠল। এতক্ষণ ধরে যেন বাঁধা পড়ে ছিল একটা ঝর্ণার জল—মুক্তির উচ্ছল আনন্দে ছুটে বেরিয়ে এল হঠাৎ।

—কিছু ভেবোনা দাদা। সব খবরই রাখেন জ্যাঠামশাই—তোমার চাইতে ভালোই রাখেন।

চাপ দাড়ির ভেতরে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ দেখা গেল না, চোখের দৃষ্টিতে ফুটলনা বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য। খোঁচাটা তাঁকে যেন স্পর্শও করেনি—এ সবের অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর আসন।

—খবর ঠিক রাখা নয়—এগুলো হাওয়াতেই ভেসে আসে কিনা।—দাড়ির নেপথ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ একটু প্রসারিত হল, খুব সম্ভব হাসলেন : তা ভালোই। ওদের দুঃখ অনেক দিনকার—মেটাতে পারো তো একটা মস্ত বড় কাজই হবে। কিন্তু নগেন, কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলি।

—বলুন না।

—যা করছ ভালোই করছ। কিন্তু দেখো, হিংসার পথ কখনো নিয়োনা। ওতে কখনো কল্যাণ নেই। মহাত্মার পথ নাও, অহিংসা দিয়ে সংগ্রাম করো।

নগেন একটু হাসল: আপনি কোনো চিন্তা করবেন না জ্যাঠামশাই। 'অহিংসা পরমো ধর্ম' তা আমরা জানি। আমাদের ব্যাপারটা নিছক নিরামিষ—ওতে কোনো রক্তারক্তির গন্ধ নেই।

উত্তমা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। ঘরের শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে তার আকস্মিক হাসিটা লিক লিক করে গেল এক গোছা চাবুকের মতো।

—জানেন রঞ্জনদা, জ্যাঠামশাই ভারী অহিংস। উনি শুধু মাছ মাংস খাননা তাই নয়, ভুলেও কোনোদিন একটা ছারপোকা পর্যন্ত মারেন না।

আশ্চর্য সংযম মৃত্যুঞ্জয়ের। এ আঘাতও তাঁকে স্পর্শ করল না।

ধীর শান্ত গলায় বললেন, হাঁ, অহিংসার সেবক। আপনারা ইয়ংম্যান রঞ্জনবাবু, এখনো রক্তের জোর আছে। কিন্তু জানবেন, আত্মার শক্তিতে যা হয়, হাজার বাহুবলেও তা হয় না। আর তার সবচেয়ে বড় নজীর গান্ধীজী। সারা দুনিয়া সে কথা স্বীকার করে।

হাতের লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় উঠে পড়লেন।

—চললেন? নগেন জানতে চাইল।

—হাঁ, উঠি। একবার হরিসভার দিকেই যাই। সারাদিন তো বিষয়ের চিন্তাতেই মন বিক্ষিপ্ত থাকে, ওখানে গিয়ে তবু একটু শান্তি পাব। চলি তা হলে রঞ্জনবাবু, নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারী খুসি হলাম—আবার দেখা হবে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনজনেই কান পেতে শুনতে লাগল তাঁর বিলীয়মান চটির শব্দ।

—খুব অমায়িক লোক!—রঞ্জনই স্তব্ধতা ভাঙল।

—হাঁ, অত্যন্ত।—নিচের ঠোঁটটা একবার কামড়াল নগেন।

—ওঁর ওপর তোমাদের মিথ্যে সন্দেহ। অত্যন্ত নিরীহ মানুষ—বিনয়ে একেবারে লুটিয়ে আছেন—রঞ্জন আবার বললে।

—সাপও মাটিতে লুটিয়েই থাকে রঞ্জন-দা, কেবল ছোবল দেবার সুবিধের জন্যে।—উত্তমা আবার হাসল। কিন্তু উচ্ছল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নয়। ছোরার ধারের মতো। একটা প্রখর হাসির রেখা বয়ে গেল তার ঠোঁটের কোণায় কোণায়।

(ক্রমশঃ)

রায়-গুণাকর

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নত শিরে চিত্ত অর্ঘ্য যুগ হতে যুগান্তর দেয় তব জন্মপীঠ স্থানে,
এ বঙ্গের ইতিহাসে রেখে গেছ স্বর্ণ লেখা, অনন্তের পারে গেছ তুমি;
ভারতীর বরপুত্র! তোমারে প্রণাম করি হে ভারত! স্মৃতি অনুষ্ঠানে,
জাতির জীবনতীর্থ তোমার জনমক্ষেত্র সারস্বত সাধনার ভূমি।
হৃদয়ের কোণে কোণে আজো সদা জেগে থাকে অন্নদামঙ্গল রূপ লয়ে
ফাগুন দিনের স্মৃতি পূর্ণিমার অভিসার প্রণয়ের প্রাথমিক ছবি;
আলোক বর্ষের পথে যে আলোক যে আনন্দ ফুটে ওঠে নিত্যবস্তু হয়ে,
কতদিন কত বর্ষ চলে গেছে; এনেছিলে সেই আলো সে আনন্দ কবি!
বাণীর মন্দিরে তব শাশ্বত প্রতিষ্ঠা দেবী তীর্থযাত্রী-চিত্ত কোকনদে
নিত্যনব দিবসের পলে পলে সুরভিত স্তব গানে পরম সুন্দর।
অলঙ্কারে উপমায় অনুপ্রাসে ব্যঞ্জনায় রসোত্তীর্ণ ভাবের সম্পদে'
নিখিল জনের মৌন মহাকাব্য রচিয়াছ রাজকবি রায়-গুণাকর।
তুমি ছিলে রসার্ণব, ছন্দের তরঙ্গতব বহায়েছ মর্ম্ম উপকূলে,
সংসারের সাহারায় তোমারি যে রসধারা নবপ্রাণ দিল পান্থজনে।
বিচিত্র আনন্দ যত সাজায়েছ হিংসা তীব্র সভ্যতার পাদপদ্ম মূলে
দেশের মাটিরে সোনা করে গেছ স্পর্শমণি, সেই কথা পড়ে মোর মনে।
শঠতার রাজপথে বিদ্রূপের রসালাপ করে গেছ—নহে নিন্দনীয়,
যে বীজ করিয়া উপ্ত চলে গেছ গুণাকর মহীরুহে ব্যাপ্ত ভাবীকালে।
এনেছিলে সাথে করে সারস্বত কলধ্বনা; কীর্ত্তি তব চির কীর্ত্তনীয়,
নবযুগ সাহিত্যের পবিত্র প্রভাতী আলো দিয়ে গেলে দিক্‌চক্রবালে।
ভারতীর একতারা করে গেছ কাব্যবীণা, সুরে সুরে ফুটায়েছ বাণী,
মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি বীণার ঝঙ্কারে মিশি সম্মোহিত করেছে স্বদেশ।
যে হিল্লোলে সত্যরূপ কালের কল্লোলে জাগে তারি শুভ্র সৌম্য চিত্রখানি
দেখায়েছ বিশ্বমাঝে, হেরি যাহা ভুলে যায় যুগযাত্রী দুঃখ দৈন্য ক্লেশ।
একদা দিগন্ততলে তোমারে পালন করে হর্ষভরে রচিয়া সংসার
বর্ষণ মুখররাত্রি শরতের বসন্তের সন্ধ্যা ঊষা মুহূর্ত্ত-মন্থর।
জীবন প্রভাতে তব রূপে রসে সাজায়েছে স্বপ্নালোকে সুষমা সম্ভার
অরণ্যের ধূলি পথ, বটবিল্ব আম্রবীথি, তৃণাস্তীর্ণ বিজন প্রান্তর।
তোমার বারতা তারা আজিও বহন করে, কথা গাঁথে মনোনীলিমায়,
কাঁটার ব্যথায় যারা রঙীন্ গোলাপ হয়ে জেগে ওঠে, তাহাদের কানে,
শুনায় নিভৃতে কবি তোমার অমৃতকাব্য চন্দ্রালোকে মৃদুমন্দ বায়,
দেখার অতীত তুমি; স্মরণ-দীপালী তব জ্বলে গঙ্গা-হৃদি-বঙ্গপ্রাণে।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন—

স্বাধীন দেশে নূতন করিয়া স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। সম্প্রতি তাঁহার জন্মভূমি কৃষ্ণনগরে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে এক দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তথায় কবির কন্যা শ্রীমতী মায়া দেবী ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীদেবেন্দ্রলাল রায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। গত ২৯শে ভাদ্র কলিকাতা কালীঘাটে দেশবন্ধু বালিকা কলেজ ভবনেও এক দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন হইয়াছিল। ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন ও শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সিঁথি বিপিন-বনমালী সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগেও নিখিল ভারত দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী পাঠাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল মানুষ তৈয়ারীর জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন—আজ বাংলায় প্রকৃত মানুষের অভাবই সর্বাপেক্ষা অধিক। এ সময়ে লোক দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা করিলে সত্যই উপকৃত হইবে। সে দিক দিয়া এই সকল সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। আমরা এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী—

পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী হইতে গত ১১ই সেপ্টেম্বর ২৭ জন সদস্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—মোট ২১২ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ২০৩ জন ভোট দিয়াছিলেন। ৪৮ জন প্রার্থী ছিলেন—তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ২৭ জন নির্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীবিজয় সিং নাহার, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, জনাব আবদুল সত্তার, শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, শ্রীগোবিন্দ

সিংহ, শ্রীতারক দাস বন্দোপাধ্যায়, শ্রীদুর্গাপদ সিংহ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীশশধর কর, শ্রীহৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি, শ্রীবসন্তলাল মুরারকা, শ্রীলালবিহারি সিং, শ্রীভক্তচন্দ্র রায়, শ্রীফকিরচন্দ্র রায়, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধ মিশ্র। ইহাদের মধ্যে ৩জন—কালাপদবাবু, প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও নিকুঞ্জবাবু বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী। প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য এবং ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ও সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ছিলেন। এখনও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ১০ জন সদস্য নির্বাচিত হন নাই—তাঁহাদের নির্বাচনের পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর আর একজন সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী—

গত ৩০শে ও ৩১শে ভাদ্র বাংলার নানাস্থানে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৭০তম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার সাহিত্যের আলোচনা-সভা হইয়াছিল। ৩০শে এক সভায় ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন ও রাষ্ট্রপাল ডক্টর কাটজু তাহার উদ্বোধন করেন। ডক্টর কাটজু তাঁহার ভাষণে বলেন—"শরৎচন্দ্রের লেখা গুলির মধ্য দিয়া তিনি বাংলার গ্রাম ও তাহার সরল-প্রাণ অধিবাসীদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনা পড়িয়াছেন—তিনি যে সকল চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সেগুলি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, কেননা চরিত্র গুলি কাল্পনিক নহে, সেগুলি প্রাণবন্ত। তিনি নারীর মর্য্যাদাও বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।" শরৎ সাহিত্যের আলোচনার ফলে দেশের লোকের মানুষের প্রতি দরদ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা মনে করি। শরৎচন্দ্রের দরদী হৃদয় মানুষ মাত্রেরই দুঃখ, অমর্য্যাদা ও নির্য্যাতনে গলিয়া যাইত, তাই তিনি লেখনী দ্বারা সেই সকল দুঃখ ও নির্য্যাতনের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকাশ করিয়াছিলেন বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার নারী হৃদয়ের গোপন কাহিনী, না বলা ব্যথারইতিহাস! তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি পাঠক সাধা-

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রণের সকলের নিকট সুপরিচিত—সেই জন্যই শরৎ সাহিত্য এ দেশে এত অধিক জনপ্রিয় হইয়াছে। শরৎসাহিত্য আলো চনা করিয়া দেশের মানুষ বর্তমান দুর্গতি হইতে মুক্তির সন্ধা লাভ করুক—তবেই এইসকল সভানুষ্ঠান করা সার্থক হইবে

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী—

গত ১২ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নবনির্বাচিত সদস্যগণের প্রথম সভা হইয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ২১২ জন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—তন্মধ্যে ১৯২ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। কমিটীর পূর্ব্ব সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ অনুপস্থিত থাকায় সহ-সভাপতি শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীঅতুল্য ঘোষ কমিটীর নূতন সভাপতি ও শ্রীবিজয় সিং নাহার সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশশধর কর ও

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন ৩জন সহ-সভাপতি এবং জনাব আবদুল সত্তার, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবীর জানা—৩জন সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ এবং নিম্নলিখিত ২১ জন কার্য্যকরী কমিটীর সদস্য হইয়াছেন—শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মন, শ্রীহৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীউমেশচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিশ্র, শ্রীদুর্গাপদ সিং, শ্রীসুনীল ঘোষ মৌলিক, শ্রীজংবীর সাবকোটা, শ্রীকালীকমল বসু, শ্রীগোপিকাবিলাস সেন, শ্রীসত্য নারায়ণ মিশ্র, শ্রীবসন্তলাল মুরারকা, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি। এবার নির্বাচনে কোন দলাদলি দেখা যায় নাই—ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। নূতন কর্ম্মীরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে নূতন মর্য্যাদা দান করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

মফঃস্বলে উচ্চ শিক্ষার প্রচার—

কলিকাতার কলেজসমূহে ছাত্রাধিক্যের প্রতীকারকল্পে গভর্ণমেণ্ট মফঃস্বলে কলেজ প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তদনুসারে এবার নূতন ৭টি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে—(১) বোলপুর কলেজ, বীরভূম (২) রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম (৩) বরিসা কলেজ, ২৪ পরগণা (৪) কান্দি রাজ-কলেজ, মুর্শিদাবাদ (৫) জঙ্গীপুর কলেজ, (৬) মণিমালা মহিলা কলেজ, আসানসোল ও (৭) দমদম মতিঝিল কলেজ, ২৪ পরগণা। খড়গপুর ও শান্তিপুরে পূর্বেই কলেজ হইয়াছিল, সেগুলিতে নূতন আই-এসসি ক্লাস খোলার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। গত কয় বৎসরে মফঃস্বলে জিয়াগঞ্জ, কাঁথি, তমলুক, মহিষাদল, কালনা, ডায়মণ্ডহারবার, কাটোয়া, বসিরহাট, নবদ্বীপ, আমতা, গোবরডাঙ্গা, নৈহাটী, আহার-বেলমা, উলুবেড়িয়া, আসানসোল, বিষ্ণুপুর, গড়বেতা প্রভৃতি বহু স্থানে কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। সে গুলিতে যাহাতে বেশী ছাত্র যায়, কর্তৃপক্ষের সে জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। সহরের আবহাওয়া ভাল নহে—তাহার উপর ব্যয়ও অত্যন্ত অধিক। সে জন্য মফঃস্বলে অল্পসংখ্যক ছাত্র লইয়া অধ্যাপনার নানা সুফল ফলিবে। যেমন নূতন ৭টি কলেজকে গভর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য দিবেন, তেমনই মফঃস্বলস্থ অন্যান্য কলেজগুলির ও যেন অর্থাভাব পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। নূতন আবহাওয়ায় ছাত্ররা যেন নূতন যুগের উপযোগী প্রকৃত মানুষ তৈয়ারা হয়, অধ্যাপকগণকেও আমরা সে বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

সমবায় নীতি প্রসার ব্যবস্থা—

পূর্বে বাংলা দেশে সমবায় নীতি প্রসারের জন্য সমবায় সংগঠন সমিতি ছিল এবং বেসরকারী ত্যাগী কর্ম্মীরা সে বিষয়ে কাজ করিতেন। স্বর্গত সুধীরকুমার লাহিড়ীর নাম এ বিষয়ে স্মরণীয়। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের নূতন সমবায় মন্ত্রী

ডাঃ আর-আহমদের চেষ্টায় ঐ কার্য্যের জন্য 'সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। গত ৩০শে ভাদ্র শনিবার ২২নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউর বাড়ীতে তাহার উদ্বোধন উৎসব হইয়াছিল। নূতন সমিতির সভাপতি শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া এক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীসরল কুমার ঘোষ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীতারাপদ চৌধুরী নূতন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। সমবায়-মন্ত্রী মহাশয় সমিতির উদ্বোধন করিয়া সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলকে বুঝাইয়া দেন। দেশকে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন করিয়া গঠন করিতে হইলে সমবায়ের প্রয়োজন কত অধিক তাহা বলার প্রয়োজন নাই। যে সকল কারণে এদেশে এতদিন সমবায় আন্দোলন উপযুক্ত সাফল্য লাভ করে নাই, সমিতি সে সকল কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিলে দেশ উপকৃত হইবে এবং সমিতি গঠনও সার্থক হইবে।

উদ্বাস্তু আগমনের হিসাব—

নয়া দিল্লীর সরকারী হিসাব হইতে জানা গিয়াছে যে ১৯৫০ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত মোট ৮২ লক্ষ ২৭ হাজার লোক পাকিস্তান হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ৫০ লক্ষ ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে ৩২ লক্ষ ২৭ হাজার লোক আসিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান হইতে, গত জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ৭ মাসে মোট ২৬ লক্ষ ৪১ হাজার হিন্দু ভারতে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার হিন্দু ফিরিয়া গিয়াছে—এখন ১৯ লক্ষ ৬৯ হাজার হিন্দু আছে। ঐ ৭ মাসে ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার মুসলমান ভারত হইতে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে ৩ লক্ষ ২১ হাজার মুসলমান ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ১৯৪৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১২ লক্ষ ৫৮ হাজার হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিল। এই সকল উদ্বাস্তদের লইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টকে কত বিব্রত হইতে হইয়াছে তাহা না বলাই ভাল। পশ্চিম পাকিস্তানে আর হিন্দু প্রায় নাই বলিলেই চলে। ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানও হিন্দুশূন্য হইবে। কিন্তু ভারতে এখনও ৪ কোটি মুসলমান বাস করিতেছেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানে যদি হিন্দুদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা না হয়, তবে দিল্লী চুক্তি কি ভাবে পালিত হইবে—তাহা জন সাধারণ বুঝিতে পারে না।

আসামের ভূ-কম্পন-বিধ্বস্ত পার্বত্য অঞ্চলে বিমান হইতে খাদ্য নিক্ষেপ—এ-স্থানে গমনাগমনের সমস্ত স্থলপথ ও জলপথ নিশ্চিহ্ন—খাদ্যাভাবে এ অঞ্চলের পার্বত্য অধিবাসীদের চরম অবস্থা

কোনারক সূর্য্যমন্দির—

উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে কোনারকে যে সূর্য্যমন্দির আছে তাহা ভারতের স্থাপত্য শিল্পের প্রধানতম নিদর্শন বলিয়া খ্যাত। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে ঐ মন্দির রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ মন্দির দ্রুত ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সে জন্য প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর চেষ্টায় উহা রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটীতে অন্যান্য সদস্যের মধ্যে উড়িষ্যার নেতা শ্রীবিশ্বনাথ দাস, খ্যাতনাম বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ভারতের খ্যাতনাম শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীকে লওয়া হইয়াছে কোনারক মন্দির সম্ভবত ৯ম বা ১২শ শতাব্দীতে

নির্মিত, ঠিক সময় এখনও স্থির হয় নাই। নির্মাণে কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা এখন আর হিসাব করা যায় না। ভারত গভর্ণমেণ্ট উহার রক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী হওয়ায় দেশবাসীর ধন্যবাদার্জ্জন হইয়াছেন। পশ্চিম ভারতে যেমন সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মিত হইতেছে, দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে কোনারকের মন্দির রক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন আছে ইহা অনস্বীকার্য।

শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার—

রাষ্ট্রসংঘের সেবক ডাক্তার রালফ্‌ বাঞ্চে এবার শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি একজন আমেরিকান নিগ্রো ক্রীতদাসের পৌত্র। প্যালেস্টাইনে ইহুদী ও আরবদের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করায় তিনি বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জ্জন করেন। নিগ্রোদের মধ্যে ইনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পাইলেন। বাঞ্চে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির অধ্যাপক। এ বৎসর নোবেল পুরস্কারের দাম ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩০৩ সুইডিস ক্রোনার—তাঁহার নোবেল পুরস্কার লাভ যোগ্যের সমাদর বলিয়া বিবেচিত হইবে।

রাষ্ট্রদূত কর্ত্তৃক ব্যবসা—

ভারতের জনৈক রাষ্ট্রদূত প্যারিসে (ফ্রান্স) অবস্থান কালে বহু মূল্যবান জহরতাদি ক্রয় করে। পরে কোনরূপ শুল্ক না দিয়া সে ঐ সকল জহরত ভারতবর্ষে আনিয়া এখানে বিক্রয় করিয়াছে। রাষ্ট্রদূতগণেরও বিনা শুল্কে কোন বিদেশী জিনিষ ভারতে আনয়নের অধিকার নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের পুলিশ এ সংবাদ পাইয়া এ বিষয়ে নাকি তদন্ত করিয়াছে ও বিষয়টি নাকি সত্য বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছে। এখন তাহা ধামা-চাপা দিবার চেষ্টা চলিতেছে। কয়েক-জন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের আত্মীয় স্বজনকে রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহাদের গুণ সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিত না। কাজেই এইরূপ জুয়াচুরির ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নহে। রাষ্ট্রদূত-দের এমন অনেক কাজ করিতে হয়, যাহাতে রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা লাভ বা ক্ষতি হইতে পারে। সে কাজে যদি এরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন জুয়াচোরকে নিযুক্ত করা হয়, তবে সে নিয়োগ কখনই সমর্থন করা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, পত্রান্তরে প্রকাশিত সংবাদটির সত্যাসত্য সম্বন্ধে সরকারী বিবৃতি প্রচার করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট জনগণকে সন্তুষ্ট করিবেন।

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অদ্ভুত সংবাদ—

বোম্বাই হইতে 'ইণ্ডিয়া' নামক একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। অদ্ভুত সংবাদ প্রকাশই তাহার বিশেষত্ব। সম্প্রতি তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে—"নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩০ সালে এক অষ্ট্রিয়াবাসী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের একটি কন্যা হয়। মাতা ও কন্যা এখন ভিয়েনা সহরে বাস করেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার দূত শ্রীরাঘবম্ পিলাইকে তাহাদের কাছে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাদের অর্থকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন।" সংবাদটি এক শ্রেণীর লোকের মুখরোচক হইবে। কিন্তু যাহারা সুভাষচন্দ্রকে জানেন তাঁহারা এ সংবাদ বিশ্বাস করিবেন না। তাহা হইলেও পণ্ডিত নেহরু গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এ সংবাদের প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন।

নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘ—

বাংলাদেশের সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিকপত্র সমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘ গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ সংঘের সদস্যগণ একটি ক্লাব গঠন করিয়াছেন এবং ক্লাবের পাক্ষিক অধিবেশনে এক এক জন বিশিষ্ট বক্তা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। গত কয় দিনে প্রবাসীর শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, বঙ্গশ্রী-সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সমবায় মন্ত্রী ডাঃ আর আহমদ, প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করিয়াছেন। কলিকাতা হাতিবাগান বাজারের দ্বিতলে (৮১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) রূপমঞ্চ কার্য্যালয়ে ক্লাবের অধিবেশন হইয়া থাকে। তরুণ সাংবাদিকগণ ক্লাবের সভায় যোগদান করিয়া ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া লাভবান হইয়া থাকেন।

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার নন্দী—

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার নন্দী সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদ বিদ্যায় এম্-এস্‌সি পাশ করিয়া কিছুদিন বিজ্ঞান কলেজে গবেষণার পর বিলাত যাত্রা করেন ও লণ্ডন হইতে পি-এচ্-ডি উপাধি লইয়া আসেন। কলিকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরেও তিনি গবেষক ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি আসামে কৃষি বিভাগে কাজে নিযুক্ত হন ১৯৪৫ সালে উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর হন। সম্প্রতি তিনি বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক—তাঁহার দ্বারা পশ্চিম বাংলার কৃষি বিভাগের কার্য্যের উন্নতি হইবে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করেন।

কবি-দম্পতির বিলাত-ভ্রমণ—

ভারতবর্ষের পাঠকগণ অবগত আছেন যে কবি-দম্পতি শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবী তাঁহাদের কন্যা কুমারী নবনীতাকে সঙ্গে লইয়া ইউরোপ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। শ্রীযুত নরেন্দ্র বাবু ১লা আগষ্ট তারিখে অসলো সহর হইতে এক পত্রে জানাইয়াছেন—"আমরা লণ্ডন থেকে বেরিয়ে ডোভার থেকে সমুদ্র পার হ'য়ে বেলজিয়ামে আসি। বেলজিয়ামের অষ্টেণ্ড, ঘেণ্ট, ব্রুজেস, ব্রাশেলস্, ওয়াটারলু (যেখানে ঐতিহাসিক যুদ্ধে মহাবীর নেপোলিয়নের পরাজয় হয়েছিল) ও এণ্টোয়াপ হয়ে আমরা হল্যাণ্ডে প্রবেশ করি। সেখানে রুজেনদান, রটারডাম, হেগ ও আমষ্টার্ডাম ঘুরে হ্যামলেটের দেশ ডেনমার্কে যাই। ডেনমার্ক বেড়িয়ে কোপেনহেগেন যাবার পথে আমাদের প্রায় অর্দ্ধেক জার্মানী মাড়িয়ে যেতে হয়েছে—বেন্থায়েম্, অসনাব্রুপ, ডসেলড্রফ, ব্রেমেন, হাম্বুর্গ প্রভৃতি গত যুদ্ধে প্রসিদ্ধ স্থানগুলির উপর দিয়ে যেতে হয়েছে। যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন আজও মেলায় নি। কোথাও না। লণ্ডনে, বেলজিয়মে, হল্যাণ্ডে অসংখ্য ভাঙা পোড়ো বিধ্বস্ত বাড়ী জনশূন্য হয়ে রয়েছে। এখনও মেরামত হয়ে ওঠে নি। ডেনমার্কে কিন্তু জার্মানীর কোন আঘাত চিহ্ন দেখতে পেলুম না। ডেনমার্ক থেকে সুইডেনে যাই। হল্যাণ্ড থেকে ডেনমার্কে আসবার সময় ট্রেণ থেকে নামতে হয় নি। ট্রেণশুদ্ধ সমস্ত যাত্রীকে জাহাজে তুলে সমুদ্র পার করে দিয়েছিল। ভেবেছিলুম, ডেনমার্ক থেকে ষ্টকহলম যাবার বেলায়ও বুঝি তাই হবে, কিন্তু হতাশ হতে হল। আমাদের সবাইকে ট্রেণ থেকে নেমে বোঁচকা বুঁচকি ঘাড়ে করে জাহাজে গিয়ে উঠতে হল। জাহাজ থেকে নেমে আবার মোটর বাসে উঠে ষ্টেশনে এলুম এবং সেখান থেকে ট্রেণে চড়ে তবে এসে ষ্টকহলমে পৌছই। সুইডেন শেষ করে নরওয়ে এসেছি। গত সপ্তাহে উত্তর মেরু প্রদেশের নিকটস্থ নার্ভিকে গিয়ে 'দুপুর রাতের সূর্য ওঠা' দেখে কাল অসলোয় এসেছি। পরশু বার্গেন বেড়িয়ে আবার জাহাজে উঠে নিউক্যাসেল হয়ে লণ্ডনে ফিরবো, ৭ই আগষ্ট নাগাত। এডিনবরায় এ বছর ওয়ার্লডস্ পি-ই-এন কংগ্রেস হবে ১৮ই

কবি নরেন্দ্র দেব

থেকে ২২শে আগষ্ট। ভারতীয় পি-ই-এনের প্রতিনিধিরূপে আমরা এই কংগ্রেসে উপস্থিত থাকবো। পি-ই-এন কংগ্রেস শেষ করে স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্লাণ্ড ঘুরে আমরা য়ুরোপে ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্ব সুরু করবো—অর্থাৎ ফ্রান্স, জার্মাণী, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, পোর্তুগাল, ইতালী এবং রুমানিয়া, যুগোস্লোভিয়া ও চেকোস্লোভিয়া হয়ে ৺পূজার সময় দেশে ফিরবো।'

লণ্ডন থেকে ২৮শে আগষ্ট নরেন্দ্রবাবু আর এক পত্রে জানাইয়াছেন—

"আপনি শুনে সুখী হবেন যে এডিনবরায় অনুষ্ঠিত World's International P. E. N. Congress এ আমরা দুজনেই ভারতের official delegate নিযুক্ত হয়ে যাই এবং সেখানে আমরা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছি। সার সি, পি, রামস্বামী আয়ার ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। পাকিস্তান থেকে সার সোয়ার্দির মেয়ে ডাঃ বেগম শায়েস্তা ইক্রামউল্লা ও পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারী শেখ মহম্মদ ইক্রাম official delegate হিসাবে এসেছিলেন এবং আমাদের কবি জসিমুদ্দীন সাহেব P. E. N. এর সাধারণ সদস্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বেগমইক্রামউল্লা মেয়েটি

ইণ্টারন্যাশানাল পি-ই-এন কংগ্রেসে (এডেনবরা) কবি নরেন্দ্র দেব ও তদীয় পত্নী শ্রীরাধারাণী দেবী

খুব ভাল। সে লণ্ডনের এম-এ, পিএচ্-ডি। চমৎকার বক্তৃতা দিলে। সাম্প্রদায়িকতার ধার দিয়েও যায় নি। মহম্মদ ইক্রাম সাহেব মুখ খোলেন নি। জসিমুদ্দীন সাহেবও বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট, অত্যন্ত খেলো বক্তৃতা। তাতে তিনি নিজেকেও সেই সঙ্গে পূঃ পাকিস্তানকেও ছোট করে ফেলেছেন।"

* * * *

"এডিনবরা থেকে আমরা Lake Districtএ বেড়াতে চলে যাই। অবশ্য তার আগে সারা স্কটল্যাণ্ড চষে বেড়িয়েছি। লেক প্রদেশে windermere থেকে Keswic পর্য্যন্ত ঘুরেছি মোটরেও মোটর বোটে। কবি wordsworth এর Dove cottage সমাধি দেখবার জন্ম Grasmere যাই, সেখান থেকে লণ্ডনে ফিরি।"

২৫শে জুলাই ষ্টকহলমে সেখানকার সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় সংবাদপত্র 'ডাজেন্স নেহার' এর প্রতিনিধি কবি-দম্পতির সহিত দেখা করিয়া তাঁহার কাগজে যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহার অনুবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম। লণ্ডনের কোন কোনও কাগজে ও P. E. N. কংগ্রেসের সংবাদের সঙ্গে কবিদম্পতির চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে এবং সিনেমার 'নিউজ রীলে'র মধ্যেও P. E. N. Congress-এর ছবিতে তাঁহাদের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সার ওয়াল্টার স্কটের বাড়ী দেখিবার জন্য কবিদম্পতি যখন এডিনবরা হইতে ৩৬ মাইল দূরে abbâtsfudএ যান তখন সেখানে স্কটের প্রপৌত্রের মুখে তাঁহারা শুনিয়াছেন যে এডিনবরা ও গ্লাসগোর সংবাদপত্রে তাঁহাদের ছবি ও বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে।

'ষ্টকহলম'এর পত্রে প্রকাশিত বিবরণ

এডিনবরায় পি-ই-এন কংগ্রেসে যাবার পথে এক ভারতীয় লেখক-দম্পতি সুইডেনে এসেছেন। শ্রীমতী আকারে ছোট কিন্তু তাঁর আকৃতি কবিত্বব্যঞ্জক। শ্রীযুত বেশ ভারিক্কি ওজনের এবং নিবিড় গুম্ফ সমালঙ্কৃত। শ্রীমতী কবিতা লেখেন। তিনি পৃথিবীর পুরুষদের নারীর বাহিরের রূপ ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের চেয়ে তাদের প্রতিভা ও মানসিক সৌন্দর্য্যের প্রতিই আকৃষ্ট হতে বলেন। শ্রীযুত দেব বাংলা ভাষায় নানা বিভাগেই লেখেন। তিনি বেয়র্ণসন, ইবসেন প্রভৃতির রচনার অনুবাদও করেছেন।

শ্রীযুক্তা দেব 'গভীর রাতে সূর্য্যোদয়' দেখবার জন্য আগ্রহান্বিত। আমরা আশা করি, তিনি দুপুর রাতের সূর্য্যের উপর বাংলা ভাষায় একটি কবিতা লিখবেন। শ্রীযুত দেব য়ুরোপের এই প্রসিদ্ধ প্রদেশটিকে পর্য্যবেক্ষণ করছেন। শ্রীমতী কথা বলেন একটু দ্রুত এবং দেব মহাশয়ের আগেই বলেন। শ্রীযুত অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে শ্রীমতীর কথাগুলি শোনেন। যেন তিনি চিরদিনই এমনি শুনতে অভ্যস্ত। এই লেখক-দম্পতি বিবাহিত জীবনের সঙ্গীত মাধুর্য্যের ও পরস্পর সহযোগিতার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এঁরা যেন ইংরাজ কবি দম্পতি শ্রীমতী এলিজাবেথ ও শ্রীযুত রবার্ট ব্রাউনিংয়ের ভারতীয় সংস্করণ।

শ্রীযুত দেব এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ খানি গ্রন্থ রচনা

করেছেন—কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি এবং শ্রীমতীর ৮ খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সমস্তই বাংলা ভাষায় লেখা। এঁরা দুজনেই রবীন্দ্র যুগের সাহিত্যিক।

ভারতবর্ষে নানা ভাষা প্রচলিত থাকার দরুণ লেখকদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া মুস্কিল। এ ছাড়া সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনীতিক সমস্যা ও তাঁদের অগ্রগমনের পথে বাধা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীমতা দেব বলেন পুরুষরা যেন নারীদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন করেন। তিনি চান, নারীর বাহিরের সৌন্দর্য্যের চেয়ে অন্তরের সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে। তিনি বলেন—মেয়েদেরও বদলাতে হবে। তাঁরা লঘু ব্যাপারে মেতে না থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করুন। পৃথিবী থেকে যুদ্ধ বন্ধ করতে ও মানব সভ্যতার উন্নতি কল্পে তাঁরা কাজ করুন। মেয়েদের মধ্যে যে মাতৃস্বরূপিনী নারী আছেন তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। এই ভাবে পুরুষের মানসিক পরিবর্ত্তনের জন্য ও নারীর বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়ার ফলে পৃথিবীর উন্নতি হবে, কারণ মানসিক সৌন্দর্য্য এমন এক বস্তু, যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হয়ে যায় না, বরং আরও উজ্জ্বল হয়।

তিস্তা নদীর জলপ্লাবন—

কালিম্পং হইতে খবর আসিয়াছে, তিস্তার শাখা লাচেন নদীর গতিপথে ধ্বস নামায় তিন মাস ধরিয়া নদীর জল অবরুদ্ধ ছিল। ফলে গাংটকের ৪০ মাইল উত্তরে ৮ মাইল ব্যাপী স্থলে জল জমিয়া হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছিল। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রবল বৃষ্টির ফলে এই ধ্বস নামিয়া যায় ও তিস্তার জল অভূতপূর্ব্বভাবে বাড়িয়া যায়। বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়! নদীর ধারে ধারে তৈল ভাসিয়া যাইতেছে—ঐ তৈল কোথা হইতে আসিতেছে কেহ বলিতে পারে না। এই সংবাদ অতীব শঙ্কাজনক—তিস্তার জল বৃদ্ধির ফলে সেতু নষ্ট হইবে ও জলপাইগুড়ীতে আবার প্লাবন হইবে। এ বৎসর দৈবদুর্বিপাক আমাদের কত ক্ষতিগ্রস্ত করিবে কে জানে? পৃথিবী যে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন—

কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন ১৮৮২ সালে এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন ও আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৯৯ সালে তিনি কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবকরূপে ও ১৯০৬ সালে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ১৯১০ সাল হইতে তিনি হিন্দী সাহিত্য প্রচার আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ করিয়া আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন ও তদবধি কংগ্রেস ও দেশসেবার কাজ
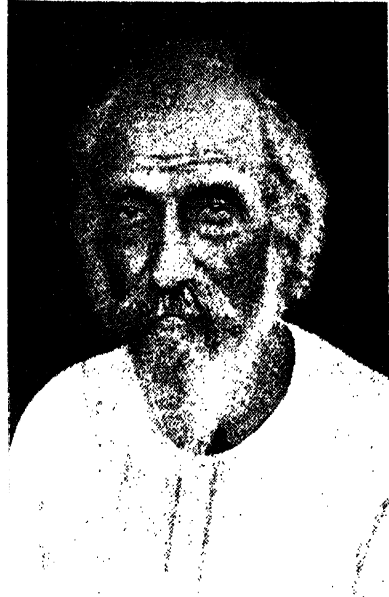
নূতন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন

করিতেছেন। ১৯২৯ সালে তিনি লালা লাজপৎ রায় প্রতিষ্ঠিত লোক সেবক সমিতির সভাপতি হন। ১৯২৩ সালে তিনি যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি হইয়াছিলেন ও তাহার পর কিছুকাল লাহোরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ও ম্যানেজারের কাজ করিয়াছিলেন। বহুবার তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন ও ১৯৩৭ সালে যুক্ত প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকারের কাজ করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি কংগ্রেস সভাপতি

নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি জুতা ব্যবহার করেন না, চিনি, লবণ, ঘৃত, দুগ্ধ, মসলা প্রভৃতি

দূর হইতে গোদাবরী তীরে নাসিক

ফটো—দিলীপ দত্ত

ব্যবহার করেন না। তিনি কথনও সরু চাল খান না—অত্যন্ত সাধারণ পোষাক ব্যবহার করেন। উত্তর প্রদেশে
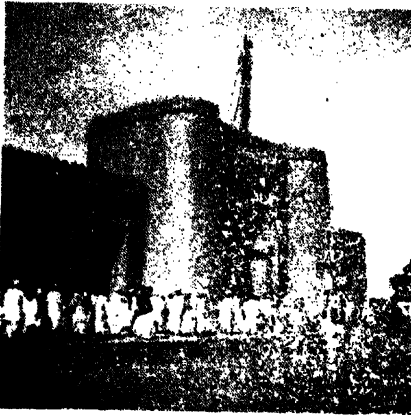
নাসিকে গান্ধী নগরের প্রধান তোরণ

ফটো—দিলীপ দত্ত

সকলে তাঁহাকে রাজর্ষি বলে। তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেস ও দেশের মঙ্গল হইলেই লোক তাঁহার নির্ব্বাচন সার্থক মনে করিবে।

মূল প্রস্তাব—

নাসিক কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটিকেই মূল প্রস্তাব বলা হইয়াছে।

নাসিক কংগ্রেস অভিমুখে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ফটো—দিলীপ দত্ত

প্রস্তাবটি এইরূপ—"জাতীয়তা-বিরোধী ও প্রতিক্রিয়া-পন্থীরা ভারতের উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া কংগ্রেস দেশে
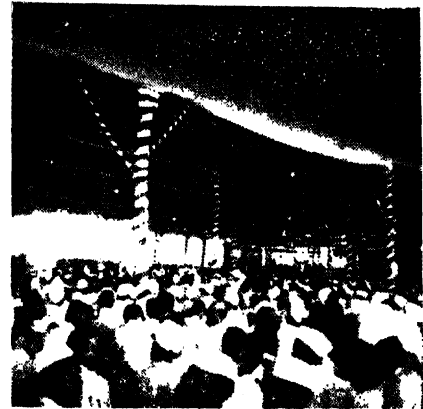
নাসিক কংগ্রেসে কুটীর শিল্প-প্রদর্শনীতে দর্শকের ভিড়

ফটো—দিলীপ দত্ত

সাম্প্রদায়িক পার্থক্যবৃদ্ধির অবসান ঘটাইতে চায়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে উত্তেজনা ও গুরুতর সমস্যার উদ্ভব

হইয়াছে, ভারতের মর্য্যাদা ও স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও দৃঢ়তার সহিত সেগুলির সমাধান প্রয়োজন এবং চেষ্টা করিলেই উহার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব। যুদ্ধের পথ অবলম্বন না করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে দুই দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইতে ভারত সরকার পাক সরকারের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহা সমর্থন করে। কংগ্রেস দিল্লী চুক্তিও অনুমোদন করিতেছে। ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া সকল সম্প্রদায় ও ব্যক্তিকে সমান অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়াছে এবং ধর্ম্মের ব্যাপারে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবহার করে না। অতএব প্রত্যেক

নাসিক কংগ্রেসের তোরণ সমীপে নূতন সভাপতির আগমন-প্রতীক্ষায় দর্শকগণ ফটো—দিলীপ দত্ত

কংগ্রেস কর্ম্মীকে সকল রকম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কংগ্রেস আহ্বান করিতেছে।" এই সমস্যা আজ ভারতকে সর্ব্বপ্রকারে বিব্রত ও বিপন্ন করিয়াছে। এই প্রস্তাব কি সে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে? যদি করে, তবেই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। নচেৎ দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি ও গোরক্ষা—

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন গত ১৮ই সেপ্টেম্বর নাসিকে নিখিল ভারত গোরক্ষা ও বনস্পতি বর্জ্জন সম্মিলনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"কেবল মাত্র গোরক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এবং প্রস্তাব গ্রহণ

গান্ধীনগর অভিমুখে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু—পথের দুই পার্শ্বে দর্শনেচ্ছু জনতা। সারিবদ্ধ মোটরগুলির প্রথম মোটরে পণ্ডিতজীকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যাইতেছে ফটো—পান্না সেন

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন সস্ত্রীক ফটো—পান্না সেন

করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই হইবে না, দৈনন্দিন জীবনে জনসাধারণকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। চামড়ার ব্যবসার জন্য এদেশে লোক গো-হত্যা করে। চামড়া রপ্তানী বন্ধ

হইলে যদি বহুমূল্য ডলার হারাইতে হয়, আমরা তাহাতে প্রস্তুত আছি। জনসাধারণের পক্ষে চামড়ার জুতা বর্জ্জন ও তৎপরিবর্ত্তে রবারের বা কাপড়ের জুতা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।" এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত ট্যাণ্ডন জনসাধারণকে বনস্পতি ব্যবহার না করার জন্ম অনুরোধ করেন। যদি ভাল ঘৃত বা তৈল না পাওয়া যায় তাহা হইলে

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং দুইজন মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ফটো—পান্না সেন

কিছুই ব্যবহার না করা ভাল। শ্রীযুত ট্যাণ্ডন নিজে গত ১৯০৮ সাল হইতে চামড়ার জুতা ব্যবহার করেন না। ভারতে গোধন প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে—এ অবস্থায় কংগ্রেস-সভাপতির মত ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন, তবে দেশের লোক পুনরায় গো-ধন রক্ষায় অনুরাগী হইতে পারে। মৃতপ্রায় জাতির নিকট যে কোন আবেদনই উপস্থিত করা হউক না কেন, তাহা তাহার কর্ণে প্রবেশ করে না।

শ্রীল রামদাস বাবাজী জয়ন্তী—

খ্যাতনামা বৈষ্ণব ভক্ত ও কীর্ত্তনগায়ক শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের নাম শুধু বাঙ্গলার বৈষ্ণব সমাজে নহে, ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তিনি শুধু নাম প্রচার করেন না; স্বর্গত রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া সকল বৈষ্ণব তীর্থ উদ্ধার ও রক্ষায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু তীর্থস্থান সংস্কার করা হইয়াছে ও সংস্কৃতক্ষেত্রে বিগ্রহসেবাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে প্রায় এক মাস ধরিয়া কলিকাতা ও সহরতলীর নানাস্থানে রামদাস বাবাজী জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র বাবাজী মহাশয়ের জীবন ও কার্য্যাবলার কথা আলোচিত হইয়াছে ও বাঙ্গালী জনগণকে তাঁহার আদর্শ রক্ষায় সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। বাবাজী মহাশয়ের বয়স ৭৪ বৎসর—তিনি সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন লাভ করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে নূতন জীবন দান করুন ও তদ্দ্বারা বাঙ্গালী জনগণ উপকৃত হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই প্রার্থনা করি।

রাজগীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—

স্বামী কৃপানন্দ মহারাজ বিহারে পাটনা জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থক্ষেত্র রাজগীর নামক স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গত কয় বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী ও স্বাস্থ্যান্বেষীদের নানাভাবে সেবা করিতেছেন। সম্প্রতি তথায় তিনি একটি মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটি ধর্ম্মশালা স্থাপন করিতেছেন। সে জন্য একখণ্ড জমী সংগৃহীত হইয়াছে ও কয়েক লক্ষ ইট প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতায় কয়েকটি সিনেমারও কয়েক সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। আশ্রম পরিচালনের জন্য কলিকাতায় একটি কমিটী গঠন করিয়া রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী পর্য্যটকদের নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। স্বামীজি তাহা দূর করার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়া বাঙ্গালী জনসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, ধনী ও সহৃদয় বাঙ্গালীরা স্বামীজির এই মহৎ কার্য্যে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানে বাধিত করিবেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জ ও কম্যুনিষ্ট চীন—

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের প্রতিনিধি শ্রীনরসিংহ রাও রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে কম্যুনিষ্ট চীন সরকারের প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণের দাবীর প্রস্তাব করিলে ভোটে উহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। শ্রীরাও বলেন—ভারত

সরকার এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, পিপিং সরকার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা সত্বেও প্রস্তাবের পক্ষে ১৬জন ও বিপক্ষে ৩৩জন সদস্য ভোট দেন। মার্কিণ পক্ষ এখনও চীনের কুও—মিংটাং পক্ষকে সমর্থন করিতেছেন। তাঁহাদের দলের এখন চীনে কোন প্রভাব নাই। সে দলের কয়েক জন সদস্যও কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করিয়া দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ কবে ধনিকতন্ত্রের প্রভাব মুক্ত হইবে কে জানে?

সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালী—

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে ভারতের প্রধান সেনাপতি কে-এম-করিয়াপ্পা ছাত্রছাত্রীদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভারতের সকল রাজ্যের অধিবাসীরই যোগদান করিবার সমান সুযোগ আছে—তৎসত্বেও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালার অধিবাসীদের সংখ্যা সামান্য, ইহা হতাশার কথা। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন—যদি উপযুক্ত যোগ্যতাসহ যথাযোগ্য বাঙ্গালী তরুণ পাওয়া যায়, তবে তিনি অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী তরুণকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করিবেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালী গ্রহণ করিবার নীতি তিনি চালাইয়া যাইবেন। তিনি আশা করেন, বাঙ্গালী যুবকগণ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া অধিক সংখ্যায় সেনাবাহিনীতে যোগদানার্থ আগাইয়া আসিবেন। আমাদের বিশ্বাস, ইহার পর সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য বাঙ্গালী তরুণদের অভাব দেখা যাইবে না।

বিহার দুর্ভিক্ষ ও শ্রীজয়প্রকাশ—

সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ১৪ দিন ধরিয়া বিহারের মুঙ্গের, শারসা, পুর্ণিয়া, ভাগলপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলায় ঘুরিয়া দুর্ভিক্ষ ও বন্যা-বিধ্বস্ত স্থানসমূহ দর্শন করিয়াছেন। তাহার পর ১৫ই সেপ্টেম্বর পাটনায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছেন—"রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত বিহারের দুর্ভিক্ষের কথা অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, বৃটীশ রাজ যদি আজ কায়েম থাকিত ও কংগ্রেস যদি বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকিত এবং প্রভূত অবস্থা যদি ইহার অর্দ্ধেক শোচনীয় হইত, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ ঘোষণার জন্য কংগ্রেসেই চীৎকার করিত। আজ অবস্থা অনুরূপ বলিয়া কংগ্রেস দুর্ভিক্ষ ঘোষণার বিরোধী। আমি দেখিয়াছি, পুর্ণিয়া জেলার রূপালি থানার তেলদিহা গ্রামে ৩২ জন অনশনে মারা গিয়াছে। লোক গাছের পাতা, মূল, কাঁকড়া, শামুক প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে।" শ্রীজয়প্রকাশের এই বিবৃতির পরও কি বিহার-সরকার আর্ত্তত্রাণের কোন ব্যবস্থা করিবেন না। বিহারের বহু জেলা হইতে খাদ্যাভাবপীড়িত দরিদ্র জনগণ দলে দলে পশ্চিম বাঙ্গলায় চলিয়া আসিতেছে—সে জন্য আজ বাংলার অবস্থাও আশঙ্কাজনক হইয়াছে।

কাশ্মীর ও পাকিস্তান—

কাশ্মীর বিরোধ লইয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ যে আপোষের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ প্রেরিত প্রতিনিধি বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে ও আপোষ মীমাংসার ভার উভয় রাষ্ট্রের উপর ছাড়িয়া দিবার নির্দ্দেশ দান করিয়াছে। কিন্তু তাহার পরও কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের মনোভাব লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর গিলগিটে পাকিস্তান রাষ্ট্রপাল খাজা নাজিমুদ্দীন এক সম্বর্দ্ধনা সভায় বলিয়াছেন—"কাশ্মীরকে মুক্ত করা প্রত্যেক পাকিস্তানী ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গ বলিয়া মনে করে এবং পাকিস্তান প্রস্তাবের ইহা অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীরকে মুক্ত করিয়া পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিলে পাকিস্তান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।" পাকিস্তান রাষ্ট্রপালের নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট—কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এখনও আপোষের স্বপ্ন দেখিতেছেন। ভারত রাষ্ট্রকে কঠোরতার সহিত কাশ্মীরে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে—নচেৎ ভারত রাষ্ট্রের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সেনাপতি কারিয়াপ্পা সৈন্য সংগ্রহের সময় অকুণ্ঠভাবে যদি ভারতের বিপদের কথা সকলকে বুঝাইয়া দেন—তাহা হইলে ভারতের পক্ষে কাশ্মীরকে বিপন্মুক্ত করা আদৌ অসম্ভব হইবে না।

নারী সমাজ ও পণ্ডিতজী—

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর নাসিক গান্ধীনগর হইতে ৬ মাইল দূরে এক বিরাট নারী সম্মিলনে পণ্ডিত জহরলাল

নেহরু নারী-সমাজের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—"ভারতীয় নারীসমাজ খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের জন্য যেন বিরক্তি প্রকাশ বা অভিযোগ না করেন এবং যাহা পাইবেন, তাহার দ্বারাই সংসার নির্ব্বাহ করেন। স্বাধীন দেশের জনসাধারণের সকল দুঃখ দুর্দ্দশা ও অসুবিধা সহ্য করিয়া স্বাধীনতার পরবর্ত্তীকালীন সঙ্কট অতিক্রমে সরকারের সহিত সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। অধিক পণ্য ও খাদ্য উৎপাদনের জন্য নারীসমাজকেও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।" নারী সমাজ চেষ্টা করিলে দেশের খাদ্যাভাব দূর করিতে পারেন। মানুষের অভ্যাস ত্যাগ করা আদৌ কঠিন নহে। যাহা সহজে পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাই জীবনধারণের চেষ্টা না করিয়া আমরা দুষ্প্রাপ্য জিনিষ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের অভাব বৃদ্ধি করিয়া থাকি। চিনি না হইলেও চলে। কিন্তু চিনির অত্যধিক ব্যবহারের ফলে সরকারকে বিদেশ হইতে বেশী দামে চিনি আমদানী করিতে হয়। এ সকল বিষয়ে আমাদের নারী সমাজ অবহিত হইবেন কি ?

সুন্দরবন অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতি—

২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার সুন্দরবন অঞ্চলে ভীষণবন্যারফলে বসিরহাটের তিন লক্ষ বিঘা জমী ও ডায়মণ্ড হারবারের দেড় লক্ষ বিঘা জমীর চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু ঘরবাড়ী ও গৃহপালিত পশুও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখনই দ্রুত বাঁধ রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ক্ষতির পরিমাণ বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। হাসনাবাদ ও নামখানাতে কেন্দ্র করিয়া সাহায্য কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। সুন্দরবন অঞ্চলে যে চাউল উৎপন্ন হয়, তাহাতে কলিকাতাবাসীকে কয়েক মাস খাওয়ানো হয়। সুন্দরবনের চাষ নষ্ট হইলে কলিকাতা বিপন্ন হইবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী—

নাসিক কংগ্রেসে অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী বিষয়ক একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—"জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। বর্ত্তমানে কি ভাবে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যে সকল অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে হইবে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইবে। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্ম্ম সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। রাষ্ট্রে অপরকে পোষণের কোন সুযোগ থাকিবে না। অর্থ ও সম্পদের বৈষম্য এমনভাবে হ্রাস করিয়া আনিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকটি মানুষ আত্মোন্নয়নের ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ লাভ করিতে পারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইবে। সমাজ স্বার্থ বিরোধী যে সকল লোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে হইবে। কায়েমী স্বার্থ যাহাতে বৃহত্তর কল্যাণের পথ হইতে জনগণকে বিচ্যুত না করিতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

কবি করুণানিধান সম্বর্দ্ধনা—

কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স ৭৪ বৎসর আরম্ভ হওয়ায় গত ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় হাওড়া মহিলা কলেজে স্থানীয় দীনবন্ধু কলেজের ছাত্র ও মহিলা-কলেজের ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। প্রিন্সিপাল শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনায়ক সান্যাল প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ কবির কাব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রবীণ কবির এই সম্বর্দ্ধনাকারীরা দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই মনোভাব বৃদ্ধির ফলেই দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। সভায় কবি তাঁহার কাব্যের প্রেরণা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

লোকগণনায় কর্ত্তব্য—

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর আগামী আদমসুমারী বা লোকগণনা সম্বন্ধে এক সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লোকগণনা করা হইবে। ঐ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় জানাইয়াছেন—"জনগণনা জাতির সহায়-সম্পদের হিসাব নিকাশ।" দেশের জন সংখ্যা, স্ত্রী পুরুষের

সংখ্যা, দেশবাসীর ধর্ম্ম, বৃত্তি, সাক্ষরতা ও শিক্ষার মান প্রভৃতির হিসাব জনগণনার মাধ্যমেই সংগৃহীত হয়। ইহা হইতেই আমরা পাই—দেশের শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, বাস ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পূর্ণ ও যথাসম্ভব সঠিক বিবরণ।" তিনি জনগণকে এই কার্য্যে সরকারী কর্ম্মীদিগকে সাহায্য করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। গণনা সম্পর্কে গৃহীত সকল তথ্যই গোপনে রাখা হইবে—কাজেই সকলে যেন সকল তথ্য নির্ভুলভাবে প্রদান করিয়া সরকারের এই কার্য্যে সাহায্য করেন।

হইতে দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এদেশে সংবাদ-পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষিত সাংবাদিক তৈয়ার করাও প্রয়োজন হইয়াছে।

পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচন—

পশ্চিমবঙ্গ হইতে নির্ব্বাচিত ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রীহিম্মতসিংকা মহেশ্বরী, জনাব রাগীব আসান ও জনাব আবদুল হামিদ পদত্যাগ করায় যে ৩টি স্থান শূন্য হইয়াছিল গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তথায় নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হইয়াছে—শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, জনাব আজিজুল হক ও জনাব আবদুল সত্তার সদস্য। চারুবাবু ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী, হক সাহেব প্রাক্তন করোনার ও সাত্তার সাহেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অন্যতম সহসম্পাদক।

কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন তাঁহার সাম্প্রতিক কলিকাতা সফরকালে কতকগুলি উদ্বাস্তু শিবির, মহিলাবাস ও শিশুপালন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। দেখা যাইতেছে একটি মহিলাবাসে তিনি কয়েকটির মহিলার সহিত কথোপকথনে রত

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা—

বর্ত্তমান বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং বিভাগের ব্যবস্থাপনার জন্য আনন্দবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে সম্পাদক করিয়া একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। শিক্ষার জন্য মাসিক বেতন ১৫ টাকা, ভর্ত্তি ফি ১৫ টাকা ও পরীক্ষার ফি ৬০ টাকা স্থির হইয়াছে। শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীমাখনলাল সেন, শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত, ডাঃ ধীরেন সেন, শ্রীমৃণালকান্তি বসু প্রভৃতি অধ্যাপনা করিতে সম্মত হইয়াছেন। ২ বৎসর ধরিয়া শিক্ষাদান চলিবে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে চেষ্টা করিতেছিলেন—এবার সে চেষ্টা ফলবতী

শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'

অপরাজেয় কাহিনীকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামের সুমতি' নামক কহিনীটি সর্ব্বজনপরিচিত এবং ইহার সার্থক চিত্ররূপ সম্বন্ধেও কিছু নূতন কথা বলিবার নাই। হিন্দী সবাকচিত্রেও 'ছোটা ভাই' নামে এই কাহিনী যে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহাও সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু সম্প্রতি একটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানে এই অপূর্ব্ব ছবিখানির

প্রদর্শন নাকি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য সংবাদটিতে ইহাও উল্লেখ আছে যে, যদি ছবিটির শেষের অংশ—অর্থাৎ রামকে পুনরায় ঘরে ফিরাইয়া আনার অংশটুকু বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ ছবি প্রদর্শনে কোন নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না। সংবাদটি খুবই অদ্ভুত। কারণ 'রামের সুমতি' রাজনীতিক কাহিনীও নয়, সাম্প্রদায়িকতার কোনরূপ সংস্পর্শও ইহাতে নাই। ইহা একটি সামাজিক চিত্র। সুতরাং ইহার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের এমন কি হেতু থাকিতে পারে? তবে কি ইহাদ্বারা আমরা ইহাই বুঝিব যে প্রত্যাবর্ত্তন ব্যাপারটি কোনও ক্ষেত্রেই পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বরদাস্ত করিতে চান না? এবং এই ইঙ্গিতই কি ইহাতে সুস্পষ্ট নয় যে, পাকিস্তান-পরিত্যাগী কোন হিন্দুর পুনরায় পাকিস্তানে প্রত্যাবর্ত্তন পাকিস্তান কর্ত্তাদের অভিপ্রেত নয়? ইহাই কি তাহার রূপক অভিব্যক্তি? দিল্লী চুক্তির মাহাত্ম্যে যাঁহারা আত্মহারা এই সংবাদটির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র শ্রীমান কল্যাণকুমার মিত্র মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে বোম্বাই ইউনিভারসিটি হইতে Bio-Chemistry শাস্ত্রে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল Fermentation Technology. ইতিপূর্ব্বে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেমিষ্ট্রিতে ফার্ষ্ট ক্লাস ডিগ্রি এবং ইউনিভারসাল

শ্রীকল্যাণকুমার মিত্র

ইন্‌সটিটিউট অব সায়ান্স হইতে Chemical Engineeringএ Associateship ডিগ্রি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি Fermentation সম্বন্ধে গভীরতর গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

তোমারে প্রণাম

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তুমি আছো, তুমি ছাড়া কিছু নাই আর।
অনন্ত চৈতন্য, নখদর্পণে তোমার
র'য়েছে অগণ্য বিশ্ব। নিঃসীম শূন্যের
সংখ্যাহীন গ্রহতারা হ'তে অরণ্যের
ক্ষুদ্রতম পুষ্পশিশু—সবার পিছনে
আছে তব পরিচর্য্যা নিঃশব্দে গোপনে

তোমার কল্যাণ হস্ত করিছে সিঞ্চন
সকলের মূলে প্রাণরস। চিরন্তন
হে দেবতা, যে তোমারে দেখেছে অন্তরে
পেয়েছে সে চিরশান্তি। কোন দুঃখশরে
টলাতে পারে না তারে। কোন প্রলোভনে
লুব্ধ নহে চিত্ত তার। নিখিল ভুবনে

তুমি তার প্রিয়তম, প্রাণের আরাম;
সচ্চিৎ আনন্দ তুমি—তোমারে প্রণাম।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আই এফ.এ শীল্ড ঃ

১৯৫০ সালের আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে ইষ্ট-বেঙ্গল ক্লাব ৩-০ গোলে সার্ভিসেস একাদশদলকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে উপর্য্যুপরি দু'বছর এবং মোট তিনবার একই বছরে লীগ-শীল্ড বিজয়ের গৌরব লাভ করেছে। ১৯৪৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং আই এফ এ শীল্ড একত্রে প্রথম বিজয়ী হয়। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ভিন্ন স্থানীয় দলের মধ্যে অপর কোন দলই এ পর্য্যন্ত তিনবার একই বছরে লীগ-শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৩৬ সালে ভারতীয়দলের মধ্যে প্রথম লীগ-শীল্ড বিজয়ী হয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তারা দ্বিতীয়বার লীগ-শীল্ড পেয়েছে ১৯৪১ সালে। লীগ-শীল্ড খেলার ইতিহাসে একই বছরে প্রথম লীগ-শীল্ড পায় গ্লুসেষ্টার্স ১৮৯৮ সালে। গর্ডনস এইচ এল আই ১৯০৮-৯ সালে উপর্য্যুপরি দু'বছর লীগ-শীল্ড পাওয়ায় প্রথম রেকর্ড করে। এ রেকর্ডের সমান করেছে একমাত্র ক্যালকাটা (১৯২২-২৩) এবং ইষ্ট-বেঙ্গল ক্লাব (১৯৪৯-৫০)। এই রেকর্ড সম্পর্কে একটা কথা উঠা স্বাভাবিক যে, আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়েছে এমন অনেক বহিরাগত মিলিটারী দলের লীগের খেলায় যোগদানের কোন সম্ভাবনা ছিল না বলে তাদের পক্ষে এই রেকর্ড করা বা ভঙ্গ করা সম্ভব হয়নি। একই বছরে লীগ-শীল্ড পাওয়ার রেকর্ড স্থাপন করা স্থানীয় দলের পক্ষে সম্ভব, বহিরাগত দলের পক্ষে নয়। সুতরাং যে সব দল এই রেকর্ড করেছে তাদের নাম উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা উচিত, লীগ-শীল্ড খেলার ইতিহাসে এই দলগুলি স্থানীয় দলগুলির মধ্যে একই বছরে লীগ-শীল্ড পাওয়ার গৌরব লাভ করেছে। স্থানীয় কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে বহিরাগত শীল্ড বিজয়ী দলগুলির প্রতি অবিচার করা হয়।

লীগ-শীল্ড বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ফটো—জে-কে-সান্যাল

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের পর্য্যায়ক্রমে দু'বছর লীগ-শীল্ড জয়লাভের ফলে ক'লকাতার বহিরাগত ফুটবল খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য স্বীকৃত হয়েছে। একথা স্বীকার না করলে তাঁদের প্রতি আমাদের অসৌজন্য এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলায় জয়লাভের প্রধান মেরুদণ্ড হ'ল আক্রমণ ভাগের পাঁচজন বাইরের খেলোয়াড়দের সুসম্বদ্ধ আক্রমণ পদ্ধতি, ক্ষিপ্রতা, পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া, সুযোগ সদ্ব্যবহারে দক্ষতা এবং সর্ব্বোপরি দলের জয়লাভের জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা। গোল করার উপরই যেখানে খেলার ফলাফল নিষ্পত্তি হয় সেখানে আক্রমণভাগকে শক্তিশালী করাই হ'ল বিচক্ষণতার পরিচয়। রক্ষণভাগ যত শক্তিশালীই হউক না কেন, দুর্ব্বল আক্রমণভাগ নিয়ে হয়ত দু' একটা খেলায় দলের প্রাধান্য বজায় রাখা যায় কিন্তু লীগের গড়পড়তার খেলায় এবং টুর্ণামেন্টে দলের শেষ মুখরক্ষা করা যায় না। আক্রমণভাগের শক্তিশালী খেলোয়াড়রা বরং বিপক্ষদলের গোল সীমানায় আক্রমণ চালিয়ে দলের দুর্ব্বল রক্ষণভাগকে যথেষ্ট সহযোগিতা করতে পারে। বিপক্ষের গোল সীমানায় বেশী সময় বল রাখার অর্থই হ'ল নিজ দলের রক্ষণভাগের উপর বিপক্ষ দলের আক্রমণের চাপ কমিয়ে দেওয়া। এই নীতিই হ'ল ফুটবল খেলায় সাফল্য লাভের মূলনীতি।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অনেক দলই এই নীতির কথা ভুলে যায়। খেলায় প্রাধান্য লাভের প্রাথমিক নীতির দিক থেকে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কোন ভুল হয়নি। দলের আক্রমণ ভাগ সদ্য অলিম্পিক প্রত্যাগত তিনজন এবং অপর দু'জন মোট পাঁচজনই বাইরের নাম করা খেলোয়াড় দিয়ে খুবই শক্তিশালী করা হয়েছে। গত বছরের ব্যাক তাজমহম্মদকে এ বছরের ফুটবল মরসুমের মধ্যে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তান থেকে আনা সম্ভব না হওয়ায় রক্ষণভাগ ক'লকাতার কোন কোন বিশিষ্ট ফুটবল দলের থেকে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ফাইনালে দলের রক্ষণভাগ আগের তুলনায় আরও দুর্ব্বল হ'ল—ব্যাকে ব্যোমকেশ বসু, হাফ ব্যাকে এস রায় এবং কাইজার অসুস্থতার জন্যে খেলতে না নামায়। ফাইনাল খেলার সমস্ত ক্ষণের মধ্যে কয়েকবার এ দুর্ব্বলতা চোখে পড়লেও বেশী সময়ই দলের আক্রমণ দলের খেলোয়াড়রা বিপক্ষের গোলে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে নিজ দলের রক্ষণভাগকে বিপদের চাপ থেকে রক্ষা করেছেন। দলের আধিপত্য রক্ষার জন্যে অপরাপর দলের মত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবও অনেক বছর ধরে বাইরের খেলোয়াড় আনিয়ে দল গঠন করছে। বেশীর ভাগই দলে খেলেছেন মাদ্রাজের নাম করা খেলোয়াড়রা। ১৯২৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম বিভাগের লীগে প্রথম খেলতে আসে। ১৯২৫-২৮ পর্য্যন্ত এই চার বছর প্রথম বিভাগে খেলে ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায়। এই চার বছরের লীগ তালিকায় দলের স্থান এই ছিল —৪র্থ (১৯২৫), ৬ষ্ঠ (১৯২৬-২৭) এবং সর্ব্ব নিম্নস্থান (১৯২৮)। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে পুনরায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে ১৯৩২ সালে প্রথম বিভাগের

সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাঙ্গলা প্রদেশ ফটো—প্রভাত বসু (ভেপো)

খেলায় খেলতে দেখা যায়। সেই সময় অর্থাৎ ১৯০২ থেকে ১৯৪১ সাল এই দশ বছরের মধ্যে বাইরের খেলোয়াড় দলে নিয়েও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব পাঁচ বার লীগের রাণার্স আপ ছাড়া অপর কিছু হ'তে পারে নি। শীল্ডের খেলায় ১৯৩৭-৩৮ সালে ৩য় রাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠেছিল। ১৯৪২-১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত এই ৮ বছরের লীগ-শীল্ডের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে আগের থেকে যেমন বেশী বাইরের খেলোয়াড় যোগদান করেছে তেমনি দলকে বিরাট সাফল্য লাভে সহযোগিতা ক'রেছে। এই আট বছরে লীগ পেয়েছে ৫ বার, উপর্যুপরি দু'বছর লীগ পেয়েছে দুবার, অপরাজেয় অবস্থায় ১ বার। লীগে রাণার্স আপ হয়েছে ১ বার। শীল্ড পেয়েছে ৪ বার, ৩ বার শীল্ডের রাণার্স আপ হয়েছে। ১৯৪২-১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে ৫ বার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে খেলে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ১৯০৩-১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডের সমান করে। তবে এই সময়ের মধ্যে ক্যালকাটা শীল্ড পেয়েছে ৩ বার, ইষ্টবেঙ্গল ২ বার। দলের সাফল্যের দিক থেকে ১৯৪৯ সালই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে স্মরণীয় বছর—একই বছরে ক্যালকাটা ফুটবল লীগ, আই এফ এ শীল্ড এবং রোভার্স কাপ পায়।

আলোচ্য বছরের শীল্ডের খেলায় অনেক শক্তিশালী দলের যোগদান করার কথা ছিল, তারা কেউ যোগদান করেনি। প্রতিবছরই এ ব্যাপার ঘটছে। ঢাক পিটিয়ে বলা হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তিশালী দল আই এফ এ শীল্ডে যোগদান করবে। কিন্তু শেষে দেখা যায় এমন সব দল আই এফ এ-র খরচায় খেলতে এসেছে যাদের ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এখানকার চতুর্থ বিভাগের নিম্নস্থান অধিকারী দলেরও সমান নয়। তারা অবিশ্যি ক'লকাতার ক্লাবগুলির কাছে অধিক সংখ্যক গোল খেয়ে স্থানীয় দলের রেকর্ড স্থাপন করার সুযোগ দিয়ে ভারতীয় ফুটবল খেলার রাজধানী ক'লকাতার ঘেরা মাঠে ফুটবল খেলার সৌভাগ্য লাভ করে। তাদের বিপক্ষে খেলে অধিক গোলের রেকর্ড করার সুযোগ ছাড়া ক'লকাতার ক্লাবগুলি আরও একটা সুবর্ণ সুযোগ পায়, খেলোয়াড় সংগ্রহ করার। দলগত খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যতই খারাপ হউক, প্রতিবছরই কোন না কোন দলের দু'একজন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়ে ক'লকাতার দর্শকের মুগ্ধ ক'রে যান আর অমনি ক'লকাতার ক্লাবগুলির শ্যেন দৃষ্টি পড়ে তাঁদের উপর। ক্লাবের নামের ঐতিহ্য, নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধার টোপ দিয়ে তাঁদের বিভিন্ন দলে টেনে আনা হয়। এই টোপের

সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে বিজেতা হায়দ্রাবাদ দল ফটো—ডি-রতন এ্যাণ্ড কোং

চার বাঙ্গলা দেশেই নয়, সারা ভারতবর্ষ, বর্ম্মা জুড়ে ফেলা আছে।

ক'লকাতার বৃষ্টির মধ্যে খেলা, নাম করা দলের সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতা, দলের খেলার ফলাফল দলের সমর্থকদের মনোমত না হ'লে রেফারীকে আক্রমণ এবং স্বভাবতই রেফারীর পক্ষপাতিত্ব বাঙ্গলার বাইরের নামকরা ফুটবল দলকে ক'লকাতার মাঠে খেলতে আসতে কমই উৎসাহিত করে। এ নিয়ে বাঙ্গলার বাইরের কাগজ পত্রে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না। বাঙ্গলার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, (১) একাধিক ক্লাব

বিভিন্ন প্রদেশের নাম করা খেলোয়াড়দের আমদানী ক'রে সেখানকার খেলার ষ্ট্যাণ্ডর্ডের অবনতির কারণ ঘটাচ্ছে, (২) জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেই সব খেলোয়াড় ক'লকাতার ফুটবল খেলায় যোগদানের দরুণ নিজ নিজ প্রদেশের পক্ষে খেলতে পারেন না (৩) এই সুযোগে বাঙ্গলা প্রদেশ নিজেও জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ঐসব বহিরাগত খেলোয়াড়দের মধ্যে একাধিক বাছাই খেলোয়াড় নিয়ে দলকে শক্তিশালী ক'রে বহুবার ফাইনালে জয়ী হয়েছে (৪) ভারতবর্ষের ফুটবল খেলায় পেশাদারী প্রথা বে-আইনী কিন্তু অবাধে ক'লকাতায় বাইরের খেলোয়াড় আমদানীর ফলে বিভিন্ন প্রদেশে সখের খেলার মর্য্যাদা রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়েছে—ক'লকাতায় আধাপেশাদারী খেলার প্রবর্ত্তনে। এ সমস্ত নির্জ্জলা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে কেউ পারেন কি? বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটকালে খেলোয়াড়দের মধ্যে কেবল নাম এবং দর্শকদের আনন্দ বিতরণের প্রেরণায় কয়জন বিত্তশালী খেলোয়াড় সময় দিয়ে শারীরিক পরিশ্রম ক'রে উন্নত খেলার অনুশীলন করতে পারেন? ক্লাবে খেলার দরুণ বাইরের খেলোয়াড়দের মত সুখ সুবিধা খুব কম বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের ভাগ্যেই জুটে থাকে। বাঙ্গলাদেশের ফুটবল খেলায় মান সম্মান, খেলায় আত্মত্যাগ প্রভৃতি আদর্শমূলক কথা বলে বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের সুখ অসুবিধার দাবীকে ঠাণ্ডা রাখা হয়। ফলে ভিতরে ভিতরে অসন্তোষের আগুন থেকে যায় যার ফলে আজ বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা আন্তরিকভাবে খেলা গ্রহণ করতে পারছেন না। এই আধাপেশাদার ফুটবল খেলার পরিবর্ত্তে আমরা একাধিকবার ফুটবল খেলায় পেশাদারী খেলা প্রবর্ত্তনের পক্ষে স্পষ্ট অভিমত এবং যুক্তি দেখিয়েছি। এ-আই-এফ-এফ-র এ ব্যাপারে গোঁড়ামির কোন অর্থ বুঝা যায় না।

আই এফ এ শীল্ডের ৪র্থ রাউণ্ডে ৮টি দলের মধ্যে বার্ণপুর দলই ছিল বাইরের। একদিকের সেমি-ফাইনালে সার্ভিসেস একাদশ দল মোহনবাগানকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে যায়। মোহনবাগানের সেণ্টার ফরওয়ার্ড আহত বাবলু কুমারের স্থানে পুরোনো খেলোয়াড় অমল মজুমদারকে একেবারে ফাইনালে খেলতে দেখা যায়। ফরওয়ার্ডের এ পরিবর্ত্তনে অবিশ্যি কোন সুফল হয়নি একমাত্র অমল মজুমদারের একটি গোল শোধ দেওয়া ছাড়া। অনভ্যস্ত স্থানে তিনি খেলতে পারেন নি এবং খেলার মধ্যে দু'বার ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়দের মধ্যে পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তনে সুফল হয়নি, বরং আরও খেলায় অবনতি দেখা যায়। লেফ্‌ট আউটে একমাত্র দাশগুপ্তই সামরিক দলের বুট উপেক্ষা করে খেলেছিলেন; বাকি সকলেই বুটের ভয়ে এতবেশী সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, সার্ভিসেস দলের রক্ষণভাগ বিপক্ষের এই দুর্ব্বলতার সুযোগে চুড়ান্তভাবে খেলায় আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলো। সত্তার, গুহ ঠাকুরতা এবং অমল মজুমদার এই তিনজনের খেলার পদ্ধতির মধ্যে তাঁদের ঠাণ্ডা প্রকৃতির খেলার পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কেউই dashing খেলোয়াড় নন, ফলে তাঁদের খেলায় ভীরুতার ছাপ যথেষ্ট আছে। বিশেষ ক'রে সামরিক দলের বিপক্ষে গোলে সবেগে ধাবমানে সক্ষম এমন একজন সেণ্টার ফরওয়ার্ড দরকার।

মোহনবাগানের সে দিনের খেলায় পরাজয়ের কারণই হ'ল খেলায় ভুলপদ্ধতি, অনভ্যস্ত স্থানে খেলা এবং ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়দের সাহসের অভাব। খেলার সমস্ত সময়েই একমাত্র সেণ্টার হাফ টি আও এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে যা কিছু রতন সেন বিপক্ষের বুট এবং বল প্রয়োগ উপেক্ষা ক'রে খেলেছেন। দলের খেলার মধ্যে জয়লাভের অদম্য উৎসাহ বা জেদ ছিল না। সামরিক দল যে জয়সূচক গোলটি করে তা বেশই অভাবনীয় এই কারণে যে, মোহনবাগানের গোলরক্ষকের পক্ষে ঐ ধরণের গোল রক্ষা করা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় হ'ত না। বলটি অনেক দূর থেকে গোলের মধ্যে যায়। গোলরক্ষক অহেতু এগিয়ে যাওয়ার ফলে বলটি কোন বাধা না পেয়েই গোলে ঢুকে। ঠিক এমনি ধরণের গোল ঐ একই গোলরক্ষককে খেতে দেখা গেছে লীগে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলায়। সার্ভিসেস দল খেলার অবস্থা বুঝে কখনও লম্বা বল পাঠিয়ে এবং কখনও সর্ট পাশ ক'রে দলের খেলোয়াড়দের বিপক্ষের বাধা অথবা লক্ষ্য রাখার পূর্ব্বেই বল দিয়েছে। সময়ে সময়ে বলটি মাটিতে পড়বার আগেই অযথা সময় নষ্ট না ক'রে বলটিকে উপরে উপরে দলের খেলোয়াড়দের নিখুঁতভাবে পাশ দিতে দেখা যায়।

মোহনবাগানের বিপক্ষে সার্ভিসেস দলের উন্নত শ্রেণীর

খেলা দেখে সকলেরই ধারণা হয়েছিলো সার্ভিসেস দল ফাইনালে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে খুবই বেগ দেবে, খেলার ফলাফল যাই হ'ক না কেন।

ইষ্টবেঙ্গল ২-১ গোলে অপর দিকের সেমি-ফাইনালে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন মাত্র একজন ছাড়া বাকি দশজন খাঁটি বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে চারজন অলিম্পিক প্রত্যাগত এবং বাকি নাম করা খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত রাজস্থানকে হারিয়ে দেয় লীগের এবং শীল্ডের খেলায়।

ফাইনালে সার্ভিসেস দল তার স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে নি, বলতে কি মাঠে দাঁড়াতে পারে নি এমনই খেলায় বিব্রত হয়ে পড়েছিলো।

একদিকে সার্ভিসেস দলের সেমি-ফাইনালে উন্নত ধরণের খেলা এবং অপর দিকে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের নিয়মিত নাম করা খেলোয়াড় ব্যাক বি বসু, হাফ ব্যাক এস রায় এবং কাইজার আহত এবং অসুস্থ হয়ে পড়ায় ইষ্টবেঙ্গল দল যে একটা জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'ল এই দুঃখ ফাইনাল খেলা সুরু হওয়ার আগে পর্য্যন্ত সমর্থকদের মনকে বিশেষ ক'রে পীড়া দিতে থাকে। সত্যিই একটি দলের পক্ষে নিয়মিত তিনজন শক্তিশালী খেলোয়াড় এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলায় না খেললে, বিশেষ ক'রে যাঁদের অভাব দলের পক্ষে অপূরণীয় সেখানে সমর্থক এবং সমস্ত দলটির নৈতিক দৃঢ়তা থাকা অসম্ভব ব্যাপার। খেলায় যেমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল যখন ইষ্টবেঙ্গল দল বি বসুর স্থানে সাত বছর আগের অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড় বেবী গুহকে নিয়ে খেলতে নামলো। তখন দেখলাম সমর্থকেরা আরও বেশী মুসড়ে পড়েছেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় অনেক দিনের অনভ্যস্ত এবং তার উপর শারীরিক বিপুলতায় সমব্যস্ত বেবী গুহকে আজ আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে খেলতে নামলে কি ক'রে নৈতিক দৃঢ়তা এবং উচ্চ আশা পোষণ করা যায় বলুন! কিন্তু খেলা সুরুর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দর্শকদের থেকে ইষ্টবেঙ্গলদলের খেলোয়াড়দের মনোবল সহস্রগুণ বেশী। ইষ্টবেঙ্গলদলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা সমর্থকদের ভরসা দিলেন। তাঁদের তীব্র গতির সঙ্গে পরস্পরের বুঝাপড়া, নিখুঁত পাশ, এবং খেলায় গোল করার জিদের মুখে সার্ভিসেস দলের সেমি-ফাইনালের খেলা দর্শকদের মন থেকে তলিয়ে গেল।

খেলার বেশীরভাগ সময়ই ইষ্টবেঙ্গল দলের ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়রা বিপক্ষের গোল সীমানায় বল টেনে রাখার ফলে দলের রক্ষণভাগের উপর চাপ খুবই কম পড়ে। মাঝে মাঝে ইষ্টবেঙ্গল দলের গোলের দিকে বল গেছে কিন্তু হাফব্যাক, ব্যাক এবং গোলরক্ষক তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। বেবী গুহ একবার গোলের মুখে সবেগে ধাবমান একটা প্রচণ্ড সটের মুখে মাথা পেতে দিয়ে বলটি প্রতিরোধ ক'রে কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন কিন্তু কয়েকমিনিট পর এমন সহজভাবে মাঠে নেমে খেলতে থাকেন যে তাঁর খেলার উপর সমস্ত দর্শকদের আকর্ষণ পড়ে। গোলে ঘটক একবার মাথার উপরের বলে সময়মত ঘুষি মেরে এবং একবার শুয়ে পড়ে বলটি আঁকড়ে ধরে দু'টি অবধারিত গোল বাঁচান। ইষ্টবেঙ্গলের তিনটির বেশী গোল হ'ত; একবার আমেদ খাঁ ফাঁকা গোলে সট না ক'রে দলের খেলোয়াড়কে বলটি পাস করায় একটা অবধারিত গোলের সুযোগ নষ্ট হয়, আর একবার গোল-রক্ষককে অসহায় অবস্থায় দূরে ফেলে রেখে যখন বলটি গোলের মধ্যে বিনা বাধায় ঢুকছে সেই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে সার্ভিসেস দলের একজন খেলোয়াড় প্রায় গোল লাইনের উপর থেকেই বলটি বের ক'রে দেয়। সেদিন ইষ্টবেঙ্গল দলের সাফল্যের মূলে ছিল দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের মনোবল, খেলায় জয়লাভে জিদ, সর্ব্বোপরি আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের ক্রীড়াচাতুর্য্য। গত ৮ বছরে দলটিকে লীগ-শীল্ডের খেলায় দলগত সাফল্য প্রতিষ্ঠা করতে বাইরের খেলোয়াড়রা প্রভৃত সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ ক'রে গত দু'বছর আক্রমণভাগের পাঁচজন বাইরের খেলোয়াড় এবং রক্ষণভাগের ৩।৪ জন বাইরের খেলোয়াড়দের সহযোগিতা ভিন্ন এতখানি দলগত সাফল্য অল্প সময়ে সম্ভব হ'ত না; সে কথা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষমহল বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা অধিক সংখ্যক বাইরের নামকরা বাছাই ফুটবল খেলোয়াড় সংগ্রহে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁদের সফল প্রচেষ্টায় আজ দলের সমর্থকেরা আনন্দিত হয়েছেন। যাঁরা দলের সভ্য অথবা সমর্থক নন, তাঁরাও দলের খেলোয়াড়দের ক্রীড়াচাতুর্য্য স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেন না। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের এই দলগত জয়লাভের মধ্যে বাইরের নাম করা খেলোয়াড়-গণ ফুটবল খেলায় তাঁদের কৃতিত্ব এবং প্রাধান্য ক'লকাতার মাঠে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে স্বদেশে ফিরে যাবেন, অনেকে এখানেই কিছুকাল থেকে যাবেন। ক'লকাতায় বাইরের খেলোয়াড়দের আগমনের পথ সহজ ক'রে তাঁরা সত্যই ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভাগ্য উজ্জ্বল রেখে গেলেন। অন্যান্য ক্লাবের বাইরের খেলোয়াড়রা দলগত সাফল্য অর্জ্জন করতে সক্ষম হ'ননি বটে কিন্তু এর জন্য খুব বেশী দুশ্চিন্তার কারণ তাঁদের নেই; অত সহজে বাঙ্গালী জাতির চৈতন্য উদয় হবে না।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অমরেন্দ্র ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "দক্ষিণের বিল"—৪৲
পরিমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পটভূমি"—২৲
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তোমারই হউক জয়"—২৸৹
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রথম ভাগ "ছবি ও ছড়া"—৷৵৹
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "আজ-কাল-পরশুর গল্প"—২৲
পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ছন্দ পতন"—২৲
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত প্রথম ভাগ "মজার বই"—৷৵৹
চিত্রভানু প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "কয়েকটি কবিতা"—৸৹
শ্রীঅক্ষয়পদ রায় প্রণীত সন্দর্ভ "অসীমের অন্বেষণ" —১৷৹
বীরেন দাশ প্রণীত উপন্যাস "আরো দূর পথ"—৩৲
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "সভ্যতার রাজপথে"—৩৲

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত উপন্যাস "দুই পক্ষ"—২৷৹
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "দিশারী কপোত"—২৲
সুজিতকুমার নাগ প্রকাশিত "নবজাতক"—৵৹
শ্রীপরিমল গোস্বামী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মারকে লেঙ্গে"—৪৲
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "আমার লেখা"—৪৷৹,
"ভূত ও অদ্ভুত"—১৷৹
শ্রীশৌরীন চৌধুরী অনূদিত উপন্যাস "রুডিন"—৩৲
শ্রীজগদিন্দু বাগচী সম্পাদিত "কমিউনিসম্"—২৸৹
পরেশকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত উপন্যাস
"কার্ডিনালের প্রণয়িনী"—৩৷৹
শ্রীকুমারেশ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "ভাঙাগড়া"—২৷৹

এইচ-এম-ভির শারদ-অর্ঘ্য

এ মাসের উল্লেখযোগ্য অবদান বাংলার ছয় জন বিশিষ্ট শিল্পীর কণ্ঠে বিশ্বকবির শরৎ বন্দনার তিনখানি রেকর্ড। প্রত্যেকখানি গান রবীন্দ্রগীতি-খ্যাত শিল্পীর কণ্ঠে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। N 31267 রেকর্ডে পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে "আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতের সঙ্গে" শ্রীমতী সুধা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "ওগো শেফালী," N 31265 রেকর্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "আজি শরত-তপনে," প্রভাত স্বপনের সঙ্গে শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে "মেঘের কোণে রোদ হেসেছে," N 31266 রেকর্ডে সন্তোষ সেনগুপ্তের কণ্ঠে "কার বাঁশী নিশি ভোরে"র সঙ্গে শ্রীমতী ইলা মিত্রের কণ্ঠে "তোমার মোহন রূপের" যে অনবদ্য প্রকাশ ভংগিমার সৃষ্টি করেছে তা সকলেরই ভাল লাগবে। কুমার শচীন দেববর্ম্মনের দু'খানি আধুনিক গান "খুলিয়া কুসুম সাজ" ও "আজো আকাশের পথ বাহি" (P11910) শিল্পীর মমতা ভরা কণ্ঠের পূর্ণ অভিব্যক্তি। বাণী চিত্রের প্লে-ব্যাক্ শিল্পী কুমারী গীতা রায় (বম্বে) দু'খানি পল্লীগীতি N 31257 রেকর্ডে পরিবেশন করেছেন। শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের প্রীতি উজ্জ্বল কণ্ঠের "চন্দ্রাবলী সাথে যাপি" ও "শুনি তিরস্কার কানু" (N 31259) কীর্ত্তন গীতি দু'খানি ভাবানুভূতিময় অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। "আমি ডেলি প্যাসেঞ্জার" ও "বৌ একটা চাই" N 31262 রেকর্ডে পরিবেশিত কৌতুক গীতি দু'খানি রচনা ও পরিবেশনা গুণে অপূর্ব্ব—শিল্পী যশোদাদুলাল মণ্ডলের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-কণ্ঠের পরিবেশনে রেকর্ডটি উপভোগ্য হয়েছে। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের N 31261 রেকর্ডের দু'খানি রবীন্দ্রগীতি "কোন খেপা শ্রাবণ" ও "আজ ধানের খেতে" শিল্পীর গৌরবময় পরিচয়ের নিদর্শন। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পূজোর ছুটি" N 31258, জগন্ময় মিত্রের "তুমি তো জান না" ও "আমার দেশের" N 31265 এবং কুমারী বাণী ঘোষালের N 31264 রেকর্ডে আধুনিক গানগুলিও ভাল হয়েছে। 'মহল' বাণী চিত্রের দু'খানি গানের সুর N 31263 রেকর্ডে বেহালা চন্দ্রে পরিবেশন করেছেন পরিতোষ শীল, ক্লারিওনেটের মাধ্যমে "বরসাত" বাণীচিত্রের দু'খানি জনপ্রিয় গানের মন্ত্রগীতি N 31260 রেকর্ডে প্রচার করেছেন শিল্পী রাজেন সরকার। শিল্পী সত্য চৌধুরী N 31283 রেকর্ডে যে আধুনিক গান দু'টি পরিবেশন ক'রেছেন, ভাব ব্যঞ্জনার দিক থেকে, রচনায় ও সুরে তা নূতনত্বের দাবী ক'রতে পারে। আজকের বাংলার আর্তনাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর কণ্ঠে। শিল্পী পঙ্কজ মল্লিক ও উৎপলা সেনের P 11911 রেকর্ডে দু'খানি গান—ক্ষণকালের গান দিয়ে চিরকালকে বাঁধবার সার্থক প্রকাশ। শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক) N 31267 রেকর্ডে মধুর উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্বজননীকে জাগাবার আহ্বান জানিয়েছেন। শিল্পী কুমারী যুথিকা রায় N 31281 রেকর্ডে যে আধুনিক গান দু'খানি উপহার দিয়েছেন—কণ্ঠমাধুরীমায় তা অনবদ্য। শিল্পী শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া) N 31270 রেকর্ডে বৈষ্ণব সাহিত্যের দু'টি অমূল্য রত্ন—বিদ্যাপতি রচিত "কি কহবরে সখি" ও জ্ঞানদাস রচিত "শুন শুনহে পরাণ পিয়া" কীর্ত্তন দু'খানি সুমিষ্ট কণ্ঠের দরদভরা অভিব্যক্তি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। শিল্পী সুরসাগর জগন্ময় মিত্র N 31280 "বাসর" ও "সমাধি"—মিলন ও বিরহ, জীবন ও মৃত্যু—দিয়ে রচা দু'খানি আধুনিক গানকে মধুরতম ক'রে পরিবেশন করেছেন। শিল্পী বেচু দত্ত N 31282 রেকর্ডে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের ঝংকারে দু'খানি আধুনিক গানকে রূপ দিয়েছেন। শিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্ত N 31278 তাঁর মধুর কণ্ঠে "এই পার ভাঙা" ও "জীবনে যে দীপ" গান দু'খানি দিয়ে এবারের শারদ-অর্ঘ্য সাজিয়েছেন। শিল্পী মীনা কাপুর N 31234 "তোমার চরণ পরশ ছলে" আর "তুমি চলে যাবে জ্ঞান" মধুক্ষরা কণ্ঠের দরদী পরিবেশনে মধুরতম হয়ে উঠেছে এই আধুনিক দু'খানি গান। গ্রামোফোন ক্লাব N 31285-92 আটখানি রেকর্ডে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের রেকর্ড-নাটক রূপ প্রকাশ করেছেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান

শিল্পী—শ্রীযুক্ত

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

অগ্রহায়ণ—১৩৫৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

স্বদেশী গানে রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগ

১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ ও তৎপ্রসূত 'স্বদেশী আন্দোলন' শুধু বাঙালীদের কাছে নয়, সারা ভারতের মানুষদের কাছে এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি-সাহিত্যিক ন'ন তিনি একাধারে রাষ্ট্রনৈতিক নেতা, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক মন্ত্রগুরু ; তাঁর "স্বদেশী-সমাজ" অপূর্ব্ব মণীষা ও মৌলিকতায় ভরা ও বঙ্গ-ভঙ্গের আগেই ১৯০৪ সালে প্রকাশিত। সে প্রবন্ধটি আজও তন্ন তন্ন করে আমাদের পড়া উচিৎ, কারণ মহাত্মা গান্ধীর শেষ পঞ্চায়েৎ-তন্ত্রের পূর্ব্বাভাষ তার মধ্যে পাই ; যেমন, অহিংস প্রতিরোধ বা Passive Resistance দক্ষিণ আফ্রিকায় জয়যুক্ত হবার আগেই ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক (বৈশাখ ১৩১৬)—অত্যাচারী রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে ধনঞ্জয় বৈরাগীর দলের সত্যাগ্রহ ! গণদেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের এই যুগেই। অগণ্য জনপ্রবাহ তাঁকে মাথায় করে গর্জ্জে উঠেছে, এগিয়ে চলেছে—এটি তাঁর মুখে শোনা গল্প নয়, আমাদের চোখে-দেখা ঘটনা। জনসাধারণের কণ্ঠে কণ্ঠে তখন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্র-সঙ্গীত। তারও বিশ বছর আগে "রবিচ্ছায়া"য় ছাপা অল্প কয়েকটি স্বদেশী গান ১৯০৫-৬ সালে যেন জাতীয় সঙ্গীতে বন্যা ডাকিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি তরুণ সুর-শিল্পীদের অর্ঘ্যেও ডালি ভরে উঠেছিল সে যুগে, যখন শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর দলের বিচারের মধ্যে বন্দীরা গেয়ে উঠ্‌ত দেশমাতৃকার বন্দনা গান ; উল্লাসকর দণ্ডিত হয়েই আদালতের মধ্যে গেয়ে উঠেছিল—

> "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
> সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।"

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত কত ফাঁসীর আসামীদের প্রাণেও প্রেরণা জুগিয়েছিল সেকথা গবেষণা করে আমাদের জানতে হয়নি। বাংলার বুকে যেন হোমের আগুন জ্বলে উঠেছিল পঞ্চাশ বছর আগে (যেমন আজও জ্বলছে, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আর এক অঙ্গচ্ছেদের ফলে)।

১৯০০ সালে দেখি রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' শেষ করে নূতন ছন্দে আত্মপ্রকাশ করছেন 'কথা ও কাহিনী'তে, 'নৈবেদ্যে'র আত্মোৎসর্গে (১৯০১) ও নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে ও প্রবাসীতে তাঁর অতুলনীয় গদ্য রচনায় : 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ' চরিত্রপূজা, লোকসাহিত্য, কণ্ঠরোধ, রাজা-

প্রজ্ঞা, সমূহ স্বদেশ, শিক্ষা (জাতীয় শিক্ষা পরিষদ), তপোবন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা—প্রভৃতি কত অমূল্য রচনা, সর্ব্বোপরি স্বদেশী যুগের গদ্য মহাকাব্য গোরা (১৩১৪-১৬) —যেটি মাসের পর মাস প্রবাসী থেকে কাড়াকাড়ি করে আমরা পড়েছি।

বিংশশতকের প্রথম দশকে যেন এক নূতন রবীন্দ্রনাথ নূতন বাণী নিয়েই আবির্ভূত হলেন। অথচ "অনাদি অতীতের" সঙ্গেও তাঁর গভীর যোগ আছে সেটি এবার বোঝাতে চেষ্টা করব, কয়েক দশক পিছু হেঁটে গিয়ে। সেখানে কোথাও দেখা পাব তাঁর অনেক ভুলে-যাওয়া সহকর্ম্মীদের, তাঁর মণীষী দাদাদের, এমন কি তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অন্তরঙ্গদের। অনেক রকম আলোড়ন ও পরিবর্ত্তন স্বীকার করেও দেখব এক বিরাট অপরিবর্ত্তনীয় অবদান বাংলার ও বাঙালী জাতির—যার ফল ভোগ করছে আজ সারা ভারত—হয়ত সারা এসিয়া।

তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটকাদির ধারা ছেড়ে স্বদেশী ভাবধারাটিকে অনুসরণ করে যাবো 'জাতীয় সঙ্গীত' পর্য্যায়ের গানগুলিকেই প্রধান অবলম্বন করে। রবি-বাউলের আবির্ভাব আমাদের স্বদেশী গানের তথা রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিবর্ত্তনে কম রহস্য-ভরা ইতিহাস নয়।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম বিচিত্রকীর্ত্তি "ঠাকুর পরিবারে"; রবীন্দ্র-প্রতিভার স্ফুরণে ও গঠনে সেই পরিবারটির অবদান নিয়ে অনেক দিন ধরে অনেক কিছু লেখা হয়েছে; হয়ত একটু বেশী করেই লেখা হয়েছে বলে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁর জীবনী-লেখককে অনুযোগ করেছিলেন যে সেটা যেন তাঁর জীবনীর চেয়ে 'প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের জীবনী'ই বেশী মনে হয় (অন্ততঃ প্রথমদিকে!); হয়ত কবি রবীন্দ্রনাথ সাবধান করাতে চেয়েছিলেন শুধু কুলপঞ্জী আলোড়নের বিপক্ষে! তাঁর স্বরচিত 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি' আমাদের কাছে অমূল্য উপাদান; অথচ অন্য মালমশলা সংগ্রহের কাজেও নাম্‌তে হবে—কারণ অনেক তার নষ্ট হয়ে গেছে ও শীঘ্র যাবে; নূতন চোখ নিয়ে কাজে নাম্‌তে না পারলে নূতন উপাদান মেলাও কঠিন ব্যাপার।

তাঁর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর কাল কেটেছে দেশের এক বিষম যুগ-সঙ্কটে (১৮৫৮-১৮৭৮); প্রথম জাতীয় যুদ্ধ (mutiny) শেষ হয়েছে রক্ত-বন্যায়; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উঠিয়ে বৃটিশ জাতি তার পার্লামেণ্ট ও সাম্রাজ্ঞী-ঘোষণা মারফতে (Queen's Proclammation) শাসন সুরু করেছে। এত বড় বিপ্লব কেন ও কি ভাবে হয়ে পড়ল তা বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের পিতা ও পিতামহের যুগ পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করতে হয়; কারণ নূতন বাংলায় স্বাধীনতার আন্দোলন মানব-স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ রামমোহন রায়ের চিন্তা ও কর্ম্মধারার সঙ্গেও যুক্ত। প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ উত্তর পশ্চিমে নয়, ব্যারাকপুরে (১৮২৪) —সেটা ভোলা চলে না। যাহোক ১৮৫০ থেকেই তুমুল তর্ক চলছিল যে ভারত থেকে কোম্পানীর রাজ্য ওঠা উচিৎ। সেই সময়েই আবার দেখি অনেকের সঙ্গে Karl Marx ব্রিটীশ শোষণ-নীতির কঠোর সমালোচনা সুরু করে দিয়েছেন। এদিকে ১৮৫১ (সেপ্টেম্বর) দেশহিতার্থী সভা (The National Association) স্থাপিত হল; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রথম সম্পাদক ও তাঁকে সাহায্য করতে এলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি এবং Kirkpatric নামে স্কচ সাহেব। এখানেও রবীন্দ্র-পিতামহ দ্বারকানাথের নীতির অনুসরণ; অর্থাৎ ইংরাজকে হটাতে হলে ইংরেজ-সহকর্ম্মী নিতে হবে, যেমন George Thompsonকে বিলাত থেকে এনে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি কর্ম্মীদের দ্বারকানাথ গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৫৪ জানুয়ারী পর্য্যন্ত অর্থাৎ দু'বছরের উপর সম্পাদকের কাজ করে দেবেন্দ্রনাথ পদত্যাগ করেন ও রাজা প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ দেশহিতার্থী সভার সম্পাদক হন। তার আগেই দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজে (এবং হয়ত অন্যত্র) National Associationএর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি এই সভার সঙ্গে British Indian Associationএর কাজের সংযোগ রেখে চলেছিলেন। এই সভা থেকে পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন সম্পর্কে এক স্মারকলিপি (memorial) পাঠান হয়, যার লিপিকার ছিলেন হয়ত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পরে Hindoo Patriotএর স্বনামধন্য সম্পাদক)। হরিশচন্দ্র ও সম্বাদ প্রভাকর প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য ও দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী ছিলেন। ১৮৫৯খৃঃ দেখি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। রামমোহন ও দ্বারকানাথের মত দেবেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন যে সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের ভিত্তিতে মিলিত হলে ভারত-বাসীদের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সুগম হবে এবং ঐক্য-মন্ত্রেই স্বাধীনতার সাধনা ভারতে ওতঃযুক্ত হবে। তাই দেবেন্দ্রনাথ সে যুগে স্পষ্ট লিখেছিলেন:—"যদি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে। তার পূর্ব্বেকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে" ("দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী"); এই মহান উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে তিনি Indian Mirror (আগষ্ট ১৮৬১) ও পরে National Paper প্রতিষ্ঠিত করেন।

৩রা অক্টোবর ১৮৫৬—১৫ নভেম্বর ১৮৫৮ অর্থাৎ দু'বছর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ের নানা স্থানে ধ্যানধারণায় কাটিয়েছিলেন। সেযুগে তাঁর ব্রহ্মসাধনার সঙ্গে স্বাধীনতার সাধনাও মিলেছিল বলেই তাঁর পরিবারে —বিশেষ তাঁর গুণী পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬), সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৩) ও কন্যা স্বর্ণকুমারী (১৮৫৫-১৯৩২), প্রভৃতির প্রাণে ও রচনায় সেই উদার স্বাদেশিকতার গভীর পরিচয় পাই। এঁদের রচিত বহু গানে দেখি অধ্যাত্ম অনুভূতির সঙ্গে মিশে আছে স্বাধীনতার প্রবল আবেগ এবং দুইএর চরম সমন্বয় ও পরাকাষ্ঠা মিলবে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম সঙ্গীত ও স্বদেশী গানে।

মিউটিনির বছরেই দেখি "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে

চায় রে" গানের রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১২৩৪-৯৪) "পদ্মিনী" প্রকাশিত হ'ল। Col. Todd-এর রাজপুত কাহিনী থেকে এক নূতন ভাবস্রোত বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করতে সুরু হ'ল। রঙ্গলালের 'কর্ম্মদেবী' ও মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রের 'সরোজিনী' ও তাতে রবীন্দ্রনাথের 'জ্বলজ্বল চিতা' গানটি সেকালের লোকেদের মনে কী উদ্দীপনা এনেছিল আমরা হয়ত আজ বুঝতে পারব না। সংগ্রাম করে রক্তদানে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে—এ শিক্ষা যেন শিশু রবীন্দ্রনাথ সহজ আবহাওয়া থেকেই পেয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যুগ ও তার প্রবন্ধগুলি নিয়ে আরো মৌলিক আলোচনা দরকার; রায়ৎ-প্রজাদের শুধু স্বাধীনতা কাড়া নয়—তাদের চাষের জমি ও পেটের ভাত পর্য্যন্ত লুট করার ফলে দেশের অবস্থা কী শোচনীয় হয়েছিল তার বর্ণনা তত্ত্ববোধিনীর লেখাতে প্রথম পাই—ও পরে সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের বঙ্গদর্শনে বাংলা দেশের কৃষক প্রবন্ধে ছাপেন। ইতিমধ্যে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ ও মধুসূদনকৃত তার ইংরেজী অনুবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে Rev Long-সাহেবের জেল—এই সব বৈপ্লবিক ঘটনা বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যকে সৌখীনতার অভিশাপে মুক্ত করে বিশ্বের দরবারে পাকা আসন দিতে চলেছে রবীন্দ্রনাথের শৈশবে। ১৮৭৫।৭৭ সালের তাঁর প্রথম স্বাক্ষরিত দুটি কবিতাই—'হিন্দুমেলার উপহার' ও Lytton দরবার-কাব্য হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীত (১৮৭০) প্রভাবান্বিত। হেমেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে এই হিন্দুমেলা (১৮৬৭) সে যুগের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল; সেকালের দীপ্ত বর্ণনা সৌভাগ্যক্রমে লিপিবদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রের সহপাঠী কবিবর নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯); ইনি এডুকেশন গেজেটে (১৮৬৬-৬৮) স্বদেশী কবিতা লিখতে সুরু করেন: হেমবাবুর ভারতসঙ্গীত আবার (নবীন সেন) স্বদেশ প্রেমব্যঞ্জক বহু কবিতা প্রকাশের পর প্রকাশিত হয়।" তাঁর পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৭) তরুণদের মনে খুব নাড়া দিয়েছিল। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' দু'একটী নিখুঁৎ ছবি এঁকে গেছেন রবীন্দ্রনাথের—১৫ বছরের বালক কিন্তু দেখতে যেন ১৮।১৯—"বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে...তিনি পকেট হইতে একটি নোটবুক বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীত-কণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও স্ফুটোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম...অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে বলিলাম যে আমি নেসানাল মেলায় গিয়া একটি অপূর্ব্ব নবযুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি একদিন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন।" আবার ১৮৯৩ সালে রাণাঘাটে দেখা: 'কুষ্টিয়া যাইবার পথে একদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১০টার ট্রেণে দয়া করিয়া রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন...সেই (১৮৭৬) নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব! উজ্জল গৌরবর্ণ; স্ফুটোন্মুখ পদ্ম-কোরকের মত দীর্ঘ মুখ। মস্তকে মধ্যভাগ-বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশশোভা, অলকা শ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণ-দর্পণোজ্জ্বল ললাট। ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্ব্ব শ্মশ্রু শোভান্বিত মুখমণ্ডল। কৃষ্ণ পক্ষ্মযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু, সুন্দর নাসিকায় মার্জ্জিত সুবর্ণের চশমা...মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরাণ ও রেশমী চাদর, চরণে কোমল পাদুকা...আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিলাম। আমার তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের কবিতাটি মনে পড়িল, "দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল"।

দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে" আর তারপরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মত শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়", গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে", বড়দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।" জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন একটা পোড়ো বাড়িতে—তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

এই সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্যোগএর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল, হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসে নি।

"আমরা তখন তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিয়া হারমনি-ফ্লুট তাঁহার সামনে দিলাম—তিনি একটি পর্দা কিছুক্ষণ টিপিয়া সুরটি মাত্র স্থির করিয়া সপ্ত ছাড়িলেন; তাহার পর একটি নূতন কীর্ত্তন গান গাহিতে লাগিলেন:—

"এস এস ফিরে এস!
বঁধু হে ফিরে এস
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত
নাথ হে! ফিরে এস"

"আমার মনে হইতে লাগিল...বংশীবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠ এইবার গৃহ পূর্ণ করিয়া ছাদ ভিন্ন করিয়া আকাশ মুখরিত করিতেছে। আবার যেন শিশুর কোমল অস্ফুট কণ্ঠের মত কর্ণে কোমল মধুর স্পর্শের মত অনুভূত হইতেছে। কি মধুর মুখভঙ্গী। গানের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখ ও চক্ষু অভিনয় করিতেছে। গানের করুণ ভক্তিরস যেন তাঁহার অধর হইতে গোমুখী নিঃসৃত জাহ্নবীর পবিত্র ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে। আমি তখন রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। গীত শুনিতে শুনিতে

আমি আত্মহারা হইলাম। আমার কঠোর হৃদয়ও গলিল। গানের পর তাঁহার কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি করিলেন। রবিবাবু একাধারে কবি ও অভিনেতা ; তাঁহার আবৃত্তির তুলনা নাই……।"

১৮৭২ সালে যে রবীন্দ্রনাথ দীনবন্ধুর' জামাই বারিক' লুকিয়ে পড়ছেন এবং বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন ও অক্ষয় সরকারের 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' নিয়ে মেতে আছেন তিনি ১৮৭৬ ও ১৮৯৩ সালে কবিবর নবীন সেনের চোখে কেমন প্রতিভাত হয়েছিলেন তার আভাস পাওয়া গেল। 'সোনার তরী'র কবি তাঁর কায়েমি আসন পেয়েছেন সেটি দেখে গেছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (মৃত্যু ১৮৯৪)—যিনি ১৮৮০-৮১ সালেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অমরত্বের। রবীন্দ্রনাথের গান অনেকেই শুনেছেন সেকালে ; কিন্তু নবীন সেনের মতন দরদী ভাষায় প্রকাশ করে যেতে পারেননি তাঁদের অনুভূতি।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতের বিকাশধারা এবার অনুসরণ করা যাক্। তাঁর সব চেয়ে কাঁচা কাব্য রচনা ১৩-১৮ বছর বয়সের—কবিতা—যাকে তিনি নিজে নাম দিয়েছেন "শৈশব সঙ্গীত"। সে সময়ে খাঁটি জাতীয় গান হয়ত কিছু লিখেছিলেন—রক্ষা পেয়েছে মাত্র দুটি ; (১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরু বিক্রম নাটকের মধ্যে—খাম্বাজ—একতালা—(দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত ১৮৭৪-৭৯)

'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্য্যে স'পিয়াছি সহস্র জীবন"

(২) বিলাতযাত্রার ঠিক পূর্ব্বে (মাইকেলী রীতিতে ?) জয় জয়ন্তী রাগিনীতে :

"তোমারি তরে স'পিনু দেহ
তোমারি তরে মা স'পিনু প্রাণ
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান॥"

এই গান গেয়ে কিশোর-কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। এ গানের ভাবে ও সুরে আমরা তাঁর দাদাদের স্বদেশী গানের অনুকরণ যেন স্পষ্ট শুনি। মধুসূদন, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ও মাইকেল জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্র-ভবনে সমাদৃত অতিথি হয়ে বহুদিন দেখা দিয়েছিলেন তার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে আমরা পাই।

১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখি কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রসিদ্ধ স্বদেশী গান রচনা করেছেন :

"মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি
দিবা রাত্রি ঝরিছে-লোচন বারি"

এ গান হিন্দু মেলায় যেমন গাওয়া হত তেমনি মাইকেলের মেঘনাদ—যখন নাট্যরূপ পেল—তার অভিনয়ের আগে 'মলিন মুখচন্দ্রমা' কখনও নট-বেহাগে কখনও তিলক-কামোদ সুরে গাওয়া হয়েছে। ১৮৬৮ হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে দেখি মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপহার দিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ স্বদেশী গান—খাম্বাজ-আড়াঠেকায় :

'মিলে সবে ভারত সন্তান
এক তান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান,

—এ গান হাজার হাজার মানুষের প্রাণে কী উদ্দীপনা জাগিয়েছিল তার পরিচয় পাই অমর বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যে : "এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক ! পূর্ব্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক ! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক"। (বঙ্গদর্শন—চৈত্র, ১২৭৯)।

সেই বঙ্কিমচন্দ্রই ক্রমশ বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের মাতৃবন্দনা রচনা করে শেষে 'বন্দেমাতরম' ও 'আনন্দমঠের' ঋষি বঙ্কিমরূপে সারা জাতিকে এক নূতন দীক্ষা দিয়েছিলেন ; তার আগে কবি নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র এডুকেশন গেজেটে স্বদেশী গান ছাপতেন, যার মধ্যে ১৮৭০ সালের সর্ব্বজন-বিদিত "ভারত সঙ্গীত" (শ্রাবণ ১২৭৭)—গানে না হোক আবৃত্তিতে—শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন ৯।১০ বছরের বালক মাত্র, তবু তাঁর কাব্য-গীতির আদি পর্ব্বে এই ভারত-সঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট—বিশেষ তাঁর হিন্দু মেলার কবিতায়। আরো কত ভুলে যাওয়া স্বদেশী গান যে রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা'র নিদর্শন পাই হিন্দু মেলা সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯) রচিত গানের মধ্যে (বাহার—যৎ)

"লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে
আমরা সকলে হেথা হেলা করি নিজ মাতা
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে॥

১৮৭৫-৭৬ সালের রাজনৈতিক ইতিহাস ; জাতীয়-মহাসভার জন্মের ঠিক দশ বছর আগেকার কথা। বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়েছে ও ভারতীর আবির্ভাবের প্রস্তুতি-পর্ব্ব। ঠিক এই সময়ে অতি ক্ষুদ্র আকারে একখানি বই ছাপা হয়েছিল যেটি অনেকের কাছে অজানা—অথচ সেটি যেন সে যুগের জাতীয় ভাবের প্রতীক : (হুবহু নকল করে দিলাম)—

"জাতীয় সঙ্গীত"—(প্রথম ভাগ) স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত-মালা। মূল্য ৶০ আনা (উল্টো পাতায়) National Song Book Part I Printed by G. P. Roy & Co. 21 Bowbazar Street (1876). etc ; লেখক বা সম্পাদকের নাম না-ছাপা যে ইচ্ছাকৃত তা' স্পষ্ট বোঝা যায় ; "বিজ্ঞাপন"টি উদ্ধৃত করি :—

এই "জাতীয়-সঙ্গীত" প্রচারের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যাইবে।…… অনেকে এই সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা সংগ্রাহকের (?)

কৃতজ্ঞতার পাত্র। যদি এই গ্রন্থদ্বারা অন্তত এক ব্যক্তিরও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত হয় সংগ্রাহক কৃতার্থ হইবেন এবং সামাজিক ও বিশুদ্ধ প্রণয়-ঘটিত সঙ্গীত সকল সংগ্রহ করিয়া "জাতীয়-সঙ্গীতের" অপর ভাগ প্রকাশ করিবেন। এই গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা কিছু লাভ হইলে তাহা কোন প্রকার জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত ব্যয় হইবে। কলিকাতা ৬ই ফাল্গুন ১২৮২"।

"জাতীয় সঙ্গীত" বইখানিতে ১৮৭৬ সালে দেখছি অনেক পুরাতন সমস্যা ও ভাবের সমাবেশ, নীলকরদের অত্যাচার: "নীল বানরে সোনার বাংলা" ও 'হে নিরদয় নীলকর, গান দুটি নীলদর্পণ নাটক থেকে স্থান পেয়েছে। তার সঙ্গে 'মলিন মুখ চন্দ্রমা.। 'মিলে সবে ভারত সন্তান', লজ্জায় ভারত যশ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের দাদাদের গান; হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙ্গা' (হয়ত শুধু আবৃত্তি নয় গাওয়া হত) 'প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ' প্রভৃতি হিন্দু মেলায় গীত ৭টি গান, (সুর তাল নির্দ্দেশ সমেত); গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে' ও 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা' গান দুটি। তাছাড়া দেখি দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলীর 'না জাগিলে সব ভারত ললনা' ও অপ্রকাশিত পর্য্যায়ে চারটি গান:

আছ সপ্ত শত বর্ষ নিদ্রাগত
এখনও জাগো জাগো মা ভারত' ইত্যাদি।

'নীলদর্পণ' নাটক ছাড়া আরো কিছু নাটকের ভিতর দিয়ে স্বদেশীভাব প্রচারিত হয়, তা'রও প্রমাণ পেলাম 'ভারত মাতা, 'ভারতে যবন' 'বীরনারী' 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' ইত্যাদি নাটকের ভিতরকার গানগুলির উদ্ধৃতি থেকে। সব চেয়ে বিস্ময় লাগল আমার—যখন দেখলাম জ্যোতিরিন্দ্র-রচিত 'সরোজিনী' নাটিকায় বালক রবীন্দ্রনাথের সংযোজিত গানের কয়েকটা কলি এই 'জাতীয় সঙ্গীত' পুস্তিকায় (রাগিনী অহং একতালা) তার উপর টীপ্পনী যথা 'ইংরাজী সুরে গান করিতে হয়:—

জ্বাথ্ রে জগৎ মেলিয়ে নয়ন
জ্বাথরে চন্দ্রমা জ্বাথরে গগন
স্বর্গ হতে সব জ্বাথ দেবগণ
জলদ অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন তোরাও দেখ্ রে
সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ
রাজপুত সতী আজিকে কেমন
সঁপিছে পরাণ অনল শিখে॥

এই অংশটি দিয়ে গান সুরু করে সম্পাদক অস্থায়াতে ফিরেছেন:—

'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা' ইত্যাদি

৩০শে নভেম্বর ১৮৭৫ তারিখে 'সরোজিনী' প্রকাশিত হয় এবং তার মধ্যে ১৪ বছর বয়সের রবীন্দ্র-রচনা এই গানটি ১৮৭৬ সালের 'জাতীয় সঙ্গীতে' সগৌরবে স্থান পেয়েছিল—এটি স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নেই। তারও প্রায় দুবছর আগে পুরু বিক্রম (১৮৭৪) নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৩ বছরের বালক কবি রবীন্দ্রনাথের গান 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটি জুড়ে দিয়েছিলেন।

১৮৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের* সাহচর্য্যে রবিচ্ছায়া নামক প্রথম গীত-সঞ্চয়িতা প্রকাশ করেন; তখন দেখি ৭৮টি মাত্র গান জাতীয় সঙ্গীত বলে ছাপা হয়েছিল; তা'র মধ্যে একটি গান আজও শোনা যায়—(রাগিনী প্রভাতী একতালা)

"একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।"

কংগ্রেসের জন্ম-বৎসরে এগানের সার্থকতা আছে। এরপর রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি স্বদেশী গান লেখেন, তার বেশীর ভাগই আমরা ভুলেছি বলে অপরাধ মনে হয়। তার মধ্যে তাল ও রাগের নির্দ্দেশ দিয়ে বেরিয়েছিল; (১) দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাহিয়ে (বাহার কাওয়ালি) (২) কেন চেয়ে আছ গো মা (কাফি) (৩) আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা (সিন্ধু) (৪) আনন্দধ্বনি জাগাও (হাম্বির ফেরতা)।

১২৯১ (১৮৮৪) সালে ব্রহ্মোপাসনার জন্য কবি (তখন তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক) লেখেন "শোন শোন আমাদের ব্যথা" (মিশ্র দেশ-খাম্বাজ ঝাপতাল) এবং 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' (ঝিঁঝিট) দ্বিতীয় গানটি ১২৯২ (১৮৮৫) সালে রচনা করেন, জাতীয় সঙ্গীত বলেও গাওয়া হত; যেমন 'জন-গণ-মন' জাতীয় সঙ্গীতও ব্রহ্ম সঙ্গীত বলে ১৯১১ মাঘোৎসবে গাইতে শুনেছি। ১২৯৩ (১৮৮৬) সালে দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায়; তার প্রথম সাড়া পাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহস্রাধিক টাকা কংগ্রেস ফণ্ডে দেন—তা'ছাড়া রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন অধুনা সুপরিজ্ঞাত কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতে (১) আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে (২) আগে চল আগে চল ভাই (বেহাগ); (৩) তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ (সিন্ধু ছাত্র সম্মেলনে কবি গেয়েছিলেন) ১২৯৫ (১৮৮৭)। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' কবি নিজে (রামপ্রসাদী সুরে) গেয়ে কংগ্রেস মহাসভাকে ও সাধারণ শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলেছিলেন; এ গান আবার ১৯০৫ সালে আমাদের প্রাণে কত বড় প্রেরণা জাগিয়েছিল তা স্বদেশী যুগের লোকেরা সবাই জানেন! ১২৯২-৯৩ সালেই (১৮৮৪-৮৬) আবার দেখি রবীন্দ্রনাথ মন দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে-মাতরম্' গানে; সেটি নিয়ে আমি "পূর্ণিমা" পত্রিকায় আলোচনা করেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে মল্লার কাওয়ালীতে গানটি নাকি গাইতেন বা গাওয়াতেন; রবীন্দ্রনাথ সুর বদলে দেশ রাগে বন্দেমাতরম (প্রথমাংশ

* ইনি সঞ্জীবনী পত্রিকায় (২৭শে বৈশাখ—১২৯২) 'আমরা কেন অন্ন পাইবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

যেটুকু এখনও কংগ্রেসে গাওয়া হয়) গেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন (১৮৯৪'সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে অবশ্য); তাঁর নিজের দেওয়া সুরেই রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম' শোনান কবি নবীন সেনকে ১৮৯৩ সালে, তিনি "আমার জীবনে" নিজেই সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। ১৮৯১ দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের পত্রিকা "সাধনা"; (১৮৯৩) সালে রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ পড়েন বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া দেশ রাগেই বন্দেমাতরমের প্রচার সারা দেশে হয়েছিল এবং ১৩০৩ (১৮৯৬) সালে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা কংগ্রেসে একক কণ্ঠে মুসলমান সভাপতি রহমতুল্লার সামনে "বন্দেমাতরম" শুনিয়ে সেই বিপুল জনতাকে মাতিয়েছিলেন। সেই দিনেই তাঁর গন্ধর্ব্ব-লাঞ্ছিত কণ্ঠস্বরের উপর অত্যধিক চাপে খুব ক্ষতি হয়েছিল সে কথা কবির মুখে শুনেছি। সেই ১৩০৩ (১৮৯৬) সালেই কবি চিত্রা ও চৈতালী পর্য্যন্ত সব রচনা দিয়ে 'গ্রন্থাবলী' প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রমে প্রথম স্বদেশীগান "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" ছাপা হয় এবং ২২ বছর পরে ১৮৯৬ (১৩০৩) সালে তাঁর নিজের স্বদেশী গানের সঙ্গে বঙ্কিমের বন্দেমাতরম কংগ্রেসে গাইছেন—এ রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আজ বুঝতে চেষ্টা করা উচিৎ। ১৮৯৮ কবি লিখেছেন "কণ্ঠ রোধ" ও সঙ্গে সঙ্গে তর্জ্জন।

১৯০০-০১ সালে দেখি পূর্ব্ববঙ্গে তাঁদের জমিদারী পরিদর্শনের কাজ থেকে সরে কার্জ্জনী রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গড়ে তুলতে লেগেছেন। 'কল্পনা ও ক্ষণিকা' শেষ করে নামছেন 'কথা ও কাহিনী' এবং 'নৈবেদ্য' রচনায়; ও সেই সঙ্গে নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা। ১৯০১ নৈবেদ্য প্রকাশ ও কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধিজীর প্রথম আবির্ভাব। ১৯০২ (অগ্রহায়ণ) পত্নী বিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ যেন ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত মূর্ত্তি। তাঁর সঙ্গে এসে মিলেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—যিনি তাঁর "Sophia" পত্রিকায় সেকালের রবীন্দ্রনাথকে "বিশ্বকবি" বলে অভিনন্দিত করেছিলেন ও পরে "অগ্নিযুগে"র সন্ধ্যা পত্রিকা সম্পাদন করে অমরত্ব লাভ করে গেছেন। কার্জ্জনের "বঙ্গভঙ্গ" চক্রান্ত (১৩১২) ও রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব নেতৃত্ব সব আজ সুস্পষ্ট ইতিহাস। তার মধ্যে দেখি ১৯০৩।৪ সালে কবিবন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন নয় ভাগে তাঁর "কাব্যগ্রন্থ" ছাপালেন এবং সেই সময়কার বহু গদ্য রচনা হিতবাদীর উপহাররূপে প্রকাশিত হল (১৯০৪)। 'সঙ্কল্প' 'স্বদেশ' ও 'গান' সে যুগে হাতে হাতে ঘরে ঘরে স্বাদেশিকতা প্রচার করেছে। সেপ্টেম্বর ১৯০৫ দেখি রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশ' কবিতা ও বাউল (গান) প্রকাশ করে সারাদেশকে এমন মাতিয়েছেন যে প্রবীণ অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছিলেন: 'এবার মরা গাঙে বান এসেছে' গানটি শুনিয়া তরী ভাসাইব কি, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে'। ১৯০৪ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে কবি তাঁর "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ পাঠ করেন—সে যেন স্বদেশীযুগের "বোধন"। ১৯০৫ (১৩১২) সালের মধ্যে বহু অমূল্য জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন, যা সমগ্রজাতি চিরদিন সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করবে। ১৯০৫ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৮৮ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন এবং ঐক্য মন্ত্রের সেই একনিষ্ঠ সাধক পিতাকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ "কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে", গানটি যে রচনা করেন সে গান মৃত্যুবরণকারী অনেক দেশ-সেবকদের প্রাণে প্রেরণা জুগিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের (৬ মাঘ ১৯১৫) বার্ষিক স্মৃতি-সভায় ঐ গান দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শুনেছি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপাসনার পর ব্রহ্ম সঙ্গীত গাইছেন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অর্গান বাজাচ্ছেন, প্রথম দেখে মনে হয়েছিল কোন যুগের মানুষ এঁরা, কত বড় জাতীয় ইতিহাসের স্তম্ভ রূপে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন। ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে বাংলার বুক থেকে উঠল প্রথম জীবন্ত বাণী "স্বরাজ"—আমাদের জন্মগত অধিকার। শিবাজী উৎসবের কবির পাশে তখন দাঁড়িয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীঅরবিন্দ।* সঙ্কট থেকে সঙ্কটে নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব সেকালে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন —তা'থেকেই সমগ্র জাতি পেয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে (১৯০৮) ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভিতরে তখনো অজানা গান্ধিজীর 'অহিংস প্রতিরোধের পূর্ব্বাভাষ। ১৯০৯-১০ প্রবাসী পত্রিকায় কবি ছেপেছেন "গীতাঞ্জলী" ও রাজা এবং লিখে গেছেন স্বদেশীযুগের গদ্য-মহাকাব্য গোরা। ১৯১১ (ডিসেম্বর) কংগ্রেসে তাঁর "জন গণ মন" প্রথম গাওয়া হয়। ১৯১১-১২ তার রূপকনাট্য ডাক ঘর ও অচলায়তনের সঙ্গে ৫০ বর্ষ পূর্ত্তির চরম নিদর্শন "জীবন স্মৃতি!"

১৩০৩ থেকে ১৩১২-১৩ (অর্থাৎ ১৮৯৬-১৯০৬) সালের মধ্যে স্বদেশী গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ যেন যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন; এই তথ্যটি একটু স্পষ্ট করে যাব, দু'চারটি গানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাফি রাগে তিনি গেয়েছেন; 'কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে'; এ গানের অন্তরায় দেখি:

"তুমি দিতেছ মা যা আছে তোমারি
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীর বারি
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী—"

১৩১০ সালের মধ্যে—অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের আগেই—দেখি উক্ত পদের অপূর্ব্ব রূপান্তর ভৈরবীতে: "ওই ভুবন মনমোহিনী" ও তার সঙ্গে 'জননীর

---

* জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে "জাতীয় বিদ্যালয়" ভাষণটি কবি পাঠ করেন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে চারটি বক্তৃতা দেন। ১৯০৬ জাতীয় মহাসভার প্রবন্ধ গুলি তাঁর 'সাহিত্য সম্মেলন'মণ্ডপে পাঠ করেন ও সমগ্র জাতিকে মনে করিয়ে দেন: "এই মিলনোৎসবের বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রটি বাংলা সাহিত্যেরই দান।"

দ্বারে আজি ঐ' 'নববৎসরে করিলাম পণ', হে ভারত আজি নবীনবর্ষে প্রভৃতি ২৫।৩০টি জাতীয় সঙ্গীত।

কলাবিৎ রবীন্দ্রনাথ জন্মভূমির 'ভুবন মোহিনী' রূপ যেমন দেখেছেন, তেমনি সুরের ঐশ্বর্য্যও সেকালে দেখিয়েছেন। হঠাৎ ১৩১২-১৩, (১৯০৫-৬) দেশ মাতৃকার অঙ্গচ্ছেদের বেদনায় "রবি-বাউল" যেন এক অভিনব সুরে আকাশ বাতাসকে ভরিয়ে দিলেন: বাউলদের ভাটিয়ালি ও সারি গানের সুর—যেগুলি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন। তার ফলে এমন কতকগুলি গান ও সুর আমরা পেয়েছি—যা খাঁটি বাংলার প্রাণের সুর—যেমন "আজ বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে" প্রভৃতি সত্যিই অতুলনীয়, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করেছেন। ১৩১২-১৩ রচিত কয়েকটি গান এখানে মনে করাতে চাই:

১। আপনি অবশ হবে বল দিবি তুই কারে?

২। নিশিদিন ভরসা রাখিস' (৩) আমার প্রাণের মানুষ (৪) আমি ভয় করব না (৫) ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি: (৬) তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে তাবলে ভাবনা করা চল্‌বে না। (৭) যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে চানা (৮) আমার সোণার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি (৯) মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে (১০) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা: (১১) যে তোরে পাগল বলে (১২) বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি (১৩) বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান (১৪ বাংলার মাটি বাংলার জল।

সর্ব্বশেষে মনে পড়ে:

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে—

যে গান মহাত্মা গান্ধিকেও মাতিয়ে ছিল তাই বাংলা শিখে তিনি ঐ গানে যোগ দিতেন তাঁর উপাসনা সভায়। ২১ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম করে গান্ধিজী যখন ১৯১৫ সালে ভারতে স্থায়ীভাবে নামলেন তখন সপরিবারে তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁকে "গুরুদেব" সম্বোধন করেন। বয়সে কবি-গুরুর চেয়ে মাত্র আট বছরের ছোট হলেও গান্ধিজী তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করিতেন এবং রাজনৈতিক তথা অন্য অনেকক্ষেত্রে তাঁদের মত-ভেদ থাক্‌লেও পরস্পরের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। গান্ধিজীর নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসধারা এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে বইতে সুরু করেছিল; কিন্তু মহাত্মাজী জানতেন সেই জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দান কী অসামান্য। আজ সেই দুই মহাপুরুষকেই আমরা হারিয়েছি—তবু আজ এই কথা ভেবে সান্ত্বনা মেলে যে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরে "বন্দেমাতরং" গান ও তাঁর "জনগণমন" (১৯১১) ও "দেশ দেশ নন্দিত করি" (১৯১৫) প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত মহাত্মাজী শুনে গেছেন ও জাতীয় নবজাগরণে তাদের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করে গেছেন।

১৮৭৪ সালে রচিত "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" থেকে সুরু করে শেষ পর্য্যন্ত যে সব স্বদেশী গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করে গেছেন সেগুলি স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত করা আমাদের জাতীয় দায়ীত্ব বলে মনে করি; তাই এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই প্রবন্ধে চেষ্টা করলাম। রাজকোপে অনেক স্বদেশী গানের চয়নিকা লুপ্ত হয়ে গেছে; তবু সাময়িক পত্রিকা ভাল করে ঘাঁটলে অনেক অপ্রত্যাশিত নূতন উপাদান ও তথ্য প্রকাশ হবে এই আশা করে এই বিষয়ে আলোচনা তুল্‌লাম। আধুনিক স্বরলিপির প্রবর্ত্তক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে প্রথমে সকৃতজ্ঞ প্রণতি জানাই কারণ তিনিই স্বরলিপি ছাপা প্রসঙ্গে 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটি, বালক রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে প্রকাশ করে গেছেন; দুই ভাই সুরকার ও সুরশিল্পী, তাঁদের তরুণ জীবনের প্রেরণা ঢেলে দিয়েছেন কত গানে—বিশেষ 'স্বদেশী' সঙ্গীতে তাও ভাল আমাদের বুঝতে আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ। তাঁদের প্রেরণায় ভাগিনেয়ী ও সুরশিষ্যা শ্রীমতী সরলা দেবী তাঁর "শত গান" স্বরলিপি প্রকাশ করেন ১৩০৭ সালে অর্থাৎ প্রায় ৫০ বছর আগে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সঙ্গীতসম্ভার কণ্ঠে কণ্ঠেই প্রাধানত চলে এসেছে; অল্পসংখ্যক গানই স্বরলিপিতে উঠেছে; তাও প্রধানত প্রতিভা দেবী, ইন্দিরা দেবী ও দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত চেষ্টায়। কিন্তু কবি গুরুর স্বদেশী গান শতাধিক হলেও "গীত-বিতানে" মাত্র ৪৬টি স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে আবার প্রাচীন গানগুলি বেশীর ভাগই বাদ দেওয়া হয়েছে। 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র মত রবীন্দ্র গীতলোকে সেই উপেক্ষিতাদের জন্য আমার মনটা কাঁদে, কারণ কবি গুরুর মুখে মধ্যে মধ্যে তাদের দুএক কলি গাইতে শুনে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি,—কী অপদার্থ ও অকৃতজ্ঞ আমরা যে সেই সব অমূল্য সম্পদ রক্ষা করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে আমরা পারিনি। স্বদেশীযুগে "মোমের" রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের নিজের সুর যা আমরা শুনেছি তাও লুপ্ত হয়েছে; আধুনিক রেকর্ডে কিছু পুরাতন গান উঠছে সেটা আশার কথা (সুরের ব্যতিক্রম অবশ্য এখানেও আছে!) কিন্তু সর্বদেশে যে স্বরলিপির ভিতর দিয়ে সঙ্গীতের সংরক্ষণ-প্রণালী গড়ে উঠেছে—তাকে অনাদর করলে আমাদেরই ক্ষতি; এবং বহু ক্ষতি যে আজ প্রায় অপূরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই শেষে মনে করাতে চাই ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে। তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে সেকালে আমাদের পুরাণ গানের চর্চ্চা চল্‌ত; হঠাৎ পরীক্ষকের মত ভঙ্গীতে তিনি একদিন আমাদের প্রশ্ন করলেন 'রবীন্দ্রযুগের স্বদেশী গানের মধ্যে ক্ষুদ্র 'জোনাকি'ও মর্য্যাদা পেয়েছিল তা তোমরা জান কি?" অর্ব্বাচীন আমরা সে ব্যসকূটের কি জবাব দেবো? তখুনি দিনুদা কোলে এস্রাজটা টেনে নিয়ে তাঁর সেই স্নিগ্ধ উদাস কণ্ঠে গান ধরলেন—আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনলাম:—

"জোনাকি! কী সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ।
এই আঁধার মাঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ॥
তুমি নও ত সূর্য্য নও ত চন্দ্র, তাই বলেই কি কম আনন্দ
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জ্বেলেছ॥

তোমার যা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গো ঋণ কারো কাছে
তোমার অন্তরে যে-শক্তি আছে তারি আদেশ খেলেছ ॥
তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠো, তুমি ছোট হয়ে নও গো ছোটো,
জগতে যেথায় যত আলো, সবায় আপন করে ফেলেছ ॥

এই অপূর্ব্ব বাউল সুরের গানটি গীত-বিতানের স্বদেশ-বিভাগ চ্যুত হয়ে 'বিচিত্র' বর্গের একটি কোণে স্থান পেয়েছে! (গীত-বিতান ২ খণ্ড ৬০৬-৭ পৃঃ) এমনি কত স্বদেশী গান রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে হয়ত লুকিয়ে রয়েছে; সন্ধানী চোখ দিয়ে তাদের খুঁজে বার করতে হবে এবং যথাসম্ভব খাঁটি সুরে তাদের স্বরলিপি—বাংলা ও হিন্দী (নাগরী) হরফে ছাপার আয়োজন করতে হবে। কারণ শুধু বাঙালী নয়, ভারতবাসী মাত্রই হয়ত একদিন দাবী জানাবে এই সব গান শেখবার। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী নাগরী অক্ষরে 'সঙ্গীত গীতাঞ্জলী' প্রকাশ করেছিলেন বলে সেই অপূর্ব্ব গানগুলি আমি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কত অবাঙ্গলী নর-নারীর মুখে শুনে মুগ্ধ হয়েছি। তেমনি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সমগ্র জাতির সম্পদ মনে করে তার বৈজ্ঞানিক প্রচারের দায়িত্ব আমাদের নিতেই হবে। এদিকে বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গীত নায়কেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই গানগুলির ভিতর দিয়ে শুধু বাঙালী তার বাঙলা মায়ের অপূর্ব্ব মূর্ত্তিই দেখেনি, সেই রূপ ও সুর অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা চিত্রে, অগণ্য অনবদ্য রচনার ভিতর দিয়ে মানব-স্বাধীনতারই যেন প্রতীক হয়ে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের নবতীতম জন্মোৎসবের আগেই তার স্বদেশী গানের পূর্ণ সঙ্কলন ও স্বরলিপি ছাপা হবে এই আশায় প্রবন্ধ লিখলাম।

আমার কবিতা

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কবিতা আজি লিখে যাই আকাশের গায়
গ্রহ-উপগ্রহ আর চন্দ্র-সূর্য্য তারার অক্ষরে;
চিরন্তন হোয়ে থাক অন্তহীন মহাশূন্য 'পরে
আন্তর আকুতি মোর জ্যোতিষ্কের জ্যোতির্ম্ময়তায়।

অতৃপ্ত আত্মার ক্ষোভ এ-দিনের মর্ম্মান্ত-হেলায়
আলোর স্পন্দনে যেন রাত্রি-দিন কাঁদে আর্ত্ত-স্বরে;
নিষ্করুণ বঞ্চনার সত্য যেন সবার উপরে
উদয়াস্ত জাগে বসি' নিষ্পলক পুত্রশোক-প্রায়।

আনন্দের অবসরে কোনোদিন মুহূর্ত্তের ভুলে
বারেকের তরে যদি যুক্তকরে উর্দ্ধ মুখে চেয়ে
শুব্ধতার তলাতলে হারাইয়া ফেলো আপনারে,—
"স্মরণের সরোরুহ নয়নের সুনীল অকূলে
বিকশিবে বদ্ধ টুটি': কবিতার ভীরু আলো পেয়ে
তৃণাঙ্কুর-শিহরণ গুঞ্জরিবে সন্ধানি' আমারে॥

সর্ব্বহারা

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

দুখের দিনে অশ্রু ঝরে
অসীম দুখে শুকিয়ে যায়!
শিয়র দেশে মৃত্যু যাদের
তাদের আবার কিসের ভয়?
যাযাবরের পথের নেশা,
মাধুকরী যাদের পেশা,
গহন বনে তারাই পারে
ঘরের অভাব করতে জয়!
শক্তি তাদের দুঃখ দলন,
বুক ফুলিয়ে তাদের চলন,
এগিয়ে চলার উন্মাদনায়
অবহেলায় দুঃখ সয়!
নূতন করে গড়বে তারা
এ সংসারের জীবন ধারা,
যারা আজি সর্ব্ব হারা
তুচ্ছ তারা নয় কো নয়!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জৈন পরিব্রাজক

সূর্যোদয়ের সঙ্গে পান্থশালার দ্বার খুলিল।

পারসিক সার্থবাহ ইতিপূর্বেই উষ্ট্র গর্দভের পৃষ্ঠে পণ্য-ভার চাপাইয়া প্রস্তুত ছিল, তাহারা পান্থশালার শুল্ক চুকাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা সারা আর্যাবর্ত পরিভ্রমণ করিবে, পথপার্শ্বে আলস্যবশে বিলম্ব করিলে চলিবে না।

চিত্রক রাত্রে ঘুমায় নাই, কিন্তু সেজন্য তাহার শরীরে তিলমাত্র ক্লান্তিবোধ ছিল না। সে দেখিল, পান্থশালা শূন্য হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রট্টার কক্ষদ্বার এখনও রুদ্ধ। রাজকুমারীর এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। চিত্রক মনে মনে গত রাত্রির অলীক ভয় ভাবনার কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রাচীর বেষ্টনের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

নবীন রবিকরে উপত্যকা ঝলমল করিতেছে, তৃণ প্রান্তে তখনও শিশিরবিন্দু শুকায় নাই। হিমার্দ্র মন্থর বায়ু শরীর পুলকিত করিতেছে। চিত্রক উৎফুল্ল নেত্রে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। আজ তাহার চোখে প্রকৃতির রঙ্ বদলাইয়া গিয়াছে।

চারিদিক দেখিতে দেখিতে তাহার চোখে পড়িল, কাল রাত্রে যেখানে সে আগুনের প্রভা দেখিয়াছিল সেইখানে আকাশ ও দিগন্তের সঙ্গমস্থলে অনেক পক্ষী উড়িতেছে; আর কোনও দিকে অমন ঝাঁক বাঁধিয়া পক্ষী উড়িতেছে না। পক্ষীগুলিকে আকাশের পটে সঞ্চরমান কৃষ্ণবিন্দুর ন্যায় দেখাইতেছে।

চিত্রক অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এই সময় রট্টা বাহিরে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলেন। চিত্রক সহাস্য হৃদ্যতার সহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল—

'রাত্রে সুনিদ্রা হইয়াছিল?'

রট্টা তাহার মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া নিম্নে নদীর পানে চাহিলেন, বলিলেন—'হাঁ। আপনার?'

চিত্রক অম্লানবদনে বলিল—'আমারও। খুব ঘুমাইয়াছি।'

রট্টা নদীর পানে চাহিয়া রহিলেন। আজ তাঁহার মনের ভাব অন্য প্রকার; একটু চাপা, একটু অন্তর্মুখী। চিত্রকের মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সে অন্তরে এক অপূর্ব প্রীতি-প্রগল্‌ভ উদ্দীপনা অনুভব করিতেছে; কোনও অজ্ঞাত উপায়ে এই রাজকুমারীর উপর তাহার যেন স্বত্বপূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। যাহার জন্য জাগিয়া রাত কাটাইতে হয় তাহার প্রতি সম্ভবত এইরূপ অধিকার-বোধ জন্মে।

সে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কি যাত্রার জন্য প্রস্তুত?'

রট্টা বলিলেন—'আমি প্রস্তুত। কিন্তু দু'দণ্ড পরে যাত্রা করিলেও ক্ষতি নাই' বলিয়া গিরিক্রোড়স্থ নির্জন পান্থশালাটির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রক হাসিয়া উঠিল, বলিল—'সত্য বলুন, এই পান্থশালার প্রতি আপনার মমতা জন্মিয়াছে?'

রট্টা স্মিতমুখে বলিলেন—'তা জন্মিয়াছে।—ফিরিবার পথে আবার এখানে রাত্রিযাপন করিব।' মনে মনে ভাবিলেন, ফিরিবার সময় সঙ্গে অনেক লোক থাকিবে··· এমন রাত্রি আর হইবে কি?

দুই একটি অন্য কথার পর চিত্রক পশ্চিম দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—'দেখুন তো, কিছু দেখিতে পাইতেছেন?'

রট্টা চক্ষের উপর করতলের অন্তরাল রাখিয়া কিছুক্ষণ দেখিলেন—'অনেক পাখী উড়িতেছে। কী পাখী?'

চিত্রক বলিল—'চিল্ল শকুন—'

রট্টা চকিতে চিত্রকের পানে চাহিলেন। কিন্তু এই সময় তাঁহাদের মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট হইল।

পান্থশালার সম্মুখে ও দুই পাশে পথের তিনটি শাখা এতক্ষণ শূন্য পড়িয়া ছিল; পারসিক সার্থ অনেক পূর্বেই গিরিসঙ্কটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল; এখন উত্তর দিক হইতে কয়েকটি মানুষ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সহিত উষ্ট্র, গর্দভ নাই, কেবল কয়েকটি মানুষ অদ্ভুত বেশভূষা পরিয়া পৃষ্ঠে ঝোলা বহিয়া পদব্রজে আসিতেছে।

চিত্রক বিস্মিত হইল। প্রাতঃকালে পান্থশালায় যাত্রী আসে না; কোথা হইতে আসিবে? নিকটে কোথাও জনালয় নাই। তবে ইহারা কে?

যাত্রিগণ আরও কাছে আসিলে চিত্রক দেখিল, ইহাদের বেশভূষাই শুধু অদ্ভুত নয়, আকৃতিও অদ্ভুত। ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষগুলি; মুখ বর্তুলাকার, হনু উচ্চ, চক্ষু তির্যক। চিত্রক অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু এরূপ আকৃতির মানুষ কখনও দেখে নাই।

পান্থশালার সম্মুখে আসিয়া পথিকদল দাঁড়াইল। চারিজন পথিক, তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ। মুখে অতি সামান্য শুক্ল শুভ্র গুম্ফ আছে, দেহ কৃশ ও শ্রমসহিষ্ণু; মুখের ভাব দৃঢ়তাব্যঞ্জক। ইনিই এই দলের নেতা সন্দেহ নাই। চিত্রক ও রট্টা পরম কৌতূহলের সহিত ইহাদের দর্শন করিতেছিলেন, বৃদ্ধও কিছুক্ষণ তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের সম্ভাষণ করিলেন।

চিত্রক ও রট্টা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর মধুর ও মন্দ্র, কিন্তু তাঁহার ভাষা চিত্রক বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিল না। যেন পরিচিত ভাষা, অথচ উচ্চারণের বিকৃতির জন্য ধরা যাইতেছে না।

চিত্রক রট্টাকে হ্রস্বকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিছু বুঝিতে পারিলেন?'

রট্টা বলিলেন—'না। ইহারা বোধ হয় চীনদেশীয়।'

চিত্রক তখন বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিল—'আপনারা কে? কি চান?'

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, কিন্তু এবারও চিত্রক কিছু বুঝিল না। সে মাথা চুলকাইয়া শেষে জম্বুককে ডাকিল, বলিল—'তোমার নূতন অতিথি আসিয়াছে। ইহারা কে?'

জম্বুক নবাগতদের দেখিয়াই বলিল—'ইঁহারা চৈনিক পরিব্রাজক। এইরূপ পথিক মাঝে মাঝে এই পথে আসেন।'

'ইহাদের ভাষা তুমি বুঝিতে পার?'

'পারি। ইহারা পালি ভাষায় কথা বলেন।'

'ভাল। জিজ্ঞাসা কর আমাদের নিকট কী চান?'

জম্বুক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিল এবং তাঁহার উত্তর শুনিয়া বলিল—'ভিক্ষু জানিতে চান ইনি রাজকন্যা রট্টা যশোধরা কিনা।'

চিত্রক সন্দেহপূর্ণ নেত্রে ভিক্ষুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'এ প্রশ্নের উত্তর পরে দিব, অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বল।'

অতঃপর জম্বুকের মধ্যস্থতায় ভিক্ষুর সহিত চিত্রকের নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তর হইল।

চিত্রক: আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন?

ভিক্ষু: আমার নাম টো-ইঙ্। আমরা চীনদেশ হইতে আসিতেছি। ইহারা আমার শিষ্য।

চিত্রক: চীনদেশ কত দূর?

ভিক্ষু: দুই বৎসরের পথ।

চিত্রক: কোথায় যাইবেন?

ভিক্ষু: কুশীনগর যাইব। লোকজ্যেষ্ঠ বুদ্ধ যেখানে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন সেই পবিত্র স্থানে দেহরক্ষা করিব এই আশা লইয়া চলিয়াছি। এখন বুদ্ধের ইচ্ছা।

চিত্রক: এই জন্য এতদূর পথ আসিয়াছেন? অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই?

ভিক্ষু: অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

চিত্রক: ক্ষমা করুন। আপনারা প্রাতঃকালে এখানে আসিলেন কি করিয়া?

ভিক্ষু: আমরা অহিংসাধর্মী বৌদ্ধ, অস্ত্রধারণ করা আমাদের নিষেধ। কিন্তু এ পথে দস্যু তস্কর আছে; তাই আমরা রাত্রিকালে পথ চলি, দিবাভাগে বিশ্রাম করি। কাল রাত্রে চন্দ্রোদয় হইলে যাত্রা করিয়াছিলাম।

চিত্রক: কোথা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন?

ভিক্ষু: চষ্টন দুর্গ হইতে।

রট্টা এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিলেন; এখন চষ্টনদুর্গের নাম শুনিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিলেন—'চষ্টন

দুর্গ! তবে আমার পিতার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল!'

ভিক্ষু হাসিলেন; বলিলেন—'আমি অনুমান করিয়াছিলাম তুমিই রাজকন্যা রট্টা যশোধরা।...আমি তোমার পিতার নিকট হইতে কিছু বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম কপোতকূট যাইতে হইবে; ভালই হইল, পথেই তোমার দেখা পাইলাম। এখানে আমার কর্তব্য শেষ করিয়া নিজ কর্মে যাইব।'

রট্টা: পিতা কী বার্তা পাঠাইয়াছেন?

ভিক্ষু: ধর্মাদিত্যের বার্তা সকলের নিকট প্রকাশ্য নয়। কিন্তু যখন দ্বিভাষীর প্রমুখাৎ কথা বলিতে হইতেছে তখন গোপন রাখা অসম্ভব। ভরসা করি ইহাতে ক্ষতি হইবে না।

রট্টার মুখে শঙ্কার ছায়া পড়িয়াছিল, তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—'না, ক্ষতি হইবে না, আপনি বলুন।'

ভিক্ষু: ধর্মাদিত্য তোমাকে এই বার্তা পাঠাইয়াছেন—তুমি কদাপি চষ্টন দুর্গে আসিও না, আসিলে ঘোর বিপদ ঘটিবে।

রট্টা স্থির বিস্ফারিত নেত্রে ভিক্ষুর পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর স্খলিত স্বরে বলিলেন—'বিপদ ঘটিবে! কিরূপ বিপদ?'

ভিক্ষু: যাত্রার পূর্বে ক্ষণেকের জন্য ধর্মাদিত্যের সহিত বিরলে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দুর্গাধিপতি কিরাত অতিশয় দুষ্ট। সে ছলনা দ্বারা তোমাকে চষ্টন দুর্গে লইয়া গিয়া বলপূর্বক বিবাহ করিতে চায়। ধর্মাদিত্যকে সে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

রট্টা: পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে!

ভিক্ষু: কারাগারে বন্দী করে নাই। কিন্তু তাঁহার দুর্গ ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, পত্র লিখিবারও অধিকার নাই। কপোতকূটে যে পত্র গিয়াছিল তাহা ধর্মাদিত্য স্বেচ্ছায় লেখেন নাই।

দীর্ঘ নীরবতার পর রট্টা চিত্রকের দিকে ফিরিলেন। তাঁহার মুখ রক্তহীন, কিন্তু চক্ষে চাপা আগুন। রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'কিরাতের যে এতদূর সাধ্য হইবে তাহা [illegible] এখন কর্তব্য কি?'

চিত্রক কিছুকাল নীরব থাকিয়া ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ কি কোনও অনুজ্ঞা দিয়াছেন?'

ভিক্ষু: না। তিনি কেবল রট্টা যশোধরাকে চষ্টন দুর্গে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তোমাদের কর্তব্য এই দুর্জনের হস্ত হইতে ধর্মাদিত্যকে উদ্ধার করা। কিরাত মিষ্ট কথায় ধর্মাদিত্যকে মুক্তি দিবে না। তাহার কূট অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়াছে জানিলে সে আরও ক্রুদ্ধ হইবে; হয় তো ধর্মাদিত্যের অনিষ্ট করিতে পারে—

রট্টা ব্যাকুল নেত্রে চিত্রকের পানে চাহিলেন। চিত্রক শান্তস্বরে বলিল—'আপনি অধীর হইবেন না, বিপদের সময় বুদ্ধি স্থির রাখিতে হয়।—মহাশয়, আপনারা পথশ্রমে পীড়িত, এখন বিশ্রাম করুন। জম্বুক, তুমি ইঁহাদের পরিচর্যা কর।'

* * * *

যে ব্যাপারে যুদ্ধ বিগ্রহের গন্ধ আছে তাহাতে চিত্রক কখনও বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় না; যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রবীণ সেনাপতির ন্যায় সে সমস্ত দায়িত্ব তার নিজ হস্তে তুলিয়া লইল।

রট্টার হাত ধরিয়া সে তাঁহাকে কক্ষে আনিয়া বসাইল। রট্টার করতল তুষারের মত শীতল, অধর ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। নারী বাহিরে যতই পৌরুষের অভিনয় করুন, অন্তরে তিনি অবলা।

চিত্রক তাঁহার সম্মুখে বসিল এবং ধীরভাবে তাঁহাকে দুই চারিটি প্রশ্ন করিয়া কিরাত ও চষ্টনদুর্গ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইল। রট্টাও চিত্রকের সহিত কথা কহিতে কহিতে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এখন কর্তব্য কি এই প্রশ্নের উত্তরে চিত্রক বলিল—'দুইটি পথ আছে। কিন্তু আপনি যদি কিরাতকে বিবাহ করিতে সম্মত থাকেন তাহা হইলে কোনও পথেরই প্রয়োজন নাই।'

রট্টা বলিলেন—'কিরাতকে বিবাহ করার পূর্বে আমি আত্মঘাতিনী হইব।'

চিত্রক বলিল—'তবে দুই পথ। এক কপোতকূটে ফিরিয়া যাওয়া, সৈন্যদল লইয়া চষ্টনদুর্গ অবরোধ করা। যতদূর জানি সৈন্য সংগ্রহ করিতে সময় লাগিবে। চষ্টন-

দুর্গের ন্যায় ক্ষুদ্র দুর্গও অন্তত পাঁচশত সৈন্যের কমে অবরোধ করা অসম্ভব।'

রট্টা প্রশ্ন করিলেন—'দ্বিতীয় পথ কী?'

চিত্রক বলিল—'দ্বিতীয় পথ, স্কন্দগুপ্তের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা।'

রট্টা উচ্চকিত হইয়া চাহিলেন—'স্কন্দগুপ্ত সাহায্য দিবেন?'

চিত্রক বলিল—'তিনি ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি। তাঁহার শরণ লইলে তিনি অবশ্য সাহায্য করিবেন।'

'তবে স্কন্দগুপ্তেরই শরণ লইব। তাঁহার নাম শুনিলে কিরাত ভয় পাইবে, বিরুদ্ধতা করিতে সাহস পাইবে না।'

'তাহা সম্ভব। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের কাছে কে যাইবে?'

'আমি যাইব। আপনি সঙ্গে থাকিবেন।'

চিত্রক ক্ষণেক মৌন রহিল, তারপর বলিল—'আপনি নারী, লক্ষ লক্ষ সৈন্যপূর্ণ স্কন্ধাবার নারীর উপযুক্ত স্থান নয়। অবশ্য আমি সঙ্গে থাকিলে বিশেষ ভয় নাই, অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দেখাইয়া স্কন্দের সমীপে পৌছিতে পারিব। কিন্তু একটি কথা আছে—'

'কি কথা?'

'সকল কথা বলার সময় নাই। কিন্তু আমি যে স্কন্দগুপ্তের দূত একথা তাঁহাকে বলা চলিবে না। আমি বিটঙ্ক রাজ্যেরই একজন সেনানী, এই পরিচয় দিলেই হইবে। স্কন্দ আমাকে চেনেন না, সুতরাং কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা নাই।'

'কিন্তু—কেন?'

'ওকথা এখন জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।'

রট্টা বলিলেন—'আর্য চিত্রক, আমি সম্পূর্ণ আপনার অধীন। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।'

চিত্রক বলিল—'আমি আপনার দাস। আপনার মঙ্গলের জন্য যাহা কর্তব্য তাহা করিব। স্কন্দগুপ্তের শরণ লওয়াই স্থির?'

'হাঁ।'

চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'তবে উঠুন। অবিলম্বে যাত্রা করিতে হইবে।' দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল—'একটা কথা। আপনি এমনভাবে বস্ত্র পরিধান করুন যাহাতে আপনাকে কিশোর বয়স্ক পুরুষ বলিয়া মনে হয়। ইহা প্রয়োজন' বলিয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রট্টার মুখে ধীরে ধীরে অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া নূতনভাবে বেশ-প্রসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

চিত্রক বাহিরে আসিয়া দেখিল, পাশেই একটি কক্ষে জৈন ভিক্ষুগণ আশ্রয় লইয়াছেন; জম্বুক তাঁহাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত আছে। চিত্রক তাঁহাদের নিকটে গিয়া বলিল—'জম্বুক, ভিক্ষু মহাশয়কে আমি একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি—মহারাজ স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি?'

প্রশ্ন শুনিয়া ভিক্ষু বলিলেন—'জানি। স্কন্দগুপ্ত হূণ দলনের জন্য আসিয়াছেন। নিকটেই আছেন।'

চিত্রক: কোথায় আছেন?

ভিক্ষু: এই উপত্যকার পশ্চিমে যে পর্বতশ্রেণী আছে তাহা পার হইলে আর একটি বৃহত্তর উপত্যকা আছে; স্কন্দগুপ্ত তথায় সৈন্য স্থাপন করিয়াছেন।

চিত্রক: একথা আপনি কিরূপে জানিলেন?

ভিক্ষু: চষ্টনদুর্গে শুনিয়াছি। জনৈক সৈনিক মৃগয়ায় গিয়াছিল সে দেখিয়া আসিয়াছে।

চিত্রক তখন ভিক্ষুকে সাধুবাদ করিয়া জম্বুককে আড়ালে ডাকিয়া আনিল, বলিল—'জম্বুক, আমরা স্থির করিয়াছি স্কন্দগুপ্তের শিবিরে যাইব।'

জম্বুক বলিল—'সে ভাল কথা।'

চিত্রক বলিল—'তোমাকে কপোতকূটে যাইতে হইবে। মন্ত্রী চতুর ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিবে। তারপর তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।'

'যথা আজ্ঞা।'

'এখন আমাদের অশ্ব আনিতে বল। এই বেলা যাত্রা করিলে সূর্যাস্তের পূর্বে স্কন্দগুপ্তের শিবিরে পৌছিতে পারিব।'

জম্বুক অশ্ব আনিতে গেল। চিত্রক ফিরিয়া গিয়া রট্টার দ্বারে করাঘাত করিল। রট্টা দ্বার খুলিয়া নত চক্ষে সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

চিত্রক দেখিল, বেশ পরিবর্তন করিয়া রট্টাকে অপরূপ

দেখাইতেছে; প্রথম যেদিন সে রট্টাকে দেখিয়াছিল সে দিনের মতই তাঁহাকে সহসা নারী বলিয়া চেনা যায় না, ভস্মের তলে রূপের আগুন চাপা পড়িয়াছে? কিন্তু মস্তকে শিরস্ত্রাণ নাই, বেণী শোভা পাইতেছে। তাহার কী হইবে?

চিত্রক নিজ কটিবন্ধ খুলিয়া রট্টার মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া দিল; উষ্ণীষের অন্তরালে বেণীবন্ধ ঢাকা পড়িল। চিত্রক বিচারকের দৃষ্টিতে রট্টার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল—'এতক্ষণে ছদ্মবেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। স্কন্দের সম্মুখে না পৌছানো পর্যন্ত ছদ্মবেশ আবশ্যক। যুদ্ধক্ষেত্র কিরূপ স্থান তাহা আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। তাই এই সাবধানতা।'

রট্টার চোখে জল আসিল; তিনি অবরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'স্ত্রীজাতি বড় জঞ্জাল।'

চিত্রক মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, পুরুষ বড় জঞ্জাল।'

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় সংস্কৃতিতে দর্শনের স্থান

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অন্যান্য জীবজন্তুর মত মানুষকে ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল ও রৌদ্র বৃষ্টিতে আশ্রয়স্থল খুঁজিতে হয়। জন্তুরা এসব পাইলেই সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। মানুষের মধ্যে জ্ঞান-তৃষ্ণা বলিয়া একটা পিপাসা আছে। এ পিপাসা ভৌতিক জলে মিটে না। মানুষের পেটের ক্ষুধা অন্নে মিটিতে পারে, কিন্তু তাহার মানসিক ক্ষুধা পক্বান্নেও তৃপ্ত হয় না। এ ক্ষুৎপিপাসা মিটাইবার জন্য মানুষ সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে চায়। সে নিজে কি? তাহার স্বরূপ ও পরমার্থ কি? জীবজগৎ জড় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, না ঈশ্বর বা পরমাত্মার ইচ্ছা ও জ্ঞান প্রসূত? জন্ম ও মৃত্যু কি? জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরপারে মানবাত্মার কোন অস্তিত্ব থাকে কিনা? এ সব প্রশ্ন মানুষের মনে স্বতঃই উঠে এবং সেগুলির সন্তোষজনক মীমাংসা করিবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য। ইহা হইতেই দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। যে শাস্ত্রে এসব প্রশ্নের বিচারসঙ্গত মীমাংসা করা হয় তাহাকেই দর্শন বলে। অতএব বলিতে হয় দর্শন প্রতি মানুষেরই একটা অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, উহা অনাবশ্যক কল্পনাবিলাস মাত্র নহে। আলডুস হাক্সলে (Aldous Huxley) নামে এক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক তাঁহার এক গ্রন্থে (Ends and Means) এরূপ মন্তব্য [illegible] জীবনে একটা দার্শনিক মত-বাদ অনুসরণ করিয়া চলে, জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা লইয়া জীবনপথে অগ্রসর হয়। একথা শুধু চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই সত্য নহে। ইহা একান্ত চিন্তাবিমুখ লোকের পক্ষেও প্রযোজ্য। ভাল হোক্, মন্দ হোক্—কোন একটা দার্শনিক মত অবলম্বন করিয়া মানুষের জীবনে চলিতে হয়। কোনও দার্শনিক মত না মানিয়া জীবনে চলা যায় না।'

প্রত্যেক মানুষের পক্ষে যে কথা বলা যায়, যে কোন মনুষ্য সমাজ বা মনুষ্যজাতির পক্ষেও সে কথা সমভাবে প্রযোজ্য। বিভিন্নকালে ও বিভিন্ন দেশে অনেক মনুষ্য-জাতি ও লোকসমাজের উত্থান পতন ঘটিয়াছে ও ঘটিবে। এ সব জাতি ও সমাজের মধ্যে এক একটা সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উহাদের পতনের সঙ্গে লুপ্তও হইয়াছে। একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎপত্তিস্থল অনু-সন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উহার মূলে একটা দর্শন-মত নিহিত আছে। কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে আছে তাহার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। যে জাতি জীব-জগৎ সম্বন্ধে যেরূপ দার্শনিক মতবাদ পোষণ করেন তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতিও সেইভাবে গড়িয়া উঠে। এজন্য কোন জাতির দর্শনকে উহার সংস্কৃতির সার বস্তু বলা যায়। কোন জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন স্তরে আছে তাহা উহার দর্শন হইতেই নির্ণয় করা যায়। পাশ্চত্য দেশের দার্শনিক জড়বাদ হইতেই তাহার যান্ত্রিক সভ্যতার কিছু আভাস

পাওয়া যায়। আবার আর্য্য জাতির আধ্যাত্মিক দর্শনের মধ্যেই উহার মানবিক সভ্যতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, দর্শন কোন জাতির সংস্কৃতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে এবং উহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

দর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস ও সঞ্জীবনী শক্তি। এই সংস্কৃতির অপর নাম আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি। যে আর্য্য সংস্কৃতি ভারতবর্ষে প্রবেশ ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার মূল আধার হইল বেদ ও উপনিষদ্। বেদ ও উহার অন্তস্থ উপনিষদ্‌সমূহে আধুনিক অর্থে পূর্ণাঙ্গ দর্শনশাস্ত্র না থাকিলেও উহাদের মধ্যে যে একপ্রকার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দার্শনিক মতবাদের বীজ নিহিত ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই বীজ কালে উপ্ত হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতি-রূপ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। উহাই আবার বেদান্ত-দর্শনরূপে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে অল্প বিস্তরভাবে প্রকাশ-মান আছে। ভারতের বেদ ও উপনিষদ্ তদনুসারী দর্শন-মতগুলি জীবদেহে রক্তকণার ন্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ব্বাঙ্গে ও সর্ব্বধমনিতে প্রবাহিত হইতেছে। একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

কোন সংস্কৃতির কথা বলিলে আমরা প্রধানতঃ পাঁচটি বিষয় বুঝিয়া থাকি, যথা সাহিত্য ও ভাষা, বিজ্ঞান, চারু-কলা, ধর্ম্ম ও দর্শন। সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু সেগুলিকে এই পঞ্চাঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে মনে হয়। কোন সভ্যজাতির কোন কৃষ্টি বা সংস্কৃতি আছে কিনা—তাহা বলিতে গেলে উহার কোন ভাষা বা সাহিত্য আছে কিনা, কোন বিজ্ঞান সম্পদ আছে কিনা, উহা চারুকলার সৃষ্টি ও সমাদর করে কিনা এবং উহার মধ্যে কোন ধর্ম্ম ও দর্শন মত বিদ্যমান কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। এগুলিকে বাদ দিলে সংস্কৃতি বলিয়া কিছু থাকে না। যে জাতির কোন পরিস্ফুট ও পূর্ণাঙ্গ ভাষা নাই, কোন বিজ্ঞান ও চারুকলা নাই, কোন ধর্ম্ম ও দর্শন নাই তাহার কোন সংস্কৃতিও নাই বলিতে হইবে। আবার যে জাতির নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আস্থা নাই সে জাতি যে ধ্বংসোন্মুখ তাহা বুঝিতে হইবে। যে দিন হইতে ভারতবাসী হিন্দু তাহার নিজ ধর্ম্ম ও দর্শন অর্থাৎ সংস্কৃতির মূল বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছে এবং তাহার প্রতি অনাস্থা ও অনাদরের ভাব দেখাইয়াছে সেইদিন হইতে তাহার পতন আরম্ভ হইয়াছে। সে দিন গুণিতে হয় ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তনের দিন হইতে, ভারতবাসীর রাজ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্বের আরম্ভ দিবস হইতে। আজ সে দিন চলিয়া গিয়াছে। ভারতবাসীরা অনেক কিছু ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। এখন তাহাদের নিজ ধর্ম্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিতে আস্থা ফিরিয়া আসিবে এবং আবার ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহ ভারত-বক্ষে প্রবাহিত হইয়া উহাকে শ্রীমণ্ডিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারত-মাতাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে এরূপ আশা করা যায়।

এখন ভারতীয় সংস্কৃতিতে দর্শনের স্থান কিরূপ তাহারই আলোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বে পঞ্চাঙ্গ সংস্কৃতির কথা বলিয়াছি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই পঞ্চাঙ্গ বিদ্যমান আছে। ভারতের একটা ভাষা ও সাহিত্য আছে, অন্ততঃ পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষাই ভারতীয় ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন ভারতে বহু বিজ্ঞানেরও অভ্যুদয় হইয়াছিল। উহার একটা নিজস্ব চারুকলাও ছিল, যদিও কালে ইসলামী ও অন্য বিদেশীয় কলার সহিত তাহার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তাহার পর ভারতীয় আর্য্যদের যে একটা ধর্ম্ম ও দর্শন ছিল এবং এখনও আছে তাহা সুধীমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইহাদের মধ্যে দর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য। কারণ ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল তথ্যগুলি উহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অনু-প্রবিষ্ট ও অনুরণিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় দর্শনের চিরন্তনী দৃষ্টিভঙ্গী। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিকদের স্থির বিশ্বাস এই যে জীবজগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র এবং দেবতারাও এক অলঙ্ঘনীয় ধর্ম্মানুশাসনের বশবর্ত্তী। ঋগ্বেদে ইহাকেই ঋত বলা হইয়াছে। মীমাংসা দর্শনে যে অপূর্ব্ব অর্থাৎ কর্ম্মফল শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন শাখায় যে অদৃষ্টের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা ঋতেরই ভাবান্তর। বোধ হয় ইহা হইতেই বিজ্ঞানসম্মত কার্য্যকারণ নিয়মের

ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ম্মফল নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা সম্বন্ধে বিশ্বাস ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনে দৃঢ়মূল হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন শাখাগুলির আর কয়েকটি সমান তত্ত্ব হইতেছে—জন্মান্তরবাদ, সংসারের নশ্বরতা, জীবাত্মার অমরত্ব, বন্ধত্ব ও মুক্তির প্রয়োজন। এ ছাড়া অনেক দর্শনে ঈশ্বর, ব্রহ্ম, প্রকৃতি, পুরুষ, মায়া, অবিদ্যা, নামরূপ প্রভৃতি তত্ত্বের কথা আছে। আবার কোন কোন দর্শনে স্বর্গ, অপবর্গ, পুরুষার্থ, যাগযজ্ঞ প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে। মুক্তির উপায়রূপে জীবজগতের যাবতীয় পদার্থের তত্ত্ববিচার, মনস্তত্ত্বের আলোচনা এবং যোগসাধন, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের বিশদ বিবরণ একাধিক দর্শনে পাওয়া যায়।

ভারতীয় দর্শনের প্রত্যয়রাজি, ভাবধারা ও সার্ব্বভৌম তত্ত্বগুলি প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে কি ভাবে প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে, নাটকে, ইতিহাসে, ব্যাকরণে, অলঙ্কারে অর্থাৎ ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক ভাবধারার অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিদের রচনাবলী পাঠ করিলে একথার সত্যতা বুঝা যাইবে। এমন কি পাণিনির ব্যাকরণে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও দার্শনিক তথ্য সম্বলিত একাধিক সূত্র পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ব্যাকরণের দার্শনিক আলোচনা হইতে পাণিনি দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক কালে ভারতীয় ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্র সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক রচনায় ভাব ও ভাষায় লালিত্য সম্পাদন করিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনেক গদ্য, কবিতা ও গীতিরচনার মধ্যে উপনিষদ ও বেদান্তের ভাবধারা এমন সুন্দর ও মধুরভাবে বিকশিত হইয়াছে যে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে কিছু পরিচয় না থাকিলে সেগুলি মনোজ্ঞ না হইয়া দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য বলিয়া মনে হইবে। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে বৈষ্ণবদর্শনের কোন জ্ঞান না থাকিলে বৈষ্ণব সাহিত্য বুঝা সুকঠিন হইয়া পড়ে। দর্শন যে মানুষের ভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিবে তাহা অতি স্বাভাবিক কথা। ভাষার উৎপত্তি যে ভাবেই হউক না কেন, মানুষের মনের ভাব ও প্রত্যয় তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত করে। মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই ভাষার সৃষ্টি! অতএব দার্শনিক চিন্তা যদি মানুষের অপরিহার্য্য হয়, তবে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা ও সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটিবে।

সকল দেশের দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রথমে বিজ্ঞানগুলির পৃথক্ সত্তা ছিল না, উহারা দর্শনেরই অঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিল। পাশ্চাত্যদেশের জড়বিজ্ঞানগুলি প্রথমে প্রাকৃতিক দর্শন (Natural Philosophy) নামে অভিহিত হইত। এতদিন মনোবিজ্ঞান দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইদানীং ইহার পৃথক্ সত্তা কেহ কেহ স্বীকার করেন। ভারতীয় বিজ্ঞানগুলি প্রথমে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট ছিল। জীববিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানে যে সব বিষয় আলোচিত হয় তাহাদের অনেকাংশ ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখাতে বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের Hindu Chemistry (হিন্দু রসায়ন), আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের The Positive Sciences of the Ancient Hindus (প্রাচীন হিন্দুদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুক্ত। জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিজ্ঞানেও দার্শনিক তত্ত্বের আলোক প্রতিফলিত হইয়াছে। এমন কি আয়ুর্ব্বেদে একটা স্বতন্ত্র দর্শন মতের আলোচনা ও প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বলিতে হয়, ভারতীয় সংস্কৃতির বিজ্ঞানরূপ অঙ্গে দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং তাহার সম্যগ্‌জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে আমাদের দর্শনশাস্ত্রে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করা আবশ্যক।

চারুকলা (Fine Arts) বলিতে আমরা প্রধানতঃ নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাটক, আলেখ্য ও ভাস্কর্য্য এই ছয়টি বিষয় বুঝিয়া থাকি। কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন চৌষট্টি কলার কথা বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে চারুকলার সঙ্গে শ্রমশিল্প (Industries) ও যন্ত্রশিল্পের (mechanics) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষে উল্লিখিত দুইটি বিষয়কে সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে না ধরিয়া আমরা চারুকলাকেই সংস্কৃতির অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে গণনা করিয়াছি। ভারতীয় চারুকলার ষড়বিধ অঙ্গেই দর্শনের ন্যূনাধিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করিয়া

দার্শনিক ভাবের আভরণ ভারতীয় সঙ্গীতের অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ গান ও দোহার মধ্যে অনেক দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি চিরস্মরণীয় কবিদের পদাবলী ও সঙ্গীতাবলীতে অনেক তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথার সন্ধান পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের গীত-চিন্তামণি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং তুলসীদাসের দোহাবলী তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অনেকেরই জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ করিয়াছে। হরিসঙ্কীর্ত্তন ও বাউল প্রভৃতি বৈষ্ণব সঙ্গীতে বৈষ্ণব বেদান্ত-দর্শনের অনেক তত্ত্ব সুললিত ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্যামা সঙ্গীতে তন্ত্রের দার্শনিক মতবাদের আভাস পাওয়া যায়। আধুনিককালে রচিত শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তনের মধ্যে অদ্বৈত-বেদান্তের তত্ত্বকথা যে ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা শুনিলে বিস্ময় হয়। সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীতে দার্শনিক শক্তিবাদের অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাবলী যে উপনিষদ্ ও বেদান্তের ভাবধারার গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে মহিমান্বিত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে, বিশেষভাবে তাঁহার গীতাঞ্জলীতে শঙ্করের মায়াবাদমুক্ত অদ্বৈত-বেদান্তের তত্ত্ব এমনভাবে ঝঙ্কৃত হইয়াছে যে তাহা বিশ্বমানবের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে। অতএব ভারতীয় সঙ্গীতের সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে এবং উহার রসাস্বাদন করিতে গেলে দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ে যথাযোগ্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে ধর্ম্ম ও দর্শন চিরকালই এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে কিন্তু ধর্ম্ম ও দর্শনের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় না। সেখানে কখন উহারা পৃথক্ ও স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ সত্তা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, আবার কখন দর্শনবিরুদ্ধ সমালোচনা দ্বারা ধর্ম্মমতকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। অথবা উহার ধ্বংস সাধন করিয়াছে। ভারতীয় দর্শন শাখাগুলি ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যার সহায় ও পরিপোষকরূপেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্ম বলিতে মুখ্যতঃ আমরা বৈদিক বা হিন্দু ধর্ম্মই বুঝিতে পারি। অবশ্য ভারতভূমিতে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অবৈদিক ধর্ম্মেরও অভ্যুত্থান হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সকল ধর্ম্মই এক বা ততোধিক দর্শন মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তাহাদের আনুকূল্য লাভ করিয়াছে। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনগুলিকে বৈদিক দর্শন বলা যায়, কারণ উহারা বেদ বা শ্রুতির স্বতঃ প্রামাণ্য মানিয়া লইয়াই যুক্তিতর্ক দ্বারা শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা ও সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্যযোগ দর্শন এভাবে বৈদিক না হইলেও উহারা স্বাধীন বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও নাস্তিক মতের খণ্ডন করিয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মও নিজ নিজ দর্শনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হইয়াছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন পরস্পরের মধ্যে এমন নিবিড়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট যে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান অপরিহার্য্য ও অত্যাবশ্যক। এমন কি কোন কোন স্থলে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রায় একই বস্তু হইয়া গিয়াছে। এজন্য সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা এবং বেদান্তকে ধর্ম্মও বলা হয় আবার দর্শনও বলা হয়। অতএব ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অথবা জীবনে কোন ধর্ম্ম পালন করিতে গেলে দার্শনিক জ্ঞান-বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য ও হিতকর।

এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে যদি রক্ষা করিতে হয় এবং উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হয়, তবে ভারতীয় দর্শনের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইবে। এই কর্তব্যপালনের দায়িত্ব কেবল ব্যক্তিবিশেষের নয়, উহা সমগ্র জাতির ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ভারতীয় দর্শনের পুনরভ্যুত্থানে সুধীমাত্রেই সচেষ্ট হউন ইহাই কামনা করি।

দুর্ঘটনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

মৃদুমন্দ মলয়ানিল দোলনচাঁপার বুকে শিহরণ জাগায়, দিগন্ত পূর্ণ হয় সৌরভে।

কিন্তু ঝড়বাদলের দিনে কোথায় যায় সেই সৌরভ, বরং ঝড়ভ্রান্ত ছিন্নমূল উদ্যান পাপড়ীচূর্ণের করুণ সমারোহে হৃদয় আকুল করিয়া তোলে।

মানুষের জীবন ও অনুরূপ, অনন্ত সুষমায় উচ্ছল। পাহাড়ী নদীর বন্যার ন্যায় সহসা বিপর্য্যয় নামিলে সেই দুকূল-ছাপান প্লাবনে আশ্রয়হারা তৃণগুচ্ছের মত এখানেও নীরবে ভাসিয়া যাইতে হয় কিম্বা ভাগ্যক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে নিস্তরঙ্গ তটিনীর বুকে নড়্‌বড়ে পাথরের নুড়িকুচির ন্যায় অসহায় ও কদর্য্য জীবন টানিয়া চলিতে হয়। উভয়েই কি কুশ্রী ও বীভৎস!

চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্তে ব্যতিক্রম হয় না, অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের বেলায় ঠিক একই নিয়ম। ক্ষণে ক্ষণে সেখানে দুর্ঘটনা ঘটে না, কিন্তু মানুষের বেলায় ঠিক উল্টো, কেহই স্বেচ্ছায় আইন ও শাসন মানিয়া চলিতে চাহে না বলিয়া পদে পদে হাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়া থাকে। মানুষের এই প্রবৃত্তিকে শাসনে রাখিবার জন্য প্রত্যেক সংস্থার কত আইনকানুন, কিন্তু দুর্ঘটনার অন্ত নাই।

প্রশ্ন উঠে; বিভিন্ন লোকে রকমারী সমাধান দেন। কিন্তু সকলেই হটকারিতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কিম্বা নিয়ম শৃঙ্খলায় অবহেলা অন্যতম কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। মনোবিদরা আরও কিছু বলেন, তাঁহারা মানসিক সুস্থতার উপরে বেশ জোর দেন। তাঁহারা বলেন মানুষের চেতন-মন কাজের সক্রিয় নিয়ামক হইলেও অবচেতন মনের দায়িত্ব কম নহে। একমাত্র শিক্ষা, শাসন ও অনুশীলন অবচেতন মনের গোপন কাহিনী সংযমের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ রাখে বলিয়া সমাজ ও সংসার বাঁচিয়া থাকে। সর্বত্র সর্বাবস্থায় সত্য কথা, মনের কথা বলিতে গেলে সংসারে বাস করা সম্ভব হয় না, এমন কি লৌকিক ভদ্রতাও রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়ে। গীতায় আছে,

কর্মেন্দ্রিয় ক্ষান্ত রাখে, কিন্তু মনে মনে থাকে
ধ্যান যায় ইন্দ্রিয় বিষয়।

সমাজের ভয়ে সংযত থাকিতে হয় বলিয়া মনের অনেক গোপন বাসনা মনেই বিলয় পাইয়া থাকে। কিন্তু ব্যভিচারী মনের চিত্ত-নিরোধের চোরাবালিতে দুর্ঘটনা বন্ধ করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না।

কত ধন সামগ্রী, জীবন—এমন কি দেশ ও জাতি যে এই দুর্ঘটনায় উৎসন্ন হইয়া যায় কে সেই খোঁজ রাখে? ম্যালেরিয়া, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যুদ্ধবিভ্রাট লাগিয়াই আছে, দুর্ঘটনাও ইহাদের চেয়ে কম যায় না। সাম্প্রতিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিধ্বস্ত দার্জিলিঙ্গ এর খবর সকলেই শুনিয়াছেন। এই সেদিন পাঞ্জাব মেলের ব্যাপারে প্রায় একশত যাত্রীর জীবনহানি হইল, জীবন্মৃত হইয়াও রহিল অনুরূপ। স্যান্টাক্রুজ বিমান অবতরণ ভূমিতে যাত্রীসমেত ওলন্দাজ বিমানের কথা নিশ্চয়ই স্মৃতির ভারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। ২৪ জন আমেরিকান রাজনীতিক, ১৩ জন সাংবাদিক এবং অন্যান্য যাত্রীসহ ৪৩ জন যাত্রীর জীবন নাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুর্দৈব।

সম্প্রতি রেলওয়ে-সচিব আয়েঙ্গার সাহেব জানাইয়াছেন যে জসিডি দুর্ঘটনা অন্তর্ঘাতীদের কাজ। আনসারী সাহেব ঐ ট্রেণেই ছিলেন, ভাঙ্গাগাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ফিসপ্লেট খোলা দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন যে উহা নিছক 'স্যাবোটাস'। ভাবিলেন না—ফিসপ্লেট আলগা হওয়াটা দুর্ঘটনার কারণ—না দুর্ঘটনার ফল। ইঞ্জিন ধ্বংস হওয়ায় লাইনকে লাইন যেখানে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায় সেখানে ফিসপ্লেট আস্ত ও অক্ষত থাকিবে কে একথা বলিবে? তথ্য উদ্‌ঘাটনের চেয়ে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দেওয়ায় আত্মতৃপ্তি আছে, রেলওয়ে-সচিব কি এই সহজ পথ ধরিয়াছেন? পুরাতন লাইন বিশেষতঃ নরম মাটীর উপরে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে বসান লাইনের উপরে নূতন ডিজাইনের অতিকায় ইঞ্জিন নিরাপদ কি? পুরাতন লাইনের ভারবহন ক্ষমতা সর্বত্র সমান আছে কি? বাড়তি গাড়ীর ওজনের সহিত ভারী ইঞ্জিনের বর্দ্ধিত গতি-বেগ কি বিহিটা দুর্ঘটনার কারণ ছিল? কুঞ্জরু কমিটীর রিপোর্টে প্যাসিফিক ইঞ্জিনের গতিবেগ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য ছিল কি?

পাইলটের দিঙনির্ণয়ে ভুল কিম্বা অন্তর্ঘাতীদের কারসাজী, কারণ যাহাই হউক, দুর্ঘটনার শেষ নাই। যানবাহন, রাস্তায় ঘাটে, কলকারখানায় সর্বত্র, সামান্য ত্রুটী, ব্যক্তিবিশেষের সামান্য লোভ জনসাধারণের বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা নগরীর জনবহুল রাস্তার ছবি একবার স্মরণ করুন। দুইদিক হইতে ট্রামগাড়ী যাওয়া আসা করিতেছে; হঠাৎ একখানা বাস্ দ্রুতবেগে চলন্ত ট্রামকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রগামী সামনের ট্রামের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ট্রামের 'কণ্ডাক্টার' দেখিল তাহার প্রাপ্য যাত্রী "বাস" বেহাৎ করিয়া লইতেছে কাজেই তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া "বাস্"কে কাটাইয়া যাওয়ার প্রবৃত্তি ও মৎসব অস্বাভাবিক নহে, ফলে হয়তো বাসের পাদানীর উপরে দণ্ডায়মান যাত্রী ছিটকাইয়া পড়িয়া এক বীভৎস দৃশ্য সৃষ্টি করিলেন, ভীড় জমিল, ঐ মুহূর্তেই পাশের রিক্সা-ওয়ালা কিম্বা ঠেলাগাড়ী সবেগে ফুটপাথ চাপিয়া উঠিল। দুই

একজন নাগরিক কিম্বা বাপমায়ের দুলালের বেঘোরে প্রাণ হারান মহানগরী রাস্তায় দুর্ঘটনা কষ্টকল্পনা নহে।

কলকারখানা অঞ্চলে বড় রাস্তার বুকের উপর দিয়া মালগাড়ী টানিবার রেললাইন (সাইডিং) সর্বত্র ছড়ান আছে। পাহারার যথেষ্ট ব্যবস্থা সত্ত্বেও লরী, গাড়ী ও ইঞ্জিনের দুর্ঘটনা প্রায়ই লাগিয়া আছে।

বড় বড় কলকারখানায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করিবার জন্য কত ব্যবস্থা। চোখে চশমা, পায়ে 'গামবুট', পরিধানে 'অ্যাপ্রোণ', বিষাক্ত গ্যাস প্রতিহত করিবার জন্য নাসিকায় প্যাড এবং আরও কত কি! প্রাচীর পত্রে, পোষ্টারে ও বিজ্ঞাপনীর সাহায্যে দুর্ঘটনার ফলাফল কত সাঙ্ঘাতিক হইতে পারে তাহার সচিত্র বর্ণনা যত্রতত্র বিজ্ঞাপিত আছে, তত্রাচ লোকে বিপদগ্রস্ত হয়। বহু দুর্ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া কদাচিৎ আকস্মিকতাই বিপদের মূল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমনোযোগিতা, হটকারিতা কিম্বা স্বার্থপরতা বিপদের কারণ বলিয়া দেখা গিয়াছে।

চঞ্চল নাগরিক-সভ্যতায় অত্যধিক যানবাহন সমস্যা অনেকাংশে দুর্ঘটনার কারণ। খেয়ালী ড্রাইভার কিম্বা মাতোয়াল গাড়োয়ান যানবাহন সংক্রান্ত নিয়ম শৃঙ্খলায় যথেষ্ট অবহিত না থাকায় নিরীহ পথচারীর বিপদের কারণ হইয়া থাকে। ঠিক একই কারণে তাহাদের নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি এবং জীবননাশের সংখ্যাও কম হয় না। অনেক সময় দেখা যায় অনভিজ্ঞ কিম্বা অসমসাহসিক পথচারীও নিজেদের ত্রুটীতে বিপদ ডাকিয়া আনে। নির্দিষ্ট ফুটপাথএ না হাঁটিয়া যানবাহন চলিবার রাস্তায় চলিতে গিয়া উভয়েরই ক্ষতির কারণ হয়। পথচারীর সহিত ফেরীওয়ালার ভাড় সম্মিলিত হওয়ায় যান-বাহনের সহিত ঠোকাঠুকি আর আকস্মিক ঘটনা নহে, কিন্তু এইরূপ দুর্ঘটনার দায়িত্ব পথচারীর হইলেও যানবাহনের ঝুঁকিই বেশী হয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতায় ড্রাইভার নির্য্যাতন কিম্বা গাড়ী-পোড়ান যুদ্ধোত্তর সহরের এক নূতন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানব কল্যাণের জন্য রচিত আইন মানুষেই লঙ্ঘন করে, আর মানুষের এই ক্ষুদ্রতা প্রতিরোধ করিবার জন্য মানুষই লড়াই করিয়া মরে। কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্।

প্রতিদিনের ঘটনা হইতে কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া সমস্যাঘন চিত্রটী পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস প্রাসঙ্গিক মনে হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির ইতিহাসে দুর্ঘটনার বিস্তৃত ইতিহাস কেবল কি অবিমিশ্রিত দুঃখের আকর? না, জাতীয় জীবনের আনন্দপূর্ণ শুভ মুহূর্ত্তের সৃষ্টিও বিপদের অদ্ভুত করস্পর্শে সংসাধিত হইয়া উঠিয়াছে।

পুণ্যানন্দ মহারাজ সংসার-বিমুক্ত সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারাসক্ত নর-নারীর নিরাশ্রয় শিশুনারায়ণকে 'মানুষ' বানাইবার ব্রতে ব্রতী। শিশু-পালনের রসদ সংগ্রহ ব্যাপারে স্থানীয় 'পালকের' দরবারের জন্য "বাসে" যাইতেছিলেন। গেরুয়া পোষাক 'একদম খালি' বাসে একটু স্থান সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিল। ড্রাইভারের নষ্ট সময় উদ্ধারের চেষ্টায় বেশ কিছু ঝাঁকানীর সহিত হেলিয়া দুলিয়া স্থান ও মান বাঁচাইয়া যাত্রীরা গন্তব্যমুখে অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ ব্রেক চাপিয়া ধরায় ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করিয়া সামনে গোত্তা মারিয়াগাড়ী থামিয়া গেল। যাত্রীরা হুমড়ী খাইয়া একে অপরের গায়ে ঠোকাঠুকি লাগিল। পুণ্যানন্দজী হুড়মুড় করিয়া ড্রাইভার সাহেবের খাঁচার দিকে ছিটকাইয়া হাতের বুড়ো আঙ্গুলটী ভাঙ্গিয়া বসিলেন। এদিকে দেখি, আর একজন পরিচিত ভদ্রলোক দাঁতের ব্যথায় বসিয়া পড়িয়াছেন পাশের ভদ্রলোকের মাথা তাহার গাল ঠুকিয়া দিয়াছে। এই সকল ঘটনায় যাত্রীদের একদল মারমুখো হইয়া কণ্ডাক্টারকে তাড়া করিল, কেহ কেহ হাতল না ধরিয়া 'বাবুর' মতন দাঁড়াইবার অবিমৃষ্য-কারিতায় বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।

রসিক নৈয়ায়িক হয়তো বলিবেন—ঠিকই হইয়াছে। স্বামিজী মহারাজ সংসারশ্রমকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বৃহত্তর সংসারধর্ম পালন করিতেছিলেন, তাই সংসার ঐ বুড়োআঙ্গুলের নিকটে কিছু আদায় করিয়া ছাড়িল—আর ঐ ভদ্রলোক যিনি সারাজীবন দেশী বিলাতী সওদাগরী অফিসে হিসাবের খাতায় লাল নীল পেন্সিলের খোঁচা মারিয়া এবং দাঁত বাজাইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এইবার কয়েকটী দাঁতের খেসারত দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিলেন।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! অহরহ প্রতিদিন রাস্তায় ঘাটে চলাফেরা করিতে ঠোকাঠুকি লাগিয়াই আছে। নষ্টামীর গুরুঠাকুর হয়তো ঈষৎ হাসিয়া "বড়ই দুঃখিত" বলিয়া সরিয়া পড়েন, কিম্বা গোবেচারা হইলে গদগদ হইয়া "আহা আহা" "বড় লজ্জিত" বলিয়া কিঞ্চিৎ মুখব্যাদান করেন, যেন কাটাঘায়ে নুনের ছিটা!

বিভূতিবাবু বীমার দালাল। কথার তুবড়ী, বেশ দুপয়সা হইতেছে, বাড়ী গাড়ী সবই হইয়াছে। ছোটবড় সকল জায়গায় উঠাবসা করিতে হয়। লোকে বলে আহা কি অমায়িক ভদ্রলোক। ব্যবসার ফিকিরে চলাফেরা করিবার মাঝে পীচঢালা ঋজু রাস্তায় চলার বেগ মনের গতিকে উদ্দাম করিয়া দেয়। পিছে থাকা মিছে, পড়ে থাকা মিছে। ঝড়ের বেগে ধুলা উড়াইয়া গাড়ী ছুটিয়া চলে। বড় সাধে গড়া মনের সোনালী ছবি গাড়ীর কলরবকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া চলে। সাচ্চা ও মেকীর খোয়াব দেখিতে দেখিতে দিনের কাজ তিনি শেষ করেন। হঠাৎ একদিন রাস্তার লাইট পোষ্টের সহিত ধাক্কা লাগিয়া সোনালী স্বপ্ন টুটিয়া যায়। লোকে বলিয়া উঠে কাঁচা পয়সা, সোনালী নেশায় কয়দিন মেজাজ ঠিক থাকে?

জনৈক বৈজ্ঞানিক কারখানায় দিনরাত কাজ করিতেন, প্রতি দিন কতশত বিশ্লেষণ, রকমফের কাজেই তাঁহার চিত্তবিনোদন। সংশ্লেষণ কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন হঠাৎ একদিন পিপাসার্থ হইয়া ভৃত্যকে জল আনিতে বলিলেন। দুই এক গণ্ডূষ জল মুখে দেওয়ার পরেই তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। পরে জানা গেল, সেই গ্লাসে কিছুক্ষণ আগে তিনিই সায়নাইড দ্রবীভূত করিয়াছিলেন। এই বেদনাদায়ক দৃশ্য যাঁহারা দেখিলেন—কিম্বা যাঁহারা শুনিলেন, সকলের আঁখি অলক্ষে বাষ্প পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু খেয়ালী বৈজ্ঞানিক

নিজের ভুলে জীবন দিয়া যে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন তাহাও কি কাহার অজানা ছিল?

আর একজন রাসায়নিকের খবর জানি। তিনি এই সহরের এক রসায়নাগারে কাজ করিতেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ তিনি অস্বাভাবিক আনন্দমুখর হইয়া উঠিতেন, আবার কয়েকদিন পরে দেখা যাইত তাঁহার বিমর্ষ বদন, বাক্যালাপেও অনিচ্ছুক। একদিন দেখা গেল এসিডে সমস্ত হাতটা পুড়াইয়া বসিয়াছেন, জামার সেই ধার গলিয়া গিয়াছে। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধ ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইলে রাসায়নিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? এসিড চেম্বারে হাত ডুবাইয়াছিলেন কেন? বেশ লজ্জামিশ্রিত বঙ্কিম হাসির সহিত বলিলেন, "দেখছিলাম দাহ্য শক্তি তলায় বেশী না উপরে। সন্দেহ হইল—মস্তিষ্কে কিছু একটা গোলমাল ঘটিয়াছে। নিমল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, প্রত্যেক ঘটনার পিছনেই একটী কারণ থাকে। কারণ কখনও বেশ প্রত্যক্ষ কখনও বা গৌণ মনের অবচেতন দেশে সুযোগের অপেক্ষায় অদৃশ্য থাকে। ঠিক অনেকটা বোরকা-পরা নারীর মতন, দৃশ্যমান অথচ অদৃশ্য। হেঁয়ালীটা স্পষ্ট করিতে বলিলে তিনি জানাইলেন যে ঐ ভদ্রলোকটী সদ্য-বিবাহিত। কম্পানীর মেসে থাকিয়া দিন গুজরাণ্ করেন। পত্নীবিরাটজনিত বিরহ ও তাপে তিনি উত্তেজিত। তাই সামনে যা দেখেন তাই প্রতিরোধ করিতে চাহেন। এসিডের উত্তাপ পরীক্ষা অবচেতন মনের বিদ্রোহের বাহ্যিক প্রকাশ। মনোবিজ্ঞানের এই তত্ত্ব পরিষ্কার করিবার জন্য সাম্প্রতিক কয়েকটী দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কর্মিদের স্বীকৃতি তিনি উদাহরণ-রূপে উদ্ধৃত করিলেন।

ব্যষ্টির ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা যেরূপ বিপদ ডাকিয়া আনে, জাতির বেলায় অনুরূপ ঘটনা ইতিহাসে বিরল নহে।

পঞ্চনদের অধীশ্বর আনন্দপাল মুসলমান আক্রমণ পর্যুদস্ত করিবার জন্য উত্তরাপথের রাজপুত্রদের মিলিত সাহায্যে ক্রমবর্দ্ধমান আফগান শক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিলেন; রাজ-জ্যোতিষী গণনা করিয়া আক্রমণের সময় পিছাইয়া দিলেন। উপযুক্ত সময়ে আক্রমণ হইল, কিন্তু শিলাবৃষ্টিতে হিন্দু সৈন্যের অধিকাংশ হতাহত হওয়ায় ভারতে মুসলমান অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য করিয়া তুলিল।

তোগলকবংশীয় মহম্মদ-বিন-তোগলক পাঠান-সম্রাটদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার কল্পনা ছিল, পারস্য ও চীন বিজয় করিয়া এসিয়ায় সর্বজনমান্য সম্রাট হইবেন। নেপালের পথে দৈবদুর্য্যোগে তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া কেবলমাত্র তোগলকবংশএর নহে, ভারতে পাঠান রাজত্বের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দিগ্বিজয়ী সম্রাট। রাশিয়ার জারের দর্পচূর্ণ করিয়া সমগ্র ইউরোপের অধীশ্বর হইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার কামনা। মস্কোর পথে ওয়ার্শা অতিক্রম করিবার পরে জনশূন্য দগ্ধ প্রান্তরের নিরস অভিনন্দন বিজয়ী সম্রাটের চিত্তে রেখাপাত করিতে পারে নাই। উদগ্র কামনা ও অসংযত লোভ তাঁহাকে এমনই হটকারী করিয়া তুলিয়াছিল যে রুশজাতির সক্রিয় নীরব প্রতিরোধ তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই। এই কারণে মস্কোর রাস্তা হইতে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। সেই প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রুশ ভল্লুকের আক্রমণ ফরাসী রক্তের শীলাস্তূপ রচনা করিয়াছিল, পরাজয়, হতমান ও হতাশা সম্রাটের সেণ্ট-হেলেনা কারাগারের সূচনা এখানেই রচিত হইয়াছিল।

বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির চিত্র কখনও একরঙ্গা হয় না, ব্যক্তি ও জাতির জীবনে দুর্ঘটনা যেমন একদিকে দুঃখের পসরা টানিয়া আনিয়াছে, ক্ষেত্রান্তরে ঠিক তেমনই সৌভাগ্যের বরমাল্যও তাহাকেই রচনা করিতে হইয়াছে।

ইংলণ্ডে সবে জয়যাত্রার পত্তন, স্পানিশ আর্মাডার আঘাতে ইংরাজের সুখস্বপ্ন চিরকালের মতন ইংলিশ চ্যানেলে সলিল সমাধি পাইত, কিন্তু দুর্ঘটনার কুলিশ কঠোর হস্তে তাহা না হইয়া "রুল ব্রিটানিয়া" 'Rule Britania' সপ্তসমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ব্রিটেনের জয়গান ভাসিয়া উঠিল। বিরাট স্পানিশ আর্মাডা তছনছ হইয়া কোথায় খড়ের মতন ভাসিয়া গেল।

ভারত আবিষ্কারের নেশায় মশগুল কলম্বাস ও আমেরিগো পথ ভুলিয়া উল্টোদিকে জাহাজ চালাইয়া আমেরিকার মতন বিরাট দেশ আবিষ্কৃত না হইলে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় নবতম অবদান 'এটম' বোমার ঘাটতি আজ কে পরিপূরণ করিত? পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষুদ্র নাগাসিকী বন্দর কি অক্ষয় মৃত্যুর কীর্ত্তি অর্জন করিতে সমর্থ হইত?

উড়োজাহাজের বিস্ফোরণে তাইহোকুর নগণ্য হাসপাতালে নেতাজী সুভাষের অকাল জীবনাবসান না হইলে কি আজাদ হিন্দ ফৌজের অক্ষয় বাসনা, দিল্লীর লালকেল্লায় চক্রশোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন হইত?

আরব, তাতার ও পাঠানের ভারত আক্রমণ, সংস্কৃতির বিরাট ধ্বংস, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের পাইকারী হত্যা না হইলে ভারতের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ছায়া-নিবিড়, ধীর-শান্ত সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্ম ও শ্যামের গহন প্রদেশে শ্রীবুদ্ধের অমর বাণী প্রচারিত হইত! তাই বলিতেছিলাম সভ্যতার ক্রমবিকাশে দুর্ঘটনা এক বিরাট জায়গা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। হাঁ, দুঃখ শোক আনিয়াছে প্রচুর, সময় সময় হতাশায় বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আবার দুর্ঘটনার কড়ি কোমল মধুর আলাপে সঙ্গীতও জমিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি, বিজ্ঞান। এখানকার কাহিনী ও তদ্রূপ। কাহারও সারাজীবনের সাধনা দুর্ঘটনার রুদ্র বিকাশে বিনষ্ট হইয়াছে। সত্যদ্রষ্টা সাধক মিথ্যাকে স্বীকার না করিয়া শত্রুপ্রদত্ত বিষ সহাস্যে তুলিয়া লইয়াছেন, তপ্ত লৌহকীলকে দণ্ডায়মান হইয়াও অসত্যকে স্বীকার করেন নাই। সক্রেটীশ, রজার বেকন, গ্যালেলিও কতজনের কথা বলিব। সমাজ সংসার আজ ইঁহাদের আত্মাহুতিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে। আপেল সুপক্ক হইলেই ঝরিয়া পড়ে। সকল যুগে সকলেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু মাটিতে আপেল পড়িতে দেখিয়া নিউটনের দৃষ্টি খুলিয়া

গেল, মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করিলেন। সংশ্লেষণে ব্যস্ত আপন-ভোলা বৈজ্ঞানিক থার্মোমিটার ভাঙ্গিয়া বসিলেন; গবেষণা পণ্ড হওয়ায় কত না তাঁহার দুঃখ, কিন্তু ভাঙ্গা থার্মোমিটারের পারদস্পর্শে পাষাণী অহল্যার মুক্তির ন্যায় রাসায়নিক রং, নীলএর জন্ম হইল। পরিশ্রান্ত বৈজ্ঞানিক দিনান্তে আহারে বসিয়া যাহাতেই হাত দেন তাহারই তীব্র মিষ্টত্বে বিরক্ত হইয়া পত্নীকে অতিরিক্ত শর্করা ব্যবহারের জন্য ভৎর্সনা করিতে গিয়া স্যাকারিন্ আবিষ্কার করিলেন। কাজ-পাগল আর একজন বৈজ্ঞানিক তৈয়ারী 'ব্রথ' ড্রয়ারে রাখিয়া কাজের নেশায় সকল কিছুই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মনে পড়িলে ড্রয়ার খুলিয়া দেখিলেন 'ব্রথে' ছাতা পড়িয়াছে। হাতে কাজ থাকায় ডিস ঐ ভাবেই ড্রয়ারে পড়িয়া রহিল। কয়েকদিন পরে পুনরায় ঐ ব্রথের খেয়াল হইলে ডিস বাহির করিয়া দেখিলেন ছত্রাকের পচন হঠাৎ এককোণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং রঙ্ এরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাঁহার খেয়াল হইল ছত্রাকের পচন বন্ধ হইতেছে কেন? অনুসন্ধান করিতে গিয়া ডাঃ ফ্লেমিং জগদ্বিখ্যাত পেনিসিলিন আবিষ্কার করিলেন, দার্শনিকেরা এই জন্যই দুর্ঘটনাকে অবিমিশ্রিত দুঃখের আকর বলিতে চাহেন না। কাজের পরিচয় তাহার ফলে। আমাদের দেশেই কত উদাহরণ আছে, 'বেলা যে পড়ে এল, (সখি) জলকে চল', ভাবুকের কানে এই কথা মরমে পশিল, সত্যই ত বেলা চলে গেল! এখনই বেরিয়ে পড়ো। লাখো লাখো লোক গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম * দেখিয়া ফিরিতেছে, কিন্তু অসহিষ্ণু নৈয়ায়িক নিমাইএর কি হইল? সহিষ্ণুতার ঠাকুর গৌরাঙ্গ প্রেমিক মহাপ্রভু মানবের কল্যাণে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে রাস্তায় নামিয়া আসিলেন। জরামৃত্যু, কেইবা না দেখিতেছে, অমর কে কোথা ভবে? প্রিয়া পত্নীর কোলে সদ্যোজাতপুত্র দেখিয়া রাজার দুলালের এত ভাবান্তর কেন? কি তিনি দেখিলেন? জগতের দুঃখের বোঝা কি তাঁহাকেই পাইয়া বসিল? প্রেম, ভক্তি ও মৈত্রীর সন্ধান আর কেইবা দিতে পারিত! এইরূপ কত পরিবার হঠাৎ আলোর ঝলকানীতে অশ্রুলোরে ভাসিয়া গিয়াছে কিন্তু ত্যাগের এই পশরাস্পর্শে জাতি ধন্য হইয়াছে, পথ ফিরিয়া পাইয়াছে, সমৃদ্ধ হইয়াছে।

দীর্ঘ জীবনে বারংবার "দুঃখের আঁধার রাত্রি" কবির জীবনে আসিয়াছিল, মৃত্যুর এই মুখোসকে যতদিন বিশ্বাস করিয়াছিলেন ততদিন বিভীষিকার ছলনায় কষ্ট পাইয়াছেন, কিন্তু যেদিন হইতে সৃষ্টিপথের সত্য দৃষ্টি তাঁহার নিকটে সহজ ও স্বচ্ছ হইয়া আসিল মৃত্যুভয় চিরদিনের মত তাঁহার চিন্তা হইতে অপাহৃত হইল, তিনি লিখিলেন—

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ায় রবীন্দ্রনাথএর নিকটে মৃত্যু সহজ এবং এত মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল।

এ সকলই হইল অসাধারণ ও অবিস্মরণীয় ঘটনা, সাধারণ লোকের জীবনে দুর্ঘটনা আপাততঃ নির্ম্মম ও করুণ, এই কারণে প্রত্যেক দেশে দুর্ঘটনা যাহাতে আংশিক নিবারিত হয় তজ্জন্য রাষ্ট্রের বহু আইন ও নিয়ম চালু আছে। সমাজও বহু সামাজিক আইন-কানুন খাড়া করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রত্যেক সংস্কার উদ্দেশ্য মানুষ যদি আংশিকভাবেও মানিয়া চলে, তবে অনেক দুর্ঘটনা আশু না ঘটিতেও পারে। সহরে সাধারণতঃ লোকজন ও গাড়ী ঘোড়ার ভীড়। এই জন্যই এখানে রাস্তার আইন কানুন এত বেশী। পথচারীর সুবিধার জন্য যানবাহনের রাস্তা আলাদা করা হইয়াছে। গাড়ী চালাইবার নিয়মাবলী খাড়া করা হইয়াছে। যেখানে ভীড় হইবার সম্ভাবনা সেখানে জনতা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্রের ব্যবস্থা আছে। বড় বড় সহরের চৌমাথায় যেখানে গাড়ী ঘোড়া, পথচারী, ট্রাম ও বাসের ভীড়, সেখানে একজন সাধারণ পুলিসের সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ ইতর ভদ্র সকলেই নির্ব্বিচারে অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই সহজ শাসনপ্রীতি মানব চরিত্রের সামাজিক সাম্য-প্রিয়তার এক অপূর্ব্ব খণ্ডচিত্র মাত্র। সাধারণ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মসুখপরায়ণ। এই ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রিয়তা তাহার নিজস্ব সহজাত স্বভাব। সমাজে বাস করিতে হইলে সমাজের শাসন ও রাষ্ট্রের আদর্শ তাহাকে জন্মগত দৃষ্টিভঙ্গি হইতে উর্দ্ধে উঠিতে সাহায্য করে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে মানুষ সাধারণ ট্রাফিক পুলিশের অঙ্গুলী সঙ্কেতে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্য, ধন ও মান ভুলিয়া নীরবে আইনানুগ হইয়া চলে সেই মানুষই যখন অনুভব করে যে তাহাকে কেহ দেখিতেছে না এবং যেই বুঝিবে যে তাহার কৃতকর্ম্মের কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না তখন পথচারীকে 'গয়াযাত্রা' করাইয়া নিশ্চিন্তে চলিয়া যায়; তবু তাহার গাড়ীর গতি শ্লথ করিয়া হতভাগ্যের অবস্থা বুঝিবার জন্য পিছনে ফিরিয়া চাহে না। এইজন্য বহু আইন সত্বেও দুর্ঘটনা একেবারে নিবারিত হওয়া সম্ভব নহে। আধুনিক সমাজের দায়িত্ব এই কারণেই বেশী হইয়া পড়িয়াছে। অনুপায় দেখিয়া সমাজ-হিতৈষীরা আইনভঙ্গকারীদের ঠেঙ্গাইবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। রাষ্ট্র বহু অনুশাসন, ধর্মাধিকরণ এবং শান্তিরক্ষক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র আইনই মানুষকে আত্মিক পরাজয় হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থকে 'বহুজন হিতায়' বলিদান ততক্ষণই সম্ভব, যতক্ষণ জাতির মণিকোঠায় আদর্শ থাকে অম্লান, অনির্বাণ। শিক্ষার প্রসার, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিবাসীর প্রতি ভালবাসা ও জাগ্রত কর্ত্তব্য বোধ অনেক দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু মানুষের অসহায়তা স্পষ্ট উপলব্ধ হয় প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সময়। ভূমিকম্পে, ঝঞ্ঝাবাত্যায় জলোচ্ছাসে কিম্বা অতিবৃষ্টিতে পাহাড় ধ্বসিয়া ক্ষণিকের মধ্যে মনুষ্যকৃত সভ্যতার যে ধ্বংস হয় তাহার তুলনা নাই। এই সকল দুর্ঘটনায় হতবাক্ মানুষের বিলাপ "হা হতোস্মি" ও দৈন্যতা ভাষায় প্রকাশে অসমর্থ।

বিগত বিহার ভূমিকম্পে গান্ধিজী প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়কে লোভী মানুষের পাপের পরিণাম ও রুদ্রের বিচার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

---

* কেহ বলেন বুদ্ধপাদপদ্ম

সাধারণ মানুষ গান্ধিজীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে অক্ষম বলিয়া তাঁহার এই মন্তব্যে সংবাদপত্রে তুমুল আলোড়ন উঠিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন নৈসর্গিক দুর্ঘটনার আংশিক কারণ দিতে অনেকটা সক্ষম হইয়াছে। মানুষের অসংযত লোভ নৈসর্গিক বিপর্য্যয়এর অন্যতম কারণ।

প্রকৃতি ও মানুষের আজন্ম যোগাযোগ। প্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য মানুষকে দেয় তাহার আহার্য্য ও শক্তি। শান্ত বনানী, নদী-নালা, দিগন্তবিস্তৃত আকাশ, অনন্ত নক্ষত্ররাজি, চন্দ্রসূর্য্যের অসীমতা এবং সমুদ্রের বিশালতা মানুষের মনে এনে দেয় স্থৈর্য্য, প্রশান্তি এবং অনির্বচনীয় উদারতা।

কিন্তু দৈবের বিপাকে এই সহজ-পাঠ যদি মানুষের মনকে চিরকাল আকৃষ্ট রাখিতে না পারে (অন্নবস্ত্রের সমস্যায় ব্যস্ত মানুষ প্রকৃতির সহিত যোগরক্ষা রাখিতে পারে নাই) তবে সে লোভী ও অমিতব্যয়ী হইয়া উঠে। দস্যু ও তস্করের মত লুণ্ঠনে মত্ত হওয়ায় তাহার মানসিক স্থৈর্য্য ও উদারতা নষ্ট হয়। শস্যক্ষেত্রের বিস্তৃতির সহিত বনানীর ধ্বংস, মণিমুক্তা ও মূল্যবান প্রস্তরের লোভে পাহাড়-পর্ব্বতের বুকে খাদ সৃষ্টি হয়। অরণ্যানী সঙ্কুচিত হওয়ায় নৈসর্গিক আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হয়, নদনদী শুষ্ক হইতে থাকে। মরুভূমির বিজয় কেতন সবেগে অগ্রসর হয়। জলধর অসময়ে বারিবর্ষণ করে; শুষ্ক নদনদীতে বন্যা নামে, ভূমিক্ষয়ে চাষের জমি অনুর্বর হয়, সর্বংসহা ধরিত্রী সর্বনাশী মূর্তি ধারণ করে।

অনন্তের যাত্রাপথে মানুষের স্থান নগণ্য, তাহার দৃষ্টিকোণ কত ক্ষুদ্র এবং সাময়িক। কাজেই প্রকৃতির সংহার মূর্ত্তি মানুষের লোভের পরিণতি কিনা কে বলিবে?

কবি ও কবিতা

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত

আধুনিক সমাজে "কবি ও কবিতা"র নামে বহু নিন্দার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন 'কবি' অর্থে 'পাগল' এবং 'কবিতা' অর্থে 'পাগলামো'। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কবি শুধু কল্পনা লইয়াই ব্যস্ত, বাস্তবের সংঘাতে কল্পনা যে চুরমার হইয়া যায় তাহা তাঁহার জানা নাই। আবার এমন লোক ও আছেন, যিনি কবির চরিত্রে দোষারোপ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করেন।

যাঁহারা বাস্তবকে জীবনের সার করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জড়বাদী ও অর্থনীতিজ্ঞানসম্পন্ন। জন্মলাভের পর তাঁহারা বর্দ্ধিত হইতে থাকেন, আর সেই সঙ্গে হিসাব করিয়া আহার করেন—হিসাব করিয়া লেখাপড়া শেখেন—হিসাব করিয়া বিবাহ করেন—হিসাব করিয়া ভালবাসেন, আর শেষে হিসাব করিয়া গোলাম সাজেন। সুতরাং 'কবি ও কবিতা' সম্বন্ধে মতবাদ আমিও তাঁহাদের অর্থনীতি ও জড়বাদিতার গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়াই যাচাই করিতে চাহি।

জড়বাদিতায় বা অর্থনীতিতে প্রত্যেক বস্তুর গুণাগুণ বিচার হয় উপকারিতা (utility) লইয়া। যে জিনিষ যত উপকারী—যত কল্যাণপ্রদ সে জিনিষ ততই আবশ্যকীয়—ততই মূল্যবান। আইন, চিকিৎসা, রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিভাগ আছে যাহাদের প্রত্যেকটী সমাজদেহের কল্যাণসাধন করিয়া থাকে। যিনি আইনজ্ঞ তিনি আইন বিভাগের যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আইন বহির্ভূত বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র দক্ষতা থাকে না, যেমন রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজন হইলে চিকিৎসককে আহ্বান করা হয়। সর্ব্বক্ষেত্রেই এই নিয়ম; ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু এই বিশ্বসংসারে 'মন' বলিয়া একটী বিভাগ আছে যাহার একমাত্র সম্রাট কবি। আইন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক সত্য প্রভৃতি আলোচিত হয় মনের সাহায্যে। এই মন যদি না থাকে তাহা হইলে আমিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং এই আমিত্ব বিলুপ্ত হইলে আইনজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, চিকিৎসক প্রভৃতি কাহারও ব্যক্তিত্ব থাকে না। সুতরাং মানুষ লইয়া সমাজ এবং প্রত্যেক মানুষই মনের দ্বারা জীবনের যাবতীয় বিষয় ধারণা করিয়া থাকে—চিন্তা করিয়া থাকে,—এই মনরূপ রাজ্যের একমাত্র রাজা কবি; কারণ কবি প্রেরণায় বা ভাব প্রবণতায় যে কবিতা লিখিয়া থাকে তাহা এক মন হইতে আর এক মনে—একদেশ হইতে আর এক দেশে—এক যুগ হইতে আর এক যুগে মনের সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। শেক্সপীয়র কবে তাঁহার পুস্তকাবলী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার লেখা এক দেশ হইতে আর এক দেশে—এক যুগ হইতে আর এক যুগে চালিত হইয়া কত মনের উপর যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু শেক্সপীয়র কেন? একথা যে কোন কবির লেখা সম্বন্ধেই বলা যায়। হোমার, চসার, গেটে, ডান্টে, শীলার, শেলী, কীট্‌স্, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বাল্মিকী, কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, প্রভৃতি ইহ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মনের যে চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া আছে, তাহা অনন্তকাল ধরিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে—যুগ হইতে যুগান্তরে চালিত হইয়া মানব মনের উপর করিয়াছে রাজত্ব, দিয়াছে প্রেরণা, আনিয়াছে

শান্তি এবং যাহা করিয়াছে তাহা এখনও করিতেছে এবং চিরকাল ধরিয়া করিতে থাকিবে। তাই কবি জ্ঞানদাতা, শান্তিদাতা, লোক-শিক্ষক, ভাব-প্রকাশক, ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক; তাই কবি দেশের গৌরব, সমাজের শ্রেষ্ঠাংশ, মনুষ্যত্বের আধার, সত্যের পূজারী, জগতের মর্য্যাদা।

ওমার বলিয়াছেন—

"The world is Thine, from Thee it rose,
By Thee it ebls, by Thee it flows."

সত্যই এ বিশ্বসংসার ভগবানের; ভগবানের দ্বারাই ইহার সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। কবির সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; কারণ কবি মন এই পৃথিবীর মধ্যে যে পৃথিবী রচনা করে তাহা এই সাধারণ মানুষের পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং সেই পৃথিবীর মধ্যে যে ভাঙাগড়া চলিয়া থা:ক তাহাও একেবারে নূতন ধরণের। এখানে শেক্সপীয়রের A Mid Summer Night's Dreamএর কথাগুলি মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছেন—

"The Poet's eye in a fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven,
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the Poet's pen
Turns then to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name."

কবি ও দার্শনিকের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং তাহারই জন্য প্রমাণীকৃত হয় উভয়েই সত্যের পূজারী বা সত্যের দ্রষ্টা। তবে প্রত্যেক কবিই দার্শনিক, কিন্তু প্রত্যেক দার্শনিক কবি নন। যাহা সাধারণ চক্ষে দেখা যায় না, সাধারণ কানে শোনা যায় না, সাধারণ জ্ঞানে জানা যায় না তাহাই প্রকাশিত হয় কাব্যে ও দর্শনে। উচ্চভাবপূর্ণ প্রত্যেক গান বা কবিতা দার্শনিক সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, আর এই দর্শনজ্ঞানলাভ হইলে মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতিমধ্যস্থিত মানবজীবন যেন এক মহাকাব্য বা অনির্ব্বচনীয় সঙ্গীত; ইহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এক প্রকার মাদকতার সৃষ্টি করিয়া চতুর্দ্দিক আনন্দময় করিয়া তুলে, আর তাহার ফলে চক্ষু-কর্ণ নাসিকা জিহ্বা-ত্বক এক অপূর্ব্ব প্রেমপ্রবাহে আপ্লুত হইয়া পরমাত্মার স্পর্শানুভূতি লাভ করে।

কেহ কেহ বলেন, কবির কবিত্ব ভাবের নেশা, কল্পনার কুহক বা অবাস্তবের ইন্দ্রজাল। এই "কেহ কেহ"র মতে বৈজ্ঞানিক সত্যই একমাত্র সত্য, ইহা ছাড়া আর সব মিথ্যা। এই "কেহ কেহ" ঘোষণা করেন, ইন্দ্রিয় সাহায্যে যাহা অনুভূত হয় তাহাই সত্য বা বাস্তব; এতদ্ব্যতীত সবই কল্পনা বা অসত্য। কিন্তু আমরা ইন্দ্রিয় সাহায্যে কতটুকুই বা দেখিতে পাই! আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই পুস্তক বা লোকের কথা বা জনশ্রুতির উপর নিহিত।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিক যে সত্য আবিষ্কার করিয়া অহঙ্কার করেন তাহা কল্পনা বলেই সম্ভব হয়; কল্পনাই সত্যের বাহক। বৈজ্ঞানিক কি অনুমান বা উপপত্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক বিষয়াবলী ব্যাখ্যা করেন না? সত্য কথা বলিতে কি, এই কল্পনা (imagination) বা উপপত্তির (hypothesis) সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। অধিকন্তু মানবজীবনই তো কল্পনাময়। এই কল্পনা যদি না থাকিত তাহা হইলে বাস্তবের ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধর্ম্মজ্ঞান, সুখ, শান্তি প্রভৃতি বিধ্বস্ত হইয়া যাইত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব ছিল অসভ্য; সুতরাং মানব মনে কল্পনার নামগন্ধ ছিল না। এই কল্পনার অভাববশতঃ মানুষ কথায় কথায় অমানুষের কাজ করিয়া ফেলিত। যে কোন উপায়ে আত্মোদর পূর্ণ করাই ছিল তখন তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম। তারপর মানুষ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া কল্পনানুরাগী হইল এবং এই কল্পনানুরাগ হইতে উদ্ভূত হইল প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। আমার মনে হয় বর্ত্তমান যুগে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বর্ব্বরতা বিকশিত হইয়াছে। ইং ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে যেন সেই বর্ব্বর যুগের পুনরারম্ভ হইয়াছে। এখন মানুষ মানুষকে আর মানুষের চক্ষে দেখে না, কারণ মানুষের মধ্যে হইয়াছে কল্পনার অভাব। সুতরাং কল্পনাজাত প্রীতি বা ভক্তি না থাকায় মানুষ দৈহিক তৃপ্তির জন্য মানুষের রক্তপাত করিতেছে।

কল্পনা চিন্তাশীলতার জননী। এই চিন্তাশীলতা না থাকায় মানুষ আজ গভীরতম পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে ও হইতেছে। Bertrand Russell বলেন, "A contemplative habit of mind has advantages ranging from the most trivial to the most profound..

But while the trivial pleasures of culture have their place as a relief from the trivial worries of practical life, the more important merits of contemplation are in relation to the greatest evils of life, death and pain and cruelty and the blind march of nations into unnecessary disaster.

কবি ঈশ্বরের সৃষ্টি, কারণ যিনি কবি তিনি জন্ম হইতেই কবি। সুতরাং কবি জন্মায় এবং কবিত্বশক্তি ঐশ্বরিক দান। আমি একস্থানে লিখিয়াছি—

"Poets are born, not made,—a fact,
As poetry shows a divine tact."

সত্যই কবিতা কবির মনে জন্মায়; চেষ্টা করিয়া কবিতা লেখা যা না। একটী বীজ যেমন ভূমিতে অঙ্কুরিত হইয়া ধীরে ধীরে পাদপে পরিণত হয় সেইরূপ কোন ভাব কবির মনে উদিত হইয়া ভাষা পরিচ্ছদে কবিতায় পরিণত হয়। কবিতা ভাবের উচ্ছ্বাস; ইচ্ছ করিলেই কবিতা রচনা করা যায় না। ইচ্ছায় শ্লোক (verse) রচ করা যাইতে পারে কিন্তু কবিতা রচনা করা যায় না। এই জ Dr. Henry Stephen বলিয়াছেন, "Poetry cannot be mad

Poetry grows in the mind just as a tree grows in the soil."

এইখানে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার একটী গল্প মনে পড়িল; উহা কবি কালিদাসের কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। কালিদাস ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বা কবি। রাজা কালিদাসকে অতিশয় ভালবাসিতেন, কারণ তিনি গুণানুরাগী ছিলেন। ইহাতে সভার একজন (বররুচির) ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। বিক্রমাদিত্য এই ঈর্ষ্যাপরায়ণতা লক্ষ্য করিলেন। রাজা বররুচির কবিত্বশক্তির পরীক্ষা করিবার জন্য সম্মুখস্থ একটী শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডকে দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি ঐ বৃক্ষকাণ্ডটী কবির ভাষায় বর্ণনা করুন"। বররুচি তখনই ঐ কাণ্ডটীকে কবিতায় এইভাবে বর্ণনা করিলেন, "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"। রচনাটী শুনিয়াই রাজা কালিদাসকে ডাকিয়া আনিয়া কাণ্ডটীকে কবিতায় তাঁহাকে বর্ণনা করিতে বলিলেন। কালিদাস ক্ষণকালের জন্য চিন্তা করিয়া বলিলেন, "নীরসঃ তরুবরঃ পুরতঃ ভাতি"। রাজা তখন বররুচিকে আনন্দোৎফুল্ল স্বরে কহিলেন, "এখন বুঝলেন তো, কেন আমি কালিদাসকে ভালবাসি—কেন তাঁকে শ্রেষ্ঠ রত্ন ব'লে গণ্য করি!" বররুচি যে শ্লোক রচয়িতা এবং কালিদাস যে কবি, একথা উক্ত রচনাদ্বয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই বোধ হয় বিখ্যাত লেখক কারলাইল (Carlyle) বলিয়াছেন, "যিনি কবিতা রচনা করেন কেবল তিনিই কবি নহেন, যিনি কবিতা পাঠ করেন তিনিও কবি।" সত্যই কবিমন না থাকিলে কবিত্বশক্তি বা কবিতার সার উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়।

গীতায় আছে—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"—অর্থাৎ জ্ঞানের তুল্য পবিত্র এ জগতে আর কিছুই নাই; আর কবিতা সর্ব্ব জ্ঞানের সার। তাই ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (Wordsworth) বলেন, "Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge. গল্পলেখক, প্রবন্ধলেখক ও ঔপন্যাসিক যে বিষয় বহু বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কবি তাহা অল্প কথায় লিখিয়া পাঠকমনে চিরাঙ্কিত করিয়া দেন। মিলটন বলেন, "More is meant than meets the ear" অর্থাৎ কবি তাঁহার মনের ভাব কথায় গাঁথিয়া এমনভাবে প্রকাশ করেন যাহা গভীরতর অর্থব্যঞ্জক; তিনি যে শব্দ ব্যবহার করেন সে শব্দ ঝঙ্কৃত হইয়া কর্ণে প্রবেশ করে এবং সেই সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত ভাব বা গূঢ় অর্থ অন্তরে অনুভূত হয়; অর্থাৎ শ্রোতা কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইয়া স্বতঃই বলিবেন, "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ!" এ স্থলে "জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিতভেল, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল!" (বিদ্যাপতি),

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

(চণ্ডীদাস)

"যা' কিছু আমার সকলি কবে নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে,
সব ছেড়ে সব পাবো তোমায়, মনে মনে মন তোমারে চায়"

(রবীন্দ্রনাথ),

"Beauty provoketh thieves sooner than gold"

(Shakspeare),

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought" (Shelley).

"True love is the secret sympathy, the silver link, the silken tie which heart to heart and mind to mind in body and in soul can bind" (Scott).

"যাহা চাই তাহা পাই না তো, প্রিয়, পাই শুধু দুঃখ জ্বালা,
আপন মনের ছায়া'তলে ব'সে গাঁথি তাইগীতিমালা", ইত্যাদি

উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতাংশগুলির প্রত্যেকটী কবির কথায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটীতেই উচ্চারিত শব্দাপেক্ষা অধিকতর ভাব বা অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু কোন লেখক বা সমালোচক উহার গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে বহু বাক্য প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবেন। "Brevity is the soul of wit"; কবির কবিত্ব এই brevity বা সংক্ষিপ্ততার উপর নির্ভর করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কোন অধ্যাপক একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "I don't like Shelleys" (আমি শেলীর মত কবিদের পছন্দ করি না)। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম; বলিলাম, "সেইজন্যই আজ বাংলার এই দুর্দ্দশা! মধুসূদনকেও আপনারা পছন্দ করেন নি। রবীন্দ্রনাথকেও পছন্দ করেন নি! এখন তাঁদের পছন্দ করছেন।" শেলীর কবিতা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি থাকা চাই। বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলে সাধারণতঃ কবিতা বোঝাই যায় না; বিশেষতঃ শেলীর কবিতা বুঝিতে অগাধ পাণ্ডিত্য চাই। ইয়ং (Young) সাহেব শেলীর Adonaisএর যে অংশ বুঝিতে পারেন নাই সেই অংশে স্বীয় অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। আমার মনে হয় কোন ভারতীয় নিজের নির্বুদ্ধিতা এরূপভাবে লিখিয়া সাধারণ পাঠককে জানাইতে পারেন না। আমার অনুমান ইউরোপীয় সমালোচকগণ হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র ভালভাবে পড়েন নাই; সেইজন্যই তাঁহারা শেলীর Adonaisএর কোন কোন অংশ সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

কবির কবিতা সত্যই অনেকেই (এই অনেকের মধ্যে তথাকথিত বিদ্বানও আছেন) বুঝিতে পারেন না এবং এই কারণেই কবিতা তাঁহাদের কাছে দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই নিজের কবিতার অর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"নানাজনে লয় তাহা নানা অর্থে টানি,
তোমা পানে ধায় তা'র শেষ অর্থখানি।"

আমাদের রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে বাংলার কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইং ১৯১৩ সালের পূর্ব্বে আমাদের দেশে অনেক লেখক, সাহিত্যিক, সমালোচক প্রভৃতি জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কেবলমাত্র কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের লেখা ভালবাসিতেন বা পছন্দ করিতেন। আশ্চর্য্য এই যে, এত বড় বাংলা দেশে—শুধু বাংলা দেশ কেন?—সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কাহারও বিদ্যাবুদ্ধি গজাইল না যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অনুধাবন করিতে পারে। উপরন্তু তথাকথিত সমালোচকগণ বা শিক্ষিত সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব শক্তির উল্লেখ করিয়া কত যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, টিটকারী ও নাসিকাকুঞ্চন করিয়াছেন তাহার হিসাব দিতে গেলে লোকের গালাগালি কুড়াইতে হয়। যাহা হউক, বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষের কেহ যাঁহাকে চিনিতে পারে নাই তাঁহার বিশ্বজয়ী প্রতিভা চিনাইয়া দিল পাশ্চাত্য দেশ ১৯১৩ সালে; যেদিন তিনি নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) লাভ করিলেন সেইদিন শুধু বাঙালী নয়—সমস্ত ভারতবাসী হক্‌চকিয়ে গেল! তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডি-লিট" উপাধি দান করিলেন—তখন সব স্বদেশবাসী তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে গিয়া ব্যথায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কথায় আছে "গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না।" রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে একথার সত্যতা পূর্ণমাত্রায় প্রমাণীকৃত হইয়াছিল। তবে দুঃখ এই যে, রবীন্দ্রনাথ যে কি—কত বড় কবি তাহা জানাইয়া দিল—বুঝাইয়া দিল—শিখাইয়া দিল ইউরোপবাসী! এ বড় লজ্জার কথা!

প্রোফেসর রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন, "To be great is not merely to be talked about, it is also to be misunderstood and Rabindranath has not escaped this fate. The many attempts made to explain him contradict each other; for, from the words of the poet men take what meanings please them." রবীন্দ্রনাথকে লইয়া বাংলার সংবাদপত্রে যে সমস্ত ব্যঙ্গ, কটূক্তি ও নিন্দাবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল সে সমস্ত নীরব ও নিস্তব্ধ হইল সেইদিন, যেদিন তিনি নোবেল-পুরস্কার পাইয়া বাংলা সাহিত্যকে সগৌরবে বিশ্বসাহিত্যের সভামণ্ডপে উচ্চাসনে বসাইয়া দিলেন।

আসল কথা, "সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া,
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া।"

স্বপ্ন

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ

গরীব মধ্যবিত্তের ঘরে জন্মেছিল শিবনাথ।

কৃতিত্বের সঙ্গে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে স্বপ্ন দেখেছিল—ডেপুটি হবার। তার বেশি অগ্রসর হয়নি তার কল্পনা। মফঃস্বলের ছোট্ট মহকুমায় বসে ডেপুটির চেয়ে বড় কোন সরকারী কর্মচারীর অস্তিত্ব অনুমানই করতে পারেনি সে। একটি মহকুমার সর্বময় কর্তা! তার চেয়ে বেশি আশা করে কে?

শিবনাথের বাবা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে "আমিনী" চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। ছোট ভাইদের পড়াবার আর বোনদের পোষণ করবার দায়িত্ব তাকে নিতে হলো ঘাড় পেতে।

তখন তাদের শহরে রেল-কোম্পানীর নতুন আপিস খুলেছে—সবেমাত্র, লোক ভর্তি হচ্ছে দলে দলে। দরখাস্ত দার সঙ্গে সঙ্গেই শিবনাথের চাকরী হোল। তখনকার দিনে পঞ্চাশটাকা মাইনে। একেবারে সাব্-ডেপুটির মাইনের সমান। স্বচ্ছন্দভাবে দিন চল্‌তে লাগলো শিবনাথের।

তার আপত্তি সত্ত্বেও শিবনাথের বাবা তার বিবাহ দিলেন। শিবনাথ যথারীতি পালন করে যেতে লাগলো তার কর্তব্য। তার আশা—তার ভাইরা মানুষ হবে, তার স্বপ্ন তারা করবে সফল, সবাই তাদের চিনবে, সম্মান করবে, ভালবাসবে—পৃথিবীর কাছে না হলেও ভারতবর্ষের কাছে অন্তত তার পরিবারটি হবে সুপরিচিত। অমর হবে সে এই দুনিয়ায়, বেঁচে থাকবে তার স্মৃতি।...

তার ভাইরা লেখাপড়া শিখলো, চাকরী পেলো, টাকা রোজগার করতে লাগলো। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা সরে গেল দূরে—তাদের স্ত্রীপুত্র নিয়ে। ধীরে ধীরে তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলো তারা।

শিবনাথের মনখানি কিন্তু হতাশায় ভেঙে গেল না তবু। সে ভাবলো—তার ভাইদের সে মানুষ করেছে—সকলের কাছে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার মতো শিক্ষা সে তাদের দিয়েছে, মান বেড়েছে তার পরিবারের। এই তো তার সম্মান। সুখে থাক তারা—এই আশীর্বাদই সে তাদের করলো।

তারা গেছে চলে। যাক্। তার ছেলেরা বড়ো হচ্ছে। ছেলেদের সে গড়ে তুলবে মনের মতো করে। মানুষ হবে তারা, তাদের মধ্যে সে হবে অমর। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থ নেই তার, ছেলেদের ভালো খাবার দেবার সামর্থ্য কোথায়? তবু, তার ছেলেরা পরীক্ষা পাশ করে যাচ্ছে একটার পর একটা। পরীক্ষা যখন শেষ হবে, তখনই তারা হবে প্রতিষ্ঠিত—তার দুঃখ যাবে ঘুচে।

উচ্চশিক্ষিত হয়েও শিবনাথের ছেলেরা মনোমত চাকরী পেলোনা। কেরাণীর ছেলে কি হাকিমী পেতে পারে? সে ছেলেদের কেরাণীগিরি করতে দেবেনা—এই তার দৃঢ় পণ। কিন্তু এ'বাজারে চাকরী কোথায় পাবে তার ছেলেরা?

বৃদ্ধ হয়েছে শিবনাথ, চুল পেকেছে, চোখের দৃষ্টি হয়েছে ঝাপ্সা, শক্তিহীন হয়ে পড়েছে তার দু'খানি বাহু। অবসর গ্রহণ করেছে সে। যে কটি টাকা পেয়েছিল সবই হয়েছে নিঃশেষ। দিন চলেনা আর, উপবাস, অর্ধাহারে কাটে দিনগুলো। তবু সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেনা। অনেক হাঁটাহাঁটি, অনেক চেষ্টার পরও তার ছেলেদের চাকরী হলোনা কিছুতেই। প্রতিযোগিতার নামে সর্বস্থলে চলেছে আত্মীয়-পোষণ, দুর্নীতি। দেশের লোকের দুরবস্থার সুযোগে নিয়োগকর্তারা করে যাচ্ছে নির্লজ্জ প্রহসন। শিবনাথের ইচ্ছা হয়—এর বিরুদ্ধে সে আন্দোলন করে। কিন্তু কেমন করে? কে শুনবে তার কথা? স্বাধীনতা সত্যই কি তার আছে? উপায় নেই সমালোচনা করবার, উপায় নেই বাঁচবার, তবু—। মানুষের চিরন্তন অধিকার থেকে বঞ্চিত এ যুগের মানুষ। তবু—তারা বাঁচে, তবু চায় বাঁচতে। কেউ বাঁচে সম্পদে, কেউ-বা দৈন্যে-অভাবে, কেউ-বা পরাজিত হয়—জীবন সংগ্রামে; রেখে যায়···দীর্ঘশ্বাস—বাতাসের ডানায়।······

বিশাল নগরী।

কে শোনে কার কথা, কে রাখে কার খবর? শিবনাথের অসুখ। চিকিৎসা চলেনা, ওষুধ নেই, পথ্য নেই, ঠাঁইটুকুর অভাব মাথা গুঁজবার। সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে একটি ভাড়াটে বাড়িতে। গৃহহীন—আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন—যেন পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।

শিবনাথের ছেলে নিশিনাথ তার বাবাকে বললে, এবার সে যেমন করে হোক একটা চাকরী নেবে যোগাড় করে—সামান্য হোক্, তবু—।

শিবনাথ বললে, না-না-না—তা'হলে আমি যে শান্তিতে মরতে পারবোনা। কি আমি চেয়েছিলাম জানিস্? আমি চেয়েছিলাম শুধু বাঁচবার মতো বাঁচতে। বেশি চাইনি। সে অধিকার কি আমার নেই? কেন থাকবো-না? পৃথিবীতে এসেছি—এখানে বেঁচে থাকবো। ভাবতে পারিনা, আমার সে আশা পূর্ণ হলোনা; তার আগেই আমি বিদায় নেবো পৃথিবী থেকে। আমি বাঁচবো—তোদের মধ্যে আমি থাকবো মরণহীন। তোরা হতাশ করিস্‌নি আমায়।······

অসুখ সারবার নয় তার। শিবনাথ তবু নির্বিকার। রোগে যন্ত্রণা নেই, মনে সুধু একটিমাত্র চিন্তা—একা—নিশ্চল। তার ছেলেরা বড় হবে, তার জীবনের একমাত্র কামনা হবে সিদ্ধ।···

ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেরা বসে আছে শিয়রের কাছে।

সকালের বাতাস ছুটেছে হুহু করে।

টেলিগ্রাম পিয়ন এলো···নিশিনাথের নামে টেলিগ্রাম। নিশিনাথ টেলিগ্রামের খামটি খুললো তাড়াতাড়ি। দেখলো—তার নিয়োগপত্র। দিল্লীতে তার চাকরী হয়েছে—আই, এ, এস, চাকরী।

শিবনাথ তখন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অবসন্ন হয়ে এসেছিল।

নিশিনাথ দৌড়ে গেল তার বাবার কাছে। তার কানের উপর পড়ে বললে, বাবা, আমার চাকরী হয়েছে—আই, এ, এস। এবার আপনি সেরে উঠুন—এখন আপনার বাঁচা প্রয়োজন—আপনি বাঁচুন বাবা—।

শিবনাথ অতি কষ্টে তার চোখ দুটো খুলে একবার তাকালো নিশিনাথের মুখের দিকে। হাতখানি একবার তুলে তাকে যেন চাইলে আশীর্বাদ করতে। যেন উচ্চারণ করতে চাইলো—শেষ আশীর্বাণী।

তারপর তার নিশ্বাসটুকু গেল বাতাসের সঙ্গে মিশে। শিবনাথের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে একটা গভীর তৃপ্তির ছাপ, তার বাঁচবার সাধ সবই যেন আজ হয়েছে সার্থক।

রাশি ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

তুলা রাশি

তুলা যদি আপনার জন্মরাশি হয়, অর্থাৎ যে সময় চন্দ্র আকাশে তুলা নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন সেই সময় যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই রকম ফল হবে—

প্রকৃতি

তুলা শব্দটি তুলাদণ্ডের সংক্ষেপ; তার মানে হ'চ্ছে দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তি। কাজেই আপনার মনের মুখ্য গতি হ'চ্ছে বিচার ও বিশ্লেষণের দিকে। আপনি নিক্তির ওজনে সব জিনিষ অনুভব করতে চান, ক্ষুদ্র খুঁটিনাটিকেও আপনার নজর এড়াতে দিতে চান না।

খুঁটিনাটি লক্ষ্য করার এই প্রবৃত্তির জন্য সব জিনিষের ভিতরের চেয়ে বাইরের দিকে আপনার লক্ষ্য থাকে বেশী এবং দুটো জিনিষের মধ্যে ঐক্যের চেয়ে ভেদটাই আগে নজরে ঠেকে। আপনার মনোভাবে সংশ্লেষণের চেয়ে বিশ্লেষণের প্রভাব বেশী।

এই মনোভাবের জন্য অনেক সময় আপনার মধ্যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বা মতির স্থিরতা পাওয়া কঠিন হ'য়ে ওঠে। যে কোন বিষয়ে হোক্ চট্ করে মত পরিবর্তন করা আপনার পক্ষে মোটেই আশ্চর্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যে মত বা ধারণা আপনি সাময়িকভাবে পোষণ করেন, তার উপর সেই সময়ের জন্য প্রায়ই একটা দৃঢ় অনুরাগ বা নিষ্ঠা আপনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

আপনার মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি আছে এবং হাতের কাজ, শিল্পকলা প্রভৃতির দিকে একটা আকর্ষণ এবং তাতে খানিকটা পটুত্বও থাকা সম্ভব। কিন্তু ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকা আপনার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব'লে আপনার পটুত্ব বা প্রতিভা অনেক সময় কোন কাজে আসে না। তবে ভাগ্যক্রমে যদি কোন উপযুক্ত সহযোগী বা অংশী পান তাহ'লে আপনার গুণপনা সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে।

আপনার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট আছে। কিন্তু কোন্ পথে কী ভাবে অগ্রসর হ'লে তা সফল হ'তে পারে—তা অনেক সময় ঠিক করতে পারেন না। অগ্রসর হওয়ার পথে নানা দ্বিধা ও সংশয় মনে উঁকি মারে। অপরের সাহায্য, সহযোগিতা বা উপদেশ আপনার অগ্রগতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

আপনার সামাজিক ব্যবহার সাধারণতঃ শিষ্ট ও মধুর এবং সামাজিক আচরণের খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য খুব বেশী। এমন কি পোষাক পরিচ্ছদেও প্রচলিত রীতিনীতির ব্যত্যয় দেখলে আপনি ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠেন। কথাবার্তায় অশনে-বসনে সর্বত্র আপনি চান শালীনতা ও শোভনীয়তা।

আপনি সাধারণতঃ আনন্দপ্রিয় হ'লেও, আপনার মধ্যে একটা অধীরতা আছে, যার জন্য সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতেই অনেক সময় আপনি চট্ ক'রে রেগে ওঠেন। কিন্তু আপনার সে রাগ কখনই স্থায়ী হয় না, খড়ের আগুনের মত তা যেমন দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে, তেমনি থপ্ করে নিভেও যায়।

আপনার মধ্যে সমালোচনার সহজ শক্তি আছে, কিন্তু খুঁটিনাটির দিকে বড় বেশী লক্ষ্য বলে অনেক সময় তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্কে সে শক্তি অপব্যয়িত হ'তে পারে।

সামাজিক প্রবৃত্তি আপনার মধ্যে খুব প্রবল। কাজেই নিঃসঙ্গ জীবন আপনার পছন্দ নয় এবং একই ভাবে একই আবেষ্টনের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকতে হ'লে আপনি দারুণ অস্বস্তি অনুভব করেন। অপরের সাহচর্য আপনার চাইই।

সহযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ দুয়ের কোন একটা না হ'লে আপনার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হ'তে পারে না। সেইজন্য যদি সহযোগী না পান, তাহ'লে অনেক সময় ইচ্ছা ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করতে পারেন।

অর্থভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনার কোনরকম দুশ্চিন্তা উপস্থিত হ'তে পারে এবং ইতস্ততঃ করার জন্য অনেক সময় আর্থিক উন্নতির বিঘ্ন ঘটতে পারে। উপার্জনের জন্য অনেক সময় অপরের সাহায্য প্রয়োজন হবে এবং উপার্জনের হ্রাস বৃদ্ধিও প্রায় ঘটবে। কিন্তু বাধা-বিঘ্ন বা বিলম্ব ঘটলেও শেষ পর্যন্ত আর্থিক ব্যাপারে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু আর্থিক ব্যাপার নিয়ে কম-বেশী চিন্তা বরাবরই থাকবে।

উত্তরাধিকারসূত্রে আপনার যদিই কিছু প্রাপ্তি হয়, তা রক্ষা করা কঠিন হবে। প্রাপ্য সম্পত্তি পেতে নানারকম বাধা বিঘ্ন ঘটবে এবং তা নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ বা মামলা মোকর্দমা হওয়াও অসম্ভব নয়। এই বিবাদ বিসম্বাদে লাভ হওয়া দূরে থাক, কাজকর্মের ক্ষতি, অনর্থক ব্যয়, মিথ্যা অপবাদ প্রভৃতির আশঙ্কাই হবে বেশী।

কর্মজীবন

জীবনের কোন না কোন সময়ে আপনার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভের যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হবে। কর্মজীবনে অনেক পদস্থ ও প্রতিষ্ঠাশালী বন্ধু ও মুরুব্বি পেতে পারেন, যাঁরা আপনার উন্নতিতে সাহায্য করবেন। দূর সম্পর্কীয়ের কোন কোন আত্মীয়ের দ্বারাও কর্মক্ষেত্রে উপকার পেতে পারেন। কর্মের ব্যাপারে অনেক বাধা বিঘ্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপনি

বন্ধু ও মুরুব্বির সাহায্যে অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু নিজের চাঞ্চল্য, অদূরদর্শিতা, সন্দেহ ও সংশয়ের জন্য আপনার উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার বিঘ্ন ঘটতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে পারিবারিক অবস্থা আপনার উন্নতির পথ রোধ করতে পারে এবং সহসা কর্ম-বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। শেষ বয়সে বিশেষ ক'রে এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। কর্মজীবনে বন্ধু ও মুরুব্বির সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে পারলে আপনি বেশী উন্নতি করতে পারিবেন। আপনার সেই সব কাজ ভাল লাগবে, যাতে অপরের সহযোগিতা পাওয়া যায় এবং যাতে অল্প পরিশ্রমে সাফল্য হ'তে পারে। সাধারণতঃ জনসাধারণের সম্মুখে আসবার অথবা জনপ্রিয়তা অর্জন করবার সুবিধা যে সকল কাজে আছে সেই সকল কাজের দিকে আপনার ঝোঁক থাকতে পারে। যে সকল কাজে সুকুমার শিল্পের সংশ্রব আছে এবং যাতে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতে হয় সে সব কাজও আপনার প্রিয় হওয়া সম্ভব। আইনজ্ঞের কাজ, শিক্ষকতা প্রভৃতিরও যোগ্যতা আপনার মধ্যে আছে। চাকরীর চেয়ে প্রফেশন এবং প্রফেশনের চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে আপনি বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন। সাধারণতঃ ছোট খাট কোন জায়গায় কাজ করার চেয়ে যেখানে বহু জনের সংশ্রব আছে, এমন কোন বড় জায়গায় কাজ করতে আপনার ভাল লাগবে। কাজেই ব্যবসা করলে আপনার উচিত বাজারে, গঞ্জে অথবা শহরে দোকান বা আড়ত করা। চাকরী করলে সেই সকল স্থানে চাকরী করা উচিত যেখানে বহু কর্মচারী এক সঙ্গে কাজ করে। প্রফেশান করলে তা করা উচিত কোন বড় শহরে। মোট কথা বহুজনের সহযোগে কর্ম আপনার সাফল্য নিয়ে আসবে।

পারিবারিক

ভ্রাতা ভগ্নীর সংখ্যা আপনার বেশী হওয়াই সম্ভব। আপন ভ্রাতা ভগ্নী ছাড়াও অনেক আত্মীয়ের সাহচর্য আপনাকে করতে হবে। অনেক সময় সহোদর সহোদরার চেয়ে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বা আত্মীয়ার সঙ্গে বেশী সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা হ'তে পারে। মধ্যে মধ্যে আত্মীয়-সম্মেলনে আপনি যথেষ্ট আনন্দ পাবেন এবং কোন কোন আত্মীয়ের দ্বারা আর্থিক হিসাবে বা কাজ কর্মের দিক দিয়ে উপকৃতও হ'তে পারেন। কুটুম্বিতার দ্বারা আপনার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হওয়াও অসম্ভব নয়।

আপনার পারিবারিক অবস্থা ঠিক এক ভাবে কখনই চলবে না। পারিবারিক আবেষ্টনে কম-বেশী পরিবর্তন প্রায়ই ঘটবে। কোন কোন সময় নিজ পরিবারের চেয়ে অপর পরিবারের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ট সংশ্রবও হ'তে পারে। আপনার কর্মের সঙ্গে আপনার পারিবারিক জীবনের কম-বেশী সম্বন্ধ থাকবে। হয়ত কর্মের প্রকৃতি এমন হবে যাতে আপনার পারিবারিক আবেষ্টনে বা গৃহস্থালীর ব্যাপারে ওলট-পালট এনে দেবে; কিম্বা এও হ'তে পারে যে আপনার পারিবারিক অবস্থা আপনার উন্নতির অন্তরায় বা অবনতি ও কর্মহানির কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে। শেষ বয়সে পারিবারিক আবেষ্টনে একটা বড় রকম পরিবর্তন হবে, তা সে ভালর জন্যই হোক্, আর মন্দের জন্যই হোক্।

সন্তান আপনার বেশী না হওয়াই সম্ভব। সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার বিশেষ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।

স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে আপনার আশাভঙ্গ বা মনোকষ্ট হ'তে পারে এবং সেই সংশ্রবে সত্যই হোক্ মিথ্যাই হোক্, কোন রকম অপবাদ হওয়াও বিচিত্র নয়।

নিকট কোন আত্মীয় বা মাতৃস্থানীয়া কোন আত্মীয়ার গুপ্ত বা প্রকাশ্য শত্রুতায় আপনার পারিবারিক শান্তি ব্যাহত না হয় সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত।

বিবাহ

দাম্পত্য ব্যাপারে আপনার আন্তরিকতা লক্ষিত হবে বটে, কিন্তু স্ত্রীর (বা স্বামীর) আচরণের খুঁটিনাটির দিকে বড় বেশী লক্ষ্য থাকায় দরুণ, দাম্পত্য জীবনে আপনি খুব সুখী হ'তে পারবেন না। বিবাহের সংশ্রবে আপনার অর্থপ্রাপ্তি বা উন্নতির সাহায্য হ'তে পারে কিন্তু স্ত্রীর (বা স্বামীর) সঙ্গে খুব ভালরকম বনিবনাও হওয়া কঠিন। এমন কি আপনাদের অবনিবনাও সমাজে প্রকাশ্য সমালোচনার বিষয় হ'তে পারে। অনেক সময় কর্মজীবন অথবা বন্ধুবান্ধবের সংশ্রব আপনার দাম্পত্য-জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তা সত্ত্বেও আপনার যদি এমন কারো সঙ্গে বিবাহ হয় যাঁর জন্ম মাস বৈশাখ আষাঢ় কার্তিক অথবা ফাল্গুন, কিম্বা যাঁর জন্মতিথি শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া বা কৃষ্ণপক্ষের নবমী, তাহ'লে কতকটা মানিয়ে চলতে পারবেন।

বন্ধুত্ব

আপনার বন্ধুভাগ্য মোটের উপর ভাল। অনেক হিতকামী বন্ধু আপনি পাবেন যাঁরা নানা দিক দিয়ে আপনার শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন। আপনি নিজে কিন্তু বন্ধুত্বের ব্যাপারে ঠিক একনিষ্ঠ হ'তে পারবেন না। অনেক সময় চাঞ্চল্য, অবিশ্বাস বা ঈর্ষ্যার বশবর্তী হ'য়ে এমন কিছু করে বসবেন যা বন্ধুর বিশেষ অনিষ্টের হেতু হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। আপনি নিজে অনেক সময় বন্ধু পরিবর্তন করবেন এবং এক বন্ধু ছেড়ে অপর বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ট সংশ্রব করতে চাইবেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বন্ধুদের সদ্ভাব অনেক ক্ষেত্রেই আপনার উপর অটুট থাকবে। যাঁদের জন্ম মাস আষাঢ়, কার্তিক অথবা ফাল্গুন, কিম্বা যাঁদের জন্ম-তিথি শুক্লা দ্বিতীয়া কি কৃষ্ণা নবমী, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আপনার বিশেষ আনন্দের কারণ হবে।

সম্পত্তির ব্যাপার বা উত্তরাধিকারের সংশ্রবে কিম্বা দেনা-পাওনা নিয়ে আপনার দু' চার জন শত্রুর সৃষ্টি হ'তে পারে, যারা আপনার প্রতিষ্ঠাহানি অথবা আর্থিক হিসাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সাহায্যে আপনি শত্রু জয় করতে সক্ষম হবেন।

স্বাস্থ্য

দৈহিক গঠনে আপনি একটু স্পর্শকাতর হবেন। আহার বিহারের ব্যাপারে সামান্য একটু ব্যতিক্রমও আপনি সহ্য করতে পারেন না। খুঁটুই হোক্, বাসকষ্টই হোক্—সবই আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য না হ'লে আপনার দেহ স্বচ্ছন্দ থাকতে চায় না। কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি আপনার সহ্য হয় না। অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, একটানা দীর্ঘ পরিশ্রম সবই আপনার যথাসাধ্য বর্জন করা উচিত। বিশেষ করে কষ্টসাধ্য দৈহিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকর। আপনার দেহের দুর্বল অংশ হ'চ্ছে গলা, হাঁটু, মূত্রস্থলী ও জননেন্দ্রিয়। তা ছাড়া চর্মরোগ বা রক্তদুষ্টির প্রবণতাও আপনার মধ্যে আছে। আপনার দেহ ভাল রাখতে হ'লে, একদিকে যেমন ঘি, মাখন প্রভৃতি চর্বিজাতীয় খাদ্য এবং ছানা, ডাল, মাছ মাংস প্রভৃতি প্রোটিন্ জাতীয় খাদ্যের দরকার, তেমনি আপনার খাদ্য সুস্বাদু ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও হওয়া চাই। একেবারে সাদাসিধা বা মসলা-বর্জিত খাদ্য আপনার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। মধ্যে মধ্যে বলকারক (টনিক জাতীয়) ঔষধ ব্যবহার আপনার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। কিন্তু ঔষধ ব্যবহারের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি করা উচিত হবে না। আপনার দেহের গঠনই এমনি যে পীড়া হ'লেই দেহে সায়াংশের অভাব ঘটতে পারে, সুতরাং যৌন ব্যাপারে আপনার বিশেষ সংযত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে অনিয়ম বা বাড়াবাড়ি হ'লে দেহ অপটু হ'য়ে উঠতে পারে।

অন্যান্য ব্যাপার

আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ অনেক হ'তে পারে এবং তাতে আনন্দও পেতে পারেন—কিন্তু একটানা দীর্ঘ ভ্রমণ বা দূরদেশ যাত্রা আপনার পক্ষে কষ্টকর হওয়াই সম্ভব। তীর্থভ্রমণ বা সমুদ্র ভ্রমণে বিপদ-আপদের আশঙ্কা আছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই যে আশা নিয়ে বিদেশে যাবেন তা পূর্ণ হবে না। বিদেশে প্রতিষ্ঠাশালী বন্ধুলাভ হ'তে পারে বটে এবং তাঁদের সাহায্যে কিছু আনন্দও পেতে পারেন, কিন্তু তাঁরা আপনার অভীষ্ট সিদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন না।

স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ৬, ১৮, ৩০, ৪২ প্রভৃতি বর্ষগুলি নিজের অথবা পরিবারস্থ কারো সংশ্রবে কোন দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হ'তে পারে। ৭, ১২, ১৯, ২৪, ৩১, ৩৬, ৪৩, ৪৮ প্রভৃতি বর্ষগুলিতে কোন উল্লেখযোগ্য আনন্দলাভ সম্ভব।

বর্ণ

আপনার প্রীতিপ্রদ ও সৌভাগ্যবর্ধক বর্ণ হচ্ছে নীল। নীল রঙের সব রকম প্রকার-ভেদই আপনি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু গাঢ় নীল রঙ্ ব্যবহার করা আপনার পক্ষে ভাল। দেহ মনের অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু হাল্‌কা ও চক্‌চকে রঙ্ আপনার ভাল লাগবে।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন হ'চ্ছে ইন্দ্রনীল (Blue diamond), নীলা, ফিরোজা (Turquoise) প্রভৃতি। অসুস্থ অবস্থায় ওপ্যাল (Opal) ধারণ করতে পারেন।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জনকয়েকের নাম—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাইজার দ্বিতীয় উইল হেলম, রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব, প্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যাবিদ্ ডাক্তার কেদারনাথ দাস, প্রসিদ্ধ দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।—

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আন্দামানে জাপানী-রাজ

গুণ্ডার বা অপরাধী সন্দেহে ব্যক্তি বা সমষ্টির উপর জাপানীরা যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা ছাড়াও সাধারণভাবে নিরীহ নিরস্ত্র অধিবাসীদের উপর যে ব্যাপক অত্যাচার হইয়াছে তাহা কল্পনাতীত। বর্তমানে সরকারী মোটর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ রাহা বলিলেন "আমরা জাপানী রাজত্বে এমন কি বন্ধুর সহিতও কথা বলিতে সাহস পাইতাম না, পাছে অন্য কাহারও কোনরূপ সন্দেহ হয়। জাপানী অফিসারের হুকুমে নিয়মিত চাকুরী করিয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতাম। জামা কাপড় কিছুই আমাদের ছিল না, ভালো পোষাক অধিকাংশই জাপানীরা তাহাদের রাজত্বের প্রথম দিকে কাড়িয়া লইয়া ছিল, বাকী যাহা ছিল তাহা তিনবৎসরে সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। পুরাতন চটের থলে কাটিয়া তাহারই প্যাণ্ট এবং জামা প্রস্তুত করিয়া উহাই পরিতাম, এ-ছাড়া রেশনের নিদারুণ অভাব। এক একটি পরিবারকে সপ্তাহে এক সিগারেট টিন-পরিমিত চাউল দেওয়া হইত।" এই সমস্ত কথোপকথনের মধ্যে পকেট হইতে একটি সিগারেট টিন বাহির করিয়া আমাদের দলের ভিতর হইতে একজন ভদ্রলোক মিঃ রাহাকে একটি সিগারেট দিতে যাইলে তিনি বলিলেন "আমি সিগারেট খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। জাপানী অধিকারে একটি সিগারেটের দাম হইয়াছিল দশ টাকা। চাঁদা করিয়া দশ টাকায় একটি সিগারেট কিনিয়া আমি ও আমার দুই বন্ধু এই তিনজনে শেষ

ধূমপান করিয়াছি, উহার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া আর সিগারেট স্পর্শ করি নাই।" তিনি বলিলেন যে খাদ্যের অভাবে সকলেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিল; বেরিবেরি, রক্ত আমাশয় এবং নানারূপ চর্মরোগ দেখা দিয়াছিল, ইহার উপর নিয়মিত ভাবে কাজ করিতেই হইত, নচেৎ জাপানীদের হাতে বেত খাইতে হইবে। পোর্টব্লেয়ারে এমন লোক নাই যে জাপানী রাজত্বে বাস করিয়া কখনও জাপানীর হাতে প্রহার লাভ করে নাই। বলিলেন, "আমরা জীবন্তে মরিয়া ছিলাম—তবে যে কোন মতে বাঁচিয়া ছিলাম সে কেবল রাঙা আলু আর নারিকেল খাইয়া, নচেৎ পোর্টব্লেয়ারে একজনও বাঁচিত না।" জাপানী রাজত্বের শেষভাগে ১৯৪৫-এর মাঝামাঝি জাপানীরা যখন খাদ্যাভাবে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, তখন লোকসংখ্যা কমাইবার জন্য উহারা যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহাও উহাদের নিকট শুনিলাম। উহা এতই অমানুষিক যে শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চাক্ষুষ দেখিয়াছে এবং নিজের দেহের উপর দিয়া নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে এইরূপ লোকের নিকট শোনা বলিয়াই সে কাহিনী নিয়ে দিলাম।

জাপানী রাজত্বের একেবারে শেষভাগে খাদ্যাভাব যখন তীব্র হইয়া দেখা দিল, তখন জাপানী অফিসারগণ পোর্টব্লেয়ারের সে সমস্ত লোক প্রত্যক্ষভাবে সরকারী প্রয়োজনে লাগিত না, তাহাদের একদিন বাড়ী হইতে জোর করিয়া লইয়া গিয়া সেলুলার জেলে আটক করিয়া বলিতে লাগিল যে এখানে নিদারুণ খাদ্যাভাব, চল তোমাদের অন্যত্র রাখিয়া আসিব সেখানে তোমরা প্রচুর খাদ্য পাইবে। লোকে কেহ তাহাদের কথা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না, কিন্তু উপায় নাই, জাপানীদের হুকুম মত কাজ করিতেই হইবে। ঐ হতভাগাদের একদিন সেলুলার জেলে আটক রাখিয়া পরদিন সন্ধ্যার পর বলপ্রয়োগে জাহাজে উঠাইতে বাধ্য করা হইল। প্রায় পাঁচ ছয় শত বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক এবং শিশুতে জাহাজ ভর্ত্তি করিয়া ১৯৪৫-এর আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে এই জাহাজ পোর্টব্লেয়ার বন্দর ছাড়িয়া রওনা দিয়াছিল। দেশের লোক তখন কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু এই সমস্ত লোককে হাভলক দ্বীপের নিকট লইয়া যাইয়া সমুদ্রবক্ষে শেষ রাত্রে জোর করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পরেই জাপানীরা প্রচার করিল যে, যে-দ্বীপে এই লোকগুলিকে পাঠানো হইয়াছে, সেখানে ইহারা সুখে আছে অতএব আরও অনেক লোক সেখানে পাঠানো যায়। অতঃপর জাপানীরা তাহাদের অফিস, কারখানা ও ক্ষেতের শ্রমিক এবং কর্মচারীদের টিকিট দিতে সুরু করিল কিন্তু কর্ম্মচারীদের স্ত্রী বা সন্তানবর্গকে টিকিট দিল না; বলিল মাত্র টিকিটধারী লোকই পোর্টব্লেয়ারে থাকিবে, বাকী সকলকেই সেই দূর দ্বীপে গিয়া বাস করিতে হইবে। ১০ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালে এইরূপে টিকিটহীন পাঁচ ছয়শত স্ত্রীলোক ও শিশু একত্র করিয়া জাপানীরা পুনরায় সেলুলার জেলে একত্রিত করিল এবং সন্ধ্যার সময় আর এক জাহাজ ভর্ত্তি করিয়া শেষ রাত্রে রাঙ্গাকান নামক অন্য একটি দ্বীপের নিকট লইয়া গিয়া জলে ফেলিয়া দেয়। পুনরায় ১৪ই আগষ্ট তারিখে এইরূপে আরও পাঁচ ছয় শত টিকিটহীন স্ত্রীলোক ও শিশু একত্র করিয়া সেলুলার জেলে আটক করা হয়, কিন্তু সেদিন আর জাহাজ ছাড়া হয় নাই, পরদিন বিকালে সহসা তাহাদের জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শুধু যে তাহাদের জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল তাহাই নহে, উপরন্তু পোর্টব্লেয়ারবাসী প্রত্যেককেই আধসের পরিমাণ চাউল এবং চিনি জাপানী মিলিটারী গুদাম হইতে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইতে লাগিল। সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। শেষে শোনা গেল যে, ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৫ তারিখে জাপান মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। খবরটা লোকমুখে শোনা গেল এবং প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেল যে জাপানীরা সহসা নিরতিশয় ভদ্র ও সহৃদয় হইয়া উঠিয়াছে।

২৩শে মার্চ ১৯৪২ হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৫ পর্য্যন্ত আন্দামানে জাপানীদের অধিকার এবং অত্যাচার অব্যাহতভাবেই চলিয়াছিল। কোনরূপ সংবাদপত্র ছিল না, কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিবার সাহস পর্য্যন্ত লোকের ছিল না, বন্দুক ও তরোয়াল দিয়া নিরস্ত্র দেশের মধ্যে বর্ব্বরতার অবাধ গতি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে এরূপ বর্বরতা প্রচণ্ডভাবে চলিয়াছিল, সভ্য পৃথিবীর সংবাদপত্র পাঠকগণ তাহার কোন আভাসমাত্রও পান নাই।

এই সাড়ে তিন বৎসরকাল সময়ের মধ্যে পোর্টব্লেয়ারের নাগরিক জীবন একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাজারে কাপড়, চাউল বা ঔষধ কিছুই পাওয়া যাইত না, কোন্‌দিন কাহাকে দিনে বা মধ্যরাত্রে গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে মারধোর করিবে, গায়ে আলপিন ফুটাইয়া হত্যা করিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, চোখের সামনে আত্মীয়স্বজনের লাঞ্ছনা যে কি ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। অথচ আত্মগোপন করিয়া পলায়নের কোন উপায়ও নাই, সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ হইতে কোথায় পলাইবে? এই দুর্ব্বিসহ জীবনযাপন করিয়া লোকে একরূপ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি আত্মহত্যাও হইয়াছিল, কিন্তু কতগুলি, তাহার কোন সংখ্যাও কেহ রাখে নাই। দুইবারে কতগুলি লোককে যে সমুদ্রে ফেলা হইয়াছিল, তাহার কোন হিসাবও সঠিক পাওয়া যায় না, তবে জেলের কর্ম্মচারীরা আন্দাজ করে প্রতিবারে পাঁচ ছয় শত হইবে বলিয়া। ইহাদের যে জলে ফেলা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে কয়েকজন নিতান্ত ভাগ্যের জোরে জীবিত অবস্থায় নিকটবর্ত্তী দ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং ইংরাজদের দ্বারা আন্দামান পুনরায় অধিকৃত হওয়ার পর ইহাদের জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করাও হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ এখনও পর্য্যন্ত পোর্টব্লেয়ারে চাকুরী করিতেছে। একজনের নাম সওদাগর, সে এখানকার কুলী সর্দ্দাররূপে এখনও কাজ করে, অন্যজন দেবীপ্রসাদ, সে Conservator of Forests-এর অফিসে এখনও দপ্তরীর কাজ করে। এইরূপ জীবিত আরও কয়েকটি ব্যক্তিকে জাপানী রাজ্যের অবসানের পর তীরমুখ্‌লীন, এ্যালেকজান্দ্রা, হাভলক ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ হইতে মৃতপ্রায় অবস্থায় উদ্ধার করা হইয়াছিল।

ইহাদের মুখ হইতেই এই সমস্ত কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে জাপানীরা যে কিরূপ হৃদয়হীন, তাহার অন্য উদাহরণও শুনিয়াছি। একটি ঘোড়ার দুইখানি পা কাটিয়া লইয়া উহাকে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া পরদিন বাকী দুইটি পা কাটিয়া লইয়া তৃতীয় দিনে ঘোড়াটিকে পুরাপুরী কাটিয়া রান্না করিবার কাহিনীও শুনিয়াছি। প্রথম দিনেই ঘোড়াটিকে বধ করিলে তিন চারদিন ধরিয়া পাছে পচা মাংস খাইতে হয়, সেই আশঙ্কায় অল্পে অল্পে কাটিয়া তিনদিন ধরিয়া টাট্‌কা মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা নাকি এইরূপেই করা হইত। কোন জাপানী সৈনিক সাংঘাতিকভাবে আহত হইলে তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার জন্য জাপানী ডাক্তাররাই আদেশ দিতেন, এবং অন্য সহকর্মী জাপানী সৈনিক জল্লাদের ভূমিকায় নির্ব্বিচারে সেই আদেশ পালন করিত। যন্ত্রণা দেওয়া বা হত্যা করা যেন জাপানীদের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ একটা ছেলেখেলার ব্যাপার ছিল।

১৫ই আগষ্টের পর পোর্টব্লেয়ার সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থায় রহিল। জাপানীরা কোন কাজই করিত না, ভালো মন্দ কোন বিষয়েই মাথা দিত না, লোকে যে যাহা পারিত করিত। এইরূপে প্রায় পাঁচ ছয় সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর ২৬-এ সেপ্টেম্বর প্রথম রেডক্রশের Mercy Ship পোর্টব্লেয়ারে আসিয়াছিল। এই জাহাজে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন যে চট-পরিহিত, রোগগ্রস্ত, মৃতপ্রায় লোক দেখিয়া তাহাদের সভ্য মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করাই দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, এই Mercy Ship এই দ্বীপে কিছু কাপড়, খাদ্য, গুঁড়া দুধ, ঔষধ ইত্যাদি আনিয়াছিল। ইহার পর ইংরাজের পুর্নদখল ফৌজ ৮ই অক্টোবর তারিখে এই দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করে। ৪৩ মাস জাপানী রাজত্বে লোকের দুঃখ হইয়াছিল অপরিসীম—তবে তৎসঙ্গে জাপানীদের দ্বারা পোর্টব্লেয়ারের ৩০ মাইল পাকা রাস্তা, একটি এরোড্রোম, ডকইয়ার্ডের কিছু উন্নতি এবং অসংখ্য শস্যক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাপানীদের রাজত্বের নিদর্শনস্বরূপ এখনও তাহাদের পরিত্যক্ত কামান, পিল্‌বক্স, পাহাড়ের নীচের আশ্রয়স্থান এবং গুদাম ঘর ইত্যাদি এখনও অবশিষ্ট আছে। সেগুলির কথা ইতিপূর্ব্বেই গত সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে।

জাপানী অত্যাচারের শেষ পরিণামটুকুও বলা উচিত। যুদ্ধান্তে আন্দামানের অত্যাচারী জাপানীগণ মিত্রশক্তির দ্বারা ধৃত হইয়াছিল। সিঙ্গাপুরে ইহাদের যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার হয়। এই বিচার আরম্ভ হইয়াছিল ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এবং ঐ বৎসর জুলাই মাসে এই বিচার শেষ হয়। বিচারে প্রায় ২৫।৩০ জনের জেল এবং ৪৫ জন জাপানীর মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল। এই বিচারের জন্য আন্দামান হইতে অনেকেই সাক্ষীরূপে সিঙ্গাপুরে গিয়াছিলেন। এ ছাড়া শ্রীমান পুষ্কর বাগচী মহাশয়ও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং এখনও তিনি ভারতের জেলে অবরুদ্ধ আছেন। প্রসঙ্গক্রমে এই সূত্রে ১৯।১০।৪৯ তারিখের পি-টি-আই-এর সংবাদটুকুও দেওয়া যায়। ঐ সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জাপানীদের মধ্যে যুদ্ধাপরাধের জন্য মোটের উপর পাঁচ ছয় হাজার অপরাধীকে লইয়া তিন হাজারেরও অধিক মামলা চালানো হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৯০০ মৃত্যুদণ্ড এবং ২,৫০০ কারাদণ্ড হইয়াছে এবং কতকগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধাপরাধী বন্দী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল যে, পরাজিত শত্রুকে বিজয়ীগণ অযথা লাঞ্ছিত করে, কিন্তু আন্দামানে লোকমুখে উপরোক্ত অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া মনে হইল যে, ঐগুলি যদি সব সত্য হয়, তাহা হইলে মানবতার দিক দিয়া এই বিচার এবং শাস্তি হওয়া সত্যই প্রয়োজন। অবশ্য একথা ঠিক যে, জয়ীরাও হয়ত ঐরূপ বা উহাপেক্ষাও অধিক অত্যাচার করে, কিন্তু একজন অপরাধীর শাস্তি দিবার উপযুক্ত কোন শক্তি নাই বলিয়া অপর অপরাধীর বিচার না হওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি নাই। উপরন্তু এইরূপ বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা থাকিলে পরবর্ত্তী যুদ্ধে অত্যাচারীগণ সাবধান হইবেন, কারণ যুদ্ধ চলিবার সময় কে জয়ী হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা ত থাকে না।

উপরোক্ত কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোন অভিজ্ঞতা নাই। বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে শুনিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাই একত্রিতভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। কেবল এইটুকুই আমার সন্দেহ রহিয়া গেল যে, যে-জাপানীদের ভদ্রতা ও অমায়িকতার সুখ্যাতিতে পূর্ব্বভারতের মণিপুরীরা ও নাগারা পঞ্চমুখ, সেই জাপানীরাই আন্দামানে এত বর্ব্বর হইয়া উঠিল কি করিয়া? হয়ত এরূপ হইতে পারে যে, আসাম অভিযাত্রীদের উপর নেতাজীর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল, কিম্বা আন্দামানকে সম্পূর্ণরূপে লোকজনশূন্য করিয়া ও জাপানী উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ মনস্থ করিয়াছিলেন, কিম্বা অন্য কোন কারণে উভয় স্থানের ব্যবহারে এই বিপরীত পার্থক্য ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, রাজকুলকে বিশ্বাস না করিবার জন্য ভারতীয় পণ্ডিতগণ যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই উপদেশ বাণী স্মরণ করিয়া মণিপুর ও আন্দামানের দুই বিপরীত ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করিবার দুশ্চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। (ক্রমশঃ)

লামার অভিশাপ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

একটা বেয়াড়া জায়গার একটা ভুতুড়ে লোকের অভিশাপ।

গল্পটা কুচবিহারের···লোকে বলে দুশো বছর থেকে সেখানে চলিত আছে।

ভুটিয়ারা থাকে যেন সে রাজ্যের উপর তলায়। মাঝের তলায় থাকে একটা পাহাড়ী জাতির লোক। নিচেরতলা খাস কুচবিহার···থাকে কোচ বা রাজবংশীরা। তাদের মধ্যে মাঝের-তলার পাহাড়ী জাতের মেয়েরা খুব সুন্দরী। কে জানে এদেরই আগে কিন্নরী বলা হইত কি-না? তারা সাজগোজও করে খুব···পুরুষরাও কম বিলাসী নয়।

প্রবাদ আছে এই কুচনীপাড়াতেই শিবঠাকুরের বিলাস-রাজ্য ছিল···তা তিনি যে শিবই হোন।

দেশে থাকে ঐ তিন জাতির লোক···তাদের মধ্যে সদ্ভাব নাই মোটেই।

আবার এই তিন জাতই বাঙালীদের ভারি হিংসা করে···বাঙালীদের নাম দিয়াছে 'ভাটীয়া' বা দখিনের লোক।

জয়ন্তী পাহাড় হিমালয়েরই একটা ধারা।

বর্ষায় জয়ন্তী পাহাড়ের জলপ্রপাত···দেখিলে মনে হয় স্বর্গ থেকে দেবতারা বুঝি সমুদ্রের মুখ খুলিয়া দিয়াছেন।

কুচবিহারের ধলনা নদীতে এই জলের চাপে এখন যেন ঢল্ নামিয়াছে।

নদী বাহিয়া জয়ন্তী পাহাড়ে উঠিতেছে তিন বন্ধু···ঐ তিন জাতের তিনটি লোক। টাসী ভুটিয়া, রামিয়া পাহাড়ী, আর শঙ্কর কোচ। তিন জনেরই লক্ষ্য ব্যবসা। ভোটদের দেশে তারা উঠিতেছে চাল-বোঝাই ডিঙি নিয়া। ফিরিবার সময় চালের বদলে সেখান থেকে আনিবে কস্তুরী, মঞ্জিষ্ঠা, মিঠা বিষ, মোম আর মধু।

তারা যতোই উজান উঠিতেছে ততোই শীত বাড়িতেছে দারুণ···তার সঙ্গে পেট জ্বলিতেছে হুহু করিয়া। তাদের ধারণা ছিল মহাকালীর মন্দিরে যাইতে দু'দিনের বেশি লাগিতেই পারে না···আর সেখানে গেলেই পেটভরা প্রসাদ মিলিবে। এখন বুঝিল নৌকায় গেলে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া মন্দিরে উঠিতে আরো দুই দিনের কমে হইবে না—তাই তাহারা নৌকা বাঁধিল একটা শক্ত বেঁটে পাহাড়ী গাছের সঙ্গে। তারপর পিঠে চালের বস্তা নিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। দেবীর পূজারী মন্দিরে ঢুকিতে দেয় না···মালগুলো পাহাড়ের নিচে রাখিয়া যাইতে হইবে—টাসী ভুটিয়া এ কথাটা বারবার শোনাইতেছে সঙ্গীদের। সে আরও বলিল—এই ভাটীয়া লামা হেমঙ্কর ভারি পাজি লোক···ঐ উপরে মহাকালের মন্দিরের তিব্বতী লামা-বাবার শিষ্য বলিয়া হেমঙ্করের এতো সাহস। তিব্বতী লামা যেমন ভুতুড়ে তেমনি গুণী। সবাই তাকে ভয় করে এই তল্লাটে। লম্বা-বুড়ো ঝোপ ঝোপ গোঁফ-দাড়ি···তেল-চিটে চামড়ার আলখাল্লা গায়ে···গলায় খট্ খট্ করিতেছে কত জানোয়ারের, কত মানুষের হাড়ের মালা।

মহাকালীর মন্দিরের নিচের পাহাড়ের আড়ালে তারা দুই তিন খেপে আনিয়া বস্তাগুলি নামাইল। আরও থাকিয়া গেল কিছুটা, কিন্তু ধৈর্যহারা তাহারা ক্ষুধায়··· ঢুকিয়া পড়িল মহাকালীর মন্দিরে।

গুহার মধ্যে দেবীর মাথায় পাহাড় হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে···মিট্‌মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে সেই অন্ধকারের মধ্যে···ধূপের ধোঁয়া মৃদু মৃদু উঠিতেছে··· বড় বড় পাথরের খোরায় নৈবেদ্য সাজানো।—কোনোটায় লাপসীর মতো দুধের সঙ্গে যবের ছাতু ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে। কোনোটায় গাছের বীজ ভুরবাতে মধুর-চিনি মাখানো নাড়ু। কয়েকটা আস্ত-আস্ত পাহাড়ে ফল। ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা লাফাইয়া পড়িল নৈবেদ্যগুলির উপর। পূজারী ভোগ দিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেখানে জাগিয়া বসিয়াছিল একটি ভুটানী কুকুর। লোকগুলোকে দেখিয়া কুকুরটা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওদিকে পূজারীও হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। যাহা পারিল তাহা নিয়া একটু সরিয়া গেল তিন জনে। পূজারী ক্রোধে

অধীর হইয়া বলিতেছেন—কে ধর্ম্মহীন অনাচারী দেবীর ভোগে বাধা দিলি? তিন বন্ধু চোখে-চোখে কি ইসারা করিল।···কুকুরটা টাসীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়···তার টুঁটি ছিঁড়িয়া দিবে। রামিয়া আর শঙ্কর দুইটা পাথরের ডেলা নিয়া কুকুরটার মাথায় এত জোরে ছুড়িয়া মারিল যে, তার মাথা ফাটিয়া ঘিলু বাহির হইয়া গেল। তারপর বাঘের মতো হেমঙ্করের উপর লাফাইয়া পড়িল সবাই এক সঙ্গে। তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল পাহাড় থেকে। তিনি জয়ন্তীর ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া গেলেন। কুকুরটা মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে উপরের পাহাড়ে উঠিতেছিল। সে মহাকালের মন্দিরে যাইতেছিল তার প্রভু হত্যার কথা জানাইতে ঐ তিব্বতী লামাবাবার কাছে। কিন্তু অতো দূর যাইতে পারিল না। কিছু দূর গিয়া একটা মরণ-ডাক ডাকিল। তারপর ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

তিব্বতী লামা মহাকালের পূজা শেষে তখন ঘটের মধ্যে আকাশ-গঙ্গার জলধারা ভরিয়া নিতেছিলেন। তাহা দিয়া দেবতার মাথায় শেষ অর্ঘ্য ঢালিয়া দিয়া যাইবেন বলিয়া। মহাকালী মন্দিরেও যেমন, মহাকাল মন্দিরেও সেইরূপ পাহাড় পথে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া পড়ে বিগ্রহের মাথার উপর সদা সর্ব্বদা ঐ আকাশ গঙ্গা হইতে। লামার হস্তস্থিত পাত্রটি কাঁপিয়া উঠিল নিচে মহাকালী মন্দিরের কুকুরটির মরণ চিৎকারে। বিপদের সঙ্কেত পাইয়া তিনি নিচে চাহিয়া দেখিলেন হেমঙ্করের দেহ নদীর আবর্ত্তে গিয়া পড়িয়াছে। সেখান হইতে দেখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না কোনো আততায়ীকে। বিচিত্র ভাষায় তিনি কি সব মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে ক্রোধে লাফাইতে লাগিলেন। তাঁর কেশপাশ, হাড়ের মালা, আর চামড়ার আলখাল্লা, যেন ঝড়ের বেগে উঠিতে-পড়িতে লাগিল। তিনি অভিশাপ দিতে লাগিলেন—হেমঙ্করের হত্যাকারী পালিয়ে গেল বটে আমার কবল থেকে, কিন্তু আমার অভিশাপ তাদের পাছু-পাছু ছুটবে···যেমন কোরে হেমঙ্করকে তারা মারলে, তেমনি কোরেই তারা মরবে ঠিক শিয়াল-কুকুরের মতো···কল্পনা কোরতে পারেনি এমনি অস্বাভাবিকভাবে! চোখ দুইটা তাঁর জবাফুলের মতো লাল হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে পাইলে ঐ আততায়ীগুলোকে ছিঁড়িয়া ফেলিতেন এমনভাবে দাঁত কড়মড় করিয়া বিকট ভঙ্গী করিতেছেন। তিনি মন্দির মধ্যে গিয়া তুমুল রবে দামামা বাজাইতে লাগিলেন। পাহাড়ীয়া একটা দারুণ বিপদের আশঙ্কায় সাজ-সাজ রব তুলিল। ওদিকে পলাতক সেই লোক তিনটার অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল। দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহারা নৌকায় আসিয়া বসিল। কোথায় পড়িয়া রহিল সেই সব চালের বোঝা, তাহা দেখিবার অবসর মিলিল না। তখন প্রাণ বাঁচানো সবার আগে···।

তারা পলাইতেছে···কানে বাজিতেছে লামার অভিশাপ—মরবে তারা কুকুর-শিয়ালের মতো···কল্পনা করতে পারেনি এমনি অপমৃত্যু হবে।

তারা নৌকা ফেলিয়া দৌড়িতে লাগিল যে যাহার দেশের দিকে। সকলেই পাছু ফিরিয়া চাহিতেছে—বুঝিবা লামা আসিতেছে তাড়া করিয়া!

কয়েক মাস কাটিল, ব্যবসাদাররা আবার আপন আপন ব্যবসায় লাগিয়া গেল। টাসী ভুটিয়া আবার চাল নিয়া জয়ন্তী পাহাড়ে ব্যবসা শুরু করিল। চাল দিয়া সেখান হইতে কস্তুরী প্রভৃতি আনিয়া বেশ দুই পয়সা লাভ করিতেছে। কিছুদিন পরে সে চাল কেনার কাজে রামিয়া পাহাড়ীর গ্রামে আসিয়া পড়িল। পাতলাখাওয়া গ্রামে রামিয়ার বাস ছিল। ভীষণ জঙ্গল···হাতী, গণ্ডার, বাঘেভরা গ্রামখানা। রামিয়া এই সব জন্তুর চামড়ার ব্যবসা করিত। চামড়া বিক্রী করিয়া সে হলদিবাড়ি, মাথাভাঙা প্রভৃতি স্থান হইতে চাল, পাট, তামাক নিয়া আসিত। টাসী তার নৌকাখানি তোড়সা নদীর ধারে বাঁধিয়া পাতলাখাওয়ায় নামিল। গ্রামের লোকরা নদী থেকে খেপ্‌লা জাল দিয়া ছোট ছোট মাছ ধরিতেছে। একটা জেলে প্রায় একমণ ওজনের একটা পুঁঠিতোড় মাছ তুলিয়াছে। টাসী খুঁজিতে খুঁজিতে রামিয়া পাহাড়ীর বাড়িতে চলিয়াছে। তার চোখে পড়িল জঙ্গল থেকে বনফুলের স্তবক হাতে বাহির হইতেছে ভস্মাচ্ছাদিত গোলাপের মতো একটি তরুণী। চোখের জলে তার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। টাসীর কি ইচ্ছা হইল ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে—বন্ধু রামিয়ার কথাটা। টাসীর প্রশ্ন শুনিয়া শোকে ভাঙিয়া পড়িল তরুণীটি। টাসীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এই

স্ত্রীলোকটিই রামিয়ার স্ত্রী কুমদি। রামিয়া তার স্ত্রীর নাম এবং রূপের কথা বন্ধুদের কাছে প্রায়ই বলিত। কুমদি রাস্তার উপরেই বসিয়া পড়িল। সে বলিতে লাগিল—সে তার স্বামীর জন্ম ভিটায় রোজ সকালে বনফুলের স্তবক দিতে যায়, আজও সেখানে যাইতেছিল। কি সুন্দর ঘর-দোর করিয়াছিল তার স্বামী। তার মনটি ছিল যেমন সুন্দর, তার রুচিও ছিল তেমনি সুন্দর। কুমদি বলিল—আমরা দু'জনকে দু'জনে কতো যে ভালোবাসিতাম, কিন্তু কাল হইল একজন বাঙালী ভাটিয়া বাবু। সে এই জঙ্গলের ইজারা নিয়াছিল। সে আমাকে কত যে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিত। একদিন সে আমার স্বামীকে বলিল—তোকে এই জঙ্গল ছেড়ে চলে যেতে হবে তোর স্ত্রীকে আমার সেবার জন্ম রেখে, নইলে জ্বালিয়ে দেবো তোর ঘরবাড়ী। আমরা ভয় খাইয়া গেলাম। গ্রামের লোকদের সব কথা বলিলাম। গ্রামের লোকরাও খুব ভয় করিত এই ভাটিয়াকে। তার বাঘ-মারা বন্দুক, আর কোমরে ঝোলানো ভুজালী—যে দেখিত সেই ভয়ে তাকে পথ ছাড়িয়া দিত। এই ভাটিয়া ছোকরা-বাবুর প্রাণের ভয় ছিল না। সে বুনো হাতীর দলের ভিতর দিয়াও তার কাঠের কুলীদের নিয়া আসিত বন্দুকের আওয়াজ করিতে করিতে। একবার সে ঘন জঙ্গলে গিয়াছে, কয়দিন নিশ্চয় ফিরিবে না ভাবিয়া আমার স্বামী গস্ত করিতে বাহির হইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল খুব শীঘ্রই ফিরিব···তোমার জন্ম বলিয়া গেলাম গ্রামের মোড়লকে···সে তোমার উপর নজর রাখিবে। আমি তাকে বেশি বাধা দিতেও পারিলাম না···অনেকদিন বসিয়া আছে। তোড়সা নদীতে ডিঙি ভাসাইয়া সে বলিল—অন্য কোন গ্রামে পালানো যায় তারও খোঁজ নিয়া আসিব, আর এ গ্রামে থাকা নয়। চার-পাঁচ দিন না যাইতেই দেখিলাম সেই ভাটিয়া বাবু আমার ঘরের চারিদিকে বন্দুক ঘাড়ে নিয়া ঘুরিতেছে। গ্রামের মোড়লকেও খবর দিলাম। তারপর আর তার খোঁজ পাইলাম না সাত-আট দিন। সে যে নদীর ঘাটের জঙ্গলে ওৎ পাতিয়া বসিয়া [illegible]ছে আমার স্বামীর প্রাণ নিতে তখন তাহা কে জানি[illegible]বার শোকে ভাঙিয়া পড়িল কুমদি। [illegible] ইয়া নিয়া বলিতে লাগিল—একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমার স্বামী নৌকা ভিড়াইতেছে নদীর ঘাটে, গ্রামের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমিও তখন নদীতে জল আনিতে গিয়াছি···দড়াম্ দড়াম্ করিয়া দুইটা গুলির আওয়াজ হইল···আমার স্বামীর বুকে পিঠে গুলি বিঁধিয়াছে। চিৎকার করিয়া উঠিলাম আমরা। দেখা গেল বাঘের মতো ছুটিয়া আসিতেছে ভাটিয়া বাবু। সে ভুজালী দিয়া আমার স্বামীর গলায় চোট বসাইয়া দিল। গ্রামের লোক আসিয়া ঝাপটাইয়া ধরিল ভাটীয়াকে। তাকে মারিতে মারিতে দেশ ছাড়া করিল···আমি অনাথ হইলাম।

কুমদি কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

বন্ধু রামিয়ার পরিণাম শুনিয়া টাসী ভুটিয়া খুব দমিয়া গেল। তাহার কৌতূহল হইল শঙ্কর কোচ কোথায় ও কেমন আছে তার খোঁজ নিতে হইবে। সে কুচবিহারের দিকে চলিল। শঙ্করের গ্রামে অনেক খুঁজিল··· শঙ্করের ভাগ্নের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল মাস দুই আগে শঙ্কর তুলার ব্যবসা করিতে সঙ্কোশ নদীতে আসামের দিকে ডিঙি ভাসায়। সেখানে তার একজন আহোম বন্ধু জুটে। আহোম তাকে কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষপুরে ভুলাইয়া লইয়া যায়। নরক রাজার রাজ্য বলিয়া ভুটিয়ারা যেমন ভয় করে, কোচরাও তেমনি ভয় করে এই কামরূপকে। আহোমটা যে প্রতিবার কামরূপে আসে, আর হিরণা কামরূপিনীর কাছে দু'তিন মাস কাটাইয়া যায়, তাহা শঙ্কর জানিত না। আহোম শঙ্করকে হিরণার কাছে আনিল, হিরণা তনু-মন-প্রাণ দিয়া দুই দিনেই শঙ্করকে ভেড়া বানাইয়া ফেলিল। আহোম একদিন হিরণাকে বলিল—এইবার তুমি আমার সঙ্গে আমার দেশে চলিয়া যাইবে বলিয়াছিলে, কিন্তু দেখিতেছি ভারি জমিয়া গেলে এই শঙ্কর কোচটাকে নিয়া! হিরণা বলিল—কোচটাকে মারিয়া ফেল তো··· সেই তোমার সঙ্গে আমার যাইবার বাধা হইয়াছে। হিরণার সঙ্গে আহোমের পরামর্শ হইয়া গেল—সেই রাত্রেই শঙ্করকে কামাখ্যার গুহায় ফেলিয়া পাথর চাপা দিয়া মারিবে···গুহা থেকে তাকে ব্রহ্মপুত্রে ফেলিয়া দিবার ভার হিরণার···তারপর দু'চারদিন আহোম কোথাও গা ঢাকা দিয়া থাকিবে···শেষে দু'জনে আসামে পলাইবে। আহোম

ঠিক কথামত কাজ করিল···সেই রাত্রেই শঙ্করকে গুহায় ফেলিয়া দমবন্ধ করিয়া মারিল। তারপর হিরণা কি করে তাই দেখিতে সে হিরণার বাড়ির আশে-পাশে রাত্রে অনেক ঘোরাঘুরি করিতেছিল। হিরণার বাড়িতে বাহিরের দোর বন্ধ···বাড়ির মধ্যে হাসির হররা উঠিয়াছে। তার ভারি সন্দেহ হইল। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল ভিতরে কাহারা কি বলিতেছে। দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল দুইজন কামরূপীকে হিরণা খাওয়াইতেছে···কি চটুল তার চাহনি! কামরূপীদের সে বলিতেছে—আহোমটা তার প্রাণের বন্ধুটাকে কিভাবে খুন করিয়া গা ঢাকা দিয়াছে··· তোমরা না থাকিলে লাসটাকে নদীর জলে ফেলাই হইত না···আর লোকে শেষে আমাকেই খুনের দায়ে ফেলিত··· আহোমটাকে এইবার তোমরা ধরিয়া ফেল, নইলে শেষে আমাকেই-সে খুন করিয়া না ফেলে! একজন কামরূপী বলিল—কেন তোমার তো খুব ভালবাসার লোক ঐ আহোমটা, এবার আবার কোচটাকেও জুটিয়ে এনেছিল··· দু'জনেরই সব কিছু তো লুটলে···আবার দুটোকেই খতম কোরতে চাও কেন? হিরণা বলিল—বাড়াবাড়ি করছে যে···কামরূপিণীদের চেনে না···বিদেশী পেলেই তো আমরা ভেড়া বানিয়ে নিই!

রামিয়ার ভাগ্নে তারপর বলিল—সেই আহোমটা আমাদের কাছে আসিয়া এই সব কথাই জানাইয়া গেল। হিরণার ঐ রকম কথা শুনিয়া আর সে একদণ্ডও সেখানে দাঁড়ায় নাই। বনের পথে ছুটিতে ছুটিতে সে পলাইয়া আসে। সে বলিল—তোমার মামার মতো আমি অতো কাছা-আলগা ছিলাম না···বেশির ভাগ টাকা-কড়িই একটা গাছের কোটরে লুকাইয়া রাখিতাম···তাই নিয়া পলাইয়া এলাম···আসবার সময় মনে বড় দুঃখ হইল··· ভাবিলাম তোমার মামার প্রাণটা নিলাম মিছামিছি একটা কুহকিনীর কথায়···কুকুরে-শিয়ালে খাইবে তার দেহটা, কোনো সদ্গতি তো হইবে না তার···তাই তার মাথাটা কাটিয়া আনিয়াছি এই বলিয়া ঐ আহোমটা মামার মাথাশুদ্ধ থলেটা আমাদের দিয়া গেল। ঐ দেখুন আমরা মামার মাথাটা ঐখানে পুঁতিয়া সমাজ দিয়াছি।

টাসী ছুটিয়া দমিয়া গেল তার দুইজন বন্ধুর এইভাবে অপমৃত্যুর খবর শুনিয়া। সে বুঝিল এইবার তার পালা··· লামার অভিশাপ ফলিবেই ফলিবে। রামিয়ার ভাগ্নে তখন বলিতেছিল—মামা এবার জয়ন্তী পাহাড় থেকে আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—আর পরস্ত্রীর পাছু পাছু ঘুরিবে না··· এ দোষ তার চিরদিন ছিল। কিন্তু টাসীর কানে সে সব কথা বড় একটা যাইতেছিল না। টাসী ভাবিতেছিল কোথায় সে যাইবে, কোথায় গেলে প্রাণে বাঁচিবে। সে যাইবার জন্য উঠিল, কিন্তু রামিয়ার ভাগ্নে তাহাকে বলিল—যখন এদেশে এখন আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন এখানকার শিবরাত্রির উৎসব পর্য্যন্ত থাকিয়া যান, এখানকার এইতো আমাদের প্রধান উৎসব। টাসী শিবরাত্রি পর্য্যন্ত কুচবিহারে থাকিয়া যাইতে রাজী হইল। সে কুচবিহারের শিব 'বানেশ্বরের' উদ্দেশে মানত করিল—খাসী দিয়া তোমার ভোগ দিব ঠাকুর···অপমৃত্যুর হাত হইতে আমায় বাঁচাইও। রামিয়ার ভাগ্নের আগ্রহে সে তার কাছেই থাকিয়া গেল।

কুচবিহার বসন্তোৎসবে মাতোয়ারা। প্রথমেই মদন-মোহনের বসন্তোৎসব···দোলযাত্রা। তারপর হইবে শৈব বসন্তোৎসব শিবরাত্রি। রাজবাড়ির মদনমোহন, দোলের সময় বানেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করিতে নিজে চলিয়াছেন চতুর্দ্দোলে চড়িয়া। শিবের প্রতিভূ রাজবাড়িতে না আসিলে মদনমোহনের দোল বসে না। যেন শিবই এখানকার আদি দেবতা, কৃষ্ণঠাকুর আগন্তুক। কোচদের শিবগোত্র। দোলের উৎসব চাপা পড়িয়া যায় শিবের উৎসবে। শিবকে নিয়া হিন্দুস্থানময় অন্ত্যজদের মাতামাতি হয় এই সময়। কিন্তু কোচদের বীভৎসতা সব দেশকে হার মানাইয়াছে। শিবের কাছে জীবহত্যা করে ইহারা কোন তন্ত্রের দোহাই দিয়া—তাহা ইহারাই বলিতে পারে। হত্যা করাও হয় না, মাথা ছেঁচিয়া মারা হয়।—সেই শিবরাত্রি আসিল।

হাজার-হাজার লোক শিবের মানসিক-করা খাসীর মাথা ঠুকিয়া আধমরা করিয়াছে···পশুগুলি মরণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে···সেই রক্ত শিবের মাথায় দিতে হইবে। পাতালের গহ্বরে শিব থাকেন। লোকে হুড়াহুড়ি করিতেছে আগে যাইতে। পশুর পা চারিটা হাতে ঝুলানো সবারই। কারো সবাই বেহোঁস হইয়া আছে। সুযোগ বুঝিয়া একদল লোক খাসীগুলো কাড়িয়া নিয়া

পলাইতেছে। টাসীর থাসীটাও কে কাড়িয়া লইল। ছোট মন্দির দ্বার দিয়া ভিতরে ঢোকে কার সাধ্য। ওদিকে মন্দির হইতে প্রবল শব্দে ঘণ্টাধ্বনি উঠিয়াছে। টাসী রাগে পাগল হইয়া গিয়াছে। সে যাহাকে পাইতেছে কিল চড় মারিতেছে। তারপর সে চিৎকার করিতে লাগিল—কে কোথায় আছ ভুটিয়া বন্ধুসব, এসো আমায় সাহায্য করো···শিক্ষা দিতে হবে এই সব কোচদের। সত্যই একদল ভোট্ কুরথি ছুড়িতে লাগিল। ওদিকে কোচদের লাঠি চলিতেছে। রক্তগঙ্গা বহিল। হঠাৎ রামিয়া কোচের ভাগ্নের হাতের লাঠি স্তব্ধ হইল। তার হাতের লাঠি খাইয়া একটা লোক তার পায়ের তলায় ধুঁকিতেছে। রামিয়ার ভাগ্নে চিৎকার করিয়া বলিল—থামো···থামো সবাই একটু···শেষে আমার লাঠিতেই টাসীভুটে মরিল না'কি? টাসী একবার চোখ মেলিয়া চাহিল···তারপর সেই যে চোখ বুঁজিল, সেই শেষ।

আমরা অর্থাৎ শ্রোতার দল একবাক্যে বলিলাম—তারপর···তারপর?···লামার শাপ দেখছি হাতে হাতে লেগে গেল সব ক'জনার।

পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে সেদিন কুচবিহার রাজ্য মিলিয়া গেল। আমরা কয়জন বাঙালী বন্ধু ক্লাবে বসিয়া খুব আনন্দ করিতেছিলাম। আমাদের মধ্যেই একজন তখন এই গল্পটি বলিতেছিলেন।

আমরা বলিলাম—ভুটিয়ারা নিশ্চয় টাসীর দেহটা নিয়া ধুমধাম সহকারে সৎকার করিল।

বক্তা বলিলেন—গুজব শোনা যায় ভুটিয়ারা মহাকাল মন্দিরে লামার কাছে টাসীর শবটা নিয়া হাজির করে। লামার রাগ পড়িয়া গেল···তিন-তিনটে লোক অপমৃত্যুতে মরিল তাঁর শাপে।

লামা সেই সময়েই বলিয়াছিলেন···দুশো বছর পরে বাঙালীরই হইবে কুচবিহার···যত সব বড় বড় লামা-দীপঙ্কর হেমঙ্কর সবাই বাঙালী···তারা কুচবিহার দিয়াই তিব্বতে চীনে গিয়াছিলেন—তাঁদের পায়ের ধুলো মাখানো কুচবিহার তাঁহাদেরই হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয়করণ

অধ্যাপক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ই-এস্, এ-আই-বি

ফিলিপিন

১৯৪৮ জুন মাসে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠানরূপে এক কোটী পিসো মূলধন লইয়া ফিলিপিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য হইতেছে (ক) ফিলিপিন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মুদ্রা মূল্যের সমতা রক্ষা, (খ) পিসোর আন্তর্জাতিক মুদ্রামূল্যের সমতা রক্ষা এবং যাহাতে পিসো অন্যান্য দেশের মুদ্রায় সহজে পরিবর্ত্তিত হয় তাহার ব্যবস্থা এবং (গ) দেশের উৎপাদন, শ্রমিক নিয়োগ ও প্রকৃত আয় যাহাতে বাড়ে সেই সকল বিষয়ে সহায়তা করা। সাত জন সদস্যকে লইয়া একটি মুদ্রা সংসদ (Monetary Board) এই ব্যাঙ্ক পরিচালন করিবেন। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রের অর্থসচিব (সভাপতি রূপে), ফিলিপিন জাতীয় ব্যাঙ্কের সভাপতি, আর্থিক উন্নয়ন সংসদের সভাপতি ও রাষ্ট্রের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত চারি জন সভ্য থাকিবেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই শতকরা ১০০ ভাগ রিজার্ভ রাখিয়া কাগজী মুদ্রার সম্প্রসারণের যে কড়া ব্যবস্থা ছিল তাহাও শিথিল করিয়া যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম রিজার্ভে মুদ্রা সম্প্রসারণ হয় তাহা করা হইয়াছে। কাগজী মুদ্রা পরিচালন ও ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ও অন্যান্য ব্যবস্থার সাহায্যে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট্ নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে। এরূপ ভাবে এই ব্যাঙ্কটী গঠিত হইয়াছে যে সরকারী আর্থিক নীতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালন পদ্ধতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগ ও সমন্বয় সম্ভব হয়।

পাকিস্থান

অনেকটা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুকরণে, করাচীতে হেড আপিস করিয়া, ১৯৪৮, ১লা জুলাই হইতে ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অব্ পাকিস্থান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। ব্যাঙ্কের মূলধন তিন কোটি টাকা, ইহার মধ্যে শতকরা ৫১ ভাগ গবর্ণমেণ্ট ও ৪৯ ভাগ সাধারণ অংশীদারগণ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট, সিকিউরিটী দ্বারা তিন কোটী টাকার রিজার্ভ যোগাইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক পাকিস্থানের মুদ্রামূল্য রক্ষা করিবে এবং দেশের জনগণের জন্য মুদ্রা ও ক্রেডিট্ সম্পর্কিত সকল কার্য্যই করিবে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার হইবে এই ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক। একটী কেন্দ্রীয় বোর্ড এই ব্যাঙ্ক পরিচালন করিবেন

—ইহাতে গবর্ণর ও ডেপুটী গবর্ণরকে লইয়া আট জন সভ্য থাকিবে—সরকার মনোনীত করিবেন পাঁচ জন এবং অংশীদারগণ নির্ব্বাচন করিবেন তিন জন। ইহা ব্যতীত আঞ্চলিক পরামর্শ সভার ব্যবস্থাও আছে।

জার্ম্মানী (সোভিয়েট অংশ)

১৯৪৬ সনে জার্ম্মানীর সোভিয়েট এলাকায় পাঁচ বিভাগে পাঁচটী কাগজী মুদ্রা পরিচালন ও ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৯৪৮ মে মাসে সমগ্র রুশ অধিকৃত এলাকার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য চালাইবার জন্য জার্ম্মাণ ইস্যু এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক (Dentsche Emission and Girobank) স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরই জুলাই মাসে এই ব্যাঙ্ককে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক অব ইস্যুতে (Dentsche Notenbank) পরিবর্ত্তিত করা হয়। ব্যাঙ্কের মূলধন করা হয় দশ কোটী ডট্‌সে মার্ক (DM)—ইহার সাড়ে পাঁচ কোটী মার্ক সোভিয়েট সামরিক সরকার নিয়ন্ত্রিত কতগুলি সরকারী ডিপার্টমেণ্ট সরবরাহ করিয়াছে এবং বাকি অংশ পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী বিভাগীয় ব্যাঙ্ক যোগাইয়াছে। বলা হইয়াছে যে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্ব্বপ্রকারে দেশের আথিক উন্নয়নে সাহায্য করিবে এবং অন্যান্য লেণ্ডার ব্যাঙ্ক ও জার্ম্মানীর ও বিদেশের অন্যান্য এলাকার আর্থিক বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবে। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাধারণ পরিচালন এবং নীতি নির্দ্ধারণ করে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ ও নীতি কার্য্যে পরিণত করে বোর্ড অব ম্যানেজাররা। ডাইরেক্টর বোর্ডের মোট সভ্যসংখ্যা সতের জন—আট জন গবর্ণমেণ্টের বিভাগীয় কর্ম্মকর্ত্তা—সভাপতি আয় ব্যয় বিভাগের চেয়ারম্যান স্বয়ং। ম্যানেজার-বোর্ডের সভ্যসংখ্যা মোট পাঁচ জন—সভাপতি ও সহ-সভাপতি নিযুক্ত হয় জার্ম্মাণ আর্থিক কমিশন কর্ত্তৃক ও অপর তিন জন সভ্য ডাইরেক্টর বোর্ড মনোনীত করেন।

কিউবা

১৯৪৮, ৩০মে কিউবার গবর্ণমেণ্ট একটী আইন পাশ করিয়া একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (Banco Nacional de Cuba) প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক সরকারের নিকট হইতে কাগজী মুদ্রা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং মুদ্রা ও ক্রেডিট্ বিষয়ে যাহাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি মান্য হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ঐ আইনেই কিউবার পিসো মুদ্রাকে দেশে একমাত্র আইনসম্মত টাকা বলিয়া গণ্য করা হইবে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের ডলার এক বৎসর পর্য্যন্ত আইনতঃ দেশের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণীয় হইবে। কিউবার পিসোর বিনিময় মূল্য যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের সমান করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূলধন পঞ্চাশ লক্ষ পিসো—গবর্ণমেণ্ট এই মূলধনের বেশী অংশ সরবরাহ করিয়াছে, বাকী অংশ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি দিয়াছে। ব্যাঙ্কের পরিচালন ভার পাঁচ জন ডাইরেক্টরের উপর ন্যস্ত। ইহাদের তিন জন (সভাপতি সহ) গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিবেন।

রুমানীয়া

১৯৪৮ সনের শেষের দিকে রুমানিয়ার জাতীয় ব্যাঙ্কের (Rumanian National Bank) পুনর্গঠন হয়। ইহার নূতন নাম দেওয়া হয় "The Bank of the Rumanian People's Republic, State Bank"। এই নূতন ব্যাঙ্কে মূলধন দুই শত কোটী লি (Lei) এবং ইহার সভাপতি সরকারী অর্থদপ্তরের মন্ত্রী। যে সকল প্রতিষ্ঠানে এই ব্যাঙ্ক অর্থ নিয়োগ করিবে তাহা ইহার পরিচালনাধীন হইবে।

বেল্‌জিয়ম (জাতীয়করণ)

১৯৪৮ জুলাই মাসে বেলজিয়ম জাতীয় ব্যাঙ্কের মূলধন আইন দ্বারা দ্বিগুণ করা হয় এবং এই নূতন অংশ (সেয়ার) গুলি গবর্ণমেণ্ট হস্তান্তরের অযোগ্য করিয়া নিজেই গ্রহণ করে। আইনের সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ঘোষণা দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বেলজিয়ম জাতীয় ব্যাঙ্কের স্বাধীনতা ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালন যাহাতে ব্যাহত না হয় তদ্বিষয়ে সরকার যত্নবান হইবেন।

নেদারল্যাণ্ডস্ (জাতীয়করণ)

১৯৪৮ সনের ১লা আগষ্ট হইতে নেদার ল্যাণ্ডসের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ অংশীদার যে এক কোটী ফ্লোরিণ মূল্যের অংশের মালিক ছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহা নিজে গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বার্ষিক ২৲ টাকা সুদের গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি প্রদান করিয়াছেন। প্রতি ১০০ ফ্লোরিণ সেয়ারের জন্য অংশীদার ২০০ ফ্লোরিণ মূল্যের গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি পাইয়াছেন।

ভারতবর্ষ (জাতীয়করণ)

১৯৪৮, ৩রা সেপ্টেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া (ট্রান্সফার টু পাব্‌লিক্ ওনারসিপ্) আইন পাশ হয়। এই আইনের বলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৪৯, ১লা জানুয়ারী হইতে সরকারী ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। প্রত্যেক ১০০৲ টাকার অংশের জন্য গবর্ণমেণ্ট অংশীদারকে ১১৮৸৴০ হিসাবে ক্ষতিপূরণ করেন। তবে এই টাকার বদলে অংশীদারগণকে প্রত্যেক ১০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে বার্ষিক তিন টাকা সুদের একখানি করিয়া গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি দেওয়া হয় এবং এক শত টাকার ভগ্নাংশ নগদে দেওয়া হয়। জাতীয় করণের পর ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে নূতন ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী (ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা ও দায়িত্ব খুবই বাড়িয়াছে। পরিচালন ব্যাপারে এখন কেন্দ্রীয় বোর্ডের গবর্ণর, দুই জন ডিপুটি গবর্ণর, দশ জন ডাইরেক্টর এবং একজন সরকারী কর্ম্মচারী সকলেই গবর্ণমেণ্ট মনোনীত। স্থানীয় বোর্ডগুলিতেও সকল সভ্যই গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করেন।

সোপেনহরের দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(১) জগৎ-প্রত্যয়-মূল

সোপেনহরের "The world as will and idea" নামক বৃহৎ গ্রন্থে ব্যাখ্যাত দর্শনের মর্ম্ম সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কয়েকটি বাক্যে প্রকাশ করা যায় :

"জগৎ ইচ্ছা-শক্তির ব্যক্ত রূপ। ইচ্ছাশক্তি অন্ধ, চৈতন্যহীন, কিন্তু মানুষরূপে অভিব্যক্ত হইবার সময়ে ইহার সহিত চৈতন্য যুক্ত হইয়াছে। ইচ্ছা জগতের মূল বলিয়া জগতের সর্ব্বত্র দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। সেইজন্য জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় জ্ঞানলাভ করিয়া ইচ্ছার দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করা।"

সার্দ্ধ দ্বি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গৌতম বুদ্ধ দুঃখের কারণ-অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া এই সত্যই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার "তৃষ্ণা" অথবা কামনা এবং সোপেনহরের ইচ্ছার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। কিন্তু ইয়োরোপীয় দর্শনে ইহা অজ্ঞাত ছিল। হয়তো ফিক্‌টের ক্রিয়ারূপী নির্ব্বিশেষ অহমের (absolute will) মধ্যে এই তত্ত্ব লুক্কায়িত ছিল। তাহা হইলেও ফিকটের দর্শনে ইহা বিশদীকৃত হয় নাই। সোপেনহরই ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তথাপি বহুদিন এই দর্শনের সমাদর হয় নাই। দীর্ঘকাল ইহা অনাদৃত ও অবজ্ঞাত ছিল। ইহার কারণ কি?

Will Duranl ইহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণই এই দর্শনের আলোচনা করিতে পারিতেন। ১৮১৮ সালে জার্ম্মান দর্শনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট ছিলেন হেগেল। কিন্তু সোপেনহর তাহাকে আক্রমণ করিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন :

"দর্শন যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এবং জীবিকা-উপার্জ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার বিষম দুর্দিন। প্রবাদ আছে—"প্রথমে বাঁচ, তারপরে দর্শনচর্চ্চা করো।" ইহার প্রতিবাদে কিছুই কি বলিবার নাই? যে সকল ভদ্রলোকের বাঁচিবার ইচ্ছা আছে, দর্শনের দ্বারাই তাঁহারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক। স্ত্রী ও সন্তানসহ তাঁহাদিগকে প্রতিপালনের ভার দর্শনের উপর। "যার নুন খাই, তার গুণ গাই"—একথা সর্বকালেই প্রচলিত আছে। দর্শন-শাস্ত্র দ্বারা অর্থোপার্জন প্রাচীন কালে সোফিষ্টদিগেরই বিশেষত্ব বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে অত্যুত্তম কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান-জগতের ক্যালিবান (Caliban) হেগেলকে কুড়ি বৎসর যাবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া অভিনন্দিত হইতে যিনি দেখিয়াছেন, তিনি সেই যুগের অভিনন্দনের জন্য উৎসুক হইতে পারেন না।...সর্ব্বযুগের অল্পসংখ্যক লোকই সত্যকে সত্য বলিয়া চিনিতে পারে। সুতরাং তাহাদের জন্যই সত্যকে অবিচলিতভাবে বিনয়ের সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে। জীবন অল্পস্থায়ী; কিন্তু সত্য সুদূরপ্রসারী। আমরা সত্যই বলিব।"

সোপেনহরের এই উক্তি সম্বন্ধে Will Duranl বলিয়াছেন— "শেষের কথাগুলি মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে (ইসফ্‌এর গল্পের শৃগালের) দ্রাক্ষাফলের অম্ল আস্বাদ আছে। প্রশংসার জন্য সোপেনহর অপেক্ষা অধিকতর লালায়িত আর কেহ ছিল না।... সোপেনহর বিনয়ের সহিত অপেক্ষা করার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—"দর্শনশাস্ত্রে ক্যাণ্টের পরে আমার পূর্ব্বে অন্য কেহ কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমি দেখিতে পাই না। "জগৎ "ইচ্ছা"র প্রকাশ" বহুদিন যাবত দর্শনে এই সত্যেরই অনুসন্ধান চলিয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাহারা পরশ পাথরের আবিষ্কারের মত এই সত্যের আবিষ্কারও অসম্ভব বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। একটি মাত্র কথাই আমি বুঝাইতে চাহিয়াছি—কিন্তু তাহার জন্য এই সমগ্র গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়াছে।...গ্রন্থখানা দুইবার পাঠ করুন; প্রথমবার পাঠে বিশেষ ধৈর্য্যের প্রয়োজন হইবে।" ইহা হইতেই সোপেনহরের বিনয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়! এই বিনয় সম্বন্ধেই তিনি লিখিয়াছেন—"বিনয় কাহাকে বলে? ইহা কপট দৈন্য প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঈর্ষ্যাপূরিত জগতে ইহা দ্বারাই লোকে গুণহীনদিগের নিকট আপনার গুণ ও কৃতিত্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বিনয় গুণ বলিয়া গণ্য হওয়ায় মূর্খদের সুবিধা হইয়াছে। কেননা এই গুণের অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবার জন্য প্রত্যেক লোককেই আপনাকে মূর্খ বলিতে হয়।"

সোপেনহর অন্যত্র লিখিয়াছিলেন—"আমাদের জার্মান দর্শনে "বুদ্ধির অব্যবহিত জ্ঞান" (Intellectual intuition) এবং নির্বিশেষ চিন্তা (absolute thinking) সুস্পষ্ট প্রত্যয় এবং অকপট গবেষণার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পাঠককে ফাঁকি দেওয়া, তাহাকে দিশাহারা এবং হতবুদ্ধি করা এবং নানাবিধ কৌশলে তাহার চোখে ধূলি দেওয়া—ইহাই এখন আমাদের অবলম্বিত প্রণালী। সত্যের স্থলে ইহাই আমাদের দার্শনিকদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার ফলে দর্শন (যদি ইহার পরেও তাহাকে দর্শন বলা চলে) ক্রমাগত নিম্নে নামিয়া গিয়াছে; অবশেষে হেগেল হীনতার নিম্নতমস্তরে গিয়া উপনীত হইয়াছেন। ক্যাণ্ট চিন্তায় যে স্বাধীনতার উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার শ্বাসরোধের জন্য প্রজ্ঞার দুহিতা এবং সত্যের ভাবী মাতা দর্শনকে

হেগেল আলোক ও উন্নতির শত্রু এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট জেসুইটদিগের হাতের অস্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু এই হীন কার্য্য গোপন রাখিবার জন্ত এবং মানুষের বুদ্ধি বিকল করিবার জন্ত, দর্শনের উপর শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর এবং অর্থহীন খিঁচুড়ীর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। বেড্‌লামের বাহিরে এরূপ বাগাড়ম্বর ও খিঁচুড়ীর কথা শোনা যায় নাই।"

"জগৎ আমার প্রত্যয়"—এই বাক্য দ্বারা সোপেনহরের গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে নূতনত্ব ছিল না। ক্যাণ্ট এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। যাহাকে বাহ্য জগৎ বলি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে আমাদের মনে তাহার জ্ঞান হয়। বিস্তারিতভাবে সোপেনহর এই মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাহার মৌলিক চিন্তার কোনও পরিচয় ছিল না। তাহার মৌলিক চিন্তা ছিল পুস্তকের শেষের দিকে। সোপেনহরের সত্য পরিচয় পাইতে যে এতদিন লাগিয়াছিল, ইহাও তাহার অন্ততম কারণ।

বিস্তারিত ভাবে সোপেনহর জড়বাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যে জড় দ্বারা জড়বাদিগণ জগতের ব্যাখ্যা করিতে উৎসুক, সেই জড় কি? মন যদি না থাকিত, জড় থাকিত কোথায়? মনঃ দ্বারাই আমরা জড়ের জ্ঞান লাভ করি এবং জড় বলিয়া যাহার জ্ঞান লাভ করি, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যয় ব্যতীত আর কিছু নহে। জড়বাদ প্রাণশক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করে, ভৌতিক এবং রাসায়নিক শক্তির দ্বারা প্রাণের কার্য্যের এবং জড়ের যান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা ভৌতিক এবং রাসায়নিক শক্তির ব্যাখ্যা করে। কিন্তু কোনও রাসায়নিক ক্রিয়াই যান্ত্রিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। আলোক, তাপ এবং তাড়িতের ধর্ম্মের ব্যাখ্যাও যান্ত্রিক নিয়ম দ্বারা অসম্ভব। ইহাদের ব্যাখ্যার জন্ত "শক্তি"র প্রয়োজন। সত্য কি, সৎ পদার্থের স্বরূপ কি, তাহা জানিতে হইলে, যাহা আমরা অব্যবহিত ভাবে জানি, তাহা হইতেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইবে। অব্যবহিতভাবে জানি আমরা আমাদের "স্বয়ং" কে; "বস্তুর বাহির হইতে তাহার অন্তঃস্থ স্বরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যতই অনুসন্ধান করা হউক না কেন, নাম ও রূপ (names & images) ভিন্ন অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। দুর্গপ্রবেশকামী কোনও লোক দুর্গ তোরণের অনুসন্ধানে যখন দুর্গ প্রদক্ষিণ করিয়াও তোরণের সন্ধান পায় না, তখন তাহার যে অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। অভ্যন্তরে প্রবেশে অক্ষম হইয়া তাহারই মতো আমরা বাহিরের নক্‌সা অঙ্কন করি। আমরা যদি আমাদের মনের স্বরূপের সন্ধান পাই, তাহা হইলে সম্ভবতঃ বাহ্য জগতের চাবিকাঠিও প্রাপ্ত হইব।"

যে প্রবন্ধ রচনা করিয়া সোপেনহর "ডাক্তার" উপাধি পাইয়াছিলেন (Four-fold Root of the sufficient Reason) তাহাতে তাঁহার জ্ঞান সম্বন্ধীয় মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সোপেনহরের মতে অবভাস (appearnce) এবং সৎপদার্থের (noumenon) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশই দর্শনে ক্যাণ্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। জগৎ যে অবভাস মাত্র তাহা প্লেটো দেকার্ত্ত লক্ এবং বার্কলে অস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্যাণ্ট তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। সমস্ত জগৎ জ্ঞাতার মধ্যে অবস্থিত, জ্ঞাতাই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু ক্যাণ্টের মতে দুইটি ক্রটী ছিল। সোপেনহর সেই ক্রটীর সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ—ক্যাণ্ট ১২টি Categoryর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একমাত্র কারণ Category হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই "কারণের" (Principlle of ground) চারিটি রূপ :—(১) ভবনের কারণ (ground of becoming, Ratio Fiendi), (২) জ্ঞানের কারণ (Ratio cogno Sciendi), (৩) সত্তার কারণ (Ratio Essendi, ground of being), (৪) কর্ম্মের কারণ (Ratio agendi). দ্বিতীয়তঃ—"ইচ্ছাই" স্বয়ং-সৎ-বস্তু; অন্য কোনও স্বয়ং-সৎ-বস্তু নাই।

জ্ঞানের বিষয়সমূহ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বুদ্ধির নিকট উপস্থিত হয় না—একাধিক বিষয় এক সঙ্গে উপস্থিত হয় এবং একটি অন্য একটির কারণ রূপে গৃহীত হয়। যখনই কোনও পদার্থের জ্ঞান হয়, তখনই কোনও কারণের ফলরূপে তাহার জ্ঞান হয়। ইহাই কারণ তত্ত্বের প্রথমরূপ (Ratio Fiendi)। আবার কোনও বিষয়, যখন মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহা শ্রেণীভুক্ত হয়। অর্থাৎ তাহা পূর্ব্বানুভূত যাহার যাহার সদৃশ, তাহার সহিত এক-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গৃহীত হয়। ইহাই কারণ-তত্ত্বের দ্বিতীয় রূপ (Ratfo cogno sciendi)। ইহা হইতেই চিন্তা করিবার সামর্থ্যের উদ্ভব হয়। (৩) তৃতীয়তঃ—সত্তার কারণ (ground of being Ratio Essendi) জ্ঞানের বিষয় সকল দেশ ও কালে অবস্থিত রূপে প্রতীত হয়। (৪) চতুর্থতঃ—কর্ম্মের কারণ (ground of action agendi Ratio)। আমাদের কর্ম্ম চালিত হয় প্রবর্ত্তনা (motive) দ্বারা প্রবর্ত্তনা হইতেই তাহার উদ্ভব হয়।

সোপেনহর বলিয়াছেন—"এই জগৎ আমার প্রত্যয়", ইহা অপেক্ষা নিশ্চিত সত্য আর—কিছুই নাই। যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়রূপেই তাহার অস্তিত্ব; জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক-বিহীন কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। জগৎ যে প্রত্যয় মাত্র, এই সত্য নূতন আবিষ্কার নহে। ভারতের পণ্ডিতগণ অতি প্রাচীনকালে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্যর উইলিয়াম জোন্‌স্ "On the Philosophy of the Asiatics" প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, যে ব্যাসের বেদান্ত দর্শনে জড়ের অস্তিত্ব—জড়ের কাঠিন্য, অভেদ্যতা এবং স্থানব্যাপী রূপের অস্তিত্ব—অস্বীকৃত হয় নাই (কেননা ইহা অস্বীকার করা বাতুলতামাত্র), কিন্তু জড় সম্পর্কে সাধারণ ধারণার ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং জ্ঞানের বাহিরে জড়ের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সত্তা এবং তাহার জ্ঞানগম্যতা যে অভিন্ন, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।"......প্রত্যয় যেমন এই জগতের একরূপ, তেমনি ইহার অন্যরূপ "ইচ্ছা"। এক দিক হইতে দেখিলে জগৎ প্রত্যয়রূপে প্রতীত হয়। আবার অন্য দিক হইতে ইচ্ছারূপে প্রতীত হয়। যাহা প্রত্যয়ও নয়, ইচ্ছা ও নয়, তাহা স্বপ্নদৃষ্ট ছায়া মাত্র আলেয়ামাত্র।

যাহা সকল বস্তু জানে কিন্তু যাহাকে কেহই জানেনা—তাহা বিষয়ী (subject)। বিষয়ীই জগতের ধারক; তাহাতেই সকল অবভাসের আবির্ভাব হয়। বিষয়ীর সহিত সম্পর্ক-হীন কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই, মানুষের দেহ এই বিষয়ীর বিষয়। জ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের মত দেহও জ্ঞানের সার্বিকরূপ দেশ ও কালের অন্তর্গত; দেশ ও কাল হইতেই বহুত্বের উদ্ভব হয়। কিন্তু বিষয়ী নিজে কখনও বিষয়ে পরিণত হয় না; কখনও বিষয়ীর জ্ঞান কেহ লাভ করিতে পারে না। দেশ ও কালের রূপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বিষয়ীর মধ্যে বহুত্ব নাই। বহুর প্রতিযোগী একত্বও নাই।......সুতরাং প্রত্যয়রূপী জগতের দুই অংশ; প্রথমার্দ্ধ বিষয়ী; দ্বিতীয়ার্দ্ধ বিষয়। দেশ ও কাল এই দ্বিতীয়ার্দ্ধের রূপ। এই জন্যে বহুত্বও তাহার রূপ। বিষয়ী দেশ, কাল ও বহুত্বের অতীত।......প্রত্যেক চিন্তার এই দুই অর্দ্ধ অবিচ্ছেদ্য। এক অর্দ্ধ দ্বারা অন্য অর্দ্ধ ব্যবচ্ছিন্ন।

বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নহে। বস্তুবাদ বিষয়কে বিষয়ীর কারণ বলিয়া গণ্য করে। ফিকটের প্রত্যয়বাদে বিষয় বিষয়ীর কার্য্যে (effect) পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে Principle of sufficient Reason-এর (পর্য্যাপ্ত কারণ তত্ত্বের) কোনও সম্বন্ধই নাই এবং বস্তুবাদ ও প্রত্যয়বাদের কোনওটিকেই সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা অবিনাভাব সম্বন্ধ (correlation)। পর্য্যাপ্ত কারণ তত্ত্ব বিষয়ের মধ্যেই অবস্থিত—তাহাই বিষয়ের রূপ। বিষয়ী ইহার বাহিরে অবস্থিত। বিষয়ীতে এই তত্ত্বের প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং বিষয়ীকে বিষয়ের কারণ বলা যায় না এবং বিষয়কেও বিষয়ীর কারণ বলা যায় না। সন্দেহবাদ (Scepticism) বিষয়ের কারণ রূপে—যে অন্য পদার্থের কল্পনা করে, জ্ঞানের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব নাই—জ্ঞানের বিষয় যে রূপে আবির্ভূত হয়, তাহাই তাহার প্রকৃত রূপ। দেশ ও কালে প্রকাশিত জগৎ মিথ্যা নয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তাহা "প্রত্যয়"—প্রত্যয়রাজির সমাবেশ—তদতিরিক্ত কোনও সত্তা তাহার নাই। "পর্য্যাপ্ত কারণ তত্ত্ব" এই সকল প্রত্যয়ের সংযোগসূত্র।

স্বপ্নের অলীকতা হইতে জগতের বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্ভব হইতে পারে। আমাদের সমগ্র জীবন যে স্বপ্ন নহে, তাহার প্রমাণ কি? বেদে ও পুরাণে স্বপ্নের সঙ্গে জগতের জ্ঞানের উপমা দেওয়া হইয়াছে। এবং জগৎ মায়াজাল রূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্লেটোও অনেক স্থলে বলিয়াছেন—মানুষ স্বপ্নের মধ্যে জীবন ধারণ করে, দার্শনিক এই স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইবার চেষ্টা করেন। পিণ্ডার, সফোক্লস্, ও সেক্স্পিয়ার জীবনকে স্বপ্নের সহিত উপমিত করিয়াছেন। ক্যাণ্ট্ বলিয়াছেন, বাস্তব জীবনে প্রত্যয় সকল পরস্পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ, স্বপ্নে সে সম্বন্ধের অভাব; ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। কিন্তু জাগ্রত অবস্থার সহিত স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার সম্বন্ধ না থাকিলেও, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলির মধ্যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং স্বপ্নও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে জাগ্রৎ জীবনের মধ্যে "পর্য্যাপ্ত কারণ তত্ত্বের সম্বন্ধ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, কোথায়ও তাহার বিচ্ছেদ নাই, কিন্তু স্বপ্নের ঘটনাবলীর মধ্যে এই সম্বন্ধ থাকিলেও, বিভিন্ন স্বপ্নের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ নাই এবং জাগ্রৎ অবস্থা এবং স্বপ্নের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই নিয়মানুসারে কোনও ঘটনা স্বপ্নদৃষ্ট অথবা জাগ্রৎ কালে দৃষ্ট, তাহা নির্ণয় করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে; কেমনা, অতীতের কোনো ঘটনার সহিত বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অনুসরণ করা অসম্ভব হইলেও, ঐ ঘটনাকে আমরা স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়া গণ্য করি না, এবং বাস্তব জীবনে ঐ নিয়মানুসারে আমরা স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করি না। কোনও বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার সময় আমরা জাগরিত ছিলাম কিনা, তাহার দ্বারাই তাহার সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারিত হয়। হব্স্ তাঁহার Leviathan গ্রন্থে বলিয়াছেন—আমরা যখন বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়াই অকস্মাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়ি, তখন স্বপ্নকে সত্য বলিয়া ভুল হয়। বিশেষতঃ জাগ্রত অবস্থায় যে বিষয়ের চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, যখন সেই বিষয়েই স্বপ্ন দেখি, তখন সে স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। তখন যেমন নিদ্রার আগমনও জানিতে পারি না, তেমনি কখন জাগরিত হইলাম, তাহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু জাগরিত হইয়া যদি স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, অথবা উক্ত সম্বন্ধের অভাব কিছুই বোধগম্য না হয়, তাহা হইলে তাহা স্বপ্ন অথবা সত্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যায়। ইহা হইতে জীবন ও স্বপ্নের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। সুতরাং যদিও আমাদের সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী যে কার্য্যকারণ সূত্রে গ্রথিত, তাহাতে বিভিন্ন স্বপ্নের স্থান নাই, এবং স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়াই এই সম্বন্ধের অভাব আমরা বুঝিতে পারি, তথাপি প্রত্যেক স্বপ্নের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীও যখন পারস্পরিক সম্বন্ধে সংযুক্ত, তখন স্বপ্ন ও জাগ্রৎ জীবনের রূপ একই বলিয়া প্রতীত হয়—এবং তাহাদের স্বরূপের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। জীবনের সঙ্গে স্বপ্নের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। উভয়ই একই গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠা। হয়তো জীবন এক দীর্ঘ স্বপ্ন মাত্র।

যে জগৎ আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, তাহার উপাদান "অবভাস"—পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ অবভাস। এই সম্বন্ধ দেশ ও কালের সম্বন্ধ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, সামান্য-বিশেষের সম্বন্ধ এবং প্রবর্ত্তন ও তদুদ্ভূত কর্ম্মের সম্বন্ধ। আমাদের জ্ঞানের মধ্যে জগতের এবম্বিধ রূপের অতিরিক্ত কিছুই নাই। যে কারণ-সম্বন্ধ অন্যান্য সম্বন্ধের মূল, তাহা সূত্ররূপে অবভাসিত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। আমাদের অহংও দেশ ও কালে অবস্থিত রূপেই জ্ঞানের বিষয় হয় এবং ইহাও সংসার অথবা অবভাসিক জগতের অন্তর্গত। কিন্তু অব্যবহিত জ্ঞান (intuitive Knowlede) এই অবভাসিক জগৎ—প্রত্যয় জগৎ ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্তায় (Ready) পৌঁছিতে সমর্থ হয়। এই অব্যবহিত জ্ঞানে জ্ঞাতা (Subject) অব্যবহিত ভাবে (দেশ কাল ও কারণত্ব বর্জ্জিত ভাবে) আপনাকে ইচ্ছা—স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি।

কলিকাতা ও সহরতলীতে বৈদ্যুতিক ট্রেণ

শ্রীনীলিমা মজুমদার বি-এস্‌সি

কলিকাতা ও সহরতলীতে যে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচলের প্রস্তাবনা হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক "Calcutta Terminal Facilities Committee" নামে ১৯৪৭ সালে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বোর্ডকে যথাসময়ে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কমিটীর সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এ সম্বন্ধে কোন সাড়াশব্দও শোনা যাইতেছে না। মনে হয় সরকারের চিরন্তন প্রথানুযায়ী ইহাকেও "কোল্ড ষ্টোরেজে" রাখা হইয়াছে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসাবাণিজ্য, লোকসংখ্যা ও আয়তন হিসাবে কলিকাতা ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম নগরী। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ পর্য্যন্ত এই মহানগরীতে যানবাহনাদির ব্যবস্থা লোক-সংখ্যানুপাতে বড়ই শোচনীয়। যে কোন সময়ে কলিকাতার ট্রাম ও বাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে লোকের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশা চক্ষে পড়ে। ভারতবর্ষের বন্দরসমূহের মধ্যে কলিকাতা বন্দর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই বন্দরে প্রায় এক কোটী টন মাল আমদানী-রপ্তানী হইত। কলিকাতার আয়তন প্রায় ২৮ বর্গমাইল। ১৯২১ সনের সেন্সাসে লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক এগার লক্ষ ছিল। ১৯৪১ সালের সেন্সাসে ইহা বিশ লক্ষের উপর হয়। বর্ত্তমানে হাওড়া ও কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় ষাট লক্ষ। উদ্বাস্তুর আগমনে উত্তরোত্তর ইহা বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। যথাশীঘ্র যদি কলিকাতা ও সহরতলীর মধ্যে যাতায়াতএর সুব্যবস্থা না হয়, তবে অচিরেই কলিকাতা বাসের অনুপযুক্ত হইয়া উঠিবে।

১৯২৫ সাল হইতে বোম্বাই সহরে এবং ১৯২৮ হইতে মাদ্রাজ সহরে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলিতেছে। কলিকাতাতেও বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ১৯১৪ সন হইতে ক্রমান্বয়ে একাধিক কমিটী গঠিত হইয়াছিল,—সর্ব্বশেষের কমিটী গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় সুদীর্ঘ ছত্রিশ বৎসরকাল জল্পনা কল্পনা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের এই বৃহত্তম নগরীতে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচলের ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই।

স্যার পদমজী গিনওয়ালা চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য চারজন সদস্যসহ ১৯৪৭ সনের কমিটী গঠিত হয়। সদস্যদের মধ্যে মিঃ জে, ডি, মাইকেল ও মিঃ এন, এম, মজুমদার রেলওয়ে বোর্ডের এবং মিঃ বি সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হইতে মনোনীত হইয়াছিলেন। অপর সদস্য মিঃ এফ, এইচ সার্প ছিলেন বৈদ্যুতিক-বিশেষজ্ঞ। কমিটীর সেক্রেটারী ছিলেন মিঃ এস, ডি, বামজী।

ভারতবর্ষে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রথম রেলগাড়ীর প্রচলন হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং দিল্লীর সহিত ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে লাইন নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ১৯০০ সালে হাওড়ায় আসিয়া পৌছায়।

কলিকাতা নগরী হুগলী নদীর পূর্ব্ব তীরে এবং হাওড়া ষ্টেশনটী পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কলিকাতা সহর ও হাওড়া ষ্টেশনের মধ্যে পণ্যদ্রব্য চলাচলের সুবিধার জন্য ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে হাওড়া পুলের (পুরাতন পনটুন ব্রীজ) নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। নৈহাটীর নিকট হুগলী নদীর উপর জুবিলী ব্রীজ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুর ডকের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জুবিলী ব্রীজের উপর দিয়া মাল চলাচল রীতিমত ভাবে আরম্ভ হইতে পারে নাই। ইহার পর সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কলিকাতায় যাত্রী ও মাল চলাচলের উন্নতিকল্পে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হয় নাই। হুগলী নদীর উপর বালী ব্রীজ মাত্র ১৯৩২ সনে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান হাওড়া ব্রীজের (উইলিংডন ব্রীজ) নির্ম্মাণ কার্য্য ১৯৪৩ সালে সমাপ্ত হয়।

১৯৪৭এর কমিটীর প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল—বর্ত্তমানে কলিকাতায় যাত্রী এবং মাল চলাচলের যে ব্যবস্থা আছে তাহা প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট কিনা, তাহা না হইলে কি উপায়ে ইহার উন্নতিসাধন করা সম্ভবপর। সরকার এই কমিটীকে ইহাও নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে তাঁহারা ধরিয়া নিতে পারেন কলিকাতা ও সহরতলীতে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চালু হইবে।

কলিকাতা রেলওয়ে ষ্টেশনের বিশেষ অসুবিধা এই যে, শিয়ালদহ এবং হাওড়া এই দুইটী প্রধান ষ্টেশনই সহরের ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ডালহৌসী স্কোয়ার ও বড়বাজার হইতে দূরে অবস্থিত। কার্য্যোপলক্ষে যাঁহারা সহরতলী হইতে কলিকাতায় আসেন, তাঁহাদের গন্তব্যস্থল যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁহাদিগকে হয় শিয়ালদহ, নয় হাওড়া ষ্টেশনে নামিতে হয়, পরে ট্রামে কিংবা বাসে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে হয়। ইহাতে অযথা রাস্তায়, ট্রামে ও বাসে ভীড় বৃদ্ধি পায়। এইখানে উল্লেখযোগ্য, বোম্বাই সহরের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ও চার্চ্চগেট ষ্টেশন ব্যবসা কেন্দ্রের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। সুবারবান ট্রেণের সফলতা তখনই লাভ হয়, যখন অন্য কোন যানবাহনাদির সাহায্য ব্যতিরেকে যাত্রীগণ ট্রেণেই তাঁহাদের স্ব স্ব গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারেন। এই উদ্দেশ্য যাহাতে সাধিত হয়, তদনুযায়ী কমিটী তাঁহাদের সিদ্ধান্ত রেলওয়ে বোর্ডকে জানাইয়াছিলেন।

কমিটীর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত কলিকাতার মিউনিসিপাল সীমানার চতুর্দ্দিকে একটী সার্কুলার বৈদ্যুতিক রেলওয়ে লাইন নির্ম্মাণ। এই সার্কুলার রেলওয়ে দমদম জংসন হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান ই, আই, রেলওয়ের চিৎপুর ইয়ার্ডের ভিতর দিয়া যাইবে। চিৎপুর ঘাট হইতে ইহা "ওভার-হেড" রেল লাইন হইয়া চলিবে। বর্ত্তমান পোর্ট-কমিশনার-এর রেল লাইনের উপর এই "ওভার-হেড" রেল লাইনটী নির্ম্মিত হইবে এবং খিদিরপুর ডকের ভিতরেও ওভার হেড চলিয়া মাঝেরহাট ষ্টেশনে গ্রাউণ্ড লেভেলে বর্ত্তমান ই, আই, রেলওয়ের সাউদার্ন সেকশনের সহিত যুক্ত হইবে। তথা হইতে শিয়ালদহ হইয়া পুনরায় দমদমে মিলিত হইবে।

বর্ত্তমানে ডায়মণ্ডহারবার, বনগাঁও, নৈহাটী, ব্যাণ্ডেল ও বজবজ হইতে যে সকল রেলওয়ে লাইন কলিকাতায় আসিয়াছে, সেগুলিকে সার্কুলার রেলওয়ের সহিত সংযুক্ত করার জন্য কমিটী ছোট ছোট লিঙ্ক লাইন নির্ম্মাণের প্রস্তাব দিয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে যাত্রীগণ বৃহত্তর কলিকাতার পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সকল দিক হইতেই আসিয়া যানবাহনাদির পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে সরাসরি স্ব স্ব কর্ম্মস্থলের অতি সন্নিকটে পৌঁছিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে কমিটী সার্কুলার ট্রেণের উপর আরোও কুড়িটি নতুন রেলওয়ে ষ্টেশন নির্ম্মাণের প্রস্তাব দিয়াছেন। পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত হইলে কলিকাতার বিভিন্ন অংশে মাল চলাচলেরও সুবিধা হইবে। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কলিকাতা হইতে ত্রিশ মাইলের মধ্যে রেলওয়ে লাইনগুলিতে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচলের জন্য কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক শক্তিতে ট্রেণ চলিলে প্রতি ঘণ্টায় ২০টী ট্রেণ চলাচল করিতে পারিবে। এইরূপে প্রয়োজন মত যান বাহনাদির ব্যবস্থা থাকিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বৃহত্তর কলিকাতা গড়িয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে সহরতলীতে যানবাহনাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াও কলিকাতায় বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে ক্রমে ক্রমে কলিকাতার আবহাওয়া দূষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রয়োজন মত পরিশ্রুত জলের অভাবে বারমাস সংক্রামক ব্যাধি লাগিয়াই আছে। অথচ বৃহত্তর কলিকাতা গড়িয়া উঠিলে অধিকাংশ লোক স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে বসবাস করিতে পারিবেন এবং কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাদের কলিকাতায় আসার কোন অসুবিধা হইবে না। স্বল্পমূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তি মিলিলে সহরতলীতে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইতে পারিবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে (আণ্ডার-গ্রাউণ্ড অথবা টিউব) লাইন নির্ম্মাণ করার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এজন্য বিশেষজ্ঞ ফরাসী ইন্‌জিনিয়ারের মত গ্রহণ করা হইতেছে। এদিকে ১৯৪৭এর কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে এবং ওভার-হেড রেলওয়ে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে কলিকাতায় ওভার-হেড বৈদ্যুতিক রেলওয়ে স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়। আমরা এই তর্ক বিতর্কে যোগদান করিতে ইচ্ছুক নহি। যাহাতে অচিরে কলিকাতা নগরীতে যাত্রী এবং মাল চলাচলের অসুবিধা দূর হয়, ইহাই আমাদের কাম্য। যাহা হোক, আশা করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করার পূর্ব্বে ইহার বিস্তৃত বিবরণ জনসাধারণকে জানাইবেন এবং তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করিবেন। কারণ কমিটীর রিপোর্টে দেখা যায় যে ভূগর্ভস্থ ট্রেণ নির্ম্মাণে প্রতি মাইলে প্রায় ৪ কোটী টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা—অপর পক্ষে ২৪ কোটী টাকা ব্যয়ে প্রায় ৪০০ রুট মাইল লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেণের চলাচলের ব্যবস্থা হইতে পারে।

মহাকবি গ্যেটের ফাউষ্ট কাব্যে সংশ্লেষণ-প্রণালীর ঔষধ

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

ফাউষ্ট কাব্যের নায়ক ডক্টর ফাউষ্ট ছিলেন সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। কাব্যের প্রারম্ভে তাঁর স্বগতোক্তিতেই তা জানতে পারা যায়। ফাউষ্ট বলছেন :—

Habe nun, ach ! Philosophie,

Juristerei und Medizin

Und leider ! auch Theologie

Durchaus studiert, mit heissem Bemuehn.

—হায়,, আমি প্রগাঢ় অভিনিবেশ ও কঠোর শ্রমসহকারে দর্শন, ব্যবহারশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা এবং ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি !

ডক্টর ফাউষ্ট ঔষধ প্রস্তুত ও তার ব্যবহার-ফল সম্বন্ধে যে সখেদ বক্রোক্তি করেছেন এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞানের সংকীর্ণ পরিধি সম্পর্কে যে হতাশার ভাব প্রকাশ করেছেন তার আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গ্যেটের অনিন্দ্যসুন্দর কবিতার হুবহু বঙ্গানুবাদের ক্ষমতার অভাবে তার ভাবার্থমাত্র এস্থলে উল্লেখ করা হচ্ছে।

মহাকবি গ্যেটে ছিলেন একাধারে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পূজারী। অনেকেই জানেন ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের এক ধনাঢ্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে প্রচলিত সুকুমার কলার উচ্চ শিক্ষালাভের সঙ্গে রসায়নশাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যার চর্চা করতেও তিনি ছাড়েন নি। প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্য-বিভোর কবি

বর্ণ সম্বন্ধে একটি থিওরিও খাড়া করেছিলেন। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আলোচ্য প্রসঙ্গে কবি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন—তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ফলতঃ গ্যেটের বাণীতে জার্মান জাতি যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল তার তুলনা মেলে না। দুর্দমনীয় অনুসন্ধিৎসা ও তৃপ্তিহীন জ্ঞানপিপাসা তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন এই জাতির মজ্জাতে মজ্জাতে। এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধির জন্য ফাউষ্ট কাব্যের নিম্নলিখিত দুটি বাণীই যথেষ্ট মনে করি।—

Wo fass ich dich unendliche Natur ?
—অনন্ত প্রকৃতি তোমা বুঝিব কেমনে ?
Ich wuenschte recht gelehrt zu werden
Uud moechte gern, was auf der Erden
Und in dem Himmel ist, erfassen,
Die Wissenschaft und die Natur.
—সত্যিকারের জ্ঞানী হতে আমি চাই—
এ ধরায় আর দূর মহাকাশ মাঝে
যত রহস্য চির-অগোচরে রাজে—
সব না জানলে আমার শান্তি নাই।

এখন মেডিসিন বা ভেষজবিদ্যা উপলক্ষে ফাউষ্ট কাব্যে যে প্রসঙ্গ আছে তার মোটামুটি আভাস দেবার প্রয়াস পাচ্ছি। কবিগুরু কিরূপ পরিবেশের অবতারণা করে কত কৌশলে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন—তা শীঘ্রই আমরা দেখতে পাব।

...বসন্তকাল। প্রচণ্ড শীতাপগমে বৃক্ষলতা পত্রপুষ্পসম্ভারে নব-জীবনের জয়যাত্রা সুরু করেছে। প্রকৃতি বর্ণগন্ধে স্বর্গীয় সুষমায় ভরপুর। নির্মেঘ নীল আকাশ থেকে সূর্যের সোনালি কিরণ অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে। শহরের কর্মকোলাহল থেকে ধনী নির্ধন, কুলি-মজুর, আবালবৃদ্ধবনিতা বদ্ধ ঘরের দুঃসহ ক্লেদাক্ত পরিবেশ ছেড়ে বেরিয়েছে ইষ্টারের উৎসব করতে—গ্রামের পথে, মাঠে পর্বতে। গাঁয়ের চাষীরাও আজ ঘরছাড়া—খাদ্য, পানীয়, বাদ্যযন্ত্র নিয়ে খোলা জায়গায় নাচগানে মত্ত। উৎসবমুখর, আনন্দবিভোর স্থাবর জঙ্গম। ডক্টর ফাউষ্টও বহুদিন পরে তাঁর জ্ঞানসাধনা ও গবেষণার ক্ষুদ্র রুদ্ধ কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন গাঁয়ের পথে—জনগণের আনন্দের এই ঝরণাধারায় অবগাহনার্থে—তাঁর প্রিয় শিষ্য ভাগনারকে সঙ্গে ক'রে। কিঞ্চিৎ অবান্তর হ'লেও বলে রাখি যে, কবি বর্ণিত এই মাঠঘাট আমি যেন মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ; কারণ আমার সাম্প্রতিক জার্মানি প্রবাসে আমি অনেকদিন কবির জন্মস্থান ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের উপকণ্ঠে বাডহোমবুর্গে ছিলাম, কিন্তু প্রত্যহ ট্রাম বা ট্যাক্সিযোগে ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে চাষীদের গ্রাম পেরিয়ে মহাকবির পদরজপূত শহরে আসতাম।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়ে আবার আসা যাক।

আচার্য ফাউষ্ট ভাগনারকে নিয়ে উৎসবরত একদল কৃষকদের পাশ দিয়ে যেতেই তারা তাঁকে চিনতে পেরে সম্বর্দ্ধনা জানালে এবং সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে শ্রদ্ধানম্রনেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। এই সময় তাদের মুখপাত্রস্বরূপ একজন বর্ষীয়ান কৃষক ডক্টর ফাউষ্টকে বলতে লাগল—"হে মহাপ্রাণ, এই আনন্দের দিনে তুমি আমাদের কাছে আসায় আমরা যে কতদূর খুশী হয়েছি তা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আজ আমরা যে এখানে মিলিত হয়েছি—এ কেবল তোমার স্বর্গত পিতা এবং তোমার দয়াতেই সম্ভবপর হয়েছে। কারণ আমাদের গাঁয়ে যখন ভীষণ প্লেগ দেখা দেয় এবং প্রত্যহ বহুলোক মারা যেতে থাকে তখন করুণার অবতার তোমার পিতা আহার নিদ্রা ভুলে ঘরে ঘরে ঘুরে আমাদের ঔষধ দিয়ে যেতেন। তুমি তখন ছিলে বয়সে নবীন, কিন্তু তুমিও নিজের জীবনের মায়া না ক'রে সুদৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেক রোগীকে ঔষধ খাওয়াতে, শুশ্রূষা করতে এবং সাহস দিতে। ভগবানের অশেষ দয়া যে যিনি এবং যাঁর পুত্র দেবদূতের মত উপস্থিত হয়ে সেই চরম দুঃসময়ে করালব্যাধির কবল থেকে আমাদের বাঁচাবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, ঐ ব্যাধি তাঁদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে নি।" গ্রামবৃদ্ধের কথা শেষ হলে সকলে সমবেত ভাবে ডক্টর ফাউষ্টের দীর্ঘজীবন কামনা ক'রে জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে। প্রত্যুত্তরে ফাউষ্ট বললেন—"ভাই সব, মানুষের একমাত্র বন্ধু পরমপিতা পরমেশ্বরই সকল কল্যাণের মূলাধার। আমরা তাঁর দীন ভৃত্য হিসাবে তাঁরই অপার করুণার কণামাত্র তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি ; সুতরাং এজন্য ধন্যবাদ আমাদের প্রাপ্য নয়—তোমরা ভগবানকেই এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাও।"

এই কথা বলে প্রতিনমস্কারপূর্বক বিদায় নিয়ে সশিষ্য ডক্টর ফাউষ্ট দূরে একটু নিরালায় সরে গেলেন। তখন শিষ্য ভাগনার বলতে লাগলেন—"গুরুদেব, না জানি কি অনাবিল আনন্দই না আজ আপনি পেলেন—গাঁয়ের লোকদের প্রাণখোলা অভিনন্দন ও সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করে! আপনার মত সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুখী ও ভাগ্যবান্ যিনি ভগবানের দেওয়া প্রতিভা ভগবানে ঈপ্সিত মঙ্গলকার্যে নিয়োজিত করে ধন্য হন।"

ডক্টর ফাউষ্ট অদূরে একটি শিলাখণ্ড লক্ষ্য করে বললেন—"অনেকটা হাঁটা হয়েছে—চল ঐ পাথরটার উপর বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক।" সেখানে কিছু সময় নীরবে কাটাবার পর ডক্টর ফাউষ্ট বলে চললেন—"সেই ভীষণ প্লেগ যখন এ অঞ্চলের গ্রামকে গ্রাম উজাড় করছিল, সেই সময় আমি প্রায়ই এসে নির্জনে একাকী এই পাথরটার উপর বসতাম—বসে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা কত না চিন্তা করতাম। কখনো বা উপবাসী থেকে মর্মান্তিক যাতনা নিয়ে প্রার্থনা করতাম। তখন বয়সে ছিলাম তরুণ—সেই বয়সের সহজাত সীমাহীন আশা ও অটল সরল বিশ্বাস নিয়ে, সজল চক্ষে কত না দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভগবানকে ডাকতাম—যদি তিনি আমার কাতর ক্রন্দনে সাড়া দিয়ে ঐ প্লেগের আক্রমণ থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেন।...কাজেই আজ এরা আমার যে প্রশংসা করল, এ যে আমার কাছে বিদ্রূপের মত ঠেকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আমার অন্তরদেবতাই জানেন

এদের সরল প্রাণের উচ্ছল প্রশংসার কতটুকু আমার পিতার বা আমার সত্যিকারের প্রাপ্য !—আমার পিতা ছিলেন নিতান্ত স্বল্পভাষী, আপনভোলা লোক। নিরলস ভাবে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে তিনি সর্বদাই 'প্রকৃতির পুণ্যবৃত্ত' (Nature's holy circle) অখণ্ড অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতেন এবং একজন বা দুজন দক্ষ সহকারীর সঙ্গে তাঁর গুপ্তকক্ষে 'অদ্ভুত ফরমুলা অনুসারে আগুন এবং মুষার (crucible) সাহায্যে নানা বিরুদ্ধধর্মী পদার্থের সংযোগ সাধনে —যেন সিংহের সঙ্গে লিলির মিলন ঘটানোর জন্য—ব্যাপৃত থাকতেন। এইরূপে জন্ম নিত কত নব নব ঔষধ; কিন্তু রোগীদের বাঁচাতে পারতাম কই সে সব ঔষধ দিয়ে? হাজার হাজার লোককে আমি স্বহস্তে দিয়েছি এই ঔষধ—তারা গেছে মরে। এই অঞ্চলে আমাদের ঔষধই প্লেগের চেয়েও ছিল বেশী ভয়ংকর। কিন্তু কেউ শুধায় নি কখনো 'কে কে এই ঔষধ খেল? আর তার মধ্যে ক'জনই বা সেরে উঠল?'—আর আজ আমি বেঁচে রয়েছি সেই লোকান্তরিত হতভাগাদের প্রিয়জনের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও ধন্যবাদ পাবার জন্য !"

গুরুর এই মর্মবেদনা করুণ, হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনে ভাগনার বলে উঠলেন—"এতে এত দুঃখ করবার কি আছে? মানুষ তার সমসাময়িক বিজ্ঞানের নির্দেশ অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করে সততার সঙ্গে তা প্রতিপালন করা ভিন্ন আর কি করতে পারে বলুন? আপনি আপনার পিতার নিকট যা শিখেছিলেন, তা সম্পূর্ণ সরল অন্তঃকরণে প্রগাঢ় বিশ্বাসের সঙ্গেই শিখেছেন। আপনার জীবনে বিজ্ঞানের সীমারেখা আপনি যাবেন বাড়িয়ে এবং সেই বিবৃদ্ধ জ্ঞানরাজ্যের উত্তরাধিকারী আপনার পুত্র হয়ত আরো রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের খ্যাতিলাভে ধন্য হবেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে—আগামীকালের সমুন্নত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুরম্য সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর আমরাই ত গেঁথে চলেছি। ভুলচুক হয় ত আমাদের হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে ত চলবে না। এ কথা যদি মেনে নেন, তবে এর জন্য দুঃখ বা অনুশোচনা করবার কোনও কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।"

আমরা দেখলাম, মহাকবি গোটে ডক্টর ফাউষ্টের মুখ দিয়ে যে জটিল সমস্যার অবতারণা করলেন পরক্ষণেই তিনি ভাগনারের উক্তির মাধ্যমে অতি সরল সুন্দর ভাবে সেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। মহাসমুদ্রের কোটি কোটি প্রবালকীটের দেহাবশেষে গড়ে ওঠে ফুলফলশোভিত নয়নমনোহর দ্বীপমালা—সেইরূপ পুরুষ পরম্পরায় এইরূপ কত ফাউষ্টের আজীবন একনিষ্ঠ সাধনার ফলে যে আমরা বিজ্ঞানের বর্তমান অভাবনীয় উন্নতি প্রত্যক্ষ করছি—কে তার খবর রাখে? জার্মানজাতি গোটের এই মর্মবাণী মর্মে মর্মে অনুভব করার ফলে স্বল্প পরিসর এক শতাব্দী সময়ের মধ্যেই তারা জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার ও অধিকার করে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিশাল জ্ঞানসাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে, সংশ্লেষণ সঞ্জাত ঔষধের আবিষ্কার ও প্রস্তুতি যিনি সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সেই স্বনামধন্য পল এরলিখের সাধনার ক্ষেত্র ছিল মহাকবির জন্মনগরী, ফ্রাঙ্কফুর্ট।

পরিশেষে আমাদের দেশের রসায়নের তরুণ ছাত্রছাত্রী ও প্রবীণ রসায়ন-বিজ্ঞানীদের—বিশেষ করে যাঁরা ঔষধ শিল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন, জনগণের ব্যাধিক্লেশ ও অপমৃত্যু নিবারণে ফাউষ্টের যে মর্মবেদনাপীড়িত ছবি কবি এঁকেছেন—তৎপ্রতি তাঁদের সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই শাস্ত্রচর্চায় আমরা যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছি এবং ভগবদ্দত্ত ক্ষমতার যতটুকু অনুশীলন ও সদ্ব্যবহার আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভবপর হয়েছে তার সাহায্যেই সনিষ্ঠ শ্রমশীলতার সঙ্গে নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করে আমাদের দুস্থ দেশবাসিগণকে ব্যাধি ও অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার পবিত্র ব্রত ও গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর সতত ন্যস্ত, একথা যেন কখনো আমরা ভুলে না যাই। 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ' বলে যে দেশের লোক শয্যাত্যাগ করেন, বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত গোটের এই ভাবধারার অন্তর্নিহিত আদর্শ তাঁদের অন্তর স্পর্শ করে জীবন মহিমময় করে তুলবে বলেই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

গীতগোবিন্দ

রাজশেখর বসু

রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি অসীম, কিন্তু তাঁর কাব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় প্রধানত বাঙালীরই আছে। বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন অবাঙালী বেশী নেই, যাঁরা মূল রচনা পড়ে রবীন্দ্রকাব্য পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন। বিশ্ব-সাহিত্য রূপে গণ্য হলেও রবীন্দ্রসাহিত্য সর্বভারতে ব্যাপ্ত হয় নি।

আর এক বাঙালী কবি জয়দেব প্রায় আট শ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় গ্রন্থের বহুপ্রচার অসম্ভব ছিল, শিক্ষিত পাঠকের সংখ্যাও অল্প ছিল, এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাতায়াতও কষ্টসাধ্য ছিল। তথাপি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য সর্ব ভারতে প্রচারিত হয়েছে, কাশ্মীর থেকে পাণ্ড্যদেশ, দ্বারকা থেকে মণিপুর—সর্বত্র তাঁর পদাবলী বহুকাল থেকে পণ্ডিত সমাজে পঠিত এবং বৈষ্ণব মন্দিরে গীত হয়ে আসছে। এই প্রসিদ্ধির কারণ, জয়দেব তৎকালীন সর্বভারতীয় সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যদি সেকালে জন্মাতেন এবং সংস্কৃতে লিখতেন তবে তিনি সমগ্র ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সার্বভৌম কবি রূপে গণ্য হতেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যদি এই যুগে সংস্কৃতে লিখতেন তবে বিশেষ খ্যাতি পেতেন না, কারণ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার অভ্যুদয়ে সংস্কৃতের চর্চা এবং প্রতিপত্তি এখন কমে গেছে।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থের বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ* সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আমি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু লিখতে আহূত হয়েছি। গীতগোবিন্দের আলোচনা দুই দিক থেকে হতে পারে, কাব্য রূপে এবং ভক্তিগ্রন্থ রূপে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুই দৃষ্টির কোনওটির অধিকারী আমি নই। অগত্যা অন্ধ যেমন হাত বুলিয়ে হস্তীদর্শন করে, আমিও তেমনি অমর্মগ্রাহী সামান্য পাঠকের স্থূল দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দের আলোচনা করছি।

বহু বৎসর পূর্বে একটি প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালীর অরুচিকর।...সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন অপবিত্র অরুচিকর এবং পাপে পঙ্কিল হয়, কৃষ্ণলীলাও তাঁহাদের বিবেচনায় তদ্রূপ।...এ সকল কবিতা অনেক সময় অশ্লীল এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্বথা পরিহার্য। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন তাঁহারা নিতান্ত আসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখনও এত কাল স্থায়ী হইত না।...যিনি কবিতা লিখেন তিনি জাতীয় চরিত্রের, সামাজিক বলের এবং আত্মস্বভাবের অধীন।...প্রাচীন কবি মাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। সেইগুলি তাঁহাদের সাময়িক লক্ষণ।'

বঙ্কিমচন্দ্র গীতগোবিন্দকে অশ্লীল বলেন নি, কিন্তু জানিয়েছেন যে তাঁর সমকালীন অনেকের দৃষ্টিতে এই প্রকার রচনা আপত্তিকর ছিল। প্রাচান কবিদের যে সাময়িক লক্ষণের কথা তিনি বলেছেন, তাঁর সময়ের শিক্ষিত পাঠকসমাজের বিচারপদ্ধতিতেও সেই সাময়িক লক্ষণ দেখা যায়। রুচি কালে কালে বদলায়। যা স্বাভাবিক মনুষ্যধর্ম তার সম্বন্ধে কোনও দেশের প্রাচীন কবিদের সংকোচ ছিল না। তাঁরা কাম ও প্রেমের বড় একটা পার্থক্য করতেন না। আদিরস পরিবেশনে তাঁদের অনেকে মুক্তহস্ত ছিলেন, পাঠকবর্গও তাতে দোষ ধরতেন না। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা এবং ভিক্টোরীয় সাহিত্যের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে শিক্ষিত জনের রুচি বদলে গিয়েছিল। তাঁরা ভাবতে পারতেন না যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে পাশ্চাত্য রুচি এদেশের প্রাচীন রুচিকে হার মানাবে। বর্তমান কালের অনেক সুবিখ্যাত লেখক

* কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ।—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্‌স। ২২৩+১৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য চার টাকা।

লালসার বর্ণনায় কার্পণ্য করেন না। আদিরস ভক্তির বাহন হতে পারে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দে এমন কিছুই নেই যা কাব্যে বর্জনীয়।

বৈষ্ণবমতে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসের যে-কোনওটির অবলম্বনে কৃষ্ণভক্তি চরিতার্থ হতে পারে, কিন্তু মধুর বা শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ, যাতে উপাস্য-উপাসকের মধ্যে কামগন্ধহীন প্রণয়িসম্পর্ক হয়। চৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ কৃষ্ণসাধনার নানা ভেদ উল্লেখ করে পরিশেষে বলেছেন, 'কান্তা ভাব সর্ব সাধ্য সার।' চৈতন্যদেবও বলেছেন, ''বরঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ''—অর্থাৎ সাধকের পক্ষে কিশোর রূপই ধ্যানযোগ্য এবং আদিরসই পরম রস। মরমী বা মিষ্টিক সাধকগণের ঈশ্বরোপলব্ধি কি প্রকার, তা অন্য লোকের ধারণার অতীত। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে শুধু ভারতীয় ভক্ত নয়, বহু খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী এবং সুফী সাধকও প্রেমাতুরা বিরহিণী নায়িকার দৃষ্টিতে ঈশ্বরের অন্বেষণ করেছেন এবং ঈশ্বরোপলব্ধির ফলে প্রিয়সমাসমতৃষ্ণা নায়িকার তুল্যই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেছেন।

তথাপি প্রশ্ন ওঠে, স্থূল আদিরস কি ভক্তির বাহন হতে পারে? পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্যমতানুসারে পরস্পরে আসক্ত।...শ্রীমদ্‌ভাগবতকার এই দুরূহ তত্ত্ব জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া মৃত ধর্মে জীবনের সঞ্চারের অভিপ্রায় করিলেন। মহাভারতে যে বীর ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকেই পুরুষ স্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন এবং স্বকপোল হইতে গোপকন্যা রাধিকাকে সৃষ্ট করিয়া প্রকৃতিস্থানীয় করিলেন।...সাংখ্যের মতে ইহাদের মিলনই জীবের দুঃখের মূল—তাই কবি এই মিলনকে স্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজাইলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতকারের গূঢ় তাৎপর্য, আত্মার ইতিহাস—প্রথমে প্রকৃতির সহিত সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি। জয়দেব প্রণীত কৃষ্ণচরিত্রে এই রূপক একেবারে অদৃশ্য।...আর্যজাতির জাতীয় জীবন দুর্বল হইয়া আসিয়াছে।...অস্ত্রের ঝঞ্চনার স্থানে রাজপুরী সকলে নূপুর-নিক্কণ বাজিতেছে।...গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি।...শব্দভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী কিশোর-কিশোরী রচিয়াছেন।...যে মহাগৌরবের জ্যোতি মহাভারত ও ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া প্রখরসুখতৃষাতপ্ত আর্য পাঠককে শীতল করিয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণভক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি গীতগোবিন্দের লালিত্য এবং রচনাচাতুর্য স্বীকার করেছেন। তাঁর একাধিক উপন্যাসে এই কাব্য থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু জয়দেবের রচনায় তিনি পারমার্থিক তত্ত্ব কিছুই পান নি। তাঁর আরাধ্য শূরশ্রেষ্ঠ দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ গীতগোবিন্দে নেই।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুপণ্ডিত, ভক্ত এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে অশেষবিৎ। তাঁর গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৮৪, তার মধ্যে ১৬০ পৃষ্ঠা সটীক সানুবাদ গীতগোবিন্দ কাব্য এবং অবশিষ্ট ২২৪ পৃষ্ঠা ভূমিকা। এই বৃহৎ ভূমিকায় গ্রন্থকার জয়দেবের দেশ, কাল ও চরিত বিবৃত করেছেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনার পদ্ধতি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি বহু যুক্তি এবং নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকূল মত খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে জয়দেবের কাব্য ভাগবতেরই অনুবর্তী, কামগ্রন্থ নয়, ভক্তিগ্রন্থ।

আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর সংস্কৃতে অনুরাগ নেই, কিন্তু প্রাচীন বাঙালী কবি জয়দেবের ভারতবিখ্যাত কাব্য সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল আছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বহুতথ্যসংবলিত গ্রন্থ পড়লে তাঁরা উপকৃত হবেন এবং গীতগোবিন্দ কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করবার অনেক উপাদান পাবেন। কাব্যের প্রথম যুগের তৃতীয় শ্লোকে জয়দেব তাঁর উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত করেছেন—যদি হরিস্মরণে মন সরস করতে চাও, যদি বিলাসকলায় কৌতূহল থাকে, তবে জয়দেবকথিত এই মধুর কোমল কান্ত পদাবলী শোন। বোধ হয় এর তাৎপর্য—শুদ্ধচিত্ত ধার্মিক বৈষ্ণব পদাবলী-বর্ণিত বিলাসকলাকে উপাস্য-উপাসক-মিলনের রূপক ভাবেই নেবেন এবং ভক্তিভরে হরিস্মরণ করে রসাবিষ্ট হবেন। আর, কৌতূহলী সাধারণ পাঠক এতে পাবেন রাধাকৃষ্ণলীলাচ্ছলে বর্ণিত মানুষী প্রেমলীলারই মোহন চিত্র।

যাঁরা সংস্কৃত জানেন না তাঁরাও গ্রন্থকারের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদের সাহায্যে অল্পায়াসে মূল শ্লোকগুলিও বুঝতে পারবেন। আশা করি, বহু যত্নে সম্পাদিত এই গ্রন্থের প্রচুর ক্রেতা ও পাঠক হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাধিকার এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থ সাহায্য করে প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

দেশ বিদেশ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাস্তুহারা-সমস্যা—

দেশবিভাগের ফলে পঞ্জাবে ও বাঙ্গালায়—পাকিস্থানভুক্ত অংশে মুসলমানাতিরিক্ত অধিবাসীদিগের ধন, প্রাণ ও মান বিপন্ন হইয়াছে। দেশবিভাগের সর্ত্ত হিসাবে মুসলমান নেতা মিষ্টার জিন্না অধিবাসি-বিনিময়ের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা গান্ধীজীপ্রমুখ ব্যক্তিদিগের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, ভারতে যেমন মুসলমানগণ, পাকিস্তানে তেমনই হিন্দুরা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদিগের তুল্যাধিকার সম্ভোগ করিয়া নিরাপদে বসবাস করিতে পারিবে। কিন্তু তাঁহাদিগের সে বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহারা অতীতের অভিজ্ঞতা অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। দূর অতীত—স্বদেশী আন্দোলনকালে প্রচারিত "লাল ইস্তাহার" প্রভৃতি; অদূর অতীত—কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হত্যাব্যাপারের পরে নোয়াখালী ও ত্রিপুরার ঘটনাসমূহ। কার্য্যকালে দেখা গেল, ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলেও, পাকিস্তান আপনাকে ইসলাম রাষ্ট্র ঘোষণা করিল—সুতরাং তথায় মুসলমান ও অমুসলমান উভয়ে প্রভেদ থাকিল ও থাকিবে। পঞ্জাবে অধিবাসি-বিনিময় "করাল কৃপাণ মুখে"—রক্তপাতে ও হত্যায় একরূপ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় তাহা হয় নাই এবং ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়েই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে পশ্চিমবঙ্গে ভার—দুর্ব্বহ ভার, সুতরাং অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমাবধি পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী হিন্দু নর-নারীর পুনর্ব্বসতির আবশ্যক ব্যবস্থা করেন নাই এবং শেষে তাহাদিগকে আন্দামান হইতে হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত নানা স্থানে পাঠাইয়া কোনরূপে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ফলে বাঙ্গালী জাতির একত্ব নষ্ট হইতেছে এবং বহু বাঙ্গালী বাঙ্গালার সংস্কৃতিভ্রষ্ট ও মাতৃভাষাত্যাগী হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইতেছে। ভারত সরকার বিহারকে যেমন উড়িষ্যাকেও তেমনই বাস্তুহারা বাঙ্গালীর পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অথচ দেখা গিয়াছে, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম কেহই পূর্ব্বাবধি বাঙ্গালীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নহে। কাজেই তাহারা সে নির্দ্দেশ সাগ্রহে পালন করিতে পারে নাই এবং সময় সময় প্রথম প্রদেশদ্বয়ে প্রেরিত বাঙ্গালীরা ফিরিয়া আসিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু নরনারীর উপর যে অনাচার ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া যে পশ্চিমবঙ্গে হয় নাই, এমন বলা যায় না—তবে তাহা যৎসামান্য। বিহারে যখন মুসলমানরা উৎপীড়িত হইয়াছিল, তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাহা কলিকাতায় এবং নোয়াখালীতে ও ত্রিপুরায় হিন্দুলাঞ্ছনার প্রতিক্রিয়া বলিয়া পার্লামেণ্টে স্বীকার করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, "যেন তেন প্রকারে" অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতেরও দোষ স্বীকার করিয়া লইয়া, পাকিস্তানের সহিত সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সম্বন্ধে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন, চুক্তির সর্ত্ত পাকিস্তানে পালিত হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই চুক্তির সর্ত্ত পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে। চুক্তির সর্ত্ত পালন জন্য তিনি যে মন্ত্রীকে ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করিতে হই ছে। সেই মন্ত্রী বাঙ্গালী—পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব হইয়া ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যাঁহাকে সচিবসঙ্ঘে গ্রহণ জন্য আহ্বান করিয়াও গ্রহণ করিতে পারেন নাই—চারুচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থ নিযুক্ত মন্ত্রী ডক্টর মালেকের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়াছেন—দিল্লীচুক্তি অনুসারে কাজ করিবার জন্য হিন্দুদিগকে প্ররোচিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু দীর্ঘ ছয় মাসের অভিজ্ঞতাফলে তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থা এখনও "স্বাভাবিক" হয় নাই—হিন্দুদিগের পক্ষে অনুষ্ঠিত অত্যাচার সহজে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নহে—হিন্দুর মনে এখনও আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়

নাই। পণ্ডিত জওহরলাল যেন "হতাশের আক্ষেপ" করিয়াছেন—এখনও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রতিদিন সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে—আস্থা এখনও "স্বাভাবিক" হয় নাই। বিশেষ যে সকল হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। গত সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপরিষদে প্রদেশপাল ডক্টর কাটজুও তাহাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

(১) গত ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭ খৃঃ) হইতে এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অন্যূন ৪০ লক্ষ হিন্দু চলিয়া আসিয়াছেন।

(২) যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন না।

(৩) চুক্তির ফলে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গে উৎপীড়নের তীব্রতা হ্রাস হইয়াছে, উৎপীড়নের অবসান হয় নাই। যে অবস্থায় হিন্দুদিগের মনে আস্থা ফিরিতে পারে, সে অবস্থা হইয়াছে কি না, বলা দুঃসাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপরিষদে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, (সরকারী হিসাবে) যে সকল হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের তথায় ত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য ৮৭ কোটি ৮১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা।

আগন্তুকদিগের সংখ্যা, তাহাদিগের ফিরিয়া যাইতে অসম্মতি ও তাহাদিগের ত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য বিবেচনা করিলেই বাস্তুহারা সমস্যার গুরুত্ব বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। প্রথমাবধি সমস্যা স্বীকারে সরকারের অসম্মতি ও তাহার পরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বিলম্ব যে বহু লোকের অনিবার্য্য কষ্টভোগের কারণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে জন্য আক্ষেপে কালক্ষেপের সময় আর নাই। এই সমস্যার সমাধান যখন করিতেই হইবে, তখন ভারত সরকারকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ও ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে সমবেত ও সাগ্রহ চেষ্টায় সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

পদত্যাগকারী মন্ত্রীর কথা—

অস্থায়ী ও পরীক্ষামূলকভাবে ভারত সরকার কর্তৃক চারুচন্দ্র বিশ্বাসকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে ভারত সরকারে দুইজন বাঙ্গালী মন্ত্রী ছিলেন (অবশ্য আমরা মিষ্টার আবুল কালাম আজাদকে বাঙ্গালী বলিতে পারি না)—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী। প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্টের মত না লইয়া পাকিস্তানের সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন, তাহাতে ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না—অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর বাস সম্ভব হইবে না—প্রত্যাবর্ত্তন ত পরের কথা—এই বিশ্বাসহেতু তাঁহারা উভয়ে পদত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। পদত্যাগের কারণ ব্যক্ত করিবার সুযোগ লইয়া শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার বক্তব্য পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন এবং তাহার পরে পশ্চিমবঙ্গে নানা স্থানে তাহা বলিয়াছেন। ক্ষিতীশচন্দ্র পার্লামেণ্টে বা অন্যত্র বক্তৃতায় বক্তব্য ব্যক্ত করেন নাই বটে, কিন্তু একাধিক বিবৃতিতে চুক্তির ব্যর্থতা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের উক্তির প্রতিবাদ ভারত সরকার করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের যুক্তিও খণ্ডন করা হয় নাই। শ্যামাপ্রসাদ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, চুক্তি যদি সফল হয়, তবে তিনি তাহাতে আনন্দিতই হইবেন ; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, তাহা সফল হইবে না।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে একজন মাত্র হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা—যোগেন্দ্র মণ্ডল। তিনি—ইংরেজ যাহাকে "তপশিলী সম্প্রদায়" নাম দিয়াছে, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি দীর্ঘ ৩ বৎসর কাল নিষ্ঠা সহকারে পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। যখন বরিশালে মুসলমানদিগের দ্বারা হিন্দু নরনারীর উপর অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন বরিশালের অধিবাসী যোগেন্দ্রবাবু বরিশালে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সমধর্ম্মীদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এতদিনে তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগপত্রে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের দৃষ্টান্ত—এমন কি হত্যার হিসাব পর্য্যন্ত দিয়া সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন—হিন্দু মানুষের অধিকার লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতে পারিবে না।

চুক্তি নিষ্পন্ন হইবার পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ও এই কথাই—প্রকারান্তরে—বলিয়াছিলেন। ৮ই এপ্রিল চুক্তি সম্পাদিত হয়। ৩রা এপ্রিল তিনি মিষ্টার নুরুল আমীনের বিবৃতি উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন—

সত্য কথা এই যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে মুসলমানরা

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে তথা হইতে বিতাড়ন জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তাহারা সেই নীতি অনুসরণ করিবার জন্য সর্ব্ববিধ উপায়ই অবলম্বন করিয়াছে:—হিন্দুদিগের গৃহ অধিকার করিয়া হিন্দুদিগকে তাহাদিগের গৃহ ত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছে, হিন্দুদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহারা মুসলমান নহে তাহাদিগের সম্বন্ধে মুসলমানদিগের ধারণানুযায়ী কাজ করা হইয়াছে, হিন্দুদিগকে হত্যা করা ও তাহাদিগের গৃহাদি দগ্ধ করা হইয়াছে, হিন্দুদিগের গৃহ লুণ্ঠিত ও সম্পত্তি নষ্ট করা হইয়াছে, হিন্দুদিগকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা ও হিন্দু-নারী অপহরণ করা হইয়াছে।

অবশ্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিবের পদত্যাগ না করিলে বিধানচন্দ্র চুক্তির ব্যর্থতা প্রত্যক্ষভাবে বলিতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের সরকারের একাধিক বিবৃতির প্রতিবাদে তাঁহার সরকার যে সকল বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, সে সকলে পরোক্ষভাবে তাহাই বলা হইয়াছে এবং পাকিস্তান সরকার যে অনৃতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাহাও বলা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবৃতিগুলি অবশ্য পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকার ভিত্তিহীন বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উক্তি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—এমন প্রমাণ করিতে না পারায় কোন্ পক্ষের কথা সত্য তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবার কথা নহে।

যোগেন্দ্রবাবু তাঁহার পদত্যাগ পত্রে যাহা বলিয়াছেন, সেজন্য তিনি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী—চুক্তির এক পক্ষ—মিষ্টার লিয়াকৎ আলী খাঁন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পাকিস্তানীর বিরাগভাজন ও আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছেন। আবার তাঁহার পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া বহু হিন্দু তাঁহার আন্তরিকতায় আস্থা স্থাপনে দ্বিধাবিচলিত হইতেছেন। ইহা অবশ্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, মুসলমান দলের যাঁহারা তাঁহার জন্য বিলাপ করিতেছেন তাঁহারাও শিষ্ট ও অশিষ্টভাবে তাঁহাকে গালি দিলেও তাঁহার বিবৃতিতে প্রদত্ত সংখ্যার বা ঘটনার ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। সে অবস্থায়—বিশেষ তিনি মন্ত্রী থাকায় তাঁহার প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহের সুবিধা ছিল মনে করিলে—সহজেই বিশ্বাস করিতে হয়, তাঁহার পদত্যাগের কারণ যাহাই কেন হউক না, তাঁহার বর্ণিত ঘটনা যেমন সত্য, তাঁহার প্রদত্ত হিসাব তেমনই নির্ভরযোগ্য। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বা অন্যায় বলা যায় না। তিনি এতদিন পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত দুষ্ট হয় না—সেজন্য তিনি, ব্যক্তিগতভাবে, ক্রটির অপরাধে অপরাধী হইতে পারেন—এই পর্য্যন্ত। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া পাকিস্তান সম্বন্ধে আপনাদিগের অবলম্বিত ও অনুসৃত নীতির পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য কি না, তাহা ভারত সরকারকে বিশেষভাবেই বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ, নীতি যে অভ্রান্ত হইবেই এমনও নহে এবং যাহারা ঘটনার পরিবর্ত্তনে নীতির পরিবর্ত্তন করিতে অস্বীকার করে, তাহারা সুবুদ্ধির পরিচয়ও দেয় না।

উচ্চ শিক্ষার সমস্যা—

এদেশে উচ্চ শিক্ষার সংস্কারের কথা বহুদিন হইতে আলোচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যে শিক্ষা-পদ্ধতির নানা ক্রটি পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। এমন কি ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পরে—অদ্যাবধি—ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্য সরকার কোন সমিতি গঠিত করিয়া আবশ্যক চেষ্টাও করেন নাই। শিক্ষাদান-পদ্ধতি গতানুগতিক ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। এমন কি চিকিৎসা-বিদ্যার বাহনও দেশীয় ভাষা হয় নাই; পরন্তু যে সকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সরকার সে সকলের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতায় কলেজের সংখ্যা বর্দ্ধিত করায় কলিকাতা ব্যতীত চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার অন্য কেন্দ্র বাঙ্গালায় নাই।

অথচ বাঙ্গালা বিভাগের পরে কলিকাতায় উচ্চ-শিক্ষার্থীর সংখ্যা-বৃদ্ধি নিবারণ জন্য তাঁহারা ছাত্রদিগের কতকাংশকে মফঃস্বলে রাখিবার উদ্দেশ্যে মফঃস্বলে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রী সরকারের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা ১০ লক্ষ টাকা ঐ কার্য্যের জন্য দিয়াছেন। সে দিন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল বলিয়াছেন, জিলায় যোগ্য

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিকে মাধ্যমিক কলেজে এবং মাধ্যমিক কলেজগুলিকে অর্থ ও যন্ত্রাদি দিয়া উন্নত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে—ফলে কলিকাতায় উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদিগের আধিক্য নিবারিত হইবে।

দুঃখের বিষয়, এই ব্যবস্থা কতকটা "গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল" হইয়াছে। প্রথমতঃ কলিকাতার কলেজে ছাত্রসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ দেখা গিয়াছে, কলিকাতার ২টি নারী শিক্ষালয়ে—গোখলে মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউশনে ও ভিক্টোরিয়া কলেজে উল্লেখযোগ্য অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ কলিকাতার উপকণ্ঠে—যথা দমদম "মোতিঝিলে" ও বরিসায়—কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেজন্য টাকা দেওয়া হইয়াছে। অথচ মফঃস্বলে প্রায় প্রত্যেক জিলার সদরে সরকারী বা বেসরকারী কলেজ আছে। কৃষ্ণনগরের ও হুগলীর সরকারী কলেজ বহুদিনের এবং বর্দ্ধমানে রাজ-কলেজও তাহাই। তদ্ভিন্ন মুর্শিদাবাদে কৃষ্ণনাথ কলেজও নূতন নহে এবং তাহাও সমৃদ্ধ। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম (হেতমপুর)—এই সকল স্থানে কলেজ পূর্ব্ব হইতেই ছিল। আবার বাঙ্গালা বিভাগের ফলে বনগ্রামে, গোবরডাঙ্গায়, বসিরহাটে ও অন্য কয়টি স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সকলই সরকারের নূতন নীতি গ্রহণের পূর্ব্বের। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইগুলিকে আবশ্যক অর্থ-সাহায্য প্রদান করিয়া—বিশেষ ছাত্রাবাসের সুব্যবস্থা করিয়া এইগুলির উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইতেন, তবে একদিকে যেমন অনেক অল্প অর্থের প্রয়োজন হইত, অন্যদিকে তেমনই এইগুলি অধিক সংখ্যক ছাত্র আকৃষ্ট করিতে পারিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সরকার যদি বসিরহাটে প্রতিষ্ঠিত কলেজের উন্নতিবিধান করিতেন, তবে আবার কয় মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী টাকী নগরে কলেজ প্রতিষ্ঠার সার্থকতা থাকিত না। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে—সরকারের নূতন নীতিতে যে সকল নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকলে আশানুরূপ ছাত্র পাওয়া যায় নাই। ইহা অবশ্যম্ভাবী। জলপাইগুড়ীতে যে কলেজ আছে, তাহাতে ছাত্র ও ছাত্রী অধ্যয়ন করে। কিছুদিন পূর্ব্বে তথায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিবের গমনে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল—সেইজন্য কলেজ এখনও উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য লাভে বঞ্চিত আছে, অথচ ঐ সহরেই একটি স্বতন্ত্র কলেজ নারীদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখের অযোগ্য হইলেও তাহাতে সরকারী সাহায্য অকুণ্ঠভাবে প্রদত্ত হইতেছে।

বিদ্যাবিস্তারে সভ্য সরকারের আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু সেই আগ্রহ যদি বিচার-বিবেচনা উপেক্ষা করে, তবে তাহাতে অভিপ্রেত ফললাভ হয় না। বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে—কারীগরী শিক্ষার, চিকিৎসা শিক্ষার ও এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রয়োজন আজ যে কত অধিক তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যখন কেন্দ্রী সরকার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগের বিষয় বিবেচনা করিয়া কলিকাতার বাহিরে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১০ লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তখন সে অর্থে যাহাতে বাঙ্গালীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

কি কারণে মফঃস্বলে কলেজ থাকিলেও কলিকাতায় ছাত্রসমাবেশ এত অধিক হয়, কেন মফঃস্বল কলেজের অধ্যাপকগণ কলিকাতার কলেজে কাজ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন—সে সকল বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে হয়ত অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইত না—নূতন কলেজগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহ অনিবার্য্য হয়, তবে সেগুলিতে যে অর্থ প্রদত্ত হইবে তাহা অপব্যয়িত না হইলেও মিতব্যয়িতার বিরোধী হইত না।

আমরা আশা করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া—রাজনীতিক কারণ-নিরপেক্ষ হইয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন ও করিবেন এবং স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া ও কলেজের স্থায়িত্ব-সম্ভাবনা বিচার করিয়া সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন। এই প্রসঙ্গে আমরা পুনর্ব্বসতি-কেন্দ্র ও নিকটবর্ত্তী কলেজের বিষয় বিবেচনা করার প্রয়োজন সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। যাহাতে পুরাতন প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলির উন্নতি না হইয়া ক্ষতি হইতে পারে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা কখনই শিক্ষাবিস্তারের সহায় হইতে পারে না।

সাংবাদিকতা শিক্ষা—

সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা থাকা সঙ্গত কি না, এই প্রশ্ন বহুদিন হইতে জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিয়াছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কোন কলেজের অধ্যক্ষ থুইং—কয়জন সম্পাদকের মত লইয়া বলেন, তাঁহারা কেহই সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সমর্থন করেন না; কারণ, তাঁহাদিগের মত এই যে, সাংবাদিকের কার্য্য অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষনীয়।

কয় বৎসর হইতে কতিপয় সাংবাদিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন। গত ৩রা অক্টোবর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ব্যবস্থার আরম্ভ হইয়াছে।

যে দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা-শিক্ষাদান আরম্ভ হয়, তাহার পরদিন পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান সচিব একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন সংবাদপত্রকে (প্রত্যক্ষভাবে) অর্থসাহায্য প্রদান করেন না; কেবল যে সকল সংবাদপত্রে সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশ সরকারের পক্ষে সাহায্যকর মনে করেন, সেই সকল পত্রে (মূল্য দিয়া) বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ইংরেজের শাসন-কালে সরকার একদিকে সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনের ভয় ও অপরদিকে বিজ্ঞাপনের জন্য মূল্যদানের প্রলোভন দেখাইয়া সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার আরম্ভ হইবার কয়দিন পরে—৭ই অক্টোবর প্রধান-সচিব ঐ ব্যবস্থার "উদ্বোধন" করেন! রাজনীতিক ব্যাপারে পদস্থ ব্যক্তিদিগকে মত প্রকাশের সুযোগ দানের জন্য এরূপ ব্যবস্থার সুবিধা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তাহাই করা হইয়াছিল কি না, বলা যায় না।

সে যাহাই হউক তাঁহার বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব বলেন—

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। তিনি কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছেন, কিসে সংবাদপত্রের প্রচার-বৃদ্ধি হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সময় সময় সংবাদপত্র লিখিত হয়। তাহা ভয়াবহ। সেইজন্য রাষ্ট্রের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া তিনি মনে করিতেছেন—যে সকল সংবাদপত্র কোন বিশেষ সংবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে অধিক সময় ব্যয় করিবেন এবং প্রবন্ধ রচনায় সঠিক উদ্যম প্রযুক্ত করিবেন, সরকার তাঁহাদিগকে অর্থ-সাহায্য দিবেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব প্রকাশ্যভাবে যে ব্যবস্থা করিবার কথা বলিতেছেন, গোপনে সেই ব্যবস্থায় কোন কোন সংবাদপত্র প্রভাবিত হইয়াছেন সন্দেহ করিয়া একদিন শরৎচন্দ্র বসু এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তখনও সেরূপ কার্য্য সংবাদপত্রের পক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

আজ কি সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, সংবাদ-পত্রের পক্ষ হইতে এই উক্তির কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল না?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার রূপে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—স্বাধীনতা চাহি, স্বাধীনতা ব্যতীত আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি না। সংবাদ-পত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার—বিশেষ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট আটলাণ্টিক চার্টারে যে চতুর্বিধ স্বাধীনতা কাম্য বলিয়াছিলেন সে সকলের মধ্যে মত-প্রকাশ স্বাধীনতার জন্যই এত দিন সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। আজ কি ভারতের জাতীয় সরকার সংবাদপত্রের সেই মনো-ভাবের পরিবর্ত্তন সাধনে প্রচেষ্ট হইবেন—সংবাদপত্রের কর্ত্তব্যের পূত আদর্শ নষ্ট করিয়া রাষ্ট্রের স্বার্থের আদর্শই প্রবল করিতে চাহিবেন? কিন্তু রাষ্ট্রের স্বার্থ ও সচিব-সঙ্ঘের স্বার্থ অভিন্ন না-ও হইতে পারে; কারণ, রাষ্ট্র স্থায়ী, সচিবসঙ্ঘ অস্থায়ী এবং সাংবাদিকরা রাষ্ট্রের স্বার্থ সম্বন্ধে সচিবদিগের অপেক্ষাও অবহিত হইতে পারেন।

খাদ্যাভাব—

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে ভারত সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধি মিষ্টার বি, এন, রাও গত ২২শে অক্টোবর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক নগরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ভারতের লোকের বিশ্বাস, পৃথিবীর জনগণের অন্নাভাব ও মানুষের অযোগ্য জীবনধারণের মানই আজ শান্তির সর্ব্বপ্রধান শত্রু।

বোধ হয়, তাঁহার স্বদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়াই তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন। কারণ গত ৩ বৎসরেও ভারতের সরকার—জাতীয় সরকার—ভারতের অন্নাভাব দূর করিতে পারেন নাই—ভারতবাসীকে খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী করিবার উপায় করিতে পারেন নাই। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ ক্রয়ে ভারতের বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে—যে অর্থ দেশবাসীর মধ্যে থাকিবার কথা, তাহা বিদেশে যাইতেছে—দেশের রক্ত শোষিত হইতেছে। অর্থাৎ ভারত সরকারের বিঘোষিত "খাদ্যোপকরণ বর্দ্ধিত করার" নীতি ব্যর্থ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রথমে সদর্পে বলিয়াছিলেন, যাহাই কেন হউক না ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পরে ভারত সরকার আর বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করিবেন না। কিন্তু কয় মাস যাইতে না যাইতেই ভারত সরকারের খাদ্য-মন্ত্রীর মারফতে সে কথা প্রত্যাহার করিয়া বলিতে হইয়াছে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ নহে—১৯৫২ খৃষ্টাব্দের পরে ভারত সরকার আর বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করিবেন না।

ঠিক সেই ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সচিব—"আমরা বিপদ অতিক্রম করিয়াছি, আর খাদ্যের অভাব হইবে না" বলিবার কয় মাস পরেই—গত ২৩শে অক্টোবর বলিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সঙ্কট এখনও পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা যেন প্রয়োজন হইলে চাউল বর্জ্জন করিয়া গম ব্যবহার করিতে প্রস্তুত থাকেন। আমেরিকা হইতে চিনা বা কাওন জাতীয় ঘাসের বীজ কিনিয়া আনিবার পরেও এই কথা!

আর বিহারে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ ভারত সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী অস্বীকার করিয়াও এমন মুন্সিয়ানা করিতে পারেন নাই যে, মৃত্যু-সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। এখন বিহারে দ্রুত খাদ্যোপকরণ প্রেরণ করা হইতেছে। যথাকালে তাহা করিলে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত না।

আসামে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে অন্নাভাব।

রাজাগোপালাচারী সরস ও মৌলিক উক্তির জন্য বিখ্যাত। তিনি বলিয়াছেন, যদি গরু ও ছাগল ঘাস ও পাতা খাইয়া দেহ গঠিত করিতে ও উৎকৃষ্ট দুধ দিতে পারে, তবে বিজ্ঞানের সুবিধা পাইয়াও আমরা কেন ঘাস ও পাতা আহার্য্যে পরিণত করিতে পারিব না? একবার বাঙ্গালায় অন্নকষ্টের সময় ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট বলিয়াছিলেন, দেশে ঘাসের মূল থাকিতে লোক অন্নকষ্ট পায় কেন? রাজাগোপালাচারী মূল হইতে খাস ঘাসে উঠিয়াছেন।

কিন্তু কেহই অভাবের মূল কারণ দূর করিবার উপায় করেন নাই। রুসিয়া যে উপায়ে খাদ্যশস্যের ফলন বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, এদেশে খাদ্য শস্যের ফলন বৃদ্ধি করিতে অক্ষমতা অযোগ্যতার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অল্পদিন পূর্ব্বে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পরোক্ষভাবে এই কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের বার্ষিক ব্যয় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা—এই টাকার বিনিময়ে দেশবাসী কি পাইতেছেন? তিনি আরও বলেন, কোন কোন প্রদেশ ভারত সরকারের নিকট হইতে অর্থ লইয়া সেচের জন্য নলকূপ করিয়াছেন—প্রত্যেক নলকূপের জলে জমীতে একের স্থানে দুই ফশল ফলিতেছে; পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাও করেন নাই।

এখনও অনেক আবাদযোগ্য জমী "পতিত" রহিয়াছে এবং সেচের অভাব দূর করা হয় নাই।

গত ২৮শে অক্টোবর দিল্লীতে সেচ-বোর্ডের পরিচালক-মণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশনে সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল নদীর জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া কৃষির উন্নতিসাধন ও শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষজ্ঞদিগকে ভগীরথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সে কথায়ও নূতনত্ব নাই। কারণ ২০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে বিখ্যাত সেচ-বিশেষজ্ঞ সার উইলিয়ম উইলকক্স কলিকাতায় আসিয়া যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন খাত কাটিয়া জল প্রবাহ প্রবাহিত করার রূপক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ভারত সরকার কত দিনে ভগীরথের মত কাজ করিতে পারিবেন? স্যর উইলিয়ম বলিয়াছিলেন—দৃঢ়তাপূর্ণ হৃদয়মাত্র ভগীরথের সম্বল ছিল। ভারত সরকারের সেই অমূল্য সম্পদ আছে কি?

পূর্ব্বোক্ত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সেচ-বোর্ডের সভাপতি মিষ্টার মাথরাণী বলিয়াছেন—

কাগজে প্রায় ১শত ৬০টি সেচ পরিকল্পনা রহিয়াছে। সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে আনুমানিক ব্যয়—এক হাজার ২শত ৭৯ কোটি টাকা—হইবে। আর ঐগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে প্রায় ৯ কোটি ৩৬ লক্ষ বিঘা জমীতে সেচ করা যাইবে—ফলে ১ কোটি ৩ লক্ষ টন অধিক ফশল উৎপন্ন হইবে। আর পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই যেমন বন্যার উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাইবে তেমনই বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পাইবে।

ইহা যে শুনিতে ভাল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু কত দিনে ও কি উপায়ে ঐ অর্থ সংগৃহীত হইবে? যেমন খাদ্যোপকরণে আমাদিগের পরমুখাপেক্ষিতা যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিষম বিপদে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না, তেমনই দেশের লোকের দারিদ্র্য প্রশমিত না হইলে তাহাদিগের অধিক করপ্রদানের ক্ষমতা হইবে না। কেবল তাহাই নহে, লোক যত দিন পূর্ণাহার না পায়, ততদিন তাহার দৌর্ব্বল্য বর্দ্ধিত হয় এবং শ্রমক্ষমতা হ্রাস পায়। সে অবস্থায় তাহার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির আশা দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব বিধানচন্দ্র রায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি প্রধান-সচিব হইবার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছিলেন, তাঁহার মত এই যে, সুস্থ মানুষের পক্ষে দৈনিক (অন্ততঃ) ১৬ আউন্স খাদ্য প্রয়োজন। প্রায় ৩ বৎসরে কিন্তু তাঁহার সরকার সে প্রয়োজন মিটাইতে পারেন নাই! পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় ভূগর্ভে রেল পথ প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না সেই পরীক্ষায় অনেক টাকা ব্যয় বা অপব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু ভূমি হইতে অধিক শস্যোৎপাদনের উপায় করিতে পারেন নাই। সেদিনও পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল আক্ষেপ করিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। সেই অবস্থায় সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—লোকের অন্নাভাব দূরীকরণের উপায় অবলম্বন; না রাজধানীতে বিলাসের ব্যবস্থা করা? বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগের পরীক্ষাফল—পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬১ জনের দেহে যক্ষ্মার বীজ রহিয়াছে। যক্ষ্মা কি অপূর্ণাহারজাত হইতে পারে না?

আমরা পশ্চিমবঙ্গে যে অন্নাভাব লক্ষ্য করিতেছি, ভারত রাষ্ট্রের প্রায় সর্ব্বত্র তাহা বিদ্যমান। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—যদি দুর্নীতিদুষ্ট না হয় তাহা হইলেও—এই সমস্যার সীমারেখাও স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ অন্নাভাবজনিত সমস্যার সমাধানই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রথম্ প্রয়োজন। সে কার্য্য পরিকল্পনার দ্বারা হইতে পারে না—পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা ব্যতীত উপায় নাই। সেজন্য লোকের যে সহযোগ প্রয়োজন, তাহা লাভ করিবার উপায়ও সরকারকে চিন্তা ও অবলম্বন করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শন—

কংগ্রেসের সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ও ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। কেহই সমস্যাবহুল পশ্চিমবঙ্গের কোন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেন নাই। কেহই পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অভ্যর্থনার আড়ম্বরে অর্থব্যয়ে আপত্তি করেন নাই। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে দুর্গোৎসবে রাজপথে তোরণ নির্ম্মাণে আপত্তি হইলেও ইঁহাদিগের আগমনে তাহা নির্ম্মাণে আপত্তি হয় নাই। সাজসজ্জায় যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা যে বাস্তহারাদিগের জন্য শীতবস্ত্রের জন্য ব্যয়িত হয় নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের পরিদর্শন নিয়মানুগ—ইংরেজ গভর্ণর-জেনারলরা এই নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—তাহা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনকে নির্ব্বাচনে যে দল সমর্থন করিয়াছিলেন, পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেসের সেই দলই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহারাই তাঁহার জয়যাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগেরই ব্যবস্থায় তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেও জাতীয়তার জনক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিপূত ভারত সভার সম্বর্দ্ধনায় ৮ মিনিটের অধিক সময় ব্যয় করিতে পারেন নাই—অন্যান্য সম্বর্দ্ধনায় অনেক সময়

দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল। সেই সকল অনুষ্ঠানের একটি—হিন্দী সাংবাদিক ও কবি বালমুকুন্দ গুপ্তের স্মরণোৎসব। সেই সভায় পুরুষোত্তমদাস তুলনায় সমালোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—হিন্দী সাহিত্যই রত্ন, ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য কাচ মাত্র এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা কবিরের ভাবের প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ যেমন বাঙ্গালায় শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বালমুকুন্দ গুপ্ত তেমনই হিন্দী সংবাদপত্রের কাজ শিখিবার জন্য বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালী গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছিলেন। তখন 'হিন্দী বঙ্গবাসী' সমগ্র ভারতে সর্ব্বপ্রধান হিন্দী সংবাদপত্র; আর অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী তাহার সম্পাদকরূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত। বালমুকুন্দ গুপ্ত যে তাঁহারই সহকারী হইয়া কলিকাতায় আসিয়া সংবাদপত্রের পরিচালন শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন—সে কথা স্মরণ করিতে পারেন, এমন বাঙ্গালী এখনও জীবিত আছেন। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের মতের মূল্য যে অধিক নহে তাহা মনে করিলে "অপরাধ" হইবে না। কারণ একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এপর্য্যন্ত যে ৩ জন ভারতীয় বিশাল বিশ্বের সভ্যদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা—ভারতের রাষ্ট্রদূত নহেন—সংস্কৃতি দূতরা—৩ জনই বাঙ্গালী। সে ৩ জন—রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন কংগ্রেসের দলাদলির আবর্ত্তে পড়িয়া ভারতে যে নূতন প্রাদেশিক দলাদলির প্রভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার পরে কংগ্রেসের সহিত সরকারের সম্বন্ধ কি, তাহাও কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সমর্থিত প্রার্থীকে পরাভূত করিয়া অন্য দলের সমর্থিত পুরুষোত্তমদাস এবার কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—অথচ তিনি পণ্ডিত জওহরলালের কংগ্রেসের পরিচালন সমিতিতে যোগদানে অস্বীকৃতি অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁহাকে বাদ দিয়া সমিতি গঠিত করিতে সাহস করেন নাই। সে বিষয়ে মিষ্টার আবুল কালাম আজাদ প্রধান মন্ত্রীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটী রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সম্বর্দ্ধনারও ত্রুটি করেন নাই।

তিব্বতে চীনের অভিযান—

আসামে যাইয়া ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাজনীতিক হিসাবে আসামের গুরুত্ব সম্বন্ধে আসামবাসীদিগকে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, তাহার সীমান্তে পররাষ্ট্র—ব্রহ্ম, তিব্বত ও পাকিস্তান। তিব্বতের সংবাদ শান্তিদ্যোতক নহে। ইংরেজ কখন তিব্বতে চীনের অধিকার অস্বীকার করেন নাই—বর্ত্তমান ভারত সরকারও সেই মত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতের বড়লাট, তখন তিনি তিব্বতে সেনাদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি রুশিয়াকে তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করিতে দিবেন না এবং তিব্বতের সহিত ভারতের বাণিজ্য-বিস্তারের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তিব্বত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফলে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে অশান্তির উদ্ভব হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতে চীনের প্রাধান্য স্বীকৃত ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন চীনে কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং চীন রুশিয়ার সহিত "এক নায়েতে" আরোহী। চীন এখন তিব্বতের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদীর প্রভাবমুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। ইহার অর্থ কি, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। কারণ, যদিও অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই বলিয়াছিলেন শান্তিপূর্ণ ভাবেই—অর্থাৎ বিনা অস্ত্রাঘাতে তিব্বতের সমস্যার সমাধান হইবে—ইহাই চীন সরকারের আশা এবং যদিও পিকিংযাত্রী তিব্বতীয় দূতগণ দিল্লীতে ভারত সরকারের সহিত আলোচনারত ছিলেন এবং সেই জন্য ভারত সরকার চীনের তিব্বতে সেনাবল প্রেরণের সংবাদে আস্থাস্থাপন করেন নাই—তথাপি চীনা সংবাদে প্রকাশ—চীনের কম্যুনিষ্ট সরকারের সেনাদলকে তিব্বতে প্রবেশ করিতে আদেশ দান করা হইয়াছে। যদিও চীনের সহিত তিব্বতের সম্বন্ধ তাহাদিগের "পারিবারিক ব্যাপার" একথা চীন সরকার বলিয়াছেন, তথাপি ভারত সরকার এই ব্যাপারে—নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না।

পিকিংএ ও লাসায় কেবল ভারত সরকারেরই প্রতি-

নিধি আছেন। তথাপি ভারত সরকার যখন বেতারে সংবাদ জানিবার চেষ্টা করেন, তখন ভারত সরকার কোন উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই রুশিয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, চ্যানের কম্যুনিষ্ট বাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করিতে আদিষ্ট হইয়াছে। শেষে পিকিংএ ভারতের রাষ্ট্র-দুত সর্দ্দার পানিক্কার ঐ সংবাদ সমর্থন করেন। কোন রাষ্ট্র যদি তিব্বতকে চীন-বিরোধী কার্য্যের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করে, তবে চীন তাহাতে আপত্তি করিলে—তাহা তাহার পক্ষে অন্যায় হয় না; কারণ তিব্বত চীনের প্রভাবাধীন।

এ দিকে তিব্বতে এক দল যেমন দালাই লামার, আর এক দল তেমনই পঞ্চম লামাদিগের পক্ষাবলম্বী; সুতরাং অযোগ্য সেনাবল লইয়া তিব্বতের পক্ষে চীনা বাহিনীর গতিরোধ করা সম্ভব হইবে না। সেই জন্য চীনা বাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করিবে, এই সংবাদে তিব্বতের রাজধানীতে বিশেষ চাঞ্চল্যের ও ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। পঞ্চম লামার বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র—তিনি এখন তিব্বত-চীন সীমান্তের নিকটে কম্যুনিষ্টদিগের রক্ষণাধীন। যদি কম্যুনিষ্ট বাহিনী প্রবল হয়, সেই ভয়ে দালাই লামা প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বৃটিশ সরকারের আশ্রয়লাভ করিবেন কি না, তাহা বলা যায় না।

হয় ত তিব্বতই বিশ্বযুদ্ধে ইন্ধন যোগাইয়া যুদ্ধ বিস্তারের কারণ হইবে। কারণ, বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদ ও কম্যুনিজম পরস্পরের সহিত শক্তি-পরীক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত।

তিব্বত সম্পর্কে "অযোগ্য" দলের উপর আস্থা স্থাপন করায় কোন কোন আমেরিকান পত্র ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিন্দা করিতেছেন। অথচ আমেরিকাই তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়া আসিয়াছেন। তবে—

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ।"

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ—

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ গত বিশ্বযুদ্ধের পরে "লিগ অব নেসন্সের" চিতাভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উভয়েরই উদ্দেশ্য—

"সহস্র বৎসর উৎকট বিগ্রহ-
উত্তাপে ধরণী জরা,
সহস্র বৎসর শান্তির সলিলে
শীতল হউক ধরা।"

"লিগের" উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা-কালেই ঐতিহাসিক ওয়েল্‌স বলিয়াছিলেন—যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যুদ্ধান্তে পৃথিবী গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করিতে আসিয়া তাহা ভণ্ডামীর জন্য নিরাপদ করিয়া যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা বাঁচিবে কি না, সন্দেহ। নূতন প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারা যায়।

"লিগ" য়ুরোপের কয়টি প্রধান দেশের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে আমেরিকার প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্প্রতি ইহার জন্মোৎসবে পৃথিবীর নানা দেশে উৎসবানুষ্ঠান হইয়াছে। সেই উপলক্ষে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান বলিয়াছেন:—

"আজ যখন যুদ্ধের ভয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত, তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যুদ্ধ অনিবার্য্য মনে করি না—মনে করি, যুদ্ধ নিবারিত হইতে পারে। যুদ্ধ নিবারণে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ বিবিধ কাজ করিতে পারেন:—

(১) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার দ্বারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ-মীমাংসা।

(২) যে সকল জাতি সঙ্ঘের সদস্য তাহাদিগের সমবেত শক্তি প্রযুক্ত করিয়া আক্রমণ নিবারণ।

(৩) আক্রমণের ভয় দূর হইলে জাতিসমূহের রণ-সজ্জার ব্যয়সঙ্কোচ।"

তিনি বলিয়াছেন—সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘকে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য মীমাংসার মত বলপ্রয়োগের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

এই উক্তি জাতিসমূহকে—আপাততঃ—সমরায়োজনে ব্যাপৃত করিবে। সে অবস্থায়—যখন কোথাও বারুদের স্তূপ থাকে তখন—তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গপাতে কি ঘটিতে পারে, তাহা বলা যায় না। সুতরাং শান্তি যে স্থায়ী হইবেই এমন বলা সম্ভব নহে।

কোরিয়ায় তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং কোরিয়ার

দুই অংশে যুদ্ধে সে ভাবে—নির্ব্বিঘ্নতা পরিষদের অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়াই—আমেরিকা এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে এবং পরিষদ, পরে তাহার নীতির সমর্থন করিয়াছে, তাহাতে জাতিসঙ্ঘের গঠন যে গণ-তান্ত্রিক নীতির অনুমোদিত তাহাও বলা যায় না।

ভারতবর্ষে সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকার—অ্যাংলো-আমেরিকান ব্লকের সমর্থক এবং সেই জন্য ঐ দেশদ্বয়ে আদর লাভ করিয়াছেন—তাঁহারা ভারতের প্রধান মন্ত্রীর রাজনীতিক বুদ্ধির প্রশংসাই করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ভারত সরকার সঙ্ঘে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে সে প্রশংসা নিন্দায় পরিণত হইয়াছে!

প্রশংসায় পরিতুষ্ট হইয়া ভারত সরকার যখন কাশ্মীর সমস্যার সমাধান জন্য জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন আর সপ্তাহকাল মধ্যে ভারত সরকারের সেনাবল অনায়াসে কাশ্মীর অধিকার করিতে পারিত। কিন্তু মধ্যস্থতা প্রার্থনা করায় কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান হওয়া ত পরের কথা, জটিলতা-বৃদ্ধিই হইতেছে। সুতরাং জাতিসঙ্ঘের দ্বারা ভারত রাষ্ট্র উপকৃত হইয়াছে কি না, সন্দেহ।

আবার কোরিয়ায় আমেরিকান সেনাদলের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘনে বিস্ময় প্রকাশ করায় পণ্ডিত জওহরলালের রাজনীতিক বুদ্ধির নিন্দা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যতক্ষণ অ্যাংলো-আমেরিকান দলের কার্য্য অবিচারিতভাবে সমর্থন করা হয়, ততক্ষণই তাঁহাদিগের প্রশংসা লাভ করা যায়।

মিষ্টার লাই মতপ্রকাশ করিয়াছেন—"যদি সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পতন হয়, তবে আমাদিগের ভবিষ্যতে আর কোন আশাই থাকিবে না।" তিনি আমরা বলিতে কাহাদিগকে বুঝেন, তাহা ব্যক্ত করা হয় নাই। কিন্তু আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে উত্থান-পতনের বহু দৃষ্টান্তে অভ্যস্ত, সুতরাং এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলেই যে সর্ব্বনাশ হইবে, এমন মনে করিতে পারি না।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পৃথিবীর ন্যায় ও শান্তির অনুরাগী-মাত্রকেই সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পতাকাতলে সমবেত হইতে আহ্বান করিয়াছেন; কারণ, তাঁহার মতে, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘই জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায় ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

কিন্তু যতদিন দুর্ব্বল জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত ও সম্মানিত না হইবে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদ অন্তর্হিত হইয়া সাম্যবাদের ভিত্তি দৃঢ় না হইবে, যতদিন আধ্যাত্মিকতা পশুবলের স্থান গ্রহণ না করিবে—ততদিন স্বার্থের সঙ্ঘাতে যুদ্ধ অনিবার্য্য থাকিবে। আমেরিকার বহু-বিঘোষিত "মনরো নীতি"ও যে তাহাকে বিশ্বযুদ্ধদ্বয়ে নির্লিপ্ত রাখিতে পারে নাই এবং এবার যে আমেরিকা কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই আমাদিগের এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। জড়বাদ-জর্জ্জরিত ইহকাল-সর্ব্বস্ব সভ্যতা স্বার্থের স্থানে পরার্থের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না।

কোরিয়া ও ইন্দো-চীন—

অগ্নি যখন ভস্মাচ্ছাদিত থাকে, তখন বাতাসের ফুৎকারে তাহার আত্মপ্রকাশে বিলম্ব হয় না। জগতের দেশসমূহ মুখে শান্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেও প্রকৃত স্বার্থে সামান্য আঘাতে বা কল্পিত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় সহজেই পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে। কোরিয়ায় ও ইন্দো-চীনে যুদ্ধের গতি সমুদ্রের তরঙ্গের মত অগ্রসর হইতেছে ও ফিরিয়া যাইতেছে। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়া আমেরিকা যে আঘাত করিয়াছে, তাহা প্রবল। কিন্তু সেই আঘাত করিয়াই আমেরিকা নিরস্ত হয় নাই। তাহাতেই তাহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ঘটিতেছে। কাজেই যুদ্ধের ফলে কোরিয়ার কোন্ পক্ষ প্রকৃত উপকার লাভ করিবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে কম্যুনিজমের শক্তিনাশই যে অ্যাংলো-আমেরিকান দলের উদ্দেশ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। হয়ত যুদ্ধের তরঙ্গ ফরমোশায়ও আপতিত হইবে। কিন্তু কমুনিষ্ট চীন ও কমুনিষ্ট রুশিয়া যে ভাবে যুদ্ধে যোগদানে বিরত রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তাহারা অপর পক্ষের বল লক্ষ্য করিয়া প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিতেছে। কৌরব-সভায় দ্যূতক্রীড়াকালে পাণ্ডবগণ এইরূপ কাজই করিয়াছিলেন এবং আপনারা প্রস্তুত হইয়া যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই কুরুক্ষেত্রে

ফলাফল নির্দ্ধারণ হইয়াছিল। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি উত্তর কোরিয়ায় "কোরিয়ার সরকার" স্থাপনের প্রস্তাব গত ২৩শে অক্টোবর করিয়াছেন; আর কম্যুনিষ্টরা বলিতেছেন, কোরিয়ার গণতন্ত্রের কথা কেবল পুত্তলিকা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

ইন্দো-চীনে ভিয়েৎমীনের সেনাবল চীনের সীমান্তে ফ্রান্সের অধিকৃত পথের শেষ ৭৫ মাইল স্থান আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ফরাসী সামরিক কর্ত্তারা ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

ভিয়েৎমীনে যদি ফরাসীদিগের পরাভব ঘটে, তবে এশিয়ায় কম্যুনিষ্টরা প্রবল হইয়া উঠিবে। ইহা যেমন ফ্রান্সের, তেমনই সাম্রাজ্যবাদী ধনিক-তন্ত্রী দেশ মাত্রেরই অভিপ্রেত নহে। সেই জন্যই ইন্দো-চীনে জাতীয় দলের সহিত যুদ্ধ দীর্ঘকালস্থায়ী হইতেছে। ফ্রান্স যে ভারতেও তাহার অধিকার ত্যাগে অনিচ্ছুক, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। এমন কি ফ্রান্স বহুমতে চন্দননগর ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেও চন্দননগর সম্বন্ধে এখনও পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় নাই। গত ২৯শে অক্টোবরের সংবাদ—ভিয়েৎমীনের সেনাদল লায়োকের উপকণ্ঠে উপনীত হইয়াছে। ইন্দো-চীনের যে অংশে ধান্যের চাষ হয়—অর্থাৎ যে অংশ স্বর্ণপ্রসূ বলা যায়—তাহা ভিয়েৎমীন দলের হস্তগত। যদি উত্তর ইন্দো-চীনে ফরাসী সীমান্তস্থ লায়োকে দুর্গ তাহারা অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে সমগ্র ইন্দো-চীনে ফরাসীদিগের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইবে না।

এদিকে কাশ্মীরের ব্যাপারের সুযোগ যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ লইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা—তাহাদিগের সম্বন্ধে আস্থাবান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও শ্রীনগরে বলিয়াছেন। সেই সকল দেশ পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশরক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত সেনাবলের প্রয়োজন।

সুতরাং যাঁহারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এতদিন অ্যাংলো-আমেরিকান "ব্লকের" মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাঁহারাও মতের পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছেন। যে দেশ আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না—সে দেশ শোষণে সর্ব্বস্বান্ত হয়। উপনিবেশ গঠনের উদ্দেশ্য তাহাই।

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৫৭

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হে সর্ব্বনিয়ন্তা দেব—এক, অদ্বিতীয়,
সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা হে অচিন্ত্যনীয়,
সমস্ত করিয়া পূর্ণ আছো বিদ্যমান
অনিত্যের মাঝে নিত্য সর্ব্বজ্ঞ মহান।
তোমারে যে নেহারিল হৃদয়-মন্দিরে
পেলো সে শাশ্বত শান্তি; সন্দেহ-তিমিরে
হেরিয়া সত্যের জ্যোতি হোলো নিঃসংশয়।
আর যারা শিরোধার্য্য করিয়া বিষয়
মৃগতৃষ্ণিকার পিছে ছুটিল উন্মনা—
অধ্রুব যা তারই মাঝে ধ্রুবেরে কামনা
করিল মোহের বশে—সেই মূঢ়মতি
বালকেরা অন্তহীন লভিল দুর্গতি;
জড়ালো মৃত্যুরজালে; অন্ধকার হোতে
অন্ধকারে ভেসে গেল প্রবৃত্তির স্রোতে।
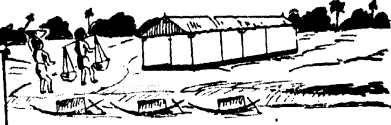
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নিঃশেষিত পুষ্পফল—রিক্তপত্র পল্লব—উদ্ভিদ জগতে বৎসরে বৎসরে আসে নববসন্ত। জীবজগতে বৎসরে বৎসরে—অথবা, একটি নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তরে আসে জীবন বসন্ত—বসন্তের স্পর্শে নারী-পশু উতলা হইয়া তাহার বাসা ছাড়িয়া বাহির হয়, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে অকস্মাৎ উন্মনা হইয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ডাক দেয়। বিচিত্র ডাক। সে ডাকের উত্তর একদিন আসে। পুরুষ-পশু সাড়া দিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়ায়। মানুষের জীবনেও হয় তো এমনিই হয়, নব নব বসন্তের সাড়া হয় তো দেহকে নাড়া দিয়া বলে—পুরাতনকে পিছনে ফেলিয়া নূতনের সন্ধানে চল, কিন্তু মানুষের মন তা' চায় না। বহু সহস্র বৎসরের তপস্যায় যে মন অহরহ জীবন চাঞ্চল্যের মধ্যে স্থির হইয়া অতীত বর্ত্তমান মিলাইয়া ভবিষ্যত রচনা করে—যে মন মরজগতের মধ্যে অমৃতকে আবিষ্কার করিয়া আস্বাদন করিয়াছে—সে মন তা চায় না। মানুষের সেই মন মহাকালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে; তাহার যে ভালোবাসার ধনকে মৃত্যু হরণ করে, তাহার সকল অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া তাহাকে লয় করিতে চায়—মানুষের মন তাহার অন্তরের অমৃতে সঞ্জীবিত করিয়া নিজের আমরণ জীবনে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া রাখে। সে অমৃত ভালোবাসা। মানুষের মন যাহাকে ভালোবাসিল—তাহাকে তাহার ভুলিবার উপায় নাই। দেহ তার যত জোরালো দাবী লইয়াই আসুক—এ ভালোবাসার কাছে তাহাকে মাথা হেঁট করিয়া হার মানিয়া মাটিতে মিশাইয়া যাইতে হইবে। সেই কারণেই তো যে জন মরিয়া গেলে তাহার জন্য একজনও কেহ কাঁদিবার থাকে না—এ সংসারে সব চেয়ে বড় দুর্ভাগা সেই জন! মানুষের এই মনই তো—তপস্বিনী সাবিত্রী, সে শত দুর্যোগেও সদাজাগ্রত, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভালোবাসার ধনকে—সে আপন মনের মধ্যে নূতন জীবনে বাঁচাইয়া তোলে। ভালোবাসা যেখানে নাই—সেখানকার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যেখানে আছে—সেখানে—এই কথাই মহাসত্য।

—স্বর্ণকে কথাটা বলতে পারি নি, রূঢ় হবে ব'লে। আপনাকে বলছি। বলুন তো—স্বর্ণ কি আপনাকে হারিয়ে—নূতন জনকে নিয়ে আবার জীবন সুরু করতে পারবে? সে যখন বাল্যকালে বিধবা হয়ে—আপনাকে বিবাহ করেছে—তখন অন্ততঃ তার কাছে সমাজপ্রভাব—মনের বিকৃত ধর্ম্মভয়, এ সবগুলো তো একেবারেই নাই!

কথা হইতেছিল দেবুর সঙ্গে। অরুণার এই পরিবর্ত্তন যেন গোটা পৃথিবী সহ্য করিতে পারিতেছে না! অরুণা যেদিন আসিয়া পৌছিয়াছিল—সেদিন দেবু আত্মগোপন করিয়া রেল কলোনীর মধ্যে লুকাইয়া ছিল; সেখানে বসিয়াই কথাটা সে শুনিয়াছিল। শুনিয়া অবধি তাহার অস্বস্তির সীমা ছিল না। দিন দুয়েক পরেই সে একদিন রাত্রে জংসন হইতে হাঁটিয়া—পরবর্ত্তী ডাউন ষ্টেশনে গিয়া আপ্ ট্রেণে জংসন ষ্টেশনে প্রকাশ্যভাবে নামিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েক জায়গায় খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে, কয়েক জনকে ডাকিয়া পুলিশ অনেক জিজ্ঞাসাবাদও করিয়াছে। দেবু ষ্টেশনে নামিতেই তাহাকেও পুলিশ ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে, এস-পি সামসুদ্দিন তাহাকে বেশ শাসাইয়াও দিয়াছে—বলিয়াছে—তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। তোমার চেয়ে অনেক চতুর আমরা। খবর আমরা সবই রাখি। হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—পিঠের চামড়া আমি তুলে নেব তোমার and then···; and then I shall send you to Port Blair—you understand? হাঁ!

দেবু স্থির হইয়া বসিয়াছিল—এতটুকু চঞ্চল হয় নাই। সামসুদ্দিন বলিয়াছিল:—হাঁ। আর একটা কথা। Tell

that—biteh—that—woman—তোমাদের মিসেস্ ভটচায্যি গো, তাকে বলো—কাদা মাখলে যমে ছাড়ে না, থান কাপড় পরলে—একাদশী করলে—আমি ছাড়ব না। দরবারী ঘাবড়েছে—আই-বি ইনস্পেক্টর ঘাবড়েছে—they were fools.—আমি ঘাবড়াতাম না। এর পর আমিই তাকে ডাকব! যত—সব!

দাঁতে-দাঁতে টিপে বলেছিল—কোন ধর্ম্ম মানে না, সুবিধের জন্য হিন্দু থেকে মুসলমান হয়, আবার শুদ্ধি ক'রে হিন্দু হয়—সেই মেয়ে আজ থান প'রে বিধবা সেজে একাদশী করেছে! well—tell her—রথ তার জন্যে আসবে—Prison van.—স্বর্গে তাকে আমি পাঠাব!

যাক সে সব কথা!

দেবু পুলিশ আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া সর্ব্বাগ্রে দেখা করিল অরুণার সঙ্গে। দেখা করিয়া বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া গেল; কৃত্রিম বিস্ময়ে অভিভূত হওয়ার ভাণ করিল। অন্যথায় সকল জিজ্ঞাসাই রূঢ় হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। যথাসাধ্য মুক্ত মন লইয়া অরুণাকে বিচার করিয়া বুঝিবার তাহার অভিপ্রায় ছিল। একেবারে অরুণার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—অরুণা দি! মধ্যে মধ্যে সে অরুণাকে দিদি বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

অরুণা তখন ঘরের মধ্যে বসিয়া নিজের জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। সেই অবধি অর্থাৎ যেদিন হইতে সে থান কাপড় পরিয়াছে সেইদিন হইতে তাহাকে কমজনের শ্লেষপূর্ণ বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখীন হইতে হইল না। তাহার পরিচিত যে তাহাকে দেখিল সেই বিস্ময় প্রকাশ করিল—তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে শ্লেষ মিশাইয়া প্রশ্ন করিল—এ কি?

তারপর কেহ হাত দিয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়া প্রশ্নটা করিল ইঙ্গিতে, কেহ বা দৃষ্টিতেই প্রশ্নটা ফুটাইয়া তুলিল, দু-চারজন মুখ ফুটিয়াই প্রশ্নটা করিল—হঠাৎ এ রকম বেশবাসের পরিবর্ত্তন? একজন প্রৌঢ় সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়াছেন—"একি রূপ হেরি হরি—ধরেছ যোগীর বেশ?"

অরুণা তাহাদের সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছে—এই ভাল লাগল!

—হঠাৎ!

—হ্যাঁ—হঠাৎ। হঠাৎ এই ইচ্ছে হ'ল, এই ভাল লাগল?

এই উত্তর দিয়াও কিন্তু সে বারবার নিজেকে যাচাই করিয়া দেখিয়াছে, নিজেই নিজেকে জেরা করিয়া আপনাকে বুঝিয়াছে:—বুঝিয়াছে—তাহার ভালবাসা সত্য। এ ভালবাসার নির্দ্দেশ—দাবী লঙ্ঘন করিলে—জীবনে তাহার দুঃখ-অশান্তির আর অন্ত থাকিবে না; জ্বলিয়া পুড়িয়া জীবনটা খাক্ হইয়া যাইবে। যেখানে ভালবাসা নাই—সেখানে ভালবাসার ভাণ করিয়া অথবা অসহায় ভাবে সমাজের নির্দ্দেশে—দেহের দাবীকে উপেক্ষা করিলে যে অশান্তিতে মন পুড়িয়া যায়, এখানে মনের দাবী উপেক্ষা করিয়া নূতন জীবন দর্শনের পুঁথির নির্দ্দেশে দেহের দাবীকে বড় করিতে গেলে—অশান্তি হইবে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী। আজও যতবার সে শ্লেষপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়—ততবার সে এই উপলব্ধিকে যাচাই করিয়া দেখে। যাচাই করিয়া দেখিতে গিয়াই—বিশ্বনাথের জন্য সে কাঁদে, এই কান্নার চোখের জলই তাহার উপলব্ধিকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া তোলে। সমস্ত সংকোচ, লজ্জা, বেদনা ধুইয়া মুছিয়া যায়, অনাবিল প্রসন্নতায় অরুণার অন্তর বাহির অপরূপ মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠে। হয়ত দুইদিন স্বর্ণের শ্লেষ-তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের সম্মুখীন হইয়া আবার নিজেকে যাচাই করিয়া দেখিল, একটা গোটা রাত্রি সে বিশ্বনাথের জন্য কাঁদিল। কান্নার মধ্যেও সে নিজেকে প্রশ্ন করিল; অতি রূঢ় প্রশ্ন,—বোধ করি তাহার জীবনের রূঢ়তম প্রশ্ন; নিষ্ঠুর উত্তেজনায় মায়া মমতাহীন হইয়া সকল চক্ষু লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্ণই তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। বলিয়াছিল—আজ যে বিশ্বনাথবাবুর কিশোর রূপ মনে প'ড়ে আপনি আকুল হয়ে উঠেছেন—অরুণাদি সে আকুলতার মূলেও কি দেহ নেই আপনার? ওই যে অজয়কে আপনার করে পেতে চাচ্ছেন—স্বামীর বদলে ছেলের রূপে পেতে চাচ্ছেন—সেও কি আপনার ওই চাওয়ারই রকম-ফের নয়? আপনি তো আমার চেয়ে অনেক পড়েছেন—অনেক জানেন—বলুন না—সেটার সত্য অর্থ তো আপনি না-জানা নন—

স্বর্ণ যেন অরুণার কণ্ঠনালীটা চাপিয়া ধরিয়া শ্বাস-রুদ্ধ

করিয়া দিয়াছিল, শুধু বাতাসই নয়—প্রসন্ন প্রভাতালোক মুছিয়া দিয়া নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকার লেপিয়া দিয়াছিল—বিশ্বসংসারের সর্ব্বাঙ্গে। সে হাত নাড়িয়া ইসারা করিয়া স্বর্ণকে বারণ করিয়াছিল—থাম স্বর্ণ, থাম।

স্বর্ণ থামে নাই। কথা শেষ করিতে বাকীও বড় কিছু ছিল না, শুধু আরও একবার উত্তরের সদর্প দাবী জানাইয়া সে থামিল—বলুন—বুকে হাত দিয়ে সত্য কথাটা বলুন শুনি! কথা শেষ করিয়া সে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, উত্তেজনায় অল্প অল্প হাঁপাইতেছিল।

অরুণা চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠস্বরে ধীরে ধীরে বলিয়াছিল—তোমার কথা এতটুকু মিথ্যে নয় স্বর্ণ, বর্ণে বর্ণে সত্য, তাকে আমি স্বীকার করছি; আমার এ চাওয়ার মধ্যেও দেহ আছে। কিন্তু—

মধ্য পথে বাধা দিয়া অসহিষ্ণু স্বর্ণ বলিয়া উঠিয়াছিল—এর পর আর কিন্তু কিসের অরুণাদি?

আছে। আলো আর অন্ধকার প্রখরতম আর গাঢ়তম অবস্থায় এক হয়ে যায় এবং অভিন্নও বটে, কিন্তু তা বলে আলো আর অন্ধকার স্বতন্ত্র হয়ে যখন প্রকাশ পায় তখন সে ভিন্ন বস্তু। তার রূপই ভিন্ন নয়—তার স্পর্শ, তার প্রভাব, তার ক্রিয়া সব ভিন্ন। স্বর্ণ—যে কোন নারীর যে কোন পুরুষ হলেই জীবনের দাবী মেটে না। আমার স্বামার স্থানে আর কাউকে বসিয়ে আমার দাবী মিটবে না, সেটা হবে মদ খেয়ে নেশা করে আনন্দ সন্ধান করার মত, তার ফলে দেহ-মন দুইকেই আরোগ্যের বদলে বিষাক্ত রুগ্ন করে তুলবে। অজয়কে আমি আমার সন্তানরূপে পেলে তবেই মিটবে আমার জীবনের দাবী। তার মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে—তার কপালে চুম্বন দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিয়ে দেহ-মন দুয়ের কথা—স্বর্ণ আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে—ভরে উঠবে। এর কদর্থ করতে চেষ্টা করো না স্বর্ণ—মূলে এর অর্থ যাই হোক—মুক্ত বেণীর মত দুই ধারায় পৃথক হওয়ার পর অর্থও পৃথক হয়ে গেছে। ও দুইয়ে মেশাতে চেষ্টা করো না—এক নদী দুই শাখায় ভাগ হয়ে গেলে তখন আর এক থাকে না—দুই ধারার জলে একই গুণ থাকে না। মাটির গুণে ধারার রঙ পাল্টায়—গুণও পাল্টায়। যে বোঁটায় ফুল ফোটে সেই বোঁটাতেই ওই ফুল থেকে যে ফল ধরে সে দুটোর বোঁটা এক বলে—এক জিনিষ নয় স্বর্ণ।

একটু চুপ ক'রে একটা নিশ্বাস নিয়ে তারপর বলেছিল—এর বেশী আর আমাকে জিজ্ঞাসা করো না স্বর্ণ, উত্তর আমি আর দেব না।

স্বর্ণ তবু আবার কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বাধা দিয়া অরুণা বলিয়াছিল—বিচারকের আসনে বসবার চেষ্টা করো না স্বর্ণ। নিজের অধিকারের কথাটা স্মরণ রেখো। যদি কেউ তোমাকে বিচারকের পদ দেয়—বা—গায়ের জোরেই নাও—তবে একতরফা বিচার করে যা খুসী রায় দিয়ো—আমি কথা বলতে নারাজ।

স্বর্ণ আর কথা বলে নাই, নীরবেই চলিয়া গিয়াছিল; সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে আর অরুণার কাছে আসে নাই। অরুণা বিশ্বনাথের জন্য কাঁদিয়াছে—আর ওই প্রশ্নই বারবার নিজেকে করিয়াছে। সে-প্রশ্নে সে অপ্রতিভ হয় নাই, লজ্জিত হয় নাই, যেমন ধীরতা ও শান্ত সংযমের সঙ্গে স্বর্ণকে উত্তর দিয়াছে তেমনি ভাবেই—ওই একই উত্তর বারবার দিয়াছে। বরং ধীরতা ও শান্ত সংযমের সঙ্গে একটি অনাবিল প্রসন্নতা তাহার মুখে একটি হাসির রেখা আঁকিয়া দিল।

দেবু আসিয়া তাহাকে ডাকিতেই সে ওই হাসি-মুখেই বাহির হইয়া আসিল। প্রসন্ন সম্ভাষণে তাহাকে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন দাদা।

দেবু তাহাকে অরুণাদি বলিয়া ডাকিলে…সে দাদা বলিয়াই সাড়া দেয়।

দেবু যথাসাধ্য কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—এ কি? কি ব্যাপার?

অরুণা আরও একটু বেশী হাসিল। বলিল—আমার বেশভূষা দেখে তো?

—হ্যাঁ। এ কি করেছেন? হঠাৎ—?

তাহার বিস্ময়ের প্রকাশ ভঙ্গিকে সে যথাসাধ্য প্রসন্ন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল—বুঝাইবার চেষ্টা করিল—যে—এ পরিবর্ত্তনের ফলে তাহার বিস্ময়ের অন্তরালে নিছক

বিস্ময় ছাড়া আর কিছু নাই। ভাল বা মন্দ কোন ধারণাই এ বিস্ময়ের পিছনে নাই।

অরুণা তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—হঠাৎ নয় দেবুবাবু, অনেক ভেবেছি, অনেক ভাঙাগড়া হয়ে গেছে আমার।

—মানে? মুহূর্ত্তে ভ্রূ দুটির উপরে কুঞ্চন রেখায় বিরূপ মনের রূঢ়তা আত্মপ্রকাশ করিল। এটুকুকে সযত্নে গোপন করিবার চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইয়া গেল।

অরুণা হাসিল। বলিল—একটা জীবনের ভাঙাগড়ার কাহিনীর এক কথায় তো মানে বলা যায় না ভাই। সময় লাগবে। বসুন। যদি সময় এখন না থাকে তবে অবসর করে আসবেন—আমিও বলতে চাই; দুঃখের কথাই হোক আর সুখের কথাই হোক—কাউকে না বলতে পেলে মন হাল্কা হয় না।

দেবু বসিয়া বলিল—অবসর করতে হবে মিসেস ভটচাজ, একটু চুপ করিয়া বসিয়া সে বলিল—আপনার বাইরের রুচি বা আচারের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মনের কতটা সম্পর্ক বুঝতে হবে আমাকে।

অরুণা বলিল—তার মানে আমার বিচার করবেন? সে হ'লে আমি আসামীর মত চুপ করেই থাকব। আপনি সাক্ষী সাবুদ নিয়ে যা রায় দেবার দেবেন। রাজনীতিক দলে কর্ম্মী হয়ে ঢুকেছিলাম যখন, তখন দেশের জন্য মুখ বুজে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত হয়েছিলাম, আর আজ আমার নিজের জীবনের পরম বস্তুর জন্য আপনার দেওয়া সাজা নেবার সময় হাজার কথা কইতে যাব কেন?

দেবু চকিত হইয়া অরুণার দিকে চাহিল।

অরুণা বলিল—বিচারের প্রহসনই হয়ে থাকে—রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধে—রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বিচারালয়ে। রাষ্ট্রনীতি নিয়ে যে সব দল কাজ করে—তারাও বিচারের সময় ওই একই ধারায় বিচার করে। তেমনি বিচার করেন তো আমার কথা আপনার শুনেই বা কাজ কি—আমার বলেই বা লাভ কি? যা খুসী করুন গিয়ে। তবুও আপনি আমার স্বামীর আকর্ষণে—তাঁরই দীক্ষায় এ দলে এসেছিলেন—একসময় আমিও আপনাকে হয় তো কিছু কিছু শিখিয়েছি, নূতন দৃষ্টিতে দেখতে সাহায্য করেছি। তাই কটা কথা বলছি, আমার ভাঙাগড়ার মধ্যে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের স্বরূপকে আবিষ্কার করেছি—নিজেকে চিনেছি, তাই বুঝতে পেরেছি যাকে একদিন স্বামীত্বে বরণ করেছিলাম তার অস্তিত্ব তার দেহের সঙ্গেই আমার জীবনে শেষ হয় নাই, তাকে ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব। 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই—নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'—। দেবুবাবু হঠাৎ বুঝলাম কথাটা। অজয়কে দেখে সেই সত্য হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আজ আমি কোন পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ ক'রে ঘর বেঁধে সুখ পেতে পারি না—শান্তি পেতে পারি না; তাই আমার স্বামীর সন্তান—আমার সন্তান অজয়কে নিয়ে ঘর বাঁধবার কামনায় আকুল হয়ে উঠেছি; তাকে আমাকে জয় করতে হবে—তার মা হতে হবে। এ সজ্জা আমার বিধবা মায়ের সজ্জা। এর জন্যে—

দেবু মাটির দিকে চোখ রাখিয়া অরুণার কথাগুলি শুনিতেছিল—হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল—এরজন্যে—?

—এর জন্যে যে কোন মূল্য আমি দিতে প্রস্তুত দেবুবাবু।

—অর্থাৎ এতকালের বিশ্বাস আদর্শ দল—সব?

—হ্যাঁ। সব, সব, সব। কিন্তু—

—আবার কিন্তু কি?

—আছে কিন্তু দেবুবাবু। বিশ্বাস আদর্শ আমাকে ছাড়তে হবে না। ছাড়তে যেটা হবে—সেটা দল। দেবুবাবু নারীর হাতে ভিক্ষা নেওয়ার জন্য চৈতন্য তাঁর ভক্তকে বর্জ্জন করেছিলেন কিন্তু ভক্তের বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিশ্বাস—সে ধর্ম্ম মতে সাধনার অধিকার কেড়ে নিতে পারেন নি। আমার জীবনের বিশ্বাস—আদর্শবাদ আপনারা কেড়ে নেবেন বা আপনাদের সঙ্গে না বনলে ছাড়তে হবে—এমন ধারণা করবার স্পর্দ্ধা আপনার বা আপনাদের হ'ল কি ক'রে?

দেবু হাসিয়া বলিল—কিন্তু ছেলের সঙ্গে যদি বিরোধ হয় আদর্শ নিয়ে?

—আমি এমন মা হতে চাই দেবুভাই, যে আমার রক্ত সুধা হয়ে তার দেহের রক্ত হয়ে প্রবাহিত হবে, আমার ভাবনা আমার ভাষাই হবে তার ভাবনা-ভাষা।

বিরোধ আমার হবে না দেবুবাবু। অরুণার চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিল।

দেবুবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আপনার কামনা সফল হোক অরুণা-দি। সর্ব্বান্তঃকরণে আমি প্রার্থনা করছি।

অরুণা বলিল—বসুন—বসুন। আপনার মানুষের মন আজও বেঁচে আছে। নইলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন না। স্বর্ণকে কয়েকটা কথা বলবেন। সে মারাত্মক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছে আমার হয়েছিল—কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি নি সে আঘাত পাবে ব'লে। বাল্যকালে যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—যার সঙ্গে ভালবাসা জন্মাবার—যাকে ভালবাসবার সময় পায় নি বলে—সকল বিয়েতেই তাই হবে? সে যে ধোয়ামোছা মন নিয়ে আপনাকে গ্রহণ করেছে, আপনার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে—এ সবকেও কি ধুয়ে মুছে যাবে—আপনার দৈহিক অস্তিত্বের অভাবে? স্বর্ণ কি আপনাকে হারিয়ে নূতন জনকে নিয়ে আবার জীবন সুরু করতে পারবে? সে যখন বাল্যকালে বিধবা হয়ে আপনাকে ভালবেসে বিবাহ করেছে, তখন অন্ততঃ তার কাছে সমাজ-প্রভাব—মনের বিকৃত ধর্ম্মভয় এ সবগুলো তো একেবারেই নাই!

—অরুণা দি!

স্বর্ণ নিজেই আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

দেবু শঙ্কিত হইয়া বলিল—চল—স্বর্ণ—বাড়ী চল।

স্বর্ণ বলিল—না!

অরুণা বলিল—বল, স্বর্ণ কি বলছ বল?

—বলছি না কিছু, বাহবা দিচ্ছ। যে সব তত্ত্বকথা চমৎকার বক্তৃতা করে বুঝালেন এতক্ষণ তার জন্ম বাহবা দিচ্ছি।

—চল স্বর্ণ!

—যাচ্ছি। ঝগড়া আমি করব না। শুধু একটা কথা ওঁকে জানিয়ে যাই। গোটা শহরটা ওঁর এই নতুন ঢং নিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। পার্টির প্রত্যেক মেম্বার এর জন্যে শপথ করে বলেছে—পার্টি থেকে ওঁকে বের করে দিতেই হবে।

—পার্টি আমি ছেড়ে দিলাম দেবুবাবু। আপনি ওপরে জানাবেন।

(ক্রমশঃ)

পূজার চিঠি

কুমারী নবনীতা দেব

কবি-দম্পতি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবী তাঁহাদের ১২ বৎসরের কন্যা কুমারী নবনীতাকে সঙ্গে লইয়া ইউরোপ ভ্রমণে গিয়াছেন—এ সংবাদ ভারতবর্ষের পাঠকগণ অবগত আছেন। পূজার সময় কুমারী নবনীতা লণ্ডনে বসিয়া তাঁহার মাতুলানী শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষকে একখানি এবং মাতুল-পুত্র শ্রীঅভীক ঘোষ (১০ বৎসরের) ও মাতুল-কন্যা কুমারী প্রণীতা ঘোষ (৭ বৎসর বয়সের)কে একখানি পত্র লিখিয়াছেন—উভয় পত্রই কবিতায় লেখা। আমরা নিম্নে পত্র ২ খানি প্রকাশ করিলাম—ইহা পাঠ করিলে কবিদম্পতির কন্যা নবনীতারও অসাধারণ কবিত্ব প্রতিভার সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। (ভাঃ সঃ)

(ক)

শারদ পূজায় পত্র পপুয়া
পাঠাই রচিয়া গীতি;
গুরুজনে দিও প্রণাম আমার
ছোটদের দিও প্রীতি।
এইতো প্রথম দেশ ছেড়ে দূরে
রহিনু পূজার কালে;
পরিনি নূতন পূজার পোষাক
কুঙ্কুম ফোঁটা ভালে।
নূতন জুতা তো নেই পায়ে আজ
পূজার হর্ষ কই গো?

ইংরাজী সবই, পাইনি এবার
পূজা বার্ষিকী বই গো।
দেশে ফিরে যেতে মন যে ব্যাকুল
ফিরিব এ মাস শেষে ;
ভাবি মনে আজ থাকিতাম যদি
তোমাদের কাছে দেশে।
মহা উৎসব—কোলাহলে যেথা
পূজার বাদ্য বাজে,
মন যে আমার ছুটে চলে আজ
সেই বাংলার মাঝে।
পাড়ায় পাড়ায় পূজা মণ্ডপে
ছোট ছেলে মেয়ে নাচে,
বিজয়ার সাঁঝে মিষ্টি খাবার
গুরুজনদের কাছে।
বন্ধুরা মোর নূতন বসনে
সজ্জিত হয়ে আজ,
পূজা মণ্ডপে হাসি-কলরবে
করিছে কত না কাজ।
সুদূর সাগর পারে বসে আমি
ভাবি স্বদেশের কথা,
বহু সুখে আছি, তবু মনে হয়
কি-জানি-কি-নেই হেথা।
দেশের প্রতিটি পথ-ঘাট বাড়ী
আত্ম বন্ধু যত,
অভু, খুকু আর দুষ্টুর কথা
মনে জাগে অবিরত।
হিন্দুস্থান-পার্কের মত
এত সুন্দর স্থান
এই পৃথিবীতে আর তো কোথাও
গড়েননি ভগবান।
সুইজারল্যাণ্ড, প্যারিস, ইটালী,
অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মাণী—
বালিগঞ্জের কাছে, মোর কাছে
সব যায় হার মানি।
এবারে পূজোতে কিন্তু পপুয়া
প্রকাণ্ড চিঠি দিনু,
আবার লিখিব, এইবারে আসি,

ইতি—তোমাদের মিনু।

(খ)

অভু সোনা! লক্ষ্মী আমার, সোনার খুকুন ভাই
দিদিটাকে ভুলেই গেছিস, একটু মনে নাই ?
দাওনা অভীক একটা চিঠি, নাওনা খবর নিজে
তাইতো মনে দুঃখ আমার, জানাই তোদের কী যে।
প্রত্যেক দিন সবার কাছেই, গল্প তোদের করি
খুকুরাণীর কথা এবং অভুর কথা স্মরি।
দুষ্টু বাবুর দুষ্টুপনার, খবর কিছু পাই,
কিন্তু তোদের হাতের লেখায়, তাহার খবর চাই।
এবার পূজোয় ভীষণ আমার, মন কেমন যা করছে,
বারে বারেই চোখের পাতা ; কেবল জলে ভরছে।
তোমরা কি ভাই দিদির কথা, একটী বারও ভাবছ,
মোটর থেকে সর্ব্বজনীন, দেখতে যখন নাব্‌ছো ?
পূজোয় এবার জামা জুতো, সব পুরানো পরছি,
মায়ের কাছে বলতে গেলেই, ধমক্ হজম্ করছি।
এবার পূজোয় ধমক ছাড়া, আর তো কিছুই পাইনি,
মায়ের মেজাজ গরম দেখে, বাবুর কাছেও যাইনি।
মা বলেছেন তিনটী বছর, পূজোর নাম না করবে,
এই পুরাণ ফ্রক ও জুত', তিনটি বছর পরবে।
তাই তো আমি চালাক হ'য়ে, লম্বা এমন হচ্ছি,
তিনটি মাসও আর না যাতে, এ সব জামা পরছি।
অনেক কথাই বলবো গিয়ে, হচ্ছে পেটে জমা,
পদ্য লিখছি, এ জন্যে ভাই, করিস্ কিন্তু ক্ষমা।
লণ্ডন-পুলিশের হ্যাট, কিনেছি তোর জন্যে,
মা কিনেছেন বই, খেলনা, দেখেননি তা অন্যে।
বার্ষিক পরীক্ষার ফল, শুভ খবর দিও,
দিদি-ভাইএর বিজয়ারই, আশীষ, প্রীতি নিও।

ইতি—তোদের দিদিভাই

* * * *

জর্জ বার্ণার্ড শ

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(১৮৫৬-১৯৫০)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী জর্জ বার্ণার্ড শ গত ২রা নবেম্বর দেহত্যাগ করেছেন। গত ২৬শে জুলাই তাঁর তিরানব্বইতম জন্ম দিবস উপলক্ষে সারা জগত তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। গত ১১ই সেপ্টেম্বর শ বাগানে পড়ে গিয়ে আহত হন এবং হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। সেখান থেকে ২৫ দিন পরে গত ৪ঠা অক্টোবর তিনি গৃহে ফিরে আসেন। হাসপাতালে ভর্ত্তি হবার সময় তিনি বলেছিলেন, "এবার যদি বাঁচি তাহলে অমর হয়ে উঠব।" কিন্তু হায়! তাঁর মত মনীষীকেও আজ পৃথিবী হ'তে বিদায় নিতে হ'ল। মহাকালের ফুৎকারে সেই অসাধারণ প্রতিভার অম্লান শিখার দ্যুতি আজ দৃষ্টি পথ হতে অন্তর্হিত হল বটে, কিন্তু যে আলোকের দীপশিখা তিনি জ্বেলেছিলেন তা চিরকাল অম্লান ও উজ্জ্বল থাকবে। তাঁর বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রে ছিল না, ছিল তাঁর হাসিতে, তাঁর ব্যঙ্গে, তাঁর বিদ্রূপে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর শিক্ষায় ছিল না, ছিল বনস্পতির মত তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বে।

সত্যই বিচিত্র ছিল তাঁর জীবন, বিরাট ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। অদ্ভুত ছিল তাঁর আচার ব্যবহার, চালচলন, অদ্ভুত ছিল তাঁর চরিত্র। পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত মানুষ আর দ্বিতীয় জন্মান নাই। তাঁর লেখনী ছিল যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি রসাল তাঁর কথাবার্ত্তা, কলম ত নয় যেন শাণিত তরবারী। কঠোর চাবুক হাতে দিয়ে ভগবান এই লোকটিকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন। সেই চাবুকের কঠোর আঘাতে অমানুষের দল মানুষ হয়েছে, অভদ্রের দল ভদ্র হয়েছে। পৃথিবীর লোক তাঁকে ভয় করেছে, শ্রদ্ধা করেছে, ভক্তি করেছে, ভালবেসেছে। তাঁর নানা অভিজ্ঞতা হতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বেদনার চেয়ে বিদ্রূপ বড়, ক্ষুদ্রতার চেয়ে মহত্ত্ব বড়।

যে ক্লেদ ও গ্লানি, তিক্ততা ও অবসাদ আজ সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেছে, সভ্যতাকে অপমৃত্যু হতে রক্ষা করবার জন্য তিনি তা আকণ্ঠ পান করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার অজস্র দানে, তাঁর প্রতিভার অজস্র আলোকে আজ সমগ্র পৃথিবী সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তাঁর পঞ্চাশ খানি নাটক আজ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে। সেই সমস্ত অভিনয় হতে তিনি দশ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক অর্থ লাভ করেছিলেন। তাঁর 'পিগ ম্যালিয়ান' নামক নাটকের চিত্ররূপের স্বত্ব বিক্রী করে তিনি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড লাভ করেছিলেন।

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বিস্ময় যে তিনি তিরানব্বই বৎসর বয়সে তাঁর শেষ নাটক "ফার ফেচেড ফেব্‌লস্‌" রচনা করেন। এত অধিক বয়সে আর কেউ কিছু রচনা করতে পেরেছেন তার পরিচয় আমাদের জানা নেই।

তাঁর বয়স যখন ১৫ বৎসর তখন তাঁর পিতার সংসার অচল হয়ে ওঠে। ঝি-চাকরদের বিদায় দিতে হ'ল—তাঁর মা লুসিন্দা এলিজাবেথ সব কাজই নিজে হাতে করেন। শ স্থির করলেন—সংসারের সাহায্যের জন্য কিছু করা প্রয়োজন। তিনি বিদ্যালয়ে বেশী দিন যান নি, তবে বাড়ীতে অসাধারণ পড়েছেন। শ চাকরি করবার জন্য ভাবলিনে এক কাপড়ের দোকানে সকাল দশটায় এসে হাজির হলেন। সোজা সাহেবের কামরায় ঢুকে একখানা পরিচয় পত্র দিলেন। তাঁকে এক ঘরে নিয়ে গেল—সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—কি পাশ করেছ?

জর্জ বার্ণার্ড শ

পাশ ত কিছু করিনি।

পাশ করনি, চাকরি করতে এসেছ?

চাকরীর সঙ্গে পাশের সম্বন্ধ কি?

দরখাস্ত এনেছ?

নিয়ে আসিনি। কাগজ দিন এখনি লিখে দিচ্ছি।

কাগজ নিয়ে শ খস্ খস্ করে এক দরখাস্ত লিখে দিলেন। তাঁর চাকরি হ'ল—বেতন মাসে ১৮ শিলিং অর্থাৎ সাড়ে বারো টাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার পরদিন চাকরীতে গিয়ে শুনলেন—তাঁর বয়স কম—চাকরি হবে না।

ভাগ্যের এই পরিহাস শুরু হ'ল তাঁর জীবনে।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই আয়র্ল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরের উপকণ্ঠে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জর্জ কার শ, আর মাতার নাম ছিল লুসিন্দা এলিজাবেথ।

তাঁর তখন পাঁচ বৎসর বয়স। চাকরের সঙ্গে সন্ধ্যাকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সে দিন রবিবার। গির্জ্জার ঘণ্টা বাজছে। দলে দলে লোক গির্জ্জার দিকে চলেছে। তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন—এত লোক সব কোথায় যাচ্ছে?

চাকর বল্লে—গির্জ্জায়।

সেখানে কি হয়?—সেখানে খৃষ্টের আরাধনা হয়, ভগবানের প্রার্থনা হয়।

তিনি বাড়ী গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মা, আমরা গির্জায় যাই না কেন?

মা বল্লেন—'বাইবেল কিনে দেব—পড়ে দেখো'। এই বলে ছেলেকে নিয়ে মা মধুর কণ্ঠে ও মধুময় ভাষায় একখানি গান করলেন—ছেলে অন্য এক জগতে চলে গেল। মা তখন বল্লেন—এই আমার গির্জা—এই আমার ভগবান।

যখন তাঁর ২০ বৎসর বয়স, তিনি ইংলণ্ডে এলেন। ছ বছর তিনি বেকার জীবন অতিবাহিত করলেন। অনবরত লেখেন, আর সেই লেখা কাগজে পাঠান। সবই ফিরে আসে। একদিন "ওয়ান এণ্ড অল" নামক একটি মাসিক পত্রিকায় "খৃষ্টান নাম" নামে তাঁর একটা লেখা প্রকাশিত হ'ল। তিনি পারিশ্রমিক পেলেন পনের শিলিং। এই তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল।

তিনি পেশা হিসেবে সাহিত্য কেন নির্ব্বাচন করেন তার কারণ তিনি বলেছেন—"ডাক্তার বা উকিলের মত সাহিত্যিকের কারও কাছে যেতে হয় না। দামী কোট প্যাণ্ট, হ্যাট, টাই দরকার হয় না। তাই আমি সাহিত্যের পেশা বেছে নিলাম।"

তিনি নাম করবার জন্ম বক্তৃতা করতে আরম্ভ করলেন—বৎসরের পর বৎসর বক্তৃতার স্রোত চলল। তিনি জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সম্বন্ধে এক সভায় বক্তৃতা করবার অনুমতি চেয়ে এক পত্র দিলেন। উত্তর এল—যারা কার্ল মার্কস পড়ে নি—তাদের বক্তৃতা করবার যোগ্যতা নেই।

তৎক্ষণাৎ বৃটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে কার্ল মার্কসের ফরাসী ভাষায় লেখা সব বই পড়লেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে নাট্য জগতে একটা সংস্কারের আয়োজন চলছে। জ্যাক গ্রেণ ইণ্ডিপেনডেণ্ট থিয়েটার নামে এক নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। ইবসেনের বিখ্যাত নাটক 'ঘোষ্ট' প্রথম অভিনীত হ'ল। কিন্তু তিনি চাইলেন একখানি নূতন ধরণের ইংরাজী বই অভিনয় করতে। শ এই সংবাদ পেয়ে "উইডোয়ার্স হাউসেস" নামক স্বরচিত প্রথম নাটক গ্রেণকে পড়ে শোনালেন। নাটক মনোনীত হ'ল। শ'এর জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন। বার্ণার্ড শয়ের নাম চারিদিকে প্রচারিত হ'ল। কিন্তু মাত্র দু রাত্রি অভিনয়ের পর এই নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় নাটক লিখলেন—"দি ফিলাণ্ডারার"। কিন্তু এটি অভিনীত হল না। তারপর তখনকার দিনের বিখ্যাত অভিনেত্রী জেনেট এচার্চএর অনুরোধে তিনি তৃতীয় নাটক লিখলেন—"মিসেস ও অরেনস প্রফেসন"। কিন্তু দুনীতিমূলক মনে করে গবর্ণমেণ্ট এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিলেন।

তার পর তিনি অনবরত একের পর এক নাটক রচনা করতে লাগলেন—"আর্মস এণ্ড দি ম্যান", "কাণ্ডিডা", "ইউ নেভার ক্যান টেল", "সিজার এণ্ড ক্লিওপেট্রা" এবং "ক্যাপ্টেন ব্রাস বাউণ্ডস কনভার্সন"। বিপ্লবী নাট্যকার হিসাবে তাঁর নাম তখন ইংলণ্ড অতিক্রম করে আমেরিকায় পৌঁচেছে। সেখানে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম নাটক অভিনীত হল গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ নাটক "মিসেস ও অরেনস প্রফেসন"।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর, প্রিন্স অব ওয়েলস থিয়েটারে শ'র নাটক "দি ডেভিলস ডিসাইপ্‌ল" ইংলণ্ডে প্রথম অভিনীত হ'ল। আমেরিকায়ও এই নাটক অভিনীত হয়। সেখান হতে শ পান পাঁচ হাজার পাউণ্ড, আর লণ্ডনের অভিনয় হতে পেলেন দশ হাজার পাউণ্ড।

শয়ের বয়স তখন ৪০ বৎসর। অবিশ্রান্ত জীবন সংগ্রামে এইবার তিনি জয়ী হলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই চার্লোট নাম্নী এক মহিলাকে শ বিবাহ করেন। পঁয়তাল্লিশ বৎসর চার্লোট শর জীবন-সঙ্গিনী স্বরূপ জীবিত ছিলেন। ১৯৪৩ সালে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

১৯০৩ সালে শর শ্রেষ্ঠ নাটক "ম্যান এণ্ড সুপারম্যান" প্রকাশিত হ'ল। দু বৎসর পরে এই নাটকখানি লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে অভিনীত হল। তখন শ এই নাট্যালয়ে নাট্যকার, নাট্যাচার্য্য ও প্রযোজকরূপে যোগ দেন। শ'র ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে নাট্যালয়ের পরিবেশের পরিবর্ত্তন হ'ল। তখন হ'তে নাট্যালয় হয়ে উঠল শিল্পকলার বিদ্যালয়—প্রমোদনিকেতন নয়—শিল্পের পীঠস্থান।

নিউ ইয়র্কেও এই নাটক অভিনীত হয়—সেই অভিনয় হতে শ'র আয় হয় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড।

তার পর অভিনীত হ'ল "মেজর বারবারা" এবং "দি ডক্টরস ডিলেমা"।

তাঁর লেখনী ছিল তীক্ষ্ণ এবং রসনা ছিল ক্ষুরধার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী।

১৯১৩ সালে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁর জননী পৃথিবী হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

আজ পৃথিবী হতে এই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার তিরোধানে—পৃথিবীর সাহিত্য-জগতের যে ক্ষতি হল তা সহজে পূর্ণ হবার নয়।

—ষোলো—

কোথায় শিকার, কোথায় কী! অ্যালবার্টের হালচাল ক্রমেই কেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল ক্যাক্রর।

একদিক থেকে ভালোই যে হয়েছে—সন্দেহ নেই সে ব্যাপারে। গেম্‌স্‌গার্ডের সন্ধানে বেরিয়ে জমিদারের জলায় দুটো চারটে ফায়ার করলে শ্রাদ্ধ কতদূরে যে গড়াত বলা শক্ত। পেণ্টুলুনপরা চেহারা আর শাদা বাপের ছেলে—এর অতিরিক্ত কতটুকু মর্যাদা তার আছে কুমার ভৈরবনারায়ণের কাছে! নিতান্তই সাম্‌না-সাম্‌নি গেলে একখানা চেয়ার বসবার জন্যে এগিয়ে দেয়—এই যা। কিন্তু হাঁড়িতে যে তার কতখানি চাল এ আর ভালো করে কে জানে কুমার বাহাদুরের চাইতে?

অ্যালবার্টের বন্দুক দুটো যেমন তেমনি ঝুলোনোই আছে। না আছে তার হিমালয়ান রেঞ্জ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল, না আছে শিকার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহ। ক্যাক্র সাহেবের সন্দেহ হয় তার চাইতে বড় কিছু শিকারের সন্ধানে আছে অ্যালবার্ট।

কী সে শিকার? মার্থা হয়তো?

একটা প্রচণ্ড উত্তাপে ক্যাক্রর সমস্ত মগজটা যেন টগবগ করে ফুটে উঠতে চায়। দেশের বুকের ওপর চাবুক চালিয়ে একদিন রেশমের ব্যবসা করেছে পার্সিভ্যাল। সাহেবের সমস্ত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে যারা তাঁতে রেশম বুনে প্রতিযোগিতা করতে চেয়েছে, রাত্রে মশালচী পাঠিয়ে আগুন লাগিয়েছে তাদের ঘরে। খুন-খারাপীও যে দুটো চারটে করতে হয়নি—নিঃসন্দেহে একথা বলবার মতো জোর নেই স্মাইদ্ ক্যাক্রর।

সে রক্ত তার মধ্যেও আছে। সেই অত্যাচারী, সেই ঘাতক। দারিদ্র্য আর বংশ-পরিচয়ের লজ্জায় আহত সাপের মতো সে ফণা লুটিয়ে আছে; কিন্তু দরকার মতো প্রাণঘাতী ছোবল দেবার শক্তিও যে রাখে, তার পরিচয় অন্তত একবার সে দিয়েছেই। সেই চামড়ার মতো নীরেট্ অন্ধকারের কালো রাত্রে—

স্মৃতির গলাটা জোর করে চেপে ধরল স্মাইদ্। কিছুদিন থেকে এই এক ব্যাধি দেখা দিয়েছে তার। যা প্রায় ভুলতে বসেছিল—থেকে থেকে হঠাৎ আলোড়ন লাগা জলের তলা থেকে একরাশ ঘোলা কাদার মতো তা ওপরে উঠে আসতে চায়। বলা যায় না, এর শেষ কোথায়। শেষ পর্যন্ত একদিন হয়তো সোজা আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে —বোবা ধরা গলায় চীৎকার করে বলতে চাইবে, হুজুর, বারো বছর আগেকার এক মেঘে ঢাকা সন্ধ্যায়—

ক্যাক্র অস্থির ভাবে উঠে বারন্দায় পায়চারী করতে লাগল।

আশ্চর্য! সে কেউ নয়—সে কোথাও নেই। এই পড়ন্ত বেলার বিষণ্ণ আলোর বাইরে সে অনধিকারীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ঘরের ভেতর আলো-না-জ্বালা ঘন ছায়ার সুযোগে অ্যালবার্ট অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে বসেছে মার্থার—গান শোনাচ্ছে তাকে। তবু পিয়ানো-টিয়ানো কিছুই নেই—এই যা রক্ষা।

জল্‌সন, বীং, ক্রস্‌বি—অদ্ভুত সব নাম। যেন মায়ালোকের কতগুলো স্বপ্ন কথা। শুনতে শুনতে সে বিরক্ত হয়ে উঠে এসেছে। গান তার খুব ভালো লাগে না, ভালোমন্দ বোঝবার ক্ষমতাও নেই। সাঁওতালী নাচ দেখেছে, শুনেছে ঝুমুরের সঙ্গে সঙ্গে মাদলের বাজনা, খুশি হয়েছে আত্মের গন্তারা দেখে, 'এন্‌কোর এন্‌কোর' বলে উৎসাহ দিয়েছে ধামালী গানের নগ্ন আদিরসে।

কিন্তু এ এক বিচিত্র জগতের খবর।

"Do you know the man, who came from the moo—oon—"

আবেগভরা গম্ভীর গলায় গান ধরেছে অ্যালবার্ট! মার্থাও সুর মিলিয়েছে তার সঙ্গে। দাঁড়িয়ে পড়ল স্মাইদ্, মনে হল, মার্থার গলা আশ্চর্যভাবে মিশ খেয়েছে ক্যাক্রর

সঙ্গে, নিখুঁত তান বাঁধা হয়ে গেছে সরু মোটা তারে। এ দুইয়ের মাঝখানে সে বিক্ষিপ্ত। এদের মাঝখানে তার গলা কোথাও মিলবে না, সব কিছুকে বেসুরো করে দেবে।

"The man from the moon—"

অ্যালবার্ট ? হয়তো তাই। মার্থার এই মাটির পৃথিবীতে যেন কোন্ চন্দ্রলোকের সংবাদ। সেখানে অন্ধকারের ছায়ার মতো ক্যারু আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে না তো ?

একটা অনিশ্চয় আশঙ্কায় নিজের হাত কামড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। কিছুই বলা যায় না, বলবার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই কিছু। অতিথি—বন্ধু! কিন্তু এ কেমন অতিথি যে এসে এই সাতদিনের মধ্যেও নড়তে চাইছে না! দিন রাত অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে বকর বকর করে কথা কইছে ? এই বা কোন্ দেশী বন্ধুত্বের নমুনা।

নাঃ, এবার অ্যালবার্টের যাওয়া উচিত।

কাল একবার আভাসও দিয়েছিল।

—তোমার তো ছুটি ফুরিয়ে এলো বার্টি ?

মার্থা শিউরে উঠেছিল শুনেঃ তাই নাকি ? কী সর্বনাশ ?

কিন্তু বার্টি অভয় দিয়েছিল, না—না, আরো দিন সাতেক হাতে আছে। তা ছাড়া, রিয়্যালি এ জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগছে। দরকার হলে আরো এক হপ্তা না হয় বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।

আনন্দে মার্থা হাততালি দিয়ে উঠেছিল; বাঃ, কী চমৎকার হবে তাহলে!

চমৎকার! ক্যারুর ইচ্ছে হয়েছিল একসঙ্গে দু হাতে দুটো ঘুষি ছুঁড়ে দেয় অ্যাল্‌বার্ট আর মার্থার মুখের ওপর। কিন্তু তবু সে প্রাণপণে আনন্দের একটা করুণ হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল ঠোঁটের আগায়ঃ হাঁ, খুব চমৎকার হবে।

—আরো এক সপ্তাহ! ভাবতেও আমার আনন্দ হচ্ছে।

আনন্দ হচ্ছে! তাই বটে। আনন্দ হওয়ার কথাই। অ-দেখা গোল্‌ডার্স গ্রীণের বাতাস নিজের চারদিকে বয়ে এনেছে অ্যালবার্ট, স্বপ্নের দেশ ইংলণ্ডের স্পর্শ ঝরে পড়ছে তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে। কিন্তু—কিন্তু! আরো এক সপ্তাহ! আবার একটা খুন করতে হবে নাকি স্মাইদ্ ক্যারুকে ?

তবু শেষ চেষ্টা।

—আর দু তিন দিনের মধ্যেই খুব বর্ষা নামবে এদিকে।

অ্যাল্‌বার্ট কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলঃ রিয়্যালি ?

—হাঁ, চারদিকে সমুদ্রের মতো জল দাঁড়াবে। এদিক ওদিক দেখতে পাওয়া যাবে না।

—বাঃ—এক্‌সেলেন্ট! সে তো দেখবার মতো জিনিস।

ক্যারু নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল।

—তখন নৌকোয় করে পাড়ি দিতে হবে। তাতে প্রায়ই অ্যাক্‌সিডেন্ট্ হয়—মানে নৌকো ডুবে যায়।

—ফাইন!—আনন্দে অ্যাল্‌বার্টের চোখ চক চক করে উঠেছিলঃ আমার সাঁতরাতে খুব ভালো লাগে। একবার আমি আধা-আধি চ্যানেল সাঁতরে গিয়েছিলাম।

—চ্যানেল ? ইংলিশ চ্যানেল ? তার অর্ধেক সাঁতরে গিয়েছিলে ?—শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মার্থা চোখ বিস্ফারিত করেছিল।

অসহায় ক্রোধে পকেটে হাত দিয়েছিল ক্রু সাহেব। তার পরেই অ্যালবার্টের সামনে বিড়ি বার করলে পদ-মর্য্যাদা থাকবেনা মনে করে, আঙুলের ডগায় গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙেছিল সেটাকে। মনে হয়েছিল ওটা বিড়ি না হয়ে মাথার মাথাটা হলেই সে খুশি হত।

শেষ চেষ্টায় স্মাইদ বলেছিল, তখন কিন্তু খুব সাপের উপদ্রব হয়।

—সাপ ? রিয়্যালি ?—অ্যাল্‌বার্টের কৌতূহল যেন অনন্তঃ I am very much interested in Bengal snakes—

এর পরে বলা যেত মাত্র একটি কথা। বেরোও—বেরোও আমার বাড়ি থেকে। কিন্তু বলা কি অতই সহজ এখন ? নিজেই নিজের গর্ত খুঁড়েছে। লর্ড বংশের ছেলে। ব্রেটন ব্রুকশায়ার। নর্থ এক্সিটার অক্সফোর্ড। ক্যারুর কালো হাতের পাশে একখানা তুষার শুভ্র হাত—সে হাতে হীরের আংটি। ক্যারু উঠে দাঁড়িয়েছিল। অন্তত আর একটা চেষ্টা করা যাক। কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত দূরে সরিয়ে নেওয়া যাক মার্থার কাছ থেকে।

—চলো বার্টি, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

—ওঃ, গ্ল্যাড্‌লি—অ্যাল্‌বার্ট উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু মার্থাই বাধা দিয়ে বসল।

—না, বার্টি, তুমি আর একটু বোসো। যাওনা স্নাইদ, তুমিই একটু ঘুরে এসো বরং। দিনরাত ঘরে বসে থেকে তোমাকেই কেমন ক্লান্ত লাগছে। তোমার একটু বেড়ানো দরকার।

বেড়ানো দরকার! দরদ কত! এতক্ষণ পরে আর সহ্য হয়নি ক্রু সাহেবের। বারুদ-ঠাসা হাউইয়ে যেন শেষ আগুনের ছোঁয়া লেগেছে—দুর্বিসহ ক্রোধে ছিট্‌কে বেরিয়ে চলে গেছে স্নাইদ্‌।

বারান্দায় প্যায়চারী করতে করতে ক্যারু নিজের ডান হাতটা মুঠো করে ধরল।

দোষ তার নিজেরও আছে বই কি। তুলনা করে দেখলে মার্থার পাশে তাকে বিউটি এ্যাণ্ড্‌ দি বিস্ট্‌ ছাড়া কী বলা যায় আর? মিশনারী বাপের মেয়ে মার্থা, উচ্চ-শিক্ষিত রেভারেণ্ড বিশ্বাস মেয়েকে পাশ করিয়েছিলেন জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পর্যন্ত। আর সে?

সে তবুও তো স্বামী। তবুও তো স্ত্রীর ওপর তার আইনগত অধিকার। এতদিন সেই অধিকারের দাবীতে নিশ্চিন্ত হয়েছিল বলেই মার্থার কোনো কটু মন্তব্য, তার দারিদ্র্যের ওপর কটাক্ষ—কোনোটাই তার দুঃসহ বলে মনে হয়নি। অ্যাল্‌বার্ট আসবার পরেও মার্থা যদি তার সঙ্গে ঝগড়া করত, স্বভাবসিদ্ধ প্রখর ভাষায় গালিগালাজ করত, তা হলে মনে হত সব ঠিক আছে। চলছে নিয়ম মতোই—কোথাও ব্যতিক্রম হয়নি, ছন্দোপতন ঘটেনি কোনোখানে। কিন্তু আজ—

মার্থা আর ঝগড়া করেনা। অভিযোগ করতে ভুলে গেছে।

অবচেতনভাবে কী একটা যেন বুঝতে পারে ক্যারু। মনে হয়: এর চাইতে মার্থা যদি মুখর হয়ে উঠত, ঢের বাঞ্ছনীয় হত সেটা। অন্তত ক্রু সাহেব বুঝতে পারত, তার সম্পর্কে একটা সজাগ চেতনা আছে মার্থার মনে। আর এই অভ্যস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটছে। ভদ্র হয়ে গেছে মার্থা—সংযত হয়ে উঠছে—মার্থার রসনা যেন সদয় হয়ে উঠছে তার ওপর। মন থেকে সরে যাচ্ছে বলেই কি ভূমিকা তৈরী করছে সৌজন্যের?

"On the silvery green—the man came down from the moon—"

সন্ধ্যা নামল। রাত্রির ছায়া পড়ল। আচক্রবাল মাঠের ওপর—শুধু রক্তের একটুখানি ফিকে রঙ্‌ লেগে রইল তিন-পাহাড়ের কৃষ্ণ স্তব্ধতায়। একদল বকের পাখার ক্ষীণ ধ্বনি মিলিয়ে এল তাল-দিগন্তের ওপারে।

ঘরে আলো জ্বলেছে। গানটা থামল এতক্ষণে। হাসির কলধ্বনি উঠল একটা। জুতোর শব্দ পাওয়া গেল—হয়তো ওরা বাইরে বেরিয়ে আসছে।

এই মুহূর্তে ওদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে নিজেকে সংযত রাখা যাবে কিনা সন্দেহ। কী বলতে কী যে বলে বসবে নিজেই জানেনা। তার চাইতে নিজের কালো মনটা নিয়ে একটু সরে দাঁড়ানোই ভালো।

সামনের খোলা দরজা দিয়ে এদিকের অন্ধকার ঘরটায় এসে ঢুকল ক্যারু।

কতগুলো ভাঙা জিনিসপত্র, একটা ছেঁড়া ক্যাম্প খাট। অন্ধকারের মধ্যে সেই ক্যাম্প খাটটাতেই ঝুপ করে বসে পড়ল স্নাইদ্‌।

বাইরে থেকে অ্যাল্‌বার্টের গলার আওয়াজ এল।

—স্নাইদ্‌ তো এতক্ষণ এইখানেই ছিল।

মার্থা জবাব দিলে, তাই তো মনে হচ্ছিল।

—গেল কোথায় তা হলে?

—তাই তো!—মার্থা ডাকল: স্নাইদ্‌—স্নাইদ্‌!

ক্রু সাহেব সাড়া দিলনা। ঠিক ইচ্ছে করেও নয়—সাড়া দেবার কোনো প্রয়োজন আছে বলেই যেন মনে হলনা তার। এত সৌজন্য, অ্যাল্‌বার্টের সামনে স্বামীর সম্পর্কে একটুখানি ভদ্রতা বাঁচিয়ে রাখা মাত্র। কিন্তু সাড়া দিয়ে সে যদি সামনে গিয়েই দাঁড়াত, তা হলেই কি সত্যি সত্যি খুশি হতো ওরা? না—হতনা। স্নাইদ্‌ ক্যারু স্পষ্ট বুঝেছে—the man from the moon আজ ঘুম ভাঙিয়েছে রাজকন্যার; কোনো দ্বীপ-দুর্গের টাওয়ারে বন্দিনীর জানালা দিয়ে এনেছে মুক্তির সংবাদ। সেখানে একটা দৈত্যের মতোই সে অনভিপ্রেত অনধিকারী।

মনে হল, মার্থা যেন এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকে খুঁজে নিলে খানিকটা। তারপরে মন্তব্য করলে, কোথাও বেরিয়ে গেছে হয়তো। ও ওই রকম।

অ্যাল্‌বার্ট বললে, পুয়োর চ্যাপ্।

—পুয়োর নয়, ইডিয়ট।—মার্থার মন্তব্য শোনা গেল আবার।

—ইডিয়ট? তা সত্যি।—বোঝা গেল, মার্থার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার সম্মতি আছে। তবু বন্ধুত্বের ঋণটা একেবারে অস্বীকার করতে পারলনা আল্‌বার্ট: হি ইজ্ এ গুড্ সোল।

অন্ধকারের মধ্যে দুহাতে নিজের হাঁটু দুটো চেপে ধরল জু সাহেব। কোথা থেকে দু তিনটে আরশোলা পড়ল গায়ের ওপর, পায়ের গোড়ায় সুড়সুড়ি দিয়ে গেল খুব সম্ভব একটা নেংটি ইঁদুর। কিন্তু স্থির হয়ে বসে রইল সে। নিজেকে সম্পূর্ণ সজাগ করে—পরিপূর্ণভাবে উৎকর্ণ হয়ে প্রতিটি কথা সে শুনে যেতে লাগল।

মার্থা বললে, এসো, বসা যাক্।

চেয়ার সরাবার শব্দ এল। ওরা বসেছে তা হলে।

—তুমি কবে হোমে যাচ্ছ?—মার্থার প্রশ্ন।

—খুব সম্ভব আসছে মাসেই। ব্রুকশায়ার হল থেকে কাকার চিঠি পেয়েছি। কী দরকারী কাজে ডেকে পাঠিয়েছেন।

—কাকা বুঝি তোমাকে খুব ভালোবাসেন?

—ওঃ, হি ইজ এ গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড চ্যাপ। ভেরি জলী ম্যান। একবার চলোইনা আমাদের ওখানে।

—আমি?—মার্থার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাওয়া গেল।

—কেন, আপত্তি কী?

—মিথ্যে ওসব বলে কেন কষ্ট দিচ্ছ বার্টি? জানোই তো আমার অবস্থা।

—এ ভারী অন্যায়!—অ্যালবার্টের গলায় অনুযোগের সুর: এখানে তোমার এভাবে নিজেকে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

—কী করব তবে?

—You should see the other side of life also! —অ্যালবার্টের গলায় শয়তানের প্রলুব্ধমন্ত্র বেজে উঠল। নির্জন বারান্দার নিভৃতিতে মার্থার সান্নিধ্য তাকে চঞ্চল করে তুলছে।

পায়ের কাছে একটা নয়—গোটা তিনেক নেংটি ইঁদুর ঘুর ঘুর করছে। সুযোগ পেয়ে একদল মশা চক্রাকারে ফিরে ধরেছে তাকে। পাথর হয়ে বসে রইল জু সাহেব।

—কিন্তু কী আমার আছে?—একটা কান্না-ভরা আকুলতা বেজে উঠল মার্থার গলায়: এই জীবনই আমার ভালো। এখানেই তিলে তিলে আমার মরতে হবে!

—ইম্‌পসিব্‌ল! কিছুতেই তা হতে পারে না।—অ্যালবার্টের কণ্ঠে পুরুষের প্রতিশ্রুতি।

—কী করে আমি যাব? কী আমার যোগ্যতা? মার্থা কি কাঁদছে? স্মাইদ্ ক্যারু ভাবতে চেষ্টা করল। মার্থা কখনো কি কাঁদতে পারে? কেঁদেছে কি কোনো দিন? ক্যারু মনে করতে পারল না।

—আমার দিকে তাকাও মার্থা!—স্নিগ্ধ বিষণ্ণ স্বর অ্যাল্‌বার্টের: চোখ তোলো।

—না—না।

—তাকাও, ভালো করে তাকাও। তোমাকে দেখি।

—কী দেখবার আছে আমার?

—তোমার চোখ। ব্ল্যাক আইজ। কালো চোখ দেখলে I feel so dreamy! মনে হয় ওই চোখের মধ্যে আমি ডুবে যাচ্ছি।

—বার্টি, প্লীজ—বোলোনা অমন করে। আমি সইতে পারছি না।

—তুমি নিজেকে জানোনা মার্থা। নিজের দিকে কখনো তাকিয়ে দেখোনি। জানোনা, তুমি কত সুন্দর!

—মিথ্যে। আমি কালো—আমি আগ্‌লি।

—কালো হলেই কি আগ্‌লি হয়? তুমি বাংলা দেশের সবুজ মাটির সৌন্দর্য। আই লাভ বেঙ্গল। বাংলা দেশের মেয়েদের আমার ভালো লাগে। একটা আশ্চর্য ছন্দ আছে তাদের। মনে হয়, লিরিক্ কবিতা। সেই কবিতা আমি তোমার মধ্যেও দেখেছি।

—বার্টি, তুমি লর্ড বংশের ছেলে। কত তোমার সম্মান, কত তোমার মর্যাদা। সেখানে কে আমি? বার্টি, ভগবানের দোহাই—তুমি আমায় ওসব বোলোনা।

—মার্থা!

—না।

—মার্থা, শোনো।

—না—না—মার্থা এবার সত্যিই কাঁদছে।

সিমেণ্টে জমানো কংক্রীটের মতো জমে গেছে ক্যাক্রর সমস্ত পেশীগুলো। শুব্ধ হয়ে গেছে বোধেন্দ্রিয়। এও ছিল মার্থার মধ্যে। ছিল চোখের জল—ছিল স্বপ্ন—ছিল এমন দুর্বলতা। কোনোদিন সে-জগতের সন্ধান পায়নি জু সাহেব, কোনোদিন পা বাড়াবার সুযোগ পায়নি মার্থার অন্তর-রাজ্যের এই বিচিত্রলোকে। যদি বিশ বছর আগেকার গোল্ডার্স গ্রীণের স্বপ্ন-মরীচিকা এমন করে তার ভেঙে না যেত, তা হলে—তা হলে কী যে ঘটতে পারত, কে বলতে পারে সে কথা!

—মার্থা, মাই লাভ—

—ও বার্টি—

—মাই ডার্লিং—

প্রেতের মতো যেন কবর ফুঁড়ে অভিশপ্ত ক্যাক্র ওদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। অ্যালবার্টের বাহুবন্ধনে তখনো মার্থা নিবিড়ভাবে বাঁধা, তখনো ওদের ওষ্ঠাধর এক সঙ্গে মিলিত।

নিঃশব্দে তিনজন দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—কিন্তু কী করতে পারত, কী করতে পারত জু সাহেব? আক্রমণ নয়, গালাগালি নয়, বিশ্বাসঘাতক বন্ধু আর অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর প্রতি একটা কটু মন্তব্যও নয়। এ হবেই—এ অবধারিত—একথা তার চেয়ে কে আর বেশি ভালো করে জানে!

The man from the moon! ছায়ার লজ্জায় আপনিই ছিটকে পড়ল স্মাইদ্ ক্যাক্র—যেমন করে একবার পড়ে গিয়েছিল একটা অবাধ্য ঘোড়ার পিঠ থেকে। কিছুই বলল না, একটা অব্যক্ত ধ্বনি পর্যন্ত উচ্চারণ করিল না। তারপর যেন কী একটা অত্যন্ত দরকারী কাজের কথা মনে পড়েছে, এমনি ভাবে অতিশয় ক্ষিপ্রগতিতে নেমে গেল বাইরের অন্ধকারে।

বাড়ি ফিরল পরদিন বেলা নটায়।

উদ্দাম রাত কাটিয়ে ফিরেছে নীচ-জাতের একটা নষ্ট মেয়ের ঘরে। তাড়ি গিলেছে কয়েক ভাঁড়। তারপর নেশায় জড়ানো চোখে টলতে টলতে ঘরে এসেছে। পাঁচ সাত বছর আগে মার্থার শাসনে এই অনুগৃহীতা মেয়েটার সংস্রব সে কাটিয়ে ছিল, আজ আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে হল।

জানত—এ হবেই সে জানত। বিস্মিত হল না—ব্যথাও পেল না। কালো মায়ের কালো ছেলে। পার্সিভ্যাল্ তাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে—সম্মান থেকে, মর্যাদা থেকে; তারই সগোত্র আর একজন শাদা মানুষ মার্থাকেও নিয়ে গেল।

অভিযোগ কাউকে করতে হলে—নিজেকেই; কারো গলা যদি টিপে ধরতেই হয়, তবে তা নিজেরই মায়ের।

বেতের চেয়ারটার ওপর ঝুপ করে শুয়ে পড়ল ক্যাক্র। টেবিলের ওপর নীল কাগজে লেখা একটা চিঠি চাপা দেওয়া—মার্থা তাকেই লিখে রেখে গেছে। অভ্যাস বসে তুলে নিলে ক্যাক্র, তারপরেই মনে হল—কী হবে পড়ে? টুকরো টুকরো করে কাগজটাকে ছিঁড়ে জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে দিলে বাইরে।

(ক্রমশঃ)

বার্ণার্ড শ'

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

সূরিগণ অগ্রগণ্য, বয়োবৃদ্ধ ঋষি নাট্যকার
জীবন-নাট্যের তব আজ কি গো হল অবসান?
এসেছ মানব হয়ে, গেলে অতি-মানবের বেশে
চির সত্যে প্রতিষ্ঠিয়া আপনার মৃত্যুহীন প্রাণ।

ক্ষুরধার লেখনীতে মধু হুল ছিল মেশামেশি।
রাজভয়, লোকনিন্দা, তুচ্ছ করি তোমার এষণা
অবধানী দৃষ্টি দিয়ে গূঢ় তত্ত্বে করেছে প্রকাশ।
অকাতরে বিলায়েছে মুষ্টি মুষ্টি ভাব স্বর্ণ-কণা।

বিলাস করেনি স্পর্শ, সম্পদ দিল না মলিনতা।
প্রতিষ্ঠা স্বাক্ষর রাখে শাশ্বতের পটভূমিকায়।
মনের যযাতি তব জরাগ্রস্ত হয় নাই কভু।
বর্ণাঢ্য তুলিকা দিয়ে সনাতন ছবি এঁকে যায়।

তোমার বিচিত্র সৃষ্টি, ওগো সত্য-পথ-সারথিক।
তোমার জীবন ধারা বহে নাই গতানুগতিক।

কুমুদশঙ্কর রায়

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হৃদয়বান মানুষ বলিতে যে দুই দশ জন মাত্র লোকের পরিচয় পাওয়া যায়, সদ্য: পরলোক-প্রাপ্ত কুমুদশঙ্কর ছিলেন তাহাদেরই একজন। যাদবপুর যক্ষ্মা আরোগ্য নিকেতন যশস্বী বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের সৃষ্টি এবং তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি বটে, কিন্তু কুমুদশঙ্কর রায়ই মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া অপরিসীম যত্নে, মাতৃসম স্নেহে লালন পালন করিয়াছেন।

কুমুদশঙ্কর রায়

যাদবপুরের হাসপাতালটির উপর ডাক্তার কুমুদশঙ্করের মমতা এতই নিবিড় ও ঘনীভূত ছিল যে, তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র করুণশঙ্করকে বিলাতে রাখিয়া যক্ষ্মারোগ চিকিৎসায় পারদর্শী করিয়া যাদবপুরেই সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। একমাত্র পুত্র কাল ব্যাধি যক্ষ্মায় ডুবিয়া থাকে সে ইচ্ছা জননীর আদৌ ছিল না এবং বিধিমত বিরুদ্ধতা ও প্রবল প্রতিবন্ধকতা করিয়াও স্বামীকে নিরস্ত করিতে তিনি পারেন নাই। হতভাগ্য প্রভাস ঘোষের শেষ নিঃশ্বাসের উপর বিধানচন্দ্র যেদিন এই আরোগ্য নিকেতনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, দধীচিসম প্রভাসের জীর্ণ দেহাস্থির উপর একখানির পর একখানি করিয়া ইষ্টক গ্রথিত করিয়াছিলেন—শিষ্য, সুহৃৎ, স্নেহাস্পদ প্রভাসের অন্তিম বাসনাকে রূপান্তরিত করিতে ভিক্ষাপাত্র হস্তে অহর্নিশি দ্বার হইতে দ্বারান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন—একান্ত ও অক্লান্ত শ্রম যত্নে বেসরকারী আরোগ্যশালার আদর্শ প্রতিষ্ঠানের রূপ দানে তনু-মন-ধন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই দিন, সেই ক্ষণ হইতে ডাক্তার কুমুদশঙ্কর কায়ার সহিত ছায়ার মত বিরাটবটবৃক্ষসদৃশ বিধান রায়ের পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট ছিলেন। কলিকাতা সহরের সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে প্রভাস বিলাতে ডাক্তারী পড়িতে গিয়া যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসে। বাঁচিবে না, জীবনের আশা নাই তথাপি বিলাতে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রভাস ভরসা পায় নাই; কিন্তু যদি মরিতে হয়, দেশের বায়ুতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার অদম্য আগ্রহেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। মৃত্যুকালে সামান্য কয়েক শত টাকা গুরু হস্তে দান করিয়া প্রভাস একটিমাত্র অনুরোধ করিয়াছিল; বলিয়াছিল, "আমার এই অর্থে যদি একটি যক্ষ্মারোগীর যন্ত্রণার লাঘব করিতে পারেন, তাহা হইলে পরলোকে গিয়াও আমি শান্তি পাইব।" প্রভাসের গুরুদেব—বিধানবাবু তাহার শেষ কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। আয়ু কেহই দিতে পারে না; যম যাহাকে আহ্বান দিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার সাধ্য কাহারও নাই; যাদবপুর যক্ষ্মারোগীদের জীবন দিতে পারিয়াছে কিনা জানি না, তবে চিকিৎসায় যাহা সম্ভব—যন্ত্রণার লাঘব এবং রোগ উপশম করিয়া নিরাশার ঘনান্ধকারে আলোকরশ্মি বিকীরণ করিয়াছে। হয়ত প্রভাসের অশান্ত আত্মা কথঞ্চিৎ শান্তিও পাইয়াছে। প্রভাসের কালে যক্ষ্মাচিকিৎসা-বিজ্ঞান আজিকার মত উৎকর্ষ লাভ করে নাই, বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াই প্রভাস চির বিদায় লইয়াছিল। আজ বহু যক্ষ্মা রোগীকে আরোগ্য লভিতে দেখিয়াও তাহার আত্মা পরম সন্তোষ লাভ করিতেছে ইহা অনুভব করিতে পারি। কুমুদশঙ্করও চিরদিন যক্ষ্মারোগীর সেবা করিয়া মৃত্যুকালে পুত্রকে সেই যক্ষ্মাক্রান্ত অভাগাদিগের সেবাতেই নিয়োজিত করিয়া গেলেন। কুমুদের আত্মাও কি পরলোকে শান্তি লভিবে না?

কলিকাতায় ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ—

সম্প্রতি বালীগঞ্জে শ্রীযুত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক অত্যধিক ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। গত কয় বৎসর ধরিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন আর জন-প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত নাই—উহা সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চালিত হইতেছে। এ অবস্থায় ট্যাক্স বৃদ্ধির ব্যবস্থা যাহাতে আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া নূতন নির্ব্বাচিত কমিশনার দ্বারা গঠিত কর্পোরেশন কর্তৃক বহাল হয়, সে জন্য সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলিকাতা বাংলার কেন্দ্র—পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ ট্যাক্স কলিকাতা হইতেই সংগৃহীত হয়—পশ্চিম বাংলায় যে ৬৭ কোটি টাকা আয়কর পাওয়া যায়, তাহার ৬৩ কোটি টাকা শুধু কলিকাতা সহরের অধিবাসীরাই প্রদান করে। বিক্রয় করের সাড়ে ৪ কোটি টাকার মধ্যে সাড়ে তিন কোটি কলিকাতা সহরেই পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলার বিজলী-কর প্রায় ১ কোটি টাকা, আমোদ কর ১ কোটি টাকা, জুয়াখেলার কর ১ কোটি টাকা—সবই কলিকাতা সহরের অধিবাসীরা দিয়া থাকে। এই সকল কথা বলিয়া সভাপতি মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা হইতে অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের দাবী জানাইয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় সামরিক গাড়ী চলাচলের জন্য কলিকাতার রাস্তাসমূহের যে ক্ষতি হইয়াছিল, সেই ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭০ লক্ষ টাকা কর্পোরেশন এখনও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট আদায় করিতে পারেন নাই। যে ভাবে কলিকাতা কর্পোরেশন ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহারও কোন যুক্তি নাই। যুদ্ধের পর যে অস্বাভাবিক অবস্থা চলিতেছে, তাহাতে কর বৃদ্ধি ব্যবস্থা বলবৎ হইলে সহরবাসী নানা ভাবে বিপন্ন হইবে—এই কথাগুলি সভায় বিভিন্ন বক্তা বিবৃত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ট্যাক্স বৃদ্ধি ব্যবস্থা রদ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যে প্রয়োজন, সে কথা প্রত্যেক সহরবাসীই আজ প্রকাশ করিতেছেন।

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ যাত্রী নিবাস—

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ মহামণ্ডল গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষাপ্রচারের জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা কালী-বাড়ীর দক্ষিণ পাশে ও বালী পুলের উত্তরে গঙ্গাতীরে একটি সুবৃহৎ বাড়ী ও পুকুরসহ তিন বিঘা জমী রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট ৫২ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। তথায় অন্যান্য কার্য্যের সহিত আন্তর্জ্জাতিক যাত্রী-নিবাস প্রতিষ্ঠা করা হইবে। বাড়ীটি পূর্ব্বে স্বর্গত যদুনাথ মল্লিকের ছিল—বালা-

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ যাত্রীনিবাস
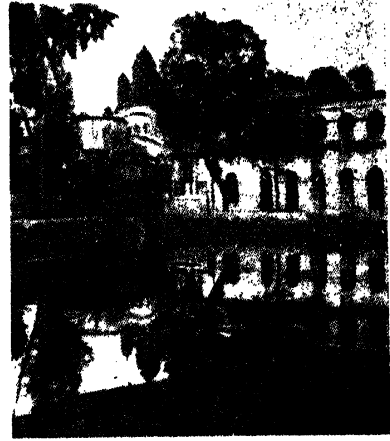
পুল নির্ম্মাণের সময় উহা রেল কর্তৃপক্ষ ক্রয় করিয়াছিলেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজা-গোপালাচারী মহাশয়ের চেষ্টায় উহা এক্ষণে রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের হস্তগত হইয়াছে। এই কার্য্যে মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব বিভাগের শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস, কলিকাতা পুলিশের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া মোটর কোম্পানীর শ্রীসুশীলকুমার দে ও দক্ষিণেশ্বরের শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা দেশবাসী সকলের প্রশংসার পাত্র।

কবি কুমুদরঞ্জন সম্বর্দ্ধনা—

বর্দ্ধমানের সাহিত্যিক সংস্থা রবিবাসরের উদ্যোগে গত ৮ই অক্টোবর সকালে বর্দ্ধমান টাউন হলে বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামনিবাসী প্রবীণ কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ উৎসবে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন ও শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমনোজ বসু ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে কবিকে মান-পত্র এবং রৌপ্য নির্ম্মিত লেখনী ও মস্যাধার উপহার দেওয়া হয়। কবি সারাজীবন গ্রামে বাস করিলেও তাঁহার কাব্যপ্রতিভা সমগ্র দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। পরিণত বয়সে কবির এই সম্বর্দ্ধনা দেশবাসীর কাব্য-প্রীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বর্দ্ধমানের যে সকল অধিবাসীর চেষ্টায় এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহারা বাঙ্গালার সাহিত্যিক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা এই উপলক্ষে কবির শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বর্দ্ধমানে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সম্বর্দ্ধনা—কবির দুই পার্শ্বে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকে দেখা যাইতেছে

আসামে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা—

আসাম প্রদেশ হইতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের ১০৮ জন সদস্য ও কেন্দ্রীয় পরিষদের ১২ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে। আগামী ৪ঠা এপ্রিল আসামের সর্ব্বত্র ঐ নির্ব্বাচনের ভোট গ্রহণ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। মোট ৪১ লক্ষ ভোটদাতা স্থির হইয়াছেন, তন্মধ্যে ১৯ লক্ষ মহিলা। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের ১০৮ জন সদস্যের মধ্যে ৩২ জন পার্ব্বত্য জেলার ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক থাকিবেন। ভারত রাষ্ট্রে আসামই সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচনের দিন স্থির করিয়াছেন—এখন অন্যান্য সকল প্রদেশের পালা আসিবে।

শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী—

গত ৫ই নভেম্বর রবিবার খ্যাতনামা দেশনায়ক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়ের বয়স ৬৪ বৎসর হওয়ায় তাঁহার জন্মদিবসে কলিকাতা ভারত-সভা হলে প্রবর্ত্তক সংঘের সভাপতি শ্রীমতিলাল রায়

মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করা হইয়াছে। ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া বিপিনবাবু যে ভাবে দেশসেবা করিতেছেন, তাহা দেশবাসী সকলের অনুকরণযোগ্য। তিনি আজীবন দারিদ্র্য, নির্য্যাতন ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া কাটাইয়াছেন। আজও তাঁহার অসামান্য কর্ম্মনিষ্ঠা ও শক্তি যে কোন যুবককে বিস্মিত করিয়া থাকে। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ, কর্ম্মময় জীবন কামনা করি। ঐ দিন তাঁহাকে একটি ৫ হাজার টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছে।

যুবকগণের উদ্যমের প্রশংসা করি ও আশা করি তাঁহাদের এই চেষ্টা দেশবাসীর প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ হইবে।

পরলোকে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১লা নভেম্বর বুধবার রাত্রি ৮টার সময় ৫৪ বৎসর বয়সে তাঁহার ঘাটশীলাস্থ (বি-এন-আর) বাসভবনে হৃদরোগে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। ৪ দিন পূর্ব্বে এক সভা হইতে ফিরিবার পথে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাহার স্ত্রী, একটি ৩ বৎসরের পুত্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান। ১৩০৩ সালের ৩০শে ভাদ্র ২৪পরগণার মুরতিপুরে তাঁহার জন্ম হয়—তাঁহার পৈতৃক বাস বনগাঁর নিকটস্থ চালকী-বারাকপুর গ্রামে—বনগাঁ হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ১৯১৮ সালে রিপণ কলেজ হইতে তিনি বি-এ পাশ করেন। ২৪পরগণা হরিনাভি স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর তিনি ভাগলপুরের ডেরা ইসমাইলপুরে জমিদারীর ম্যানেজারের কার্য্য করেন। যেমন বাল্যকালে বাড়ী হইতে ৪ মাইল দূরে স্কুলে যাতায়াতের সময়, তেমনই জমিদারীর মধ্যে ভ্রমণের সময় তাঁহাকে বনে জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ চলিতে হইত। জমিদারীর কাজ ছাড়িয়া আসিয়া তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতায় শিক্ষকতা করেন ও পরে দেশে
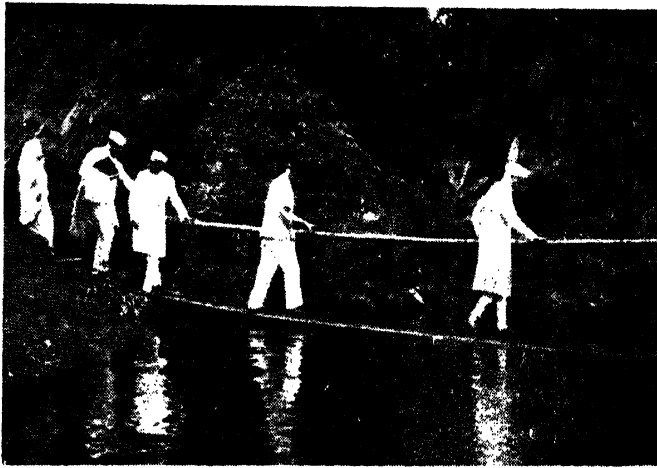
আসামের ভূকম্প-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়া সদলবলে পণ্ডিত জহরলালকে একটি অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো অতিক্রম করিতে দেখা যাইতেছে। পূর্বে একটি মজবুত লোহার পুলই এখানে ছিল। পণ্ডিতজীর সেক্রেটারী এই অস্থায়ী সাঁকো অতিক্রম কালে জলে পড়িয়া যান। ফটো—তারক দাস

বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজি—

আমেরিকা ২৫১ ওয়েষ্ট ৯১ ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক-২৫ হইতে একদল বাঙ্গালী 'বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজি' নাম দিয়া একখানি বাংলা ভাষার মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন। উহা বহু জ্ঞাতব্য তত্বে পূর্ণ থাকে। গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা সম্প্রতি আমাদের হাতে আসিয়াছে—তাহাতে 'সিটিকিউল রহস্য' 'আধুনিক পাওয়ার হাউসের গঠন পদ্ধতি' প্রভৃতি কয়েকটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শক্তি নিয়োগী, পরেশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ১০জনের নাম উহাতে দেওয়া হইয়াছে। আমরা আমেরিকা-প্রবাসী এই

ফিরিয়া যাইয়া স্থানীয় হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লেখক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর আরণ্যক, অপরাজিতা, স্মৃতিপ্রদীপ, মেঘমল্লার, যাত্রাবদল, নবাগত, তৃণাঙ্কুর, উর্মিমুখর, দেবযান, মৌরীফুল প্রভৃতি ৩০ খানিরও অধিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। দেশবাসী তাঁহার প্রাপ্য শ্রদ্ধা সম্মান প্রদান করিয়াছিল—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বোম্বাই অধিবেশনে ও মারাট অধিবেশনে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী—সুনীলমাধব সেনগুপ্ত

তিনি সাহিত্য শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক-প্রকৃতির আড়ম্বরহীন মানুষ ছিলেন। তাঁহার সহৃদয় ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার মৃত্যুতে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবার নহে। তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী পাঠক তাহা পাঠ করিয়া শুধু আনন্দ লাভ করিবে না, নূতন ভাব-প্রেরণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

পরলোকে পূর্ণচন্দ্র সিংহ—

কলিকাতা জোড়াসাঁকো সিংহ পরিবারের পূর্ণচন্দ্র সিংহ গত ২৭শে সেপ্টেম্বর পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি সারা জীবন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য তাঁহার গৃহে বহু সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও সে
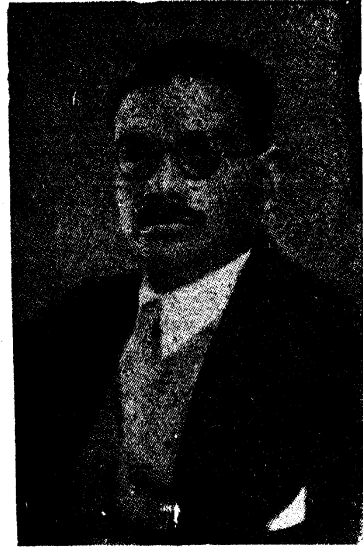
পূর্ণচন্দ্র সিংহ

জন্য তিনি প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। এ সময়ে তাঁহার মৃত্যুতে সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্য এবং তাহার রক্ষকগণের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

সমাজ-সচেতন—

'নয়া সমাজ' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের শারদীয়া সংখ্যায় কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় মহাশয়ের একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বাঙ্গালার সকল কবির দৃষ্টি এই কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করি :—

মাছ বিকাচ্ছে তিন টাকা সের পটোল বার আনা
এ সব কিছুই দেখতে পায় না কাব্য তোমার কানা।
আটায় ভেজাল, চালে কাঁকর, পাই না কেরোসিন,
কাব্য তোমার এ সমস্যায় ক্যালাস উদাসীন।
ট্রামে বাসে ভিড়ের ঠেলায় দুর্ঘটনা হয়,
তোমার কাব্যে তার ত কোন নেইক পরিচয়।

মেজর জেনারেল শ্রীসত্যব্রত সিংহ রায়ের রাঁচিতে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন

১

রাঁচির সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রের একটী দৃশ্য

সব অফিসে ঘুসের দাবী, নেইক কেহ সৎ,
কাব্য তোমার দেখাচ্ছে কি প্রতিকারের পথ ?
ঠাকুর চাকর চার না থাকতে তিরিশ টাকার কমে
চাষের অভাব ঘুচায় রেশন, যবে এবং গমে।
ধুতি শাড়ী কিনতে গেলে যা খুশী দাম চায়,
তোমার কাব্যে পাই না খুঁজে এ সবের উপায়।
কাজেই দেখছি নও কো তুমি সমাজ-সচেতন,
এ যুগে ও কাব্য তোমার অচল আয়তন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নবনির্ব্বাচিত সম্পাদক
শ্রীবিজয় সিং নাহার

ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়—

কলিকাতার খ্যাতনামা যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পরহিত ব্রতী, কংগ্রেস-সেবক ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের অকাল মৃত্যুতে বাংলার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ হইবার নহে। গত ৩০ বৎসর কাল তিনি নিঃস্বার্থভাবে যে সেবাকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালটির নাম 'কুমুদশঙ্কর যক্ষ্মা-হাসপাতাল' রাখার যে প্রস্তাব হইয়াছে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করি। তিনি ঐ হাসপাতালের উন্নতি ও প্রসারের জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র করুণাশঙ্কর ও কন্যা বাণী সেনগুপ্তা পিতার জীবনী রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। যাঁহারা কুমুদশঙ্করের জীবনের ঘটনা জানেন, তাঁহারা দয়া করিয়া তাহার বিবরণ কলিকাতা ১০০ ল্যান্সডাউন রোডে করুণাশঙ্করের নিকট প্রেরণ করিলে তাহারা কৃতজ্ঞ হইবেন।

রথীন্দ্র সংস্কৃতি পরিষদ—

গত ১৫ই অক্টোবর কলিকাতা ঢাকুরিয়া ৯নং মহারাজা ঠাকুর রোডে শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের গৃহে রথীন্দ্র সংস্কৃতি পরিষদের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। সভায় স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন। ঐ অঞ্চলে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'রথীন্দ্র গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান' গীতা-ধর্ম্ম প্রচারের যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের উপকার সাধনে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস—গীতার শিক্ষা অবলম্বন করিয়া আবার ভারতবর্ষ সর্ব্বক্ষেত্রে নবজন্ম, নূতন শক্তি লাভ করিবে এবং সমগ্র জগতকে উচ্চতর ও সমৃদ্ধতর মানব-জীবনের আদর্শ দেখাইবে। এ বিষয়ে যাঁহারা চেষ্টা করিবেন, তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত উপকার করিবেন। রথীন্দ্র সংস্কৃতি পরিষদের এই বিষয়ে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—

গত ৪ঠা কার্ত্তিক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, বাংলার প্রবীণতম সাহিত্যিক বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের দ্বি-নবতিতম জন্মতিথি বাঁকুড়া এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২০টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ঐ দিন তাঁহাকে মাল্য দান করা হয় এবং বহু কবি ও সাহিত্যিক লিখিত অভিনন্দন প্রদান করেন। সকলের উত্তরে যোগেশবাবু তাঁহার বাল্য-জীবনের কথা সভায় বিবৃত করিয়াছিলেন। আমরা বিজ্ঞানাচার্য্য মহাশয়ের সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

ৰ্মেণ্ট রাখেন।
আগষ্ট
মণ

বারাকপুর গান্ধীঘাটে—গান্ধীজীর তৈলচিত্রে পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল ডক্টর কাট্‌জু ও কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের পুষ্পমাল্য অর্পণ

আসামে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটি সম্বর্ধনা সভায় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতা। ডাঃ প্রসাদের পশ্চাতে আসামের প্রদেশপাল শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম

জর্জ বার্ণার্ড শ'—

গত ২রা নভেম্বর ৯৪ বৎসর বয়সে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সুবিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ' পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে বাগানে ভ্রমণকালে তিনি হঠাৎ পড়িয়া যান এবং তাঁহার পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ফলে তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং অস্ত্রোপচারের পরে কয়েক দিন একটু সুস্থও ছিলেন। আশা হইয়াছিল তিনি শীঘ্রই নিরাময় হইবেন। কিন্তু ২রা নভেম্বর রাত্রে তিনি হঠাৎ মারা যান। শ্লেষ, বিদ্রূপ এবং বাক্যের কষাঘাতের মধ্য দিয়া সুরসিক শ' বিশ্ব-সমাজের উপর যে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকাল ধরিয়া—তাহার কিন্তু মৃত্যু নাই। পৃথিবীর সাহিত্য যতদিন থাকিবে ততদিন বার্ণার্ড শ' মানুষের মনে অমর হইয়া থাকিবেন।

সাময়িক পত্রিকা সংঘে নূতন মন্ত্রী ডাঃ আর আমেদ—
দুই পার্শ্বে সংঘের সভাপতি ও সম্পাদক

রেশনের পরিমাণ হ্রাস—

গত ৩ই নভেম্বর হইতে দুই সপ্তাহের জন্য রেশন এলাকায় প্রতি সপ্তাহে ২১ ছটাকের স্থানে ১৪ ছটাক দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে—গমের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা হয় নাই। কোন মানুষের পক্ষেই প্রতি সপ্তাহে চাউল ও গমে মোট ৩৫ ছটাক খাইয়া জীবনধারণ করা সম্ভব নহে। চাউল কম দেওয়ার কারণ হিসাবে খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানাইয়াছেন যে সকল রেশনহীন এলাকায় চাউলের দাম মণ প্রতি ৩০ টাকার কমে পাওয়া যায় না। সে জন্য রেশন এলাকায় কম চাউল দিয়া যে চাউল বাঁচিবে তাহা জলপাইগুড়ী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জ্জিলিং ও ২৪পরগণায় প্রদান করা হইবে। অবশ্য রেশন এলাকায় ১৭ টাকা ও রেশন-হীন এলাকায় ৩০ টাকা মণ চাউল বিক্রয় কেহ সমর্থন করিবে না। সর্বত্র যাহাতে এক দরে চাউল বিক্রয় হয়, সেজন্য সত্বর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। কিন্তু সেজন্য পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা কেন যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, তাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারে না। কম চাউল পাইলে ধনী লোকেরা অন্য খাদ্য অধিক মূল্যে কিনিয়া খাইতে পারে, কিন্তু দরিদ্রগণের পক্ষে অখাদ্য অর্থাৎ শাক পাতা খাওয়া ছাড়া বা অর্দ্ধাহারে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

আসাম ও পাকিস্তান—

সম্প্রতি আসাম, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারীগণের সম্মিলিত বৈঠকে প্রকাশ পাইয়াছে যে পূর্ব পাকিস্তান হইতে আসামে দল দল মুসলমান পাঠাইয়া আসামকে পাকিস্তানের সহিত যুক্ত করার গোপন ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। গত কয় মাস ধরিয়া দলে দলে মুসলমানগণ পাকিস্তান হইতে আসামে যাইলেও আসাম গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কিছুই করেন নাই—অন্য দিকে আসাম হইতে হিন্দু বাঙ্গালী তাড়াইবার জন্য তাঁহাদের ব্যবস্থার অন্ত নাই। হিন্দু-বাঙ্গালার পক্ষে—এমন কি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের পক্ষেও আর আসামে বাস করা সম্ভব নহে। আসামের বর্তমান মন্ত্রিসভার এই কার্য্যের ফলে যদি আসাম একদিন পাকিস্তানের কুক্ষীগত হইয়া যায়, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিবে না। এ বিষয়ে কি কেন্দ্রীয় সরকারের কিছুই করিবার নাই?

মুর্শিদাবাদে চাউলের দর—

মুর্শিদাবাদ জেলায় চাউলের দর গত আগষ্ট মাসে খুব বাড়িয়া যাওয়ায় লোকের ধারণা হইয়াছে যে ঐ জেলা হইতে গভর্ণমেণ্ট ধান্য সংগ্রহ করায় ঐ অবস্থা হইয়াছে। সে সম্পর্কে গত ৩০শে আগষ্ট এক বেতার বক্তৃতায় পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—"যদি এ বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলায় গভর্ণমেণ্ট হইতে ধান্য ক্রয়ের ব্যবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় স্থানে চাউল প্রেরণের

ব্যবস্থা না করা হইত, তাহা হইলে মুর্শিদাবাদ হইতে সকল ধান বা চাউল পাশে নদীয়া জেলায় বা বিহারে চলিয়া যাইত—কারণ ঐ সকল স্থানে চাউলের দাম খুব বেশী ছিল। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে ৭ মাস চাউলের দামের কিরূপ পার্থক্য ছিল, তাহা নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে।

মাস	নদীয়া	মুর্শিদাবাদ
১৯৫০	(চাউলের মণ)	
জানুয়ারী	১৯৶০	১৭৶০
ফেব্রুয়ারী	২০৲	১৬৷৶০
মার্চ	১৯৷৷০	১৬৷৵০
এপ্রিল	২০৷৷০	১৭৲
মে	২২৷৶০	১৯৷৶০
জুন	২৫৷৴০	২২৷০
জুলাই	৩১৸৵০	২৬৵০

মুর্শিদাবাদ জেলার খাদ্যাবস্থার খবর গভর্ণমেণ্ট রাখেন। সেজন্য গত ১লা জানুয়ারী হইতে ২৯শে আগষ্ট ৮ মাসে গভর্ণমেণ্ট মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৭৮৭৬৭ মণ চাউল কিনিয়া ঐ সময়ের মধ্যে ১৫২২৪৯ মণ চাউল ও ৩৪২৭০ মণ আ[illegible] জেলাকে প্রদান করিয়াছেন। যে পরিমাণ ক্রয় করা হইয়াছে, প্রদান করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী।" ঐ সময়ে খাদ্য-মন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, পরবর্তী ৪ মাসে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ও গম দিয়া গভর্ণমেণ্ট মুর্শিদাবাদকে রক্ষা করিবেন। আমরা আশা করি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করার ফলে আমরা উপরের হিসাব প্রদান করিলাম। সরকার পক্ষ যে এ বিষয়ে একেবারে অনবহিত নহেন, তাহা হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়।

দোলা

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

এ ভুবনে শুধু ক্ষণতরে আস',
ক্ষণিকের ভালবাসা,
প্রিয়া মুখ লাগি' জাগে বুকে বটে,
অতি দুরন্ত আশা,
মনে হয় বুঝি, চিরদিন তারে,
বক্ষে রাখিব ধরি'
স্নেহেরি পরশে, দুবাহু জড়ায়ে,
বন্দী তাহারে করি ;—
সহসা ঝঞ্চা ঈশানের কোণে,
দেখা দেয় কালোমেঘে,
সুখের সে নীড় ভেঙে চুরে যায়,
বহে ঝড় খরবেগে,
বুকের সে ধন, পারি না রাখিতে,
বুকেতে আড়াল করি'
উতরোল বায়ু কোথা লয়ে যায়,
আমি শুধু, কেঁদে মরি ;

অশ্রুধারায় বিধাতা চরণে,
কত রূপে দিই পূজা,
তবু এ ভুবনে আরবার তারে,
বৃথা হয় মোর খোঁজা ;
যার ধন তার কোলে ফিরে যায়,
মায়া ছাঁদে রাখে বেঁধে,
কত মধুমাস আসে আর যায়,
দিন যায় মোর কেঁদে,—
এই ত জীবন, এই ত মরণ,
হাসি কান্নার ধন,
আসে আর যায়, ক্ষণিকে মিলায়,
তবু বুঝেনাত মন !
তবু ভালবাসি, বুকেতে জড়াই,
আদর তাহারে করি,
প্রেম নিপীড়ন, সহিতে জনম,
আঁখি জলে তাহা স্মরি !

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব ঃ

ইংলণ্ডের বিখ্যাত সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার ক্রিকেট লীগের প্রতিযোগিতার খেলার খবর ভারতীয় সংবাদপত্র-গুলিতে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর ক্রিকেট ক্রীড়ামহলে সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার ক্রিকেট লীগের খেলা নানা দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েকবছর ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ক্রিকেট খেলার অনুরাগিগণ সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার ক্রিকেট লীগের খেলার ফলাফলের উপর খুব বেশী আগ্রহ প্রকাশ করছেন কারণ লীগের খেলার বিভিন্ন দলের পক্ষ নিয়ে একাধিক নামকরা ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে খেলছেন। গতবছর বিজয় হাজারে এবং ভিন্নু মানকড় লীগের খেলায় প্রভূত খ্যাতি প্রতিষ্ঠা ক'রে এসেছিলেন। গত বছর মানকড় লীগে সহস্রাধিক রাণ এবং শতাধিক উইকেট নিয়ে লীগে নতুন রেকর্ড স্থাপন ক'রে ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব বিদেশে প্রমাণ ক'রে আসেন। এবার তাই আরও বেশী সংখ্যক ভারতীয় খেলোয়াড়দের সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে খেলবার নিমন্ত্রণ আসে, মোটা টাকার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এ বছরে খেলতে যান বিজয় হাজারে, লালা অমর নাথ, ভিন্নু মানকড় এবং পলি উমরি গড়। এ রা বিভিন্ন দলের হয়ে খেলেন। লীগের সমস্ত খেলার শেষে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের যে গড়পড়তার হিসাব তালিকা বের হয়েছিল তার বিশিষ্ট স্থানগুলির অধিকাংশ ভারতীয় খেলোয়াড়রা অধিকার ক'রেছেন। আমাদের পক্ষে এখবর খুবই আনন্দের বিষয়। ব্যাটিংয়ে যাঁরা মোট ৩৩০ রাণ করতে পারেন একমাত্র তাঁদের নামই তালিকাভুক্ত করা হয়। পলি উমরিগড় ব্যাটিংয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর মোট রাণ সংখ্যা ৫৯৯। বিজয় হাজারে আছেন চতুর্থ স্থানে। লালা অমরনাথ অসুস্থতার জন্য বেশী খেলায় যোগদান করতে পারেন নি সুতরাং এই প্রয়োজনীয় রাণ করা সম্ভব হয়নি বলে তালিকায় তাঁর নাম নেই। বাকি তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের নাম আছে। বোলিংয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যাঁরা ৩২টি উইকেট পান তাঁদের নামই তালিকায় স্থান দেওয়া হয়। সেই হিসাব মত প্রথম স্থানে আছেন ভিন্নু মানকড়, দ্বিতীয় স্থানে বিজয় হাজারে চতুর্থ স্থানে লালা অমর নাথ এবং নবম স্থানে পলি উমরি গড়। কোন এক দলের বিপক্ষে ভিন্নু মানকড়ের বোলিং এভারেজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। মানকড় ৮ ওভার বলে মাত্র ৬ রাণ দিয়ে ৭টা উইকেট পান। শেষ ৯ বলে মানকড় কোন রাণ না দিয়ে ৪ জনকে বিদায় করেন।

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট মরসুমে বিলেত থেকে ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দেশের ষোলজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল খেলতে এসেছে। দলের খেলোয়াড়দের নামের দিক থেকে গত বছরের কমনওয়েলথ দলের থেকে এই দলটি বেশী শক্তিশালী বলেই ক্রীড়া মহলের অভিমত। আমাদের ভারতবর্ষে

ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের মধ্যে রামনামের মাহাত্ম্য আজ স্মরণাতীত কাল থেকেই বিস্মরণীয় হয়ে আছে। সম্প্রতি রামনামের মাহাত্ম্য আজ সারা পৃথিবীর ক্রিকেট মহলে এবং সংবাদপত্র জগতে যে কীর্ত্তিত হচ্ছে তার নিমিত্ত হ'লেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রবাসী ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় রামাধীনের বোলিং সাফল্য। রামাধীনের বোলিং নিয়ে ক্রিকেট ক্রীড়াজগতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। 'রামাধীনকে আমরা দেখতে চাই'—ভারতীয় জনসাধারণের দিক থেকে এই দাবী সংবাদপত্রে প্রবল জনমত সৃষ্টি করে। সেই রামাধীন বহুকাল পর পূর্ব্বপুরুষের দেশ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছেন. কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের সঙ্গে খেলতে আসায়। এই দলে ইংলণ্ডের ১১ জন, অষ্ট্রেলিয়ার ৩ জন এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২ জন খেলোয়াড় আছেন। দলের অধিনায়ক হ'লেন ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলার ভূতপূর্ব উইকেট রক্ষক লেসলী এমস। দলের ম্যানেজার হয়ে এসেছেন জর্জ্জ ডাক ওয়ার্থ, তিনিও ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব উইকেট রক্ষক।

নিম্নলিখিত খেলোয়াড় নিয়ে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলটি গঠিত হয়েছে।

লেসলী এমস (কেণ্ট ও ইংলণ্ড) ক্যাপটেন, ফ্র্যাঙ্ক ওরেল (বার্বাদোস ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ)—ভাইস ক্যাপটেন, এ বার্লো ল্যাঙ্কসায়ার), ক্রস ডুল্যাণ্ড (দঃ অষ্ট্রেলিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়া), জর্জ্জ এমেট (গ্লুসেষ্টার্সায়ার ও ইংলণ্ড) লরি ফিসলক (সারে ও ইংলণ্ড), হ্যারণ্ড গিম্বলেট (সোমেরসেট ও ইংলণ্ড), কেন গ্রিভস (নিউ সাউথ ওয়েলস ও ল্যাঙ্কসায়ার), জ্যাক আইকিন (ল্যাঙ্কসায়ার ও ইংলণ্ড), লেসলী জ্যাকসন (ডার্বিসায়ার ও ইংলণ্ড), জিম ল্যাকার (সারে ও ইংলণ্ড), সনি রামাধীন (ত্রিনিদাদ ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ), ডিরিক স্যাকলটন (হাম্পসায়ার ও ইংলণ্ড), আর স্পুনার (ওয়ার উইকসায়ার), জর্জ্জ ট্রাইব (ভিক্টোরিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া) এবং ফ্রেড রিজওয়ে (কেণ্ট)। এই ষোলজনের মধ্যে টেষ্ট খেলোয়াড় আছেন ইংলণ্ডের ৮জন, অষ্ট্রেলিয়ার ২জন এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২জন।

কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব টেষ্ট ক্যাপটেন পি-টি-আই-য়ের সংবাদদাতার নিকট তাঁর দল সম্পর্কে বলেছেন—'best players in the British Commonwealth' তাঁর মতে সবদিক থেকেই এই দলটি 'well balanced' এবং যতদূর সম্ভব শক্তিশালী বোলারদের নিয়ে দলটি গঠন করা হয়েছে। বোম্বাইয়ে 'প্রোগ্রেসিভ গ্রুপ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক ভোজ সভায় লেসলী এমস বলেন, তাঁর দলে কেবল পৃথিবীর কয়েকজন 'finest batsmen'ই আসেন নি, এসেছেন পৃথিবীর নামকরা কয়েকজন 'fastest-scorers'। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ এ, এস ডি মেলোর মতে, লেসলী এম্স, ওরেল, ট্রাইব, রামাধীন, ফিসলক এবং গিম্বলেট হ'লেন 'Greatest cricketers ever'। দলের অধিনায়ক লেসলী এম্স এই ভোজসভায় মন্তব্য করেছেন, 'his cricket career would be incomplete without the visit to India, the birth place of the great Rajitsinghji'।

এম সি সি দলের সঙ্গে লেসলী এম্স প্রত্যেক কমনওয়েলথ দেশে গিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। ভারতবর্ষে এইবার তাঁর প্রথম পদার্পণ। কমনওয়েলথ দলের সব থেকে বেশী আকর্ষণের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রবাসী ভারতীয় খেলোয়াড় রামাধীন। এঁর বোলিং নিয়ে ক্রিকেট ক্রীড়া-জগতে রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। স্পিন বোলারগণ ক্রিকেট খেলার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে যে ভাবে আঙ্গুল দিয়ে বলটি ধরে বল করেন, রামাধীন হলেন তাঁর ব্যতিক্রম। এক বছর আগেও সনি রামাধীন ছিলেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দক্ষিণাঞ্চলের ক্লাব ক্রিকেট মহলের নিকট পরিচিত। সেখান থেকে চার মাসের মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে ইংলণ্ডে খেলতে এসে পৃথিবীর ক্রিকেট ক্রীড়ামহলে আন্তর্জাতিক পদমর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে সকলের, কাছে এক বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসার জাল বিস্তার করলেন, তাঁর অসামান্য বোলিং সাফল্যে। 'লেগ-ব্রেক এবং অফ্-ব্রেক' এই দুইয়েতেই তিনি সমান পারদর্শী এবং তাঁর বল সাধারণতঃ 'good length' বজায় রেখে চলে। ব্যাটসম্যানের উদ্দেশ্যে বল ছাড়বার সময় তাঁর 'unorthodox fingerwork' ব্যাটসম্যানকে ধাঁধাঁর মধ্যে রাখে, কোন দিকে বল গিয়ে গতি পরিবর্ত্তন করবে তা বুঝতে না দিয়ে। 'অমৃতবাজার' এবং 'যুগান্তর পত্রিকার' নিজস্ব সংবাদদাতার সংবাদ অনুসারে প্রকাশ,। রামাধীনের এতখানি বোলিং সাফল্যের অন্যতম

সহায়ক হ'ল নাকি তাঁর টুপি। তিনি টুপি মাথায় বল করেন এবং টুপিতে হাত দিয়ে উইকেট-কিপারকে তাঁর সংকেত পাঠান। জানি না এর মধ্যে কতখানি কৌশল আছে। তবে কৌশল যখন থলির মধ্যে থেকে বেরিয়েই পড়লো তখন দেখা যাক্ ব্যাটসম্যানরা তাঁর বল কতখানি উপেক্ষা করতে পারেন। ইংলণ্ড সফরে রামাধীন মোট ১২৯টা উইকেট পান। প্রতি উইকেট পান গড়ে ১৫ রানের কিছু বেশী রান দিয়ে। টেষ্ট ম্যাচের বোলিং এভারেজ হ'ল—৩৭৭·৫ ওভার, ১৭০ মেডেন, ৬০৪ রানে এবং ২৬টা উইকেট। ভারতবর্ষের প্রথম খেলায় প্রথম বলেই তিনি উইকেট পান, বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট কণ্ট্রোল একাদশের বিপক্ষে এবং মাত্র প্রথম ইনিংসে ২৩ রানে ৬টা উইকেট পান। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তিনি ২৭টা উইকেট পেয়েছেন ১৩৪ ওভার বল দিয়ে, ৪৭টা মেডেন নিয়ে এবং ২১৫ রান দিয়ে।

কমন ওয়েলথ দলের ভারতবর্ষে পাঁচ মাসের ক্রিকেট সফর শেষ হবে ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারীর ১১ তারিখে (?)। পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচ হবে, (১) দিল্লী (নভেম্বর ৪-৮), (২) বোম্বাই (ডিসেম্বর ১-৫), (৩) কলিকাতা (ডিসেম্বর ৩০—৩ জানুয়ারী ১৯৫০) (৪) মাদ্রাজ (জানুয়ারী ১৯-২৩) এবং (৫) কানপুর (ফেব্রুয়ারী ৮-১২)। ক'লকাতায় ৩টি খেলা হবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে (ডিসেম্বর ২০-২২) এবং রাজ্যপাল একাদশের বিপক্ষে (ডিসেম্বর ২৪-২৬)।

রোভার্স কাপ ফাইনাল ঃ

১৯৫০ সালের প্রতিযোগিতার ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিস দল ১-০ গোলে ক'লকাতার এরিয়ান্স দলকে হারিয়ে রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়েছে।

এরিয়ান্স দল একাধিক দলের একাধিক খেলোয়াড় নিয়ে রোভার্সে যোগদান করে। বাইরে এরূপ ভাবে দল গঠন আইন সঙ্গত। ক'লকাতার একমাত্র মোহনবাগান দলই (১৯২৩) ১১ জন নিজ দলের বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে ফাইনা'ল খেলেছে।

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল ঃ

দিল্লীর ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে ৮ম গুর্খা রাইফেলস দলকে পরাজিত করেছে। প্রথম দিনের ফাইনালে উভয় পক্ষে দু'টি গোল হওয়ায় খেলাটি ড্র যায়। ইস্টবেঙ্গল দল দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছাড়া অপর দল থেকে দু' জন খেলোয়াড় নিয়ে দলকে শক্তিশালী করে। অপর দিকে গুর্খা দলে ক্যালকাটা গ্যারিসনের এবং শীল্ডের সার্ভিসেস একাদশের একাধিক খেলোয়াড় যোগদান করে।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

অষ্টত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক